আপোস করিনি

অগ্নিমিত্র

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

APOS KARINI

(A biographical novel based on the life of Harish Chandra Mukherjee, the editor of Hindoo Patriot.)

by

AGNIMITRA

প্রকাশক :
শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল, ১৯৬০

প্রচ্ছদ : শ্রীঅতি দাস

মুদ্রক :
বি. সি. মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের
প্রথম জীবনী-গ্রন্থরচয়িতা
বোম্বাই এলফিনস্টোন কলেজের
প্রয়াত অধ্যাপক :
ফ্রামজী বোমানজীর স্মৃতির
উদ্দেশে—

ভূমিকা

ঊনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকের সূচনাপর্বেই মাত্র সাঁইত্রিশ বছর বয়সে যাঁর অকালপ্রয়াণে বঙ্গদেশের নীলকর-নিপীড়িত লক্ষ লক্ষ দরিদ্র কৃষক-পরিবারের নরনারী 'অসময়ে হরিশ ম'ল' ব'লে বুক চাপড়ে কেঁদেছিল ; যিনি আঠারোশো সাতান্ন সালের তথাকথিত সিপাহি-বিদ্রোহকে সমসাময়িক কালেই সর্বপ্রথম 'দ্য গ্রেট ইণ্ডিয়ান রিভোল্ট' বা 'ভারতীয় মহাবিদ্রোহ' ব'লে ঘোষণা ক'রেছিলেন ; যিনি 'ভারতীয় সাংবাদিকতার জনক' রূপে সম্মানিত—'হিন্দু পেট্রিয়ট' সম্পাদক সেই আপোসবিহীন, 'চরমপন্থী' হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনী অবলম্বনে রচিত এই গ্রন্থ 'আপোস করিনি'।

প্রথমেই জানিয়ে রাখা প্রয়োজন, এটি জীবনী-গ্রন্থ বা বায়োগ্রাফি নয়। এ-গ্রন্থ সর্বাংশেই জীবনী-উপন্যাস বা বায়োগ্রাফিকাল নভেল। উপন্যাসের ক্ষেত্রে কাহিনীসূত্র গ্রন্থনে কল্পনার সাহায্য গ্রহণ অপরিহার্য। হরিশচন্দ্রের পূর্ণাঙ্গ জীবনীগ্রন্থ নেই ব'লে কল্পনার সাহায্য অবশ্যই আমাকে গ্রহণ ক'রতে হয়েছে। কিন্তু এ-কথা আমি নির্দ্বিধায় ব'লতে পারি যে, ঐতিহাসিক তথ্যের বিন্দুমাত্র বিকৃতি না ঘটিয়ে কল্পনার সাহায্য আমি সেইটুকুই গ্রহণ ক'রেছি যেটুকু হরিশচন্দ্রের চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের প্রতি আলোকপাত এবং কাহিনী-বিন্যাসের পক্ষে প্রয়োজন। কাহিনীতে উল্লিখিত অজস্র চরিত্র এমন কি, নীলবিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী অখ্যাত কৃষকদের নামেরও অধিকাংশই আমি নীলচাষ-সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষকের গ্রন্থ ও নথীপত্র থেকে পেয়েছি।

এই উপন্যাসের জন্য উপাদান ও তথ্যসংগ্রহের ব্যাপারে অনুজপ্রতিম অধ্যাপক অলোক রায়ের কাছে আমি সবচেয়ে বেশি ঋণী। তিনি তাঁর মাতামহ প্রখ্যাত জীবনীকার প্রয়াত মন্মথনাথ ঘোষের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে রক্ষিত বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা, রিপোর্ট, গেজেটিয়ার, সংবাদপত্র ইত্যাদি ব্যবহার ক'রতে দিয়ে আমাকে অপরিশোধ্য ঋণপাশে আবদ্ধ ক'রেছেন। তাছাড়া, স্কটিশ চার্চ কলেজের গ্রন্থাগারিক শ্রীকবিতা রায় ও সহ-গ্রন্থাগারিক শ্রীঅমলেশ রায়ও বিভিন্ন দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা দেখতে দিয়ে আমাকে আন্তরিকভাবে সাহায্য ক'রেছেন। তাঁদের কাছেও আমি ঋণী।

প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক সমরেশ বসু সম্পাদিত 'মহানগর' মাসিক পত্রিকায় এই উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হ'তে আরম্ভ করেছিল। তিন-চতুর্থাংশ প্রকাশের পর দুর্ভাগ্যবশত মহানগর পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হ'য়ে যায়। সম্প্রতি বাঙলা পুস্তক প্রকাশনা ক্ষেত্রে অন্যতম দিক্‌পাল স্বনামখ্যাত শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার দীর্ঘকলেবর এই উপন্যাসখানি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়ে আমাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ ক'রেছেন। শিল্পী-বন্ধু অতি দাস এই গ্রন্থের প্রচ্ছদপটটি প্রীতিবশত অঙ্কন করে দিয়েছেন। তাঁর কাছেও আমি কৃতজ্ঞ।

উপন্যাসখানি পাঁচটি পর্বে সম্পূর্ণ। দু'খণ্ডে প্রকাশিতব্য এই উপন্যাসের প্রথম খণ্ডে থাকছে প্রথম তিনটি পর্ব—যথাক্রমে উদ্ভিন্ন অঙ্কুর, আতপ্ত নিদাঘ এবং পদসঞ্চার। হরিশের শৈশব থেকে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের সূচনা পর্যন্ত উক্ত তিনটি পর্বের বিষয়বস্তু। দ্বিতীয় খণ্ডে দুটি পর্ব—বহ্নিবলয় ও নীলবিষে নীলকন্ঠ। অর্থাৎ মহাবিদ্রোহ থেকে নীলবিদ্রোহ পর্যন্ত। অলমিতি—

কলকাতা

অনিলকুমার সেনগুপ্ত
(অগ্নিমিত্র)

লেখকের অন্যান্য বই

সম্বুদ্ধ জাতক
কাজলী
এককুড়ি পাঁচ
দেশ থেকে দেশান্তর

প্রথম খণ্ড

উত্তরাভাস

দ্বিতীয় খণ্ড

উত্তরাভাস

পয়লা নভেম্বর সোমবার, আঠারোশো আটান্ন সাল। ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনের ইতিহাসে বিশেষভাবে চিহ্নিত একটি দিন। রঙবদল আর রূপবদল। একটা অধ্যায়ের সমাপ্তি, অন্য অধ্যায়ের সূচনা।

একটু আগে সূর্য পশ্চিম আকাশে অন্তর্হিত হ'য়েছে। হেমন্তের সংক্ষিপ্ত অপরাহ্ন ম্লান থেকে ম্লানতর হ'য়ে রাতের অন্ধকারে সবে তখন আকাশে ডানা মেলতে শুরু ক'রেছে।

টাউন কলকাতার দক্ষিণ উপকণ্ঠে ভবানীপুর গ্রামে এক বিখ্যাত ইংরিজি সাপ্তাহিক পত্রিকার আপিসঘর। কিছুক্ষণ আগে সম্পাদকের টেবিলের ওপর সেজবাতি জ্বেলে দিয়ে গেছে ছাপাখানার একজন কর্মচারী। সেই আলোয় গভীর মনোযোগে একটি লেখার প্রুফ দেখছে এক যুবক। সেই যুবকই পত্রিকার সম্পাদক।

যুবকের বয়স সবে পঁয়ত্রিশ বছরকে ছুঁতে চ'লেছে। লম্বা, দোহারা গড়ন, গায়ের রঙ রীতিমতো ফর্সা। সাধারণভাবে অবশ্য তার চেহারায় পৃথক বৈশিষ্ট্য কিছু নেই। বৈশিষ্ট্য যা কিছু—সে তার চোখ দু'টিতে। আয়ত দু'টি চোখই অসাধারণ উজ্জ্বল।

প্রুফ দেখা শেষ ক'রে আস্তে আস্তে মুখ তুলে তাকালে যুবক। সামনের জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে, বাইরের আবছা অন্ধকা'রে দু'চারটে জোনাকি পোকার আলো টিপ্‌টিপ্ ক'রে জ্ব'লছে আর নিবছে।

যুবক আবার দৃষ্টি নামিয়ে নিলে প্রুফের পাতার ওপর। বড়ো বড়ো হরফে জ্বল্‌জ্বল ক'রছে নিবন্ধের শিরোনামা—'নেটিব ম্যাজিস্ট্রেট'।

যুবকের ঠোঁটের কোণে আত্মগত একটু মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠলো। এই ধিক্কারেও কি লজ্জা পাবে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শ্বেতাঙ্গ শাসকের দল? এতটুকুও গ্লানি বোধ ক'রবে কি লেপ্টেন্যান্ট গবর্নর স্যার ফেডরিক হ্যালিডের গবর্নমেন্ট অব বেঙ্গল? কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে কি পুষ্পকুঞ্জে সুশোভিত ছোটোলাটের বেলভেডিয়ার প্রাসাদে? কিম্বা চৌদ্দলক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত এস্‌প্ল্যানেডের সেই সুবিশাল সুরম্য বড়োলাট ভবনে?

পকেট থেকে চেনঘড়িটি বের ক'রে সময় দেখে নিলে যুবক। তারপর তার স্বভাবসিদ্ধ গম্ভীর গলায় ডাক দিলে, গোবিন্দ!

একটু পরেই পেছনদিকের কম্পোজঘর থেকে বেরিয়ে এলো হেড কম্পোজিটর গোবিন্দ। বছর তিরিশেক বয়সের রোগা ছিপছিপে যুবক। একটু দূরে দাঁড়িয়ে বিনীতভাবে সে ব'ললে, দেখা হ'য়ে গিয়েছে স্যার?

—হ্যাঁ। এরপরেও আর একবার দেখতে হবে। এটা এ-হপ্তার কাগজেই যাবে।

—আচ্ছা স্যার।

প্রুফের কাগজগুলো তুলে নিয়েও গোবিন্দ কিন্তু চ'লে গেল না। বেশ কয়েকমুহূর্ত সে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে দেখে যুবক ব'ললে, কিছু ব'লবে? টাকাকড়ি দরকার?

—আজ্ঞে না।

—তাহ'লে কী?

একটু সাহস পেয়ে আম্‌তা আম্‌তা ক'রে গোবিন্দ ব'ললে, ছোটোমুখে বড়ো কথার অপরাধ নেবেননি স্যার। এই নেকাটা কম্পোজ করবার সময় সামান্য যট্টুকুনি বুঝেচি তাতে মনে একটা খট্‌কা নেগে রয়েচে।

—কিসের খট্‌কা?

—আজ্ঞে, কিশোরীচাঁদ বাবুর মেজিস্টেটের চাকরিটা তাহ'লে এইভাবেই গেল?

শান্ত গম্ভীর স্বরে যুবক উত্তর দিলে, হ্যাঁ, তাই তো গেল। অবিশ্যি এভাবে না গেলেও অন্যভাবে নিশ্চয়ই যেতো। তবু কমিশন বসবার ফলে বিচারের একটা ভান করবার সুযোগ ওরা পেয়েচে!

কয়েকমুহূর্ত নীরব থেকে তারপর আপনমনেই যেন ব'লতে লাগলো যুবক, আজ সোমবার। পাঁচদিন আগে গত বেস্পতিবার হ্যালিডে সায়েবের দপ্তর থেকে বরখাস্তের সরকারি চিঠি পেয়ে গেচে কিশোরী। কি চমৎকার বিচার!

আবার আপনমনেই একটু হাসলে যুবক।

মৃদুস্বরে গোবিন্দ ব'ললে, আমি আর কট্টুকুনই বা বুঝি স্যার! তবু মনে হচ্চে, আপনার এই নেকাটা পড়ে কোম্পানিবাহাদুর ক্ষেপে হয়তো লাল হ'য়ে যাবে!

যুবক মৃদু হেসে ব'ললে, সেটা না হ'লেই তো বুঝবো, আমার এ-লেখা ব্যর্থ হয়েচে। তবে কিনা, তুমি কিন্তু হিসেবে একটু ভুল ক'রে বসলে গোবিন্দ! আজ থেকে কোম্পানি সরকার তো আর থাকচে না হে!

—তাইতো! লজ্জায় জিভ কেটে গোবিন্দ ব'ললে, একেবারেই ভুলে গিয়েচিলুম স্যার। আজ থেকেই তো নাকি খোদ মহারাণীর গর্‌মেন্ট চালু হওয়ার কথা! কিন্তু স্যার, শুনেচিলুম, আজ নাকি কেল্লা থেকে তোপ দাগা হবে, কত নক্‌শা-তামাশা হবে, কত হাজার হাজার টাকার বাজি পুড়বে, রোশনাই হবে? কই, সে-সবের তো কোনো উয্যুগ দেখচিনে?

একটু কৌতুকের হাসি হেসে যুবক ব'ললে, খুবই হতাশ হ'য়ে প'ড়েচ দেখচি! কোনো চিন্তা নেই, সবই হবে। এলাহাবাদ থেকে টেলিগ্রাফে খবর আসার কথা। হয়তো এখনো খবর এসে পেঁছয়নি তাই দেরি হচ্চে।

গোবিন্দ ব'ললে, একটা কথা তো বুঝতে পারচিনে স্যার। কোম্পানির সদর দপ্তর হ'ল এই ক'লকেতায়, লাটবাহাদুরও এখেনেই থাকেন। তা তিনি মহারাণীর অর্ডার জারি করবার জন্যে কলকেতা ছেড়ে এলাহাবাদে গেলেন কেন?

যুবক হাসতে হাসতেই ব'ললে, এই সহজ ব্যাপারটা বুঝতে পারলে না? প্রয়াগ হ'ল ত্রিবেণী-সঙ্গম। সেখানে চান্ ক'রলে পুণ্যি হয়, জানোতো? সেইজন্যেই লাটসাহেব এমন ভালো একটা তীর্থক্ষেত্র বেছে নিয়েচেন আর কি!

গোবিন্দ খুশি হ'য়ে ব'ললে, তা বটে! কোম্পানির অত্যেচার অনাচার যে মাত্রায় উঠে গিয়েচিল তা তো আর বলবার নয়! কিন্তু স্যার, ওনারা তো কেরেস্তান। কেনিং সায়েব হিঁদুর তীর্থিক্ষেত্তর বেছে নিলেন কেন?

—তিনিই জানেন!

—আমার কী মনে হয় জানেন স্যার? ওনার মতো ভালোমানুষ ব'লেই এই মতলব নিয়েচেন।

—এই তো অনেক কিছু বুঝে ফেলেচ দেখচি!—যুবক মুখ টিপে হাসতে লাগলো।

অপ্রতিভ হ'য়ে গোবিন্দ ব'ললে, না স্যার, এ তো আমি আন্‌জাদে বললুম।

দুম্—দুম্—দুম্—দুম—দুম্—

হেমন্ত-সন্ধ্যার বিষণ্ণ নৈঃশব্দকে হঠাৎ ভেঙে খান্ খান্ ক'রে দিয়ে কেল্লার তোপ গর্জন ক'রে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হ'য়ে গেল বাজির রোশনাই। কাছে, দূরে, এখানে-ওখানে অগুন্তি হাউইবাজি আকাশের বুক চিরে শোঁ শোঁ ক'রে ওপরে উঠছে।

উত্তেজিত আনন্দে গোবিন্দ ব'ললে, কেল্লায় তোপ দাগচে স্যার! খপর তাহ'লে এসে গিয়েচে!

যুবকও যেন একটু উত্তেজিত হ'য়ে উঠলো। চেয়ার থেকে উঠে জানালার কাছে এগিয়ে গেল সে। প্রত্যক্ষভাবে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসন তাহ'লে শেষ হ'ল!

ততক্ষণে পেছনের ছাপাখানা থেকে বেরিয়ে এসেছে দ্বিতীয় কম্পোজিটর হরিগোপাল আর মেশিনম্যান নন্দরাম। আড়চোখে মালিকের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে তারা গিয়ে দাঁড়ালে অন্যপাশের জানালায়।

দুম্—দুম্—দুম্—

'হার মোস্ট গ্রেশাস ম্যাজেস্টি কুইন্স্ প্রোক্লেমেশন!'

ব্রিটিশ সম্রাজ্ঞী তথা ভারত-সম্রাজ্ঞী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা-সনদ।

কেল্লার উপর্যুপরি তোপধ্বনিতে উচ্চকিত হ'য়ে উঠেছে বৃটিশ-ভারতের মেট্রোপলিস টাউন ক্যালকাটা। সেই সঙ্গে আকাশের অন্ধকার চিরে বাজির আলোর চোখ ধাঁধানো রোশনাই।

ঠিক তিনমাস আগে দোসরা আগস্ট তারিখে ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্টে পাশ হয়েছিল ভারত-শাসনের নতুন সনদ। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে বৃটিশ-ভারতের শাসনভার নিজের হাতে তুলে নেবেন বৃটিশ সাম্রাজ্যের সর্বময়ী অধিকর্ত্রী কুইন ভিক্টোরিয়া।

আজ পয়লা নভেম্বর ভারতের মাটিতে তার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা সম্পন্ন হ'ল। এলাহাবাদে দরবার ডেকে রাণী ভিক্টোরিয়ার অনুজ্ঞাপত্র আজ আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করলেন গবর্নর জেনারেল ইন্ কাউন্সিল লর্ড ভাইকাউন্ট ক্যানিং। আজ থেকে তাঁর পদমর্যাদাও পরিবর্তিত হল। গবর্নর জেনারেল ইন কাউন্সিলের পরিবর্তে 'ভাইসরয় অব ইণ্ডিয়া'।

কিন্তু রাজধানী কলকাতার পরিবর্তে অনুজ্ঞাপত্র ঘোষণার জন্যে এলাহাবাদ নির্বাচিত হ'ল কেন?

জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বাজির আলোয় আলোকিত টাউন কলকাতার উল্লসিত আকাশের দিকে তাকিয়ে আপনমনেই আবার একটু হাসলে যুবক। নিঃশব্দ, মৃদু, অর্থপূর্ণ হাসি।

দেড় বছর আগের কথা।

সারা উত্তরভারতের অন্তে-প্রত্যন্তে উত্তাল বিদ্রোহের বহ্নিমান লেলিহান শিখা তখন স্তিমিত। কিন্তু সেপাইদের ওপর—শুধু সেপাই কেন তাদের সঙ্গে যারা বিন্দুমাত্রও সহযোগিতা ক'রেছে. সেই সমস্ত ব্লাডি নিগার ইণ্ডিয়ান নেটিবদের ওপর উন্মত্ত প্রতিহিংসার জ্বালায় বৃটিশ সেনাপতিরা তখন মরীয়া। কানপুর, আগ্রা, মীরাট কিম্বা দিল্লিতে বিদ্রোহীদের ওপর যে-আক্রোশ চরিতার্থ করা সম্ভব হয়নি, একটা ছোটো উপলক্ষ্য নিয়ে সেই আক্রোশ যেন উত্তপ্ত লাভাস্রোতের মতো নেমে এলো এলাহাবাদের নরনারী আর শিশুদের উপর।

বিদ্রোহের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কালা-আদমি সেপাইদের ভেতর শুধুমাত্র শিখ আর গুর্খা রেজিমেন্টগুলো অন্নদাতা কোম্পানির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। চূড়ান্ত আনুগত্যে তারা শ্বেতাঙ্গ অন্নদাতার সেবা করেছে—অকম্পিত হাতে রাইফেলের ট্রিগার টেনেছে স্বদেশী বিদ্রোহী সহকর্মীদের বুক তাক ক'রে। বিদ্রোহ দমনে সবচেয়ে বড়ো সহায় শিখ আর গুর্খা সেপাইয়ের দল। তাই মনে মনে তাদের কাছে কৃতজ্ঞ ছিল ইংরেজ।

দেড় বছর আগে জুন মাসের মাঝামাঝি একদিন এলাহাবাদের পথে নিহত হ'ল একজন শিখ সেপাই। তারপরই সেই বীভৎস ঘটনা।

সুযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এলাহাবাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো বৃটিশ ফৌজ। নিরপরাধ নর-নারী-শিশুর রক্তে ভিজে গেল এলাহাবাদের মাটি। সমস্ত উত্তরভারতেই রক্তবন্যা ব'য়ে গিয়েছিল। কিন্তু পৈশাচিক নৃশংসতায় তার সবগুলিকেই বোধহয় ছাড়িয়ে গেল এলাহাবাদের ঘটনা। কমপক্ষে আটশো লোকের হ'ল ফাঁসি, বন্দুকের গুলি আর তরোয়ালের কোপে কত জন যে প্রাণ দিলে তার হিসেব নেই।

আজ এই দেড় বছর পরে এখনো হয়তো রক্তের দাগ শুকোয়নি এলাহাবাদের মাটিতে।

সেখানকার বাতাসে কান পাতলে এখনো হয়তো শোনা যাবে অসংখ্য কণ্ঠে মরণ-যন্ত্রণার দুঃসহ তীব্র আর্তনাদ।

তাই কি দরকার ছিল একটু সান্ত্বনার প্রলেপ দেওয়ার? রাজধানী কলকাতার পরিবর্তে সনদ-ঘোষণার জন্যে তাই কি নির্বাচিত হ'ল এলাহাবাদ?

'হার মোস্ট গ্রেশাস ম্যাজেস্টি কুইন-স্ প্রোক্লেমেশন!'

ইংলণ্ডেশ্বরীর সদয় আশ্বাসে তাঁর ভারতীয় প্রজাবৃন্দ আশ্বস্ত হোক। তারা জানুক, এর পর থেকে ন্যায়-নীতি আর সুবিচারের জন্যে তাদের দুশ্চিন্তা ক'রতে হবে না।

হঠাৎ যেন চোখ দু'টো ঝ'লসে গেল যুবকের।

কাছাকাছি কোনো জায়গা থেকে একটা জোরালো হাউই শোঁ শোঁ ক'রে অনেক উঁচু আকাশে উঠে সশব্দে ফেটেছে। সঙ্গে সঙ্গে ঝলমলে নানারঙের আলোর রোশনাইয়ে ভ'রে উঠেছে আকাশ। তার ভেতর থেকে দু'পাশে ফুটে উঠলো নীলরঙের দু'টি পরী—হাতে তাদের নানারঙের আলোর ফুলে গাঁথা মালা। দুই পরীর মাঝখানে আকাশের বুকে অনেকখানি জাযগা জুড়ে লাল আলোয় ইংরিজি হরফে লেখা ফুটে উঠলো—গড সেভ দ্য কুইন।

ঈশ্বর মহারাণীকে রক্ষা করুন!

যুবকের মুখে আবার ফুটে উঠলো সেই মৃদু নিঃশব্দ হাসি। গত দেড়বছর ধ'রে সারা উত্তরভারত জুড়ে জ্বলেছে বিদ্রোহের লাল আগুন। হাজার হাজার মানুষের লাল রক্তে ভিজেছে উত্তরভারতের মাটি। আজ হাউই বাজির রোশনাইয়ে রাণী ভিক্‌টোরিয়ার উদ্দেশে মঙ্গল-কামনাও লালে লাল হ'য়ে এ-দেশেরই আকাশে জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে!

পাঞ্জাবের রঞ্জিৎ সিং ব'লে গেছেন, সব লাল হো যায়েগা!

তিনি ঠিকই অনুমান ক'রেছিলেন। ভবিষ্যতের ছবি হয়তো তাঁর চোখের সামনে স্পষ্ট হ'য়েই ভেসে উঠেছিল। ভারতবর্ষের মানচিত্রে ইংরেজ-অধিকৃত অঞ্চলগুলি আজ লাল রঙে রঞ্জিত। সুবে বাঙলার মানচিত্রে একশো বছর আগে তেইশে জুন তারিখে রবার্ট ক্লাইভের তরোয়ালের খোঁচায় প্রথমে প'ড়েছিল লাল রঙের ছোপ। একশো বছর পরে প্রায় সারা ভারতবর্ষের মানচিত্র আজ লালে লাল।

আকাশের বুকে নীলপরী আর লাল আলোর লেখাগুলো অন্ধকার আকাশের বুকে ভাসতে ভাসতে ক্রমেই উত্তরদিকে মিলিয়ে যেতে লাগলো।

উত্তরদিকেই তো আসল জমজমাট টাউন কলকাতা!

নগর-উপান্তে গণ্ডগ্রাম ভবানীপুরের একটা একতলা বাড়ির জানালায় দাঁড়িয়ে সুতোনুটি কিম্বা ডিহি-কলকাতার আকাশ দেখা যায় না। সেখানে হয়তো বাজির আলোয় রাতের আকাশ হ'য়ে গেছে প্রায় দিনের মতো। সিংঘি, সরকার, ঠাকুর, শেঠ, মল্লিক আর বসাকদের বনেদি বাড়িগুলোয় আজ নাকি লাখ লাখ টাকার বাজি পুড়বে! উৎসবের জোয়ারে টাউন কলকাতার জীবন-স্রোত আজ কানায় কানায় টইটম্বুর।

কেল্লায় একুশবার তোপ দাগা শেষ হ'ল। সব শেষের শব্দটা বাতাসে প্রতিধ্বনিত হ'য়ে আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল।

—স্যার!

গোবিন্দের ডাকে চমক ভাঙলো যুবকের। তার দিকে চোখ ফেরাতেই উদ্দীপ্তস্বরে গোবিন্দ ব'ললে, স্যার, কলকাতায় আজ এই যে আনন্দ—এই যে কোম্পানির দানো আমাদের ঘাড় থেকে নেমে গেল, এ তো স্যার, ব'লতে গেলে আপনার জন্যেই সম্ভব হ'ল!

গোবিন্দের কথা শেষ হ'তে না হ'তেই হরিগোপাল ব'ললে, শুধু আমরা নই স্যার, তাবৎ কলকেতার মানুষ আজ এ-কথা ব'লতে বাধ্যি! সেই মিউটিনির শুরু হওয়া এস্তক আজ পজ্জন্ত আপনি যে কিভাবে খেটেচেন, তা বাইরের নোকে না জানুক, আমরা এই তিনজনা তো

জানি? কলম হাতে আপনি যদি নাটবাহাদুরের পাশে না দাঁড়াতেন, তবে কি আর এই সুখের দিন আজ আসতো স্যার? কেনিং সাহেবের শত্তুরপক্ষ গোরা সাহেবের দলতো চেল্লাচিল্লি ক'রে ওনাকে এদেশ থেকে তাড়িয়ে তবে ছাড়তো! ফি-জাহাজে আমাদের এই কাগজ বিলেতে যেতো ব'লেই না সেখেনে ভদ্দরনোক গোরা সায়েবেরা এনাদের কেচ্ছাকীর্তি জানতে পারলে!

যুবক একটু অন্যমনস্ক।

হ্যাঁ, কিছুটা তো তাই-ই বটে! কথায় উচ্ছ্বাসের মাত্রা একটু বেশি থাকলেও ঠিকই বলেছে হরিগোপাল। ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে দু-পক্ষের বাদ-বিতণ্ডায় বিরোধীপক্ষের নেতা গ্ল্যাডস্টোন সাহেবের প্রধান হাতিয়ার ছিল এই পত্রিকা। এই পত্রিকা থেকেই ছত্রের পর ছত্র উদ্ধৃতি দিয়ে সরকারী নীতির বিরুদ্ধে তিনি বহুবার জোরালো বক্তব্য রেখেছেন। ক্যানিং সাহেবের বিরুদ্ধপক্ষ এদেশ থেকে বহু-স্বাক্ষরিত এক পিটিশন পাঠিয়েছিল। তাদের প্রধান বক্তব্য, নেটিবদের প্রতি এত সহানুভূতিশীল, অযোগ্য, অপদার্থ গবর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিংকে অবিলম্বে পদচ্যুত ক'রে যোগ্যতর কোনো গবর্নর জেনারেল নিয়োগ করা হোক। কিন্তু পিটিশনার শ্বেতাঙ্গদের ইচ্ছাপূরণ হ'ল না। ক্যানিং তো র'য়ে গেলেনই, উপরন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারত শাসনের সনদ-ই হ'য়ে গেল খারিজ! রাণী ভিক্টোরিয়া সরাসরি নিয়ে নিলেন ভারত সাম্রাজ্যের দায়িত্ব।

নন্দরাম মেশিনম্যান। গোবিন্দ কিম্বা হরিগোপালের যেটুকু ইংরিজি জ্ঞান আছে, তার সে-টুকুও নেই। কোনো লেখারই অর্থ সে বোঝেনি, সপ্তাহের পর সপ্তাহ মেশিন চালিয়ে কেবল পত্রিকা ছেপেই গেছে। কিন্তু গর্বে তারও বুক ফুলে উঠেছে। যে সাপ্তাহিক পত্রিকা এদেশে ঝড় তুলেছে, ঝড় তুলেছে গোরাদের দেশ বিলেতে—সে পত্রিকা তারই হাতে ছাপা হ'য়ে বেরোয়, এটা কি কম কথা?

নন্দরাম-ও আর চুপ ক'রে থাকতে পারলে না। ব'ললে, আমার অপরাধ লেবেন নি স্যার, আমি মুখ্যুসুখ্যু মুনিষ্যি, কীই বা বুঝি? কিন্তুক বড়োনাটবাহাদুর আপনার নেকাকে যে কতদূর মান্যি দিয়েচেন, তা তো আমি জানি? এই পাঁচ-ছ'মাস আগে এস্তকও ফি-হপ্তায় কাগজ ছাপার দিন তেনার খাস আদ্দালি সায়েব আগে থেকে এসে ছাপাখানায় ব'সে থাকতেন। ছাপা শুরু হ'লে পেথমদিকের ক'খানা কাপি লিয়ে তবে গাড়ি হাঁকিয়ে নাটসাহেবের হাতে পোঁছে দেবার তরে ছুটতেন! তেনার হাতে গরম গরম কত কাগজ আমি তুলে দিয়েচি!

গোবিন্দ একটু উষ্মার সঙ্গে ব'ললে, তা যদি বলিস নন্দ, তেনার হাতে কাগজ তো আমিও তুলে দিয়েচি, হরিও মাঝে-মাঝে দিয়েচে। তুই একা কেন?

যুবক-সম্পাদক হেসে ব'ললে, তোমাদের তিনজনেরই দেখচি, গর্ব করবার বিলক্ষণ কারণ আছে। নেহাৎ রামা-শ্যামা নয়, একেবারে খোদ বড়োলাটবাহাদুরের খাস আর্দালির হাতে গর্‌মা-গরম কাগজ তুলে দেওয়া কি সোজা কথা? এ সৌভাগ্য ক'জনের হয়?

তিনজনেই একটু অপ্রতিভ হ'য়ে গেল।

গোবিন্দ আম্‌তো আম্‌তো ক'রে ব'ললে, আজ্ঞে, তার জন্যে নয় স্যার। সত্যি কথা ব'লতে কি, যে-কাগজে আমরা কাজ করি, তারই জোরে দেশে যে এত বড়ো একটা পালাবদল হ'য়ে গেল, সেইটেই তো আমাদের গর্ব!

আর একটা জোরালো হাউই আকাশে উঠে গেল।

দক্ষিণে চড়কডাঙার দিক থেকে খোল-করতাল সহযোগে সম্মিলিত কণ্ঠে সংকীর্তনের সুর ভেসে আসছে। উল্লাস-প্রকাশের অন্যতম পন্থা।

এগিয়ে আসছে নগর-সংকীর্তনের দল। তাদের গানের কলি ক্রমশ স্পষ্ট হ'য়ে কানে ভেসে আসছে—

মহারাণীর দীর্ঘজীবন কামনা করি।
প্রেমানন্দে সবাই মিলে বল হরি হরি॥

যুবক হেসে ব'ললে, বাঃ, মিলিয়ে গান বেঁধে ফেলেচে তো!

নন্দরাম ব'ললে, আমাদের চড়কডাঙার হরিসভার দল স্যার! ভারী ভালো কেত্তন গায়, খুব ভক্তি!

যুবক ব'ললে, হুঁ, সে তো বুঝতেই পারচি।

আলোয় আলো কলকাতার আকাশ। অবিশ্রান্ত হাউইবাজির আলোয় আকাশের অন্ধকার কোথায় যেন হারিয়ে যেতে বসেছে। উল্লাস, কোলাহল আর বাজির শব্দে টাউন কলকাতা দিশেহারা। যেন সব প্রাপ্য আজই কড়ায় গণ্ডায় হাতের মুঠোয় এসে গেছে!

চাপকানের পকেট থেকে কয়েকটা টাকা বের ক'রলে যুবক। প্রত্যেকের হাতে দু'টি ক'রে টাকা দিয়ে ব'ললে, আজ আর কাজ নয়—আজ ছুটি। বাড়ি যাওয়ার পথে ছেলেপিলেদের জন্যে মেঠাই কিনে নিয়ে যেয়ো। কালকে বরঞ্চ একটু সকাল সকাল এসে কাজ শুরু ক'রো, কেমন?

—দু'-টা-কা-র মেঠাই?—কেমন যেন হতচকিতের মতো ব'ললে গোবিন্দ, অত মেঠাই দিয়ে কী হবে স্যার? সে তো ব'য়ে নিয়ে যেতে বারকোশ লাগবে!

—বড়ো চ্যাঙাড়িতেই ঠিক দিয়ে দেবে ময়রা। যাও—

অভিভূতের মতো ধরা গলায় গোবিন্দ ব'ললে, স্যার, আমরা তো বক্‌শিশ চাইনি!

—আমিও বক্‌শিশ ব'লে দিইনি গোবিন্দ। ও-টাকাতো তোমাদের দিইনি, দিয়েচি তোমাদের ছেলেমেয়েদের মেঠাই খেতে। জানিনে, ভবিষ্যতে কী হবে! তবু আজকের দিনটায় সবাই মিলে যাহোক একটু আনন্দ ক'রে নেওয়া যাক, কী বলো? জানো তো আমাব কোনো সন্তান নেই। থাকলে তাদের জন্যে হাতে ক'রে যাহোক একটু কিছু নিয়ে যেতুম, তাই নয়? কোনো সংকোচ ক'রো না। তোমরা যাও—

ওরা তিনজন বেরিয়ে যাওয়ার পর বেশ কয়েকমিনিট কেটে গেছে।

হাউইয়ের পর হাউই আকাশে উঠছে। রঙীন আলোর বিচ্ছুরণে আকাশ মাতোয়ারা। 'গড সেভ দ্য কুইন!' 'লং লিভ কুইন ভিক্‌টোরিয়া!'

জানালার কাছ থেকে আস্তে আস্তে স'রে এলো যুবক। ঈশ্বর হয়তো ইংল্যাণ্ডের অধীশ্ববীকে দীর্ঘায়ু দান করবেন, হয়তো রক্ষা করবেন তাঁকে। কিন্তু ব্রিটিশের উপনিবেশ এই বিরাট দেশ ভারতবর্ষকেও তিনি কি রক্ষা করবেন?

হঠাৎ দ্রুত পায়ে ঘরের বাঁদিকে এগিয়ে গেল যুবক। সেখানে কাঠের শেল্‌ফে পর পর সাজানো রয়েছে পত্রিকার ফাইল। কোন্‌টা কোথায়, সে তার নখদর্পণে।

মে মাসের ফাইলটা বের ক'রে দ্রুতহাতে পৃষ্ঠা উল্টে একটা নিবন্ধকে খুঁজে বের ক'রে অন্য এক উত্তেজনায় তার প্রত্যেকটি পংক্তির ওপর নতুন ক'রে আবার চোখ বোলাতে শুরু ক'রলে যুবক।

আজ পয়লা নভেম্বর। ছ'মাস আগে মে মাসের ছ'তারিখের পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধ।

'দি অ্যাট্রোসিটিজ অ্যাণ্ড রেট্রিবিউশন।'

বর্বরতা এবং প্রতিহিংসা!

নিবন্ধটি দ্রুত প'ড়ে গেল যুবক। একবছর ধ'রে ভারতবর্ষের বুকে উত্তাল বিদ্রোহ এবং সেই বিদ্রোহদমনে বৃটিশ রাজশক্তির উন্মত্ত নৃশংস মূর্তি দেখার পর ছ'মাস আগেকার উপলব্ধির ফসল!

নিবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদের ঠিক প্রথম বাক্যটিতেই কিছুক্ষণের জন্যে সংবদ্ধ হ'য়ে গেল যুবকের দৃষ্টি।

"History will, we conceive, take a very different view of the facts of the great Indian Revolt of 1857 from what contemporaries have taken of them."

"আমাদের বিশ্বাস, আঠারোশো সাতান্ন সালের ভারতীয় মহাবিদ্রোহকে সমসাময়িক ব্যক্তিবর্গ যে দৃষ্টিতে বিচার ক'রছেন, ইতিহাস ভবিষ্যৎকালে তা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে তার মূল্যায়ন ক'রবে।"

—হ্যাঁ, তাই করবে!—নির্জন ঘরে দাঁড়িয়ে হঠাৎ সোচ্চার স্বগতোক্তির মতো ব'ললে যুবক, আমার বিশ্বাস, তা করবেই!

মোহ ছিল, মোহ-ভঙ্গ হয়েছে। ছিল কিছুটা দিশেহারা উদ্‌ভ্রান্তি। বৃটিশ তার নির্মমতম হিংস্র চেহারাটা দেখিয়ে ক'রে দিয়েছে ভ্রান্তি নিরসন।

নিজের কাছেই কেমন যেন একটু আশ্চর্য লাগছে যুবকের। সেপাইদের বিদ্রোহ আরম্ভ হওয়ার দু'একমাস আগেই পল্টন ছাউনিগুলোয় এদেশি সেপাইদের ধুমায়মান অসন্তোষের উত্তাপকে কেমন ক'রে যেন সে অনুভব ক'রতে পেরেছিল। আভাস পেয়েছিল অগ্নিস্ফুলিঙ্গের প্রতীক্ষায় সঞ্চিত বারুদ-স্তূপের। ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্টের আসন্ন দাবানলের ইঙ্গিত মিলেছিল ব'লেই মঙ্গল পাঁড়ের বিদ্রোহের আগেই তার কলম থেকে বেরিয়েছে 'দ্য মিউটিনিজ'।

শ্বেতাঙ্গেরা ব'লেছে মিউটিনি। তার অর্থ, সামরিক বিভাগে বিক্ষুব্ধ বিদ্রোহ মাত্র। এদেশবাসীও বলে মিউটিনি। বিদ্রোহ আরম্ভের প্রথম দিকে কয়েকটি লেখায় সে নিজেও ওই মিউটিনি শব্দটাই ব্যবহার ক'রেছে। কিন্তু সে ভ্রান্তি বেশিদিন থাকেনি। 'মিউটিনি' শব্দটার পরিবর্তে তার কলম থেকে ঝ'রে পড়লো তিনটি শব্দ—গ্রেট ইণ্ডিয়ান রিভোল্ট!

ভারতীয় মহাবিদ্রোহ!

দ্রুত হাতে একবছর আগেকার সেই মে মাসের ফাইল টেনে বের করলে যুবক।

একুশে মে আঠারোশো সাতান্ন সাল।

'দ্য কান্ট্রি অ্যাণ্ড দ্য গভর্ণমেন্ট'—দেশ এবং রাজশক্তি।

এপ্রিলের গোড়ায় মঙ্গল পাঁড়ের ফাঁসি—মে মাসের গোড়ায় মীরাট ক্যান্টনমেন্ট থেকে সর্বাত্মক বিদ্রোহের সূচনা। বিদ্রোহী সেপাইদের সঙ্গে প্রতিদিন যোগ দিচ্ছে হাজার হাজার রিক্ত, বঞ্চিত ভারতবাসী। সে কি কেবলমাত্র মিউটিনি?

'দ্য কান্ট্রি অ্যাণ্ড দ্য গভর্ণমেন্ট!'—একুশে মে তারিখের নিবন্ধ।

"There is not a single native of India who does not feel the full weight of the grievances imposed upon him by the very existence of the British rule in India—grievances inseparable from subjection to a foreign rule."

"আজ ভারতবর্ষের এমন একজনও অধিবাসী নেই যে কিনা এদেশে বৃটিশ-শাসনজনিত নিষ্পেষণের দুঃসহ গুরুভারকে অনুভব করছে না। বৈদেশিক শাসকের কাছে অধীনতা স্বীকারের গ্লানির সঙ্গে সেই দুঃসহ গুরুভারের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।"

একটা সুগভীর পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো যুবকের বুক থেকে। হ্যাঁ, দৃঢ় প্রত্যয় থেকেই এ-কথা সে লিখেছিল। এ তার আন্তরিক উপলব্ধি।

উপলব্ধি কি নির্ভুল?

কে জানে! ইতিহাসই ভবিষ্যতে তার বিচার ক'রবে!

ফাইলগুলো তুলে রেখে আর একবার জানালা দিয়ে টাউন কলকাতার আকাশের দিকে তাকালে যুবক। তারপর এগিয়ে গেল ঘরের ডানদিকে। আলমারি খুলে একটা ডাচ ক্ল্যারের বোতল বের ক'রলে সে। ডাচ ক্ল্যারে দিয়েই বিদেশি মদে তার হাতে-খড়ি হয়েছিল। এর চেয়ে অনেক দামী মদেও তার অভ্যেস আছে। কিন্তু হয়তো প্রথম পরিচয়ের সূত্র ধ'রেই এই বিশেষ মদের ওপর তার প্রথম প্রণয়ের দুর্বলতা আছে।

জানালা দিয়ে আরো কিছুক্ষণ আলোকোজ্জ্বল আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলো যুবক। প্রচণ্ড আনন্দের মুহূর্তে কেমন যেন একটা বিহ্বল অবসাদ!

সংশয় মেটে না।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অপশাসন গেল, সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার নামে খোদ বৃটিশ সরকার আজ থেকে দায়িত্ব নিয়েছে ভারত-সাম্রাজ্যের। কিন্তু সত্যিই কি তাতে প্রার্থিত পরিবর্তন কিছু

হবে? খোলস-বদলের পর এই সোনার খনির মতো বিরাট উপনিবেশে বৃটিশ এবার কোন কলা-কৌশলের আশ্রয় নেবে, কে জানে!

আজকের মতো দূরে যাক চিন্তা-ভাবনা।

আর বিলম্ব নয়। ডাচ ক্ল্যারের বোতল খুলে আস্তে আস্তে সেই তেজি উগ্র সুরার সবটুকু গলায় ঢেলে দিলে হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার যুবক-সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

প্রথম পর্ব

উদ্ভিন্ন অঙ্কুর

ভবানীপুর অঞ্চল তখন পর্যন্ত নিতান্ত এক গণ্ডগ্রাম।

টাউন কলকাতার উপকণ্ঠে হ'লেও কলকাতার অংশ হিসেবে গণ্য হওয়ার কৌলিন্য তখনো সে অর্জন করেনি। বন-জঙ্গল, ঝোপ-ঝাড় আর খানা-ডোবা নিয়েই তখনকার ভবানীপুর।

উত্তরে গোবিন্দপুর; দক্ষিণে চড়কডাঙা, রসাগ্রাম আর কালীঘাট।

অবশ্য গোবিন্দপুর তখন আর আগেকার গোবিন্দপুর নেই। তার পশ্চিমদিকে গঙ্গার ধার ঘেঁষে বেশ বিরাট একটা এলাকা সেই কবে গ্রাস ক'রে নিয়েছে কোম্পানি সরকারের নতুন কেল্লা। আর পূর্বদিকেও নেই সেই ধানক্ষেত, তামাকের ক্ষেত, কলাবাগান কিম্বা বাঁশবন। দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে বন-জঙ্গল আর পতিত জমি। চৌরিঙ্গি অঞ্চল থেকে যে পথটা ডিহি বিরজি, ভবানীপুর, রসাগ্রাম হয়ে কালীঘাটের দিকে চ'লে গেছে, সেই পথের পূর্বদিক থেকে আরো পূবে ক্যামাকসাহেবের বিরাট বাগানবাড়ির সীমানা পেরিয়ে সাবেক বামুনবস্তী পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় এরই ভেতর সাহেব-ফিরিঙ্গিদের কত কোঠা বাড়ি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। আর কিছুদিন পরে হয়তো লোকে চিনতেই পারবে না কোথায় ছিল জোড়াতালাও, কোথাও ছিল ঝাঁঝরি তালাও নামে সেইসব পুরনো দীঘি। চিনতেই পারবে না কোথায় ছিল বাদামতলা আর কোথায় বা বামুনবস্তী!

উত্তরের সুতোনুটি আর আগের সুতোনুটি নেই। বড়োবাজার থেকে শুরু ক'রে একেবারে সেই বাগবাজারের মারাঠা খাল পর্যন্ত সারা এলাকা এখন তার হঠাৎ ফেঁপে-ওঠা জাঁকজমকের জৌলুষে চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। ডিহি কলকাতা, কলুটোলা, বৌবাজার, বড়োবাজার, জোড়াসাঁকো, শোভাবাজার—সবাই যেন সদ্য-উদ্ভিন্না চপল যুবতীর মতো ঠারে-ঠমকে, রূপের গরবে ফেটে পড়ছে! কোম্পানির দৌলতে দিশি ভাগ্যান্বেষী বাবুদের জুটেছে দেওয়ানি, বেনিয়ানি, দালালি আর গোমস্তাগিরি। দাপট বলতে তারই দাপট, রম্‌রমা ব'লতে তারই রমরমা। টাউন কলকাতার শেঠ, বসাক, সরকার, মল্লিক, সেন কিম্বা ঠাকুরেরা যেন রূপকথার ঐশ্বর্য দিয়ে টাউন কলকাতার নতুন রাজপুরীর দেমাকি অঙ্গে চাপিয়ে চ'লেছে অলঙ্কারের পর অলঙ্কার। তাই ব'লতে গেলে সুতোনুটিই এখন আসল কলকাতা।

কালীঘাট কলকাতার অংশ নয়, কিন্তু তার সম্ভ্রম ভিন্ন।

কালীঘাটের মায়ের মন্দির কি আজকের মন্দির? একান্ন পীঠের অন্যতম কালীঘাট। সেই কবে শ্রীমন্ত সওদাগর নাকি সিংহল-যাত্রার পথে মায়ের মন্দিরে পুজো দিয়ে তবে রওনা হ'য়েছিলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কতবার জাঁকজমকে পুজো দিয়ে গেছেন মায়ের মন্দিরে। লাখ টাকা ব্যয় ক'রে মায়ের পুজো দিয়েছেন রাজা নবকৃষ্ণ।

শুধু কি তাই?

কোম্পানির গোরা ফিরিঙ্গিরা তো আর হিন্দু নয়? তারা কেরেস্তান মানুষ। তবু সিদ্ধিলাভের আশায় হাজার হাজার টাকা খরচ ক'রে তাদেরই কতজন ভক্তিভরে দিয়ে গেছে মায়ের পুজো।

পাশাপাশি গ্রাম হ'লেও কালীঘাটের সঙ্গে কোনো তুলনাই চলে না ভবানীপুরের। সারা বছর ধ'রে কত শ'য়ে শ'য়ে তীর্থযাত্রী আসে কালীঘাটে। বন-জঙ্গলের ভেতর দিয়ে তাদের পায়ে-চলা পথগুলো এঁকে বেঁকে এগিয়ে গেছে ডিহি বিরজি, ডিহি চক্রবেড়ে, ভবানীপুর, চড়কডাঙ্গা

আর রসাগ্রামের ভেতর দিয়ে। সেই সুবাদেই লোকে তবু চেনে ভবানীপুরের নাম। নইলে কে চিন্‌তো?

তবু তারই ভেতর কিছুদিন আগে থেকে কোম্পানি বাহাদুরের দয়ায় একটু আলাদা ইজ্জৎ পেয়েছে ভবানীপুর। কোম্পানি সরকারের জেনারেল হাসপাতালটি এতদিন ছিল রাইটার্স বিল্ডিংসের কাছে স্কোয়ারদীঘি অঞ্চলে। সেটা উঠে এসেছে ভবানীপুরের উত্তর সীমানায়। তারই কাছাকাছি বসেছে কোম্পানির দু'টো আদালত—সদর দেওয়ানি আর নিজামৎ। ইজ্জতের দিক থেকে এ বড়ো কম কথা নয়!

কিন্তু তাই বলে টাউন কলকাতার সঙ্গে তার কি তুলনা চলে?

টাউন কলকাতায় কত চওড়া খোয়া-বাঁধানো পাকা রাস্তা কত পাল্‌কি, ফিটন, ল্যাণ্ডো, বুহাম গাড়ির ছড়াছড়ি। কত বড়ো বড়ো ইমারত, বিলাস-বৈভবের কি অফুরন্ত সমারোহ!

তার তুলনায় গণ্ডগ্রাম ভবানীপুর তো কোনো হিসেবের ভেতরেই আসে না! তবু এই গণ্ডগ্রামটিকেই একদিন বেছে নিলেন স্বাধীনচেতা পাদরি রেভারেণ্ড পিফার্ড। এখানেই তিনি প্রতিষ্ঠা ক'রলেন তাঁর নিজের বিদ্যালয়—ইউনিয়ন স্কুল।

তার কয়েকবছর আগেই অবশ্য সদর কলকাতার চিৎপুর-গরানহাটায় প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে হিন্দু কলেজ। তার একবছর পরেই ডেভিড হেয়ার সাহেব পটলডাঙায় খুলেছেন তাঁর ভার্নাকুলার স্কুল। আটবছর পরে হিন্দু কলেজ উঠে এসেছে পটলডাঙার হেয়ার সাহেবের জমিতে। তারও বছর ছয়েক পরে চার্চ অব স্কটল্যাণ্ডের পাদরি রেভারেণ্ড আলেকজাণ্ডার ডাফ এসেছেন কলকাতায়। আরো উত্তরে হেদুয়া পুকুরের কাছাকাছি কোথাও তিনিও একটা স্কুল খোলার চেষ্টায় ছিলেন। তাঁর সহায় নামী ব্যক্তি দেওয়ানজী রামমোহন রায়। ডাফ সাহেবের সঙ্কল্প খুব তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়েছে। জোড়াবাগান-নিমতলা অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে গেছে তাঁর জেনারেল অ্যাসেম্ব্লিজ ইন্‌স্টিট্যুশন।

রেভারেণ্ড পিফার্ড'ও হয়তো ইচ্ছে ক'রলে টাউন কলকাতার কোনো জমজমাট এলাকায় নিজের স্কুল আরম্ভ করতে পারতেন। কিন্তু সে-চেষ্টা তিনি করেননি। মিশনারি হিসেবে ক্রিশ্চানধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এদেশে এলেও আর পাঁচজন মিশনারির সঙ্গে একটা জায়গায় তাঁর স্বভাবে একেবারেই অমিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসক-প্রতিনিধিরা তাঁরই স্বজাতি শ্বেতাঙ্গ। কিন্তু তাদের উচ্ছৃংখল এবং দর্পিত চাল-চলনকে তিনি একেবাবেই সহ্য ক'রতে পারেন না। আর অন্যদিকে হঠাৎ-ধনী এদেশি বাবুদের প্রতিও তাঁর বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই। অথচ সদর কলকাতায় কোনো প্রতিষ্ঠান আরম্ভ ক'রতে গেলে এদের দুপক্ষের কারো না কারো সাহায্য নিতেই হবে। সেটা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় ব'লেই নিজের স্কুলের জন্যে তিনি চ'লে এলেন টাউন কলকাতার অনেক দক্ষিণে—গণ্ডগ্রাম এই ভবানীপুরে।

ইউনিয়ন স্কুল!

স্কুলে নতুন বছর আরম্ভের সময়কার একদিন সকাল।

নিজের কামরায় ব'সে গভীর মনোযোগে পিফার্ড সাহেব কিছু দরকারি কাগজপত্র দেখছেন, এমন সময় ফরসা রোগা লিকলিকে একটি ছোটো ছেলে তাঁর কামরায় ঢুকে টেবিলের বিপরীত দিকে সামনাসামনি এসে দাঁড়ালে। ছেলেটির পরনের ধুতি-পিরান নিতান্তই জীর্ণ।

—পাদরি সায়েব!

হঠাৎ একটা শিশুকন্ঠের ডাক শুনে পিফার্ড মুখ তুলে তাকালেন। ছেলেটি তাঁর অচেনা। তিনি অনুমান করে নিলেন, হয়তো এই বছরেই ভর্তি হ'য়েছে। স্কুলের ছাত্রেরা তাঁকে ফাদার ব'লেই সম্বোধন করে, কেউ পাদরিসাহেব বলে না।

সস্নেহ হাসি হেসে পিফার্ড ব'ললেন, কিছু বলবে? তুমি কোন্ ক্লাসে ভর্তি হ'য়েচ?

ছেলেটি সপ্রতিভভাবেই উত্তর দিলে, আমি এখনো ভর্তি হইনি। কিন্তু এই স্কুলে ভর্তি হ'তে চাই ব'লেই আপনার কাছে এয়েচি।

রেভারেণ্ড পিফার্ড বেশ কয়েকমুহূর্ত ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এদেশে এতটুকু বয়সের কোনো ছেলেকে এতখানি সপ্রতিভ তিনি আগে দেখেননি। তাছাড়াও ছেলেটির আর একটা বৈশিষ্ট্য তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তার দেহ খুবই শীর্ণ কিন্তু তারই ভেতর চোখ দু'টি অস্বাভাবিক উজ্জ্বল।

—তোমার নাম কী?

—হরিশ। শ্রী হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

—তোমার বয়স কত?

—সামনের বোশেখ মাসে সাত হবে।

—আগে কোথাও প'ড়েচ?

—হ্যাঁ, আমাদের পাড়ার পাঠশালায় আমি দু'বছর প'ড়েচি।

হরিশ প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে আর প্রৌঢ় পিফার্ডের মনে খুশির মাত্রা বাড়ছে। এই ক'বছরে ইউনিয়ন স্কুলে কত ছেলে এসেছে কিন্তু এত অল্প বয়সের ঠিক এইরকম অনাড়ষ্ট, সপ্রতিভ ছেলে আর একটা তাঁর নজরে পড়েনি। এদেশি ছেলেদের বেশির ভাগই তিনি যা দেখেছেন, তারা দু'রকমের। একদল খুব ভীরু প্রকৃতির, অন্যদল অতিবিক্ত অনুগত। এতদিন পরে তিনি এমন একটি ছেলেকে দেখছেন, প্রথম দর্শনেই যাকে একটু আলাদা জাতের ব'লে চিনে নেওয়া যায়!

পিফার্ড এবার ইচ্ছে ক'রেই ছদ্ম গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললেন, আমার স্কুলে ভর্তি হ'তে গেলে তোমাকে যোগ্যতার পরীক্ষা দিতে হবে। আমি তোমাকে কয়েকটি প্রশ্ন ক'রবো, উত্তর দিতে পারবে?

—আমি নিশ্চয়ই চেষ্টা ক'রবো।—উত্তর এলো শিশুকণ্ঠ থেকে।

—বাঃ, এই তো চাই!—এবারে মনের খুশিভাব আর গোপন রাখতে পারলেন না পিফার্ড। কথার উত্তর দেবার সময়েও ছেলেটির দৃষ্টি আর কণ্ঠস্বরে কি চমৎকার আত্মপ্রত্যয়!

পিফার্ড পর পর কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। তার ভেতর দু'তিনটি প্রশ্ন সাত বছর বয়সের ছেলের পক্ষে রীতিমতো কঠিন।

হরিশ কিন্তু অপ্রতিভ হ'ল না। প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে চট্‌পট্‌ সে উত্তর দিয়ে গেল। তার বয়সের পক্ষে উপযুক্ত প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর-ই নির্ভুল। এমন কি, কঠিন প্রশ্নগুলির ভেতরেও দু'টির উত্তর সে নির্ভুলভাবেই দিতে পেরেছে। কেবল একটি প্রশ্নের ক্ষেত্রে ব'ললে, এটা আমি বলতে পারবো না পাদরিসায়েব!

একগাল হেসে সোচ্ছ্বাসে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হরিশকে নিজের কাছে টেনে নিলেন পিফার্ড। উচ্ছ্বসিত আবেগে তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে ব'ললেন, আমি খুব খুশি হয়েছি। হ্যাঁ, তোমাকে আমি নিশ্চয়ই ভর্তি ক'রে নেবো।

আনন্দে, উত্তেজনায় রোগা লিকলিকে ছেলেটার ডাগর ডাগর চোখদু'টো আরো উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো। যোগ্যতার পরীক্ষায় সে তাহ'লে উত্তীর্ণ হ'য়েছে!

পিফার্ড প্রশ্ন ক'রলেন, তোমার অভিভাবক—মানে, তোমার বাবা কি সঙ্গে এসেচেন?

মুহূর্তের ভেতর ম্লান হ'য়ে গেল হরিশের মুখ। মৃদুস্বরে সে ব'ললে, আমার বাবা এখানে থাকেন না সায়েব, আমি মামাবাড়িতে থাকি। সঙ্গে আমার বড়োমামা এয়েচেন, তিনি বাইরে দাঁড়িয়ে আচেন।

আর্দালিকে দিয়ে হরিশের মামাকে ভেতরে ডেকে পাঠালেন পিফার্ড। দুরু দুরু বুকে [illegible] ভেতরে এসে ঢুকলেন হরিশের বড়মামা বীরেশ্বর চাটুজ্যে।

—আপনিই এই ছেলেটির অভিভাবক?—প্রশ্ন ক'রলেন পিফার্ড।

আম্‌তা আম্‌তা ক'রে ঢোঁক গিলে বীরেশ্বর উত্তর দিলেন, আপাতত তা ব'লতে পারেন সায়েব।

—ঠিক আছে, তাতে কোনো অসুবিধে হবে না। এ-ছেলেকে আমি আমার স্কুলে ভর্তি ক'রে নেবো এবং তা আজই!

বীরেশ্বরের মনে আনন্দ, চোখের চাউনিতে দুশ্চিন্তা। বিচলিত স্বরে অতি সঙ্কুচিত ভাবে হাত জোড় ক'রে তিনি ব'ললেন, সে তো খুবই সৌভাগ্যের কথা! কিন্তু তার আগে আমার একটা নিবেদন আছে সায়েব!

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তেমনিভাবেই হাত জোড় ক'রে আর একবার ঢোঁক গিলে ব'ললেন, এটি আমার ভাগ্‌নে—মানে, সহোদরা ভগ্নীর ছেলে। ওর জন্মদাতা পিতা এখানে থাকেন না। আমার ভগ্নী এবং ওরা দু'ভাই আমাদেরই দরিদ্র সংসারে প্রতিপালিত।

পিফার্ড মৃদু হেসে ব'লেন, কুলীন ব্রাহ্মণ?

—হ্যাঁ সায়েব। আমরা নৈকষ্য কুলীন। কিন্তু বড়োই দরিদ্র। আপনি হরিশকে ভর্তি ক'রে নিতে চাইচেন, এ আমাদের পক্ষে অতীব আনন্দেব কথা। কিন্তু ইস্কুলের বেতন কিম্বা বইপত্তরের ব্যয়নির্বাহের সামর্থ্য যে আমাদের নেই!

পিফার্ড ব'ললেন, তাহ'লে ওকে ভর্তি করবার জন্যে নিয়ে এলেন কেন?

করুণ মুখে বীরেশ্বর ব'ললেন, বিশ্বেস করুন সায়েব, এই পৈতে ছুঁয়ে বলচি, আমি আনতে চাইনি, ছেলেটাই জোর ক'রে আমাকে টেনে এনেচে। লেখাপড়া করবার আগ্রহ ওর খুবই বেশি, কিন্তু আমাদের যে সঙ্গতি নেই, সেটাতো ও ঠিক বুঝতে পারে না!

পিফার্ড আবার হরিশের মুখের দিকে তাকালেন। হরিশের দু'চোখ তখন জলে ছলছল ক'রছে।

হরিশকে নিবিড় স্নেহে কাছে টেনে নিলেন পিফার্ড। তারপর বীরেশ্বরের দিকে তাকিয়ে স্নিগ্ধ, প্রশান্ত হাসি হেসে ব'ললেন, এ-ছেলের জন্যে আপনাদের একটা সিক্‌কা টাকাও ব্যয় ক'রতে হবে না বাবু। ওর সব দায়িত্ব আমি নিজেই নিলুম। আমারই সুপারিশে হরিশ বিনা বেতনে এই স্কুলে পড়বে। ওর বই-খাতা সব কিছু জোগানোর দায়িত্বও আমার। আশা করি, এর পরেও ওকে ভর্তি করতে আর আপনার আপত্তি থাকতে পারে না?

আপত্তি!—ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইলেন বীরেশ্বর। কয়েকমুহূর্ত তাঁর মুখ দিয়ে কোনো কথা ফুটলো না। ছেলেটা কি যাদুমন্তর জানে? নইলে এইটুকু সময়ের ভেতর কেমন ক'রে এতবড়ো রাশভারি পাদরি সাহেবের মন ও জয় ক'রে ফেললে?

ভর্তির আবেদনপত্রে গোটা গোটা হাতে বাঙলায় সই ক'রে দিলেন বীরেশ্বর।

হরিশের হাড় জির্‌জিরে কাঁধে হাত রেখে রেভারেণ্ড পিফার্ড ব'ললেন, সুইট বয়! এইটুকু বয়সে শিক্ষার ওপর তোমার এই আগ্রহ দেখে আমি আন্তরিকভাবে খুশি হ'য়েচি। যোগ্যতার বিচারেও তুমি সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হ'য়েচ। আজ প্রথম দিনেই একটা কথা তোমাকে ব'লে রাখি। জীবনে সব সময় মনে রাখবে, শুধু যোগ্যতা আর মেধা থাকলেই হয় না। তাকে শাণ্ দিয়ে আরো ধারালো করবার জন্যে চাই অক্লান্ত পরিশ্রম, চাই অধ্যবসায়। যত বিপদ-বাধাই আসুক, তার বিরুদ্ধে তোমাকে সংগ্রাম ক'রতে হবে। চাই পরিশ্রম, অধ্যবসায়, দৃঢ়সংকল্প।—পারবে তো?

সাতবছর বয়সের ছেলে এ-সব কথার অর্থ কতটুকু বুঝলে, তা সে-ই জানে! কিন্তু তার ডাগর ডাগর ঝক্‌ঝকে চোখ দু'টি যেন ঝলমল ক'রে উঠ্‌লো। কচি গলায় শান্ত অথচ গম্ভীরস্বরে সে ব'ললে, হ্যাঁ আমি পারবো!

॥ দুই ॥

সেদিন ছেলে হাসিমুখে বাড়ি ফিরে আসার পর রুদ্ধশ্বাসে সমস্ত বিবরণ শুনলেন রুক্মিণী। এ-ও কি সম্ভব?

এমন ব্যাপার সহজে কেউ বিশ্বাস করবে? ওই একরত্তি ছেলেটা কিনা বিদ্যের বহর দেখিয়ে অতবড়ো একজন পণ্ডিত পাদরি সাহেবের মন জয় ক'রে এসেছে! শুধু কি মন জয় করা? বিনি মাইনেয় পড়বার বন্দোবস্ত ক'রে একেবারে ভর্তি পর্যন্ত হ'য়ে এলো? এইটুকু ছেলের এত ক্ষমতা!

বিনিমাইনের খবরটাই রুক্মিণীর কাছে সবচেয়ে দামী। দুঃসহ দারিদ্র্যের তাড়নায় জর্জরিত এক দুঃখিনী মায়ের কাছে তার চেয়ে ভালো খবর আর কী হ'তে পারে?

শুধু কি দারিদ্র্য? তার চেয়েও অনেক বেশি গ্লানির একটা ভারী বোঝা সেই কবে থেকে জগদ্দল পাথরের মতো বুকের ওপর চেপে ব'সে আছে। পরের গলগ্রহ হ'যে বেঁচে থাকার এ-যন্ত্রণা বড়ো মর্মান্তিক!

নৈকষ্যকুলীন পাত্র পেয়ে আর কোনো কিছু বিচার বিবেচনা ছাড়াই রামধন মুখুজ্যের হাতে একমাত্র মেয়ে রুক্মিণীকে সম্প্রদান ক'রেছিলেন ঠাকুরদাস চাটুজ্যে। তার আগেই যে উত্তরপাড়ায় আর মুর্শিদাবাদ জেলায় কোন্ গ্রামে রামধনের আরো দু'টি সংসার হ'য়ে গেছে, তা জেনেও পিছিয়ে যাননি ঠাকুরদাস। কন্যাদায়ের মতো বড়ো দায় তো আছেই, তার ওপর বংশের শুদ্ধি বজায় রাখতে গেলে এ-টুকু মানিয়ে নিতে হবে বৈ কি! একটা মাত্র মেয়ে, অ-সতীনে দিতে পারলে কোন বাপের না ভালো লাগে? কিন্তু উপায় নেই। তার প্রতীক্ষায় বসে থাকতে গেলে মেয়েকে হয়তো সারাজীবনই আইবুড়ো হ'য়ে থাকতে হবে। তার চেয়ে এই-ই ভালো। দেশাচার না মেনে সমাজে বাস করা যায়? কুলীনের ছেলে পাঁচটা সংসার করলেই বা ক্ষতি কী? কৌলিন্যের কথা ভাবতে গেলে, সেটা বরঞ্চ একদিক থেকে ভালো। তাতে অন্তত পাঁচজন কুলীন বাপ কন্যাদায় থেকে মুক্তি পেলো, কৌলিন্যও অটুট রইলো। এইতো বছর পঞ্চাশেকের ভেতর ভঙ্গ আর বংশজ বামুনে দেশ ছেয়ে গেছে। সারা বাঙলাদেশ খুঁজলেও ক'টা নৈকষ্য ঘর মেলে?

ঠাকুরদাস চাটুজ্যে যত গরীবই হোন, মাথা নোয়াননি—কৌলিন্য খোয়ান নি। দুই ছেলে বীরেশ্বর আর দেবনারায়ণের জন্যে নৈকষ্য কুলীনঘর থেকেই বৌ এনেছেন, রুক্মিণীকেও দিলেন নৈকষ্য কুলীনের ঘরে। যদিও সেই বিয়ের পর থেকে আজ পর্যন্ত স্বামী-শ্বশুরের ভিটে একবার চোখে দেখারও সুযোগ হয়নি রুক্মিণীর।

বর্ধমান জেলায় মেমারির কাছে শ্রীধরপুর গ্রামে রামধনের পৈতৃক নিবাস। ফুলিয়া মেল, রাঢ়ী শ্রেণী মুখ্য কুলীন। রামধনকে পেয়েই মনস্থির ক'রে ফেলেছিলেন ঠাকুরদাস চাটুজ্যে। এমন পাত্র হাতছাড়া ক'রলে শেষে কপাল চাপড়াতে হবে।

মেয়ের সতীন কাঁটার ভয়?

নিতান্ত পূর্বজন্মের পুণ্যফল না থাকলে কুলীনঘরের কোন্ মেয়ে একেবারে নিজের দখলে অসতীন ঘর পায়? বিধির নির্বন্ধ ব'লে কথা! নির্বন্ধ যেখানে আছে, মেয়েকে সেখানে দিতেই হবে। তারপর অদৃষ্ট! মানুষের এত সাধ্য আছে যে অদৃষ্টের বিধান মানবে না?

ঠাকুরদাস চাটুজ্যেও তাই আর দ্বিধা করেননি।

বর্ধমান জেলার শ্রীধরপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীরামধন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ভবানীপুর চাউলপট্টি নিবাসী ঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যা রুক্মিণী দেব্যার বিবাহ হ'য়ে গেল। জামাইয়ের বয়স যদিও মেয়ের বয়সের দ্বিগুণ তবু মেয়েকে অন্তত উপযুক্ত বয়সে পাত্রস্থ ক'রতে পারার তৃপ্তিতে কালীঘাটে মায়ের মন্দিরে একদিন পুজো দিয়ে এলেন ঠাকুরদাস।

বিয়ের পর মেয়েরা শ্বশুরবাড়ি যায়। কিন্তু রুক্মিণীকে শ্বশুরবাড়ি যেতে হয়নি। বিয়ের

অনুষ্ঠান মিটে যাওয়ার পর রামধন এখানে ক'দিন ছিলেন। তারপরই চ'লে গেলেন মুর্শিদাবাদের শ্বশুরবাড়িতে। সেখানে নাকি অনেকদিন যাওয়া হয়নি। জামাই রওনা হ'য়ে যাওয়ার সময় যথেষ্ট বিনীতভাবে ঠাকুরদাস বললেন, মাঝে মাঝে কিন্তু ঘুরে যেয়ো বাবাজীবন!

রামধনও বিনীতভাবেই উত্তর দিলেন, আজ্ঞে, সে তো বটেই! হাজার হোক, সহধর্মিণী এখানে রইলেন, আমার তো একটা দায়িত্ব আছে?

জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত রুক্মিণীর জীবনের দিনগুলো এই বাড়িরই চার দেওয়ালের ভেতর সীমাবদ্ধ। প্রথমে যৌবনের কত উচ্ছ্বাস, কত কল্পনা, কত রঙীন স্বপ্ন এই সংকীর্ণ পরিসরের বদ্ধ হাওয়ার ভেতরেই দীর্ঘশ্বাস হ'য়ে মিলিয়ে গেছে!

তবে রামধন একেবারে হৃদয়হীন ছিলেন না। পালা ক'রে তিন শ্বশুরবাড়িতেই তিনি পদার্পণ ক'রেছেন। তার ভেতর অবশ্য উত্তরপাড়ার দিকেই পাল্লা কিছু ভারী। সেখানেই তাঁর প্রথম পক্ষ। সে হিসেবে তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। রুক্মিণীও দোষ দেননি।

স্বামীর ওপর অভিমানের অধিকার কুলীনঘরের মেয়ের কাছে তো দুঃস্বপ্নের মতো! অভিমানের বদলে এই ভেবেই নিজের মনকে তিনি প্রবোধ দিয়েছেন, হাজার হোক, প্রথম পক্ষ তো! সেখানে মনের টান একটু বেশি থাকাই স্বাভাবিক।

হায়রে, রুক্মিণী নিজে যদি প্রথম পক্ষ হ'তেন!

কত হতাশ্বাস, কত অব্যক্ত বেদনার বোঝা দিনের পর দিন বুকের ভেতরটাকে দুঃসহ ভারে ভারী ক'রে তুলেছে। সে-ভার বইতে না চাইলেও বইতে হবে! তবু তাব ভেতর সবচেয়ে বড়ো সান্ত্বনা কোলজোড়া দুই মাণিক। স্বামীর সোহাগ না পেলেও তাঁরই দেওয়া দু'টি সন্তান অন্তত তিনি পেয়েছেন।

তাঁর হারাণ আর হরিশ।

দুঃখিনী মায়ের দু'টি চোখের মণির মতো। বাকি জীবনের আশা, ভরসা, সান্ত্বনা আর নির্ভর!

একরত্তি ছেলে হরিশ আজ এত আনন্দ ব'য়ে এনেছে!

চোখের জল আর বাধা মানছে না রুক্মিণীর। উদ্বেল আবেগে হরিশকে তিনি বুকে চেপে ধ'রলেন।

দু'চোখে তখন হু হু ক'রে জলের ধারা নেমেছে।

॥ তিন ॥

দেখতে দেখতে দু'তিনটে বছর কেটে গেল।

ইউনিয়ন স্কুলের সেরা ছাত্রদের নাম করতে গেলেই এখন হরিশের নামটা সবার মুখে প্রথম আসে। দশ-এগারো বছর বয়সের ওই রোগা লিকলিকে ছেলেটার স্মৃতিশক্তি আর সেই সঙ্গে সব কিছু জানবার আগ্রহ দেখে শিক্ষকেরাও হতবাক! বোধহয় সবচেয়ে খুশি হয়েছেন রেভারেণ্ড পিফার্ড। হ্যাঁ, ছেলেটিকে চিনে নিতে সেদিন তাঁর ভুল হয়নি।

একখানা মোটা আটহাতি ধুতি আর অতি সস্তা মোটা কাপড়ের একটা কামিজ-এই হ'ল হরিশের স্কুলের পোশাক। পায়ে জুতো পরবার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। কলার বাসনার ক্ষার দিয়ে ধুতি-কামিজ কেচে দেন রুক্মিণী। কোথাও ছিঁড়লে বা ফেঁসে গেলে সেলাই ক'রে দেন। তাই দিয়ে যতদিন চলে।

আজ এই ক'বছর হ'ল খালি পায়ে এই পোশাকে স্কুলে যাতায়াত ক'বছে হরিশ। বীরেশ্বরই কষ্টে-সৃষ্টে বছরে একখানা ধুতি আর একটা কামিজ কিনে দেন হরিশকে। ছোটোমামা দেবনারায়ণ এ-সব নিয়ে মাথা ঘামান না।

হরিশ যে নিতান্ত গরীব, স্কুলের সব ছেলেই তা জানে। বলতে গেলে অত গরীব আর একটা ছেলেও স্কুলে নেই। হরিশ কিন্তু নির্বিকার। নিজের দারিদ্র্যকে গোপন করবার কোনো চেষ্টাও যেমন তার নেই, তেমনি, সেটাকে অযথা জাহির ক'রে অন্য ছেলেদের কাছে অনুকম্পার পাত্র হ'তেও সে রাজী নয়। যাদের বাবার অঢেল টাকা আছে, পরুক তারা দামী বিলিতি কাপড়ের চোগা-চাপকান, মখমলের টুপি। তা নিয়ে হরিশের কোনো মাথাব্যথা নেই। ধনী ঘরের দু'চারটি ছেলে হরিশের জীর্ণ পোশাক নিয়ে প্রায়ই ঠাট্টা-তামাশা করে।

সহপাঠীদের ভেতর যদুগোপাল, কালাচাঁদ, জয়কৃষ্ণ আর রামননারায়ণ হরিশকে সত্যিই ভালোবাসে। তারা কেউ বিরাট ধনীর সন্তান না হ'লেও বাড়ির অবস্থা মোটামুটি ভালো। ধনীর আদুরে দুলাল ছেলে ক'টির ঠাট্টা-তামাশা তারা একেবারেই বরদাস্ত ক'রতে পারে না। বিশেষ করে কালাচাঁদ আর যদুগোপাল একটু রগচটা। তারা হরিশকে প্রায়ই এই ধরনের কথা বলে, তুইও শুনিয়ে দে না, মেরিট জিনিসটা ড্রেসে থাকে না, থাকে মগজে। সেই ব্যাপারে পাল্লা দিতে এসো দিকি বাছাধনেরা!

হরিশ বলে, তোরা রাগিস্ কেন? আমি সত্যিই তো গরীব। তাছাড়া, ওরা যা বলে বলুক না, আমার তো গায়ে লাগচে না!

হরিশের গায়ে না লাগলেও তাদের গায়ে লাগে। শেষ পর্যন্ত তারা চারজনই প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াইয়ে নেমেছে। তাদের মুখ থেকে মাকাল ফল, ষাঁড়ের গোবর, ধর্মের ষাঁড়, মা শেতলার বাহন ইত্যাদি খেতাব পেয়ে ধনীর দুলালেরাও একটু নরম কেটেছে।

নিজের সম্বন্ধে গর্ব করতে নেই! এ-বিষয়ে প্রতিমুহূর্তেই নিজেকে সচেতন রাখে হরিশ। কতটুকুই বা তার জ্ঞান, যা নিয়ে গর্ব করা চলে?

জ্ঞানভাণ্ডার অসীম, অনন্ত! ফাদার পিফার্ডই একদিন পড়াতে পড়াতে বলেছিলেন বিজ্ঞানী নিউটনের গল্প। অতবড়ো বিরাট পণ্ডিত মানুষ নাকি শেষজীবনে বলেছিলেন, আমি জ্ঞানসমুদ্রের তীরে সামান্য কিছু নুড়ি কুড়িয়েছি মাত্র।

নিউটনের সেই কথাটা হরিশের মনে একেবারে গেঁথে গেছে।

জ্ঞানকে সমুদ্রের মতো অসীম, অতল জেনেই সন্তর্পণে তার দিকে এগোতে হবে! যখনই যেটুকু জানার সুযোগ পাওয়া যায়, সেইটুকু সঙ্গে সঙ্গে জেনে নিতে হবে। যুক্তি দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে তাকে স্পষ্টভাবে বুঝে নেবার চেষ্টা করতে হবে।

পরিশ্রম—অধ্যবসায়—দৃঢ়সংকল্প—সংগ্রাম!

ফাদার পিফার্ডের সেই প্রথম দিনের উপদেশও হরিশের মনের গভীরে গাঁথা হ'য়ে গেছে। দারিদ্র্যের চাপে যত অসুবিধেই হোক, দমলে চ'লবে না। তার ওপর ফাদার পিফার্ডের ন্যস্ত বিশ্বাসের মর্যাদা তাকে রাখতেই হবে!

তার কিশোর-মনের সঙ্গোপনে এরই ভেতর কল্পনায় একটু একটু ক'রে কত স্বপ্ন উঁকি দিতে শুরু ক'রেছে! যে-সব স্বপ্নের কথা কাউকে সে বলেনি। এমনি কি, মাকেও নয়।

ইউনিয়ন স্কুলের পড়া সাঙ্গ হ'লেই সে থেমে যাবে না। তাকে পড়তে হবে হিন্দুকালেজে। সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় পাশ ক'রতে পারলে সেখানে বেতন লাগে না, জলপানির টাকাতেই পড়ার খরচ চ'লে যায়, সে-খবরও জেনে নিয়েছে হরিশ।

কিন্তু হিন্দুকালেজ তো অনেক দূরের পথ! কোথায় এই ভবানীপুর আর কোথায় টাউন কলকাতার পটলডাঙা-গোলদীঘি। চৌরঙ্গী, কসাইটোলা, মলঙ্গা, বৌবাজার, কলুটোলা পেরিয়ে তবে নাকি সেখানে যাওয়া যায়। হিন্দু কালেজ এখনো চোখেই দেখেনি হরিশ। কেমন ক'রে দেখবে? এই ভবানীপুরের চৌহদ্দির বাইরে এক পা-ও তো সে কখনো যায়নি। বন্ধুদের ভেতর যারা হিন্দুকালেজ দেখেছে, তাদের মুখে শোনা বিবরণের ওপর নির্ভর ক'রেই মনে মনে তার একটা ছবি এ'কে নিয়েছে হরিশ। বিরাট মোটা মোটা থামওয়ালা বাড়ি, কত বড়ো বড়ো

ক্লাশঘর, কত বিশ্বান অধ্যাপক প্রতিদিন সেখানে ছাত্রদের মনের সামনে নতুন নতুন জ্ঞানভাণ্ডারের দরজা খুলে দিচ্ছেন!

ভাবতেও কেমন যেন রোমাঞ্চ লাগে!

অবশ্য হিন্দুকালেজে নাকি বড়োলোকের ছেলেরাই পড়ে। তা পড়ুক, তাতে হরিশের কী? সে তো পড়বে জলপানির টাকায়।

বাড়ি অর্থাৎ মামাবাড়ির পেছনে সামান্য একটু ফাঁকা জমি। তারই প্রান্তে কাছাকাছি একটা ডুমুরগাছ, একটা কাঁটালগাছ আর একটা কলাঝাড়। তারপরই শুরু হ'য়ে গেছে বাঁশঝাড়ের ফাঁকে ফাঁকে আশশ্যাওড়া, কালকাসুন্দি অর শীষ-আপাঙের জঙ্গল। তার ভেতর দিয়ে একটা সুঁড়িপথ গিয়ে প'ড়েছে আদিগঙ্গায়। পথের দু'ধারে লজ্জাবতীলতায় ছেয়ে থাকে। হাত দিয়ে ছুঁলেই লজ্জাবতীর পাতাগুলো কুঁক্‌ড়ে যেন ডানা মুড়ে লুকোয়। কিছুদিন আগে পর্যন্তও বিকেলবেলায় লজ্জাবতীর পাতায় হাত ছোঁয়ানো ছিল হরিশের একটা প্রিয় খেলা। আজ কিছুদিন হ'ল তাও বন্ধ হ'য়েছে।

উঁচু ক্লাশে ওঠার পর চাপ বেড়েছে পড়াশুনোর। তাই দিনের আলো থাকতে থাকতে যেটুকু সময় পাওয়া যায়, সেটুকুও সে পুরোদমে কাজে লাগায়। স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে সামান্য একটু বিশ্রাম। তার পরই ব'সে যায় বই-খাতাপত্তর নিয়ে।

জলখাবারের পাট নেই বললেই চলে।

যে-সংসারে দু'বেলা ভালোভাবে হাঁড়িই চড়ে না, সে-সংসারে নিয়মিত জলখাবার আসবে কোথা থেকে? তবু মাসের ভেতর দু'একদিন হয়তো স্কুল-ফেরতা ছেলের সামনে সামান্য দু'মুঠো মুড়ি বা খই সমেত ছোট্ট একটা বেতের ধামি এগিয়ে দেন রুক্মিণী। মায়ের ছলছল চোখের দিকে তাকিয়ে হরিশ বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পারে, মামীদের কাছে অনেক গঞ্জনা সহ্য ক'রেই হয়তো ওটুকু সংগ্রহ করতে হ'য়েছে তার মাকে। কোনো প্রশ্ন করে না হরিশ। নিঃশব্দে মায়ের দেওয়া জলখাবারটুকু খেয়ে বই-খাতা খুলে ব'সে যায় নিজের কাজে।

সবে এগারো বছর বয়সের কিশোর।

কিন্তু রূঢ় বাস্তবের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা তার স্বপ্নালু কিশোর মনটাকে যেন পঞ্চাশ বছরের প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে দিয়েছে।

রাতে পড়বার জন্যে পিদিম জ্বাললে দুই মামীরই মুখ ভার হয়, তা হরিশ লক্ষ্য ক'রেছে। পিদিমের জন্যে রেড়ির তেল কিনতেও তো পয়সা লাগে? রোজ রোজ সে পয়সা জোগাবে কে?

মনে যত কষ্টই হোক, কথাটা তো মিথ্যে নয়! বড়মামার কোনো রোজগার নেই ব'ললেই চলে। একটা মস্ত বড় গুণ, তাঁর খোল বাজানোর হাত ভারী চমৎকার। তারই দৌলতে এখানে-ওখানে সংকীর্তনের আসরে বাজিয়ে যা দু'চার আনা পয়সা পান, ব'লতে গেলে সেই-ই তাঁর রোজগার। বাড়ির ছেলেমেয়েদের সামনে বড়মামী কত সময় তাঁকে কত গঞ্জনা দেন, কিন্তু তিনি নির্বিকার। অদ্ভুত সহ্যশক্তি বড়মামার। চিৎকার ক'রতে ক'রতে রাগে দুঃখে বড়মামী কোনো কোনোদিন হয়তো কেঁদেও ফেলেন। কিন্তু বড়মামা অদ্ভুতভাবে নির্লিপ্ত, নীরব। চুপ ক'রে সব শোনেন। তারপর সন্ধ্যে হ'লেই উড়ুনিখানা কাঁধে ফেলে বেরিয়ে চ'লে যান চড়কডাঙার হরিসভায়। হরি-সংকীর্তনে খোল বাজিয়ে দুপুর রাতে গুণ গুণ্ ক'রে পদাবলী কীর্তনের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে বাড়ি ফিরে আসেন।

ছোটমামা রসাগ্রামের ছোট এক জমিদারি সেরেস্তায় জমানবিশের চাকরি করেন। মাস গেলে মাইনে আট টাকা। ব'লতে গেলে তাঁর সেই রোজগারটুকুর ওপরেই নির্ভর ক'রে আছে এতগুলো লোকের সংসার। মামামামী চারজন ছাড়া মামাতো ভাইবোন পাঁচজন। তার সঙ্গে এ-সংসারে বোঝার ওপর শাকের আঁটির মতো চেপে ব'সে আছে মা, দাদা আর হরিশ নিজে। মামামামীদের অভাব-অনটনের সংসারে তারা তিনজন সত্যিই তো গলগ্রহ!

ভোরবেলায় সূর্য ওঠা থেকে নিশুত রাত পর্যন্ত সংসারে অশান্তি। তা সত্ত্বেও মামামামীরা এখনও কিন্তু তাড়িয়ে দেননি।

তাহ'লেও মামীদের ঝাঁজালো কথা যখন-তখনই কানে আসে হরিশের। গলার জোর ছোটমামীরই বেশি। কিন্তু বড়মামীও তাঁর সঙ্গে গলা মেলান। স্বামীর তেমন কোনো উপার্জন নেই ব'লে রোজগেরে দেওর এবং ছোটো জা-কে তোয়াজ ক'রে চ'লতেই হয় তাঁকে। সেইজন্যে গলগ্রহ ননদের ওপর ঝাল ঝাড়ার সময় ছোট জা-র সঙ্গে তাঁকে গলা মেলাতেই হয়।

—ঠাকুরঝির মতলবটা কী? ঠাকুরজামাই এলেই তো শোনা যায়, দেশের বাড়িতে কত জমি-জিরেত, মরাইভরা ধান, গোয়ালভরা দুধেলা গাই, পুকুর-ভরা রুই কাৎলা আরো কত কি! এদিকে মন্তর-প'ড়ে বে' করা মাগ তো সেই জন্মাবধি বাপের ঘরেই প'ড়ে রইলো! গরীব দাদাদের ঘাড়ের ওপর ব'সে মাগী আর কতদিন পর্যন্ত নিজের আখের গোছাবে? ছেলেকে ইঞ্জিরি পড়িয়ে সায়েব বানাবে? ছেলে তার হ্যাট-কোট বুট প'রে কোম্পানির দপ্তরে চাকরি ক'রতে যাবে নাকি? ফিটনগাড়ি হাঁকিয়ে আপিস যাবে আর কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা এনে আবাগী মাকে বানাবে রাজার মা? বেশ তো, এতই যদি সাধ তো নিজের ভাতারের ভিটেয় গিয়ে সেখানকার ধনদৌলত দিয়েই ছেলেকে সাহেব বানালে হ'ত? নিজের আখের গোছানোর জন্যে এইভাবে গরীব দাদাদের ঘাড় ভাঙা কেন?

রুক্মিণী মুখ বুজে সব শোনেন, সব সহ্য করেন। তাঁর চোখ বেয়ে টপ্‌টপ্ ক'রে জলের ফোঁটা পড়তে থাকে।

মায়ের অসহায় মুখের দিকে তাকিয়ে হরিশের বুকের ভেতরটা কান্নায় যেন মুচ্‌ড়ে উঠতে থাকে। তার অভাগিনী মাকে মুখ বুজে সবই সহ্য ক'রতে হবে! সহ্য ক'রতে হবে তাকেও। তাছাড়া কোনো উপায়তো নেই!

নিজের জন্মদাতা পিতাকে জ্ঞান হওয়ার পর হরিশ দেখেনি। নিতান্ত শৈশবে দেখা সেই মানুষটার কোনো স্মৃতিই তার মনে নেই। অভাগিনী মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে সেই মানুষটার বিরুদ্ধে তার কিশোর মনের ভেতর প্রচণ্ড অথচ নিষ্ফল একটা বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠতে থাকে। তাদের বাড়ি আছে, তার বাবা বেঁচে আছেন তা সত্ত্বেও কেন তার মাকে প্রতিদিন মুখ বুজে মেনে নিতে হবে এত লাঞ্ছনা, এত অপমান?

মাকে দেখে হরিশ আজকাল ভালোভাবেই বুঝতে পারে, শ্লেষ, বিদ্রূপ, গঞ্জনা—সবই তাঁর গা-সওয়া হ'য়ে গেছে। দৈনন্দিন ভাতের খোঁটায় এখন তাঁর চোখে জল আসে না। মনটাকে শক্ত পাথর ক'রে তোলার চেষ্টায় তিনি যেন এখন মরীয়া।

হরিশকে ঘিরে ভবিষ্যতের কত স্বপ্ন রুক্মিণীর!

আর সেই কারণেই তাকে নিয়ে চিন্তাও তত বেশি। এমনিতেই ছেলেটা রুগ্ন, তারপরও এই বাড়ের বয়েসে আধপেটা খেয়ে পড়াশোনার অত ধকল পুইয়ে ছেলেটা বেঁচে থাকবে তো? কপালে কী আছে ভগবান জানেন!

ছেলের বয়স অতটুকু হ'লে কী হবে, বোঝে অনেক কিছু। মুখে বিশেষ কিছুই বলে না, কিন্তু মাঝে মাঝে করুণ, বিষণ্ন দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। রুক্মিণীর মনে হয়, ছেলেটা যেন তার নিরুপায় দৃষ্টির উপলব্ধি দিয়ে মায়ের ব্যথার গভীরতাকে সে যেন অনুভব করবার চেষ্টা ক'রছে। ম্লান, বিষণ্ন, বেদনার্ত একটু হাসি ফুটে ওঠে রুক্মিণীর মুখে। তাঁর সারাজীবনের ব্যর্থতা আর হাহাকারকে ওইটুকু ছেলে কেমন ক'রে বুঝবে? সুতীব্র আনন্দ-বেদনার এক অব্যক্ত অনুভূতিতে ভ'রে ওঠে রুক্মিণীর মন। এগারো বছর বয়সের ছোট্ট ছেলেটার অস্ফুট, অনুচ্চারিত, নিরুপায় সমবেদনার স্পর্শটুকু তাঁর দুঃখের দুঃসহ বোঝাটাকে যেন অনেকখানি হালকা ক'রে দেয়!

বড় ছেলে হারাণ কিন্তু একেবারেই বিপরীত। চোখের সামনে পড়াশোনায় ছোটো ভাইটার এত উদ্যম, এত নিষ্ঠা দেখছে কিন্তু তার মনে কোনো বিকার নেই। পাড়ার পাঠশালায় যেটুকু

লেখাপড়া শিখেছে তাতেই সে সন্তুষ্ট। মামীদের ফ্‌-ট্‌ফরমাশ খাটে, মামাতো ভাইবোনদের নিয়ে কানামাছি খেলে আর অন্য সময় টোটো ক'রে ঘ্‌রে বেড়ায়। অন্য কোথাও যাওয়ার ইচ্ছে না হ'লে বাড়ির পেছনে আদিগঙ্গায় গিয়ে ছিপ ফেলে মাছ ধরে। মাঝে মাঝে দ্‌'টো-একটা মাছ-ও নিয়ে আসে। তার কোনো মাথা-ব্যথা আছে ব'লে মনে হয় না। যেন এইভাবে সারাজীবন কাটবে! অথচ বয়স তো কম হ'ল না? চৌদ্দ বছরে পা দিতে চ'লেছে।

সকাল-সন্ধ্যে দ্‌'ভাজের গঞ্জনা আজকাল এত গা-সওয়া হ'য়ে গেছে র্‌ক্মিণীর যে তা নিয়ে আজকাল আর কাঁদতে বসেন না র্‌ক্মিণী। চোখে জল না এলেও অন্য একটা উপসর্গ কিছ্‌দিন আগে থেকে দেখা দিয়েছে। মাঝে মাঝে মাথা ধরে। কোনো কোনোদিন অসহ্য যন্ত্রণায় মাথাটা যেন ছিঁড়ে পড়তে চায়। সে যে কী অসহ্য যন্ত্রণা তা কাউকে ব'লে বোঝাবার নয়। তেমন মাথার যন্ত্রণায় কত রাত না ঘ্‌মিয়ে কেটেছে। তব্‌ কাক-ভোরে উঠে সংসারের বরাদ্দ সব কাজই তাঁকে ক'রতে হ'য়েছে।

র্‌ক্মিণী নিজে লেখাপড়া জানেন না। বড়দাদা বীরেশ্বরের কাছে শ্‌নেছেন, কে এক ভবানীচরণ বাঁড়্‌জ্যে নাকি 'কলিকাতা কমলালয়' নামে একখানা বাঙলা বই লিখে ছাপিয়েছেন। সে বইতে নাকি অনেক মজার মজার রঙ-তামাশা আছে। তিনি নাকি এ-ও লিখেছেন যে, লক্ষ্মী সব সময়েই এই কলকাতা শহরে বিরাজ করছেন। ভাগ্যবান লোকের হাতে পড়লে এই শহরের ধ্‌লোম্‌ঠিও সোনাম্‌ঠি হ'য়ে যায়!

হ্যাঁ, খাঁটি কথাইতো লিখেছেন তিনি!

স্‌তোন্‌টি আর ডিহি কলকাতার কত লোক কত সামান্য অবস্থা থেকে দেখতে দেখতে বড়োলোক হ'য়ে গেল! কেউ লাখোপতি, কেউ কোটিপতি। ভাগ্যে না থাকলে এমন ক'রে লক্ষ্মীলাভ হয়?

র্‌ক্মিণী অবশ্য নিজের চোখে কলকাতার সেই সব ভাগ্যবান ধনীবাব্‌দের দেখেননি, কিন্তু লোকের ম্‌খে শ্‌নে নামগ্‌লো ম্‌খস্থ হ'য়ে গেছে। কল্‌টোলার মতিশীল, সিমলের রামদ্‌লাল, জোড়াসাঁকোর দ্বারকা ঠাকুর, মানিকতলা-চালতাবাগানের দেওয়ানজী রামমোহন, কুমোরট্‌লির বনমালী সরকার, গোবিন্দ মিত্তির—কার নাম তিনি জানেন না? কুমোরট্‌লির 'গোবিন্দ মিত্তিরের ছড়ি আর বনমালী সরকারের বাড়ি'—এ ছড়া তে কবে থেকেই লোকের ম্‌খে ম্‌খে ফিরছে!

জোড়াসাঁকোর দ্বারকা ঠাকুর নাকি পীরালি বাম্‌ন। কিন্তু কুবেরের ঐশ্বর্য তাদের বংশের বাম্‌নাইয়ের কলঙ্ককে কবে ঢেকে দিয়েছে। নৈকষ্য কুলীনও তাঁর একট্‌ কৃপাদ্‌ষ্টি পেলে বর্তে যায়! কলকাতার উত্তরে দমদমের কাছে বেলগেছিয়া না কি একটা গাঁয়ে তাঁর নাকি একটা পেল্লায় বাগানবাড়ি আছে। সেখানে নাকি মদ, বাইজী, বিলিতি সব ধলাচামড়ার মেয়েমান্‌ষ আর খানাপিনার বাবদ এক রাতের ফ্‌র্তিতেই পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকা খর্‌চা হ'য়ে যায়!

প-ঞ্চা-শ ষা-ট হা-জা-র টা-কা!

সে কত? ক'কুড়িতে তত টাকা হয়? ভাবতেই কেমন যেন মাথা ঝিম্‌ঝিম্‌ করে র্‌ক্মিণীর। হাজার টাকা দ্‌রে থাক, শ'টাকা দ্‌রে থাক—এতখানি বয়েসে পঞ্চাশটা টাকাই একসঙ্গে চোখে দেখেননি র্‌ক্মিণী।

সবই কপাল! কপাল ছাড়া আর কী?

বৌবাজারের বিশ্বনাথ মতিলালের নাম আজ কে না জানে? জয়নগরের গরীব বাম্‌নের ছেলে কোথায় কোন্‌ এক ন্‌নের গোলায় আট টাকা মাইনের ম্‌হ্‌রি ছিল। সেই মান্‌ষ আজ লাখো লাখো টাকার মালিক!

হ্যাঁ, কপাল-ই হ'ল আসল কথা! যার কপাল আছে, মা লক্ষ্মী তাকে দ্‌'হাত উপ্‌ড় ক'রে দেন। নইলে যে কান্ত ম্‌দির কিনা পান্তা ভাতও জ্‌টতো না, সেই মান্‌ষ কোথায় উঠে গেল!

র্‌ক্মিণী পাথর-চাপা কপাল নিয়েই জন্মেছেন।

স্বামীর ঘর করবার স্বপ্ন তো সেই কবেই মিলিয়ে গেছে, ভরসা এখন শুধু ছেলেদু'টো। পাথর-চাপা কপাল না হ'লে হারাণ-ও কি এর ভেতর কোথাও একটা চার-পাঁচ টাকা মাইনের চাকরি পেয়ে মায়ের দুঃখ একটু ঘোচাতে পারতো না?

না, হারাণ পারবে না। এখন হরিশ-ই তাঁর একমাত্র ভরসা। কিন্তু সেই হরিশকে নিয়ে তাঁর মনের গভীরে সব সময়েই একটা অশুভ আশঙ্কা। সে কথাটা মনে পড়লেই বুক কাঁপে।

পাদরি সায়েব হরিশের জন্যে এত করছেন কেন? ছেলেটার মাথায় হাত বুলিয়ে একদিন কেরেস্তান ক'রে নেবে না তো? তিনি শুনেছেন, টাউন কলকাতায় সায়েবদের ইস্কুলে পড়া কয়েকটা বামুনের ছেলে নাকি কেরেস্তান হ'য়ে গেছে। হরিশ-ও যদি তাই হ'য়ে যায়?

বেশির ভাগ রাতেই শেষ প্রহরের আগে ঘুম নামে না রুক্মিণীর চোখে। দেওয়ানি আদালতের পেটা ঘড়িতে প্রতি ঘণ্টায় ঢং ঢং ক'রে সময় ঘোষণার শব্দ কাঁপতে কাঁপতে হাওয়ায় মিলিয়ে যায় রুক্মিণীর চোখে ঘুম আসে না। অন্ধকারে চোখ তাকিয়ে শুয়ে থাকেন তিনি। কেবল দীর্ঘশ্বাস আর দীর্ঘশ্বাস! বিধাতাপুরুষ যেন তাঁর সারা জীবনের কুষ্ঠিটাকে দীর্ঘশ্বাসের একটা কালো তুলট দিয়ে মুড়ে দিয়েছেন! যে বাতাসে তাঁকে নিঃশ্বাস নিতে হয়, সে-বাতাসকেও যেন সব সময় ভরিয়ে রেখেছে তাঁরই পরিত্যক্ত দীর্ঘশ্বাস!

পাশে শুয়ে অঘোরে ঘুমোয় হরিশ।

নিবিড় মমতায় ঘুমন্ত ছেলের গায়ে-মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে থাকেন রুক্মিণী। চোখে তাঁর কত জাগরি-স্বপ্ন!

হরিশ হবে বিরাট বড়লোক! হাজার হাজার টাকা রোজগার ক'রে সবাইকে চমক্ লাগিয়ে দেবে এই ছেলে। ইংরিজি শেখা হ'য়ে গেলে কোম্পানির দপ্তরে কিম্বা বেশ বড়োসড়ো কোনো গোরাসায়েবের কাববারে একটা চাকরি। তারপরেই তো বরাত খুলে যাবে। ছেলেটা নিজের চেষ্টাতেই যেমন পাদরি সায়েবের নেকনজরে প'ড়েছে, তখনো ঠিক তেমনি ক'রে প'ড়ে যাবে মালিকেব নেকনজরে। দেখতে দেখতে আজকের এই রোগা জিরজিরে ছেলেটা হ'য়ে উঠবে টাউন কলকাতার দশজন মান্যিগণ্যি বড়লোকের একজন। এখন যেমন লোকে বলে, কলুটোলার শীলেদের বাড়ি, চোরবাগানের মল্লিকবাড়ি, কুমোরটুলির সরকারবাড়ি, জোড়াসাঁকোর সিংঘিবাড়ি,—তখন তার সঙ্গে আর একটা বাড়ির নাম জুড়ে বলে ভবানীপুরের মুখুজ্যেবাড়ি! অবিশ্যি হরিশ হয়তো এখানে বাড়ি না-ও ক'রতে পারে। বনেদি হ'তে গেলে টাউন কলকাতায়ই কোথাও তাকে বাড়ি ক'রতে হবে। তাতে কিছুমাত্র আপত্তি নেই রুক্মিণীর বরঞ্চ সে-ই ভালো। ঝামা-ঘষা কপালের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা এই ভবানীপুর ছেড়ে অন্য কোথাও উঠে যেতে পারলেই একটু বুক ভ'রে নিঃশ্বাস নিতে পারবেন রুক্মিণী।

তখন রুক্মিণীকে পায় কে?

টাউন কলকাতার বুকে ঝলমলে তিনমহলা বাড়ি, দমদম কিম্বা পেনেটিতে হরিশের বাগানবাড়ি, কত লোক আসছে যাচ্ছে, কত কাজ হরিশের! তার সময় কোথায়? ফিটন গাড়ি হাঁকিয়ে রোজ বেরোবে হরিশ, বাগানবাড়িতেও মাঝে মাঝে ফুর্তির আসর বসাবে। কত বাজি পুড়বে, কত আলোর রোশনাই! সেই সঙ্গে বাছাই করা বাইজী মাগীদের নাচ!

হ্যাঁ, এ-সব তো ক'রতেই হবে! নইলে লোকে মান্যি ক'রবে কেন? মেয়েছেলে রাখে না, এমন ক'টা বড়লোক কলকাতায় আছে? ঠাট-বাট বজায় রাখতে গেলে সবই ক'রতে হবে হরিশকে। পুষুক না দু'টো মেয়েছেলে। সে তো তখন জোয়ান বেটাছেলে হ'য়েছে। এখনকার মতো এই ছোট্ট ছেলেটিতো আর নেই তখন?

না, এ-সবে কোনো আপত্তিই করবেন না রুক্মিণী। যে ঠাটে যেমন দস্তুর। ছেলে তাঁর টাকা চিনুক! বুঝুক আমোদ-ফুর্তির রস—জীবনটাকে উপভোগ করুক কানায় কানায়। বাইরে যা খুশি ক'রে বেড়াক, শুধু রুক্মিণীর কাছে আজকের মতো এই বাধ্য ছেলেটি হ'য়ে থাকলেই হল।

কোম্পানির আমলে কারবার ক'রে বড়লোক হ'তে গেলে নাকি সাধ্‌পুরুষ থাকা চলে না। থাকার দরকার কী? সাধ্‌তা ধুয়ে কেউ জল খাবে? কোম্পানির দয়ায় নানা জাতের কারবার ক'রে যারা আজ লাখোপতি, তারা কি কেস্টনামের জপমালা হাতে নিয়ে কারবরে নেমেছিল? চুরি, জোচ্চুরি সব কিছু ক'রেই না তারা সমাজে আজ এত বড়? লোকে তাদের সেলাম করে। হরিশও চাকরি ছেড়ে দিয়ে একটা কোনো কারবার ধ'রবে। বড়লোকের জাতে উঠলেই লোকে সেদিন ঠিক এমনি ক'রেই সেলাম জানাবে হরিশকে।

সত্যিই যদি তেমন দিন আসে?

কল্পিত স্বপ্নের আবেশ আর উন্মাদনার শিহরণে বিহ্বল হ'য়ে পড়ে রুক্মিণীর সমস্ত চেতনা। আপ্লুত আবেগের প্রচণ্ডতায় স্নায়ুগুলো কেমন যেন বিবশ হ'য়ে আসে!

সেদিন এই অভাগিনী রুক্মিণীকেও লোকে সমীহ ক'রতে বাধ্য হবে!

পাড়ার লোকে সেদিন সভয়ে সসম্ভ্রমে তাঁর দিকে তাকাবে। তাঁর একটু দয়া পাওয়ার জন্যে মুখে বিগলিত হাসি নিয়ে কতবার আনাগোনা ক'রবে!

সাহেব কোম্পানির দোকান থেকে মায়ের জন্যে দামী পাল্কি তৈরি করিয়ে আনবে হরিশ। দুইভাইকে নেমন্তন্ন ক'রে সেই পাল্‌কি পাঠিয়েই নিজের বাড়িতে নিয়ে যাবেন রুক্মিণী। সেই পাল্‌কি চেপে রোজ গঙ্গাস্নানে যাবেন তিনি। ছ'বেহারার সেই দামী পাল্কির দিকে তাকিয়ে পথের দু'ধারের লোক ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে ব'লবে, আমাদের হরিশবাবুর মা গঙ্গা নাইতে চ'লেচেন। আহা, কি ভাগ্যিমানী মা গো!

॥ চার ॥

ইউনিয়ন স্কুলে সেদিন দুপুরে হঠাৎ এক হৈ হৈ ব্যাপার।

নীচু ক্লাশের আট-দশটি ছেলে এক মারাত্মক কাণ্ড ঘটিয়ে ব'সেছে। তার পারণামও নিঃসন্দেহে সাংঘাতিক। জল যে বহুদূর গড়াবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ভর দুপুরবেলা। একটু আগে সবে টিফিনের ঘণ্টা প'ড়েছে। একজন অচেনা গোরাসাহেব কী একটা কাজে নাকি স্কুলের চত্বরে এসে দাঁড়িয়েছিল। কাছেই দাঁড়িয়ে গল্পগুজব করছিল সেই ছেলে ক'টি। গোরা সাহেব তাদের কী ব'লেছে তা কেউ জানে না। কিন্তু তারপরেই দেখা গেল বচসা শুরু হ'য়ে গেছে। দেখতে দেখতে বচসা থেকে একেবারে হাতাহাতি।

মুহূর্তের ভেতর ভালো ছেলে নামে পরিচিত সেই রোগা লিকলিকে হরিশ ছেলেটা ঝাঁপিয়ে পড়লে গোরাসাহেবের ওপর। তার ডাকে বাকি ছেলেগুলোও ঝাঁপিয়ে প'ড়ে যোগ দিলে তার সঙ্গে। অতর্কিতে অতগুলো ছেলে একসঙ্গে চড়াও হওয়ার ফলে টাল্‌ সামলাতে পারেনি সাহেব। কোনো বাধা দেবার অবসর পাওয়ার আগেই মাটির ওপর চিৎপাত হ'য়ে প'ড়ে গেছে সে। তারপর বেদমভাবে মার্‌। কিল, চড়, লাথি, ঘুষি কিছুই বাদ যায়নি। মার খেতে খেতে সাহেব তখন প্রায় অজ্ঞান হওয়ার দাখিল। তাতেও ছেলেরা ক্ষান্ত হয়নি। সেই অবস্থায় সবাই মিলে সাহেবকে চ্যাংদোলা ক'রে স্কুলের সীমানার বাইরে বড় রাস্তার পাশে শুইয়ে রেখে তারপর বীরবিক্রমে ফিরেছে।

কি বেপরোয়া ডানপিটে ছেলেগুলো! ওদের কি প্রাণের ভয়-ডরও নেই? যারা সেই ঘটনা দেখেছে তার সবাই ব'লছে সাহেবের কোমরে নাকি একটা পিস্তল গোঁজা ছিল। লোকটা যদি পিস্তল বের ক'রে গুলি চালাতো? সেটা করেনি, এই রক্ষে!

এই সর্বনেশে কাণ্ডের জের নিশ্চয়ই সহজে মিটবে না! লোকটা দিশি নেটিব হ'লে চিন্তার কিছু ছিল না। কিন্তু একেবারে খোদ রাজার জাত ব'লে কথা! তার গায়ে হাত প'ড়েছে। কোম্পানিবাহাদুর কি সহজে ছেড়ে দেবে?
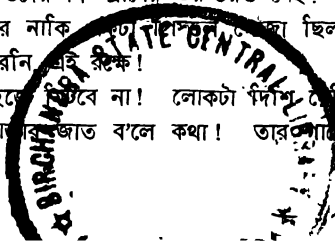
আরো চিন্তার কথা, ফাদার পিফার্ড তখন স্কুলে ছিলেন না। কী একটা দরকারি কাজে তিনি ক'লকাতায় গিয়েছিলেন। তাঁর অনুপস্থিতির সময়েই কিনা এতবড়ো একটা কাণ্ড ঘ'টে গেল? এই ঘটনার জন্যে তাঁকে কোম্পানি বাহাদুরের কাছে কতরকম জবাবদিহি ক'রতে হবে, কে জানে! সেই গোরা সাহেবের তেমন সুপারিশের জোর থাকলে ব্যাপারটা হয়তো লাটবাহাদুরের দরবার পর্যন্ত গড়াতে পারে!

কিছুক্ষণ পরের কথা।

টিফিন শেষ হ'য়ে স্কুল আবার ব'সে গেল। তার একটু পরেই পিফার্ড সাহেবের খাস কামরায় ডাক প'ড়লো হরিশের। মনে মনে প্রস্তুতই ছিল হরিশ। সে জানতো, ফাদারের ঘরে ডাক তার পড়বেই!

আর্দালির সঙ্গে হরিশ রওনা হ'য়ে যেতেই অন্য ছেলেগুলোর মুখ তখন শুকিয়ে গেছে। হরিশের ডাকে সাময়িক উত্তেজনায় কাজটা তারা ক'রে ফেলেছে। পরিণামের কথা তখন তো মাথায় আসেনি। স্কুলে শাস্তি পাওয়া তো অবধারিত। তার চেয়েও ভয়ের কথা, বাড়িতে কী কৈফিয়ৎ দেবে? গোরা সহেবেরা রাজার জাত। তাদের কারো গায়ে হাত দেওয়ার অপরাধকে বাড়িতে নিশ্চয়ই ক্ষমা করা হবে না!—স্কুল থেকে যদি নাম কাটা যায়? যদি পুলিশম্যান পাঠিয়ে পাকড়াও ক'রে নিয়ে গিয়ে কয়েদখানায় রেখে দেয়? ফাদার হরিশকে প্রথমেই ডাকলেন বটে, কিন্তু এরপর একে একে সকলেরই তো ডাক পড়বে। হরিশ কখনো মিছে কথা বলে না। ফাদার যখনই তাকে জিজ্ঞেস ক'রবেন, সঙ্গে আর কে কে ছিল—হরিশ তো তখন তাদের সকলের নাম ব'লে দেবে। তখন কে বাঁচাবে? কী দরকার ছিল ঝামেলা করবার? সাহেবের কথায় হরিশই আগে রেগে গিয়েছিল, সে নিজে যা পারতো, তাই না হয় করতো।

রেভারেণ্ড পিফার্ডের কামরায় ঢুকে দাঁড়ালে হরিশ।

গম্ভীর থম্‌থমে মুখে তার দিকে বেশ কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন পিফার্ড। তারপর গুরুগম্ভীর স্বরে ব'ললেন, আজ একটু আগে স্কুলের সীমানার ভেতর একটা কুৎসিত কাণ্ড ঘ'টে গেছে, তার বিবরণ আমি শুনেছি। আর একথাও আমি শুনেছি সে ঘটনার জন্যে প্রধানত তুমিই দায়ী।—এ-কথা সত্যি?

—হ্যাঁ, ফাদার।—অকম্পিত বিনীত নম্র স্বরে উত্তর দিলে হরিশ।

রেভারেণ্ড পিফার্ড-ও যেন কয়েক মুহূর্তের জন্যে বোবা হ'য়ে গেলেন। কোনো লজ্জা নেই, সংকোচ নেই, ভয় নেই—অম্লানবদনে স্বীকার ক'রছে যে কুৎসিত ঘটনাটার জন্যে সে-ই দায়ী? ছেলেটা কি কুসঙ্গে প'ড়ে সম্পূর্ণ নষ্ট হ'য়ে গেল? এই ছেলেকে নিয়ে তিনি মনে মনে এত গর্ব অনুভব ক'রে এসেছেন এতদিন?—এ তো ক্ষমার অযোগ্য ঔদ্ধত্য! এ সাহস সে পেলে কোথায়?

কয়েক মুহূর্তের অস্বস্তিকর নীরবতা।

তারপরেই ক্রোধে, ক্ষোভে, উত্তেজনায় ফেটে পড়লেন পিফার্ড।—হরিশ! তুমি কি এখনো বুঝতে পারছো না, স্কুলের নিয়মশৃঙ্খলার ওপর তুমি কি কদর্যভাবে আঘাত ক'রেছ?

হরিশের উজ্জ্বল আয়ত চোখ দু'টি কয়েক মুহূর্তের জন্যে একটু নিষ্প্রভ হ'ল। মুখ নীচু ক'রে শান্ত, সসম্ভ্রমে স্বরে সে ব'ললে, আমি যা করেছি তার জন্যে আপনি আমাকে যে শাস্তি দেবেন, তাই আমি মাথা পেতে নেবো ফাদার! কিন্তু তার আগে আমি শুধু আপনাকে এইটুকুই জানাতে চাই যে, আমাদের স্কুলের পবিত্রতা রক্ষা করবার জন্যেই এ-কাজ ক'রতে আমি বাধ্য হয়েছিলুম।

—পবিত্রতা রক্ষা! কি ব'লতে চাও তুমি?—অসহিষ্ণু উত্তেজনায় থর্‌থর্ ক'রে কাঁপছেন পিফার্ড।

আস্তে, মুখ তুলে শান্ত, অচঞ্চল স্বরে হরিশ ব'ললে, সেই গোরাসায়েব মাতাল অবস্থায় স্কুলের ভেতর ঢুকে অশ্রাব্য গালিগালাজ আরম্ভ ক'রেছিল।

কিছুটা থম্‌কে গেলেন পিফার্ড। তারপর বিস্মিতভাবে জিজ্ঞেস ক'রলেন, কাকে?

—সবাইকে। এই স্কুলকে, আপনাকে এবং আমরা নেটিব ব'লে আমাদের সবাইকে। আমি এগিয়ে গিয়ে সায়েবকে স্কুল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করি, তার উত্তরে সে ব্লাডি ইণ্ডিয়ান নিগার ব'লে আমার গায়ে থুথু ছিটিয়ে দেয়। আপনি ঘটনার যে জায়গাটা থেকে শুনেছেন, সেটা ঘ'টেছে ওই থুথু ছিটিয়ে দেবার পরে।

এবারে রেভারেণ্ড পিফার্ড কিছুটা বিমূঢ় নির্বাক দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন হরিশের মুখের দিকে। ছেলেটাকে তিনি যেন আবার নতুন ক'রে চিন্‌ছেন। বর্ণগর্বী মাতাল লোকটার মুখে 'ব্লাডি ইণ্ডিয়ান নিগার' এইটুকু ছেলের জাতীয় সম্ভ্রমবোধকে এইভাবে আহত করেছে! আর সেই জন্যে তার মনে এত দুর্জয় সাহস্‌ এলো যে, তার চেয়ে বয়সে কত বড় একটা শক্তসমর্থ জোয়ান মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেও সে এতটুকু ভয় পায়নি!

রেভারেণ্ড পিফার্ডের কণ্ঠস্বর হঠাৎ শান্ত হ'য়ে গেল। ব'ললেন, কিন্তু বড়োদের কাউকে না ডেকে এতটুকু ছেলে হ'য়ে তুমি নিজে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গেলে কেন?

—মাফ করুন ফাদার, মাতাল মানুষটার থুথু ছিটোনোও আমি হয়তো মাতালের কাণ্ড ব'লে অগ্রাহ্য ক'রতে পারতুম, কিন্তু তার মুখে কদর্য গালাগালির সঙ্গে ওই ইণ্ডিয়ান নিগার কথাটা শুনে আমি আর মাথা ঠিক রাখতে পারিনি।

পিফার্ড এবার দৃষ্টিকে আরো প্রশস্ত ক'রে তাকালেন হরিশের দিকে। তারপর প্রশ্ন ক'রলেন, সে লোকটাকে আর কখনো তুমি দেখেছো?

—না ফাদার। তবে এইটুকু বুঝতে পেরেছিলুম যে, সে কোনো জাহাজের খালাসি।

—কেমন করে বুঝলে?

—তারই মুখের কথায়। মাতাল অবস্থায় সে নিজেই সে-কথা ব'লেছিল।

পিফার্ড আর কোনো প্রশ্ন ক'রলেন না। তিনি নিজে শ্বেতাঙ্গ। এদেশের মানুষ সম্বন্ধে শ্বেতাঙ্গদের মনোভাব তিনি খুব ভালোভাবেই জানেন। তাই হরিশের মুখের ওই বিবরণটুকুই তাঁর কাছে যথেষ্ট। বিশেষত, জাহাজে যারা খালাসির কাজ করে তাদের বেশির ভাগেরই শিক্ষার কোনো বালাই নেই, চালচলন রুচিহীন, নোংরা আর উদ্ধত। শুধু জাহাজের খালাসি কেন, কোম্পানির সিবিলিয়ান হ'য়ে কিম্বা অন্য কোনো সূত্রেও যারা এদেশে আসে, তাদের ভেতর মুষ্টিমেয় দু'চারজন ছাড়া অধিকাংশেরই শিক্ষাদীক্ষা তাদের উদ্ধত, উন্নাসিকতার অন্তরালে লুপ্ত। এদেশের মানুষকে তারা মানুষ বলেই গণ্য করে না। সেক্ষেত্রে লণ্ডনের ইস্ট-এণ্ড মার্কা একটা অশিক্ষিত মাতাল নাবিক যে কোন্‌ জঘন্য স্তরের কথাবার্তা ব'লতে পারে, তা অনুমান করতে অসুবিধে হ'ল না রেভারেণ্ড পিফার্ডের। মুখের কথায় প্রতিবাদ নিষ্ফল হ'য়েছে দেখেই ক্ষুব্ধ হরিশ তার সঙ্গীসাথীদের নিয়ে লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে প'ড়েছিল! অথচ এতটুকু ছেলের কাছে সেই ধরনের দুর্জয় সাহস অকল্পনীয়।

আবিষ্ট মুগ্ধ দৃষ্টিতে হরিশের নির্ভীক উজ্জ্বল চোখ দু'টির দিকে তাকালেন পিফার্ড। তারপর আপনমনেই একটু হাসলেন। এর পাশাপাশি অন্য চিত্র তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠছে! তাঁর ভারত-প্রবাসের এই ক'বছরে বিভিন্ন অভিজ্ঞতাই হ'য়েছে। কত পূর্ণ বয়স্ক দিশিবাবুকে তিনি দেখেছেন, যারা শ্বেতাঙ্গ-মনিবের মুখে ব্লাডি ইণ্ডিয়ান নিগার সম্বোধন শুনে কৃতার্থ হ'য়ে যায়, ব্লাডি বাস্টার্ড সম্বোধন শুনে বিগলিত হেসে ঘাড় কাৎ ক'রে বলে, ইয়োর মোস্ট ওবিডিয়েন্ট সারভেন্ট স্যার! আর ঠিক তাদেরই পাশে এই ছবি!

হরিশের জন্যে গর্বে ভ'রে উঠেছে পিফার্ডের মন। তাঁর স্কুলে অন্তত এমন একটা বাঙালী

বালক আছে, যার জাতীয় মর্যাদা বোধ সেইসব শ্বেতাঙ্গ প্রভুর পা-চাটা যে কোনো নেটিব বাবুকে লজ্জা দিতে পারে। অবশ্য সে লজ্জাবোধ যদি তাদের থাকে!

হরিশ শুধু মেধাবী ছেলে নয়; সে নির্ভীক, সাহসী, সত্যবাদী। যে-ছেলের জাতীয় মর্যাদাবোধ এত গভীর, তাকে কিনা কঠিনতম শাস্তি দেওয়ার সংকল্প নিয়েই ডেকে পাঠিয়েছিলেন পিফার্ড।

প্রশান্ত দৃষ্টিতে পিফার্ড তাকালেন হরিশের দিকে। হরিশ কিন্তু তখনো দণ্ডাজ্ঞার প্রতীক্ষায় স্থির ভাবে তার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে।

—আমার কাছে এসো!—বললেন ফাদার পিফার্ড।

হরিশ কাছে এগিয়ে যেতেই তার শীর্ণ একখানি হাত নিজের বলিষ্ঠ হাতের ভেতর চেপে ধরে পিফার্ড বললেন, তোমার কৃতকর্মের জন্যে কিরকম শাস্তি তুমি প্রত্যাশা করো?

হরিশের চোখ দুটি ছলছল করে উঠলো। তার কেবল একটা শাস্তিতেই সবচেয়ে ভয়। মুখ নীচু করে কাঁপা কাঁপা অস্ফুট স্বরে সে বললে, আপনি কি আমাকে এই স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেবেন ফাদার?

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন পিফার্ড। আবেগে বুকে চেপে ধরলেন হরিশকে। তাঁর গলাও যেন একটু ধরে এলো। বললেন, মাই ডিয়ার সুইটি নটি বয়! একটুক্ষণ আগে পর্যন্তও আমার মনে সেইরকম সিদ্ধান্তই ছিল। কিন্তু সে-সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে পেরে এই মুহূর্তে আমিই সবচেয়ে আনন্দ পাচ্ছি!

জলভরা চোখে রেভারেন্ড পিফার্ডের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো হরিশ।

নিজের আবেগ একটু সামলে নিয়ে পিফার্ড বললেন, না হরিশ, তোমাকে স্কুল ছাড়তে হবে না। সসম্মানেই এই স্কুলে পড়বে তুমি। তুমি যা করেছ, তার জন্যে সরকারি দপ্তরে যদি কোনো কৈফিয়ৎ দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়, তার দায়িত্ব আমারই রইলো। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা জানবার পর একটা কথা তোমাকে না বলে আমি পারছিনে হরিশ! বয়সের হিসেবে তুমি একটু বেশি দুঃসাহসের কাজ করে ফেলেছ, তাই নয় কি? শুনলুম, লোকটার কাছে পিস্তল ছিল। সে যদি পিস্তল থেকে গুলি ছোঁড়ার অবকাশ পেতো, তাহলে কতখানি মারাত্মক ব্যাপার ঘটে যেতে পারতো, বলোতো? সুইটি নটি বয়, তোমার সম্ভ্রমবোধ আমাকে মুগ্ধ করেছে। আশীর্বাদ করি ভবিষ্যৎ জীবনে তুমি এইরকম নির্ভীক, তেজস্বী হও। কিন্তু শুধু নির্ভীক হলেই তো হয় না হরিশ, আত্মরক্ষার কৌশলটাও সেই সঙ্গে জেনে রাখা প্রয়োজন। তেজস্বী হও কিন্তু রাগের বশে অন্ধ হয়ে কখনো যেন নির্বুদ্ধিতা ক আত্মরক্ষায় অবহেলা করো না, এই আমার উপদেশ। যাও, এবার তোমার ক্লাশে যাও—

॥ পাঁচ ॥

এই ক'বছরে টাউন কলকাতার ওপর দিয়ে কত পরিবর্তন হ'য়ে গেল, কিন্তু রুক্মিণীর অদৃষ্টের কোনো পরিবর্তন হয়নি।

এতকাল পরে সবে যেন একটু আশার আলো দেখা দিয়েছে। যে হারাণের ওপর কোনদিন কোনো ভরসাই রাখেননি রুক্মিণী, সেই হারাণ একটা চাকরি পেয়েছে। মাইনে মাসে পাঁচটাকা।

যোগাযোগটা ক'রেছেন হারাণের ছোটমামা দেবনারায়ণ। জমিদারি সেরেস্তায় চাকরির সুবাদে বেশ কিছু উকিল, মোক্তার, মুহুরি, গোমস্তার সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে। সদর আদালতের একজন মুহুরিবাবু অল্পমাইনেয় একজন কমবয়সী কর্মচারির খোঁজ করছিলেন। শুধু কমবয়সী হ'লেই হবে না, অনভিজ্ঞ-ও হওয়া চাই। কারণ, অভিজ্ঞ লোক সম্বন্ধে মুহুরিবাবুর ভয় আছে। তাঁরই কাছে হারাণকে কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন দেবনারায়ণ।

হারাণের চাকরি হওয়ার পর আর দেরি করেননি রুক্মিণী। ছেলের বিয়ে দিয়ে ঘরে বৌ এনে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছেন। ছেলেটার বাউণ্ডুলেপনা এবার ঘুচুক।

বিয়ের বয়স তো কবেই হ'য়ে গেছে। পনেরোয় পা দিয়েছে হারাণ। পাড়া পড়শিদের কত ঘরের গিন্নি দশ-বারো বছরের ভেতরেই ছেলের বিয়ে দিয়ে ঘরে বৌ এনে আমোদ-আহ্লাদের শখ মিটিয়েছে। রুক্মিণীর কি ইচ্ছে হয়নি? কিন্তু মনের সাধ মনেই চেপে রাখতে হ'য়েছে। ভাই-ভাজের সংসারে গলগ্রহ হ'য়ে প'ড়ে থেকে ঘরে বৌ আনার স্বপ্ন দেখা চলে না।

হারাণের চাকরি হওয়ার পর সে-বাধা আর রইলো না। বীরেশ্বরের সামর্থ্য নেই কিন্তু হৃদয় আছে। তিনিই একদিন গোপনে রুক্মিণীকে ডেকে ব'লেছিলেন, তোর যাহোক দাঁড়ানোর মতো একটা সম্বলতো হ'ল? আমি বলি কি, তুই এবার আলাদা ক'রে তোর সংসার পেতে নে তাতে এ-সংসারেও খিটিমিটি ক'মবে, তোরও শান্তি।

বড়দাদার সঙ্গতি না থাকলেও তাঁর স্নেহের উত্তাপটুকু সব সময়েই অনুভব ক'রেছেন রুক্মিণী। কেন যে তিনি এ-পরামর্শ দিলেন, তা বুঝতেও এতটুকু অসুবিধে হয়নি তাঁর। ছেলে চাকরি পাওয়ার কয়েকমাসের ভেতরেই স্বার্থপরের মতো নিজের আলাদা সংসারের প্রসঙ্গ উথ্থাপন করা রুক্মিণীর পক্ষে সম্ভব হ'ত না। কিন্তু সব দিক দিয়ে অবস্থাটা আগের চেয়ে অনুকূল। এর ভেতর বীরেশ্বর ডিহি চক্রবেড়ের এক বড়লোকের বুড়ী-মাকে রোজ পালা ক'রে ভাগবত, রামায়ণ আর মহাভারত পাঠ ক'রে শোনানোর একটা কাজ পেয়ে মাসে পাঁচটা ক'রে টাকা আনছেন সংসারে। দেবনারায়ণের মাইনেও বেড়েছে দু'টাকা। ফলে, সংসারে অনটনের সেই অতি বীভৎস চেহারাটা সাময়িকভাবে কিছুটা আড়াল হ'য়েছে। দেবনারায়ণ চাকরি জুটিয়ে দিয়েছেন হারাণকে। তাঁরও মনোগত ইচ্ছে, রুক্মিণী এবার নিজের ছেলেদের নিযে পৃথক সংসার পেতে তার নিজের মতো থাকুক। সুতরাং রুক্মিণীর দিক থেকে সংকোচের কোনো বাধাই রইলো না।

নিজের ছেলের রোজগারে জীবনে সম্পূর্ণ নিজস্ব সংসার।

ভাবতেও কেমন যেন অবাক লাগে রুক্মিণীর। বিশ্বাস ক'রতেও যেন ভয় হয়। এটাও ঘুমের চোখে দেখা স্বপ্ন নয়তো?

কতদিন পরে মুক্তির স্বাদ!

দিশেহারা আনন্দে কখনো কখনো ঝর্‌ঝর্‌ ক'রে কেঁদে ফেলেন রুক্মিণী। একটু পরে আবার চোখের জল মুছে নিয়ে আপনমনেই হাসতে থাকেন।

হারাণের বৌ বেশ কয়েকবার তার শাশুড়িকে এইরকম হাসতে-কাঁদতে দেখেছে। আট-ন'বছরের ছেলেমানুষ মেয়ে। তার মনে এরই ভেতর রীতিমতো ভয় ধ'রে গেছে। তার শাশুড়ি পাগল নয় তো? অথচ অন্য সময় তো বেশ ভালোমানুষ ব'লেই মনে হয়! তাকে দিব্যি আদর করেন, কাছে বসিয়ে পরিপাটি ক'রে খোঁপা বেঁধে দেন, গামছা দিয়ে ঘ'ষে ঘ'ষে মুখ মুছিয়ে সুন্দর ক'রে সিঁদুর পরিয়ে দেন, গাল টিপে আদর ক'রে বুকে টেনে নেন। তখন তো শাশুড়িকে তার বেশ ভালোই লাগে। কিন্তু সেই মানুষটাই মাঝে মাঝে এইরকম হাসতে হাসতে কাঁদেন কেন; আবার কাঁদতে কাঁদতে বা হাসেন কেন?

রুক্মিণীর মনে স্বপ্নের ফুল এবার একটু একটু ক'রে পাপড়ি মেলতে শুরু ক'রেছে। আর কয়েকবছর পরে তাঁর হরিশও রোজগার ক'রতে আরম্ভ ক'রবে। সে নিশ্চয়ই হারাণের চেয়ে মাইনে বেশি পাবে। পেতেই হবে কারণ হরিশ ইংরিজি জানে। দুই ছেলের রোজগারের তখন আরো কত সচ্ছল হবে রুক্মিণীর একান্ত নিজের সংসার!

শুধু টাউন কলকাতাই নয়, এই ক'বছরে ভবানীপুরেও হয়েছে বেশ কিছু পরিবর্তন। এইতো সবে আঠারো-বিশ বছর আগে কোম্পানি বাহাদুর কী নাকি এক লটারি বসিয়েছিল। সেই কমিটি টাউন কলকাতার ভোল পাল্‌টে দিয়েছে। তার ঢেউ ভবানীপুরেও কিছুটা লেগেছে।

চৌরঙ্গি, কসাইটোলা থেকে সাহেব-ফিরিঙ্গিদের বসতি একটু একটু ক'রে এগিয়ে আসছে

দক্ষিণ দিকে। তারই চাপে প'ড়ে সাত-পুরুষের ভিটে ছেড়ে বাদামতলা থেকে বামুনবস্তী পর্যন্ত এলাকার কত ঘর মানুষ যে এদিক-ওদিক ছিটকে প'ড়েছে, কে তার হিসেব রাখে? যাদের কিছু সঙ্গতি আছে, তারা উঠে গেছে টাউন কলকাতার ঠনঠনে, সিমুলে, শ্যামবাজার, বাগবাজার কি শোভাবাজারে। বাকি সবাই স'রে এসেছে দক্ষিণে। নতুন বসত ক'রেছে ভবানীপুর, কালীঘাট কিম্বা চেতলায়। ঝামেলা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে আদিগঙ্গা পেরিয়ে সরাসরি চ'লে গেছে সাবর্ণচৌধুরীদের খাস তালুক ঠাকুরপুকুর কিম্বা বড়শে এলাকায়।

কোম্পানিবাহাদুরের দৌলতে সামান্য এই ক'বছরের ভেতর কতই না কান্ড ঘ'টে গেল! কত হৈ চৈ, কত 'গেল' 'গেল' রব!

সতীদাহ বন্ধ।

এইতো সেদিন কোম্পানির লাটবাহাদুর আইন জারি ক'রে সতীদাহ বন্ধ ক'রে দিয়েছেন! স্বামীর চিতেয় সহমরণে গিয়ে সতী নারীর স্বর্গে যাওয়ার পথ বন্ধ হ'য়ে গেল।

এই আইনের কথা উঠতেই সে কি শোরগোল!

কোম্পানির লালমুখো সাহেবেরা তো কেরেস্তান। তারা রাজত্বি ক'রছে করুক, কিন্তু হিন্দুর ধম্মোকম্মে হাত দেবে কেন? কেরেস্তান রাজার স্লেচ্ছপনার জুলুমবাজি হুকুমে সনাতন হিন্দু ধম্মের বিধিবিধান সবই যদি রসাতলে গেল, তাহ'লে হিন্দুর আর রইলো কী?

ধর্ম! সমাজ! শাস্ত্রের বিধান!

দাঁতে দাঁত চেপে কথাগুলোকে যেন পিষে গুঁড়ো ক'রে ফেলবার জন্যেই বিড়বিড় ক'রে উচ্চারণ করেন রুক্মিণী। মাথার ভেতর যেন আগুন জ্ব'লতে থাকে। কার নাম ধর্ম? কোন্টা সামাজিক নিয়ম? কাকে বলে শাস্তো বিধান?

কুলীন ব্রাহ্মণের তৃতীয় পক্ষ রুক্মিণী মর্মে মর্মেই জানেন, 'ধর্ম গেল' ব'লে চেঁচিয়ে যারা আকাশ ফাটায় তারা কতখানি ধার্মিক!

এই পোড়া হিন্দু-সমাজে ক'টা মেয়ে স্বামীসোহাগে সোহাগিনী? যে-মেয়ের সে-ভাগ্যি হ'য়েছে সে যদি স্বামীর চিতেয় আগুনে পুড়ে সতী হ'য়ে স্বর্গে যেতে পারে যাক, কিন্তু স্বামীর সোহাগ কাকে বলে, যে আবাগীরা সারাজীবনে তা কোনোদিনই জানতে পারলে না, তাদের কী দায়? কেন সহমরণে যাবে তারা?

ধর্মশাস্ত্রের বিধিবিধান মেনে চলার সব দায়-দায়িত্ব কি শুধু মেয়েদেরই? মিন্সেগুলোর কোনো দায় নেই? দশটা মেয়ের সব্বোনাশ ক'রলেও মিন্সেগুলোর কোনো পাপ নেই। অগ্নিসাক্ষী বিয়ে-করা ঘরের পরিবারকে রাতের প'. রাত, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর উপোসী ক'রে একা ফেলে রেখে বেশ্যামাগীর ঘরে প'ড়ে থাকার নাম ধর্ম? আর কুলীন মিন্সেগুলো? ভূভারতের সব জায়গায় যতগুলো খুশি আবাগীর সিঁথেয় সিঁদুর ঘ'ষে দিয়ে জাওলা মাছের মতো তাদের জীইয়ে রেখে যাওয়া আর ইচ্ছে মতো, একবছর-দু'বছর বাদে দয়া ক'রে একদিন এসে তাকে জাওলার হাঁড়ি থেকে তুলে কচ্‌কচিয়ে চিবিয়ে খাওয়াব নাম ধর্ম?—ধম্মো!—সমাজ!—শাস্তর!

সতী আইন পাশ হওয়ার পর পাড়াপড়শি সত্তর ˙ বরের বুড়ি থেকে ছুঁড়ি বৌ-ঝি পর্যন্ত সবাই হায় হায় ক'রেছে। কেরেস্তান লাটসাহেবকে তারা শাপমান্যি ক'রেছে। তাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে রুক্মিণীও লাটসাহেবকে অভিসম্পাত দিয়েছেন। না দিলে লোকে কানাকানি ক'রবে।

কিন্তু মনে মনে ব'লেছেন, বেশ ক'রেচে সায়েব। আচ্ছা জব্দ করেচে অনামুখো মিন্সেগুলোকে। সঙ্গে যাওয়ার লোভ দেখিয়ে ডব্‌কা ছুঁড়ি বৌগুলোকে যারা তার মরা-ভাতারের চিতেয় তুলে দিয়ে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে মেরে হরিধ্বনি দেয়, তাদের সাধের গুড়ে বালি প'ড়েছে। আবাগী মেয়েটার মরণকান্নার চিৎকার চাপা প'ড়ে যায় ঢাক-ঢোলের

কান ফাটানো শব্দে। ম'রতে না চাইলেও মরতে তাকে হবেই! আবাগীকে পর্ড়িয়ে ছাই করবার পর তার সহায়-সম্পত্তি ভাগবাঁটোয়ারা ক'রে লর্টে নেবার পথ এবার বন্ধ হ'ল!

কই, মাগ ম'রলে তোরা তো স'মরণে যাস্‌নে অলপ্পেয়ের দল? মাগকে চিতেয় তুলে দিয়ে এসে তার ছেরাদ্দ-শান্তিটর্কু হ'য়ে যাওয়া পজ্জন্ত সবর্র সয় না! তার পরের দিনই আর একটা মাগ এনে ঘরে তুলিস! তোদের শরীলেই খালি ওম্‌ আছে, মেয়েছেলের শরীলে ওম্‌ নেই? শাস্তরের বিধানে বয়েসের বিধবা মাগীকে একা একা বিছানায় রাত কাটাতে হবে সারাজেবন। কিন্তু মিন্‌সে হ'লে কি একা বিছানায় রাত কাটানো যায়? বয়েস যতই হোক, মেয়ের বয়সী মাগ হ'লেও তাই-ই চাই। অন্তর্জ্জলী যাত্রার কালেও গত্তে-বসা চোখ চক্‌চক্‌ করে, জিবের ডগায় লালা ঝরে!

ধম্মো!—সমাজ!—শাস্তর!

সব বর্জরর্কি। সেই বর্জরর্কিতে আচ্ছা মতন ঘা মেরেচে লাটসায়েব। একটা কাজের মতো কাজ ক'রেচে অ্যাদ্দিনে কোম্পানি। মনে মনে লাটবাহাদর্রের উদ্দেশ্যে রর্ক্মিণী ব'লেছেন, তুমি সর্খে-শান্তিতে বেঁ'চে থাকো সায়েব। তোমার মেমসায়েব যেন চির-এয়োতি হয়! মা কালী যেন তোমাকে অক্ষয় পেরমাই দেন!

চন্দরার ভালো নাম চন্দ্রমর্খী। রঙ যদি কালো না হত, তাহলে মেয়েটাকে বোধ হয় চাঁদের মতোই দেখাতো। দেহে যৌবন যেন ফেটে পড়ছে। চোখ-মর্খের গড়নও নয়ন-ভোলানো। তাকে দেখে কে ব'লবে পাঁচটা ছেলে-মেয়ের মা! কালোর ভেতরেও যে রর্পের ছটা কাকে বলে, চন্দরাকে দেখলে তা বোঝা যায়।

মেয়েটার কথা বলবার ভঙ্গিটিও ভারী সর্ন্দর! যত রাজ্যের ঘরের কেচ্ছা তার পেটে যেন গজ্‌গজ্‌ ক'রছে। এত খবর সে কোথায় পায় তা সে-ই জানে! কিন্তু তার দেওয়া খবরগর্লো যে মিথ্যে নয়, তা বর্ঝতে বাকি নেই রর্ক্মিণীর। তরফ-কলকাতায় কেচ্ছার অভাব?

যেদিনই হাতে একটর্ সময় থাকে সেদিনই দর্ধের কেঁ'ড়ে পাশে রেখে ব'সে যায় চন্দরা। সে বেশ ভালো ক'রেই জানে, তার মর্খে এইসব কেচ্ছা-কেলেঙ্কারির কথা শর্নতে বামর্নদিদি ভালোবাসে। হাত নেড়ে, চোখ বড় বড় ক'রে খাটো গলায় কি রসিয়েই না বলে চন্দরা! এমন সর্ন্দর ক'রে গর্ছিয়ে বলে যেন এইমাত্র নিজের চোখে সব কিছর্ দেখে এসেছে!

এই তো মোটে মাস তিনেক আগের কথা।

কলকাতার বনেদিপাড়া শোভাবাজারে কোন্‌ এক লাখোপোতি বেনিয়ানবাবর্র বাড়ির খিড়কির বাইরে পাঁচিলের ধারে নাকি একটা সদ্যবিয়ানো মরা মেয়ে প'ড়ে ছিল। মেয়েটার গায়ের রঙ গাঢ় লালচে। তার মানে, বড় হ'লে নিকষ কালোই হ'ত। চোখ-মর্খের গড়ন সব নাকি অবিকল সে-বাড়ির এক জোয়ানমদ্দ চাকরের মতো। হয়তো গঙ্গায় ফেলে দিয়ে আসার সর্যোগ পায়নি তাই বাড়ির পেছনে ফেলে দিয়েই পাপ বিদেয় ক'রেছে। তাই ব'লে ঘরের কেচ্ছা তো আর চেপে রাখতে পারেনি? আর এমন কেচ্ছা হবেই বা না কেন? বেনিয়ানবাবর্র ছেলেরাতো বাগানবাড়িতেই রাত কাটায়। সোমত্ত বৌগর্লোর দোষ কী?

আর একটা ঘটনা নাকি এই সবে পনেরো-বিশদিন আগের ব্যাপার।

বৌবাজারের এক নামজাদা বাড়ির এক সোমত্ত বৌ আত্মহত্যে করেছে। সে কথা বলেই চারদিকে চাউর করা হ'য়েছে বটে, কিন্তু সারা কলকাতার লোকে জানে তাকে খর্ন করা হ'য়েছে।

—তা ধরো দিদি, ধারা ওই একই। বাড়ির কত্তার একমাত্তর ছেলে। কত ঘটা ক'রে বে' হ'ল কিন্তু কথায় বলে, স্বভাব না যায় ম'লে। অমন নক্কি পিতিমের মতো কাঁচা বয়সের বৌটাকে ঘরে ফেলে রেখে ছেলেটা রাত কাটাতো জানবাজারে এক মাগীর কাচে। কোনো রাতে যদি বা ঘরে ফিরতো, তাও ত্যাখন মদের ঘোরে বেহর্ঁশ। ভেবে দ্যাকো দিকি, ছর্ঁড়িটার সাদ-আহ্লাদ মেটানোর শখ

তার মনের ভেতরেই গুমরে কেঁদে ম'রেচে কিনা? সবাই তো আর সমান হয় না? বৌ ছুঁড়িটাও শেষ পজ্জন্ত একটা পথ বেছে নিলে। দূর সম্পক্কের এক আইবুড়ো দেওর সেই বাড়িতে থেকেই হেঁদুকালেজে নেকাপড়া করতো। সেই দেওরকেই লজরের বাণে বশ ক'রলে ছুঁড়ি। পেল্লায় বাড়ি—তার কত অন্দি-সন্দি, কত ফাঁকফোকর। কতায় বলে, ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়। অষ্টপ'র কেই বা ব'সে পাহারা দিচ্চে, বলো? আবাগী সেই দেওরকে দিয়েই সাদ-আল্লাদ পুষিয়ে নেওয়ার তাল ক'রে নিলে। আইবুড়ো দেওর ছোঁড়া তো কাঁচা পাপী। অমন রসের সোয়াদ পেয়ে সে-ও একেবারে বে-এক্তেয়ার। নুকিয়ে চুরিয়ে পীরিত করারও আর তর সয় না। আবাগীর দশাও তাই। আরে বাপু, আঁচল চাপা দিয়ে কি আর আগুন ঢেকে রাকা যায়? একদিন শাশুড়ির লজরেই ধরা প'ড়ে গেল দেওর-ভাজ। তার ক'দিন বাদেই চেরকালের তরে সাদ আল্লাদ মেটানো শেষ ক'রে দুনিয়া থেকেই চ'লে যেতে হ'ল আবাগীকে। কপালের নেকন খণ্ডাবে কে?

কে যে আসলে খুন ক'রেছে বৌটাকে, তা অবশ্য ব'লতে পারে না চন্দরা। কেউ বলে সোয়ামি, কেউ বলে শ্বশুর। আবার অন্য গুজব-ও শোনা যাচ্ছে বৌবাজার পাড়ায়। শ্বশুরের নিজেরই একটা বেজম্মা ছেলে আছে; বাবুর রক্ষিতার পেটে তার জন্ম। তাকেই নাকি কিছু সম্পত্তি লিখে দেওয়ার টোপ দিয়ে তার হাত দিয়েই খুন করিয়েছে বেটার বৌকে। কোম্পানির দয়ায় টাকারতো অভাব নেই? ঘরের নাম ডাক বজায় রাখতে দশ-বিশ হাজার টাকা দামের একটা বাড়িই নয় লিখে দিলে? তাছাড়া, যে-মাগীর পেটেই জম্মাক, সে-ও তো বাবুর সন্তান বটে! রক্তের সম্বন্ধ ব'লে কথা!

এমনি ধরনের আরো কত কেচ্ছা কথা শোনায় চন্দরা।

কোথায় কোন্ মুহুরিবাবুর নাকি রূপসী পরিবারের দৌলতেই কপাল ফিরে গেছে। তার সাহেব-মুনিবের ঘরে মাঝে মাঝেই তিনি নাকি পরিবারকে দু'চার ঘন্টার জন্যে সাহেবের কুঠিতে নিয়ে যেতেন। বকশিশ হাতে হাতে মিলে গেল। কোম্পানির কেল্লায় একটা জুৎসই ঠিকেদারি। কথায় বলে, যাকে রাখো, সে-ই রাখে। সাহেবও পুষিয়ে দিলে মুহুরিবাবুকে।

সেই লোকই আজ লাখো-লাখো টাকার মালিক। ঠিকেদারি থেকে ধাপে ধাপে উঠে এখন আমদানি-রপ্তানির কারবারী।—এরই নাম কপাল!

আর্মানিটোলায় কারবারের গদী, তার ওপর সুদে খাটছে হাজার হাজার টাকা। কলুটোলায় পেল্লায় তিনমহলা বাড়ি, পেনেটিতে জমজমাটি বাগানবাড়িও করেছে। যার রূপের ব'ড়শিতে লোকটা এমন ভাগ্যিকে গেঁথে তুলেছে, সেই গিন্নিমাগী এখন চৌষট্টি ভরির সোনার গয়না গায়ে চড়িয়ে ঝি-চাকর, বৌ-বেটা আর কত্তার ওপর খবরদারি করে। বস্‌রাই মুক্তো ছাড়া অন্য মুক্তো তার গয়নায় নেই। পাঁচ মুক্তোর নথ নাকে পুজোর দিনে নাটমন্দিরে গিয়ে চোখ বুজে ভক্তিভরে মা দুর্গার পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দেয়।

কে তার যৌবনকাল নিয়ে খোঁজ ক'রছে? কার এত বড় বুকের পাটা, তা নিয়ে কথা বলে? তার লাখোপতি কত্তা পর্যন্ত তাকে মান্যি ক'রে চলে।

বিভোর হ'য়ে চন্দরার গল্পগুলো শোনেন রুক্মিণী। গল্প কেন, সবই তো সত্যি কথা! টাউন কলকাতায় এমন কত ঘটনা আকছার ঘটছে।

চন্দরার বর্ণনাভঙ্গিটা বেশ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করবার মতো। শুনে শুনে কেমন যেন নেশা লেগে গেছে। বিশেষ ক'রে যে-সব কেচ্ছায় লম্পট, মাতাল, হৃদয়হীন স্বামীর ওপর প্রতিশোধ নেবার নেশায় ভর্‌ভরন্ত বয়সের বৌগুলো পরপুরুষের কোলে ভরা যৌবন সঁপে দেয়, তাদের কথা শুনে শুনে রুক্মিণীর যেন আশ মেটে না! শুনতে শুনতেই কখন যেন একটা অস্থির উত্তেজনায় তাঁর বুকের ভেতরটা হাঁপাতে থাকে; একটা অসহ্য প্রদাহে জ্ব'লে যেতে থাকে সারা দেহ। ঝিম্ ঝিম্ ক'রতে থাকে মাথার ভেতর।

হ্যাঁ, ঠিক করেছে তারা, বেশ ক'রেছে!

মাথা ঝিম্ ঝিম্ ক'রতে ক'রতে তারপর একসময় সেই মাথাধরার উপসর্গটা দেখা দেয়। অসহ্য যন্ত্রণায় মাথাটা তখন যেন ছিঁড়ে পড়তে থাকে।

চন্দরাকে মনে মনে হিংসে করেন রুক্মিণী। মেয়েটা বয়সে তাঁর চেয়ে দু'চার বছরের ছোটই হবে, কিন্তু যৌবনের ঢলকে গতরে কি আঁটোসাঁটো ক'রেই না বেঁধে রেখেছে! দেখলে মনে হয়, বয়স যেন এখনো এককুড়িও পেরোয়নি। আর রুক্মিণী নিজে? এরই ভেতর যেন বুড়িয়ে গেছেন!

হিংসে হবে না কেন? রুক্মিণীর বিয়েই হ'য়েছিল, কিন্তু সোয়ামির সঙ্গে ঘর-বাঁধা কাকে বলে, তা জানার কপাল জীবনে তাঁর হ'ল না। আর চন্দরা? তার সতীন নেই। তার সোয়ামী সেই তাগড়াই জোয়ান গুপীকান্ত লোকটা একা তারই। সেই জোয়ান-মদ্দ মানুষটার আদর-সোহাগ ষোলো আনাই ওই মাগীর একার দখলে। মনের যৌবন আর গতরের তাপ-শান্তির দেমাকে মাগীর যেন মাটিতে আর পা পড়ে না!

একটা গয়লার ঘরের মেয়ে কেন এত ভাগ্যবতী হবে? কেন সে রোজ এসে ঠারে-ঠমকে নিজের সুখ-শান্তিকে এমন দেখিয়ে দেখিয়ে জাহির ক'রে যাবে? দেমাকের বড় বাড় বেড়েছে মাগীর! হে মা কালী! পরের জন্মে চন্দরাকে কুলীন বামুনের ঘরের মেয়ে ক'রে পাঠিও মা! একবার বুঝুক, এ দুনিয়ায় মেয়ে হ'য়ে জন্মানোর সুখ কতখানি!

আজকাল হারাণের বৌয়ের সঙ্গে হঠাৎ হঠাৎ বড় রূঢ় ব্যবহার করেন রুক্মিণী। কেন করেন, নিজেও তা জানেন না। বুঝতেও পারেন না, তুচ্ছ কারণে কখন ওই ছোট্ট মেয়েটাকে দু'টো কর্কশ কথা ব'লে ফেলবেন তিনি। কতই বা বয়েস মেয়েটার? সংসারের কতটুকুই বা বোঝে সে? তবু মাঝে মাঝে সামান্য কারণে শাশুড়ির ধমক খায়। তারপর আড়ালে ব'সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। তা দেখে কেমন যেন একটা অদ্ভুত তৃপ্তি পান রুক্মিণী।

হারাণের স্বভাব আগের চেয়ে অনেক পাল্টে গেছে। সংসারে বেশ মন ব'সেছে ছেলেটার। তবে বড় মেনিমুখো। বৌ-অন্ত প্রাণ। যেন বৌ আর কারো ছিল না, ওর একারই হয়েছে।

আহা, হারাণের মাইনে আর একটু বাড়লে কত ভাল হ'ত! পাঁচটাকায় সংসার চ'লে যাচ্ছে বটে, তবে অভাব-অনটনের দাগগুলোতো আর এই ক'টা টাকায় মুছে যাওয়ার নয়।

হরিশের লেখাপড়ার জন্যে একমাত্র পিদিমের তেলের দাম ছাড়া আর কিছু লাগে না। তার বইপত্তর, খাতা কলম সব কিছু এখনো তো দিয়ে চ'লেছেন পাদ্রি সাহেব। কি সুক্ষণেই যে ছেলেটা তাঁর নজরে প'ড়েছিল! এমন কি, ইস্কুলে সেই গোরা সাহেবের সঙ্গে মারপিট করবার পরেও ছেলেটাকে তিনি ইস্কুল থেকে তাড়িয়ে দেননি। উঃ, সেই ঘটনার কথা শোনার পর প্রায় মাসখানেক ধ'রে রাতে ঘুমোতে পারেনি রুক্মিণী। সব সময় আতঙ্ক, এই বুঝি সেই গোরাসাহেব দলবল নিয়ে এসে বাড়ি চড়াও হয়!

পাদরি সাহেবের দয়ায় তাঁর কাছে রুক্মিণী মনে মনে কৃতজ্ঞ। তবুও একটা অজানা আতঙ্কে মাঝে মাঝে বুক কাঁপে। পাদরি সাহেব যেভাবে ছেলেটাকে বশ ক'রে ফেলেছেন—আর, তাঁর নামেও ছেলেটা যেরকম পাগল—তাই দেখেই তো ভয় হয়! হঠাৎ যদি কেউ এসে একদিন বলে, হরিশ কেরেস্তান হ'য়ে গেছে?

না, রুক্মিণী তা কোনোমতেই সহ্য ক'রতে পারবেন না। থাক হিন্দুয়ানিতে হাজার দোষ, তাই ব'লে নৈকষ্য কুলীনের ছেলে কেরেস্তান হ'য়ে গিয়ে অখাদ্যি-কুখাদ্যি খাবে আর গির্জেয় গিয়ে যীশুর পুজো করবে—তা কি সহ্য করা যায়?

নিজের এই আশঙ্কার কথা মাত্র একজনের কাছেই প্রকাশ ক'রেছেন রুক্মিণী। সে হ'ল আনন্দ—উত্তরপাড়ার বড় সতীনের বড়োছেলে আনন্দচন্দ্র। বড় সতীনকে চোখেও দেখেননি রুক্মিণী। আনন্দকে রুক্মিণীর কিন্তু সতীনপো ব'লে মনে হয় না। মনে হয় যেন নিজেরই পেটের ছেলে।

ভারী মিষ্টি স্বভাব ছেলেটার। তেমনি দয়া-মায়ার শরীর। কোনো কাজে কখনো কলকাতায় এলে যেমন ক'রেই হোক একটু সময় ক'রে নিয়ে একবার অন্তত দেখা করে যায় ছোটমার সঙ্গে। খোঁজখবর নিয়ে যায় হারাণ আর হরিশের। বয়সে আনন্দ রুক্মিণীর চেয়ে অল্প কয়েক বছরের ছোট কিন্তু ঠিক যেন নিজের মায়ের মতোই শ্রদ্ধাভক্তি করে ছোটমাকে। আনন্দের মা বড় মুখরা আর জেদি। কারো সঙ্গেই নাকি মিষ্টিমুখে দু'টো কথা বলা তাঁর স্বভাবে নেই। রুক্মিণীর কোলে এসেছে ওই দু'টি মাত্রই ছেলে আর বড় সতীন চার ছেলে, তিন মেয়ের মা। আনন্দ আর তার পরের ভাই রাজচন্দ্রের বিয়ে হ'য়ে গেছে। দুই বৌয়ের ওপরেই নাকি দিনরাত চলে নির্যাতন। তিন মেয়েরই বিয়ে হ'য়ে গেছে। শ্বশুরবাড়ি গিয়ে তারা বোধহয় হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে। পারতপক্ষে বাপের বাড়ির পথ মাড়ায় না। উত্তরপাড়ার বাড়িতে অষ্টপ্রহর অশান্তি যে লেগেই আছে, আনন্দের কথাবার্তার ফাঁক থেকেই রুক্মিণী তা বুঝে নিয়েছেন।

বাড়িতে স্নেহের শান্তি নেই ব'লেই হয়তো মাঝে মাঝে সৎমার কাছে এসে একটু স্নেহের স্পর্শ নিয়ে যায় আনন্দ। তাছাড়া এই যোগাযোগ রাখার পেছনে তার মনের মায়া-মমতাও একটা কারণ। সেজোভাই রাজকিশোর আনন্দের খুব অনুগত। বয়সে রাজকিশোর হরিশের চেয়ে বছর খানেকের বড়। তাকেও দু'একবার সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছে আনন্দ। সে বলে, আমাদের আর হারাণ-হরিশের দেহে তো একই রক্ত বইচে, ছোটমা! এত কাছাকাছি থেকেও ভাই ভাইকে চিনবে না, তা কি হয়?

কিছুদিন আগে আনন্দ একবার এসেছিল।

সে এসেই কিন্তু সবচেয়ে আগে হরিশের খোঁজখবর নেয়। হরিশ যে এত লেখাপড়া করছে, তা নিয়ে আনন্দের গর্বের সীমা নেই। হরিশকে এত ভালোবাসে ব'লেও হয়তো আনন্দের ওপর রুক্মিণীর টান একটু বেশি।

সেদিন আনন্দের সঙ্গে কথায় কথায় নিজের আশঙ্কা প্রকাশ করতেই সে বললে, এই সায়েবের ইস্কুলে এখনো তো তেমন কিছু ঘটেনি ছোটমা, আগে থেকেই এত ভয় পাচ্চ কেন? হিন্দু কালেজ হ'লে তবু কথা ছিল। আমার তো মনে হয় হরিশ তেমন কিছু করবে না।

রুক্মিণী করুণমুখে বললেন, তবু মন যে মানে না বাবা!

আনন্দ হেসে ব'ললে, তাহলে ইংরিজি ইস্কুলে পড়া বন্ধ ক'রে দাও।

বুকটা ছ্যাঁৎ ক'রে ওঠে রুক্মিণীর। হরিশের ওপরেই যে তাঁর ভবিষ্যতের সব আশা-ভরসা! এতখানি এগিয়ে যাওয়ার পর হঠাৎ এখন মাঝপথে ইংরিজি পড়া বন্ধ ক'রে দিলে এতদিনের স্বপ্নটাই যে ভেঙে চুরমার হ'য়ে যাবে!

ছোটমার নিরুত্তর মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর মনের ভাব কিছুটা আঁচ করে নিতে পারে আনন্দ। সে ব'ললে, হরিশকে তুমি আমার চেয়ে অনেক বেশি ভালো ক'রে চেনো ছোট মা। আমি তার মনের খবর কতটুকুই বা জানি? তবু তার সম্বন্ধে আমার এইটুকু বিশ্বাস আছে, সে-রকম কিছু ক'রলে তোমাকে না জানিয়ে সে চোরের মতো কিছু করবে না। ওকে তুমি লেখাপড়া ক'রতে দাও।

আনন্দের সঙ্গে সেদিন এই কথাবার্তার পর পুরোপুরি আশ্বস্ত না হ'লেও রুক্মিণীর মন থেকে সাময়িকভাবে অন্তত আতঙ্ক একটু কেটেছে। হ্যাঁ, ঠিক কথা-ই তো বলেছে আনন্দ। হরিশ তার মাকে না জানিয়ে চোরের মতো কিছু ক'রবে না—ক'রতে পারে না।

প্রতিমাসেই শেষের দিকে সংসার খরচায় টান পড়ে।

হারাণ একদিন দুঃখ ক'রে বলছিল, জানো মা, গোরাসায়েবদের কুঠির একটা খানসামাও মাসে পনেরো টাকা মাইনে পায়। পাংখাপুলার—মানে যে লোকটা ঘরের কোণে ব'সে সায়েবের মাথার ওপর ঝালর-পাখার দড়িটা টানে, তারও মাস-মাইনে অন্তত দশ টাকা। আর আমি? সারাদিন মুহুরিবাবুর কাছে গাধার খাটুনি খেটে মাসের মাইনে পাই পাঁচটা টাকা!

রুক্মিণী ব'ললেন, তোর মুনিব মুহুরিবাবুকে বল্ না, আর অন্তত একটা টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিক।

হারাণ হেসে ব'ললে, আমার মুনিবকে তুমি তো চেনো না মা? নিজে ফি-রোজ এদিক-ওদিক ক'রে মক্কেলগুলোকে বোকা বানিয়ে নিদেন ষাট-সত্তর-আশি, এমন কি একশো টাকাও উপরি কামিয়ে নিচ্চে। কিন্তু আমাদের বেলায় পাই পয়সাটিও হাত দিয়ে গলবে না। টাকার কথা বললেই ব'লবে, পথ দ্যাকো!

সভয়ে রুক্মিণী ব'ললেন, তবে থাক বাপু, ব'লে দরকার নেই।

হারাণ ব'ললে, ওই ভয়েই তো কিছু ব'লতে সাহস পাইনে। তবে আমিও হারাণ মুকুজ্জে! সবুর করো না আর ক'টা মাস, তারপর দেখিয়ে দেবো। আদালতের সেরেস্তার মারপ্যাঁচগুলো আর একটু রপ্ত ক'রে নিই, তারপর একদিন ওই পাঁচটাকা মাইনের চাকরিতে নাথি মেরে চ'লে আসবো, হ্যাঁ!

—কোথায়? কী ক'রবি তাহ'লে?—উদ্বিগ্নস্বরে প্রশ্ন করলেন রুক্মিণী।

—আমি বব্বুলে হবো।

—বব্বুলে! সেটা আবার কী?

—বড় বড় লাখ-বেলাখ টাকার মামলার দালাল।—হারাণ রীতিমতো উদ্দীপ্তস্বরে ব'ললে, তুমি দেখে নিও মা!

কিছুই বুঝলেন না রুক্মিণী। প্রশ্ন ক'রলেন, সেটা ক'রলে কী হয়রে হারাণ? মাইনে বাড়ে?

—মাইনে? ফুঃ! মাইনে কী ব'লচো মা, কমিশনই হ'ল তার আসল রস। ধরো, পাঁচ লাখ টাকার সম্পত্তির ওপর মামলা। শতকরা দশটাকা—নয় ধরো, আমাব মতো নতুন বব্বুলের জন্যে আদ্দেক রেটে শতকরা পাঁচটাকা হারেই কমিশন ঠিক হ'ল। তাহ'লে কত টাকা আসচে বলো দিকি? সে-হিসেব দিলেও তুমি বুঝতে পারবে না। চাই শুধু একটা ডাকসাইটে অ্যাটর্নি আপিস—যারা খালি মামলাবাজ বড়লোক মক্কেল ধরিয়ে দেবে। তাদের পাওনাগণ্ডা তারা বুঝে নিক। মক্কেলের মামলার তদ্বিরতদারকি, ছোটাছুটি—সব দায় তখন আমার। তোমাকে কী বলবো মা, এ-পেশায় একবার জমিয়ে নিতে পারলে মালক্ষ্মী একেবারে ল্যাণ্ডোগাড়ি চেপে ঝম্ঝম্ ক'রে মল বাজিয়ে ঘরে এসে অধিষ্ঠেন হবেন, হ্যাঁ!

আবেশে হারাণের চোখ দু'টি এমন বুজে এলো যেন, বাড়ির দরজায় মা লক্ষ্মীর মলের ঝম্ঝম্ শব্দ তখনই তার কানে এসে বাজছে!

হারাণ যেন চোখের সামনে অদূর ভবিষ্যতের ছবি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে! হারাণ মুখুজ্জ্যে তখন আর মুহুরিবাবুর পাঁচ টাকা মাইনের কর্মচারী নয়—সে তখন টাউন কলকাতার একজন নামজাদা রইস্ বব্বালিয়া! বড় বড় ঘরে তার আনোগোনা। তাকে ডেকে লাখ লাখ টাকার বিষয়-সম্পত্তির মামলা-তদারকির দায়িত্ব দিচ্ছে ধনী বাবুরা। তার এত চাহিদা যে অনেক কাকুতি মিনতি সত্ত্বেও বহু উমেদার মক্কেলকে ফিরিয়ে দিতে হচ্ছে। সময় কোথায়? পাঁচ লাখ হোক, দশলাখ হোক—যত টাকার মামলা তার ওপর কমপক্ষে শতকরা দশটাকা হারে কমিশন। উঃ, ভাবতেও রোমাঞ্চ লাগে! মক্কেল তার ওপর পুরোপুরি নির্ভর ক'রে আছে, ওদিকে অ্যাটর্নি আপিসে আর উকিল ব্যারিস্টারের কাছে খাতিরের অন্ত নেই! সবায়ের মুখে হারাণবাবু আর হারাণবাবু!

কপালে যদি লেগে যায় তাহ'লে সংসারের হাল ফেরাতে ক'বছর? টাউন কলকাতায় একটা পছন্দসই জমি কিনে পেল্লায় বাড়ি তুলবে হারাণ। স্টুয়ার্ট কোম্পানি থেকে কিনে নেবে সেরা জাতের ল্যাণ্ডো কিম্বা ফিটন গাড়ি। অবশ্য ব্রাউনবেরি গাড়িও বেশ ভালোই লাগে হারাণের। অবস্থা আরো খানিকটা ফিরলে তখন কিনবে একখানা ব্রুহ্যাম গাড়ি!

ব্রুহ্যামের ইজ্জৎই আলাদা। সুপ্রীম কোর্টের চীফ জাস্টিসকে একখানা ব্রুহ্যাম গাড়িতে

চেপে এসপ্ল্যানেডের পথে যেতে দেখেছে হারাণ। আঃ সে যে কী গাড়ি! কি রূপ আর কি জৌলুষ! একবার তাকালে চোখ ফেরানো যায় না, এমন তার বাহার!

রুক্মিণী ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন উৎকণ্ঠিত আগ্রহ নিয়ে। অধৈর্য হ'য়ে বললেন, সেটা কেমনতরো কাজ, আমাকে একটু বুঝিয়ে বল্ না বাবা!

হারাণ তখনো কল্পনার মৌতাতে রয়েছে। একটু বিরক্ত স্বরে ব'ললে, সে-সব হ'ল আইন-আদালতের ব্যাপার, অনেক ঘোর-প্যাঁচের ঝামেলা। সে-সব ব্যাপার তোমাকে বোঝালেও তুমি বুঝবে না মা।

অগত্যা চুপ ক'রে গেলেন রুক্মিণী। সত্যিই তো, আইন-আদালতের ব্যাপার তিনি কীই বা বুঝবেন? কিছু না জেনেও রুক্মিণীর মনের ভেতর আনন্দের শিহরণ।

হে মা কালী! মুখ তুলে চেয়ো মা। সেই বব্বুলে না কী হ'য়েই হারাণ যেন কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা এনে সিন্দুক বোঝাই করে!

॥ ছয় ॥

উত্তরপাড়া থেকে আনন্দ সেদিন হঠাৎ বেশ সকালবেলায় এসে উপস্থিত। এর আগে সে আর কোনোদিনই এত সকালে আসেনি। রুক্মিণী তাকে জল-গামছা এগিয়ে দিয়ে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আজ হঠাৎ এ-সময়ে কেন বাবা? খপর-টপর সব ভালো তো?

আনন্দ হেসে ব'ললে, খুব একটা ভালো খপর নিয়েই এয়েচি ছোটমা। সেই কাক-ভোরে বেরিয়েচি। আসলে এমন একটা খপর পেটের ভেতর গজ্‌গজ্ কচ্চে যে আমার আর সবুর সইলো না। হরিশ কোথায়? ইস্কুলে চ'লে গেচে?

—না বাবা, এখনো যায়নি। ভাত খেতে ব'সেচে। তা কী এমন ভালো খপর যে এই সাত সকালে ছুটে এলি?

এমন সময় হরিশ ঘরে ঢুকলে। আনন্দ ব'ললে, দাঁড়াও, একটু পরে ব'লচি। তারপর হরিশ, তোর খপর কী? লেখাপড়া ভালো চ'লচে তো?

আনন্দকে প্রণাম ক'রে হরিশ ব'ললে, আজ্ঞে, হ্যাঁ।

স্কুলে যাওয়ার আগে রোজ মা-কে প্রণাম ক'রে যায় হরিশ। রুক্মিণীকে প্রণাম ক'রে সে উঠে দাঁড়ালে।

আনন্দ হাসতে হাসতে ব'ললে, এর ভেতর আবার কোনো গোবাসায়েবকে ধ'রে ঠ্যাঙাসনি তো?

লজ্জা পেয়ে মুখ নামিয়ে নিলে হরিশ।

কতদিন আগের কথা। তবু রুক্মিণীর চোখে আতঙ্কের চিহ্ন ফুটে উঠ্‌লো।—আর ও-সব অলুক্ষুণে কথা বলিসনি বাবা! এইতো হাড় জির্‌জিরে চেহারা, নাক টিপলে এখনো দুধ গলে! কোন্ সাহসে যে একটা জোয়ান মদ্দ গোরার গায়ে ও হাত তুলতে গিয়েচিল, তা ভাবতে গেলে এখনো আমার বুকের রক্ত হিম হ'য়ে যায়! ওর বয়েসই বা কত বল্ দিকিনি?

একটু মুখ টিপে হেসে হরিশ ব'ললে, এগারো বছর।

—আর দাঁত বা'র ক'রে হাসতে হবে না বাছা!—ঝাম্‌টা দিয়ে ব'ললেন রুক্মিণী, কি ডাকাত ছেলে রে বাবা! নেহাৎ মা কালী সেদিন রক্ষে ক'রেচেন!

হরিশের গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে। হাসলে মুখখানা দেখতে বেশ মিষ্টিই লাগে। তার দুষ্টুমি-ভরা মুখের দিকে তাকিয়ে আনন্দ সস্নেহে ব'ললে, হ্যাঁরে, এ-ইস্কুলের পড়া শেষ হ'য়ে গেলে কী করবি কিছু ভেবেচিস? হিন্দু কালেজের সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষেটা দিবি নাকি?

হরিশের বুকের ভেতরটা ছলাৎ ক'রে উঠ্‌লো। মনে মনে সে যে ঠিক সেই কথাটাই ভেবে রেখেছে, বড়দাদা কেমন ক'রে তা জানতে পারলেন?

উৎফুল্লস্বরে সে ব'ললে, হ্যাঁ, সেই রকমই ইচ্ছে আছে আমার।

—খুব ভালো কথা! পরীক্ষেটা তুই দে। আমার তো বিশ্বেস, তুই ভালোভাবেই পাশ করবি আর জলপানিও পাবি। হিন্দু কালেজে প'ড়তে পারা তো কম ভাগ্যির কথা নয়!

রুক্মিণী হাঁ ক'রে শুনছেন। কিছুই বুঝতে পারছেন না। শুধু হিন্দু কলেজের নামটাই যা শোনা আছে।

হরিশের স্কুলে যাওয়ার সময় হ'য়ে গেছে বুঝতে পেরে আনন্দ ব'ললে, তুই যা, তোকে আর দেরি করিয়ে দেবো না। কিন্তু মনে থাকে যেন, জলপানি পাওয়া চাই-ই!

হরিশ বেরিয়ে যাওয়ার পর রুক্মিণী ব'ললেন, হ্যাঁ রে, হি'দু কালেজে আবার জলপানিও দেয়?

আনন্দ ব'ললে, এমনিই কি আর দেবে? ওই যে শুনলে, তার জন্যে একটা পরীক্ষে আছে? তুমি নিশ্চিন্দি থাকতে পারো ছোটো মা, হরিশ জলপানি পাবেই! তারই টাকায় ওর পড়াশোনার খরচা চ'লে যাবে, চাই কি মাসে মাসে দু'চার টাকা বাঁচতেও পারে।

বিহ্বলের মতো রুক্মিণী বললেন, কী জানি বাবা, কপালে কী নেকা আচে! কিন্তু ওই যে শুনি, হি'দু কালেজে পড়লে ছেলেরা কেরেস্তান হ'য়ে যায়?

আনন্দ একটু দ্বিধাজড়িত স্বরে ব'ললে, যা শুনেচ তা একেবারে মিছে নয়। তবে এত ছেলেতো প'ড়চে, তাদের সবাই কি আর কেরেস্তান হ'য়েচে? কেষ্টমোহন বাড়ুজ্যে, মহেশ ঘোষ—এইরকম দু'চারজন হ'য়েচে বটে!

—থাক বাবা, তবে আর জলপানির দরকার নেই।

আনন্দ ব'ললে, কপালে লেখা থাকলে সে তোমার হিন্দু কালেজের বাইরেও হ'তে পারে। পাদরি সায়েবেরা তো খ্যাপলা জাল হাতে নিয়ে সারা দেশময় ঘুরে বেড়াচ্চে। কোথায়ও মাছের ঘাই দেখলেই ঝপাং ক'রে জাল ফেলচে। সে যা-ই হোক, হিন্দু কালেজে সুযোগ পেলে হরিশকে তুমি বাধা দিও না ছোটমা। হয়তো ওই হিন্দু কালেজ থেকেই ওর কপাল খুলে যেতে পারে। কলকাতার সব বনেদি ঘরের ছেলেরা পড়ে সেখানে। পাশ ক'রে একবার বেরোতে পারলে হরিশকে চাকরি বাকরি খু'জতে হবে না, চাকরিই ওকে খু'জে নিয়ে যাবে দেখো।

—ঠিক বলছিস বাবা?

—যা দেখি শুনি তাই বলচি।

রুক্মিণীর মাথার ভেতর তখন যেন ঝিম্ ধ'রেছে। যে কোনো সামান্য একটা সম্ভাবনার কথা শুনলেই তাঁর এইরকম হয়। মাথায় ঝিম্ ধরে, বুকের ভেতর কে যেন হাতুড়ি পেটাতে থাকে। সমস্ত চেতনা যেন মুহূর্তের ভেতর অজ্ঞাত অন্ধকার ভবিষ্যতের রাজ্যে কল্পনায় গড়া একটা উন্মাদ স্বপ্নের দিকে দুরন্তবেগে ছুটতে আরম্ভ করে! আর কিছু নয়, শুধু আশৈশব দারিদ্র্যের বিভীষিকা থেকে মুক্তির স্বপ্ন! অনাস্বাদিত প্রাচুর্যের আকাঙ্ক্ষা-রসে সিক্ত একটা দুর্দম আকুতি। টাকা—টাকা—টাকা!

আবেগে ধরা গলায় রুক্মিণী বললেন, ভাইকে তুই সেই আশীর্বাদই কর্ বাবা! ও যেন সংসারের দুখ্যু মোচন ক'রতে পারে!

কয়েকমুহূর্ত নীরবে কাটলো। তারপর স্নিগ্ধস্বরে আনন্দ ব'ললে, মনে মনে ওকে সে-আশীর্বাদ তো সবসময়েই কচ্চি ছোটমা! আমার কখনো মনেই হয় না, হরিশ আমার সোদর ভাই নয়। এই যে আজ সাতসকালে ছুটে আসা, সে তো ওরই জন্যে এয়েচি। এবার হরিশের বে' দাও ছোটমা, আমি একটা সুলক্ষণা পাত্রীর খপর নিয়ে এয়েছি।

রুক্মিণীর চোখ-মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো।—তাই বল্! বে'র বয়েস তো হ'য়েই গেচে বাবা! এইতো চোদ্দয় পা দিতে চ'লেচে। হারাণকেও এই বয়েসেই বে' দিয়েছিলুম। তা কোথাকার পাত্রী? কেমন ঘর? নৈকষ্যি তো?

—তা নইলে কি আমি সমন্ধ এনেচি? পাত্রী আমাদের ওতোরপাড়ারই মেয়ে। বংশে

কোনো খুঁৎ নেই, তবে কিনা বড় গরীব। মেয়েটির রঙ একটু চাপা হ'লেও চোখমুখের গড়ন ঠিক যেন দুগ্গোপিতিমে! লক্ষ্মীছিরি ব'লতে তোমরা যা বলো, পাত্রীকে দেখলে বুঝবে সেটা যেন ষোলো আনার ওপর আঠারো আনা। তবে কিনা বয়েসটা একটু বেশি হ'য়ে গেচে—দশবছরে প'ড়েচে।

—দ-শ ব-চ-র! তবে তো সোমত্ত মেয়ে রে!

—সেই কথাই তো বলচি। ওই বয়েসের ব্যাপারটাই যা একটু চিন্তার বিষয় ছোটমা। নইলে গুণের কথা যদি বলো, অমন একটা পাত্রী চট্ ক'রে মেলে না। তাছাড়া ধরো, গরীবের মেয়ে, গরীবের ঘরে এসে মানিয়ে নিতে পারবে।

রুক্মিণী মৃদুস্বরে বললেন, সবই তো বুঝতে পারচি বাবা, কিন্তু—

বাধা দিয়ে আনন্দ ব'ললে, আমাকে যদি পেত্যয় যাও ছোটমা, তবে আমি এইটুকুই ব'লতে পারি, আমার নিতান্ত ইচ্ছে অমন একটা লক্ষ্মীমানী মেয়েকে আমাদের ঘরেই নিয়ে আসি—ঘর আলো হবে। আসলে রাজু মানে রাজকিশোরের জন্যেই পাত্রীটির কথা আমি ভেবেছিলুম। কিন্তু সাত-পাঁচ নানা কথা ভেবে পরে মনে হ'ল, অমন দেবী পিতিমের মতো ঢল্‌ঢলে মেয়েটাকে আমাদের ওতোরপাড়ার বাড়িতে নিয়ে না তোলাই ভালো।

—কেন রে?—আনন্দের কথার অন্তর্নিহিত অর্থ সব কিছু জেনে বুঝেও না জানার ভান ক'রে জিজ্ঞেস ক'রলেন রুক্মিণী।

কয়েকমুহূর্ত চুপ ক'রে রইলো আনন্দ। তারপর খুব কুণ্ঠিতস্বরে ব'ললে, তুমিতো বুঝতেই পারচো ছোটমা, কেন একথা ব'লচি! সন্তান হ'য়ে মাতৃনিন্দে করা মহাপাপ। তবু এ-টুকু না ব'লে পারচিনে, আমার মায়ের মতো শাশুড়ির কাছে গিয়ে পড়লে ফুলের মতো মেয়েটা দু'দিনে শুকিয়ে যাবে। তোমার বড়বৌমা যে কিভাবে মুখ বুজে সংসার ক'রে যাচ্চেন, সেতো দিনের পর দিন চোখের ওপরেই দেখচি! আমার তো সারাক্ষণ মনে ভয়, বাড়িতে কোন্‌দিন না একটা অঘটন ঘটে!

একটা তীব্র চাপা উল্লাসে রুক্মিণীর বুকের ভেতরটা আথালি পাথালি ক'রতে লাগলো। সতীনের নিন্দে কার না ভালো লাগে? তাও আবার তারই পেটের ছেলের মুখে। বুকের ভেতর উল্লাসের যত ঢেউই ব'য়ে যাক, মুখখানি কিন্তু কাঁচুমাচু ক'রে রুক্মিণী বললেন, আহা, তবে তো বাছা বৌমাদের বড় কষ্ট!

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আনন্দ ব'ললে, এখনতো আর অদেষ্টকে ফেরানোর কোনো পথ নেই! তাঁদের কপালে যা আছে, তাই হবে। কিন্তু জেনেশুনে এমন মেয়েটাকে সে-সংসারে নিয়ে যেতে সাহস পাচ্চিনে ব'লেই তোমার কাছে এলুম। হরিশ আমার সোনার চাঁদ ভাই! তার জন্যেও তো একটা ঘর-আলো করা পাত্রী চাই? তাই তাকে এ-বাড়িতে আনার ইচ্ছে নিয়েই আমার আসা।

রুক্মিণী গদগদ স্বরে ব'ললে, আসবি বৈ কি বাবা, একশোবার আসবি। এটাও তো তোর নিজের বাড়ি রে! তা তুই যে-মেয়ের এত সুখ্যাত্ কচ্চিস, সে-মেয়ে যে সত্যিই ভালো তাতে আর সন্দ কী?

—আমি সুখ্যাত্ কল্লেই তো আর পাকা কথা হবে না, তোমার একবার নিজের চোখে দেখা দরকার।

—তুই যখন ব'লচিস তখন যেতেই হবে। তা, মেয়েটির নাম কী?

—মোক্ষদাসুন্দরী। বাপের নাম গোবিন্দ চাটুজ্যে। আমার মুখ থেকে একটা খপর পাওয়ার আশায় চাটুজ্যেমশাই তো খুব উদ্বিগ্ন হ'য়ে আছেন। ব'লতে গেলে ক'নে দেখার জন্যে আজই একটা দিনক্ষণ স্থির ক'রে যেতে পারলে ভালো হয়। মামাদের কাউকে অন্তত যাওয়া দরকার। তোমাদের নিয়ে যাওয়া আর পৌঁছে দেবার জন্যে নৌকোর বন্দোবস্ত তিনিই ক'রবেন। কোনো

অসুবিধে হবে না। বাড়ির পেছনে আদিগঙ্গা থেকে নৌকোয় চাপবে আর সোজা গিয়ে বালীখালে ঢুকে চাটুজ্যেমশাইয়ের বাড়ির সামনেই নাব্‌বে।

—তবে আর চিন্তে কী? আমি পাশের বাড়ি থেকে পাঁজি আনিয়ে দিচ্চি, তুই-ই দেখেশুনে একটা দিনক্ষণ ঠিক ক'রে দিয়ে যা। আমি বড়দাদাকে জানিয়ে রাখবো। তাঁর যেতে কোনো অসুবিধে হবে না।

আনন্দ ব'ললে, আমি বরঞ্চ চাটুজ্যেমশায়ের সঙ্গে কথা ব'লে দিনক্ষণ ঠিক ক'রে তোমাকে জানিয়ে যাবো। সত্যি কথা বলতে কি ছোটমা, অমন নিষ্ঠাবান সাত্ত্বিক বামুন আজকাল বড় একটা দেখা যায় না। বংশ ভালো, অবস্থাও এককালে ভালো ছিল ব'লে শুনেচি। বয়েসকালে অনেক কন্যাদায়গ্রস্ত কুলীনই কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করবার জন্যে ও'কে সাধ্যিসাধনা ক'রেচিলেন বলে শুনেচি। উনি কিন্তু একটার বেশি সংসার করেননি। মোক্ষদা তাঁর সেই একমাত্র পরিবারেরই মেয়ে।

—কী বলচিস বাবা? কুলীন ঘরে এমন নোকও আছে?

—হ্যাঁ ছোটমা। চাটুজ্যেমশাই সত্যিই আলাদা ধাতের মানুষ। তাঁকে দেখলে শ্রদ্ধায় আপনিই মাথা নত হ'য়ে আসে।

রুক্মিণী কয়েকমুহূর্ত স্তব্ধ গম্ভীর ভাবে ব'সে রইলেন। এ কি সম্ভব? কুলীন ঘরের পুরুষ একটা সংসার ক'রেই তৃপ্তিতে জীবন কাটিয়ে দিলে! আরো দশটা মেয়েকে নিয়ে ছেলেখেলা ক'রল না! বিশ্বাস ক'রতেই পারছেন না রুক্মিণী। অথচ আনন্দ নিশ্চয়ই মিছে কথা বলছে না!

—তুই আজই গে' পাকা কথা দিয়ে দে আনন্দ! আমার ক'নে দেখার দরকার নেই। আমি এই ঘরেই কাজ ক'রবো।

—পাকা কথা দিয়ে দেবো! বিস্মিত স্বরে আনন্দ ব'ললে, হঠাৎ কী হ'ল? একবারও চোখের দেখা না দেখেই কাজ করবে ঠিক ক'রে ফেললে?

—হ্যাঁ। চোখে দেখার দরকার মিটে গেচে বাবা! তুই যখন পচন্দ ক'রেচিস, তাতেই আমার পচন্দ হ'য়ে গেচে। আমার ঘরে তো আর ডানাকাটা পরীর দরকার নেই? আর বয়েসের কথা? হরিশ যখন নেকাপড়া শিখচে, তখন পাত্রীও একটু বাড়-বাড়ন্ত হ'লেই ভালো। মনস্থির আমি ক'রে ফেলেচি আনন্দ! এই মেয়েকেই আমি ঘরের নক্কি ক'রে আনবো।

॥ সাত ॥

এতদিন পরে হঠাৎ সেই মানতের কথা মনে প'ড়েছে রুক্মিণীর।

মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বুক কেঁপে উঠেছে। এ কী সর্বনাশ ক'রেছেন তিনি? এই পাঁচবছর ধ'রে সেই মানতের কথা তিনি একেবারে ভুলে ব'সে আছেন? আর সেই মানতের পুজো মিটিয়ে না দিয়েই ছেলের বিয়ে দিতে চ'লেছেন তিনি!

পাঁচ বছর আগে মহামারী লেগেছিল কলকাতায়। গোরা-ফিরিঙ্গিরা যতই শাদা-কালোর বিচার করুক, মহামারী কিন্তু কোনো বাছ-বিচার করেনি। শ'য়ে শ'য়ে লোক ম'রেছে তখন। শাদা-কালোয় ভেদ নেই। কী কারণে শেষের দিকে এই ভবানীপুর অঞ্চলে মহামারীর রাক্ষসী যেন মেতে উঠেছিল। কত লোক ম'রেছে তার হিসেব নেই।

হরিশের বয়স তখন ন'বছর।

এমনিতেই ছেলেটা রোগা। তার ওপর একদিন জ্বর গায়েই স্কুল থেকে বাড়ি ফিরলে সে। কাঁদতে কাঁদতে সেইদিনই রুক্মিণী কালীঘাটের মা কালীর কাছে মানত ক'রে রেখেছিলেন, হরিশ ভালো হ'য়ে উঠলে লালপেড়ে শাড়ি আর পাঁচসিকের ডালা দিয়ে মায়ের পায়ে তিনি পুজো দিয়ে আসবেন।

হরিশের সে-জ্বরে মহামারীর থাবা ছিল না। ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হ'য়েছিল, দু'দিন পরে সেরেও গেল। তারপর রুক্মিণীও মানতের কথা ভুলে গেলেন।

জ্বর সে যে-জ্বরই হোক, মানত তো করা হয়েছিল? তাও যে সে দেবতার কাছে নয়! ভূ-ভারতে সবচেয়ে জাগ্রতা দেবী হ'লেন কালীঘাটের মা! মানত মিটিয়ে না দেওয়ার জন্যে এতদিনেও তিনি যে কোনো নির্মম সাজা দেননি, তা নিশ্চয়ই রুক্মিণীর পূর্বজন্মের কোনো পুণ্যফলে।

ভয়ে ব্যাকুল হ'য়ে পড়লেন রুক্মিণী। হরিশের বিয়ের কথাবার্তা, দিনক্ষণ সব ঠিক হ'য়ে গেছে। আর বেশি দেরিও নেই।—হে মা কালী, অপরাধ নিও না মা!

ক'দিন পরেই কালীঘাটে গিয়ে পুজো মিটিয়ে দিয়ে এলেন রুক্মিণী। মনের ওপর থেকে একটা গুরুভার নেমে গেল।

বাড়িতে বেশ সাড়া প'ড়ে গেছে।

মামীরা খোঁজখবর নিচ্ছেন, পাড়াপড়শিরা এসে কৌতূহলে এটা-সেটা জিজ্ঞেস করছে। বড় বৌ তো সুযোগ পেলেই দেওরের সঙ্গে ঠাট্টা-তামাশা ক'রে চ'লেছে। চন্দরা গয়লানি আগেই জানিয়ে রেখেছে, ছোটঠাউরের বে'তে তার কিন্তু একখানা শান্তিপুরী শাড়ি চাই!

হরিশের মুখে আর কথাটি নেই। স্কুলের ক্লাশে প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে চট্‌পট্ উত্তর দিতে পারলে কী হবে, বৌঠানের কাছে একেবারে নাকালের একশেষ! উত্তরপাড়ার সেই না-দেখা মেয়েটার নাম জড়িয়ে বৌঠান এমন সব কথা বলছে যে লজ্জায় হরিশের কান লাল হ'য়ে যাচ্ছে। সেখান থেকে পালাতে পারলে সে বাঁচে! সেকথার জবাব দিতে গেলে তো সেই ধরনের সব কথা মুখ দিয়ে বের করতে হয়। সেইটে সে কিছুতেই পারছে না।

অথচ হরিশ এখন আর একেবারে অজ্ঞ নেই।

শেক্‌স্‌পিয়রের প্রায় সব নাটকই তার পড়া হ'য়ে গেছে। নারী-পুরুষের সম্পর্ক, তাদের প্রেম-বিরহ নিয়েও একটা অস্পষ্ট কল্পনামধুর ধারণাও গ'ড়ে উঠেছে তার মনে। তাছাড়া তার সহপাঠীদের ভেতর বেশ কয়েকজনের বিয়ে হ'য়ে গেছে। তাদের কাছে শুনে শুনে দাম্পত্যজীবনের কিছু কিছু আশ্চর্যজনক তথ্যও সে জেনে ফেলেছে।

বৌঠানের রসিকতায় বাইরে লজ্জা পেলেও মনে মনে কিন্তু অখুশি হয় না হরিশ। বরঞ্চ, মোক্ষদাসুন্দরী নামের সেই না-দেখা মেয়েটার কল্পনায় গড়া ঢলঢলে মিষ্টি মুখখানা তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সে যেন দেখতে পায়, ডুরে শাড়ি পরা একটা দিব্যি গোলগাল, নাদুস-নুদুস ছোট্ট মেয়ে ঘোমটা মাথায় তার দিকে তাকিয়ে ফিক্ ফিক্ ক'রে হাসছে আর সেই সঙ্গে মেয়েটার নাকের নিচে চিক্‌চিক্ ক'রে দুলছে একটা নোলক!

কি অদ্ভুত ব্যাপার!

কোথাকার কোন্ একটা অজানা অচেনা মেয়ে তার বৌ হ'যে এ-বাড়িতে আসবে আর তাকে ভালোবাসবে!

হঠাৎ কী যেন হ'ল।

কলকাতায় ক'দিন ধ'রে একটা থম্‌থমে ভাব। [illegible]-মহল্লার হৈহল্লায় হঠাৎ পড়েছে ভাটির টান। পাঞ্চ-হাউস, ট্যাভার্ন আর হোটেলগুলোয় ফুর্তির ফোয়ারা আগের তুলনায় একেবারেই ক্ষীণ। গোরা-ফিরিঙ্গিরাতো বটেই, অনেক দিশিবাবুও শুকনো মুখে ঘুরছে।

কোম্পানি সরকারের সম্মান নাকি বিপন্ন!

আফগানিস্তানে হানা দিয়েছিল কোম্পানির ফৌজ। সেখানকার রুক্ষ পাথুরে মাটির ওপর জোর লড়াইয়ে গোরাপল্টনের বীরত্বের গর্ব চুপসে গেছে।

এতদিন পর্যন্ত একটার পর একটা নিখুঁৎ চালে কেবলই কিস্তিমাৎ ক'রে এসেছে কোম্পানি! সেই ক্লাইভ-হেস্টিংসের আমল থেকে আজ পর্যন্ত দানের পর দান জিৎ। তার নিজের ঘরের রাজা

কখনো যে বিপক্ষের হাতে মাৎ হ'তে পারে, তা কি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিল কোম্পানি সরকার? তাও আবার মন্ত্রী নয়, গজ নয়, ঘোড়া নয়—একেবারে বোড়ের চালে?

ঠিক তাই-ই হয়েছে আফগানিস্তানে।

বেণ্টিঙ্ক সাহেব চ'লে যাওয়ার পর গবর্নর জেনারেল হ'য়ে এসেছেন লর্ড অকল্যাণ্ড। আফগানিস্তানের ওপর বৃটিশ সিংহের থাবা বিস্তারের ফন্দি এ'টে তিনি ফৌজ পাঠালেন কাবুলে। সীমান্তের বিপদ থেকে নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্যে অঞ্চলটা কোম্পানির চাই-ই!

আফগানিস্তানের রাজা দোস্ত মহম্মদ।

সাগরপারের এই আগন্তুকদের সম্বন্ধে আগে থেকেই তিনি সাবধান ছিলেন। হিন্দুস্তানে তাদের মৌরসি পাট্টা গেড়ে বসার কূটকৌশলের নমুনাতো একেবারে তর্‌তাজা! কাজে কাজেই সাগরপারের বেনিয়া কালসাপকে নিজের দেশের মাটিতে কিলবিলিয়ে উঠে ফণা তোলার ফুরসৎ দিতে তিনি একেবারেই নারাজ।

কোম্পানি তখন তাঁবেদার হিসেবে বেছে নিলে দোস্ত্‌ মহম্মদের প্রতিদ্বন্দ্বী শাহ্‌ সুজাকে। এ-যাবৎকাল রাজ্য বিস্তারে এই কৌশলটাই সবচেয়ে বেশি কাজ দিয়েছে।

একেবারে প্রথম দফার চালে কোম্পানিরই জিৎ হ'ল। কামানের গোলার দাপটে দোস্ত্‌ মহম্মদকে হারিয়ে দিয়ে শাহ্‌ সুজাকে কাবুলের সিংহাসনে বসিয়ে দিলে কোম্পানি। কিন্তু শেষরক্ষা হ'ল না।

আচম্‌কা বিদ্রোহ ক'রে ব'সলো আফগানিস্তানের মানুষ। শাহ্‌ সুজাকে তারা একেবারেই চায় না। চায় না তার ভিন্‌দেশি মুরুব্বি ইংরেজকে।

পাঠান রক্তের তেজ-ই আলাদা।

বন্ধুকে তারা জান্‌ দিয়ে রক্ষা ক'রবে। কিন্তু যাকে একবার দুশ্‌মন বলে জেনেছে, তার জান্‌ না নেওয়া পর্যন্ত রক্ত ঠাণ্ডা হবে না। নাস্তানাবুদ ক'রেছে তারা গোরা পল্টনকে। শ'য়ে শ'য়ে গোরা সেপাইকে প্রাণ দিতে হয়েছে তাদের হাতে। শাহ্‌ সুজাকে তারা টেনে নামিয়েছে কাবুলের সিংহাসন থেকে। দোস্ত্‌ মহম্মদ আবার ফিরে পেয়েছেন সিংহাসন।

সেই রক্তারক্তি কাণ্ডের পর যে দু'চারজন গোরা সেপাই কোনমতে প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছিল, তারাই খবরটা দিয়েছে। তারপর থেকেই কলকাতা থম্‌থমে।

সেই কোন্‌ সুদূর আফগানিস্তানে কী ঘটেছে, তার বিশদ বিবরণ কেমন ক'রে জানবে কলকাতার সাধারণ মানুষ? এদেশিরা তো পরের কথা, খোদ সাহেব-বিবিবাও ভালো ক'রে জানে না, আসল ব্যাপারটা কী। জানেন শুধু গোরাপল্টনের কয়েকজন হোমরা-চোমরা সেনাপতি আর লাটবাহাদুর। তাঁরাও সবটুকু জানতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ!

তাই গুজবেরও অন্ত নেই।

কেউ ব'লছে, পাঠানেরা ক'লকাতায় হানা দেবে; কেউ ব'লছে কোম্পানির হুকুমে গোরা পাদরিরা এবার এদেশের মুসলমানদের জোর ক'রে ধ'রে ধ'রে কেরেস্তান ক'রে দেবে। কেউ বা নাকি শুনে এসেছে, পাঠান মুসলমানদের এই বেয়াদপিতে গোরা সাহেবেরা এত বেশি রেগে গেছে যে, এখন থেকে তাদের কুঠিতে কুঠিতে খানসামা, বাবুর্চি, খিদমৎগার, আবদার, পাংখাপুলার, কোচোয়ান—কোনোরকম চাকরিতেই আর মুসলমান উমেদারকে বহাল করা হবে না। শুধু তাই নয়, এখন যারা কাজ করছে তাদেরও নাকি তাড়িয়ে দেওয়া হবে।

এ-সব গুজব অবশ্য ক'দিন পরেই মিলিয়ে গেল। পাঠানরাও কলকাতা আক্রমণ ক'রলে না, মুসলমান খানসামা বাবুর্চিদেরও চাকরি গেল না। কলকাতা যেমন চলছিল তেমনিই চলতে লাগলো।

হরিশ মনে মনে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল।

কোম্পানির সাহেবদের কি মর্জির ঠিক আছে? হয়তো হুকুম জারি ক'রে দিলে, যেহেতু আফগানিস্তানে গোরাপল্টনের পরাজয় হয়েছে সেই হেতু শোক প্রকাশের জন্যে এখন থেকে এক বছরের ভেতর কোনো নেটিব বিয়ে ক'রতে পারবে না!

তাহ'লে কী হবে?

কয়েকদিন ধ'রে বেশ বুক ঢিপ্‌ঢিপ্ করেছে হরিশের। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোম্পানি সরকার সেরকম কোনো হুকুম দিলে না দেখে সে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলে।

প্রতিদিন ভোরে ঘুম ভাঙছে আর বিয়ের তারিখটা একদিন একদিন ক'রে এগিয়ে আসছে। সত্যিই তার বিয়ে হবে? একটা ঘোমটা-মাথায় ছোটো মেয়েকে লোকে ব'লবে, হরিশের বৌ!

আর মাত্র পনেরো দিন!

॥ আট ॥

আদিগঙ্গায় স্নানের ঘাটে বাঁধা রয়েছে একখানা ছোটখাটো পান্‌সি নৌকো।

বর গিয়ে নৌকোয় উঠলেই দাঁড়ে হাত লাগাবে মাঝিমাল্লারা। দেখতে দেখতে আদিগঙ্গা ছাড়িয়ে পান্‌সি গিয়ে ঝাঁপিয়ে প'ড়বে গঙ্গার বুকে। রওনা হবে উত্তরপাড়ায়। গঙ্গার বুকে ছলাৎ ছলাৎ শব্দ তুলে এগিয়ে চলবে উজানে। তারপর একসময় গিয়ে ভিড়বে বালীখালের কোনো এক ঘাটে। আবার সেই পান্‌সিতেই হরিশ ফিরে আসবে পরের দিন। তখন আর একা নয়—সঙ্গে লাল টুক্‌টুকে চেলি-পরা নতুন স্ত্রী!

শুভকাজে যাত্রার সময় হ'য়ে গেছে।

যাত্রা-মঙ্গল অনুষ্ঠানের জন্যে তৈরি হ'য়ে অপেক্ষা করছেন পুরুতঠাকুর। তার আগে একটু স্ত্রী-আচার শুধু বাকি।

বরের সাজে টোপরমাথায় পিঁড়িতে গিয়ে বসলে হরিশ। চার পাশে এয়োতীদের ভিড়। হরিশের সামনে মাটির ওপর একখানা পাথরের থালা। দুধ দিয়ে সেই থালায় ছেলের হাতের কনুই পর্যন্ত ধুয়ে আঁচলে হাত মুছে দিয়ে রুক্মিণী ব'ললেন, আমার জন্যে কী আনতে যাচ্ছ বাবা?

হারাণের বৌ পাশ থেকে ব'লে দিলে, অ ঠাকুরপো! বলো, তোমার জন্যে দাসী আনতে যাচ্ছি।

হরিশ চোখ বড় বড় ক'রে বললে, দাসী! দাসী মানে কি বৌ? দাসী মানে তো চাকরানি!

এয়োদের ভেতর হাসির রোল উঠ্‌লো।

হারাণের বৌ চোখ পাকিয়ে ব'ললে, মা গো মা! বে' না হ'তেই এত বিচার? বে'র পর না জানি আরো কত মানে তুমি বের ক'রবে!

বর্ষীয়সী একজন এয়ো ব'ললেন, বেটার বৌ মায়ের কাছে দাসী ছাড়া আর কী বাছা? শুভকম্মে যাত্রার আগে মাকে ও-কথা বলতে হয়!

আর একজন ব'ললেন, আজ তুই-ই কি একথা পেথম বলবি ভেবেচিস? মান্ধাতার আমল থেকে এই রীত্ চ'লে আসচে, বুঝলি?

হরিশ তবু চুপ করে রইলো।

বড়মামী বিরক্তস্বরে ব'ললেন, হ'ল কী তোর? বোবা হ'য়ে গেলি নাকি?

ঘরভর্তি এয়ো আর আইবুড়ো মেয়ের দল। বাইরে অপেক্ষা করছেন বীরেশ্বর, দেবনারায়ণ আর পুরুতঠাকুর। আনন্দও আছে। তাকে বরযাত্রী হিসেবে যাওয়ার জন্যে বিশেষ ক'রে ব'লে দিয়েছেন রুক্মিণী।

'তোমার জন্যে দাসী আনতে যাচ্ছি মা'—এই কথাটা বলা যে বিয়ের অনুষ্ঠানে একটা গতানুগতিক নিয়ম মাত্র এবং এযাবৎকাল সবাই সে-নিয়ম মেনে এসেছে—সবই বুঝতে পারছে হরিশ। কিন্তু কথায় কথায় যাকে বলা হয় 'ঘরের লক্ষ্মী', তাকে দাসী বলতে হবে কেন, এই কথাটা কিছুতেই

তার মাথায় ঢুকছে না। দাসী ব'লে চিহ্নিত না করলেই কি ছেলের বৌ মায়ের সেবা করবে না? তাছাড়া দাসী শব্দটার প্রয়োগে মনের যে ভাব ফুটে বেরোয়, 'ঘরের লক্ষ্মী'র সঙ্গে তা যেন কিছুতেই খাপ খায় না! সব কিছুকেই দাসত্বের নিরিখে ছাপ দেওয়ার এ-রকম একটা প্রথা হ'য়েছিল কেন?

এয়োরা অধৈর্য হ'য়ে প'ড়েছে। ছেলেটার ব্যাপার-স্যাপার কী? পেছন থেকে একটি যুবতী এয়ো ব'ললে, ইঞ্জিরি ইস্কুলে পড়ে তো? বৌ ব'লতে বোঝে মেমসায়েব বিবি। তাই না রে হরিশ?

আবার একটা হাসির রোল উঠলো।

সামান্য কয়েকটা মুহূর্তের ব্যাপার মাত্র। কিন্তু তারই ভেতর এক প্রগাঢ় বেদনায় রুক্মিণীর মুখ কালো হ'য়ে গেছে। যে হরিশ তাঁর নয়নের মণি, যাকে ঘিরে তাঁর এত স্বপ্ন, সেই হরিশ কি মনে মনে সত্যিই কেরেস্তান হ'য়ে গেল? ছেলের সদ্য দুধে-ধোয়া হাত দু'টো তখনো ধরা রয়েছে তাঁর হাতের ভেতর। ছেলে ব'লবে, 'তোমার জন্যে দাসী আনতে যাচ্ছি মা'—তাই শুনে তারপর ছেলের হাত মুখ মুছে দিয়ে মিষ্টিমুখ করিয়ে মা তাকে শুভযাত্রায় অনুমতি দেবেন, এই হ'ল লোকাচার। কিন্তু এ কী করছে হরিশ? লজ্জায়, অপমানে তাঁর যে ডুকরে কেঁদে ওঠার মতো অবস্থা হ'ল!

দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল আনন্দ। সে একটু এগিয়ে এসে বললে, তক্কোশাস্তর নিয়ে পরে মাথা ঘামালেও চ'লবে হরিশ! বে' ক'রতে রওনা হওয়ার আগে মাকে এ-কথা বলতে হয়। ছেলে যদি মায়ের দাস হয় তবে তার বৌয়ের দাসী হ'তে বাধাটা কী? নে, আর দেরি করিসনে। গঙ্গায় ভাটির টান শুরু হ'লে পৌঁছতে দেরি হ'য়ে যাবে।

মায়ের উদ্গত কান্নার আভাসে ভরা মুখের দিকে তাকিয়ে হরিশ ব'ললে, তোমার জন্যে দাসী আনতে যাচ্ছি মা!

সবাই হাঁপ ছেড়ে বাঁচলে। যাক, দাদার ধমকে তবু ছেলের সুমতি হ'য়েছে। আশ্চয্যি ছেলে বটে! বৌকে দাসী বলতে এত আপত্তি! ছেলেকে ইংরিজি পড়ানোর মজা এবার বুঝুক হরিশের মা!

এতক্ষণে রুক্মিণীর মুখে হাসি ফুটেছে। আঁচল দিয়ে চট্ ক'রে চোখের কোণ মুছে নিয়ে এয়োদের উদ্দেশ্যে তিনি চেঁচিয়ে বললেন, তোমরা বাপু ওকে নিয়ে এত দিগ্‌দারি কচ্চ কেন, বলো দিকি? বাছা আমার আর কখনো বে' কত্তে গেচে যে এইসব মেয়েলি নিয়ম জানবে? নাও দিকি, আর হাসাহাসি ক'রো না। এবার দুগ্গা দুগ্গা ব'লে শুভকম্মে যাত্রা কত্তে দাও!

যাত্রামঙ্গল প'ড়ে রওনা হ'ল হরিশ।

জোয়ারের জলে আদিগঙ্গা তখন কানায় কানায় টইটম্বুর। জলের বুকে ছলাৎ ছলাৎ শব্দ তুলে তর্‌তর্ ক'রে হাল্‌কা পান্‌সি এগিয়ে চললো গঙ্গার দিকে। সর্দার মাঝি একগাল হেসে হরিশের দিকে তাকিয়ে ব'ললে, একটুক সবুর করো ঠাউর! এইটুক পথ পেরিয়ে একবার বড় গাঙে গে' পড়তে পাল্লে হয়! এই জোয়ারের টানেই নৌকো ত্যাখন মনপবনে ছুটতে নাগবে উজোনপানে। কোনো চিন্তে নাই, সুয্যি ডোবার আগেই তোমার শউরবাড়ির ঘাটলায় পোঁচে দেবো! —ওরে, তোরা আর একটুক্ জলদি জলদি দাঁড় টান্‌রে সুমুন্দিরা। দেকচিস নি, দেরি হয়ে যাচ্চে ব'লে দাঠাউরের অধৈয্যি নাগচে?

লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠলো হরিশের মুখ।

বরকর্তা বীরেশ্বর আর দেবনারায়ণ হাসি চেপে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। আনন্দও কোনোমতে হাসি চেপে নিলে। হারাণ ফিক্ ফিক্ ক'রে হাসতে লাগলো।

গঙ্গার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বার পরেই নৌকো সত্যিই তর্‌তর্ ক'রে এগিয়ে চললো উত্তরদিকে। ভরা জোয়ারের বেগে আপনা আপনিই যেন ভেসে চ'লেছে।

এইবার হরিশের বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করতে লাগলো।

সহপাঠীদের ভেতর রামনারায়ণ, যদুগোপাল আর কালাচাঁদের বিয়ে হ'য়ে গেছে। বিয়ের রাতে মেয়েদের হাতে নাকাল হওয়ার অভিজ্ঞতা তাদের তিনজনেরই আছে। কারো কিছু বেশি, কারো কম। সবচেয়ে করুণ অভিজ্ঞতা যদুগোপালের। সেইজন্যেই সে যতখানি সম্ভব বুঝিয়ে পড়িয়ে দিয়েছে হরিশকে।

—পই পই ক'রে বলচি হরিশ, খুব সতর্ক থাকবি! যে যাই বলুক, নিজে কিন্তু বুদ্ধি খাটিয়ে চলবি! হয়ত ধর, খেতে বসবার সময় যে-পিঁড়ে পেতে দিয়েছে, তার নিচে রেখে দিয়েচে কয়েকটা গোটা সুপুরি। যেই ব'সতে গেলি অমনি পিঁড়ে গেল হড়কে আর সঙ্গে সঙ্গে চিৎপটাং। কিম্বা ধর্, চূড়ো ক'রে ভাত সাজিয়ে দিয়েচে থালায়। ভাতের চূড়োর ভেতর যে একটা গোবর-ভরা বাটি লুকিয়ে রেখেচে, সেটা তো আর তুই জানিস নে? তাহ'লে কী করবি? আগেই আঙুলের খোঁচা মেরে ভেতরটা ঠাহর ক'রে নিবি, বুঝলি? আমাকে শরবৎ খেতে দিয়েছিল। তার ভেতর কী মেশানো ছিল জানিস? পো'টাক ধানী লঙ্কা বাটা, উঃ!

হরিশকে সর্বদিক থেকে সাবধান ক'রে দিয়ে সবশেষে নিতান্ত গোপনে মনের একটা খেদও জানিয়েছে যদুগোপাল। একপাল মেয়ে সারারাত বাসর জাগবে কেন? নিজের বে'করা বৌয়ের সঙ্গে প্রথম মিলনের রাতে একটা 'লভ'-এর কথাও বলতে দেবে না? হিন্দু সমাজের এই প্রথাটা খুবই নিষ্ঠুর। এটায় তার ঘোরতর আপত্তি আছে।

দুঃখ ক'রে যদুগোপাল ব'ললে, ভেবে দ্যাখ্ তো হরিশ, জীবনে এই যে অমূল্য রাতটা এইভাবে নষ্ট হ'য়ে গেল, এটা কি আর কোনোদিন ফিরে আসবে? তোর বে' মিটে যাক, তারপর আমি ইংলিশম্যানে চিঠি লিখে হিন্দু বাসর সিস্টেমের এই নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে এজিটেশন আরম্ভ ক'রবো ভাবচি।

হরিশ হেসে ফেললে।

রেগে গিয়ে ভেংচি কেটে যদুগোপাল ব'ললে, হাসি বেরিয়ে যাবে চাঁদ! ঠিক আছে, দাগা খেয়ে আয়, তারপর আমার সঙ্গে তুইও যদি এই সোশ্যাল রিফর্মে হাত না মেলাস তো আমার নাম যদুগোপালই নয়!

—ওতোরপাড়ার ঘাট দেকা যাচ্চে দাঠাউর!—বীরেশ্বরের উদ্দেশ্যে ব'ললে সর্দার মাঝি। তারপর হরিশের দিকে তাকিয়ে একগাল হেসে বললে, কতা রেকেচি কিনা, দ্যাকো দাঠাউর। ওই যে সুয্যি একনও ডোবেনি!

হরিশের অবস্থা তখন নিতান্তই করুণ। বুকের ভেতরের ঢিপ্ঢিপ্ শব্দ যেন নিজের কানেই শোনা যাচ্ছে। কে জানে, বালী-উত্তরপাড়ার মেয়েরা আবার কোন্ নতুন নতুন ফন্দিফিকিরে তাকে নাকাল করবার ব্যবস্থা ক'রে রেখেছে!

যদুগোপালের সতর্কবাণীগুলো সে যথাসম্ভব মনে মনে ঝালিয়ে নিতে লাগলো।

॥ নয় ॥

এ-যাবৎ ইতিহাসে কত রাজ্যজয়ের কাহিনী প'ড়েছে হরিশ।

জয়ের আনন্দ বিজয়ীর মনে যে কিরকম আলোড়ন তোলে, তার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ লেখা থাকে না ইতিহাসের পৃষ্ঠায়। কিন্তু এবার যেন তার স্বরূপ হরিশ কিছুটা বুঝতে পারছে!

এ-ও তো এক রাজ্যজয়ের আনন্দ!

কিম্বা তার চেয়েও বেশি, তার চেয়েও সুন্দর। রাজ্যজয়ের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে কত অশ্রু, কত হতাশ্বাস, কত রক্তপাতের কাহিনী। কিন্তু এ-জয়ে সে-বেদনার চিহ্নমাত্র নেই। বরঞ্চ, যাকে জয় ক'রে আনা হয়েছে, তার মুখেও আনন্দের ঝিলিক। ক'নে বিদায়ের সময় একটু কান্নাকাটি

হয় বটে, কিন্তু সেতো সাময়িক ব্যাপার। বাড়ির মেয়ে পরের ঘরে চ'লে গেলে কার না দুঃখ হয়? নিজের বাড়িঘর, আত্মীয়-স্বজনকে ছেড়ে চ'লে আসতে কার না চোখে জল আসে?

সব ব্যাপারটাই কেমন যেন এক আকস্মিক স্বপ্নের মতো!

হঠাৎ এক রাতে মন্ত্র পড়া আর মালা-বদলের পরেই কোথাকার কোন্ একটা অজানা অচেনা মেয়ে হ'য়ে গেল হরিশের বৌ! তার সঙ্গে সারাজীবন কাটাবে ব'লে নিজের বাড়ি ছেড়ে কিনা এ-বাড়িতে চ'লে এলো—এ কি কম কথা? হরিশকে সে 'ওগো' বলে ডাকবে—হরিশকে সে ভালোবাসবে!

শুভদৃষ্টি—মালাবদল—সম্প্রদান—সপ্তপদী—লাজাঞ্জলি.........

যেন একটার পর একটা স্বপ্ন রূপকথার রাজ্য থেকে ভেসে এসে হরিশের সদ্য তারুণ্যের ছোঁয়া-লাগা মনের স্বচ্ছ শরৎ-আকাশে সেদিন একটার পর একটা বিহ্বল আবিষ্ট মুহূর্তের স্বপ্ন-মেঘের মালা গেঁথে দিয়ে যাচ্ছিল! একটা বিচিত্র সুন্দর অনুভূতি!

বিয়ের পর কয়েকটা মাস কেটে গেছে। কিন্তু হরিশের মনের আকাশে সেই স্বপ্ন-মেঘের মালা এখনো যেন ভেসেই চ'লেছে। এ তো শুধু সময় কেটে যাওয়া নয়; এ যেন রূপকথার সেই ক্ষীরসাগরের ওপর দিয়ে মনপবনের দাঁড় বেয়ে হিজলকাঠের নায়ে চ'ড়ে রূপবতী কন্যার দেশে এগিয়ে চলার মতো! এতদিন কাব্যে আর নাটকে নায়ক-নায়িকার প্রেমের কাহিনী প'ড়েছে হরিশ। নিজের জীবনে একটি জীবন্ত নায়িকা এই তো প্রথম!

চলতি কথায় লোকে বলে পরিবার কিম্বা মাগ। শুদ্ধ ভাষায় ভার্যা, সহধর্মিনী কিম্বা অর্ধাঙ্গিনী। এ সবগুলোর চেয়ে 'বৌ' শব্দটা অনেক মিষ্টি। কাব্যের ব্যঞ্জনা তাতে সবচেয়ে বেশি। উত্তরপাড়া থেকে জয় ক'রে নিয়ে আসা তার বৌ দেখতে কত সুন্দর! কেমন টানা টানা ডাগর চোখ, কেমন ফোলা ফোলা গাল। রঙটা নাকি তেমন ফরসা নয়। পাড়াপড়শিরা কানাকানি করে, হরিশ অমন ফর্সা টুকটুকে ছেলে, তার কপালে জুটলো কিনা একটা কেলে বৌ? অথচ, গোরা সায়েবেরা যখন কালো ব'লে এ-দেশের মানুষকে ঘেন্নার চোখে দেখে, তা নিয়ে কত কথা! আপনমনেই ভাবে হরিশ, কি অদ্ভুত জাত আমরা! গায়ের রঙ নিয়ে নিজেরাই নিজেদের ছোটো করি। নিজেরা কালো, নজর কিন্তু সবসময় ধলার দিকে!

বৌ কালো না ফর্সা, তা দিয়ে কিছুই এসে যায় না হরিশের। দুষ্টু দুষ্টু চোখে মুখ টিপে হেসে মোক্ষদা যখন তাকায় তখন কি সুন্দর যে দেখায় তাকে! আবার, কোনো হাসির কথা শুনলেই যখন খিল্‌খিল্ ক'রে হেসে লুটিয়ে পড়ে তখন হরিশের মনে হয়, রূপকথার বর্ণনা একটুও মিথ্যে নয়। হাসিতে মুক্তো ঝরা বোধহয় একেই বলে। —আচ্ছা, ওফেলিয়া, জুলিয়েট, মিরান্দা কিম্বা দেসদিমোনা কি ওর চেয়েও সুন্দরী ছিল?

সদ্য উত্তীর্ণ কৈশোর আর নবলব্ধ তারুণ্যের সন্ধিকাল। আবিষ্ট চেতনার জগতে অজ্ঞাতপূর্ব একটা স্বপ্ন-স্বাদ! স্বপ্ন কেন, এ তো বাস্তব। উৎসারিত আবেগের বাঁধভাঙা বন্যার ঢেউয়ে ভেসে সম্পূর্ণ অন্য একটা জগতের আবিষ্কার!

সদ্য বিয়ের পর প্রথমদিকে কিছুদিন স্কুলের ক্লাশে ব'সে পড়া শুনতে শুনতে খুবই অন্যমনস্ক হ'য়ে যেতো হরিশ। চোখের সামনে বারবার ভেসে উঠতো মোক্ষদার ঢল্‌ঢলে মুখখানি। সেই অন্যমনস্কতার জন্যে বন্ধুবান্ধবদের অনেক টিট্‌কারিই তার কপালে জুটেছে। ব্যতিক্রম শুধু কালাচাঁদ। সে যে হরিশের চেয়ে বয়সে কিছু বড়ো এবং সেই সুবাদে হরিশের সহধর্মিণী তার ভাদ্রবধূ—এ ব্যাপারটার ওপর কালাচাঁদ যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে। সহপাঠীদের ঠাট্টা তামাশার হাত থেকে হরিশকে সে সব সময়েই বাঁচানোর চেষ্টা ক'রে। আড়ালে ডেকে ভারিক্কি চালে বলে, আর তো সময় দেওয়া যাবে না হরিশ, এবার মনের রাশটা টেনে ধ'রতে হবে! আরে বাপু, ওয়াইফ

তো পালিয়ে যাচ্ছে না? রোজই তো দেখ্চিস। আর সময় নষ্ট না ক'রে এবার পড়াশোনায় মন দে—

অন্যমনস্কতা অবশ্য বেশ কিছুদিন আগেই কাটিয়ে উঠেছে হরিশ। হিন্দু কলেজের সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষাও ক'দিন আগে দেওয়া হ'য়ে গেছে। যথাসম্ভব ভালো উত্তর-ই লিখেছে। বিশেষত, ইংরিজি রচনা যে এত ভালো হবে, তা সে নিজেও আগে ভাবতে পারেনি। ইউনিয়ন স্কুল থেকে মোট পাঁচটি ছেলে পরীক্ষায় ব'সেছিল। আর কেউ স্কলারশিপ পাক বা না পাক, হরিশ যে পাবেই, এ-সম্বন্ধে শিক্ষকেরাও নিশ্চিন্ত।

পরীক্ষার পর মোক্ষদা একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, এই পরীক্ষা দিলে কী হয় গো?

মুচ্‌কি হেসে হরিশ উত্তর দিয়েছিল, বৌয়ের কাছে একশো আটটা চুমু পাওনা হয়।

ফিক্‌ ক'রে হেসে মোক্ষদা ব'ললে, অসভ্য দত্যি কোথাকার!

আবার সেই মুক্তো-ঝরা হাসি।

ফুলশয্যার রাতের কথা হরিশ বোধহয় জীবনেও ভুলতে পারবে না। সত্যি, কি বোকা-ই না ছিল তার বৌ!

রাত তখন বেশ হয়েছে। ফুল-ছড়ানো বিছানায় একা ব'সে আছে হরিশ। নতুন বৌকে নিয়ে এয়োরা আসবে।

দেওয়ানি আদালতের পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে এগারোটা বাজার শব্দ ভেসে এলো। তার একটু পরেই সাজিয়ে গুছিয়ে নতুন বৌকে নিয়ে ঘরে ঢুকলে এয়োর দল। কিছুক্ষণ রঙ্গ-রসিকতার পর বৌঠান ব'ললে, এবার সবাই চলো ভাই, আমার ঠাকুরপোর আর তর্‌ সইচে না!

লজ্জায় হরিশ মুখ নিচু ক'রলে।

সেই অবস্থাতেই হরিশের চিবুক ধ'রে নাড়া দিয়ে বড়ো বৌ ব'ললে, নাও গো, আর ঢং কত্তে হবে না, তোমার সম্পত্তি বুঝে নাও বাপু। সারাজেবনের তরে মৌচাক জমা রইলো। দেখো, আজ ফুলশয্যের রাতেই সবটুকু মধু নুটেপুটে নিয়ে এমন ডাগর মৌচাকটাকে আবার ঝাঁজরা ক'রে দিয়ো না যেন!

সবাই খিল্‌ খিল্‌ ক'রে হেসে উঠলো।

দরজার কপাট দুটো বাইরে থেকে টেনে দিতে দিতে বড়োবৌ মুচকি হেসে ব'ললে, নাও ভাই, এবারে দোরের হুড়কো এ'টে দিয়ে মনের হুড়কো খুলে দাও—

লজ্জায় কিছুক্ষণ জায়গা থেকে উঠতেই পারেনি হরিশ। বন্ধুরা ব'লে দিয়েছিল, মেয়েরা চ'লে যাওয়ার ছল ক'রলেও তখুনি কিন্তু চ'লে যাবে না। আড়ি পেতে থাকবে আনাচে-কানাচে। খুব সাবধান!

কিছুক্ষণ কেটে গেল।

হঠাৎ বাইরে থেকে বৌঠানের বিরক্ত চাপাগলার স্বর শোনা গেল, বাবাগো বাবা, এমন স্যায়না ছেলে আর দেখিনি বাপু! নে বাপু, চল্‌ সবাই। কোনো আশা নেই—

আরো কিছুক্ষণ পরে মেয়েরা সত্যি সত্যি চ'লে গেছে বুঝতে পেরে আস্তে আস্তে উঠে দরজার হুড়কো বন্ধ ক'রে দিলে হরিশ। আড়চোখে তাকালে একবার মোক্ষদার দিকে। বুটিদার ঢাকাই শাড়ির মোড়কে একটা পুঁটুলির মতো একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা। যেন একটা পুতুল।

কি সুন্দর দেখাচ্ছে জ্যান্ত পুতুলটাকে! পিদিমের আলোয় নাকছবিটা চিক্‌চিক্‌ করছে। হাতের লাল শাঁখা কেমন টুক্‌টুকে! গয়নাগাটি কিছুই দিতে পারেননি শ্বশুরমশাই। তাঁরাও যে গরীব। কী হবে গয়না দিয়ে? এইতো ভালো।

কিন্তু এখন কী ব'লে নায়িকাকে সে সম্বোধন করবে? যদুগোপাল আর রামনারায়ণ দু'জনেই একমত হ'য়ে তাকে ব'লে দিয়েছে, প্রথম সম্ভাষণের দায়িত্ব কিন্তু হাজব্যাণ্ডের।

রামনারায়ণ ব'লেছে কথায় বলে, মেয়েদের বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না। তোর ওয়াইফ কিন্তু নিজে যেচে তোর সঙ্গে কথা ব'লবে না। তোকেই আগে কথা বলে ওয়াইফের আড় ভাঙাতে হবে তা খেয়াল রাখিস!

তারা তো উপদেশ দিয়েই খালাশ। কিন্তু হরিশ এখন কি ক'রবে? হ্যামলেট-ওফেলিয়া, রোমিও-জুলিয়েট, ফার্দিনান্দ-মিরান্দা—সব নায়ক-নায়িকার প্রণয়-সংলাপগুলো মিলে-মিশে জট পাকিয়ে কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে মাথার ভেতর।—আচ্ছা, নির্জনদ্বীপে বনদেবীর মতো মিরান্দাকে দেখে ফার্দিনান্দ প্রথম কথাটা কী বলেছিল?

ফার্দিনান্দের সংলাপ মনে করবার আপ্রাণ চেষ্টায় হরিশ যখন গলদ্ঘর্ম সেই সময় তাকে হতবাক্ ক'রে দিয়ে মোক্ষদা-ই পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো। গলায় আঁচল দিয়ে সে ঢিপ্ ক'রে একটা প্রণাম ক'রলে হরিশকে।

—একি! পেন্নাম কেন? নায়িকার সঙ্গে এই কথাটুকুই সেদিন হরিশের প্রথম প্রণয়-সংলাপ।

খুব মৃদুস্বরে মোক্ষদা ব'ললে, পেন্নাম কত্তে হয়!

—কেন?

—মা ব'লে দিয়েচে, ফুলশয্যের রেতে সোয়ামিকে সবচেয়ে আগে পেন্নাম করবি। সোয়ামি হল মেয়েদের সবচেয়ে বড়ো গুরুজন।

কি মিষ্টি গলা তার বৌয়ের! হরিশের কানে তার কথাগুলো যেন জলতরঙ্গের সুরের মতো লাগলো।

প্রণাম ব্যাপারটা হরিশের কাছে আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত। কিন্তু সে যে এরই ভেতর কারো প্রণাম পাওয়ার মতো গুরুত্ব অর্জন ক'রে ফেলেছে, সেটা ভাবতে বেশ ভালোই লাগলো। এই মেয়েটার কাছে সে তাহ'লে এখন থেকে সবচেয়ে বড়ো গুরুজন?

এখন থেকে এই গোলগাল ছোট মেয়েটা তাকে প্রণাম ক'রবে, তার স্কুল থেকে ফেরার সময় হ'য়ে এলে চঞ্চল চোখে বারবার পথের দিকে তাকাবে, রাতে তারই পাশে শুয়ে ঘুমোবে, তার মঙ্গলকামনায় সিঁদুরের রেখা এঁকে লাল টুক্টুকে ক'রে রাখবে নিজের সিঁথির সীমন্ত!

কি রোমাঞ্চকর অনুভূতির স্বাদ!

তন্ময়ভাবে কতক্ষণ কেটে গেছে হরিশের তা খেয়াল নেই। হঠাৎ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ শুনে সে চম্‌কে উঠলো।

এ কি, নতুন বৌ কাঁদছে যে!

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে আর মুখে আঁচল চাপা দিয়ে প্রাণপণে কান্নার শব্দ চাপা দেওয়ার চেষ্টা ক'রছে।

কী হ'ল, কিছুই বুঝতে পারছে না হরিশ। বিয়ের রাতে ব'লতে গেলে বৌয়ের মুখখানাই ভালো ক'রে দেখা হয়নি। আগের দিন ছিল কালরাত্রি। বর-বৌকে সে রাতে এক জায়গায় থাকতে নেই। তাই মায়ের কাছে শুয়েছে বৌ। আজই বৌয়ের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের রোমাঞ্চ আর আজই তার চোখে জল?

হতভম্বের মতো কিছুক্ষণ মোক্ষদার দিকে তাকিয়ে রইলো হরিশ। তারপর আম্‌তা আম্‌তা ক'রে ব'ললে, কী হয়েচে, কাঁদচো কেন? মায়ের জন্যে মন কেমন ক'রচে?

ফুলে ফুলে কাঁদতে কাঁদতেই মাথা নেড়ে মোক্ষদা জানালে, না।

—তা'হলে? কী হ'য়েচে ব'লবে তো?

এইবার মোক্ষদা একটুখানি মুখ তুলে তাকালে। পিদিমের অল্প আলোতেও দেখা গেল, তার ফোলা ফোলা দু'গাল বেয়ে চোখের জলের ধারা নামছে আর নামছে।

শেক্‌স্‌পিয়র-পড়া চৌদ্দ বছর বয়সের নায়ক বিব্রতভাবে এবার নায়িকার একখানি হাত ধ'রে করুণ অনুনয়ের সুরে ব'ললে, শোনো ফুলশয্যের রাতে চোখের জল ফেলতে নেই।

কান্নাভেজা গলায় নায়িকা বললে, তা আমি জানি।

—তাহ'লে কাঁদচো কেন?

আরো ফুঁপিয়ে উঠে ভাঙা গলায় মোক্ষদা ব'ললে, আমি বুঝতে পেরেচি আমাকে তোমার পছন্দ হয়নিকো!

কি আশ্চর্য কথা! তার যে কত বেশি পছন্দ হ'য়েচে, কেমন ক'বে তা বোঝাবে হরিশ? এই রকম পরিস্থিতিতে নায়ক কী বলবে, কী করবে, শেক্‌স্‌পিয়র তা কিছু লিখে যাননি। লিখলেও হরিশের তা জানা নেই। অগত্যা নিজের বুদ্ধি-বিবেচনাই তাকে প্রয়োগ ক'রতে হ'ল।

এক ফুঁয়ে পিদিমটা নিবিয়ে দিলে হরিশ। তারপরই ক্রন্দনরতা নায়িকাকে পাঁজাকোলা ক'রে তুলে নিলে। তার জলে-ভেজা গালের ওপর এলোপাথাড়ি আট-দশটা চুমু খেয়ে বললে, পছন্দ হ'য়েচে কিনা এবার বুঝতে পারচো?

নায়িকার অবস্থা তখন সঙ্গীন। সমস্ত ব্যাপারটার আকস্মিকতায় তার ছোট্ট তুলতুলে কিশোরী দেহটা লজ্জায়, ভয়ে একেবারে কাঠ! আর সেই সঙ্গে বিবশ-করা এক বিহ্বল অনুভূতি। জরির ফিতে-বাঁধা, কাঁকই-গোঁজা খোঁপাটা আলুথালু হ'য়ে প'ড়েছে, বুকের ওপর থেকে শাড়ির আবরণ গেছে শিথিল হ'য়ে। সেই অবস্থায় হাতের বাঁধন থেকে মুক্ত ক'রে তাকে বিছানার ওপর বসিয়ে দিয়েছে নায়ক।

নায়িকা বিবশ, বিহ্বল!

এ কিসের অনুভূতি? যেন বসন্তের এক ঝলক দম্‌কা হাওয়া ক্ষ্যাপার মতো হঠাৎ কোথা থেকে ছুটে এসে তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত সর্বাঙ্গের ওপর দিয়ে দস্যি দামালের মতো লুটোপুটি ক'রতে লাগলো। এমন যে হয় তা তো কখনো জানতো না।

তবু লজ্জায় আড়ষ্ট হ'য়ে গেল নায়িকা।—ছি ছি ছি, কোনো বেটাছেলে কোনো মেয়েকে এইভাবে চুমু খায়? হোক না সোয়ামি, তাই ব'লে এত অসভ্য হবে?

কি দস্যি বেটাছেলে, মা গো!

দিদি অবিশ্যি কানে কানে বলে দিয়েছিল, দেখিস, একটু ভাব-সাব হ'য়ে যাওয়ার পর ভাতার কিন্তু জাপটে ধ'রে সোয়াগ ক'রবে। তাতে যেন আবার ভয় পেয়ে যাস্‌নি বোকা মেয়ে! সোয়ামি যেমন ধারায় সোয়াগ কত্তে চায়, তাতেই সাড়া দিবি। লজ্জা কী? আঁধার ঘর, তুই আর তোর সোয়ামি ছাড়া আর তো কেউ সেঘরে নেই? বুঝলি তো?

ঘাড় নেড়ে মোক্ষদা ব'লেছিল, হুঁ।

রওনা হ'য়ে আসার আগেও দিদি বারবার পাখি পড়া ক'রে বুঝিয়ে দিয়েছে।—জানিস তো, আমাদের কুলীন ঘর। কুলীনের মিনসেরা একটা ছেড়ে একশোটা বে' কত্তে পারে। খুব সাবধান রে মুখী! পেথ্‌থম দফাতেই সোয়ামিকে এমনধারা বশ ক'রে ফেলবি যেন আর কোনো মাগীর পানে কক্‌খনো তার নজর না যায়। যা চায় তাই দিবি—যা বলে তাই শুনবি। তারপর দেখিস, দান উল্টে গেছে। তুই যা বলচিস তাই শুনচে, তুই যা করাচ্চিস তাই কচ্চে। নিজের সাথ্‌থো নিজেই দেখতে হয়, আর কেউ দ্যাখে না। মনে থাকবে তো?

তাতেও মোক্ষদা ঘাড় নেড়ে ব'লেছিল, হুঁ।

ওমা, তাই ব'লে এইভাবে কেউ সোহাগ করে? ওইভাবে জাপটে ধ'রে তার গালে অতগুলো চুমু খাবে? মা গো মা, সোয়ামি কেমনধারা মানুষ গা? মানুষ না অসুর?

স্বামী মানুষই হোক আর অসুরই হোক, মোক্ষদার চোখের জল কিন্তু ততক্ষণে শুকিয়ে গেছে। কিশোরীদেহটা কেমন এক বিহ্বল আবেশে দিশেহারা।

ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে হরিশ ব'ললে, আর চোখের জল ফেলবে না তো?

বিবশ কণ্ঠে আরো ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে মোক্ষদা ব'ললে, ধ্যেৎ! তুমি ভারী অসভ্য। তোমাকে আমার ভয় কচ্ছে।

—ভয়? হাসতে হাসতে হরিশ এবার কিশোরী নায়িকাকে আরো নিবিড় ক'রে বুকের ভেতর টেনে নিলে।

এখন এই ক'মাস পরে সে-রাতের কথা মনে পড়লেই হাসি পায়।

যে মোক্ষদা সেইদিন গাল ফুলিয়ে ব'লেছিল, তোমাকে আমার ভয় ক'রছে, সেই মোক্ষদাই এখন হরিশের গলা না জড়িয়ে ধ'রে ঘুমোতে পারে না। এমন কি, হরিশ কোনোদিন একটু স'রে শুলেও তার মান হয়। তখন গাল ফুলিয়ে বিছানার একেবারে আর এক প্রান্তে গিয়ে জড়োসড়ো হ'য়ে পাশ ফিরে শুয়ে থাকে। কত রকম সাধ্যসাধনা ক'রে তখন তার মান ভাঙাতে হয়! মান যখন ভাঙে, তখন আবার এ-পাশ ফিরে এমন নিবিড়ভাবে হরিশকে জড়িয়ে ধ'রে যে তার প্রায় দম বন্ধ হওয়ার দাখিল।

মোক্ষদাকে হরিশ তার নিজস্ব একটা আদরের নাম দিয়েছে—ওফেলিয়া।

শেক্‌স্‌পিয়রের এই নারী-চরিত্রটাকে হরিশের সবচেয়ে ভাল লাগে। সেই শুভ্র, নিষ্পাপ ফুলের মতো প্রেমিকা চরিত্রটি হরিশের কিশোর মনের ওপর সবচেয়ে দাগ কেটেছে। নিজের প্রেয়সীর জন্যে ওফেলিয়া নামটা সেইজন্যেই সে ধার ক'রেছে শেক্‌স্‌পিয়রের নাটক থেকে। ভাগ্যিস শেক্‌স্‌পিয়র হ্যামলেট নাটকখানা লিখে রেখে গেছেন। নইলে এমন মিষ্টি নামটা হরিশ পেতো কোথায়?

নিজস্ব একটা গোপন আদরের নাম পেয়ে মোক্ষদা ভারী খুশি। হরিশের গলা জড়িয়ে ধ'রে চুম্বনে চুম্বনে তার ওষ্ঠ ভরিয়ে দিয়ে আবেগে আপ্লুত স্বরে সে ব'লেছে, হ্যাঁ, তোমার দেওয়া নামেই তুমি ডাকবে আমাকে!

মোক্ষদার মুখখানা বুকে চেপে ধ'রে গভীর আবেশে হরিশও ব'লেছিল, সেইজন্যেই তো আমার সবচেয়ে প্রিয় নামটা তোমায় দিয়েচি।

—তোমার দেওয়া নামটা আমার খুব পছন্দ হ'য়েচে গো! ভাগ্যিস তুমি এত ইংরিজি প'ড়েচিলে। ন'ইলে এমন সুন্দর একটা মেমসায়েবের নাম আমি কোথায় পেতুম? আমায় কিন্তু একদিন ওই মেয়েটার গপ্পো বলবে, কেমন?

—নিশ্চয়ই। শেক্‌স্‌পিয়রের সব গল্পগুলোই তোমাকে বলবো। তোমার লেখাপড়া শিখতে সাধ হয়?

—হুঁ। কিন্তু সবাই বলে, মেয়েদের নাকি ও-সব ক'রতে নেই?

—কে ব'লেচে? তোমার মতে, আমি তো এখন তোমার সবচেয়ে বড়ো গুরুজন। আমি ব'লচি, দোষ নয় বরঞ্চ গুণ। আমি তোমায় শেখাবো।

আমি কিন্তু ইংরিজি শিখতে পারবো না।

—দরকার নেই। তুমি বাঙলাই শিখবে।

—খু-উ-ব গোপনে কিন্তু! কেউ যেন জানতে না পারে!

—তাই হবে।

আবার লোকাচারের পালা।

বিয়ের প্রথম বছর ভাদ্র, পৌষ আর চৈত্রমাসে নতুন বৌকে শ্বশুরবাড়িতে থাকতে নেই। তাই অঘ্রাণের শেষের দিকেই মেয়েকে নিয়ে গেলেন গোবিন্দ চাটুজ্যে। যাওযার সময় মোক্ষদার মুখে একদিকে যেমন হাসি, অন্যদিকে তেমনি চোখের পাতা ভিজে আসছে। এক মাসের ওপর ছাড়াছাড়ি হ'য়ে কাটাতে হবে!

মোক্ষদা উত্তরপাড়ায় চ'লে যাওয়ার পর সব কিছুই যেন বিস্বাদ লাগছিল হরিশের। তার ওপর আবার একটা অপ্রত্যাশিত আঘাত।

হিন্দু কলেজের সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। পাশ ক'রেছে দু'জন মাত্র—কুঞ্জবিহারী আর জগদানন্দ। হরিশ পাশ ক'রতে পারেনি।

হরিশের চেয়ে অনেক কম মেধাবী দু'টি ছেলে পাশ ক'রে গেল অথচ হরিশ হ'ল অকৃতকার্য—এ-সংবাদে ইউনিয়ন স্কুলের শিক্ষকেরা তো বটেই, রেভারেণ্ড পিফার্ড পর্যন্ত হতবাক্। অনেকের কাছেই তিনি বেশ জোর দিয়ে ব'লেছেন, ইংল্যাণ্ডের যে-কোনো নামজাদা পাবলিক স্কুলের সেরা ছাত্রের সঙ্গে ইংরিজি ভাষা-সাহিত্য নিয়ে সমানে প্রতিযোগিতা করবার যোগ্যতা আমার হরিশের আছে ব'লেই আমি বিশ্বাস করি।

সেই হরিশ হিন্দু কলেজের প্রতিযোগিতায় অনুত্তীর্ণ এ-কথা তিনি যেন বিশ্বাস ক'রতেই পারছিলেন না।

খবরটা শোনার পর হরিশের মন কিছুক্ষণের জন্যে যেন অসাড় হ'য়ে গিয়েছিল। যে পরীক্ষা সে এত ভালো দিয়েছে, সেই পরীক্ষায় তার এই ফল?

স্কুল-ফেরতাপথে কালাচাঁদ ব'ললে, দ্যাখ- হরিশ, হিন্দু কালেজে পড়তে গেলে মগজের জোর থাকলেই হয় না রে, মুরুব্বির জোর-ও থাকা চাই! তোর বাপের কি তিনমহলা বাড়ি আছে? জুড়ি গাড়ি আছে? টাউন কলকাতায় নামজাদা বাবুদের সঙ্গে দহরম-মহরম আছে? কিন্তু কুঞ্জ বল্, জগ্দা বল্—দু'জনারই ওই আসল জোরটা আছে, বুঝলি?

কোনো কথাই হরিশের তখন ভালো লাগছিল না। কিছুটা যেন আপনমনেই সে ব'ললে, কি জানি, আমার পরীক্ষা সত্যিই হয় তো ভালো হয়নি।

কালাচাঁদ ফোঁস ক'রে উঠলে, রাখ দিকি! তোর লেখা ভালো হয়নি আর যত ভালো হ'য়েচে ওই দু'টো হাফ-গাধার? দ্যাখ্ হরিশ, আমি নিজে ভালো ছাত্তর নই, সেকথা আমি নিজেই জানি। কিন্তু তাই ব'লে, ভালো-মন্দ চেনার ক্ষ্যামতা আমার নেই, সে-কথা ভাবিসনে! ওরা দু'জন তোর চেয়ে ভালো ইংরিজি লিকেচে একথা আমাকে বিশ্বাস কত্তে হবে? এই তোকে ব'লে রাখচি, ওরা দু'জন যদি মুরুব্বির জোরে বেরিয়ে না গিয়ে থাকে তো আমার এই কানদু'টো কেটে আদিগঙ্গায় ভাসিয়ে দেবো!

কালাচাঁদ যত যাই বলুক, হরিশের মন তাতে প্রবোধ মানেনি। বেশ কয়েকটা দিন রীতিমতো উদ্‌ভ্রান্তভাবে কেটেছে তার। জলপানি না হয় না-ই দিক, গরীবের ছেলে ব'লে ভর্তি ক'রতে না চায় না করুক, কিন্তু সে কি এতই খারাপ পরীক্ষা দিয়েছে যে পাশ করবার যোগ্য ব'লেই গণ্য হ'ল না?

এই সময়টা মোক্ষদা এখানে না থাকায় ভালোই হ'য়েছে। হরিশের বিপর্যস্ত, উদ্‌ভ্রান্ত এই চেহারা দেখলে সে-বেচারা হয়তো কেঁদেই ফেলতো।

প্রায় পাগলের মতোই দিন কাটতে লাগলো হরিশের। দিনরাত মনের ভেতর ওই একই চিন্তা—সে অকৃতকার্য হয়েছে!

কুঞ্জ আর জগদানন্দের বাড়ির অবস্থা ভালো। কুঞ্জর বাবার বিরাট ব্যবসা আর জগদানন্দের বাবা বেনিয়ান। দিশি বাবুমহল, কোম্পানির সাহেবমহল—দু'দিকেই নাকি তাঁদের যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি। বেশ তো, ওদের দু'জনকে হিন্দু কালেজের কর্তারা ভর্তি করতে চান করুন, কিন্তু হরিশকে ডেকে তাঁরা এইটুকু অন্তত ব'লতে পারতেন যে, পরীক্ষায় তুমি ভালোভাবেই উত্তীর্ণ হ'য়েছ কিন্তু গরীবের ছেলে ব'লে তোমাকে আমরা হিন্দু কালেজে নিতে পারচি নে।

তাতেও একটা সান্ত্বনা থাকতো। কিন্তু এ কী হ'ল?

হরিশের হাব-ভাব দেখে রুক্মিণী রীতিমতো ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। তিনি ধ'রেই নিলেন,

ছোটোবৌমা বাপের বাড়ি যাওয়ায় এই বিপত্তি। বড়বৌও শাশুড়ির সেই সিদ্ধান্তে সায় দিয়েছে। কিন্তু প্রচলিত অভ্যেসে দেওরের সঙ্গে মশ্‌করা ক'রতে গিয়ে সে চ'মকে গেছে।

—মা গো মা, তুমি দেখালে বটে ঠাকুরপো! একেবারে সতীহারা শিব! বলি, এ দুনিয়ায় আর কি কেউ কোনোদিন বে' করেনি? নাকি আর কারো বৌ বাপের বাড়ি যায় না?

—যা জানো না, তার ভেতর কথা ব্‌লতে এসো না বৌঠান!

হরিশের গলার স্বরে আর চোখের চাউনিতে থতোমতো খেয়ে গেছে বড়োবৌ। ঠাকুরপো তো এভাবে কখনো কথা বলে না? তাহ্‌লে কী হ'ল? জটিল অন্য কিছু?

বড়োবৌ তারপর আর মশ্‌করা করতে যায়নি। তারও সম্মানে লেগেছে। দরকার কী ঠাট্টা-মশ্‌করার? যে যার নিজের মতো থাকাই ভালো।

কয়েকদিন পর থেকে অবশ্য হরিশের উদ্‌ভ্রান্ত ভাবটা ক'মে এলো। বৌঠানের ওপর একদিন মুখ ক'রেছিল ব'লে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলে হরিশ। আবার ডুবে গেল পড়াশোনায়। ছেলেকে আবার স্বাভাবিক হ'তে দেখে নিশ্চিন্ত হ'লেন রুক্মিণী। বেয়াইকে তিনি আগেই খবর পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, মাঘ মাস পড়লেই তিনি যেন ছোটবৌমাকে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন। মাঘ মাসের চার তারিখে নিজেই এসে মেয়েকে পেঁৗছে দিয়ে গেলেন গোবিন্দ চাটুজ্যে।

সেদিন রাতে মোক্ষদার কথা আর ফুরোয় না!

—উঃ মাগো, এই এতগুলো দিন যে আমার কিভাবে কেটেছে, তা আমিই জানি আর ভগমান জানে! তোমার আর কী? নেকাপড়া নিয়েই তো মশগুল। হ্যাঁ গা, আমার কথা ভাবতে? আমার তরে কষ্ট হ'ত তোমার? রোজ ইস্কুল থেকে ফিরে জলখাবার খেয়েচো তো? আমার খোঁপার যে কাঁটা দু'টো হারিয়ে ফেলেছিলুম, সে দু'টো পেয়েচো? জানো, আমার দিদি আবার পোয়াতি হ'য়েচে। একজন গুণে ব'লেচে, এবার ছেলে হবে। আহা, তাই যেন হয়! দিদির তো তিনটেই মেয়ে। আমাদের ওতোরপাড়ার গঙ্গায় জেলেদের জালে একটা হাঙর ধরা প'ড়েচিল, জানো? আমি ভেবেচি, হাঙর দেখতে যেন কী না কী! ওমা, দেখলুম সে তো মাছেরই মতো গো! কি পেল্লায় চেহারা, মাগো! ওই যাঃ, আসল কথাটাইতো বলা হয়নি। আমার মা কী ব'লেচে, জানো? না বাপু, বলবো না। তোমার আবার দেমাকে তখন মাটিতে পা প'ড়বে না। যাকগে, ব'লেই ফেলি। মা ব'লেচে, শিবের মতো জামাই পেয়েচি আমি।—ইস্‌, শিব না কচু! একটা বেম্মদত্যি! কেমন শিব তা আমিই জানি বাপু।

—আর কিছুদিন তাহ'লে ওতোরপাড়ায় থেকে এলেই হ'ত। তাহ'লে বেম্মদত্যির হাত থেকে ছাড়া পেতে?

—উঁহুঁ, তা আমি পারবো না।

ফিক ক'রে হেসে হরিশের বুকের ভেতর মুখ গুঁজে দিলে মোক্ষদা।

—আবার তো চত্তির মাসে গে' থাকতে হবে?

—সে তখনকার কথা তখন। উঃ, মুনিঋষিরা কেন যে এইসব খেয়াল্কেলে নিয়ম কানুন বেঁধেচিল! তারা তো আর বে' করেনি?

—দু'চারজন ছাড়া সব মুনিঋষিরাই বে' করেচিলেন।

—তবে এই কষ্টের নিয়মটা কল্লেন কেন?

—যিনি ক'রেচিলেন, তিনি বোধহয় নিজের বে'র প্রথম বছরটা কেটে যাওয়ার পর ক'রেচিলেন।

খিল্‌ খিল্‌ ক'রে হেসে উঠলে মোক্ষদা।—ঠিক বলেচ! নিজেদের পেথ্‌থম বচ্চরটাতো কেটে গেল? এইবার শাস্তর-পুঁথি নিকে আর পাঁচজনাকে জ্বালাও।

একমাস অদর্শনের পর প্রথম উচ্ছ্বাসের পর্ব কাটতে সারা মাঘ মাসটাই প্রায় ফুরিয়ে গেল। তারপর একদিন হরিশ ব'ললে, এখন থেকে তোমাকে ইংরিজি সাহিত্যের ভালো ভালো গল্পগুলো শোনাবো।

—আমার গপ্পোটা?

—তোমার গপ্পোটা মানে?

—তোমার ওপিলিয়ার গপ্প গো!

—তাই বলো! ওফেলিয়ার গল্পতো ব'লবোই। তার আগে মজার গপ্পগুলো শুনে নাও। কমেডি অব এররস্, মিডসামার নাইট্স্ ড্রিম, মার্চেন্ট অব ভেনিস—আরো কত গল্প আছে!

ফাল্গুনের মাঝামাঝি।

এরই ভেতর অনেকগুলো গল্প বলা হ'য়ে গেছে। গোপনে খাতা বেঁধে দিয়ে বাঙলা বর্ণমালা শেখানোও শুরু হ'য়ে গেছে।

আগের রাতেই হ্যামলেট নাটকের গল্পটা মোক্ষদাকে শুনিয়েছে হরিশ। উদগ্রীব আগ্রহ নিয়ে শুনেছে সে।

কিন্তু তারপরই কী যে হ'ল! মোক্ষদা ভীষণভাবে বেঁকে ব'সেছে। ওই ওফেলিয়া নামটা সে কিছুতেই নেবে না। ও নামে হরিশ যেন তাকে আর কোনোদিনও না ডাকে!

বিব্রতভাবে হরিশ ব'ললে, কেন গো, কী হ'ল? নামটাতো কত সুন্দর! তোমারও পছন্দ।—

—না, আমার পচন্দ নয়। কেন, আমাদের দেশে কি ভালো নাম নেই যে তুমি আমাকে ওই মেমসায়েবি নামে আদর ক'রবে?

কথা হচ্ছিল বেশ নিশুত রাতে। বাইরে ফুটফুটে জ্যোৎস্নার আলো। শীতের উত্তুরে হাওয়া প্রায় বিদায় নিয়েছে। বসন্তের হাওয়া সবে বইতে শুরু ক'রেছে। বাড়ির পেছনদিকের গাছগাছালির পাতায় পাতায় তার মর্মরধ্বনি। কাছেই কোথাও দু'দিকে দুটো গাছে ব'সে ডাকছে দু'টো পাখি। তার একটা পাপিয়া, অন্যটা দামাপাখি। পাপিয়া তো যখন তখন দেখা যায় কিন্তু দামা পাখির দেখা পাওয়া যায় খুব কম। ওদের ডাক ভারী মিষ্টি। হরিশ ও-পাখির ডাক চেনে ব'লেই বুঝতে পারছে।

আদরেব ওফেলিয়াকে জড়িয়ে ধ'রে আবো কাছে টেনে নিযে হরিশ ব'ললে, হঠাৎ এমন মত পাল্টে গেল কেন?

মোক্ষদা নিরুত্তর।

—বলোই না, কী হয়েচে?

—কিছু হয়নি।

—তাহ'লে আপত্তি কেন?

—মেমসায়েবি নামে আমার দরকার নেই।

—এতদিন তো সে-কথা বলোনি?

—অ্যাদ্দিন বলিনি ব'লে আজ ব'লতে নেই বুঝি?

হরিশের কাছে সবই হেঁয়ালির মতো লাগছে। কিছুই বুঝতে না পেরে সে চুপ ক'রে রইলো। যদুগোপাল ঠিকই ব'লেছিল, মেয়েদের মতিগতি বোঝা ভার।

বসন্তের ফুরফুরে হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পাপিয়াটা ডেকেই চ'লেছে। আবার, এদিকে মোক্ষদাও সেই যে বুকে মুখ গুঁজে প'ড়ে রয়েছে, সে-মুখ তুলছেও না, কথাও বলছে না।

একটু পরে হরিশ অনুভব ক'রলে, বুকে যেন একটু গরমের ছোঁয়া। এ যে চোখের জল, তা বুঝতে তার মুহূর্তমাত্র দেরি হ'ল না। একটু জোর দিয়েই মোক্ষদার মুখখানা সে তুলে ধ'রলে। জলে ভেসে যাচ্ছে দু'চোখ।

জানালা দিয়ে একফালি চাঁদের আলো এসে লুটিয়ে পড়েছে বিছানায়। মুখখানা তুলে ধরতেই ফুঁপিয়ে কেঁদে হরিশের হাতখানা জড়িয়ে ধ'রলে মোক্ষদা।

—কেন তুমি আমায় ওই নামটা দিলে? সে তো আগেই ম'রে গেল। আমি কি তোমাকে ছেড়ে ওইরকম ক'রে আগেই ম'রে যাবো নাকি? না, তা হবে না—

এতক্ষণ ফ‍ুঁপিয়ে কাঁদছিল। এবার ঝর্‌ঝর্‌ ক'রে কেঁদে ফেললে।

কথাটা হঠাৎ হরিশের ব‍ুকেও ছ্যাঁৎ ক'রে লেগেছে। সত্যিই তো, একথা আগে তার খেয়াল হয়নি! নামটা যত মিষ্টিই হোক, কিন্তু যে-নায়িকার জীবন আরম্ভ হ'তে না হ'তেই আলো নিবে গেল, তার নাম বেছে নেওয়া ঠিক হয়নি।

নিজের হাতে মোক্ষদার চোখের জল ম‍ুছে দিলে হরিশ।

পাপিয়া বোধ হয় তখন অন্য কোথাও উড়ে গেছে। একা দামা পাখিটা মাঝে মাঝে ডাকছে। তার স‍ুরেলা শিস্‌ দেওয়া ডাক যেন আগের চেয়েও অনেক বেশি মিষ্টি লাগছে।

ধরা গলায় মোক্ষদা ব'ললে, ও-নামে আমাকে আর কোনদিন ডাকবে না, বলো?

—না। এবার খ‍ুশি তো?

পরম পরিতৃপ্তিতে হরিশের ব‍ুকে মাথা রেখে মোক্ষদা ব'ললে, হ‍ুঁ।

দ্বিতীয় পর্ব

আতপ্ত নিদাঘ

॥ এক ॥

ইঙ্গিতটা প্রথমে বৌঠানের মুখ থেকেই পায় হরিশ।

সেদিন সন্ধ্যের পর ঘরে ব'সে একমনে পড়ছিল সে। মোক্ষদা তখন বাইরের দাওয়ায় ব'সে রুক্মিণীর পায়ে তেল মালিশ ক'রছে। এমন সময় বৌঠান এসে ঘরে ঢুকলে। রান্না ক'রতে ক'রতেই এক ফাঁকে উঠে এসেছে। ভিজে হাত আঁচলে মুছতে মুছতে মুখ টিপে হেসে চাপাগলায় সে ব'ললে, বাব্বাঃ, করিৎকম্মা ছেলে বটে! তাইতো বলি, আজ ক'দিন ধ'রে রোজ একটা বেনেবৌ পাখি এসে শুনিয়ে শুনিয়ে এত ডাকে কেন?

—তাতে কী হয় বৌঠান?

সঙ্গে সঙ্গে ভেংচি কেটে বড়বৌ ব'ললে, আহা, ন্যাকা! ভাজা মাছটি উল্‌টে খেতে জানো না! বেনে বৌ কী ব'লে ডাকে জানো না? গেরস্তের খোকা হোক, গেরস্তের খোকা হোক —বুঝেচ? রোজ-দুপুরে হয় রাস্তার ধারের ওই আমগাছটায়, নয়তো বাড়ির পেছনের ডুমুর গাছটায় ব'সে পাখিটা বারবার ডাকে, গেরস্তের খোকা হোক! গেরস্তের খোকা হোক! পাখিটা যত চেঁচায়, ছোট'র মুখ ততই রাঙা হ'য়ে ওঠে। বলি, স্যায়না ন্যাকা ইংরিজিজনবিশ, এবার মাথায় কিছু ঢুকেছে?

হঠাৎ একটু লজ্জা, একটু সঙ্কোচ, একটু অপ্রতিভ চাউনি। আর, তারই সঙ্গে মনের ভেতর একটা সুতীব্র শিহরণ। যেন বুকের ভেতর সমস্ত রক্ত একসঙ্গে ছল্‌কে উঠলো!

দেওরের চিবুক ধ'রে নাড়া দিয়ে বড়বৌ ব'ললে, পীরিতের ধাক্‌কায় রাতের ঘুম তো ভুলেচ! সারারাত ধ'রেই দু'জনায় বক্‌বক্‌ম বক্‌বকম্‌ ক'রেই চলো। এদিকে পরিবারের কেন যে অরুচি দেখা দিয়েচে, কেন আজকাল গা বমি বমি ক'রচে, তার খপর কখনো নিয়েচ?

হরিশের কান দু'টো লাল হ'য়ে উঠেছে। ঢোঁক গিলে আম্‌তা অম্‌তা ক'রে কোনোমতে ব'ললে, ও-সব মেয়েলি ব্যাপার আমি বুঝি নাকি?

মা গো মা! —মুখে আঁচল চাপা দিয়ে খিল্‌ খিল্‌ ক'রে হেসে উঠলে বড়োবৌ, আহা রে, দুধের বাছা! মেয়েলি ব্যাপার-স্যাপার তো কিছুই বোঝো না গোঁসাই ঠাকুর কিন্তু আসল কাজটিতো ঠিকই গুছিয়ে ফেলেচ! সাধে কি আর বেনে বৌটার টনক ন'ড়েচে?

হরিশের ফর্‌সা মুখখানা লজ্জায় এবার এত লাল হ'য়ে উঠলো যে কান দু'টো পর্যন্ত গরম লাগছে।

বৌঠান তবু ছাড়বার পাত্রী নয়। ব'ললে, আমার খপর দেওয়ার কথা, আমি দিয়ে দিলুম। এখন থেকে একটু বুঝে-সমঝে চ'লো বাপু! না কি তাও আবার বাখান ক'রে ব'লতে হবে? বন্ধুবান্ধব দু'একজনের তো ছেলেপুলে হ'য়েচে? তাদের ঠেঞে একটু জেনেশুনে নিও, এ-সময়ে কেমন ভাবে থাকতে হয়। আমি গুরুজন, আমি আর কী ব'লবো?

হরিশের চিবুক ধ'রে আর একবার নাড়া দিয়ে হাসতে হাসতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল বড়বৌ। সে বেরিয়ে যেতেই একটা দিশেহারা অনুভূতি অস্থির ক'রে তুললে হরিশকে। তার এত আদরের ছোটবৌ মা হ'তে চ'লেছে। সে হবে বাবা!

বইয়ের পৃষ্ঠা যেমন ছিল, তেমনিই রইলো।

হরিশ যেদিন নৌকোয় চ'ড়ে উত্তরপাড়ায় বিয়ে ক'রতে গিয়েছিল, সেদিন গঙ্গায় ছিল ভরা জোয়ার। সেই জোয়ারের বেগ-ই যেন চ'লছে আর চ'লছে। উচ্ছল জোয়ার এবার সত্যিই কূল ছাপিয়ে বইতে চ'লেছে!

তার মতো সুখী এখন কে?

অদ্ভুত মিষ্টি একটা রঙীন রূপকথার রাজ্যে যেন চ'লে গেল হরিশ। তার ছোটবৌয়ের কোলে আসবে কোলজোড়া ছেলে। ছেলেটা হয়তো ভীষণ দুষ্টু হবে। তাকে সামলাতে হিমসিম খেয়ে যাবে ছোটবৌ। মা-ও হয়তো তাঁর নাতিকে সামলাতে গিয়ে দিশে পাবেন না। তখন কী হবে? হরিশ নিজেই সে-দায়িত্ব নেবে। ছোট্ট ছেলেটাকে বুকে চেপে ধ'রে তার গায়ে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে তাকে ঘুম পাড়িয়ে দেবে। ছোটবৌকে ইচ্ছে ক'রেই রাগিয়ে দেবার জন্যে ব'লবে, তুমি একদম আনাড়ি! দেখলে তো, দস্যি দামাল ছেলেকে কেমন ক'রে শান্ত ক'রতে হয়?

গাল ফুলিয়ে ছোটবৌ হয়তো ব'লবে, যেমন দস্যি বাপ, তার ছেলে তেমনিই হবে তো? বেশ তো, তোমার ছেলেকে তুমিই সামলাও, আমি পারবো না—

মুখে কথাটা ব'লবে বটে, কিন্তু সন্তর্পণে হরিশের বুকে ছোট্ট ঘুমন্ত ছেলেটাকে নিয়ে সযত্নে শুইয়ে দেবে বিছানায়। তখন সেই ঘুমন্ত ছেলেকে দেখে কে ব'লবে যে, একটু আগে এই ছেলেই কেঁদে চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় ক'রেছিল?

হরিশ মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে ছেলের দিকে। হয়তো লোভ সামলাতে না পেরে তার নরম তুলতুলে গালে একটা চুমু দিতে যাবে। অমনি ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে বাধা দেবে ছোটবৌ।

—কি সব্বোনাশ, তুমি কেমন মানুষ গো? জানো না, ঘুমের ভেতর চুমু খেলে বড় হ'য়ে সে-ছেলে ভীষণ রাগী হয়?

মেয়েদের এই সংস্কারটা জানে হরিশ। বৌঠানের ছেলেটাকে ঘুমের ভেতর আদর ক'রতে গিয়েই জেনেছে।

এটা জেনে ভালোই হ'য়েছে তার। সে বারবার ঘুমন্ত ছেলেকে চুমু খাওয়ার ভান ক'রবে আর ছোটবৌকে রাগিয়ে দিয়ে মজা দেখবে।

অল্প কয়েকদিন পরের কথা।

স্কুল থেকে ফিরে হাত-মুখ ধুয়ে হরিশ ঘরে এসে ব'সেছে। সে জানে, একটু পরেই তার সেই চেনা পায়ের শব্দে ছোটবৌ ঘরে ঢুকে জলখাবারটুকু সযত্নে তার সামনে রেখে ব'লবে, নাও, তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও।

একটু পরেই করুণ দৃষ্টিতে হরিশের দিকে তাকিয়ে ব'লবে, তোমার শরীলটে দিনকে দিন কাহিল হ'য়ে যাচ্ছে গো?

এই শেষের কথাটা আজকাল তার মুখে প্রায় বাঁধা বুলি হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। হরিশের শরীর কাহিল দেখাক বা না-ই দেখাক, ছোটোবৌ তাকে কাহিল দেখবেই!

তার এই অযথা উদ্বেগ হরিশের মন্দ লাগে না। বরঞ্চ বেশ ভালোই লাগে। মোক্ষদা কোনোদিন ও-কথাটা না ব'ললেই যেন মনে মনে তার অভিমান হয়। তবে কি ছোটোবৌয়ের ভালোবাসা আগের চেয়ে ক'মে গেছে?

আজ স্কুলে একটা মজার ঘটনা ঘ'টেছে। সেটা ছোটোবৌকে বলবার জন্যে তার মন ছটফট ক'রছে।

ফাদার পিফার্ড ইংরিজির ক্লাশ নিচ্ছিলেন। পেছনের বেঞ্চিতে ব'সে উমেশ কখন ঘুমিয়ে প'ড়েছে। সবে দিন পনেরো আগে বেচারার বিয়ে হয়েছে। ফাদার সে-কথা জানেন না। আর জানলেও খেয়াল নেই। বিয়ের আগে নিশ্চয়ই ছুটির দরখাস্ত জমা পড়েছিল।

ক্লাশে একজন ছাত্রকে ওইভাবে ঘ্মোতে দেখে ফাদার রেগে আগ্ন। চিৎকার ক'রে উঠলেন, উমেশ!

উমেশ ধড়মড় ক'রে উঠে দাঁড়ালো। চোখ থেকে ঘ্মের ঝোঁক তখনো ভালো ক'রে কাটেনি। তার ভেতর ফাদারের ওই র্দ্রম্তির্ত দেখে সে প্রায় কেঁদেই ফেলে আর কি!

—ক্লাশে ঘ্মোচ্ছিলে কেন?

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে কাঁদো কাঁদো ম্খে উমেশ ব'ললে, আমাকে মাপ কর্ন ফাদার! আর কেনোদিন ঘ্মোবো না।

সেই রাগের ভেতরেই হেসে ফেললেন পিফার্ড।—আর কোনোদিন ঘ্মোবে না? সারা জীবন জেগেই কাটিয়ে দেবে, অ্যাঁ?

ক্লাশে একটা চাপা হাসির রোল উঠলো।

পিফার্ড ব'ললেন, তোমার বলা উচিত ছিল, ক্লাশে আর কোনোদিন ঘ্মোবো না। যাও, চোখে জল দিয়ে এসো—

পেছন থেকে কে একজন চাপাস্বরে ব'ললে, ক'দিন আগে উমেশের বে' হয়েচে ফাদার।

ফাদার পিফার্ডের ম্খখানা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ স্নিগ্ধ হাসিতে ভ'রে উঠলো। ব'ললেন, দেন এক্সকিউজ মী উমেশ! এক্ষেত্রে তোমার আজকের অপরাধ ক্ষমা করা গেল।

ছেলেরা সবাই হেসে উঠল। তাদের হাসিতে তিনিও যোগ দিলেন। উমেশ বেচারা ম্খ নীচু ক'রে চোখে জলের ঝাপ্‌টা দিতে বেরিয়ে গেল।

সেই ঘটনার কথাই মনে মনে ভাবছিল হরিশ। ভাবতে গেলেই হাসি পাচ্ছে। বিয়ের পর বেশ কিছ্দিন পর্যন্ত তারও তো ক্লাশে ব'সে ঘ্মে চোখ জড়িয়ে আসতো। উমেশ বেচারা ধরা প'ড়ে গেছে আর হরিশ ধরা পড়েনি—এই যা তফাৎ!

অন্যমনস্ক ছিল ব'লেই হরিশ জানতেও পারেনি, ছোটোবৌ কখন ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে। নিঃশব্দে হরিশের সামনে ম্ড়ির বাটিটা রেখে মোক্ষদা চাপাস্বরে ব'ললে, খেয়ে নাও।

হরিশ হেসে ব'ললে, আজ টেরই পেল্ম না, কখন এলে! জানো, আজ স্কুলে ভারী একটা মজার ব্যাপার হ'য়েচে। আমাদের উমেশ—

ইশারায় তাকে থামতে ব'ললে মোক্ষদা। চাপাস্বরেই ব'ললে, মজার কথা থাক। এখন একদম হাসাহাসি ক'রো না।

হরিশ ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে ব'ললে, কেন, কী হ'য়েচে? কোনো দ্ঃসংবাদ?

চুপ ক'রে রইলো ছোটোবৌ। ম্খ নীচু ক'রে পায়ের ব্ড়ো আঙ্লের ডগা দিয়ে মেঝের ওপর সে অর্থহীন আঁচড় কাটতে লাগলো।

কয়েকম্ঠো ম্ড়ি চিবিয়ে এক ঢোঁক জল খেয়ে উৎকণ্ঠিত স্বরে হরিশ ব'ললে, বলোই না, কী হ'য়েচে?

সেই ভাবে ম্খ নীচু ক'রেই কাঁপা কাঁপা স্বরে মোক্ষদা ব'ললে, বট্‌ঠাকুরের চাকরি গেছে।

—দাদার চাকরি গেচে! —স্তম্ভিত বিস্ময়ে হরিশ ব'ললে, কেন?

—কেন তা কি আমি জানি?

এতক্ষণে ম্খ তুলে তাকালে মোক্ষদা। তার চোখ দ্'টো ছল ছল ক'রছে।—হ্যাঁগা, এখন কী হবে?

বাটিতে যে ম্ড়ি ক'টি অবশিষ্ট ছিল, তা আর হরিশের গলা দিয়ে নামলো না। গেলাসের বাকি জলট্কু ঢক্‌ঢক্‌ ক'রে খেয়ে সে চুপ ক'রে ব'সে রইলো। ওই তিনটি শব্দ একটা বিরাট জিজ্ঞাসা চিহ্নকে পেছনে নিয়ে তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো, এ-খ-ন কী হ-বে?

নীরবে নিঃশব্দে কয়েকটা দিন কেটে গল।

দাদা চুপচাপ, বৌঠানের ম্খেও কোনো কথা নেই। মায়ের কাছে জিজ্ঞেস ক'রেও দাদার হঠাৎ

চাকরি চ'লে যাওয়ার কারণটা কিছুই বুঝতে পারলে না হরিশ। মোক্ষদার কাছেই সে শুনলে, বৌঠান নাকি দাদাকে স্পষ্ট-ই জানিয়ে দিয়েছে, আর ক'দিনের ভেতর রোজগারের কোনো একটা উপায় না হ'লে ছেলেকে নিয়ে সে বাপের বাড়ি চ'লে যাবে। দিনের পর দিন উপোস দিয়ে এখানে প'ড়ে থাকতে সে পারবে না।

ম্লান মুখে হরিশ শুধু একটু হাসলে।

এখনো তো সংসার চ'লছে, এখনো হাঁড়ি চ'ড়ছে। যা সম্বল আছে তা ফুরোলে তবে উপোস দেওয়ার প্রশ্ন। বৌঠান তার আগেই এত অধৈর্য হ'য়ে প'ড়েছে?

রুক্মিণী সেদিন থেকে একেবারে স্তব্ধ হ'য়ে গেছেন।

ছোড়দাদা দেবনারায়ণই হারাণের চাকরি ঠিক ক'রে দিয়েছিলেন। তাঁর মুখ থেকেই হারাণের চাকরি যাওয়ার কারণ জানতে পেরেছেন তিনি। মুহুরিবাবুর উপরির টাকা থেকে দু'টো টাকা সরিয়েছিল হারাণ। সেটা হাতে-নাতে ধরা প'ড়ে যাওয়ায় সেই মুহূর্তেই তাকে বরখাস্ত ক'রেছে মুহুরিবাবু। তাঁর মুখে হারাণ যে চুণ-কালি লেপে দিয়েছে, সে কথাও বোনকে বেশ রূঢ়ভাবেই জানিয়ে দিয়ে গেছেন দেবনারায়ণ।

দারিদ্র্য রুক্মিণীর কাছে নতুন কিছু নয়। উপোসে দিন কাটানোর অভিজ্ঞতা তাঁর কত-ই তো আছে। কিন্তু হারাণের চাকরির পর সবে একটু সুদিনের মুখ দেখতে আরম্ভ ক'রেছিলেন, ঠিক সেই সময়েই এতবড়ো আঘাত! এখন তো কেবল নিজের ছেলে দু'টোই নয়, দু'টো পরের মেয়েও যে এই সংসারের সুখ-দুঃখের ভাগী হ'য়ে গেছে!

ভগবান যাকে মারতে চান, তাকে কি এইভাবেই আঘাতের পর আঘাত ক'রে চলেন? একটু দম ফেলার অবসর-ও দেন না তিনি? আর জন্মে ভগবানের পায়ে কী এমন অপরাধ ক'রেছিলেন রুক্মিণী যে, এই জন্মে সেই শৈশব থেকে তাঁর কপালটাকে বারবার এইভাবে দ'লে-পিষে-মুচড়ে ক্ষতবিক্ষত না ক'রে দিলে ভগবানের চ'লছিল না?

কয়েকদিন পরের কথা।

হরিশ স্কুলে যাওয়ার জন্যে তৈরি হ'য়েছে, এমন সময় মোক্ষদা এসে কাঁচুমাচু মুখে জানালে, দিদি ব'ললে বট্‌ঠাকুর তোমায় এখুনি একবার ডাকচেন।

হারাণের ঘরের সামনে গিয়ে হরিশ ব'ললে, আমায় ডেকেচ দাদা?

—হ্যাঁ ঘরে আয়। ইস্কুলে যাচ্চিস?

—হ্যাঁ।

—এখন সংসার কিভাবে চ'লবে, তা কিছু ভেবেচিস?

হরিশ চুপ ক'রে রইলো।

হারাণ গম্ভীর স্বরে ব'ললে, তুই যে কিছু ভাবচিস, তার লক্ষণ তো দেখচিনে!

হরিশ তার উত্তরে কী ব'লবে বুঝতে পারলে না। সামনের অনিশ্চিত অন্ধকার ভবিষ্যতের জন্যে মনে উদ্বেগ ঠিকই দেখা দিয়েছে কিন্তু তার বেশি কিছু নয়। হয়তো দু'একমাসের ভেতরেই দাদার আর একটা কোনো চাকরি হ'য়ে যাবে, খানিকটা এইরকম ধারণা নিয়েই সে আছে।

—সংসার তো আমার একলার নয় হরিশ, তোরও সংসার। ভেবে চিন্তে একটা কিছু উপায় তো ক'রতে হবে?

বড়োবৌ পাশেই ছিল। সে ব'ললে, তোমার দাদা যে কতখানি বিপদে প'ড়ে তোমাকে ডেকে এ-কথা ব'লচে, তা বুঝতেই পারচো?

—হ্যাঁ, বৌঠান।—মুখ নীচু ক'রেই উত্তর দিলে হরিশ।

হারাণ এবার গলার স্বর একটু মোলায়েম ক'রে ব'ললে, আমার তো মনে হয়, ইস্কুলে এই আট বছরে তুই যা ইংরিজি প'ড়েচিস, একটা মোটামুটি ভালো চাকরির পক্ষে তা যথেষ্ট। আর পড়বার কী দরকার বল্?

হরিশ মুখ নীচু করেই দাঁড়িয়ে রইলো।

তার মুখের থম্‌থমে ভাব একটু লক্ষ্য ক'রে নিয়ে বড়োবৌ ব'ললে, তুমি যে নেকাপড়া এত ভালোবাসো, তাকি তোমার দাদা জানেন না ঠাকুরপো? কিন্তু সংসারের এই বিপদে উপায় কী বলো? তাই তোমার দাদা ব'লচিলেন, তুমি যদি এখন যাহোক একটা চাকরি বাকরি করো তো সংসারটা বাঁচে।

হারাণ সঙ্গে সঙ্গে ব'ললে, আর দু'দিন পরে কী খেয়েই বা ইস্কুলে যাবি? বাড়িতে যে হাঁড়ি-ও চড়বে না! সোজা কথা, চাকরির চেষ্টা তোকে ক'রতে হবে! বুঝতে পারচিস?

মৃদু স্তিমিত স্বরে হরিশ ব'ললে, হ্যাঁ।

বড়োবৌ ব'ললে, সব দিকই ভাবতে হবে ঠাকুরপো! ছোটোর কথাও চিন্তে ক'রতে হবে। সে তো এখন আর একা নয়? এ-সময়ে তার খাওয়া-দাওয়ার একটু যত্ন আত্তি না হ'লে খুবই চিন্তের কথা!

স্কুল ছেড়ে জীবিকার সন্ধানে বেরোতে হবে এবার!

কত সাধ, কত স্বপ্ন, কত কল্পনা!—সব কিছু নিমেষে খান্ খান্ হ'য়ে ভেঙে যাবে!

না, দাদা কিম্বা বৌঠানের ওপর ক্ষুব্ধ হ'য়ে লাভ নেই। দাদা তো এতদিন তাকে ডেকে এ-কথা বলেনি? আজ নিরুপায় হ'য়েই ব'লতে বাধ্য হ'য়েছে।

হ্যাঁ, বৌঠান ঠিকই ব'লেছে। ছোটোবৌ সন্তানের মা হ'তে চ'লেছে। তাকে তো যেমন ক'রেই হোক, সুস্থ রাখতে হবে!

—কী ভাবচিস?—প্রশ্ন ক'রলে হারাণ।

—কিছু না। হ্যাঁ, আমি বুঝতে পারচি, চাকরির চেষ্টা আমাকে ক'রতেই হবে!

হারাণের মুখে স্বস্তির হাসি ফুটে উঠলো। একটু উৎসাহিত হ'য়ে সে ব'ললে, পাদরি সাহেব তো তোকে খুব ভালোবাসেন। তাঁকেই একবার ব'লে দ্যাখ্ না, যদি গোরাদের কোনো হৌসে একটা চাকরির ব্যবস্থা ক'রে দেন?

হরিশ যেন আঁৎকে উঠলে। সঙ্গে সঙ্গে ব'ললে, না দাদা তা আমি পারবো না।

—কেন রে? এটা তো মস্তবড়ো সুযোগ!

—তা হোক। যাঁর কাছে আমি প্রাণ-ঢালা স্নেহমমতা পেয়েচি, তাঁর কাছে করুণা ভিক্ষে চাইতে পারবো না।

ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে রইলো হারাণ। স্নেহ-মমতা আর করুণার ভেতর কী এমন তফাৎ আছে, সে-কথা কিছুতেই তার মাথায় ঢুকছে না। হারাণের মুখের ভাব এবার কঠিন হ'ল। ব'ললে, তার মানে, হাতে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সে-সুযোগ তুই নিবিনে? তবে কি চাকরির চেষ্টা করবার ইচ্ছে তোর নেই?

—না দাদা, চাকরির চেষ্টা আমি নিশ্চয়ই ক'রবো, সে-কথা তোমায় দিয়ে যাচ্চি।

অবসন্ন পায়ে হারাণের ঘর থেকে নিজের ঘরে ফিরে এলো হরিশ। কেমন যেন ভাবলেশহীন চাউনি।

ভয়ার্ত, বিবর্ণমুখে ব'সে ছিল মোক্ষদা। ব্যাকুল স্বরে সে জিজ্ঞেস ক'রলে, বট্‌ঠাকুর কী ব'ললেন গো?

সে-কথার কোনো উত্তর দিলে না হরিশ। গলার ভেতরটায় কী যেন আট্‌কে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, কথা ব'লতে গেলে কথার বদলে হয়তো একঝলক কান্না বেরিয়ে আসবে। কোনোমতে সে ব'ললে, আজ আমি স্কুলে যাবো না ছোটোবৌ।

পরের দিন পড়ন্ত বিকেল।

একটু আগে স্কুল ছুটি হ'য়ে গেছে। রেভারেন্ড পিফার্ড তাঁর ঘরে ব'সে কয়েকখানা দরকারি কাগজপত্র দেখছিলেন।

—আসতে পারি ফাদার?

দরজার কাছে হারিশের গলা শুনে চোখ তুলে তাকালেন পিফার্ড। এ কী চেহারা হ'য়েছে ছেলেটার?

—এসো, ভেতরে এসো। তুমি কি অসুস্থ?

—না ফাদার, আমার শরীর সুস্থই আছে।

—তাহ'লে কাল স্কুলে আসোনি কেন?

—আমি আজও স্কুলের ক্লাশে আসিনি ফাদার। স্কুলে আসা আর আমার হবে না। আমি আপনার কাছে বিদায় নিতে এয়েচি।

হতবাক্ হ'য়ে তাকিয়ে রইলেন পিফার্ড।—এ-সব তুমি কী ব'লচো?

দু'চোখ জলে ঝাপ্সা হ'য়ে এসেছে। গলা দিয়ে একটা শব্দও যেন বেরোতে চাইছে না।

নিজেকে একটু সামলে নিয়ে তারপর সে ধরা গলায় ব'ললে, আপনার স্নেহ পেয়েচিলুম বলেই আজ আটবছর ধ'রে এই স্কুলে পড়বার সৌভাগ্য আমার হ'য়েচে। কিন্তু এখন আমাদের সংসারের অবস্থা এমন একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েচে যে উপার্জনের পথ খুঁজে নেওয়া ছাড়া আমার আর কোনো উপায় নেই।

রেভারেণ্ড পিফার্ড হতভম্ব দৃষ্টিতেই তাকিয়ে রইলেন।

হরিশের কথাগুলো তখনো তিনি যেন বিশ্বাস ক'রে উঠতে পারছেন না। ইউনিয়ন স্কুলের নাম ছড়িয়ে পড়বার জন্যে এই হরিশের ওপর তিনি কতখানি আশা ক'রে আছেন! তার মুখে এ কী কথা! ছেলেটা আর প'ড়বে না?

পিফার্ড ব'ললেন, হরিশ, তুমি সেই শৈশব থেকে আজ পর্যন্ত কত কষ্ট ক'রে চ'লেচ তার কিছুট আমি বুঝতে পারি। তোমাদের হিন্দু শাস্ত্রে যাকে বলে তপস্যা, জ্ঞানার্জনের জন্যে তুমি সেই তপস্যা ক'রে চ'লেচো, সে তো আমি নিজের চোখেই দেখেচি। আর মাত্র দু'একটা বছর! এই সময়টুকুর জন্যে তোমাদের সংসার তোমাকে একটু ছেড়ে দিতে পারবে না?

হরিশের চোখ আরো ঝাপ্সা হ'য়ে আসছে। কান্নাভেজা গলায় সে ব'ললে, উপায় নেই, ফাদার!

কয়েকমুহূর্ত স্তব্ধ হ'য়ে রইলেন রেভারেণ্ড পিফার্ড। তাঁর কণ্ঠস্বর-ও রুদ্ধ হ'য়ে এসেছে। চেয়ার থেকে উঠে আস্তে আস্তে নিজেই এগিয়ে এলেন হরিশের কাছে। তার কাঁধে হাত রেখে ব'ললেন, উপায় থাকলে তুমি এ-কথা ব'লতে না, তা আমি জানি। আর আমার কিছু বলবার নেই। হয়তো তোমার একখানা সার্টিফিকেট দরকার হবে। এই মুহূর্তেই তা আমি লিখতে পারচি নে, কাল-পরশু কখনো লিখে রাখবো। পরশু স্কুল ছুটির পর এসে নিয়ে যেয়ো—ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন!

অবশ, অশক্ত পায়ে যেন টল্‌তে টল্‌তে স্কুল থেকে বেরিয়ে এলো হরিশ। চোখের জলের ধারা আর বাধা মানছে না!

পেছনে প'ড়ে রইলো আটবছরের কত স্মৃতি! প'ড়ে রইলো তার কত স্বপ্ন-কল্পনার ভগ্নস্তূপ!

সব স্বপ্নের দাহকার্য সমাপ্ত হ'য়ে গেল!

ইউনিয়ন স্কুল থেকে ফেরা নয়—পনেরো বছর বয়সের হরিশ আজ যেন তার জীবন-স্বপ্নের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন ক'রে শ্মশান থেকে ফিরছে!

॥ দুই ॥

উপমন্যুর গল্প সেই কবে ছেলেবেলায় শুনেছিল হরিশ।

মহর্ষি আয়োদধৌম্যের আদর্শ গুরুভক্ত শিষ্য উপমন্যু। শিষ্যের সততা আর নিষ্ঠা পরীক্ষা

করবার জন্যে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, হয়তো বা বছরের পর বছর গুরু তাকে আহার-বঞ্চিত রেখেছেন। নানা ছলে চোখের সামনে থেকে ক্ষুধার্ত শিষ্যের আহার্য সরিয়ে দিয়েছেন তিনি। গুরুকে ত্যাগ ক'রে যাননি উপমন্যু, কিন্তু জঠর-জ্বালাকেও তো জয় ক'রতে পারেননি! শেষ পর্যন্ত জঠর-জ্বালায় হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হ'য়ে অর্কপত্র খেয়ে দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছিলেন উপমন্যু।

নলরাজার গল্পও শুনেছে হরিশ। শুনেছে মহাতেজা ঋষি বিশ্বামিত্রের কাহিনী।

শনির কোপে চূড়ান্ত ভাগ্য বিপর্যয়ের ভেতর ক্লান্ত, অবসন্ন, ক্ষুধার্ত নলরাজার হাত থেকে অর্ধদগ্ধ মৃত মৎস্যও নাকি জীবন্ত হ'য়ে জলে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে পালিয়ে গেল!

আর তপোসিদ্ধ মহর্ষি বিশ্বামিত্র?

দুর্ভিক্ষ-কবলিত এক রাজ্যে তখন তিনি পরিব্রাজক। কোথায় অন্ন? উদর পূর্তির জন্যে কোথায় একমুষ্টি খাদ্য? বিশ্বামিত্রের মতো পরন্তপা ঋষিকেও সেদিন অতি সাধারণ মানুষের মতো জঠর-জ্বালার কাছে পরাজয় মানতে হ'য়েছিল। পরিত্যক্ত চণ্ডালপল্লীতে চণ্ডালের-ও অভক্ষ্য মৃত এক সারমেয়-শবের পৃষ্ঠদেশের মাংস ভক্ষণ ক'রে তাঁকে নিবৃত্ত ক'রতে হয়েছিল জঠর-জ্বালা!

এ-সব তো পুরাণের-ই কাহিনী।

পুরাণের যুগেও তাহ'লে পেটের জ্বালা ছিল সবচেয়ে বড়ো জ্বালা? তপোবলে যাঁরা ভূত-ভবিষ্যৎ জানতে পারতেন, তেজোবলে দৃষ্টিমাত্রে যাঁরা যাকে খুশি ভস্ম ক'রে দিতে পারতেন, সেই সব মুনি-ঋষিদেরও তাহ'লে পেটের জ্বালায় দিশেহারা হ'তে হ'য়েছে? পেটের জ্বালায় রাজাকেও ফেলতে হ'য়েছে চোখের জল?

তাহ'লে রক্ত-মাংসের সাধারণ মানুষ? তারা কী ক'রবে? তাদের কথা ব'লবে কোন্ পুরাণ?

স্কুল ছেড়ে দেওয়ার পর তিনমাস কেটে গেছে।

তিন মাস তো নয়—যেন তিন বছর! এই তিনমাসের ভেতর প্রতিটি ঘন্টা, প্রতিটি মিনিট, প্রতিটি সেকেণ্ড সেই একই চিন্তা হরিশের সমস্ত চিন্তা-চেতনাকে তাড়না ক'রে নিয়ে চ'লেছে।

জীবিকা!—অন্নসংস্থান!

সামান্য দু'টি অন্ন-সংস্থানের জন্যে একটা কোনো নিশ্চিন্ত নির্ভর। নিরাপত্তার মোটামুটি একটু আশ্বাস!

ইংরিজি ভাষার ওপর বয়স অনুপাতে হরিশের অসাধারণ দখলের খবর অবশ্য ভবানীপুর অঞ্চলে অনেকেই জানে। সেই সূত্রে মাঝে মাঝে ইংরিজি দরখাস্ত লেখার দরকারে কেউ কেউ তার কাছে আসতো। তখন পারিশ্রমিক নেওয়ার কথা তার মনেও হয়নি। এখন কিন্তু সেই দরখাস্ত লিখে দেওয়াই তার একমাত্র অবলম্বন। মজুরি হিসেবে দু'আনা তিন আনা—যে যা দেয়, তাই-ই হাত পেতে নেয় হরিশ। কেউ কেউ আবার পরে দেবো ব'লে চ'লে যায়। পরে আর কখনোই দিতে আসে না।

চাকরি জোটেনি কিন্তু ওই দরখাস্ত লেখার ওপর নির্ভর ক'রেই এই তিনটে মাস কেটে গেছে। অন্তত উপোস ক'রে থাকতে হয়নি। তা সত্ত্বেও বড়োবৌ তার ছেলেকে নিয়ে বাপের বাড়ি চ'লে গেছে। মোক্ষদাকে কিছুদিন উত্তরপাড়ায় গিয়ে থাকার কথা ব'লেছিল হরিশ। সে-কথার উত্তরে মোক্ষদা ব'লেছিল, আমি কোন্ দুঃখে এখন বাপের বাড়ি যাবো? তুমি যেন আর একবারও আমায় ও-কথা ব'লো না! আমায় তুমি এ-কথা কেমন ক'রে ব'ললে গো?

কোনো কথা ব'লতে পারেনি হরিশ।

মোক্ষদা এমন ঝর-ঝর্ ক'রে কেঁদে ফেলেছিল যে তারপর আর কোনোদিন তাকে সে-কথা বলা সম্ভব নয়।

দরখাস্ত লেখার কাজটা সে করে সকালে, রাতে আর ছুটির দিনে। দুপুর থেকে বিকেল

পর্যন্ত চাকরির চেষ্টায় মরীয়ার মতো ঘুরে বেড়ায়।

ট্যাঙ্ক স্কোয়ার, ধর্মতলা, কশাইটোলা, চীনেবাজার, বড়োবাজার, আর্মানিটোলা—কোনো এলাকা ঘুরতে সে বাকি রাখেনি। সবাইকে জানিয়েছে, তার ইংরিজি জ্ঞান সম্বধে তখুনি হাতে কলমে পরীক্ষা দিতে সে প্রস্তুত। কিন্তু লোকের দরকার নেই ব'লে যারা জানিয়েই দিয়েছে, তারা মিছেমিছি একজন ছোকরা উমেদারের পরীক্ষা নিয়ে কী ক'রবে?

হরিশের চরিত্র আর ইংরিজি ভাষায় দক্ষতা সম্বন্ধে রেভারেণ্ড পিফার্ড যা লিখে দিয়েছেন, একখানা সার্টিফিকেটে তার চেয়ে বেশি প্রশংসা কল্পনা করা যায় না। সেই কাগজখানা কামিজের পকেটে নিয়ে কত জায়গায় গিয়েছে হরিশ, কিন্তু সবই নিষ্ফল!

বন্ধুদের ভেতর কালাচাঁদ আর যদুগোপাল সত্যিই যে তাকে কতখানি ভালোবাসে তার পরিচয় এখন যেন আরো নিবিড়ভাবে পাচ্ছে হরিশ। তারা দু'জন যেখানেই সুযোগ পায় সেখানেই ব'লে বেড়ায়, ইংরিজিতে যদি কিছু লিখিয়ে নিতে হয়, সোজা চ'লে যাও চালপট্টির হরিশের কাছে। সদর ক'লকাতার বাইরে বাঙালি ঘরে অত চোস্ত ইংরিজিনবিশ আর পাবে না!

দুই বন্ধুর প্রচারে হরিশের নাম সত্যিই বেশ ছড়িয়ে প'ড়েছে। আগের চেয়ে আরো দু'চারজন বেশি লোক আসছে। দুই বন্ধু শুধু প্রচার ক'রেই দায়িত্ব শেষ করেনি, নিজেরাও মাঝে মাঝে দরখাস্ত লেখার লোক ধ'রে নিয়ে আসে।

কালাচাঁদ ব্যবসায়ী পরিবারের ছেলে। নিজে এখনো ব্যবসায়ে না নামলেও ব্যবসা-বুদ্ধি তার রক্তে আছে। একদিন সে ব'ললে, হাত-যশ তো কিছুটা হ'য়েছে, এবার তুই রেট বাড়িয়ে দে হরিশ! ধর্, একপাতার দরখাস্ত হ'লে দু'আনা, দু'পাতার হ'লে চার আনা, আর তিনপাতা হ'লে ছ'আনার জায়গায় কন্‌সেশন ক'রে নয় পাঁচ আনাই নিলি? তেমন মক্কেল দেখলে ছ'আনাতো বটেই, একটু ভুরু কুঁচকে পারলে আট আনাই নিয়ে নিস্। হ্যাঁ, একটু বড়ো বড়ো আর ফাঁক ক'রে লিখবি। তাহ'লে এক পাতার জিনিস দু'পাতায়, দুপাতার জিনিস তিনপাতায় গড়িয়ে যাবে, তিনপাতার জিনিস চার পাতায়—

হরিশ হেসে ব'ললে, দুর, তা আমি পারবো না!

কালাচাঁদ ক্ষুব্ধ স্বরে ব'ললে, ওই তো তোর দোষ হরিশ! নিজের ট্যাঁকের একটা পাই পয়সা খর্‌চা না ক'রে স্রেফ দালালির ওপর দিয়ে কত লোকে হাজার হাজার লাখলাখ টাকা কামাই ক'রে নিচ্চে আর তুইতো বাপু মেহনৎ ক'রেই পয়সা নিবি! সাধারণ মানুষের কথা ছেড়েই দে হরিশ। ওই যে রাজা রামমোহন—যিনি কিনা সতীদাহ, বেহ্মধম্মো, ডফ্ সাহেবের ইস্কুল—কত কিছু নিয়ে দেশে ঝড় বইয়ে দিলেন, তাঁর কি টাকার অভাব ছিল? তবু যদ্দিন ক'লকেতায় ছিলেন তদ্দিন বেনিয়ানি আর তেজারতির কারবার ক'রে আরো কত হাজার হাজার টাকা রোজকার ক'রেচেন। কি বলবো হরিশ, রাজার বাড়ির পার্টিতে নাকি সেরা নাচওয়ালি ছাড়া নাচের আসরই হ'ত না! তুই নিকী বাইজীর নাম শুনেচিস? তাকে নাকি 'কাটালানি অব্ দ্য ইস্ট' বলা হ'ত। তাহ'লে কিরকম নাচওয়ালি ছিল দ্যাখ্! উঃ, আমরা একবার তার নাচ দেখতে পেলুম না মাইরি! তার মতো নাচওয়ালিকে নাচাতে অলবাৎ হাজার হাজার টাকা মুজরো দিতে হ'য়েচে? আর, সে টাকা রোজগারও করতে হ'য়েচে? তাই বলচিলুম, এত অনেষ্টি দেখালে কোম্পানির রাজত্বে কি আর পয়সা রোজগার করা যায়রে বাপ? আর তাছাড়া এতে তোর অনেষ্টিই বা নষ্ট হচ্চে কোথায়? ধর্, যে লোকটা দরখাস্ত লিখিয়ে নিয়ে যাচ্চে, তাকে তো সেটা জমা দেওয়া থেকে কাজ উদ্ধার করা পর্যন্ত সব দেউড়িতেই দু'একটাকা ক'রে দস্তুরি, পাগড়ি সবই দিতে হবে? যে-লোক সে-খরচাগুলো ক'রতে পারে, সে তোকে চার আনা পয়সা বেশি দিতে পারে না?

অকাট্য যুক্তি কালাচাঁদের।

হরিশ তার সঙ্গে আর তর্ক করেনি। শুধু ব'লেছে, আর কিছুদিন যাক, তারপর সে-কথা ভাবা যাবে।

দু'দিন আগে সন্ধ্যের পর রামনারায়ণ এসেছিল। কার কাছে সে খবর পেয়েছে, চীনেবাজারে নামজাদা আসবাবপত্রের কারবারী মুখার্জি কোম্পানিতে নাকি একজন কেরাণি নেওয়া হবে। ঠিকানাটাও সে সঙ্গে এনেছে। ব'ললে, তুই কালকে একেবারে দশটা বাজতেই গিয়ে খোদ মালিকের সঙ্গে দেখা ক'রবি!

ঠিকানা লেখা কাগজের চিরকুট হরিশের হাতে দিয়ে তারপর কামিজের পকেট থেকে দু'টো ডাঁসা পেয়ারা বের ক'রলে রামনারায়ণ। চাপাগলায় ব'ললে, ইয়ে, মানে, তোর পরিবারকে দিস। এ-সময় আবার স্ত্রীলোকের মুখে অরুচি হয় তো? একটু ঝাল, টক কি একটা ডাঁসা পেয়ারা নাকি ভালো লাগে। আমার পরিবারকেও আমি এনে দিতুম। তোর ওয়াইফ তাহ'লে বাপের বাড়ি যাচ্চেন কবে?

হরিশ করুণ স্বরে ব'ললে, আমি তো তাকে যেতে ব'লেচি কিন্তু সে কিছুতেই যেতে চাইচে না। মা-ও ব'লচেন, আর একমাস পরে পাঠাবেন। কী নাকি একটা অনুষ্ঠান আছে।

—পঞ্চামেত্য।—গম্ভীরভাবে ব'ললে রামনারায়ণ, প্রথম পোয়াতি ব'লে কথা! সাত মাসে পঞ্চামেত্য না খাইয়ে তোর মা কি বৌমাকে পাঠাতে পারেন? তা আমি বলি কি হরিশ, সেটা মিটে গেলেই ওতোরপাড়ায় পাঠিয়ে দিবি, দেরি ক'রবিনে। তোর একটা কিছু স্থায়ী রোজগারের ব্যবস্থা এখনো হয়নি, অথচ এ-সময়ে তোর ওয়াইফের পক্ষে তো যাহোক একটু পুষ্টিকর খাওয়া-দাওয়ার দরকার?

হরিশের মুখের দিকে না তাকিয়েই আপনমনে কথা ব'লে যাচ্ছিল রামনারায়ণ। কথা শেষ হওয়ার পর হরিশের সঙ্গে চোখাচোখি হ'তেই সে অপ্রতিভ হ'য়ে গেল। হরিশের চোখ দু'টো ছলছল ক'রছে!

রামনারায়ণ তাড়াতাড়ি ব'ললে, এই দ্যাখো, মন খারাপ ক'রচিস কেন? দ্যাখ না, চাকরিটা যদি কপালে লেগে যায় তবে কাল থেকেই তো সমস্যা মিটে যাবে!

হরিশ মৃদুস্বরে ব'ললে, তার তো এখনো কিছু ঠিক নেই! নিজের জন্যে আমিও ভাবচি নে নারাণ, ওরই জন্যে ভাবচি। দরখাস্ত লিখে দিয়ে যা পাচ্চি তাতে ডাল-ভাতের সংস্থানটা মোটামুটি হ'য়ে যাচ্চে। মাঝে মাঝে দু'একদিন অবিশ্যি একটা পয়সাও রোজগার হয় না। তবু সবচেয়ে বড়ো ভরসা চন্দরা গয়লানী। বেশ কিছু টাকা বাকি প'ড়লেও সে কিন্তু দুধের জোগান বন্ধ করেনি।

—তবে আর ভাবনা কী? পঞ্চামেত্য মিটে গেলে ওয়াইফকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে তুই-ও উঠে-প'ড়ে লেগে যা। এর ভেতর একটা কিছু হিল্লে হ'য়েই যাবে। সেই ফাঁকে সংসারটা একটু সামলে নিবি। তারপর দিনক্ষণ দেখে শুভক্ষণে একদিন ফুট্‌ফুটে ছেলে-কোলে ঘরের লক্ষ্মীকে ঘরে নিয়ে আসবি!

হরিশ চুপ ক'রে রইলো।

রামনারায়ণ আরো চাপাস্বরে ব'ললে, তোর মনের কী ইচ্ছে—ছেলে না মেয়ে? আমার পরিবারের খুব শখ ছিল ছেলে হয়, কিন্তু জানিস তো, হয়েচে মেয়ে। তাই নিয়ে কি মন খারাপ! আমি বলেচি, এখনো তো অঢেল সময় প'ড়ে রয়েচে। অত মন খারাপ করবার দরকারটা কী? তোর পরিবারের মনটা জেনেচিস?

—ছেলে।

—মেয়েদের এই একটা রোগ, বুঝলি হরিশ? সব মেয়েই চায়, ছেলে হোক। আরে বাবা, মেয়েরও তো দরকার? সবই যদি ছেলে হয় তাহ'লে বড়ো হ'য়ে তারা বে' ক'রবে কাকে? নাঃ, মেয়েদের এ-মনোভাব রিফর্ম করা দরকার!

আর দু'চার কথার পর রামনারায়ণ চ'লে গেল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চুপ ক'রে ব'সে রইলো হরিশ। হয়তো আরো অনেকক্ষণ ওইভাবেই

সে ব'সে থাকতো। কিন্তু মোক্ষদা ঘরে ঢুকে তার অন্যমনস্ক চিন্তায় ছেদ ঘটিয়ে দিলে।

—তোমার এই বন্ধু আর জন্মে নিশ্চয়ই তোমার কেউ ছিলেন গো!

হরিশ একটু চমকে উঠলে।—ওর কথাগুলো তুমি শুনেচ নাকি?

—সব কথাই শুনেচি। তুমি কিন্তু কাল সকালেই চীনেবাজারের সেই দোকানে যাবে!

—যাবো। দেখি, যদি কিছু হয়!

পরের দিন বেশ সকাল সকাল বেরিয়ে বেলা দশটার আগেই চীনেবাজারে পেঁছে গেল হরিশ। রামনারায়ণের খবর ভুল ছিল না, লোক নেওয়ার কথা ছিল সে-দোকানে। কিন্তু আগের দিনই লোক নেওয়া হ'য়ে গেছে।

প্রতিদিন একই কাহিনী!

পড়ন্ত বেলায় ক্লান্ত, অবসন্ন পায়ে ভবানীপুরের পথ ধরে হরিশ। পা যেন আর চলতে চায় না, তবু হাঁটতে হয়।

হরিশ হাঁটে আর দেখে ভাগে-ভাড়ার কেরাঞ্চিগাড়িতে আপিসপাড়ার নেটিববাবুরা বাড়ি ফিরছেন। ছক্কোরগাড়িতেও ফিরছেন কেউ কেউ। অন্যদিকে ল্যাণ্ডো, ফিটন কিম্বা ল্যাণ্ডোলেটে চেপে সাহেব-বিবিরা হাওয়া খেতে চ'লেছেন স্ট্র্যাণ্ডের দিকে। গঙ্গার হাওয়া না খেলে তাঁদের চলে না।

ব্যাকুল প্রতীক্ষায় প্রতিদিন পথের দিকে তাকিয়ে থাকে মোক্ষদা। কোনোদিন সন্ধ্যের ভেতরেই ফিরে আসে হরিশ। কোনো কোনো দিন সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত হ'য়ে যায়।

রোজই সেই ম্লান দৃষ্টিতে নীরব প্রশ্ন। রোজই সেই হতাশ দৃষ্টির নীরব উত্তর, কিছু হয়নি।

দারিদ্র্যের অভিজ্ঞতা তো আশৈশব। কিন্তু এই ক'মাসের ভেতর বাস্তব জীবনের আরো বহু রূঢ় সত্য তার কাছে স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে।

রাতে শুয়ে ঘুম আসে না। পাশে শুয়ে মোক্ষদা। সে-ও অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমোয় না, তা বুঝতে পারে হরিশ। ঘুমের ভান ক'রে প'ড়ে থাকে। তারপর হয়তো কখন ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমের ভেতরেই অভ্যেসবশত হয়তো জড়িয়ে ধরে হরিশের গলা। সস্নেহ মমতায় ঘুমন্ত মোক্ষদার হাতের ওপর আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে হরিশ।

ঢং—ঢং—ঢং—

সদর দেওয়ানি আদালতের পেটা ঘড়ি প্রতি ঘন্টায় বাজে। তার শব্দতরঙ্গ গভীর রাতের নীরবতাকে হঠাৎ হঠাৎ ভেঙে দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে প্রতিধ্বনিত হ'য়ে দূরে মিলিয়ে যেতে থাকে।

॥ তিন ॥

এতদিন পরে অন্ধকারার লৌহ কপাট খুলে গেল।

সত্যি সত্যিই একটা চাকরি পেয়েছে হরিশ। প্রায় একবছর অনিশ্চিত অবস্থার বন্দিদশা থেকে মুক্তির স্বাদ!

টাউন কলকাতার বিখ্যাত নীলামদার টলা অ্যাণ্ড কোম্পানি।

কলুটোলা অঞ্চলে বিরাট তাদের নীলামঘর, সেই অনুপাতে বিরাট তার আপিস। সেই আপিসের আরো পানেরো-বিশজন নেটিব রাইটারের ভেতর হরিশ এখন একজন!

একটাই মাত্র চাকরি খালি হ'য়েছিল—একজন বিলরাইটার চাই। খবরটা এনে দিয়েছিলেন কালাচাঁদের বাবা। ব্যবসা সূত্রে টলা কোম্পানির বড়ো সাহেবের সঙ্গে তাঁর ভালো জানাশোনা আছে। তাঁর সুপারিশ আর রেভারেণ্ড পিফার্ডের দেওয়া সার্টিফিকেট—এরই জোরে চাকরিটা হরিশ-ই পেয়ে গেল।

সার্টিফিকেটের কাগজখানি এই একবছরে জীর্ণ হ'য়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেই জীর্ণ কাগজখানিই বেশ কিছুক্ষণ ধ'রে দেখলেন বড়োসাহেব।

রেভারেণ্ড পিফার্ডের মতো ব্যক্তি যে ছেলেকে এই প্রশংসাপত্র দিয়েছেন, তাকে আর পরীক্ষা ক'রে দেখবার কোনো দরকারই নেই। জ্ঞানের দরকার খুব বেশি নেই। কিন্তু সততা আর কর্তব্যনিষ্ঠা—এই দু'টোই সবচেয়ে বেশি দরকার। সবক'টি গুণের ওপরেই বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন রেভারেণ্ড পিফার্ড। মিথ্যে কথা বলবার মানুষ তিনি ন'ন।

সার্টিফিকেটখানা হরিশের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বড়োসাহেব ব'ললেন, ইয়ং বাবু, তোমাকেই আমি নিচ্ছি। আজ সরকারবাবুর কাছে কাজগুলো একটু বুঝেশুনে নিয়ে যাও, কাল থেকে আপিসে আসবে! মাইনে পাবে মাসে আট টাকা।

চাকরির প্রথম ক'দিনে বেশ একটু হক্‌চকিয়ে গিয়েছিল হরিশ। এত বড়ো আপিসের সমস্ত কর্মচারিদের ভেতর তারই বয়স সবচেয়ে কম। সারাদিনে কত লোকের আনাগোনা, সারাক্ষণ কত ব্যস্ততা! সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত কাজের চাপে দম ফেলার ফুরসৎ নেই। তারই ভেতর কতবার বড়ো সাহেবের কামরায়, কতবার ছোটো সাহেবের কামরায় ডাক প'ড়ছে!

নীলামের দিনগুলিতে পথচারী মানুষকে আকৃষ্ট করবার জন্যে নীলামঘরের দরজার সামনে ব'সে ঘণ্টা বাজানোর একটা লোক আছে। তার গরহাজিরেয় এরই ভেতর দু'চারদিন হরিশকে গিয়ে ঘণ্টা বাজাতেও হ'য়েছে।

বেশ মজা পেয়েছে হরিশ। যেটা বাজাতে হয় সেটা পুজোর ঘণ্টার-ই মতো। কিন্তু তার চেয়ে আকারে অনেক বড়ো আর ভারী। কিছুক্ষণ বাজানোর পর হাত ব্যথা হ'য়ে যায়, এই যা অসুবিধে।

আপিসের পূর্বদিকে যে বাড়িটায় এখন মেডিকেল কালেজ হ'য়েছে, সে বাড়িটা নাকি আগে ছিল ছোটো আদালতের জেলখানা! ওই বাড়িরই ভেতর কোন্‌ একটা জায়গায় বছর পাঁচেক আগে ডাক্তারির ছাত্র পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত নাকি নিজের হাতে মড়া কেটেছিলেন! হৈ হৈ প'ড়ে গিয়েছিল ক'লকাতায়। হিন্দুর ছেলে হ'য়ে কিনা এতবড়ো অনাচার! সাহেবদের কাছে বিলিতি চিকিচ্ছে-বিদ্যে শিখতে হবে ব'লে কি অশুচি মড়া নিয়েও ঘাঁটাঘাঁটি ক'রতে হবে? তাও আবার বিলেত থেকে জাহাজে আমদানি করা কোন্‌ কেরেস্তানের মড়া। হিন্দুর জাত-জন্মের তাহ'লে আর রইলো কী?

হরিশ তখন ইউনিয়ন স্কুলেই পড়ছে।

যে-বছর সে দল-বল নিয়ে মাতাল গোরা খালাসিকে মেরেছিল, সেই বছরেই শীতকালে এতবড়ো কাণ্ডটা ঘ'টেছিল, তা হরিশের বেশ মনে আছে। মধু গুপ্তের মড়া-কাটা নিয়ে বন্ধুদের ভেতর তুমুল তর্ক-বিতর্ক হয়েছিল, সে নিজে ছিল মধু গুপ্তের পক্ষে, সে-কথাও মনে আছে তার।

এতদিন পর্যন্ত জীবনের গণ্ডি ভবানীপুরের ভেতরেই সীমাবদ্ধ ছিল। অনেক কথা হরিশ কানে শুনেছে, চোখে দেখেনি। কোম্পানির রাজত্বে গোরা আর কালার মধ্যে তৈরি করা পার্থক্যের পাঁচিলটা যে কতখানি পোক্ত, এবার তা নিজের চোখে দেখছে।

টলা কোম্পানির অপিসে রাইটার অর্থাৎ কেরাণিদের ভেতর দু'টি ভাগ—হোয়াইট আর নেটিব। গোরা-ফিরিঙ্গি রাইটারদের ঘর আলাদা, মর্যাদাও আলাদা। একই কাজ, কিন্তু তদের মাইনে অনেক বেশি। নেটিব বিলরাইটার ব'লে হরিশের মাইনে আট টাকা। আর ও-ঘরে একজন ফিরিঙ্গি বিলরাইটার মাইনে পায় কম ক'রেও পঞ্চাশ টাকা। টাঁশ ফিরিঙ্গিদের ওরা গোরার দলেই ধ'রে নিয়েছে। অবশ্য মাইনের বেলাতেই নেটিবদের সঙ্গে তাদের এই পার্থক্য। এমনিতে খাঁটি ইয়োরোপীয় সাহেবরা ওদের কিন্তু কোনো মর্যাদা দেয় না। প্রৌঢ় সরকারবাবুর মুখে হরিশ শুনেছে, মাইনের ব্যাপারে সাহেবদের সব হৌসেই নাকি এই রীতি।

মাঝে মাঝে আপনমনেই হাসে হরিশ।

পাঁচবছর আগে ইউনিয়ন স্কুলের একটা এগারো বছর বয়সের ছাত্র এক মাতাল গোরা খালাসির মুখে 'ব্লাডি ইণ্ডিয়ান নিগার' সম্বোধন শুনে রাগে, অপমানে ক্ষিপ্ত হ'য়ে লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে

প'ড়েছিল। সেই ছেলেটাই আজ যোলো বছর বয়সে ধলা-কালার পাঁচিলটাকে মেনে নিয়ে অম্লান-বদনে ঘাড় গ‍ুঁজে টলা কোম্পানির আপিসে কলম পিষে চ'লেছে!

উত্তরপাড়া থেকে ভালো খবর এসেছে।

একটা ফুটফুটে ছেলে হ'য়েছে মোক্ষদার। মা-ছেলে দু'জনেই ভালো আছে। ছেলের রঙ নাকি তার বাপের মতোই ফরসা হ'য়েছে।

সন্ধ্যের পর বাড়ি ফিরে মায়ের মুখে খবরটা প্রথম শুনলে হরিশ। সঙ্গে সঙ্গে সে যে কী এক বিচিত্র অনুভূতি!

রুক্মিণীও খুশিতে দিশেহারা। তাঁর হরিশের প্রথম ছেলে। সেই কোলের ছেলে হরিশ, সেও কিনা ছেলের বাপ হ'য়ে গেল!

হরিশকে খবরটা দিয়েই রুক্মিণী ব'ললেন, এ তোর পয়মন্ত ছেলে বাবা! ও এয়েচে ব'লেই তো তোর কপাল খুললো। ওরই জন্যে চাকরিটা তুই পেয়েচিস।

হেসে হরিশ ব'ললে, ওর জন্মের আগেই তো আমি চাকরি পেয়েচি মা।

এ উত্তরে রুক্মিণী রীতিমতো ক্ষুণ্ণ। বললেন, শুধু জন্মের দিন তারিখ দিয়েই কি পয়-অপয় বিচার হয় বাবা? পয় নিয়েই সে তার মায়ের পেটে এয়েছিল, তা নইলে পাথর-চাপা কপাল থেকে পাথর নামতো?

হরিশ হাসতে হাসতেই ব'ললে, তবে তাই হবে!

—তাই হবে আবার কী? তাই হ'য়েচে। আমি কিন্তু সোনা দিয়ে নাতির মুখ দেখবো, তা আমি আগেই ব'লে রাখচি!

সে-রাতে ঘুমই হয়নি হরিশের।

চাকরি পাওয়ার পর এই দু'তিন মাসে রাতে শরীর এত ক্লান্ত থাকে, যে, শুতে না শুতেই ঘুম পেয়ে যায়।

কিন্তু সেদিন ঘুম কোথায়?

শরীরে যেন কোনো ক্লান্তিই নেই। ইচ্ছে হচ্ছিল, তখুনি উত্তরপাড়ায় ছুটে যায়। নিজের চোখে একবার দেখে আসবে, ছেলে-কোলে ছোটো-বৌকে দেখতে কেমন লাগছে!

মেয়ে সম্বন্ধে বড়ো ভয় মোক্ষদার। কোলে যেন ছেলে আসে, এই ছিল তার একান্ত সাধ। সে-সাধ তবে পূর্ণ হ'য়েছে!

কত স্বপ্ন মোক্ষদার মনে!

উত্তরপাড়ায় চ'লে যাওয়ার আগে তার কিছু কিছু সে ব'লেও ফেলেছে হরিশের কাছে। হরিশকে সব কথা না ব'লে সে যে থাকতে পারে না! ওদিকে আবার মনের গোপন চিন্তাগুলো নাকি আগে ফাঁস ক'রতে নেই। সেইজন্যে নেহাৎ যেটুকু না ব'লে পারেনি, সেইটুকুই ব'লেছে, বাকি অনেক কিছুই মনে চেপে রাখতে হ'য়েছে তাকে। উত্তরপাড়া থেকে ছেলেকোলে যেদিন ছেলের বাপের কাছে সে ফিরবে, সেইদিন সে কথাগুলো ব'লবে।

এটা অবশ্য মোক্ষদা আগেই জানিয়ে রেখেছে যে, তার ছেলে হবে বাপের মতোই জেদী আর তেজী। তবে তাই ব'লে সে মাতাল গোরা দেখলেই ঠেঙিয়ে বেড়াবে না।

ছেলে হবে তার বিরাট বিদ্বান!

ছেলের বাবার যে লেখাপড়ার ওপর কত টান অথচ কোন্ অবস্থায় কত দুঃখে তাকে তা ছাড়তে হয়েছে, সে-কথা মোক্ষদার চেয়ে বেশি আর কে জানে? আত্মীয়-স্বজন হাজার বাধা দিলেও শুনবে না মোক্ষদা। তারা বাধা দেয় দিক, ঠাট্টা করে করুক—কিছুই গায়ে মাখবে না মোক্ষদা। সে তার ছেলেকে অনেক লেখা-পড়া শিখিয়ে বিদ্বানপণ্ডিত ক'রে তুলবে; হরিশের মনের ব্যথা সে দূর ক'রবে!

সংবাদটা পাওয়ার পর ক'দিন ধ'রে কোনো কাজে হরিশের যেন আর মন বসে না। ছেলেকে দেখার জন্যে মন ছট্‌ফট্‌ ক'রছে, অথচ সে-কথা কাউকে ব'লতেও পারছে না।

ক'দিন পরে রুক্মিণীই ব'ললেন, বেয়ান খপর পাঠিয়েচে হরিশ। সামনের শুক্কুরবার আঁতুড় যাবে। তার পর একদিন গে' ছেলের মুখ দেখে আসিস।

উত্তরপাড়ায় গিয়ে মোক্ষদাকে এবার যেন নতুন ক'রে দেখল হরিশ। কোথায় সেই ভীরু, সলজ্জ, অভিমানিনী মেয়ে, যাকে সে এতদিন চিনতো? এ যেন সে-মেয়েই নয়!

ছেলে কোলে পেয়ে মোক্ষদা যেন একেবারে অন্যরকম হ'য়ে গেছে! রাতে পাশাপাশি শুয়ে ঘুম না আসা পর্যন্ত যে মেয়ে সারাক্ষণ হরিশের দিকে তাকিয়ে অনর্গল কথা ব'লতো, হরিশ একটু অন্যমনস্ক হ'লে জোর ক'রে মুখ টেনে নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিত—সে-মেয়ের কোনো চিহ্নই নেই!

কতদিন পরে দেখা!

তাকে দেখেই ছোটোবৌ যে খুশিতে ডগমগ হ'য়ে উঠেছে, আড়চোখে বারবার তার দিকে তাকিয়েছে, তা অবশ্য হরিশের নজর এড়ায়নি। এমন কি, তার শাশুড়ি যখন কাঁথায় জড়ানো ছেলেকে নিয়ে দেখাতে এলেন, তখন মোক্ষদা যে দরজার কপাট ধ'রে দাঁড়িয়ে উদ্‌গ্রীব আগ্রহে তাকিয়ে তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য ক'রছিল, তাও দৃষ্টি এড়ায়নি হরিশের।

কিন্তু তা সত্ত্বেও কোথায় যেন একটা দূরত্ব সৃষ্টি হ'য়ে গেছে!

ভবানীপুর থেকে এবার উত্তরপাড়ায় আসার আগে পর্যন্ত হরিশের গলা না জড়িয়ে ঘুমোতেই পারতো না মোক্ষদা। কিন্তু গলা জড়িয়ে ধরা তো দূরের কথা, এবার সেই মেয়ে সারারাতে, ক'বার হরিশের দিকে তাকালে? তার দৃষ্টি সারাক্ষণ রয়েছে তার বুকের কাছে কাঁথায় জড়ানো ছোট্ট জীবন্ত পুতুলটার দিকে।

অভিমানে হরিশের মন ভ'রে উঠলো।

কোলে ছেলে পেলেই কি স্বামীকে এইভাবে অবহেলা ক'রতে হয়? আর কোনো মেয়ে নিশ্চয়ই এরকম ক'রে তার স্বামীর মনে কষ্ট দেয় না। শুধু হরিশের কপালেই ছিল এই অবহেলা!

মাত্র একটা দিনের জন্যে সে এসেছে।

নতুন চাকরিতে এখন তো আর ছুটি নেওয়া সম্ভব নয়; তাই রবিবারে এসেছে। রাতটা থেকে ভোরবেলায় ক'লকাতায় রওনা হ'য়ে যাবে—সময় মতো পৌঁছে তাকে আপিসে হাজরে দিতে হবে। আপিস সেরে তারপর সন্ধ্যেয় বাড়ি ফিরবে, মাকে সেই রকমই বলা আছে।

হাতে এইটুকু সময় অথচ এর ভেতর তার সঙ্গে ক'টা কথাই বা ব'লেছে মোক্ষদা?

একই ঘরে হ'লেও হরিশকে আলাদা বিছানা ক'রে দেওয়া হ'য়েছে। নিজের বিছানায় শুয়ে চোখ বুজে প'ড়ে রয়েছে হরিশ। ওদিকে মোক্ষদা তার ছেলেকে সামলাচ্ছে। হঠাৎ কেঁদে উঠেছিল ছেলেটা। তাকে খাইয়ে শান্ত ক'রে কেমন সুন্দর ঘুম পাড়িয়ে ফেললে মোক্ষদা। তার ওপর অভিমান হ'লেও মনে মনে তার কেরামতিকে তারিফ না ক'রে পারছিল না হরিশ। এই ক'দিনের ভেতরেই কেমন পাকা গিন্নির মতো ছেলের তদারকি ক'রতে শিখেছে ছোটোবৌ!

অনেক রাতে হরিশের চোখ দু'টো সবে ঘুমে জড়িয়ে এসেছে, এমন সময় গায়ে চেনা হাতের স্পর্শ!

—হ্যাঁ গা, ঘুমিয়ে প'ড়েচো?

—হুঁ।

—আমার ওপর তোমার বুঝি খুব রাগ হ'য়েচে?

—না।

—হ্যাঁ, আমি বুঝতে পারচি, রাগ হ'য়েচে। জানো, আমার কিরকম ভয় হয়েচিলো? কত মেয়েই তো শুনেচি, ছেলে হওয়ার সময় ম'রে যায়। ভারী ভয় হ'ত আমারও যদি তাই হয়? তবে তো তোমার সঙ্গে আর কোনোদিন দেখা হবে না!

এইবারে হরিশ বলবার সুযোগ পেয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ব'ললে, আমার সঙ্গে দেখা হওয়ার তোমার ভারী গরজ! তুমি তো আমার দিকে তাকালেই না! শুধু তোমার ছেলেকে নিয়েই ব্যস্ত!

—ওমা, তুমি কেমন পাগল গো! ছেলে কি একা আমার? তোমার নয়?

—তাই ব'লে তুমি আমার দিকে একবারও ভালো ক'রে তাকাবে না?

হরিশের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লে মোক্ষদা। চুমুতে চুমুতে তার মুখ ভরিয়ে দিয়ে ব'ললে, তুমি সত্যিই পাগল! তুমি দিয়েচ ব'লেই তো এই মাণিক আমি পেয়েচি গো! ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আমি যে সব সময় তোমাকেই দেখ্চি!

বিহ্বল হ'য়ে যায় হরিশ। এর পরেও কি আর অভিমান করা চলে?

॥ চার ॥

ভবানীপুর থেকে কলুটোলা।

দূরত্ব বড়ো কম নয়। কিন্তু হেঁটে আপিস যাতায়াত ক'রতে হরিশের এমন অভ্যেস হ'য়ে গেছে যে, দূরত্বটা তার কাছে এখন আর কিছুই মনে হয় না। ঠিক সময়ে আপিসে পেঁছিতে হবে ব'লে বেশ সকাল-সকালেই দু'টো ভাতে-ভাত মুখে দিয়ে তাকে বেরিয়ে প'ড়তে হয়। দশ মিনিট আগে পেঁছিবে সে অনেক ভালো, কিন্তু এক মিনিটও যেন দেরি না হয়!

কাঁসারিপাড়ার ভেতর দিয়ে কোণাকুণি চৌরঙ্গীর পথ ধ'রে সোজা এসপ্ল্যানেড। গবর্নমেন্ট প্লেসকে বাঁয়ে রেখে কসাইটোলা আর কপালীটোলার ভেতর দিয়ে এগিয়ে বৌবাজার পেরিয়ে সে পেঁছে যায় আপিসে। সেই সাতসকালে বেরিয়ে বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যে হ'য়ে যায়। এর ভেতর পেটে কিছু পড়ে না।

একবছরের ওপর হ'য়ে গেল চাকরি ক'রছে হরিশ। কিন্তু শীত-গ্রীষ্ম, ঝড়বাদলা—কোনো সময়েই আপিসে পেঁছিতে আজ পর্যন্ত একদিনও তার দেরি হয়নি। একটা দিনও কাজে ফাঁকি দেয়নি সে।

প্রৌঢ় সরকারবাবু হরিশকে ভালোবাসেন। হরিশের কাজে নিষ্ঠা দেখে তাঁর যেমন ভালো-ও লাগে, তেমনি কষ্টও হয়। প্রথম যৌবনে তিনিও যখন টলা কোম্পানির চাকরিতে ঢোকেন তখন হরিশের মতোই গাধার খাটুনি খাটতেন। কিন্তু তাতে আখেরে লাভ কী হ'ল? পঁচিশ বছর চাকরির পর মাইনে আজ তিরিশ টাকা। এই পঁচিশ বছরে খাটিয়ে খাটিয়ে রস নিঙড়ে নিয়ে ছিব্‌ড়ে ক'রে দিয়েছে কত বেশি! অথচ ও-ঘরে একজন ছোকরা ফিরিঙ্গি রাইটারও মাইনে পায় মাসে দেড়শো টাকা।

সরকারবাবু আগে ঠাট্টা ক'রে হরিশকে ব'লতেন, তোমার গায়ের যা রঙ তাতে তোমাকে ওই ফিরিঙ্গি রাইটারদের ঘরেই বসানো উচিত ছিল।

হরিশও হেসে জবাব দিত, নেটিব ফিরিঙ্গি হওয়াব সাধ নেই সরকারবাবু। নেটিব হ'য়ে জন্মেছি, এ-জন্মোটা অন্তত নেটিবই থেকে যাই!

সরকারবাবু চুপি চুপি দু'একবার হরিশকে ব'লেছেন, এই মাইনে দিয়ে কি সারাজীবন চ'লবে হে ছোকরা? সংসার করেচো, বৌমার কোলে সবে একটি মাত্তর এয়েচে। মা ষষ্ঠীর কৃপায় এর পর তো আরো বেশ কয়েকটি আসবে? তখন কেমন ক'রে তাদের ভরণ-পোষণ ক'রবে তা ভেবে দেখেচো? তোমাকে নেহাৎ ভালোবেসে ফেলেচি ব'লেই ব'লচি হরিশ, টলা কোম্পানি তো সব রস নিংড়ে নিয়ে বুড়ো বয়সে ছিব্‌ড়ে ক'রে দেবে! তাই ব'লচি, সময় থাকতে থাকতেই এখানে ব'সে কিছু উপরি আয়ের পথ দ্যাখো হে!

হরিশ ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ ক'রে তাকিয়েছে। এখানে ব'সে উপরি আয়! কেমন ক'রে তা সম্ভব?

সরকারবাবু একদিন ব'লেই ফেললেন, তোমার আগে অভয়চরণ নামে যে লোকটা এই জায়গায় ব'সে বিল রাইটারের কাজ ক'রে গেচে, সে কিন্তু এরই ফাঁকে কিছু ক'রে নিতো, বুঝলে?

—দস্তুরি? ঘুষ?

হরিশের চোখে-মুখে এমন একটা তীব্র ঘৃণার ভাব ফুটে উঠলো যে সরকারবাবুও একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে গেলেন।

—অসম্ভব! আমি তা পারবো না সরকারবাবু।

সরকারবাবু তারপরে আর কথা বাড়াননি। জীবনে তিনি বহু লোক চরিয়েছেন। প্রথমে গরম, পরে নরম। বেশির ভাগ লোকই তাই। কিন্তু হরিশ যে একটু অন্য ধাতুর ছেলে, সেটা তিনি আস্তে আস্তে বুঝতে পেরেছেন। হরিশের ভালোর জন্যে তাঁর বলা। তাঁর নিজের স্বার্থ আর কী? ছেলেটা যদি নিজের আখের না বোঝে তো এর চেয়ে বেশি কী আর ক'রবেন তিনি?

সরকারবাবুর নিজের উপরি আয় মাসে অন্তত চার-পাঁচশো টাকা। কোনো কোনো মাসে কপালে লেগে গেলে তার চেয়েও বেশি হয়। টলা কোম্পানিতে কাজের অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়েই নিজের পথ তিনি নিজেই আবিষ্কার ক'রে নিয়েছেন। টাউন কলকাতায় টাকা উড়ে বেড়ায়। সেই উড়ন্ত রুপোলি চাকতিকে মুঠোয় ভরবার জন্যে চাই কেবল দেখার চোখ আর বাগানোর কৌশল। নীলামে বিক্রি করবার জন্যে যারা জিনিসপত্র পাঠায়, তাদের কাছে দস্তুরি নিয়ে থাকেন তিনি। বিল পাঠাতে দেরি করবার গোপন অর্জি নিয়ে যে-সব দেনদার আসে, তাদের কাছেও ন্যায্য পাওনা হিসেবেই কিছু দস্তুরি তিনি পান। তাছাড়া নতুন কিম্বা পুরনো—যে রকম দালালই হোক না কেন, তাদের কাছেও কমিশন তাঁর বাঁধা। হরিশকে তিনি যে স্নেহের চোখে দেখেছেন, সেটা মিথ্যে নয়। সেইজন্যেই পথ বাৎলে দিয়ে তার যাহোক একটু উপকার ক'রতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু এই বাজারেও যে এত হদ্দ বোকা ছেলে থাকতে পারে, তা তিনি কল্পনা-ই ক'রতে পারেননি। অমন ছেলের ভালো ক'রতে গিয়ে নিজের বিপদ ডেকে না আনা-ই ভালো।

সারাদিন ঘাড় গুঁজে কাজ করে হরিশ। তারই ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ হয়তো কখনো কয়েক মুহূর্তের জন্যে তার মন উন্মনা হ'য়ে যায়।

মেডিক্যাল কালেজ থেকে আর একটু উত্তরে এগোলেই বাঁদিকে হেয়ার সাহেবের ভার্ণাকুলার স্কুল আর ডানদিকে সংস্কৃত কালেজের লাগোয়া হিন্দু কালেজ।

হিন্দু কালেজ!

নামটা মনে পড়লেই বুকের ভেতর কেমন টন্‌টন্ কর'তে থাকে হরিশের। সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় সেই ব্যর্থতার ক্ষতস্থান তার আজও শুকোয়নি।

মন থেকে এই আক্ষেপটা দূর করবার জন্যে সে নিজেই নিজেকে অনেক সময় যুক্তি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা ক'রেছে। পরীক্ষায় পাশ করলেও অল্প কিছুদিনের ভেতরেই তো তাকে হিন্দু কালেজ থেকে বিদায় নিতে হত? দাদার চাকরি চ'লে যাওয়ার পর ইউনিয়ন স্কুলে পড়া তাকে ছেড়ে দিতে হ'ল: অনিশ্চিত অন্ধকার ভবিষ্যতের ভেতরেই বেরিয়ে পড়তে হ'ল জীবিকার সন্ধানে। হিন্দু কালেজে পড়লেও তো সেই একই ঘটনা ঘ'টতো! তাহ'লে মিছেমিছি আর আক্ষেপ পুষে রেখে লাভ কী?

যুক্তি দিয়ে মনকে বুঝিয়েও কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই গোপন ক্ষতটাকে সে সারিয়ে তুলতে পারেনি। পরীক্ষায় সে কৃতকার্য হ'তে পারেনি, এ দুঃখ কেমন ক'রে ভুলবে?

উন্মনা মনকে জোর ক'রে আবার টলা কোম্পানির আপিসে ফিরিয়ে আনে হরিশ। আবার কলম চ'লতে থাকে। পাওনাদারের কাছে নীলামদার টলা অ্যান্ড কোম্পানির বিলের পর বিল—পাওনাগণ্ডার কড়া-ক্রান্তির হিসেব।

ছুটির পর পা যেন আর চ'লতে চায় না। তবু হাঁটতে হবে। হেঁটে হেঁটে একসময় গিয়ে পেঁছিতে হবে ভবানীপুরে।

কসাইটোলা পেরিয়ে এসপ্ল্যানেডের কাছে এলেই লাটসাহেবের বাড়ির পশ্চিমদিকে প্রায় গঙ্গার

ধারে এসপ্ল্যানেড রো যেন কী এক অদৃশ্য আকর্ষণে তাকে টানতে থাকে। রাস্তাটা নয়, সেই রাস্তার ওপর একটা বাড়ি।

বাড়িটার মালিকের নাম নাকি ডক্‌টর স্প্রং। সেই বাড়িতেই রয়েছে ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি। জ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডার।

আপিস-ফেরতা পথে কতদিন সম্মোহিতের মতো এসপ্ল্যানেড রো-তে ঢুকে প'ড়েছে হরিশ। বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে বিভোর হ'য়ে তাকিয়ে কতক্ষণ কেটে গেছে তার! সম্বিৎ ফিরে পাওয়ার পর অবসন্ন পায়ে আবার ধ'রেছে ভবানীপুরের পথ।

আপনমনেই হাসে হরিশ।

বড়ো ম্লান, বিষণ্ন সে হাসি। দীর্ঘশ্বাসই যেন ছদ্মবেশে হাসি হ'য়ে বেরিয়ে আসে।

সবই আকাশকুসুম! আট টাকা মাইনের একজন বিলরাইটার কেমন ক'রে এ-কথা ভাবে যে, সে যদি ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরির সদস্য হ'তে পারতো? একটুখানি সাঁতার কাটার সুযোগ পেতো ওই জ্ঞানসমুদ্রে?

অন্ধকার চৌরঙ্গির পথ ধ'রে হাঁটতে হাঁটতে কত কী ভাবে হরিশ! কত স্বপ্ন ছিল মনের গভীরে! তা কি একটু একটু ক'রে এই টলা কোম্পানির বিলরাইটারের ভেতরেই বিলীন হ'য়ে যাবে?

কয়েকমাস আগে আপিস থেকে ফেরার সময় রাস্তায় একদিন মাথা ঘুরে প'ড়ে গিয়েছিল হরিশ। তখন অবশ্য ভবানীপুর এলাকার ভেতরেই এসে প'ড়েছে সে। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ মাথাটা কেমন ঘুরে উঠলো, সেও তাড়াতাড়ি পাশের একটা বেড়া ধ'রে মাটিতে ব'সে প'ড়ল, তারপর কী হ'ল মনে নেই। পথচারী দুজন লোক তাকে ধ'রে সামনের বাড়িটার দাওয়ায় নিয়ে তোলে। সেটা আবার চন্দরা গয়লানির এক পড়শীর বাড়ি। মাথায় জল ঢেলে সুস্থ ক'রে তারাই হরিশকে বাড়ির কাছাকাছি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল। হরিশ কিন্তু বাড়িতে কিছুই বলেনি।

মোক্ষদা তখন ছেলে নিয়ে সবে ক'দিন হ'ল ভবানীপুরে এসেছে।

হরিশ যখন বাড়ি ফিরলো, ছেলেটা তখন কাঁদছিল। মোক্ষদা ছেলে সামলাতেই ব্যস্ত তখন। ওদিকে রুক্মিণীও সন্ধ্যাহ্নিকে ব'সেছেন। আর বড়োবৌ হেঁসেলে ব্যস্ত। তা নইলে সন্ধ্যের পর ভিজে মাথা দেখে কারো না কারো মনে প্রশ্ন নিশ্চয়ই জাগতো।

বেশ কয়েকদিন পরে চন্দরার মুখে সেদিনকার ঘটনার কথা জানতে পারে মোক্ষদা। সে শুনেছে তার পড়শীর মুখে। বামুনদিদি কিম্বা ছোটোবৌ-ঠাকরুণ সে-ঘটনার কথা কিছুই জানে না দেখে চন্দরা নিজেই থ'!

—ও মা গো, সে কি কতা! ছোট্‌ঠাউর নিজে কিচু বলেনিকো?

মোক্ষদার মুখ তখন কাঁদো কাঁদো হ'য়ে গেছে। ছলছল চোখে সে ব'ললে, তুমিই বলো গয়লানি মাসি, নিজে কিছু না ব'ললে ঘরে ব'সে আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব? কথায় বলে, আপন বুঝ্‌ পাগলেও বোঝে। তা এত ইংরিজি প'ড়ে সেটুকুও যদি না বোঝে তো পণ্ডিত হ'য়ে লাভ কী বলো?

চন্দরা সায় দিয়ে ব'ললে, সে-কতা আর ব'লতে?

সেইদিন থেকে উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তা পেয়ে ব'সেছে মোক্ষদাকে। হরিশ ফিরে এলেই সবচেয়ে আগে আড়চোখে লক্ষ্য ক'রে সে দেখে নেয়, মাথার চুলগুলো শুকনো না ভিজে। প্রথম দিকে চুলের ভেতর হাত দিয়েই সে দেখতো। স্পষ্ট ব'লতো, তোমাকে আর আমি বিশ্বেস করিনে। তুমি যা লোক!

আজকাল অবশ্য চুলে আর হাত দেয় না, চোখে দেখেই ঠাহর ক'রে নেয়। হরিশও বাড়িতে ঢুকেই মোক্ষদার সঙ্গে প্রথম দেখা হ'লেই মুচ্‌কি হেসে বলে, আজ খানায় পড়িনি।

মোক্ষদা মাথার দিব্যি দিয়েছিল।

তারপর থেকে হরিশ রোজ দুপুরে এক পয়সার ক'রে ভেজানো ছোলা খেয়ে টিফিন করে।

সেই কোন্ সাত সকালে পেটে দু'টি ভাত পড়ে। তাওতো ব'লতে গেলে পাখির আহার! তারপর সারাদিন পেটে কিছু না প'ড়লে মাথার কী দোষ? এতদিন কেন যে মাথা ঘোরেনি, সেটাই আশ্চর্য!

মাসে চারটে রবিবার ছুটির দিন। বাকি ছাব্বিশ দিনের জন্যে ছাব্বিশ পয়সা। মাসের প্রথমেই তিরিশটা পয়সা আলাদা ক'রে সরিয়ে রাখে মোক্ষদা। নিজেই রোজ একটা ক'রে পয়সা গুঁজে দেয় হরিশের হাতে।

ছেলেটা দেখতে দেখতে চোখের সামনে কেমন ডাগর হ'য়ে উঠছে! হামা দিতে শিখলো, দাঁড়াতে শিখলো, এখন দু'চার পা হাঁটতেও শিখেছে। মুখে বুলিও বেশ ফুটতে শুরু ক'রেছে। বাব্বা, মাম্মা, দাদ্দা-সব বলতে পারে। কেমন সুন্দর চিনতে শিখেছে! 'বাবা' ব'ললেই হরিশের দিকে তাকায়। মেজাজ ভালো থাকলে তার সঙ্গে একটু উপরি উপঢৌকন-ও দেয়—ফোকলা দাঁতে খিল্ খিল্ হাসি। বেশ কয়েকটা দাঁত গজিয়ে গেছে। মুখের ভেতর আঙুল দিলেই কুটুস্ ক'রে কামড়ে দেয়।

আজকাল বেলা একটু প'ড়ে এলেই আপিসে ব'সে চঞ্চল হ'য়ে ওঠে হরিশের মন। কাজে ফাঁকি সে দেয় না, দেবেও না। কিন্তু নিজে বেশ বুঝতে পারে, খোকার মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠে বারবার তার মনোযোগের চেষ্টাকে যেন এলোমেলো ক'রে দিতে চাইছে! নিজের অজ্ঞাতেই চোখ দু'টো ঘন ঘন দেওয়াল ঘড়ির দিকে ঘুরে যায়— কখন ছুটির সময় হবে!

এসপ্ল্যানেড রো-এর সেই সম্মোহনী আকর্ষণ-ও আজ ক'মাস হ'ল নেই। এখন নবেম্বরের মাঝামাঝি। গত আগষ্ট মাসেই ডক্টর স্ট্রংয়ের বাড়ি থেকে ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে রাইটার্স বিল্ডিংসের ভেতর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের চত্বরে।

আগের তুলনায় আজকাল বেশ তাড়াতাড়িই বাড়ি ফেরে হরিশ। বাইরের পোশাক ছেড়ে হাত-মুখ ধুয়ে কোনেমতে যাহোক একটু কিছু মুখে দিয়ে ছেলেকে নিয়ে সে মেতে ওঠে।

মোক্ষদা বলে, এইবার জব্দ হ'য়েচো!

হরিশ মুখ টিপে হাসে।

একদিন মোক্ষদা ব'ললে, এইবার আমি যদি বলি, আমার দিকে ফিরে তাকানোর সময় তোমার হয় না, কেবল খোকাকে নিয়েই মত্ত—আর জবাব কী দেবে বলো দিকি?

হরিশ হাসতে থাকে।

মোক্ষদা খোকাকে বুকে তুলে নিয়ে চুমুতে চুমুতে তার গাল ভরিয়ে দিয়ে ব'ললে, স্বার্থপর ছেলে! সোয়াগের বেলায় বাবা আর জ্বালাতন করবার বেলায় মা, কেমন?

খোকা খিল্ খিল্ ক'রে হেসে ব'ললে, বাব্বা দাবো—

কপট রাগে তার গাল টিপে দিয়ে মোক্ষদা বললে, ওরে দুষ্টু, এখন বাবা বেশি আপন হ'য়ে গেল? বলি, সারাদিন তোর ধকল কে পোয়ায় শুনি?

খোকা এক কথার মানুষ। একটা কথাই সে আঁকড়ে ব'সে আছে। আবার ব'ললে, বাব্বা দাবো—

হরিশ হো হো ক'রে হেসে উঠলো। মোক্ষদাও হেসে লুটিয়ে পড়ে আর কি!

তারপরেই ছেলের ফোলা ফোলা গালে আরো কয়েকটা চুমু খেয়ে নিবিড় ক'রে তাকে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধ'রে ব'ললে, ঠিক ব'লেচিস ধন, ঠিক ব'লেচিস! আমিতো খালি তোর ধকল পোয়াই সোনা, আর তোর-আমার দু'জনার ধকল পোয়াতে হয় তোর বাবাকে। জানিস বাবা, তোর দিদিমা বলেন, আমার শিবের মতো জামাই, আমি সত্যিকারের গৌরীদান ক'রেচি। তোর বাবার মতো হ'তে পারবিতো মাণিক?

হরিশের হাসিমুখখানা হঠাৎ নিষ্প্রভ হ'য়ে গেল।

কোন্ গভীর বেদনাকে সে প্রতিমুহূর্তে ভুলে থাকতে চায়, তা তো ছোটোবৌ তেমন ক'রে জানে না! অথবা জানলেও তার গভীরতা সে বেচারা কতটুকুই বা বোঝে?

একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে হরিশ ব'ললে, ওর বাবা কিছুই হ'তে পারেনি ছোটোবৌ। বাবার মতো হ'য়ে ও কী ক'রবে? খোকাকে তুমি আশীর্বাদ করো, ওর জীবনে এগিয়ে যাওয়ার পথে ও যেন কোনো বাধা না পায়! ও যেন বিরাট মানুষ হ'য়ে দেশের, দশের, সমাজের কাজে নিজেকে লাগাতে পারে!

হরিশের দিকে একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিলে মোক্ষদা। তার চোখের কোণও চিক্‌চিক্ ক'রে উঠেছে।

খোকার মুখখানা নিজের গালে চেপে ধ'রে প্রগাঢ় আবেগের স্বরে মোক্ষদা ব'ললে, তুমি দেখো, খোকা তোমার সব আশা পূরণ ক'রবে!

॥ পাঁচ ॥

আবার শীতকাল আসছে।

আগে থেকেই মনে মনে চিন্তিত হ'য়ে প'ড়েছেন রুক্মিণী। এবার শীতে ছেলেটা কেমন থাকবে, কে জানে! আগের বছর শীতকালে হরিশ বেশ কষ্ট পেয়েছে। বুকে শ্লেষ্মা ব'সে গিয়ে প্রচণ্ড কাশি আর শ্বাসকষ্ট। কাশতে কাশতে কোনো কোনোদিন এত কষ্ট হ'য়েছে যে বুকে বালিশ চেপে সারারাত প্রায় ব'সে কাটিয়েছে। সেই অবস্থার ভেতরেই ছেলেটা নিয়মিত আপিস ক'রেছে। মোক্ষদা তখন উত্তরপাড়ায়। সেইজন্যেই সে কিছু জানে না।

হরিশ জানে, অসাবধানে বুকে হঠাৎ শ্লেষ্মা ব'সে যাওয়ার ফলেই তাকে সেই দুর্ভোগ ভুগতে হ'য়েছিল। কিন্তু রুক্মিণীর কাছে তো সেই লক্ষণগুলো অজানা নয়!

হাঁপানি!—সেই কষ্টদায়ক ব্যাধির পূর্বাভাস!

রামধন মুখুজ্যের হাঁপানির ব্যামো ছিল, রুক্মিণী তা জানেন। পৈতৃক সূত্রে ছেলের কপালে আর কিছু জুটলো না, জুটলো কেবল সেই সর্বনাশা ব্যাধি।

রাতে ছেলেটার কষ্ট দেখে চোখ দিয়ে হু-হু ক'রে জলের ধারা নামতো রুক্মিণীর। হরিশ ছেলেবেলা থেকেই রুগ্ন, কিন্তু এ-ব্যামোর কোনো লক্ষণ তো এতদিন তিনি বুঝতে পারেননি? বিধাতাপুরুষ তাহ'লে তাঁর দুর্ভাগ্যের ষোলো কলা-ই পূর্ণ করে ছেড়েছেন।

রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে, বেদনায় বহুকাল পরে স্বামী অভিধেয় সেই মানুষটির কথা মনে প'ড়েছে রুক্মিণীর। কিন্তু স্বামীর স্মৃতি এতদিনে তাঁর কাছে বড়ো অস্পষ্ট, বড়ো বিবর্ণ হ'য়ে গেছে। চেহারাটাই ভালো ক'রে মনে পড়ে না, অন্য স্মৃতি তো দূরের কথা।

আজ প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তে প্রায় পেঁীছে গেছেন রুক্মিণী। আজ আর সেই অতীতের ধূসর, বিবর্ণ দিনগুলোর কথা ভেবে লাভ কী? ভাবতে গেলেও সব কথা মনে পড়ে না। বারবার ছিন্ন হ'য়ে যায় চিন্তা-সূত্র। সে স্মৃতি কি এক সুতোয় গাঁথা একটা মসৃণ নিটোল জপের মালা যে আল্‌তো ক'রে একটু আঙুলের ছোঁয়া পেলেই একটার পর একটা দানা আপনা-আপনি এগিয়ে আসবে?

সে-স্মৃতি আসলে যোগরহিত কতগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনার কষ্টকৃত যোগফল মাত্র! চিন্তা করতে গেলেই মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করে। তারপর সেই ভয়ঙ্কর মাথা ধরা। অসহ্য থেকে অসহ্যতর! মাথায় ঘটি ঘটি জল ঢেলেও সেই দুঃসহ যন্ত্রণার কবল থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। এক অতৃপ্ত নারীর প্রেতাত্মা যেন প্রথম যৌবন থেকেই তাঁর ওপর ভর ক'রেছে। রুক্মিণী চিতেয় না ওঠা পর্যন্ত সেই অশরীরী আত্মা তাঁকে ছাড়বে না।

তবু বিধাতাপুরুষ একটা জায়গায় তাঁকে অন্ততঃ একটু শান্তি দিয়েছেন। তাঁর হারাণ আর হরিশ নৈকষ্য কুলীনের রক্ত গায়ে নিয়েও হৃদয়বান। তারা তাদের পরিবারকে ভালোবাসে। তাঁর

ভেতরেও হরিশ যেন হারাণের চেয়েও বেশি যায়। ছোটোবৌমাকে সে যে কত গভীরভাবে ভালোবাসে, তা বুঝতে পারেন রুক্মিণী। হরিশকে দেখে বুঝতে হবে কেন, ছোটোবৌমার মুখ দেখলেই তো বোঝা যায়। ভাতারের সোহাগে দেহ-মন ভর-ভরাট হ'য়ে না থাকলে কোনো মেয়ের মুখে অষ্টপ্রহর অমন খুশির হাসি ঝিলিক মারে? সারাদিন হাসি মুখে খাটছে মেয়েটা। একটা দণ্ডের তরেও তার মুখ কালো হয় না। চলে না তো যেন উড়ে যায়। সব সময় যেন রূপকথার সুখসায়রে ভাসছে!

অত সোহাগ কি ভালো?

আজকাল রুক্মিণীর মনে একটা আশঙ্কা দেখা দিতে শুরু ক'রেছে। বড়ো আদিখ্যেতা হরিশের! বৌয়ের পীরিতে হাবুডুবু খেতে খেতে নিজের মাকে ভুলে যাবে না তো ছেলেটা? ছোটোবৌ মাগী পুরোপুরি গুণ ক'রে নেবে না তো তাঁর হরিশকে?

সেদিক থেকে হারাণ আর বড়ো বৌ সম্বন্ধে রুক্মিণী অনেক নিশ্চিন্ত। ওরা দু'টিতে যেমন সোহাগ-পীরিতেও কম যায় না, তেমনি মাঝে মাঝে আবার ঝগড়াঝাটিও করে। হারাণ তো মাঝে মাঝে বেশ তেড়ে ফুঁড়েই কথা বলে। ঠিকই করে সে। যত যা-ই হোক, বেটাছেলের কি অমন মাগমুখো হওয়া ভালো?

বড়বৌ আবার পোয়াতি হ'য়েছে। এখন একেবারে ভরা মাস। তাকে জোর ক'রেই হেঁসেল থেকে সরিয়ে দিয়েছে মোক্ষদা। দু'বেলাই সে হেঁসেল সামলায়।

সন্ধ্যাহ্নিক সেরে ভেতরদিকের দাওয়ায় ব'সে কত কথা ভাবছিলেন রুক্মিণী। হেঁসেলে ভাত রাঁধছে ছোটোবৌ। ঘরে ব'সে ছোটো জায়ের ছেলেকে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা ক'রছে বড়োবৌ।

আজকাল বেলা ছোটো হ'য়ে গেছে। শীতের দিনে বিকেল হ'তে না হ'তেই তো সন্ধ্যে নেমে আসে। বাড়ি ফিরতে হরিশের এমনিতেই রাত হ'য়ে যায়। বাড়িতে যদিও ঘড়ি নেই কিন্তু সময়ের একটা আন্দাজ তো আছে? রান্না ক'রতে ক'রতে মোক্ষদার বারবারই মনে হচ্ছিল, আজ যেন বড়ো বেশি দেরি হচ্ছে! এত দেরি কেন?

কেল্লায় রাত ন'টার তোপ পড়লো।

মোক্ষদার বুকের ভেতর ঢিপ্‌ঢিপ্ ক'রতে লাগলো। এত রাত তো কোনোদিন হয় না? মানুষটা আবার সেই অনেকদিন আগেকার মতো পথে কোথাও মাথা ঘুরে প'ড়ে যায়নি তো?

শেষ পর্যন্ত উদ্বেগ আর চেপে রাখতে পারলে না মোক্ষদা। হেঁসেল থেকে বেরিয়ে দাওয়ার কাছে এসে মৃদুস্বরে ব'ললে, আজ আপনার ছেলের আসতে যেন বড়ো বেশি দেরি হচ্চে, তাই না মা?

রুক্মিণী নিজেও দুশ্চিন্তা ক'রছিলেন। কিন্তু মোক্ষদা এসে কথাটা ব'লতেই তাঁর মাথায় যেন আগুন চ'ড়ে গেল। অস্বাভাবিক কর্কশ স্বরে ব'ললেন, দেরি হচ্চে তো কী হয়েছে বাছা? অ্যাত্‌খানি হেঁটে আসতে হয় না? আর আদিখ্যেতা ক'রো না তো বাপু! বেটাছেলে কি মাগের আঁচল ধ'রে দিনরাত্তির ঘরে ব'সে থাকবে নাকি?

এ-যাবৎ শাশুড়ির কাছে সে মায়ের স্নেহ পেয়ে এসেছে। তাঁর মুখে আজ পর্যন্ত একটা রূঢ় কথা শোনেনি। সে বুঝতেই পারলে না, তার অপরাধটা কী? মুখ নীচু ক'রে সে আবার হেঁসেলে ফিরে গেল। তার বুক ঠেলে কান্না আসছে। মনে দুশ্চিন্তা হ'চ্ছে ব'লেই কথাটা সে ব'লতে গিয়েছিল। কিন্তু তার জন্যে শাশুড়ি তাকে এমন একটা কড়া কথা ব'ললেন?

মাটির হাঁড়িতে ভাত সবে টগ্‌বগ্ ক'রে ফুটতে আরম্ভ ক'রেছে।

কাঠের চেলা একটু টেনে আঁচ কমিয়ে দিয়ে হাঁটুতে মুখ গুঁজে পিঁড়ির ওপর চুপ ক'রে ব'সে রইলো মোক্ষদা। উদ্গত কান্নার ঢেউয়ে তার পিঠ সমেত সারা দেহটা ফুলে ফুলে উঠছে। প্রাণপণে কান্না চাপার চেষ্টা ক'রছে সে। না, আর কোনোদিন শাশুড়ি-মাকে এ-কথা সে ব'লবে না। খোকার বাবার ফিরতে যত দেরিই হোক, তা নিয়ে তার নিজের মনের ভেতর যত উদ্বেগই দেখা দিক—আর কারো সামনে কোনোদিন সে তা প্রকাশ ক'রবে না।

একটু পরে হরিশ এসে গেল।

মোক্ষদা টের-ই পায়নি। সে তখনো হাঁটুতে মুখ গুঁজে কান্নার শব্দ চাপার চেষ্টাই ক'রে চ'লেছে। হাঁটুর কাপড় ভিজে যাচ্ছে চোখের জলে।

হরিশকে দেখে রুক্মিণীই চেঁচিয়ে ব'ললেন, অ ছোটোবৌমা, হরিশ এয়েচে। তারপর হরিশের উদ্দেশ্যে ব'ললেন, এত রাত করিস কেন বাবা? বাড়ির লোকের দুশ্চিন্তে হয় না? আমার কথা নয় ছেড়ে দে, কিন্তু কচি-বৌটার কথা তো ভাবতে হয়? বাছা আমার সেই কখন থেকে ভেবে ম'রছে! যা, হাতে-মুখে জল দিয়ে নে—

এবার নতুন ক'রে আর একবার হতভম্ব হওয়ার পালা মোক্ষদার! এইতো, এখন সে তার এতদিনের চেনা শাশুড়ির গলা-ই শুনছে। তাহ'লে একটু আগে এই মানুষ-ই তার সঙ্গে অত খারাপ ব্যবহার ক'রলেন কেন? নিশ্চয়ই কোনো কারণে মন বিষিয়ে ছিল। উত্তরপাড়ার বাড়িতেও তো মন বিরক্ত থাকলে মা কত সময় হঠাৎ রেগে-মেগে সাত-পাঁচ ঝাঁজালো কথা ব'লেছেন। তাই ব'লে মা কি তাকে ভালোবাসেন না? তাছাড়া এপর্যন্ত একদিনও তো শাশুড়ি-মা তার সঙ্গে কোনো দুর্ব্যবহার করেননি? তাঁর আজকের হঠাৎ-বলা একটা কটু কথাকে সে গিঁট বেঁধে পুষে রাখবে? ছি!

নিমেষের ভেতর সব দুঃখ দূর হ'য়ে গেল মোক্ষদার।

না, তার শাশুড়ি মোটেই খারাপ ন'ন। একটু আগে মনের দুঃখে সে যা ভাবছিল তা ভুল—সব ভুল!

হারাণও ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। অনুযোগের সুরে সে ব'ললে, না হরিশ, এত দেরি করাটা কোনোক্রমেই সমীচীন নয়। বিশেষ, এত রাতে এদিকে আসার পথ-ঘাট খুব নিরাপদ থাকে না। আজ এত দেরি হ'ল কেন?

হরিশ নিজেই অপ্রস্তুত বোধ ক'রছিল। সত্যিই আজ অস্বাভাবিক দেরি হ'য়ে গেছে। কিছুক্ষণ আগে সে যখন পুরনো নাচঘর এলাকা দিয়ে আসছে তখনই কেল্লায় ন'টার তোপ প'ড়েছে। তোপ শুনে সে আরো জোরে পা চালিয়েছে।

হারাণের প্রশ্নের উত্তরে হরিশ ব'ললে, স্পেন্সেস হোটেলে যেতে হ'য়েচিলো। তাই দেরি হ'য়েচে।

হারাণ চোখ বড়ো বড়ো ক'রে বললে, স্পেন্সেস হোটেল! তুই সেখানে ঘুরে এলি? বলিস কি! বাপরে বাপ, সে তো বিরাট হোটেল—এলাহি কাণ্ডকারখানা! বিরাট বিরাট বড়োলোক সাহেব বিবিরা ছাড়া সেখানে কেউ ঢুক্‌তেই পারে না। তুই সেখানে ঢুকেচিলি?

হারাণের বিস্ময় চরম সীমায় উঠলো। তার চোখ-মুখের অবস্থা দেখে হরিশ হেসে ব'ললে, আপিস থেকেই একটা কাজে আমাকে পাঠিয়েচিলো দাদা, নইলে আমাকে সেখানে ঢুকতে দেবে কেন?

—তাই বল্‌! তা ভেতরটা কেমন দেখলি? খুব জাঁকজমক? খুব জমজমাট?

—আমি সামান্যই দেখেচি। হ্যাঁ, জাঁকজমক তো বটেই!

হরিশ ভালো ক'রে সব দেখেনি তা ঠিক। কিন্তু যেটুকুও বা দেখেছে, ইচ্ছে ক'রেই তার বিস্তৃত বিবরণ এড়িয়ে গেল। কারণ, আড়ম্বর আর জাঁকজমকের কোনো প্রসঙ্গ পেলেই কেমন একটা লোভার্ত আগ্রহে দাদার চোখদুটো চক্‌চক্‌ ক'রে ওঠে, হরিশ তা ভালো ক'রেই জানে।

রুক্মিণী সাগ্রহে দু'ভায়ের কথা শুনছিলেন। একটু ফাঁক পেয়ে প্রশ্ন ক'রলেন, সেটা কী রে হরিশ?

হরিশ কিছু বলবার আগেই প্রচণ্ড উৎসাহে হারাণ ব'ললে, গোরা সা'হেবদের সবচেয়ে বড়ো হোটেল মা! তাই ব'লে যে কোনো গোরা ফিরিঙ্গিরই সেখানে থাকবার মুরোদে কুলোয় না, হ্যাঁ! একটা ঘর নিয়ে একমাস থাকতে গেলেই নাকি দু'শো টাকা—তার মানে, তোমার এক কুড়ি দু'কুড়ি নয়, একেবারে দশকুড়ি টাকা লাগে!

রুক্মিণীরও চোখ বড়ো বড়ো হ'য়ে গেছে।—বলিস কী? একমাসে দশকুড়ি টাকা!

হরিশ ঘরে ঢুকে গিয়েছিল। সেখান থেকেই হেসে ব'ললে, দু'শো নয় দাদা, একশো—একশো পঁচিশ পর্যন্ত। আমাদের আপিসে স্পেন্সেস হোটেলের রেট-চার্ট আছে, আমি দেখেচি।

হারাণ তাতেও বিন্দুমাত্র নিরুৎসাহ না হ'য়ে ব'ললে, আমি যা শুনেচিলুম, তাই ব'লেচি। সে যাই হোক, একটা মাত্তর লোকের জন্যে মাসে একশোটা টাকাও কি কম কথা? জানো মা, যে-সব গোরা সাহেবরা বিলেত থেকে ক'লকাতায় আসে, তারা খেজুরি বন্দরে পেঁছেই ডাক হরকরার হাতে আগেই স্পেন্সেস হোটেলে খবর পাঠিয়ে দেয়, পাছে ঘর না মেলে! আর চাঁদপাল ঘাটে জাহাজ থেকে নেমে তুমি যে কোনো পাল্‌কি বেহারাদের বলো, সেরা হোটেল পেঁছে দাও—তারা ঠিক তোমাকে ওই স্পেন্সেস হোটেলে নিয়েই হাজির ক'রবে!

—মরণদশা! আমি আবার মত্তে মেলেচ্ছদের হোটেলে যাবো কেন?

বড়োবৌ কখন ঘর থেকে বেরিয়ে দাওয়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। হাসি চাপতে না পেরে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে সে ব'ললে, পাগলের মতো কী যা তা ব'লচো? মা জাহাজে থেকে চাঁদপাল ঘাটে নামবেন?

—দূর, দূর, যত সব অনাছিষ্টি কথা ওর মুখেই আসে বাপু। আর কখ্‌খনো এমন কথা বলবিনি!—নিতান্ত বিরক্ত মুখে ব'ললেন রুক্মিণী।

একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে হারাণ ব'ললে, না, মানে, একটা এগ্‌জাম্পল দিলুম আর কি। যাই বলো, স্পেন্সেস হোটেলের এখন দারুণ ফেম!

ইংরিজি পড়েনি ব'লেই কথাবার্তায় দু'চারটে ইংরিজি শব্দ ব্যবহারের ঝোঁক হারাণের একটু বেশি।

রাতে শুয়ে মোক্ষদা ব'ললে, তোমার আসতে এত দেরি হচ্চে দেখে আমার যে কি দুশ্চিন্তেই হচ্ছিল গো!

হরিশ কুণ্ঠিত স্বরে ব'ললে, পথে আসতে আসতে আমি তা বুঝতে পারচিলুম ছোটোবৌ। আজ আমি এমন একটা জিনিস হাতে পেয়েচিলুম, যেটা পড়তে পড়তে কখন যে এতখানি সময় পেরিয়ে গেচে, তা বুঝতেই পারিনি।

—কী জিনিস গো?

—লণ্ডন টাইম্‌স। আমাদের গোরা-রাজাদের দেশের নাম ইংল্যাণ্ড, তা জানো তো? সেখানকার কলকাতা হ'ল লণ্ডন শহর। কলকাতার চেয়েও অনেক পুরনো। সেখান থেকে বেরোয় একখানা খুব নামজাদা পত্রিকা—তার নাম লণ্ডন টাইম্‌স্।

অবাক্ বিস্ময়ে মোক্ষদা ব'ললে, তুমি কোথায় পেলে?

—ওই যে শুনলে না, স্পেন্সেস হোটেলে গিয়েচিলুম? সেখানেই আজ আমি টাইম্‌স্ কাগজের চেহারা এই প্রথম দেখলুম। পড়বার সুযোগ-ও একটু পাওয়া গেল; সে-সুযোগ ছাড়িনি ব'লেই এত দেরি।

আজ হরিশের জীবনে একটা নতুন রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা!

এডোয়ার্ড হিল নামে এক ব্রিটিশ যুবক কয়েকদিন আগে এদেশে এসে পেঁছেছেন। উদ্দেশ্য, ক'লকাতার সুপ্রীমকোর্টে আইন-ব্যবসা।

নবাগত অভিজাত বংশীয় ইংরেজরা সাধারণত স্পেন্সেস হোটেলেই ওঠেন। হিল সাহেবও সেখানেই উঠেছেন। তাঁর ইচ্ছে, এস্‌প্ল্যানেড অঞ্চলের কাছাকাছি কোথাও একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেখানে চলে যাওয়া। কিছু ভালো আসবাব-পত্রের জন্যে তিনি টলা

কোম্পানির ক্যাটালগ চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। আপিস ছুটির পর তাঁর কাছে ক্যাটালগ পেঁাছে দেওয়ার দায়িত্ব প'ড়েছিল হরিশের ওপর।

টলা কোম্পানির নেটিব প্রতিনিধিকে দেখে অবাক হ'য়ে হরিশের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন হিল সাহেব। তিনি জেনে এসেছেন, এদেশের সব লোকেরই গায়ের রঙ কালির মতো কালো। পালকি বেহারা থেকে হোটেলের বেয়ারা-বাবুর্চি সবাইকে সেই রকমই দেখেছেন তিনি। তাহ'লে এত উজ্জ্বল গৌরবর্ণের মানুষ-ও এদেশে আছে!

হিল্ যখন বিস্মিত হ'য়ে হরিশকে দেখছিলেন, হরিশ তখন সাগ্রহে সামনের টেবিলের দিকে তাকিয়ে দেখছে—একখানা টাইম্স্ পত্রিকা! নাম শোনা কাগজটাকে চোখে দেখা এই প্রথম।

হিল সাহেব কৌতূহল চাপতে পারছিলেন না। প্রশ্ন ক'রলেন, আপনি এদেশেরই মানুষ তো?

হ্যাঁ, খাঁটি বাঙালি। —উত্তর দিলে হরিশ।

—আশ্চর্য, এদেশের মানুষ এত ফর্সা হয়! অথচ আমি শুনে এসেচি, এখানে সবাই কালো।

হরিশ ব'ললে, আমাদের দেশ ভারতবর্ষের আয়তন বিশাল মিষ্টার হিল। উত্তর ভারতে এমন অজস্র মানুষ আছে, যাদের ফরসা রঙের পাশে আমাকে কালো দেখাবে। তবে আমরা ভারতীয়েরা গায়ের রঙ দিয়ে মানুষ বিচার করি না, ও-ব্যাপারে আপনাদের দেশের লোকই অতিমাত্রায় সচেতন।

তরুণ বাঙালি যুবকটির কথার ভেতর শ্বেতাঙ্গদের বর্ণগত উন্নাসিকতার ওপর রীতিমতো শ্লেষ আছে বুঝেও তার কথা বলবার মার্জিত রুচিশীল ভঙ্গিটি কিন্তু নবাগত ইংরেজ যুবকের ভালো লাগলো। হরিশকে তিনি ব'সতে অনুরোধ ক'রলেন।

ভদ্রতার খাতিরে বসতেই হ'ল হরিশকে।

এদেশ সম্বন্ধে কিছু জানার আগ্রহে তিনি কিছু কিছু প্রশ্ন ক'রলেন। হরিশ-ও সংক্ষেপে প্রশ্নগুলির উত্তর দিলে। শুধু যে তার কথা বলবার মার্জিত, বুদ্ধিদীপ্ত ভঙ্গিটুকুই হিল সাহেবকে আকৃষ্ট ক'রেছে তা নয়—একজন বিদেশি হিসেবে ইংরিজিভাষার ওপর এই বাঙালি যুবকের সহজ, স্বচ্ছন্দ অধিকার দেখেও তিনি বিস্মিত।

হিল এদেশে আন্‌কোরা নতুন। এখানে এসে তাঁর স্বজাতি শ্বেতাঙ্গদেব কাছে তালিম পাওয়ার অবকাশ তাঁর তখনো হয়নি। হয়তো সেইজন্যেই হরিশের কথাবার্তা শুনে তাঁর কৌতূহল ক্রমেই বাড়ছিল। হঠাৎ তিনি প্রশ্ন ক'রে ব'সলেন, একজন ভারতীয় হিসেবে এদেশে ব্রিটিশ-শাসন সম্বন্ধে আপনার অভিমত কী?

হরিশ কয়েকমুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে তারপর ব'ললে, আমি নিতান্তই একজন সাধারণ মানুষ। আমার মতামতে কী এসে যায় মিষ্টার হিল?

হিল বুঝতে পারলেন, বুদ্ধিমান যুবকটি সুকৌশলে তাঁর প্রশ্নকে এড়িয়ে গেল। এড়িয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। কারণ, যুবকের দৃষ্টিতে তিনি নিজে তো শাসক-জাতের একজন ব'লেই চিহ্নিত।

এবারে হিল ব'ললেন, দেশে থাকতে শুনেচি এবং সংবাদপত্রেও মাঝে মাঝে প'ড়েচি, কোম্পানির সিবিলিয়ান হ'য়ে যাঁরা এদেশে আসেন, তাঁদের অনেকেই এখানে বিরক্তিকর আচরণ ক'রে থাকেন। যার ফলে দু'পক্ষের ভেতর সুস্থ সম্পর্ক গ'ড়ে উঠ্‌চে না। এটা কি ঠিক?

—হ্যাঁ, ঠিক।—শান্ত গম্ভীর স্বরে হরিশ ব'ললে, আমাদের এদেশের সমাজে বহু কুসংস্কার ছিল এবং আছে। ব্রিটিশ শাসনের আমলে তার কিছু কিছু দূর হ'য়েছে, ভবিষ্যতে হয়তো আরো হবে। অন্ধ সংস্কার থেকে য়ুরোপ-ও তো মুক্ত নয়? তা নইলে মধ্য যুগে সেখানে ক্যাথলিক আর প্রোটেস্ট্যান্টের দাঙ্গায় মানুষের রক্তে মাটি লাল হ'য়ে উঠেচিল কেন? উইচ-হাণ্টিং এখনো হয়তো লোপ পায়নি। আমাকে মাফ ক'রবেন মিস্টার হিল, একজন নবাগত ব্রিটিশ হিসেবে খোলামনে আপনি আমাকে যে প্রশ্ন ক'রেছেন, খোলামনে তার উত্তর দিতে গেলে আমাকে এ-কথা অকপটে ব'লতেই হবে যে, মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া কি সিবিলিয়ান, কি মিশনারি, কি ব্যবসায়ী—

শ্বেতাঙ্গ সমাজের অধিকাংশেরই এদেশের মানুষ সম্বন্ধে মনোভাবের মূলে ভিত্তিটা ঘৃণা আর তাচ্ছিল্য। আশা করি, আপনিও নিশ্চয়ই স্বীকার ক'রবেন, এ অবস্থায় শাসক আর শাসিতের ভেতর সুস্থ সম্পর্ক গ'ড়ে উঠতে পারে না।

এডোয়ার্ড হিল বেশ কিছুটা বিস্ময়ে হরিশের মুখের দিকে তাকালেন। শান্ত গম্ভীর গলায় বাঙালি যুবক যে কথা ক'টি বলে গেল, তার তাৎপর্য অনেক গভীর। শুধু তাই নয়, যুবকের চোখমুখে কোনো ভয় বা দ্বিধার চিহ্নমাত্র নেই!

—আপনার স্পষ্ট উত্তর আমার ভালোই লাগলো বাবু। এদেশে থাকলে আপনার এ-কথাগুলো আমার কাজে লাগবে ব'লেই আমি মনে ক'রচি। ধন্যবাদ—

কথাটা ব'লেই এডোয়ার্ড হিল হাত বাড়িয়ে টেবিলের ওপর থেকে সেই টাইম্‌স্‌ কাগজখানা তুলে নিলেন। ব'ললেন, দেশ থেকে যেদিন জাহাজে চ'ড়েচি, সেই তারিখের কাগজ। আমি বুঝতে পারচি, দেশবিদেশের অনেক খবর আপনি রাখেন। সুতরাং টাইম্‌স্‌ কাগজের নাম আপনার জানা আছে, এটা নিশ্চয়ই ধ'রে নিতে পারি? আমার অনুরোধ, এই লেখাটা আপনি প'ড়ে দেখুন। আশা করি, এটুকু অন্তত বুঝতে পারবেন যে, এ-বিষয়ে আমাদের দেশেও যথেষ্ট সমালোচনা করা হয়!

কাগজের একটা লেখা দেখিয়ে হরিশের দিকে কাগজখানা এগিয়ে দিলেন হিল সাহেব। হরিশ সাগ্রহে প'ড়তে আরম্ভ ক'রলে।

প্রবন্ধটা ভারতবর্ষের বর্তমান গবর্নর জেনারেল লর্ড এলেনবরার ওপর লেখা।

পাঠানদের হাতে গোরাপল্টনের সেই শোচনীয় পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়ে যেতে পারেননি আগেকার লাটসাহেব লর্ড অকল্যাণ্ড। মনের ক্ষোভ মনে চেপে রেখেই চ'লে যেতে হ'য়েছে তাঁকে। তাঁর পরেই ব্রিটিশ ভারতের নতুন গবর্নর জেনারেল হ'য়ে এলেন লর্ড এলেনবরা।

শাসকের পরিবর্তন—কৌশলেরও পরিবর্তন।

এদেশে এসেই নতুন গবর্নর জেনারেল তাঁর প্রথম কর্তব্য বেছে নিলেন, আফগানিস্তানের রুক্ষ, পার্বত্য প্রান্তরে ব্রিটিশ-সিংহের হৃতমর্যাদা পুনরুদ্ধার। লর্ড অকল্যাণ্ড যে-ভুল ক'রেছিলেন, সে-ভুল লর্ড এলেনবরা ক'রবেন না।

সাজ সাজ রব প'ড়ে গেল কোম্পানির পল্টন ছাউনিতে।

প্রায় পাঁচবছর পরে উদ্ধত, দুর্বিনীত আফগানিস্তানে নতুন ক'রে আবার হবে ব্রিটিশ অভিযান!

অভিযানের নেতৃত্ব দেবেন সেনাপতি পোলক।

এ-রকম একটা অভিযানের জন্যে এমন সেনাপতির দরকার, যে-লোক চূড়ান্ত দুঃসাহসী, বেপরোয়া, হৃদয়হীন আর নৃশংস। এই সব ক'টি যোগ্যতাই আছে সেনাপতি পোলকের। তাই তাঁকেই নির্বাচন ক'রেছেন গবর্নর জেনারেল।

কাবুল আক্রমণ ক'রতে গেলে সিন্ধুর ভেতর দিয়ে যাওয়াই সুবিধে। তাতে পথ এবং ব্যয়, দুই-ই সংক্ষেপ হবে। কিন্তু লর্ড বেন্টিঙ্ক যে কয়েকবছর আগে সিন্ধুর আমীরদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখার জন্য মৈত্রী-চুক্তি ক'রে রেখে গেছেন? সিন্ধুর ভেতর দিয়ে সেনাবাহিনী নিয়ে কাবুল অভিযানে গেলে সে চুক্তিতে ফাটল ধরবে না তো? ধরে ধরুক, তাছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

সেনাবাহিনী নিয়ে এগিয়ে চ'ললেন সেনাপতি পোলক। সদীর্প সিন্ধুর ভেতর দিয়েই কাবুলে গিয়ে পৌঁছলেন তিনি। তারপরই আরম্ভ হ'ল বৃটিশ-সিংহের হৃত-গৌরব পুনরুদ্ধার।

উন্মাদ ধ্বংসলীলা—বর্বর হত্যাভিযান!

নারী, শিশু, বৃদ্ধ কেউ রেহাই পায়নি সেনাপতি পোলকের হাতে। এমন সেনাপতি পেয়ে গোরা সৈন্যেরাও পৈশাচিক উল্লাসে মেতে উঠলো। নির্বিচারে হত্যা, অগ্নিসংযোগ, ধ্বংস আর লুণ্ঠন। সেনাপতির আদেশ, চালাও, আরো চালাও! পাঁচবছর আগে কাবুলের এই বেয়াদপ

মানুষগুলো আমাদের একটা গোটা বাহিনীকে ধ্বংস ক'রে দিয়েছিল, সে অপমানের প্রতিশোধ নেওয়া কি এত অল্পে হয়?

ক'দিন ধ'রে নারকীয় জিঘাংসার তাণ্ডব চ'ললো কাবুলের ওপর। রক্তে লাল হ'য়ে গেল মাটি, অসংখ্য শবদেহ হ'ল স্তূপাকার।

সেনাপতি পোলক পরিতৃপ্ত। সিদ্ধ হয়েছে তাঁর সঙ্কল্প। বিজয়গর্বে কাবুল ত্যাগ ক'রে তিনি ভারতের পথে পা দিলেন। · আবার সেই সিন্ধুর ভেতর দিয়ে।

কিন্তু ঘটনার জের সেখানেই মিটলো না।

বেন্টিঙ্কের আমলে হ'য়েছিল মৈত্রী চুক্তি। কিন্তু কই, সে-চুক্তির মর্যাদা তো রাখলো না ইংরেজ সরকার? চুক্তিকে বুটের তলায় মাড়িয়ে সিন্ধুর মাটির ওপর দিয়েই গোরাপল্টন কাবুলে গেল এবং ফিরে এলো।

বিক্ষুব্ধ সিন্ধুর আমীরের দল, বিক্ষুব্ধ সিন্ধুর সাধারণ মানুষ। সিন্ধী, বালুচ সবাই।

অবস্থা একটু ঘোরালো দেখে স্যার চার্লস্ নেপিয়ারকে নতুন চুক্তি করবার জন্যে সিন্ধুর আমীরদের কাছে দূত হিসেবে পাঠালেন লর্ড এলেনবরা। কিন্তু নেপিয়ারের উদ্ধত ব্যবহারে ক্ষিপ্ত হ'য়ে স্বাধীনচেতা বালুচেরা আক্রমণ ক'রলে দূতাবাস।

আবার নেটিবদের বেয়াদপি? অসহ্য!

সিন্ধুপ্রদেশ আক্রমণ করবার আদেশ দিলেন গবর্নর জেনারেল। বিজয়ী হ'ল ইংরেজবাহিনী। ইউনিয়ন জ্যাক উড়লো সিন্ধুপ্রদেশের আকাশে।

রুল ব্রিটানিয়া রুল দি ওয়েভ্স্
ব্রিটন্স্ শ্যাল নেভার বী শ্লেভ্স্

আর একবার সাফল্যের পরিতৃপ্তিতে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো লর্ডের মুখ। রাজধানী কলকাতার গবর্ণমেণ্ট হাউসে হ'ল বিরাট উৎসবের আয়োজন। আলোকসজ্জা, বলনাচ আর ফেনিল সুরার প্রবাহ।

টাইম্সের লেখাটি প'ড়ে মুখ তুলে তাকালে হরিশ।

লর্ড এলেনবরার কাবুল আক্রমণ আর সিন্ধু জয়ের ঘটনাকে উদ্ধত, অপরিণামদর্শী শাসকের উপযুক্ত কাজ ব'লে বেশ কড়া ভাষাতেই মন্তব্য ক'রেছে টাইম্স্। কাবুলে বৃটিশ বাহিনীর নিষ্ঠুর ক্রিয়াকলাপকে ধিক্কার দিয়েছে।

লর্ড এলেনবরার মতো উগ্র, অপরিণামদর্শী গবর্ণর জেনারেল বেশিদিন ক্ষমতায় থাকলে ব্রিটিশ জাতির স্বার্থ এবং মর্যাদা যে মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ণ হবে, সে সম্বন্ধে টাইম্স্ বেশ স্পষ্টভাবেই সতর্কবাণী উচ্চারণ ক'রেছে।

—কেমন লাগলো?—উৎসুকভাবে প্রশ্ন ক'রলেন এডোয়ার্ড হিল।

আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ মিস্টার হিল! সত্যি কথা ব'লতে কি, আজ এই সমালোচনা প'ড়েই প্রথম জানতে পারলুম, কাবুলে সত্যি সত্যি কী ঘ'টেচিলো। আমাদের এখানে ব্রিটিশ পরিচালিত যে ক'টা কাগজ আছে, তাতে ব্রিটিশ শক্তির বিজয়গর্বে উচ্ছ্বাস প্রকাশ ক'রতেই দেখেছিলুম। সুনাম, মর্যাদা কিম্বা মানবতার প্রশ্ন তুলে এমন ঝামেলা ক'রতে দেখিনি।

এডোয়ার্ড হিল হেসে ব'ললেন, এখানকার কাগজের সম্পাদককে নিশ্চয়ই গবর্ণর জেনারেলের মন জুগিয়ে চলতে হয়! সে যাই হোক, ভারতবর্ষে নতুন এসে আপনার সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে আমার যথেষ্ট লাভ হ'ল বাবু! আমি খুব শিগ্‌গিরই ভাড়া বাড়িতে উঠে যাবো। আমি ব্যবস্থা ক'রে এসেচি, প্রতি জাহাজের ডাকেই দেশ থেকে আমার কাছে কিছু কিছু পত্র-পত্রিকা আসবে। আপনার আগ্রহ থাকলে আপনি অনায়াসেই সেগুলো প'ড়তে পারবেন। আপনাকে আমার সাদর আমন্ত্রণ জানানো রইলো।

স্পেন্সেস হোটেল থেকে যেন হাওয়ায় ভেসে বেরিয়ে এলো হরিশ।

নবাগত একজন ব্রিটিশ যুবকের সম্বন্ধে এই অভিজ্ঞতা বেশ ভালোই লাগছে। কিন্তু এখানকার শ্বেতাঙ্গ সমাজের হাওয়া গায়ে লাগার পর এই এডোয়ার্ড হিল-ই কি আজকের মতো এত অন্তরঙ্গভাবে একজন নেটিবের সঙ্গে কথা ব'লতে পারবেন?

হোটেল থেকে বেরিয়েই চোখের সামনে বিরাট প্রাসাদ গবর্ণমেন্ট হাউস।

ওই তো লর্ড ওয়েলেস্‌লির তৈরি ক'রে রেখে যাওয়া লাটপ্রাসাদের ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে। ওরই কোনো সুসজ্জিত কামরায় ব'সে শ্যাম্পেনের পাত্রে চুমুক দিতে দিতে লর্ড এলেনবরা হয়তো নতুন কোনো নৃশংস অভিযানের পরিকল্পনা ক'রছেন!

পুব দিকের রাস্তা ধ'রে হাঁটছে হরিশ।

সামনে গবর্ণমেন্ট হাউসের বিরাট প্রবেশদ্বার। কৃষ্ণা-পঞ্চমীর আবছা আলো-আঁধারির প্রেক্ষাপটে প্রবেশদ্বারের ওপরকার সিংহটাকে বেশ বোঝা যাচ্ছে। বৃটিশ-সিংহের প্রতীক!

বেশ রাত হ'য়ে গেছে।

অবশ্য শ্বেতাঙ্গদের কাছে এখন রাত-ই নয়। হোটেল, ট্যাভার্ন আর পাঞ্চ-হাউসে এখন তাদের ভীড় ক্রমেই বাড়তে থাকবে। এখনকার এই প্রায়-নির্জন রাস্তাই আবার গাড়ির চাকা আর ঘোড়ার খুরের শব্দে ঘন ঘন উচ্চকিত হ'তে থাকবে রাত বারোটার পর। মদে বেহুঁশ সাহেব-বিবিদের নিয়ে তাদের গাড়িগুলো ফিরবে কুঠিতে কুঠিতে।

হন হন ক'রে পা চালিয়েছিল হরিশ। তারপর বাড়ি পর্যন্ত এসে পেঁছিতে যা সময় লেগেছে।

হরিশের বিবরণের প্রত্যেকটি শব্দ যেন হাঁ ক'রে গিলছিল মোক্ষদা। হরিশ থামতেই সে ব'ললে, তারপর?

—তারপর আবার কী? আমার কথাটি ফুরোলো, ন'টে গাছটি মুড়োলো—

—আহা, তুমি কি রূপকথা ব'লচো নাকিনি?

—রূপকথার মতোই তো! রাজ্যিজয় ক'রে ফিরে এসে আট টাকা মাইনের রাজামশাই এবার রাজরাণী আর রাজপুত্তুরকে নিয়ে সুখে রাত বারোটার পর ঘুমোনোর চেষ্টা ক'রবে।

স্নিগ্ধ মৃদুস্বরের ভেতর দিয়ে মনের সবটুকু আবেগ উজাড় ক'রে মোক্ষদা ব'ললে, সেটা তো আর মিছে নয়? নিশ্চয়ই, রাজরাণীই তো আমি! হ্যাঁ, খোকা আমার রাজপুত্তুর!

॥ ছয় ॥

কয়েকদিন আগে সবাই মাইনে পেয়েছে!

তারপর থেকেই টলা কোম্পানীর নেটিব রাইটার মহলে দেখা দিয়েছে একটা চাপা বিস্ময় আর বিক্ষোভ। এখানে চাকরিতে কারো পনেরো-বিশ বছর, কারো আট-দশ, কারো বা অন্তত পাঁচবছর হ'য়ে গেল। কাজ তো সবাই সাধ্যমতোই ক'রে আসছে, কিন্তু এতদিনের ভেতর এ-রকম তাজ্জব কাণ্ডতো কখনো ঘটেনি! কারো কম ক'রে পাঁচ বছর কি সাত বছরের মাথায় হয়তো একটা টাকা মাইনে বেড়েছে। কিন্তু ব'লতে গেলে একেবারে আনকোরা রাইটার হরিশ ছোঁড়ার বেলায় এটা কী হ'ল?

একলাফে মাইনে বেড়ে গেল দু'টাকা!

বয়সে সবচেয়ে ছোটো, সবচেয়ে জুনিয়ার রাইটার হরিশ মুখুজ্যে কিনা দু'টাকা ইন্‌ক্রিমেন্ট নিয়ে সবায়ের চোখের সামনে দিয়ে ড্যাং ড্যাং ক'রে বাড়ি চ'লে গেল! বাকি সবাই সাবেক মাইনে নিয়ে আঙুল চুষতে চুষতে বাড়ি যাও?

ছোকরা কী দিয়ে বড়ো সাহেবকে বশ ক'রেছে, সেইটেই তো রহস্য!

কাজ দিয়ে নিশ্চয়ই নয়। কাজে আর কেউ কিছু কমতি যায় না। বরঞ্চ ওই জুনিয়র রাইটারের চেয়ে কাজ তারা অনেক বেশি বোঝে, তাদের অভিজ্ঞতাও অনেক বেশি। তাহ'লে কিসের জোরে টেক্কা দিলে হরিশ?

একমাত্র উত্তর—গায়ের রঙ।

হ্যাঁ, ওই ধবধবে রঙই ছোকরার বরাৎ খুলে দিয়েছে। গোরাসাহেবদের কাছে চামড়ার রঙ দিয়েই তো সব কিছুর বিচার! নইলে গোরা রাইটার আর নেটিব রাইটারদের ভেতর মাইনের বেলায় এমন আশমান জমিন ফারাক কেন? তাও আবার দ্যাখো, নেটিবদের ভেতর ঠিক ওই ধলা চামড়াকেই বেছে নিয়েছে। বলা নেই, কওয়া নেই, অমনি একটা জুনিয়রের মাইনে দু'টাকা বাড়িয়ে দিলে? চোখের সামনে এমন অবিচার দেখলে কাজ ক'রতে কারো ইচ্ছে হয়?

হরিশের কাছে ব্যাপারটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত।

ক্যাশিয়ারবাবু সেদিন যখন গুণে গুণে দশটা সিক্কা টাকা তার হাতে দিলেন, তখন সে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে ছিল।

ক্যাশিয়ারবাবু হেসে ব'ললেন, হাঁ ক'রে দেখচো কী হে? সই করবার সময় দ্যাখোনি, আট টাকার জায়গায় এবারে দশ টাকা লেখা রয়েচে? নাও, আর একবার দেখে নাও—

খাতাখানা একটু এগিয়ে ধ'রলেন তিনি। হরিশ দেখলে, স্পষ্ট লেখা রয়েছে দশটাকা। অর্থাৎ তার মাইনে তাহ'লে দু'টাকা বেড়েছে!

আবার সেই দু'টাকা!

পথে হাঁটতে হাঁটতে বছর চারেক আগেকার একটা দিনের স্মৃতি তার চোখের সামনে ভেসে উঠ্‌লো। ইউনিয়ন স্কুল থেকে বিদায় নেওয়ার পর যখন দরখাস্ত লেখার ওপর নির্ভর ক'রে দিন চ'লছিল, তখনকার একটা ঘটনা।

তখন বর্ষাকাল।

ক'দিন ধ'রেই বৃষ্টি চ'লছে। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি, তার সঙ্গে ঝ'ড়ো হাওয়া। দুর্যোগে বাইরে বেরোনো কঠিন।

সে'কদিন দরখাস্ত লেখাতে হরিশের কাছে কোনো লোকই আসেনি। কেমন ক'রে আসবে? এমনিতেই অত দুর্যোগ, তার ওপর পথে এমন জল-কাদা হ'য়েছে যে পা দিলে হাঁটু পর্যন্ত ব'সে যায়। টাউন ক'লকাতা হ'লে তবু কথা ছিল। সেখানে সব পাকা রাস্তা। পাকা ব'লতে খোয়া-বাঁধানো। টাউন ক'লকাতার জন্যে সব কিছু ক'রতেই কোম্পানি রাজি। একসময় চৌদ্দ লাখ টাকা খরচ ক'রে লর্ড ওয়েলেসলি যেমন লাটপ্রাসাদটা তৈরি করিয়েছেন, তেমনি কলকাতার পথ-ঘাটও অনেক ক'রে রেখে গেছেন। উত্তরে সেই চিৎপুরের মারাঠা খালের কাছ থেকে এই ভবানীপুর গড়ের মাঠের ভেতর দিয়ে সেই খিদিরপুর পর্যন্ত সার্কুলার রোড নামে অতবড়ো রাস্তাটাতো তিনিই ক'রে রেখে গেছেন। কিন্তু সার্কুলার রোডের দক্ষিণে ভবানীপুর আগেও যা ছিল পরেও তাই। ভবানীপুর তো টাউন ক'লকাতার চৌহদ্দির ভেতর নয়, তাই লটারি কমিটিও সেখানকার রাস্তায় একটুকরো খোয়াও ফেলেনি।

যেদিনের ঘটনা তার আগের দিনই রুক্মিণী ব'লেছিলেন, আসচে কাল কিন্তু ঘরে চাল একেবারে বাড়ন্ত হ'য়ে যাবে বাবা!

করুণ মুখে তাকিয়ে হরিশ ব'লেছিলো, দেখি, কাল যদি কেউ দরখাস্ত লেখাতে আসে!

বাড়িতে তখন তারা তিনজন—মা, মোক্ষদা আর হরিশ নিজে। বড়োবৌ ক'দিন আগে বাপের বাড়ি গেছে, হারাণও তার ক'দিন পরে একটা ছুতো ক'রে শ্বশুরবাড়ি গেছে। হরিশের আশা ছিল, পরের দিন দুর্যোগ হয়তো একটু ক'মবে আর যাহোক দু'একজন লোক দরখাস্ত লেখাতে আসবে।

কিন্তু পরের দিন দুর্যোগ যেন আরো বেশি ক'রে ঘনিয়ে এলো। মাঝরাতে বৃষ্টি একটু ধ'রেছিল। ভোরের একটু আগে থেকেই আবার অঝোর ধারায় বৃষ্টি শুরু হ'ল। ঝ'ড়ো হাওয়া যেন আগের দু'তিন-দিনের চেয়েও দামাল হ'য়ে উঠেছে। তার সঙ্গে অনবরত বিদ্যুতের ঝিলিক আর মেঘের গর্জন। তার ভেতর কেউ যে পথে বেরোবে তার সাধ্য কী? হাওয়ার দাপটে

জানালার কপাট খোলা যায় না। তবু কপাট একটু ফাঁক ক'রে আকুল প্রত্যাশায় পথের দিকে তাকিয়ে রইলো হরিশ। বলা যায় না, হয়তো এমনও হ'তে পারে যে, আজই দরখাস্ত লিখিয়ে জমা না দিলেই নয়, এমন কেউ হঠাৎ এসে প'ড়তে পারে।

কিন্তু কোথায় লোক? পথে একটা কুকুর পর্যন্ত নেই।

সকাল থেকে কতক্ষণ যে এই নিস্ফলা প্রতীক্ষার পালা চ'লেছে, তাও বুঝতে পারছিল না হরিশ। ঝ'ড়ো হাওয়া আর মেঘের গর্জনে কোনো পেটা ঘড়ির শব্দও কানে আসেনি।

হয়তো বেলা দশটা বাজে—কিম্বা হয়তো এগারোটা।

তখন প্রায় চোখ ফেটে জল আসার অবস্থা হরিশের। সব আশাই তো ব্যর্থ হ'ল! ছোটো বৌ তখন এবাড়িতে একেবারেই নতুন বৌ। সেই নতুন বৌকেও উপোসে রাখতে হবে?

মোক্ষদা কিছুক্ষণ থেকেই কিছু একটা ব'লবে ব'লে হরিশের মুখের দিকে তাকিয়ে আবার চোখ নামিয়ে নিচ্ছিলো। হরিশকে জানালার কপাট বন্ধ ক'রতে দেখে মৃদুস্বরে সে ব'ললে, হ্যাঁগা, একটা কাজ ক'রবে? আমার এই নোলকটা কোথাও বন্ধক দিয়ে—

তার কথা শেষ হ'তে না দিয়েই ধরা গলায় হরিশ ব'ললে, ছি! তা আমি পারবো না! তা কি হয়?

—কেন গো, তাতে কী হয়েছে? হাতে টাকা পেলেই আবার ছাড়িয়ে আনবে!

—ও-কথা তুমি আমাকে ব'লো না ছোটোবৌ! আমরাও গরীব, তোমার বাবাও গরীব। তিনি কত কষ্টে তোমাকে ওই একটা মাত্র সোনার গয়না দিয়েছেন, তা কি আমি বন্ধক রাখতে পারি? তিনি জানতে পারলে কত কষ্ট পাবেন!

মোক্ষদা চুপ ক'রে রইলো।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ালে হরিশ।—মা, কেউ এলো না! আর তো কোনো উপায় দেখছিনে!

ধাতুপাত্র ব'লতে সম্বল একখানা পিতলের থালা। কোনো কথা না ব'লে থালাখানা বের ক'রে দিলেন রুক্মিণী।

হরিশ ইতস্তত ক'রছে। রুক্মিণী ব'ললেন, তুই আমি হয়তো উপোস দিতে পারবো, কিন্তু ঘরে নতুন বৌ। ওইটুকু মেয়েকে আমি উপোসী রাখতে পারবো না। এই থালা বাঁধা দিয়ে যেখান থেকে হোক চাল কিনে আন্—

ধুলো ঝেড়ে থালাখানাকে গামছায় জড়িয়ে নিয়ে হরিশ সবে বেরোতে যাচ্ছে, এমন সময় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ।

হরিশের বুকের ভেতরটা ধক্ ক'রে উঠ্‌লো। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিতেই হিহি ক'রে কাঁপতে কাঁপতে ঘরে ঢুকলেন এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক। হাতে একটা চামড়ার ব্যাগ আর ছাতা। ছাতাটা অবশ্য তখন আর ছাতার মতো নেই। একটা বাঁটের সঙ্গে কুণ্ডলী পাকানো কয়েকটা শিক আর খানিকটা কাপড়ের টুক্‌রো।

আগন্তুক ভদ্রলোক একজন সম্ভ্রান্ত জমিদারের মোক্তার। পরের দিনই আদালতে তাঁদের সেরেস্তার একটা মামলা আছে। সেই সংক্রান্ত কিছু বাঙলা নথিপত্রের ইংরিজি অনুবাদ দরকার। হরিশের নাম তিনি লোকমুখে শুনেছেন। ব্যাপারটা এতখানি জরুরি ব'লেই এই দুর্যোগের ভেতরেও তাঁকে আসতে হয়েছে। এই অবস্থায় হরিশ যদি একটু কষ্ট ক'রে তাঁর এই উপকারটুকু ক'রে দেয় তাহ'লে তিনি খুবই কৃতজ্ঞ থাকবেন!

একেবারে নাটকীয় ঘটনার মতো!

কিন্তু তাইতো ঘ'টেছিল সেদিন। সেই মোক্তারবাবু পারিশ্রমিক হিসেবে দু'টো টাকা দিয়েছিলেন হরিশকে। টাকা তো নয়—দু'টো মোহর যেন!

সেদিন তাইই মনে হ'য়েছিল হরিশের। সেই দু'টাকা কেবল সেদিনকার সঙ্কট থেকেই

উদ্ধার করেনি, তার পরের কয়েকদিনের জন্যেও দুশ্চিন্তা দূর ক'রেছিল।

সে-কথা ভোলেনি হরিশ। সহজে কি ভোলা যায়?

এ-বারেও নাটকীয় ভাবে হাতে এলো ঠিক সেই দু'টাকা। অবশ্য এই দু'টাকার সঙ্গে সেদিনকার সেই দু'টাকার পার্থক্য আকাশ-পাতাল!

কেন যে হঠাৎ তার ওপর সদয় হ'য়ে বড়োসাহেব মাইনে বাড়িয়ে দিলেন, হরিশ তা নিজেই জানে না। অথচ ক'দিন ধ'রেই বেশ কয়েকজন সহকর্মীর কাছে কথার খোঁটা তাকে শুনতে হ'য়েছে। দু'জন মাত্র তাকে কোনো খোঁটা দেননি—সরকারবাবু আর ব্রজ মিত্তির।

হঠাৎ মাইনে বেড়ে যাওয়ার পেছনেও ছিল একটা নাটকীয় ঘটনা কিন্তু হরিশের পক্ষে সেটা জানার সুযোগ হয়নি।

আগের মাসে একদিন দুপুরে বড়ো সাহেবের সঙ্গে দেখা ক'রতে এলেন একজন শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক। সেই ভর দুপুরেই তিনি মদের নেশায় চুর হ'য়ে আছেন। ভাবভঙ্গি খুবই উত্তেজিত। নিজের পরিচয় দিলেন মিস্টার ক্যারেল। তাঁর অভিযোগ, কথায় কথায় এত সতীপনা ক'রলে ব্যবসায়িক লেন-দেন করা যায় না। টলা কোম্পানি সোজা ব'লে দিক যে সতীপনা সে ফলাবেই, তাহ'লে মিস্টার ক্যারেলও ভবিষ্যতে এই হৌসের সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক রাখবেন না। কলকাতায় অক্শনের আরো হৌস আছে।

বড়ো সাহেব প্রথমে কিছুই বুঝতে পারেননি। তাঁকে ব'সতে ব'লে তাঁর মুখ থেকে এলোমেলো ভাবে কিছু কথা শোনার পর ব্যাপারটা আঁচ ক'রতে আরম্ভ ক'রলেন।

মিস্টার ক্যারেল ব'ললেন, দেখুন, আমি আগে কোম্পানির একজন রাইটার ছিলুম, এখন একজন ফ্যাকটর। সুতরাং আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একজন ফ্যাকটরের সামাজিক মর্যাদা যথেষ্ট?

—নিশ্চয়ই। —বড়োসাহেব ব'ললেন।

—তাছাড়াও আমি যে হারে বেনামি ব্যবসা চালাতে শুরু ক'রেচি, তাতে দু'তিন বছরের ভেতরেই কলকাতার য়ুরোপীয় সমাজে আমি যে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হ'য়ে উঠবো তা আমি আপনাকে লিখে দিয়ে যেতে পারি। শুনে অবাক হবেন না, হয়তো আর কয়েক বছরের ভেতরেই গবর্নমেন্ট হৌসের পার্টিতে নিয়মিতভাবে নিমন্ত্রিত হবে এই মিস্টার ক্যারেল। সেই জন্যেই একজন সম্ভ্রান্ত শ্বেতাঙ্গ হিসেবে আমি সরাসরি আপনার কাছে জানতে এসেছি, আমার মতো ব্যক্তির সঙ্গে কি টলা কোম্পানির একটা ব্লাডি নেটিব রাইটার অপমানজনক আচরণ করবে? আর টলা কোম্পানিও এত সতী কোম্পানি যে, নির্দিষ্ট দিনে বিলের টাকা জমা দিতে না পারলে একজন সম্ভ্রান্ত শ্বেতাঙ্গকে সুদ দিতে বাধ্য ক'রবে? তাহ'লে এদেশে ইংরেজ শাসন থেকে লাভ কী?

আগন্তুক যে প্রকৃতিস্থ ন'ন তা বুঝেও যথাসম্ভব বিনীতভাবে বড়োসাহেব ব'ললেন, দয়া ক'রে ব্যাপারটা আমাকে খুলে বলুন মিস্টার ক্যারেল। যদি কোনো প্রতিকার করা সম্ভব হয়, আমি নিশ্চয়ই ক'রবো।

—কী প্রতিকার আপনি ক'রবেন? পরশুদিন সুদসমেত আমার সরকার আপনাদের বিল মিটিয়ে দিয়ে গেছে।

সেই ক্রুদ্ধ, উত্তেজিত স্বরেই কথাটা ব'ললেন মিস্টার ক্যারেল। তারপর হঠাৎ তাঁর সুর নরম হ'য়ে গেল। ভাব-গদগদ স্বরে তিনি ব'ললেন, আচ্ছা, আপনিই বলুন, ক'লকাতায় বাস ক'রে একটু ভালোভাবে জীবনটাকে উপভোগ ক'রতে গেলে মাসের শেষে হাতে টাকা থাকে? নিজের এবং অতিথি অভ্যাগতের জন্যে মদের খরচা তো আছেই, তার ওপর আরবী ঘোড়া, সহিস, কোচোয়ান, সরকার, খানসামা, বাবুর্চি, খিদ্‌মৎগার, পাঙ্খাপুলার—সবই না রাখলে সমাজে পাত্তা পাওয়া যায় না। তার ওপর কুঠিতে পুষে রাখতে হয়েছে একটা নেটিব মেয়েছেলে। এদেশে বিয়ে করবার মতো শ্বেতাঙ্গিনী কুমারী ক'টা আসে বলুন? 'যা-ও বা দু'চারজন আসে তারাও ঢ'লে পড়ে

আরো অনেক বেশি রেস্তদার মক্কেলের দিকে! সুতরাং আর পাঁচজন যা করে আমাকেও তাই করতে হয়েছে। বাধ্য হ'য়েই রাত কাটানোর জন্যে একটা নেটিব মেয়ে জোগাড় ক'রে নিয়েচি। মেয়েটার রঙই যা কালো, নইলে যেমন ঢলঢলে যৌবন তেমনি আমার ওপর ভালোবাসা! আমারই এক বন্ধুর পোষা নেটিব মেয়েটা তো সুযোগ পেলেই তার সাহেবের বন্ধুবান্ধব, এমন কি, নেটিব খানসামার সঙ্গেও শোয়। আমারটি কিন্তু সেদিক থেকে একেবারে হিন্দু সতী। সুতরাং তার প্রতিও আমার কর্তব্য আছে, এটা আপনি নিশ্চয়ই মানবেন? যদিও শ্বেতাঙ্গিনী নয় তবুও স্ত্রীলোক তো? তারও একটু সাজগোজ ক'রতে ইচ্ছে করে। সত্যি কথা ব'লতে কি সেটা আমিও পছন্দ করি। হাজার হোক, যাকে নিয়ে রাত কাটাবো, ফুর্তি-টুর্তি ক'রবো, সে একটু সেজেগুজে থাকলে কার না ভালো লাগে বলুন? আমি তো মনে করি, এ ব্যাপারে পুরুষের উদার হওয়াই উচিত। আমি নিজে তাকে প্রসাধনের জিনিসপত্র যথেষ্টই কিনে দিই কিন্তু তার ওপরেও আছে বক্সওয়ালাদের উৎপাত। বক্সওয়ালা চেনেন তো আপনি? ওই যে নেটিব ফিরিওয়ালাগুলো হেজলিন, পমেটম, চুলের কাঁটা, ফিতে, আরো রকমারি জিনিস বাক্সে নিয়ে ফিরি ক'রে বেড়ায়? উঃ, কি সাংঘাতিক শয়তান লোকগুলো! ঠিক দুপুরবেলায় সাহেব যখন বাড়িতে থাকবে না জানে, তখনই ফিরি ক'রতে আসে! অমন ভালো ভালো শৌখিন জিনিস চোখের সামনে দেখলে কার না লোভ হয় বলুন? তার ওপর মেয়েছেলে! বিবিতো সারা মাস ধ'রে বক্সওয়ালার কাছে এন্তার শৌখিন জিনিস ধারে কিনে খালাস, এদিকে বিল মেটাতে সাহেবের প্রাণান্ত! আপনাকেও নিশ্চয়ই প্রতিমাসে বক্সওয়ালার বিল মেটাতে গিয়ে ঢোঁক গিলতে হয়? সে যাই হোক, নানা কারণে মাসের শেষের দিকে হাত প্রায় খালি হ'য়ে গিয়েছিল। বাকি ক'দিন ট্যাভার্নে গিয়ে মদ খাওয়ার টাকা নেই, এই রকম অবস্থা! অথচ তারই ভেতর মাথার ওপর ঝুলছে আপনার হৌসের একটা পাঁচশো টাকার বিল! ক'দিন আগে আমার সরকারকে এখানে পাঠিয়েছিলুম, যদি বিলের তারিখটা মাসখানেক পিছিয়ে নেওয়া যায়! বিল বিভাগের যে নেটিব রাইটার বিলটা তৈরি ক'রেছে, সে ইচ্ছে ক'রলেই অনায়াসে তা ক'রতে পারতো। এমন কি, আমার সরকাব সেই বিল রাইটারকে প্রথমে দু'টাকা তারপর তিনটাকা, সবশেষে পাঁচটাকা পর্যন্ত দস্তুরি হাতে গুঁজে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু একটা নেটিবের এতবড়ো ঔদ্ধত্য যে, সে-টাকা সে প্রায় ছু'ড়েই ফেলে দিলে? এটা একজন সম্ভ্রান্ত শ্বেতাঙ্গকে অপমান করা নয়? তাই আমি নিজে জানতে এসেছি, টলা কোম্পানি কবে থেকে এত সতী হ'য়েছে?

এতখানি ব'লে থামলেন মিস্টার ক্যারেল। শেষের দিকে তাঁর চোখমুখে আবার সেই প্রচণ্ড উত্তেজনার অভিব্যক্তি ফিরে এলো।

বড়ো সাহেব গম্ভীরমুখে ব'ললেন, হুঁ, খুবই অন্যায়। ঠিক আছে, এর পরে কোনো বিল নিয়ে অসুবিধে দেখা দিলে আপনি নিজে আমার কাছে নিয়ে আসবেন। কিন্তু যে নেটিব রাইটার এ-কাজ ক'রেছে তার নাম কি আপনি ব'লতে পারেন?

—আপনি কী ব'লছেন? ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একজন ফ্যাকটর কিনা একটা নেটিবের নাম মুখস্ত ক'রে রাখবে? তবে আমার সরকার বাবুর কাছে যা শুনেছি তাতে এইটুকু ব'লতে পারি আপনার নেটিব রাইটারদের ভেতর একটা কমবয়সী ফর্সা রঙের শুয়োর নাকি আছে, তারই কাজ। দ্যাট ভেরি ব্লাডি হোয়াইটিশ নিগার!

বড়ো সাহেব গম্ভীর মুখেই ব'ললেন, ঠিক আছে, জানা রইলো। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি নিশ্চয়ই ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।

—ধন্যবাদ।—খুব খুশি হ'য়ে বড়ো সাহেবের সঙ্গে করমর্দন ক'রে টল্‌তে টল্‌তে বেরিয়ে গেলেন মিস্টার ক্যারেল।

একটু পরেই বড়োসাহেবের ঘরে ক্যাশিয়ারের ডাক পড়লো। তিনি এসে দাঁড়াতেই বড়ো সাহেব

ব'ললেন, আগামী মাস থেকে ছোকরা রাইটার হরিশের মাইনে দু'টাকা বাড়িয়ে দিচ্ছি। পে-বিলে তার নামে দু'টাকা ইনক্রিমেন্ট যোগ ক'রে নিও।

এই হ'ল হরিশের মাইনে বেড়ে যাওয়ার নেপথ্য কাহিনী।

একদিক থেকে অন্য রাইটারদের কথা ঠিক। ওই ফর্‌সা রঙের জন্যেই তাকে চিনে নিতে সুবিধে হ'য়েছিল বড়ো সাহেবের। মাতাল মিস্টার ক্যারেল অভিযোগ ক'রতে এসে হরিশের মাইনে বাড়িয়ে দিয়ে গেল।

সত্যনারায়ণের পুজো দিলেন রুক্মিণী।

পুজোর জন্যে আলাদা যে দুধটুকু দিয়েছিল চন্দরা, তার দাম সে কিছুতেই নিলে না। ব'ললে, ছোট্‌দাদাঠাউরের আরো ভালো হ'ক বামুনদিদি, ও দুধটুকুর তরে দাম নিতে আমাকে ব'লোনি।

মোক্ষদা আপ্লুত হ'য়ে হরিশকে ব'ললে, সবাই তোমাকে কত ভালোবাসে গো!

হরিশ মুচ্‌কি হেসে ব'ললে, হ্যাঁ, একমাত্র খোকার মা ছাড়া আর সবাই, কী বলো?

কয়েকদিন পরেই আবার দেখা দিল হাঁপানির লক্ষণ। গত বছর শীতের সময় হরিশের এ-কষ্ট মোক্ষদাও দেখেছে। সেই কাশি আর শ্বাসকষ্ট আরম্ভ হ'তেই তার মুখ শুকিয়ে গেল। ব'ললে, তুমি ক'দিন ছুটি নাও না গো!

—ছুটি চাইলেই পাওয়া যায় না ছোটোবৌ। তাছাড়া কষ্ট যা কিছু, তা হয় রাতে। আপিসে কাজ করিতো দিনের বেলায়। সংসারে দায়দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে। ছুটি নিতে গেলে চাকরিটাই যদি চ'লে যায়?

আটজন মানুষের সংসাব এখন। বড়োবৌয়ের দু'মাস বয়সের মেয়েটাও তো সংসারের একজন বটে! তার নাম দেওয়া হয়েছে মাধুরীলতা। নামটা দিয়েছে মোক্ষদা।

সেই চাকরি যাওয়ার পর থেকে বট্‌ঠাকুর আজ পর্যন্ত আর একটা চাকরি পাননি। ক্বচিৎ-কদাচিৎ এখানে-ওখানে খাতা লেখার ঠিকে কাজ ক'রে আট আনা, একটাকা হয়তো আনেন। কিন্তু মোক্ষদা লক্ষ্য ক'রে দেখেছে, হরিশ যেমন প্রতিমাসে মাইনের টাকা এনে আগে মায়ের হাতে দেয়, বট্‌ঠাকুর কিন্তু তা করে না। তিনি যা পান, তুলে দেন বড়োবৌয়ের হাতে। তা থেকে একটা পাই পয়সাও এ-পর্যন্ত সংসারের পেছনে খরচ করেনি বড়বৌ। হয়তো অসময়ের জন্যে জমিয়ে রাখছে! দেওরের রোজগাবের ওপর দিয়েই সংসার যখন চ'লে যাচ্ছে তখন খামোকা বাড়তি খরচ ক'রে লাভ কী? পাছে এ সব নিয়ে মোক্ষদার মনে কোনো প্রশ্ন ওঠে, সে পথও আগে থেকেই বন্ধ ক'রে রেখেছে বড়োবৌ। মাঝে মাঝেই সে বলে, ভগবান যে কবে তোর বট্‌ঠাকুবকে একটু সুদিনের মুখ দেখতে দেবেন, দিনরাত খালি তাই ভাবিরে ছোটো! নেহাৎ লক্ষণের মতো ভাই পেয়েচে তাই রক্ষে পেয়ে গেল, নইলে কী দুদ্দশা হ'ত বল দিকিনি? হ্যাঁ, ভাই বটে ঠাকুরপো! এমন ভাই ক'জনা পায়? আর আমার ছোটো'র মতো জা-ই বা ক'জনার ভাগ্যিতে মেলে?

মোক্ষদা মাত্র একদিনই হরিশের কাছে উষ্মা প্রকাশ ক'রেছিল। সঙ্গে সঙ্গে হরিশ ব'ললে, ছি, এভাবে ভাবতে নেই ছোটোবৌ, এতে নিজের মনই ছোটো হয়ে যায়। কয়েকবছর আগেকার কথা ভাবো দিকি? তুমি যখন বৌ হ'য়ে এ-বাড়িতে এলে, তখন দাদার রোজগারেই তো সংসার চ'লতো। সংসারে সেদিন অভাব থাকলেও দাদা কিম্বা বৌঠানের কাছে এতটুকু অনাদর তো তুমি পাওনি?

সেদিন হরিশের বুকে মুখ গুঁজে কেঁদে ফেলেছিল মোক্ষদা।

ছি, ছি, এমন কথা সে ব'লতে গেল কেন? তার স্বামীর মন যে শিবঠাকুরের মতো! আর সেই মানুষের কাছেই কিনা সে নিজে এত ছোটো মনের পরিচয় দিয়েছে? না, এ-রকম কথা সে আর কোনোদিন ভাববে না, কোনোদিন বলবে না।

মোক্ষদার মাথায়, পিঠে গভীর মমতায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে হরিশ বললে, আমি জানি,

তোমার মন ছোটো নয়। হয়তো একটা সাময়িক বিরক্তি চাপতে না পেরে কথাটা ব'লে ফেলেচো। শোনো, আমার স্ত্রী হিসেবে এ-সংসারে এখন তোমার দায়িত্বই যে সবচেয়ে বেশি। আমার মা জন্মদুঃখিনী। দাদা একটু উদাসীন প্রকৃতির মানুষ কিন্তু মনটা ছোটো নয়। আর বৌঠান? তোমার কাছে যেমন তোমার স্বামী-পুত্রের স্বার্থ সবচেয়ে বড়ো, বৌঠানের মনটাকেও সেই দৃষ্টিতে বিচার ক'রে দেখো—তখন মনে কোনো ক্ষোভ থাকবে না।

আরো নিবিড় ক'রে স্বামীর বুকে মুখ গুঁজে মোক্ষদা ব'ললে, হ্যাঁ, আমি পারবো। আবার যদি কখনো ভুল করি, আমাকে শুধরে দিও!

আগের বছরের তুলনায় শীত এবার একটু কম।

শীতের প্রথম দিকে হরিশের সেই কাশি আর শ্বাসকষ্ট একটু মাথাচাড়া দিলেও কয়েকদিন পরে কিছুটা ক'মে এলো। এটা যে হাঁপানির প্রথম স্তর সেটা হরিশ জানতে পেরেছে। কিন্তু ছোটোবৌয়ের মন খারাপ হ'য়ে যাবে ব'লে তাকে কিছু বলেনি। মোক্ষদাও বুঝতে পেরেছে এই কাশি, এই বুকে হাঁপ ধরা, দম নিতে কষ্ট হওয়া—এ সবই হাঁপানির লক্ষণ। উত্তরপাড়ায় তাদের বাড়ির কাছেই এক বুড়ির হাঁপানির ব্যামো আছে। তাই এ-ব্যামোর উপসর্গগুলো সে জানে। কিন্তু হরিশকে সে তা জানতেই দেবে না! হাঁপানির মতো ব্যামো হয়েছে শুনলে এই বয়সেই মানুষটার মন যে ভেঙে যাবে! আর রুক্মিণী তো ছেলে আর ছোট বৌমাকে বরাবরই ব'লে আসছেন, শ্লেষ্মার ধাত একটু বেশি হ'লেই এ-রকম হয়। হাঁপানি হ'তে যাবে কোন্ দুঃখে?

চন্দরা গয়লানির বাপের বাড়ি গঙ্গার ওপারে আন্দুলে! ভাইপোর বিয়ে উপলক্ষ্যে কয়েকদিনের জন্যে বাপের বাড়ি গিয়েছিল চন্দরা। তার কাছে গোপনে একটা জিনিস আনতে দিয়েছিলেন রুক্মিণী—একটা মাদুলি!

আন্দুলের ওদিকে একজন সাধুবাবা আছেন, তিঁনি হাঁপানির মাদুলি দেন। সে মাদুলি নাকি একেবারে অব্যর্থ।

চন্দরা ফিরে এসেছে। ভাইপোর বিয়ের হৈহুল্লোড়ের ফাঁকেই সময় ক'রে নিয়ে সাধুবাবার কাছে সে গিয়েছিল। পুজো বাবদ সোয়া পাঁচ আনা দিতে হয়! তাই দিয়ে হরিশের জন্যে মাদুলি সে নিয়ে এসেছে। শোধন করাই আছে, এখন শুধু কালো সুতোয় বেঁধে মাদুলিটা গলায় পরিয়ে দিলেই হ'ল।

মাদুলি হাতে নিয়ে ভক্তিভরে কপালে ঠেকালেন রুক্মিণী। কালীঘাটের মা কালীর কাছে মনে মনে আকুল প্রার্থনা জানালেন, মুখ তুলে চেয়ো মা! এই মাদুলিতেই আমার বাছার ব্যামো যেন একেবারে সেরে যায়!

সঙ্গে সঙ্গেই চন্দরাকে আবার সাবধান ক'রে দিলেন তিনি। ফিস্ ফিস- ক'রে ব'ললেন, দ্যাখ, এটা যে হাঁপানির মাদুলি, তা যেন ভুলেও কখনো মুখ ফস্কে না বেরোয়!

চন্দরাও ফিস্ ফিস- ক'রে জিজ্ঞেস করলে, তবে কী ব'লবো?

—বলবি শেলেষ্মার মাদুলি।

—তাই ব'লবো।—সায় দিলে চন্দরা।

সেইদিন রাতেই নিজের হাতে হরিশের গলায় মাদুলি পরিয়ে দিলেন রুক্মিণী। ব'ললেন, আর শীতকালে তোকে এত কষ্ট পেতে হবে না বাবা!

তাবিজ-কবজ-মাদুলিতে হরিশের বিশ্বাস নেই। কিন্তু মা নিজের হাতে পরিয়ে দিচ্ছেন ব'লে সে আর আপত্তি ক'রতে পারলে না! একটু হেসে ব'ললে, হাঁপানির মাদুলি কোত্থেকে আনলে মা?

—বালাই ষাট! হাঁপানির কে ব'লেচে? তোর যত সব অনাছিষ্টি কথা! কেন, শ্লেষ্মার ধাতের জন্যে মাদুলি প'রতে নেই? ও-সব অলুক্ষুণে কথা আর কখনো যেন বলিস নি!

মোক্ষদা ঘরেই ছিল। সে ব'ললে, তাই বলুন তো মা!

রুক্মিণী হেসে প্রস্থানোদ্যত হ'লেন। মোক্ষদা চাপাস্বরে হরিশকে ব'ললে, কিগো মাকে পেন্নাম করলে না?

হরিশ তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে মাকে প্রণাম ক'রলে। মোক্ষদাও গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম ক'রলে শাশুড়িকে।

মোক্ষদার চাপা কথাটা রুক্মিণীর কানে স্পষ্টভাবেই গেছে। তিনি অভিভূত! মায়ের আমার সবদিকে লক্ষ্য থাকে।

মোক্ষদা প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়াতেই তার চিবুক ধ'রে স্নেহচুম্বন দিয়ে রুক্মিণী ব'ললেন, চির-এয়োতি হও মা!

॥ সাত ॥

উত্তরপাড়া থেকে হরিশের শ্বশুর সেদিন একটা আর্জি নিয়ে রুক্মিণীর কাছে এলেন। মেয়েটা অনেকদিন বাপের বাড়ি যায়নি। মেয়েকে একবার দেখার জন্যে তার মায়ের মন বড়ো ব্যস্ত হ'য়ে আছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি এর ভেতর আসেন নি। কারণ, বেয়ানেব বড়ো বৌমা অন্তঃসত্তা ছিলেন। ভগবানের কৃপায় তিনি নির্বিঘ্নে একটি কন্যাসন্তান প্রসব ক'রেছেন এবং সেই শিশুটিরও বয়স যাহোক মাস চারেক হ'ল। সুতরাং সাংসারিক অসুবিধে না হ'লে বেয়ান যদি এখন অনুগ্রহ ক'রে অনুমতি দেন তাহ'লে কয়েকটা দিনের জন্যে মেয়েকে তিনি উত্তরপাড়ায় নিয়ে যেতে পারেন।

রুক্মিণী ব'ললেন, বেইমশাই, আমিও তো সন্তানের মা? মায়ের প্রাণ কেন যে আন্চান্ করে তা কি আমি বুঝিনে? আমি আপত্তি ক'রবো কেন? আগে আপনার মেয়ে তার পরে তো আমার ঘরের বৌ?

অভিভূত হ'য়ে গেলেন গোবিন্দ চাটুজ্যে। গদগদ স্বরে ব'ললেন, আমার মেয়ে যে আপনার মতো শাশুড়ি পেয়েচে সে তার বহুজন্মের পুণ্যির ফলে বেয়ান।

মনে মনে বেশ আত্মপ্রসাদ উপভোগ ক'রলেন রুক্মিণী। হেসে ব'ললেন, আমার তো মেয়ে নেই বেইমশাই, দুই বৌমাই আমার মেয়ের মতো। বিশেষ ক'রে ছোটোবোমার মতো বৌ পাওয়াও ভাগ্যির কথা। সত্যি কথা ব'লতে কি মাকে দু'দণ্ড না দেখলে আমারও কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে।

গোবিন্দ চাটুজ্যের চোখে মুখে উদ্বেগ ফুটে উঠ্লো। তাহ'লে কি পাঠানোর ইচ্ছে নেই? আম্তা আম্তা ক'রে তিনি ব'ললেন, তবে কি এখন ছাড়তে আপনার আপত্তি আচে?

—না, না, আমি আপত্তি ক'রচি নে। তবে কিনা এই শীতের সময়টা হরিশতো আবার একটু সর্দি-কাশিতে ভোগে? আমারও বয়েস হ'য়েচে, ঠিকমতো যত্নআত্তি ক'রতে পারিনে। তাই বলচিলুম, এ-সময়টা ছোটো বৌমা চ'লে গেলে হরিশের হয়তো অসুবিধে হবে।

—না, না, বাবাজীবনের অসুবিধে ঘটিয়ে মেয়েকে নিয়ে যেতে আমি চাইনে।

—এই তো মাঘমাস ফুরিয়ে এলো ব'লে! ফাগুনের মাঝামাঝি শীতটা চ'লে যাবে, তখনই মেয়েকে নিয়ে যাবেন, আবার চত্তির মাস পড়বার আগেই মা আমার চ'লে আসবে, কী বলেন?

—এতো উত্তম প্রস্তাব। তাই-ই হবে।

দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে সব কথাই শুনেছে মোক্ষদা। তার হয়েছে জ্বালা! ওদিকে মা-বাবার কাছে গিয়ে কয়েকটা দিন থাকার জন্যেও মন ছট্‌ফট্ করে, এদিকে আবার হরিশকে একা ফেলে রেখে চ'লে যেতেও ইচ্ছে করে না।

গোবিন্দ চাটুজ্যে চ'লে যাওয়ার পর তাঁর গমনপথের দিকে কতক্ষণ তাকিয়ে রইলেন রুক্মিণী। এই মানুষটির জন্যে তাঁর মনে একটা গভীর সম্ভ্রমবোধ আছে। নৈকষ্য কুলীন এবং সুপুরুষ

হ'য়েও তিনি ধর্মের নামে যেখানে সেখানে লালসা পরিতৃপ্তির সুযোগ নিয়ে বেড়াননি। ইচ্ছে ক'রলে এই মানুষ দু'টো-তিনটে কেন, এককুড়ি-দু'কুড়ি মেয়েকে ভোগ ক'রতে পারতেন! অথচ কত সংযমী, কত নির্লোভ!

কত ভাগ্যবতী তাঁর বেয়ান!

কুলীনের মেয়ে হ'য়েও জীবনে তাকে সতীন-কাঁটার জ্বালা সইতে হ'ল না! সারাজীবন ধ'রে স্বামীর সোহাগে একা-ই তার ভোগ-দখল! তার পাওনায় আর কেউ ভাগ বসায়নি। কেউ ছিনিয়ে নেয়নি তার সাধের সোয়ামিকে!

ছোটোবৌমাকে না পাঠালে কেমন হয়?

মেয়েকে দেখার জন্যে কেঁদে মরুক না হতচ্ছাড়ী মাগী—তাতে রুক্মিণীর কী এসে যায়? সে মাগী একটু বুঝুক, মনের কষ্ট কী জিনিস! বুঝে দেখুক, আশাভঙ্গে মন-ও কেমন ভাঙে। বেয়াইকে কথা দেওয়া হয়েছে? অমন কথা তো কত লোকেই দেয় আবার দরকার হ'লেই কথার খেলাপ করে। ব'লে দিলেই হবে, এখন অসুবিধে আছে, এখন পাঠাবো না। কী ক'রবে? জোর ক'রে তো আর নিয়ে যেতে পারবে না? নিয়ে যাক দেখি? তার একমাসের ভেতরেই হরিশের আবার বিয়ে না দেন তো তিনি ঠাকুরদাস চাটুজ্যের মেয়েই ন'ন। কুলীনের ছেলের আবার পাত্রীর অভাব হয়?

আর সে-মাগীর মেয়েটাও হয়েছে তেমনি! যেমন মা তেমনি মেয়ে! সোয়ামির পীরিতে দিনরাত যেন হাবুডুবু খাচ্ছে! ঢং দেখলে গা-পিত্তি জ্ব'লে যায় রুক্মিণীর। ভাতার কি আর কোনো মেয়ের হয় না?

আবার মাথার ভেতর ঝিম্ ঝিম্ ক'রছে!

সেই প্রচণ্ড মাথা-ধরার পূর্ব লক্ষণ। একটু পরেই মাথাটা যেন ছিঁড়ে প'ড়ে যাবে। তারপর সেই ঘটি ঘটি জল।

কুঁয়োতলার দিকে চ'ললেন রুক্মিণী। মাথার যন্ত্রণায় দিশেহারা হ'য়ে ওঠার আগেই জল ঢেলে রেহাই পাওয়ার চেষ্টা ক'রতে হবে!

সেই রাতেই কথা হচ্ছিল হরিশ আর মোক্ষদার।

মোক্ষদা ব'ললে, আমার বাবার কাছে মা কী ব'লেচেন, জানো? ব'লেচেন, আমার মতো বৌ পাওয়াও ভাগ্যির কথা। —শুনচো তো?

—হুঁ, শুনছি।

—তুমি কী বলো?

—আমার মতো স্বামী পাওয়া দুর্ভাগ্যের কথা।

—ছি! তুমি কী গো? আমার মতো ভাগ্যিবতী কে?

—তুমি নিজে।

—যাও!—হ্যাঁ গা, আমায় ছেড়ে থাকতে পারবে? কষ্ট হবে না?

—উঁহু।

—ইস্, ব'ললেই যেন আমি পেত্যয় যাচ্চি আর কি! তোমার যে কত কষ্ট হবে তা আমি বাপু ভালো ক'রেই জানি। আমার-ও কিন্তু ওতোরপাড়ায় গে' খুব কষ্ট হবে গো!

—তবে না গেলেই হয়।

—ওমা, তাই ব'লে মা-বাপের কাছে একটু যাবো না? হ্যাঁ গা, একটা কাজ ক'রলে কেমন হয়? রোববার ক'রে সকালে তুমি ওতোরপাড়ায় চ'লে যেও। সোমবারে ভোরে বেরিয়ে এসে আপিস ক'রবে?

—আমি তো তাই ভেবেচি। কিন্তু লোকে হাসাহাসি ক'রবে যে!

—করুকগে। তাই ব'লে এতদিন আমাদের দেখা হবে না?

—মোটে তো পনেরো-বিশ দিন।

—আহা, পনেরো-বিশ দিনই যেন কিছু কম? কথা দাও, তুমি যাবে?

—তুমি বরঞ্চ ওখানে গিয়ে একটা কাজ ক'রো। সবাইকে জানিয়ে রেখো, খোকাকে না দেখে তার বাবা একেবারেই থাকতে পারে না।

—সে-কথা আর রটাতে হবে কেন? কথাটা তো ষোলো আনা সত্যি।

হরিশের মুখে ফুটে উঠলো একটু অপ্রস্তুতের হাসি। ব'ললে, তুমি তো সারাদিনই দেখচো, আর আমি খোকাকে দেখি একটা মাপা সময় মাত্র। তাই হয়তো ওরকম মনে হয়!

হঠাৎ যেন একটা ঘূর্ণিঝড় ব'য়ে গেল।

স্বল্পস্থায়ী ঘূর্ণিঝড়, কিন্তু রূপ তার করাল ভয়ঙ্কর! ঝড় যখন থামলো, তখন দেখা গেল, এই দম্পতির সযত্ন-লালিত আশালতার চারাটি কে যেন মাটি থেকে উপ্ড়ে ছিন্নভিন্ন ক'রে দিয়েছে।

সকালে আপিসে যাওয়ার সময় খোকার সামান্য একটু জ্বর দেখে গিয়েছিল হরিশ। সন্ধ্যের পর আপিস থেকে সে যখন ফিরলো তখন জ্বরে অচেতন ছেলেকে কোলে নিয়ে ব'সে আছে ছোটোবৌ।

দুপুরের দিকেই জ্বরের ধরনটা ভালো নয় দেখে কবিরাজ ডেকে এনেছিল হারাণ। রোগী দেখে কবিরাজের মুখে দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে উঠেছিল। তিনি ওষুধ দিয়ে গেছেন। কিন্তু ওষুধ খাওয়ানোই প্রায় সম্ভব হয়নি। মুখে ওষুধ দিলে তা গড়িয়ে প'ড়ে যাচ্ছে। খোকার কোনো সাড়া নেই।

সারারাত ছেলে কোলে নিয়ে ব'সে রইলো মোক্ষদা। কিন্তু তাকে ধ'রে রাখতে পারলে না। পরের দিন একটু বেলা হ'তেই খোকার দেহটা নিথর, নিস্পন্দ হ'য়ে গেল। মোক্ষদা তখনো বুঝতে পারেনি, তার খোকা আর নেই।

হরিশ নির্বাক, নিস্পন্দ।

মোক্ষদার সঙ্গে সে-ও সারারাত জেগেছে। আপিস থেকে ফিরে খোকার ওই অবস্থা দেখে সে আবার পাগলের মতো কবরেজ মশাইয়ের কাছে ছুটেছিল। তিনি ব'লেছিলেন, পরের দিন দুপুর পেরিয়ে যাওয়ার পর আবার খবর দিতে।

কিন্তু সে দরকার আর হ'ল না।

তার আগেই শেষ হ'য়ে গেল সব কিছু। যে মায়ের কোলে এসেছিল, সেই মায়ের কোলে শুয়েই খোকা চিরদিনের মতো চ'লে গেল।

শোকে উন্মাদিনী মা তার মৃত খোকাকে কোলে নিয়ে স্তব্ধ পাথরের মূর্তির মতো ব'সে আছে। তার কোল থেকে মৃত শিশুকে তুলে আনবে কে?

তবু তো উপায় নেই। পাড়াপড়শিদের ভেতর যে দু'একজন শ্মশানে যাওয়ার জন্যে এসেছে, তারা এগিয়ে গেল।

কোল থেকে খোকার নিস্পন্দ দেহটাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার সময় পাগলের মতো তাকে বুকে জাপটে ধ'রেছিল মোক্ষদা। তারপর সেই যে ডুক্‌রে কেঁদে উঠে সেখানেই লুটিয়ে পড়লে, দু'দিনের ভেতর কেউ তাকে সেখান থেকে ওঠাতে পারেনি।

আচ্ছন্নের মতো শ্মশান থেকে ফিরলে হরিশ।

ঘর থেকে মোক্ষদার বুক-ফাটা কান্না ভেসে আসছে। হরিশকে দেখে আবার ডুকরে কেঁদে উঠলেন রুক্মিণী।

হরিশ যেন তখনো বিশ্বাস ক'রতে পারছে না যে, খোকা নেই। তার খোকা আর কোনোদিনই ফিরবে না!

॥ আট ॥

তারপর কয়েকটা মাস কেটে গেছে।

হরিশ আপিসে গেছে, কাজ ক'রেছে—কিন্তু সবই যেন যন্ত্রচালিতের মতো। মোক্ষদাও যেন একটা নিষ্প্রাণ পাথরের মূর্তির মতো।

দিনের পর দিন যায়, রাতের পর রাত। সংসার-ও যেমন চলে, তেমনি চলছে।

রাতে বিছানায় এ-পাশে নীরবে শুয়ে থাকে হরিশ, ও-পাশে বাক্যহীন মোক্ষদা। মাঝখানের জায়গাটা ফাঁকা। এখানেই শুয়ে ঘুমোতো তাদের খোকা।

রাত দুটো বেজে যায়, তিনটে বেজে যায়, ঘুম আসে না হরিশের চোখে। বালিশে কান পেতেই সে নিঃশব্দে বুঝতে পারে, ও-পাশে নিঃশব্দে মুখ গুঁজে কাঁদছে ছোটোবৌ। যতক্ষণ জেগে থাকে ততক্ষণই সে নিঃশব্দে কাঁদে। তারপর ক্লান্ত হ'য়ে শেষ রাতের দিকে হয়তো একটু ঘুমিয়ে পড়ে।

ছোটোবৌকে কী সান্ত্বনা দেবে হরিশ?

তিনবছর ধ'রে মায়ায় জড়িয়ে তারপর এইভাবে অতর্কিতে চ'লে গিয়ে তার বুকের ভেতরটাও তো ফাঁকা ক'রে দিয়ে গেছে খোকা। কিন্তু সে পুরুষ মানুষ, তাকে বাইরে যেতে হয়, চাকরি ক'রতে হয়, তাই অবস্থার চাপে নিষ্ঠুর বাস্তবকে মেনে নিতে সে বাধ্য হয়েছে।

কিন্তু ছোটোবৌ?

সে যে মা! নিজের রক্তে আর মমতায় প্রাণদান ক'রে খোকাকে সে সৃষ্টি করেছিল। এই ঘর, এই বাড়ির সীমানাটুকুই তার গণ্ডি। এরই ভেতর সাহচর্যক্ষণের সাহচর্য দিয়ে তার জন্যে খোকা একটা রূপকথার রাজ্য সৃষ্টি ক'রেছিল। সে রাজ্যটা ভেঙে চুরমার হ'য়ে গেছে। মায়ের কাছে এ-শোকের গভীরতা যে কতখানি অতলস্পর্শ, তার পরিমাপ করবার সাধ্য কি কোনো পুরুষ মানুষের থাকতে পারে?

মোক্ষদার দিকে তাকানো যায় না।

একটা সদ্য ফোটা ফুল যেন প্রতি মুহূর্তে চোখের সামনে একটু একটু ক'রে নিস্তেজ হ'য়ে যাচ্ছে।

কিছুদিন আগে মোক্ষদার বাবা এসে মেয়েকে নিয়ে গিয়েছিলেন। এখান থেকে সরিয়ে অন্যমনস্ক ক'রে আস্তে আস্তে তার শোকের বোঝাটাকে যদি একটু হালকা ক'রে দেওয়া যায়!

কিন্তু এক হপ্তা পেরোতে না পেরোতেই ফিরে এলো মোক্ষদা।

না, আর কোথাও গিয়ে সে থাকতে পারবে না। যে ঘরের প্রতিটি কোণ, প্রতিটি জিনিস, প্রতিটি বায়ুকণার সঙ্গে তার খোকার স্মৃতি জড়িয়ে আছে, সে-ঘর ছেড়ে সে কেমন ক'রে থাকবে?

এবার উত্তরপাড়া থেকে ফিরে আসার পর মোক্ষদা আর যখন-তখন কাঁদে না বটে, কিন্তু তার স্তব্ধ গাম্ভীর্য হরিশের কাছেও কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হ'ল।

বড়োবৌ গোপনে মাঝে মাঝে শাশুড়িকে বলে, ছোটোর হাব-ভাব দেখে আমার কিন্তু বড়ো ভয় লাগচে মা! ও শেষকালে পাগল-টাগল হয়ে যাবে না তো?

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে রুক্মিণী বলেন, কি জানি মা কপালে আরো কী নেকা আচে! দেখা যাক, কোলে আর একটা এলে আবাগী যদি এ-শোক ভুলতে পারে।

মোক্ষদার শরীর দিন দিন ভেঙে পড়ছে।

একদিন রাতে হরিশ ব'ললে, বৌঠানের কাছে শুনি, তুমি নাকি খাওয়াদাওয়া প্রায় ছেড়েই দিয়েচ?

বড়ো ম্লান একটু হাসি ফুটে উঠলো মোক্ষদার শীর্ণ মুখে। মৃদুস্বরে ব'ললে, কই, নাতো!

কিছুক্ষণ নীরবতা।

তারপর আবার হরিশ ব'ললে, তোমার শরীরটা খুবই রোগা হ'য়ে গেছে। চোখ দুটো গর্তে ব'সে গেছে—

—সে তো তোমারও।

আবার স্তব্ধতা! বাড়ির পেছনে গাছে ব'সে একটা রাতচরা পাখি ডাকছে।

হরিশ কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকার পর ব'ললে, আমি বলি কি, তুমি আবার কিছুদিন ওতোর পাড়ায় গিয়ে মায়ের কাছে কাটিয়ে এসো।

—না।

আর কয়েকমাসের ভেতর মোক্ষদার শরীরের অবস্থাও রীতিমতো চিন্তার কারণ হ'য়ে দাঁড়ালো। কবিরাজ ডেকে দেখালে হরিশ, কিন্তু উন্নতির কোনো লক্ষণ দেখা গেল না।

বড়ো বৌ একদিন হরিশকে আড়ালে ডেকে ব'ললে, ক'ব্রেজ বদ্যির ওষুধে কি এ অসুখ সারে ঠাকুরপো? এখন দরকার ছোটোর কোলে আর একটা ছেলে!

কিন্তু সে অবকাশ আর হ'ল না।

যেদিন সে পুরোপুরি বিছানা নিলে, তারপর আর দিন দশেক মাত্র বেঁচে ছিল।

কবিরাজ এলেন। হরিশের পীড়াপীড়িতে কবিরাজের ওষুধ-ও মুখে দিয়েছিল মোক্ষদা। তারপর ক্ষীণ কণ্ঠে ব'ললে, আমাকে ওষুধ খাইয়ে কী ক'রবে বলোতো? খোকা সেই কবে থেকে আমাকে ডাকচে। তার কাছে যাওয়ার জন্যে আমি যে পা বাড়িয়ে আচি!

হরিশের বুকের ভেতর থেকে একটা উদ্গত কান্নার ঢেউ যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছিল।

একটু পরে শীর্ণ হাতে হরিশের একখানি হাত ধরে ম্লান হেসে মোক্ষদা ব'ললে, মনে আচে, বে'র পরে তুমি আমাকে আদরের নাম দিয়েচিলে, ওফেলিয়া? শেষ পজ্জন্ত তাই হ'ল গো! তোমাকে ছেড়ে এমনভাবে চ'লে যেতে হবে, তা তো আমি চাইনি!

মোক্ষদার কোটরে-বসা দু'চোখের কোণ দিয়ে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো। হরিশ দিশেহারার মতো মোক্ষদার শীর্ণ হাতখানি চেপে ধরে রুদ্ধস্বরে ব'ললে, আমি ভুল করেচিলুম ছোটোবৌ!

হরিশের মুঠোর ভেতর মোক্ষদার হাতখানা থর্‌থর্ ক'রে কাঁপতে লাগলো। দু'চোখে মর্মান্তিক আকুলতা! কাঁদার মতো শক্তিও তখন তার শরীরে নেই।

মোক্ষদা শেষ কথা ব'লেছিল, আমি তো চির-এয়োতি হ'য়েই রইলুম। সিঁথির সিঁদুর নিয়েই যাচ্চি। সিঁদুর দিয়ে আমার কপাল ভরিয়ে দিওগো—

একটা বছরও পুরলো না।

ছোটোবৌকে চিতায় তুলে দিয়ে আর একবার শ্মশান থেকে ফিরে এলো হরিশ।

আজ এই ক'বছরে পলে পলে গ'ড়ে তোলা স্বপ্নের অবশিষ্টটুকুও চোখের সামনে পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল।

ওফেলিয়া!

হ্যামলেটের গল্পটা শোনার পর থেকে ওফেলিয়া নামটা সম্বন্ধে কি প্রবল আপত্তিই না ছিল ছোটোবৌয়ের! হরিশকে ছেড়ে সে নাকি কিছুতেই আগে ম'রতে পারবে না!

সেই মেয়েকেই চিতায় তুলে নিজের হাতে মুখাগ্নি ক'রে এসেছে হরিশ। চোখের সামনে ওফেলিয়ার দেহটা পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল!—সত্যিই ওফেলিয়া!

তৃতীয় পর্ব

পদসঞ্চার

উদ্ভিন্ন যৌবনের সেই প্রথম স্বপ্নভঙ্গের পর তিনটে বছর কেটে গেছে।

এই তিন বছরে সংসারে নিজের দায়িত্বপালনে কোনো ত্রুটি করেনি হরিশ। সবই ক'রেছে, এখনো ক'রে চ'লেছে। কিন্তু আগেকার সেই সতেজ প্রাণচাঞ্চল্য আর নেই। নেই সেই আবেগ-বিহ্বল অনুভূতির বিকীর্ণ সঞ্চার।

প্রথম কয়েকমাস যেন একটা বন্ধনহীন বৈরাগ্য আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল তাকে। কিন্তু নিজেকে বন্ধনহীন ভাবলেই কি বন্ধনমুক্তি ঘটে? ছোটোবো নেই, খোকা নেই,—তবু মা তো রয়েছেন। তার জন্মদুঃখিনী মা! আর রয়েছেন দাদা, বৌঠান। রয়েছে তাদের তিনটি সন্তান। সংসারে এতগুলো মানুষ তার ওপর নির্ভর ক'রে আছে। কোথায় বৈরাগ্যের অবসর? কোথায় বন্ধনমুক্তি?

আপিস ছুটির পর সেই ব্যস্ত হ'য়ে বাড়ি ফেরার তাড়া এখন আর নেই। বরঞ্চ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরলেই বুকের ভেতরটা খাঁ খাঁ করে। মনে হয়, আপিস যদি রাত দশটা-বারোটা পর্যন্ত চ'লতো তাহ'লেই বোধ হয় ভালো হ'ত। ক্লান্ত, অবশ দেহে বাড়ি ফিরে কোনোমতে দু'টি খেয়েই সে ঘুমিয়ে পড়তে পারতো!

প্রথম দিকে আপিস ছুটির পর দিনের পর দিন উদ্দেশবিহীনভাবে পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছে হরিশ। তারপর ক্লান্ত হ'য়ে এক সময় ভবানীপুরের পথ ধ'রেছে। দুশ্চিন্তা করবার জন্যে মোক্ষদা আর নেই। কিন্তু মা তো এখনো রয়েছেন!

একই ভাবে টলা কোম্পানির চাকরি তাকে ক'রে যেতে হ'য়েছে; সংসারের আর্থিক দায়িত্ব সেই একই ভাবে বহন ক'রে যেতে হয়েছে আর একইভাবে প্রতি মুহূর্তে অনুভব করে চ'লতে হয়েছে নিজের শূন্যতাকে!

ছেলের হাব-ভাব দেখে বড়ো ভয় পেয়ে গেলেন রুক্মিণী। কোন্ মা না ভয় পায়? সবে কুড়ি বছর বয়স; ব'লতে গেলে সারা জীবনটাই পড়ে রয়েছে। একটা বৌ ম'রেছে ব'লেই এই বয়সে ছেলেটা এমন বিবাগী হ'য়ে যাবে? বৌ মরেছে বলে বেটাছেলের এমন হা-হুতাশ কি শোভা পায়? তায় আবার কুলীন বামুনের ছেলে। লোকে ব'লবে কী?

হারাণ এতদিন পরে আবার যাহোক একটা কাজ পেয়েছে। গঙ্গা সরকারের বাজারে একটা বেনেতি দোকানে খাতা লেখার চাকরি। মাইনে পাঁচ টাকা। সামান্য পাঁচ টাকা মাইনের চাকরিটা নেওয়ার তেমন একটা গরজ ছিল না হারানের। কিন্তু বড়োবৌ তাকে একরকম জোর ক'রেই বাধ্য ক'রেছে। ব'লতে গেলে ঠাকুরপোর ওপর নির্ভর ক'রেই তো এতগুলো পেট চ'লছে। তার যা মতি-গতি, যদি হট্ ক'রে একদিন চাকরি ছেড়ে দিয়ে বিবাগী হ'য়ে কোথাও চ'লে যায়, তখন উপায় হবে কি? তার ওপর এরই ভেতর বড়োবৌয়ের পেটে আর একটা এসে গেছে।

ওদিকে ঠাকুরপোর আবার বিয়ে দেবার জন্যে শাশুড়ি উঠে প'ড়ে লেগেছেন। নতুন ছোটোবৌ আবার কেমন ছাঁচের মেয়ে হবে, কে জানে! আহা, বড়ো ভালো মেয়ে ছিল মোক্ষদা!

রুক্মিণী মাঝে মাঝেই বিয়ের কথা তোলেন, কিন্তু হরিশ রাজি নয়। বড়োমামা বীরেশ্বর বুঝিয়ে ব'লেছেন, দ্যাখ্ বাবা, সংসার-ধম্মো পালন ক'রতে গেলে রোগ-শোক-তাপ থাকবেই। তাই ব'লে লোকে ধম্মোপালন ক'রবে না? কথায় বলে, পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা। বংশরক্ষা না ক'রলে যে পুন্নাম নরকে গতি! সেধে সে গতি কে চায়, বল?

বড়োমামাকে যথেষ্ট মান্য করে হরিশ। তবু হেসে ব'লেছিল, হিন্দুশাস্ত্রের বিধানের তো

শেষ নেই বড়োমামা। পুরুষের পক্ষে সুবিধে মতো যে পথে যাওয়ার ইচ্ছে হোক না কেন, কোনো না কোনো পুরাণ থেকে তার জন্যে দু'চারটে শ্লোকের পালকি নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। বাধা শুধু মেয়েদের ক্ষেত্রেই দেখচি। সে যাই হোক, আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের বংশলোপ হওয়ার ভয় তো নেই? শুনেচি, সব মিলিয়ে আমরা আট ভাই চার বোন। তাহ'লে আর চিন্তা কী?

বীরেশ্বর ব'ললেন, সে তো রামধনের বংশ রক্ষা হ'ল। কিন্তু তোর? অন্ততঃ দু'টি একটি পুত্র সন্তান তো চাই!

হরিশ ব'ললে, সে পুত্রও যদি মারা যায়?

রুক্মিণী ভয়ার্ত স্বরে ব'ললেন, তোর মুয়ে কি আগল নেই? এমন অনাছিষ্টি কথা কেউ বলে?

হরিশ ব'ললে, আমাকে তোমরা পেড়াপিড়ি ক'রো না মা।

মনঃক্ষুন্ন হ'য়ে তার পর কয়েকমাস চুপ ক'রে রইলো রুক্মিণী। ছোটোবৌমা নিশ্চয়ই বশীকরণ দিয়ে গুণ ক'রেছিল হরিশকে। নইলে এমন হয়? সে ম'রে গিয়েও ঘাড় থেকে নামেনি। ছেলেটার ওপর তার তুক্‌তাকের ঘোর এখনো তাই চ'লছে।

একদিন আপিস ছুটির পর সবে পথে নেমেছে হরিশ।

প্রায় তার সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়েছে রাইটার ব্রজরাজ মিত্তির। মাঝবয়সী মানুষটা! বয়সে হরিশের দ্বিগুণ হবে।

হরিশের কাঁধে আলতো ক'রে একটু চাপ দিয়ে ব্রজ মিত্তির ব'ললে, আজ কোন্ এলাকায় টহল হবে ভায়া?

হরিশ একটু অপ্রতিভভাবে ব'ললে, কেন বলুন তো দাদা?

কণ্ঠস্বরে যথাসম্ভব সহানুভূতি ফোটানোর চেষ্টা ক'রে ব্রজ মিত্তির ব'ললে, সব খবরই রাখি হে ভায়া! সোজা কথা নয়, পর পর অতবড়ো দু'টো দাগা! সরকারবাবু সেদিন ব'লচিলেন, আজকাল আপিস ছুটির পর রোজই তুমি নাকি ভ্যাগাবাণ্ডের মতো পথে পথে ঘুরে বেড়াও। আরে বাপু, জীবনে দুঃখু-কষ্টতো আসবেই। আবার তাকে ভুলেও যেতে হবে। নইলে মানুষ কিসের, অ্যাঁ? আর, তার জন্যে খামোকা পথে পথে ঘুরে বেড়ানোরই বা দরকার কী?

প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে হরিশ ব'ললে, দুঃখকষ্টের ব্যাপার কিছু নয় দাদা। হাতে একটু সময় থাকে, তাই একটু ঘুরে ঘুরে টাউন ক'লকাতা দেখি।

মুচ্‌কি হেসে হরিশের কাঁধে আর একবার একটু চাপ দিয়ে ব্রজ মিত্তির ব'ললে, দূর্, দূর্, এইভাবে হেঁটে হেঁটে কি টাউন ক'লকাতা দেখা যায় না তার আসল রস পাওয়া যায়? বিদ্যেধরীদের পাড়ায় এর ভেতর গেচো কেনোদিন?

আরক্তিম হ'য়ে উঠলো হরিশের মুখ। মনের বিরক্তি মনে চেপেই উত্তর দিলে, না।

ব্রজ মিত্তির একগাল হেসে ব'ললে, হুঁ, বুঝতে পারচি, বৌটা তোমাকে দেহে-মনে নেশা ধরিয়ে এমন বুঁদ ক'রে রেখে গেচে যে তাকে আর ভুলতে পারচো না! সেটা খুবই ভালো কথা ভায়া, তবে কিনা জানোতো, জেনেশুনে আত্মাকে কষ্ট দিতে নেই? এই ভরা বয়েস, তারপর রক্তের সোয়াদ বেশ ভালোভাবেই পেয়েচ বুঝতে পারচি! তারপরেও শরীরটাকে আর কদ্দিন উপোসী রাখবে বলো দিকিনি? হয় ঘরে আর একটা মাগ্ নিয়ে এসো, নয়তো মাঝে মাঝে হোটেলে খাও!

হরিশ চুপ ক'রে হাঁটিতে লাগলো।

একটু অপেক্ষা ক'রেই ব্রজ মিত্তির আবার ব'ললে, বাড়িতে যখন রেঁধে দেবার কেউ নেই তখন হোটেলে খেলে কারো জাত-ধম্মো যায়, বলো? বিদ্যেধরীদের কাছে মাঝে মাঝে ঘুরে আসাটাও সেইরকম আর কি!

হরিশ মৃদুস্বরে ব'ললে, আমার রুচিতে পোষাবে না।

—তবে আর কী করা যাবে? নাঃ, তুমি দেখচি জাত-প্রেমিক হে! বৌটা যে তোমাকে কতখানি ভালোবেসেচিলো সেটা তোমার অবস্থা দেখে বেশ মালুম ক'রতে পারচি!

মোক্ষদার মুখখানা যেন হরিশের চোখের সামনে ভেসে উঠ্‌লো। তাকে যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে হরিশ! হ্যাঁ, বর্ণে বর্ণে খাঁটি কথা ব'লেছে ব্রজ মিত্তির।

ছোটোবৌ হৃদয় উজাড় করে দিয়েই ভালোবেসেছিল হরিশকে। দেহে যৌবনের ঢল্ নামার পর থেকেই পরিতৃপ্তির পূর্ণতায় তার স্বামীকে সে ভরিয়ে দিয়েছে। হরিশের উন্মত্ত আসুরিক আসঙ্গতৃষ্ণার জলকে সে আকণ্ঠ পান করিয়েছে। নিজেও তারপর পরিতৃপ্তা মদালসার মতো অঙ্গে অঙ্গে মিশে অঘোরে ঘুমিয়েছে সারারাত। তার কোলে যে সন্তান এসেছিল, সে তো কেবল সাময়িক কামতৃপ্তির ফসল নয়—খোকা ছিল তাদের দু'জনের দেহ-মনের আবেগ-উপচিত স্নিগ্ধ আনন্দধারার সৃষ্টি!

ব্রজ মিত্তিরের গলার স্বরে আবার এ-জগতে ফিরে এলো হরিশ।—কিহে ভায়া, ঠিক বলিনি?

হরিশ চুপ ক'রে রইলো।

—ফার্স্ট লভ্ তো? ভুলতে একটু সময় লাগবে। তার ওপর তুমি যা ইমোশন্যাল টাইপ দেখ্‌চি! আমি বলি কি, চট্‌পট্ আর একটা মাগ এনে তোলো ঘরে। তারপর আপনা আপনি সব ভুলতে পারবে। তাছাড়া দুঃখ-কষ্ট ভোলার অব্যর্থ ওষুধ তো হাতের কাছেই আছে হে! আপত্তি না থাকে তো আমার সঙ্গে চলো। দুঃখু ভুলে থাকার পথের হদিশ আজই পেয়ে যাবে।

ব্রজ মিত্তির পচাই মদের একজন মার্কামারা রসিক, আপিসের সবাই তা জানে, হরিশও জানে।

হরিশ মৃদুস্বরে ব'ললে, পচুই মদ?

একটু উষ্মার সঙ্গে ব্রজ মিত্তির ব'ললে, ওহে ভায়া, যার নাম চাল ভাজা, তারই নাম মুড়ি। হুইস্কি, রাম, শেরি, শ্যাম্পেন হ'লেই তা কুলীন হ'য়ে গেল আর দিশি মদ নেটিব ব'লেই তা অকুলীন? এই পচুই মদের কদর কত জানো? চীনেবাজারে কেষ্ট দত্তের পাণ্ড হাউসে চলো, দেখবে, এই অমেত্ত-র লোভে সেখানে ধলা-কালা একাকার। বিলিতি মদের পাণ্ড-হাউসে নাথি মেরে কত ইংরেজ, ফরাসি, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ গোরা ফিরিঙ্গি কেষ্ট দত্তের পাণ্ড-হাউসে গে' গড়াগড়ি খায়, তার খপর রাখো? যাবে তো বলো! একটু টেনে এমন বুঁদ হয়ে যাবে যে দুঃখু-কষ্টের পিতেম'ও কাছ ঘেঁষতে সাহস পাবে না।

হরিশ কয়েকমুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে তারপর ব'ললে, চলুন।

ব্রজ মিত্তির একটু ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে ব'ললে, সত্যিই যাবে ভায়া? ঠাট্টা ক'রচো না তো?

হরিশ ব'ললে, না, ঠাট্টা করিনি, সত্যিই যাবো।

ব্রজ মিত্তির মহা খুশি। ব'ললে, শাবাশ! এই তো খাঁটি মরদের মতো বুকের পাটা! আরে বাপু, কোন্ এজুকেটেড নেটিব ড্রিঙ্ক না করে বলো? হাজার হাজার লাখো লাখো টাকা হাওয়ায় ভেসে আসচে যাচ্চে ব'লে দেওয়ান বেনিয়ান বাবুরা টানে হুইস্কি, জিন, বার্গাণ্ডি, ক্ল্যারে, শ্যাম্পেন, আর মাসমাইনে মাত্তর পনেরো টাকা ব'লে বেরজো মিত্তির ছোটে কেষ্ট দত্তের পাণ্ড হাউসে—এইতো তফাৎ!

রাজি হওয়ার পর মনে একবার দ্বিধা এসেছিল বটে, কিন্তু কথা যখন দিয়েছে তখন হরিশ আর পিছিয়ে আসবে না। বেহুঁশ হওয়ার মতো একটা কোনো অবলম্বন তার চাই। বুকের ভেতর এ-বোঝাটাকে সত্যিই আর সে বইতে পারছে না।

কি উগ্র ঝাঁঝালো পানীয়!

গলা দিয়ে যখন নামলো তখন গলা বুক যেন জ্বলে গেল। তারপর একটু একটু ক'রে কেমন সুন্দর একটা অবসাদ নেমে এলো সর্বাঙ্গে। কেমন অবশ হ'য়ে এলো স্নায়ুগুলো। তারপর দুঃসহ স্মৃতির বেদনাকে যেন আবৃত ক'রে দিল বিস্মরণের একটা ঝাপ্‌সা আবরণ। এর নামই কি নেশা?

এ নেশার স্বাদ হরিশের কাছে সেইদিনই প্রথম। তারপর থেকে কেষ্ট দত্তের পাঞ্চ হাউস প্রায়ই তাকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ ক'রে নিয়ে গেছে।

একটুও বাড়িয়ে বলেনি ব্রজ মিত্তির। এত দিশি মদের দোকান থাকতেও চীনেবাজারে কেষ্ট দত্তের দোকানে ভীড় যেন উপচে পড়চে। শাদা আদমি খদ্দেরের সংখ্যা সেখানে কালা আদমির চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়।

আপিসের কাছাকাছি এলাকাগুলোয় বেশ কিছু দিশি মদের দোকান বেশ রমরম্ ক'রে চ'লছে। সাহেবদের পাঞ্চ-হাউসের অনুকরণে দিশি মদের শুঁড়িরাও তাদের দোকানের নাম দিয়েছে পাঞ্চ-হাউস। ধর্মতলা, খালাসিটোলা, জানবাজার, কপালীটোলা, মলঙ্গা—কোথায় দিশি মদের পাঞ্চ-হাউস নেই? ব্রজ মিত্তির পথ চিনিয়ে বাঁচিয়ে দিয়েছে হরিশকে। যেদিনই মনটা বড়ো বেশি ভারী হ'য়ে ওঠে, সেদিনই সে ঢুকে পড়ে কোনো একটা দোকানে। ছোটোবৌ আর খোকার স্মৃতি সেদিন তার অবসাদগ্রস্ত চেতনাকে পীড়িত ক'রতে পারে না। বাড়ি ফিরে বিছানায় শুলেই তার চোখে নেমে আসে ঘুম।

বড়োবৌ একদিন হারাণকে ব'ললে, ঠাকুরপো আজকাল কিন্তু বেশ নেশাভাং ক'রচে!

হারাণ ব'ললে, তাতে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়েচে? টাউন কলকাতায় দ্যাখোগে', বড়ো বড়ো ঘরের বাবুরা মদের ফোয়ারায় চান ক'রচে, মদের চৌবাচ্চায় সাঁতার কাট্‌চে। আবার কাঁড়ি কাঁড়ি টাকাও রোজগার ক'রচে। হরিশও ক'রবে দেখো! যারা মদ খায় তারাই অনেক টাকা রোজগার করে।

এই অদ্ভুত সিদ্ধান্ত শুনে বড়োবৌ থ'! সে ব'ললে, এমন বিচিত্তির কথা তো বাপের জন্মে শুনিনি বাপু!

হারাণ ভারিক্কি চালে ব'ললে, এ দুনিয়ার কতটুকুই বা তুমি দেখেচ আর কতটুকুই বা শুনেচ?

বড়োবৌ ছাড়বার পাত্রী নয়। ঝামটা দিয়ে ব'ললে, আহা, কথার কি ছিরি! বে' ক'রে এনে ইস্তক যেন ভারী দেখতে শুনতে দিয়েচ? এই এককুড়ি বছরের ভেতর খালি আঁতুড় ঘর ছাড়া আর তো কিছু দেখলুম না!

বড়োবৌ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। হারাণ গম্ভীর মুখে তামাক টানতে টানতে ভাবতে লাগলো, পরের মাথায় কাঁটাল ভেঙে খাওয়ার ওস্তাদ বোধ হয় মেয়েদের চেয়ে বড়ো আর কেউ নেই!

রুক্মিণী কিন্তু তাঁর চেষ্টায় ইস্তফা দেননি। তিনি মাঝে মাঝেই সময় সুযোগ মতো ইনিয়ে বিনিয়ে হরিশের কাছে বিয়ের কথা তোলেন। বড়োবৌ একদিন তাঁর কাছে হরিশের মদ খাওয়ার প্রসঙ্গ তুলতেই তিনি তেলে বেগুনে জ্ব'লে উঠলেন।—তুমি থামো তো বাছা! সোনার আঙটি আবার বাঁকা! বেটাছেলে হ'ল সোনার আঙটি। একটু মদ খেয়েচে তো কী এমন হ'য়েচে? তাও তো সোমত্ত বয়সের ছেলে এই অবস্থায় রাঁড়ের বাড়ি গে' পড়ে থাকে না, তাই যথেষ্ট। আমি আবার নতুন বৌ ঘরে আনলে তোমার বাড়াভাতে ছাই প'ড়বে, কেমন?

হরিশের সম্মতির জন্যে আর অপেক্ষা করবার মতো ধৈর্য ছিল না রুক্মিণীর। চোখের সামনে ছেলেটা সারাজীবন এইভাবে বিবাগী হ'য়ে কাটাবে নাকি? ওই যে বিপিন বৈরিগী রোজ সকালে টহল দিয়ে নাম শুনিয়ে যায়, সে তো বৈরিগী বোষ্টম মানুষ। প্রথম বোষ্টুমি মারা যাওয়ার পর তাকেও ঘরে আর একটা বোষ্টুমি আনতে হয়েছে। যে বয়সের যা ধর্ম! ছেলে রাজি না হ'লে তাকে জোর ক'রেই রাজি করাতে হবে! ঘরে একটা টান না থাকলে বয়সের ধর্মে যদি এদিক-ওদিক ছুক ছুক ক'রে বেড়ায় তবে তো তাদের পেছনেই টাকা পয়সা উড়ে যাবে!

একরকম গোপনে গোপনেই ব্যবস্থা ক'রে ফেললেন রুক্মিণী। পাত্রী একটা পাওয়া গেছে। মেয়েটা বেশ ডাগর-ডোগর আছে, তবে গায়ের রঙ একটু শামলা গোছের। তা হোক গে। মেয়েটা মেয়ে হ'লেই হ'ল। গায়ের রঙ ধুয়ে কি বেটাছেলে জল খাবে? কুল শীল নিয়ে অত বিচার করবার অবসর কোথায়? তাছাড়া অত বিচার ক'রেই বা হবে কী? কাজ তো হাঁড়ি ঠেলা আর ছেলে

বিয়োনো। গতরে সেইটুকু ক্ষমতা থাকলেই হ'ল। মায়ের জবরদস্তিতে শেষ পর্যন্ত আর হরিশের আপত্তি টি'কলো না। বিয়ে হ'য়ে গেল।

এতদিনে নিচিন্ত হ'লেন রুক্মিণী।

কিন্তু পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হওয়া তাঁর কপালে ছিল না। দু'তিন মাসের ভেতরেই তিনি বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পারলেন, আগেকার ছোটোবৌয়ের সঙ্গে নতুন ছোটোবৌয়ের পার্থক্য আকাশ-পাতাল। বড়োবৌও কিছুদিনের ভেতরেই বুঝতে পারলে, তার আশঙ্কাই সত্যি। মোক্ষদা কোনোদিন বড়ো জায়ের মুখের ওপর কথা বলেনি। নিজের সোদরা দিদির মতোই বড়ো জাকে সে দেখতো। নিজের কোলে ছেলেটা আসার আগে পর্যন্ত ভাসুরপো ভাসুরঝিদের ঝক্কি ঝামেলার বেশির ভাগই সে নিজে পোয়াতো। কিন্তু নতুন ছোটোবৌ সর্বদিক থেকে তার বিপরীত। সংসারে এসে প্রথমেই নিজের দিকটা সে ভালো ক'রে বুঝে নিয়েছে। তার স্বামীর রোজগার যে ভাসুরের রোজগারের দ্বিগুণ, তাও প্রথম দিকেই জেনে নিয়েছে।

হরিশের চোখে পার্থক্যটা বড়ো মর্মান্তিকভাবে ধরা প'ড়েছে।

বিয়ের পর মাসখানেক-ও তখন কাটেনি। একদিন রাতে ছোটোবৌ ব'ললে, আমি এসে সব খপরই নিয়েচি। শুনি, আগের পক্ষের সঙ্গে তোমার পীরিতের নদীতে রোজই নাকি বান ডাকতো?

হরিশ কোনো উত্তর দিলে না।

নতুন ছোটোবৌ একটু মুচ্‌কি হেসে ব'ললে, আহা রে পীরিতের লাগর, সে মাগীকে এখনো ভুলতে পারোনি দেখচি!

গম্ভীর স্বরে হরিশ ব'ললে, কথাবার্তাগুলো একটু ভদ্রভাবে বলবার চেষ্টা করো ছোটোবৌ!

নতুন বৌ অবাক্ হ'য়ে ব'ললে, ওমা, এর ভেতর আবার অভদ্দর কথা কী বললুম?

হরিশ চুপ ক'রে রইলো।

তার দিক থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে নতুন বৌ ব'ললে, কী ক'রবো বলো? আমরা মুখ্যুসুখ্যু মুনিষ্যি, ইঞ্জিরি তো আর পড়িনি যে ইঞ্জিরি মতে ভদ্দর কথা ব'লে তোমার মন জুড়োবো?

অসহিষ্ণু স্বরে হরিশ ব'ললে, যার কথা ব'লে তুমি খোঁটা দিচ্চ, সে-ও কোনোদিন ইংরিজি পড়েনি। রুচি জিনিসটা ইংরিজি শেখার ওপর নির্ভর করে না।

নতুন বৌ ঠোঁট উল্‌টে ব'ললে, কি জানি বাপু! আমি ভেবেচি আমার মরা-সতীন হয়তো ইঞ্জিরি-পড়া বিবি ছিল, তাই এত পীরিতের জোয়ার।

নতুন বৌ সবই জানে, সবই শুনেছে। তবু প্রতি কথায় একটু খোঁচা না দিয়ে সে পারে না। কিন্তু হরিশ দোষ দেবে কাকে? ইচ্ছেয় হোক, অনিচ্ছেয় হোক, বিয়ের প্রস্তাবে সে তো শেষ পর্যন্ত সম্মতি দিয়েছিল। এখন এই নারীই তার ধর্মপত্নী। একেও সে অগ্নিসাক্ষী ক'রেই ঘরে এনেছে। নতুন বৌয়ের রুচি যত সঙ্কীর্ণই হোক, তার দায়িত্ব হরিশকে বহন ক'রে যেতেই হবে!

ক্লান্ত, অসহায় স্বরে হরিশ ব'ললে, সে চিরদিনের মতো চ'লে গেছে। সে তো কোনোদিনই আর তোমার সঙ্গে বিবাদ ক'রতে আসবে না? অনেক রাত হ'য়েচে এবার ঘুমোতে দাও।

নতুন বৌ অসহিষ্ণু স্বরে ব'ললে, আমার সঙ্গে দুটো কথা বলতেও তোমার কি অসহ্য লাগে? তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে সেই মাগীর স্বপ্ন দেখবে বুঝি?

তিক্ততম স্বরে হরিশ ব'ললে, হ্যাঁ, দেখবো।

॥ দুই ॥

আকণ্ঠ তৃষ্ণা!

সে তৃষ্ণায় ভেতরে ভেতরে ছটফট ক'রছে হরিশের মন। কিন্তু নিবারণের উপায় নেই!

হারাণের উপার্জন বাড়েনি কিন্তু পোষ্য সংখ্যা বেড়ে হ'য়েছে ছয়। তার ওপর হরিশের

নিজের মদের খরচ। দাম অবশ্য বেশি নয়, পাঁইট বোতল দু'আনা। কিন্তু সে খরচটাও তো লাগে? অভ্যেসটা আর ছাড়তে পারেনি হরিশ। এখন আর ছাড়বার ইচ্ছেও হয় না।

ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি এখন আর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ভেতর নেই। লাইব্রেরি উঠে গেছে মেটকাফ হলে। ট্যাঙ্ক স্কোয়ারের দক্ষিণে যে সংক্ষিপ্ত পথটুকু ব্যাঙ্কশাল আর হেয়ার সাহেবের বাড়ির গা দিয়ে পশ্চিমে গঙ্গার পাড়ে গিয়ে স্ট্র্যাণ্ডে মিশেছে, সেই মোড়ের ওপরেই মেটকাফ হল। মাঝে মাঝে আপিস ছুটির পর হাঁটতে হাঁটতে হরিশ চ'লে যায় ব্যাঙ্কশালের পথে। মেটকাফ হলের সামনে গিয়ে বিভোর হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

ডোরিক স্থাপত্যের আদর্শে তৈরি কি বিরাট বাড়ি!

ওই বাড়িটার ভেতর থরে থরে সাজানো কত বই, কত পত্র-পত্রিকা! জ্ঞানের কি বিরাট ভাণ্ডার!

নির্নিমেষ দৃষ্টিতে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকে হরিশ। অন্যমনস্ক দৃষ্টি কখনো চ'লে যায় গঙ্গার দিকে। কত জেলে ডিঙ্গি গঙ্গার বুকে। পাল তুলে ভেসে যাচ্ছে কত ভাউলে, বজরা, পান্সি! —এই গঙ্গার ওপর দিয়েই হরিশ একদিন বিয়ে ক'রতে গিয়েছিল উত্তরপাড়ায়!

অজ্ঞাতেই একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে বুক থেকে।

আবার সে চোখ ফেরায় মেটকাফ হলের দিকে। সাহেব সদস্যরা আসছেন, দিশি সদস্যরাও আসছেন। কেউ পাল্কিতে, কেউ ল্যাণ্ডোতে, কেউ বা ফিটনে।

লাইব্রেরির সদস্য হ'তে গেলে মাসিক চাঁদা দু-টাকা। তাছাড়াও আনুষঙ্গিক কিছু খরচ আছে। হরিশ যদি না চালাতে পারে? একবার সদস্য হওয়ার পর চাঁদা বাকির দায়ে তার নাম কাটা যাবে? সে লজ্জার চেয়ে সদস্য না হওয়া ভালো।

কী সব আবোল-তাবোল ভাবছে সে!

যেখানে এত বড়ো বড়ো মানুষের আনাগোনা, সেখানে তার মতো দশ টাকা মাইনের একটা সামান্য রাইটারকে সদস্য ক'রবে কেন? লেখাপড়াও আরম্ভ হ'তে না হ'তে বন্ধ হ'য়ে গেছে। তাকে যদি কেউ প্রশ্ন করে, কদ্দুর পড়াশোনা করেচ হে ছোকরা যে বুকের পাটা দেখিয়ে ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরির মেম্বর হ'তে এয়েচ?—তখন কী উত্তর দেবে সে?

এই লাইব্রেরি যখন এসপ্ল্যানেড রো-তে ডক্টর স্ট্রংয়ের বাড়িতে ছিল, তখন সে বাড়িটা তাকে কী এক সম্মোহনী আকর্ষণে প্রায়ই টেনে নিয়ে যেতো! সে-সময় লাইব্রেরির ভেতরের চেহারা তার দেখবার সুযোগ হয়নি। এবার কিন্তু বাইরে থেকেই কিছুটা দেখেছে। মেটকাফ হলের প্রশস্ত সিঁড়ি দিয়ে উঠে মোটা থামের পাশে দাঁড়ালে হলঘরের ভেতরে নিস্তব্ধ বিশাল জ্ঞানসমুদ্রের একটু অংশ অন্তত দেখা যায়। তা দেখার পর থেকেই তার তৃষ্ণা যেন আগের চেয়ে অনেক বেশি বেড়ে গেছে। প্রতিদিন আরো বাড়ছে।

অথচ আশ্চর্য, মাঝে কয়েকটা বছর সে যেন ভুলেই গিয়েছিল তার সঙ্গোপন আরব্ধ ব্রত। ভুলে গিয়েছিল, সেই কতবছর আগে জ্ঞানতৃষ্ণায় অধীর সাত বছর বয়সের নিঃসম্বল এক দুঃসাহসী বালক ইউনিয়ন স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্যে পাগল হ'য়ে নিজে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল স্কুলের অধ্যক্ষ রেভারেণ্ড পিফার্ডের সামনে।

তার আটবছর পরে?

দুঃসহ দারিদ্র্যের তাড়নায় নিরুপায়ভাবে যেদিন ইউনিয়ন স্কুল থেকে তাকে বেরিয়ে আসতে হ'য়েছিল, সেদিন সে অঝোর ধারায় কেঁদে ফেলেছিল! সেদিন সত্যিই তার মনে হ'য়েছিল যেন জীবনের সব স্বপ্নকে চিতায় তুলে দিয়ে শ্মশান থেকে ফিরছে।

সবই কি সে ভুলে ছিল এতদিন?

না, সে ভোলেনি কিছুই। উপায় ছিল না, তাই তাকে ভুলে থাকার ভান ক'রতে হ'য়েছে। সংসারের দায়িত্ব অষ্টপ্রহর তাকে বেঁধে রেখেছে। সংসারের দারিদ্র্য আজও তার তেমনিই আছে! তার দায়িত্ব সম্বন্ধে সবাই তাকে সচেতন ক'রে রাখে! একমাত্র মা ছাড়া অন্তরের স্পর্শ

আর কারো কাছে নেই। হ্যাঁ, আর একটা জায়গায় নিঃস্বার্থ অন্তরের স্পর্শ আছে। ছোটো ছোটো ভাইপো ভাইঝিগুলো। বিশেষ ক'রে মাধুরীলতা নামে ভাইঝিটা যে কী মায়ার বাঁধনেই তাকে বে'ধে ফেলেছে! হরিশ তাকে ডাকে মধু-মা।

সব বুঝতে পারে হরিশ। দাদা বরাবরই নির্বিকার, উদাসীন। সে জানে হরিশ আর যাই করুক, সংসারের দায়িত্ব এড়িয়ে যাবে না। বৌঠান অবস্থার চাপেই বাধ্য হ'য়ে সব সময় দেওরকে তুষ্ট রাখার চেষ্টা করেন। আর নতুন ছোটোবৌ? অন্নবস্ত্রের জন্যে একটা স্বামী দরকার; দেহতৃপ্তির জন্যে দরকার একটা শক্ত সমর্থ পুরুষ মানুষের। তার কাছে হরিশ সেই স্বামী, সেই পুরুষ মানুষ। হৃদয় দিয়ে হৃদয়কে অনুভব করবার শক্তি তার নেই, চেষ্টাও নেই। হরিশের মনে হয়, এটা হয়তো একদিক থেকে তার পক্ষে ভালোই হ'য়েছে। তার হারিয়ে যাওয়া ওফেলিয়ার স্নিগ্ধ স্মৃতিটুকু অবিঘ্নিত থাক!

মেটকাফ হলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে কখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। অন্ধকার নেমে আসে গঙ্গার ওপর। শুধু জেলে ডিঙির আলোগুলো এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায়।

বাড়ি ফেরার কোনো তাড়া নেই।

বরঞ্চ বাড়িতে যতক্ষণ না থাকা যায় ততক্ষণই শান্তি। হয়তো মা ব'সে ব'সে চিন্তা ক'রবেন। বেশি রাত হয়ে গেলে নতুন ছোটোবৌ-ও হয়তো একটু চিন্তা ক'রতে পারে। সেটা যে কোনো স্ত্রীর পক্ষে করণীয় ব'লেই হয়তো সে ক'রবে! তারপর মানুষটাকে ফিরে আসতে দেখে যখন উদ্বেগ কাটবে তখন থেকেই বাঁকা বাঁকা কথা বলতে আরম্ভ ক'রবে। কদর্য ইঙ্গিত—অরুচিকর ভাষা।

—শুধু ধেনো মদেই কি ষোলো আনা ফুর্তি হয়! ফুর্তির নদীতে তুফান আনতে টাউন কলকাতায় কত বিদ্যেধরী অপ্সরী আচে! টোলায় টোলায় জ্যান্ত রসদ। মন্তর পড়ারও দরকার নেই, ভাত কাপড় দেওয়ার পিতিজ্ঞে করবার-ও দরকার নেই। ফ্যালো কড়ি মাখো তেল। তেমন কোথাও তেল মাখতেই আজ এত দেরি হ'ল নাকি?

নীরবে সবই সহ্য করে হরিশ।

এ নিয়ে কড়া ভাষায় কিছু ব'লতে গেলে রাতদুপুরে হয়তো চে'চিয়ে পাড়া মাথায় করবে। কিম্বা তাতেও যথেষ্ট মনে না হ'লে কান্না জুড়ে দেবে।

হরিশ একদিন তার এক সহকর্মীর অনুরোধে বৌবাজারে তাদের পাড়ায় সারারাত যাত্রাপালা শুনেছিল। বাড়িতে আগেই বলা ছিল, সে রাতে বাড়ি ফিরবে না। পরের দিন বন্ধুটির বাড়িতে দু'টি খেয়ে একেবারে আপিস ক'রে ফিরবে।

পরের দিন সন্ধ্যের পর বাড়ি ফিরতেই নতুন ছোটোবৌ তার নিজের মূর্তি ধ'রলে। কোথায় যাত্রাগান হ'চ্ছে, তা কি সে নিজের চোখে দেখতে গেছে? কিছু না বোঝাব মতো কচি খুকি সে নয়। টাউন কলকাতা তো রেণ্ডিমাগীতে গিস্‌গিস্ ক'রচে। ত'দের কারো ঘরে রাত কাটানোর লোভ তো সেকথা সোজাসুজি ব'লে গেলেই হ'ত! মিছেমিছি যাত্রাপালার ওজর দেবার কী দরকার

রাতজাগার পর সারাদিন আপিসে কাজ ক'রে হরিশের বেশ মাথা ধ'রেছিল সেদিন। সে-ও আর ধৈর্য রাখতে পারলে না। প্রচণ্ড উত্তেজিতস্বরে ব'ললে, হরিশ মুখুজ্যে মিছে কথা বলে না ছোটোবৌ! তোমার ছোটো মন আর রুচি দেখে এখন আমার কী মনে হ'চ্চে, জানো? তোমার মতো স্ত্রীর সঙ্গে এক বিছানায় শোয়ার চেয়ে তাদের সঙ্গে রাত কাটানো ঢের ভালো!

—কী ব'ললে? কী ব'ললে তুমি?—চিৎকার ক'রে উঠলে ছোটোবৌ।

—যা ব'লেচি, তা তো তুমি শুনেচ! তাদের হাতে টাকা দিলেই দেহ পাওয়া যায়; মনের মাশুল দিতে হয় না, কর্তব্যের দায়-ও পোয়াতে হয় না। তারাও তা দাবি করে না।

হাউ হাউ ক'রে কে'দে ফেললে ছোটোবৌ।—নিজের পরিবারকে এ-কথা তুমি ব'লতে পারলে?

তোমার কাছে আমি বেশ্যেমাগীরও অধম? বেশ তো, তাদের কাউকে ঘরে এনে রাখলেই হ'ত। ভদ্দরঘরের মেয়েকে বে' ক'রে আনলে কেন? কেন তুমি আমার এতবড়ো সব্বোনাশ ক'রলে? কেন আমার জেবনটাকে নষ্ট ক'রে দিলে বলো?

পাগলের মতো চিৎকার ক'রতে ক'রতে তখন নিজের কপাল চাপড়াচ্ছে ছোটোবৌ। হয়তো তার কথাগুলো পাশের ঘরে দাদা আর বৌঠানের কানে গিয়ে পেঁাছচ্ছে! হয়তো মায়ের কানে গিয়েও কথাগুলো বিঁধছে।

লজ্জায়, ঘৃণায়, রাগে হরিশের তখন এক অস্বাভাবিক অবস্থা। তারই ভেতর নিজেকে যথাসম্ভব সামলে নিয়ে সে ব'ললে, নিজের স্বভাবটাকে শোধরাবার চেষ্টা করো ছোটোবৌ, তাতে শান্তি পাবে।

ছোটোবৌয়ের প্রবল কান্নার শব্দে হরিশের সেই কথা ক'টি ডুবে গেল। সে তখন আরো হাউ হাউ ক'রে কাঁদছে আর বলছে, হায়, ভগমান, আমার কপালে তুমি কিনা এই নিকোঁচিলে? বাবা, বাবাগো! হাত পা বেঁধে এ তুমি আমায় কোথায় ফেলে দিলে গো বাবা—

॥ তিন ॥

কিছুদিন ধ'রেই কলকাতার গোরা মহলে বেশ একটা উত্তেজনা চ'লছে। ইংলিশম্যান কাগজের কাটতি বেড়ে গেছে, কাটতি বেড়েছে বেঙ্গল হরকরা আর ফ্রেন্ড অব্ ইণ্ডিয়ার।

পাঞ্জাবে শিখদের সঙ্গে কোম্পানির লড়াই বেধেছে।

না, এবারে কেউ আর ব'লতে পারবে না যে, কোম্পানি পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া বাধিয়েছে। লর্ড এলেনবরা গবর্নর জেনারেল থাকলে হয়তো তা সম্ভব হ'ত। কিন্তু তাঁকে তো কোম্পানি কবেই বিলেতে সরিয়ে নিয়ে গেছে। এখন গবর্নর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ। তিনি যেচে যুদ্ধের হুকুম দেননি। শতদ্রু নদী পার হ'য়ে শিখ সেনারাই বৃটিশ অঞ্চল আক্রমণ ক'রেছিল। তার পরেও কি গবর্নর জেনারেলের পক্ষে চুপ ক'রে ব'সে থাকা সম্ভব? বাধ্য হ'য়েই তাঁকে যুদ্ধের হুকুম দিতে হ'য়েছে।

কিন্তু শিখবাহিনীই বা হঠাৎ আক্রমণ ক'রে ব'সলে কেন?

কতজনে কত কথা ব'লছে। তার কোন্‌টা যে ঠিক আর কোন্‌টা যে গুজব, কে বলবে?

রঞ্জিত সিং বুদ্ধি রাখতেন।

তাঁর মৃত্যুর পরেই শিখরাজ্যে দেখা দিল অরাজকতা। সৈন্যবাহিনী সর্বেসর্বা হ'য়ে ওঠার 'পর বেশ কয়েকজন শাসক তাদেরই মর্জিতে হ'লেন পদচ্যুত। কয়েকবছর আগে সিংহাসনে বসানো হয় রঞ্জিত সিং-এর নাবালক ছেলে দলীপ সিংকে। তার মা রাণী ঝিন্দন হ'লেন নাবালক রাজার অভিভাবিকা। রাণী ঝিন্দনের সঙ্গেও বিরোধ বেধে গেল শিখবাহিনীর। পাশেই ফিরিঙ্গি কোম্পানির রাজত্ব। তাই কোম্পানিতো আর চুপ ক'রে ব'সে থাকতে পারে না। তারাও ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কা ক'রে পাঞ্জাব আর সিন্ধুর সীমান্তে সৈন্য জড়ো ক'রতে থাকে। কেউ কেউ ব'লছে, তাই দেখেই খাল্‌সাবাহিনী নাকি ক্ষেপে গিয়ে কোম্পানির পল্টনকে আক্রমণ ক'রে ব'সেছে। আবার কেউ ব'লছে, আসল রহস্য আরো গভীর। খাল্‌সাবাহিনীর ওপর লাহোর-দরবারের কোনো প্রভাব খাটছে না দেখে নাবালক ছেলের সিংহাসন নিরাপদ করবার জন্যে রাণী ঝিন্দন একটা কূট চাল চেলেছেন। তিনিই নাকি কায়দা ক'রে প্ররোচনা দিয়ে গোরা পল্টনের ওপর খাল্‌সা বাহিনীকে লেলিয়ে দিয়েছেন। তারা কোম্পানির সঙ্গে লড়াই ক'রে নিজেদের শক্তি ক্ষয় করুক। একবার হতবল হ'লে তাদের দিক থেকে নাবালক দলীপ সিংকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দেওয়ার ভয় আর থাকবে না।

আসল কারণ যা-ই হোক, পাঞ্জাবের মাটিতে যে অনেক রক্ত ঝ'রেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত কোম্পানিই জিতেছে। বীর খালসাবাহিনী পরাভূত, হতমান।

আবার কোম্পানির জয়! আবার বিজয়োৎসব!

কেবল যুদ্ধজয়ই নয়, তার মূল্যে হিসেবে জলন্ধর, দোয়াব আর শতদ্রু নদীর দক্ষিণে সমস্ত শিখরাজ্য এসেছে কোম্পানির অধিকারে। সিন্ধু আগেই দখলে এসেছিল। এবার এলো পাঞ্জাবের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল আর তার সঙ্গে ফাউ হিসেবে হাজারা এবং কাশ্মীর!

হোটেলে, ট্যাভার্নে, পাঞ্চ-হাউসে আবার ছুটলো মদের ফোয়ারা। বক্সওয়ালাদেব বিক্রি অসম্ভব রকম বেড়ে গেল। ইংরেজ সাহেবদের কুঠিতে কুঠিতে সরকারবাবু থেকে আরম্ভ ক'রে খানসামা, বাবুর্চি, খিদমৎগার, আবদার, পাঙ্খাপুলার, সহিস, কোচোয়ান—সবাই পেলো পর্যাপ্ত বকশিশ।

রুল ব্রিটানিয়া রুল দি ওয়েভ্স্!

টলা কোম্পানিতে এ-বছর লাভের অঙ্ক বিপুল। তার ওপর পাঞ্জাবের যুদ্ধে এতবড়ো একটা সাফল্য!

বছরের শেষের দিকে টলা কোম্পানির সমস্ত শ্বেতাঙ্গ আর ইউরেশীয় কর্মচারিরা জানতে পারলে, সামনের জানুয়ারি থেকে তাদের মাইনে বাড়তে চ'লেছে। কারো তিরিশ, কারো চল্লিশ, কারো বা পঞ্চাশ টাকা। যারা আরো ওপরে আছে, তাদের একশো থেকে দেড়শো টাকা।

তারপর থেকেই নেটিব কর্মচারী মহলে একটা চাপা খেদ দেখা দিল। সবই সেই তেলা মাথায় তেল? যার মাইনে ছিল দেড়শো তার হ'য়ে গেল দুশো কি আড়াইশো: কিন্তু যাদের মাইনে দশ, বারো কি পনেরো তাদের মাইনে সেই জায়গাতেই র'য়ে গেল?

কিন্তু এই অবিচারের প্রতিবাদ ক'রবে কে? কার ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে? প্রতিবাদ দূরের কথা, সামান্য অনুযোগ জানাতে গেলেই চাকরি থেকে বরখাস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। তখন যে স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে উপোস দিয়ে ম'রতে হবে!

পরস্পরের ভেতর ফিস্ ফিস্ ক'রে কথা হয়। সবাই বলে, এ ঘোরতর অন্যায়। এর একটা প্রতিকার হওয়া উচিত। প্রতিবাদ? না, না, প্রতিবাদের কথা চিন্তা করাই অন্যায়। অন্নদাতা প্রভু হ'ল জন্মদাতা পিতার-ই মতো। তাঁর কাছে আবার প্রতিবাদ কী? তারা বড়োজোর একটা আর্জি পেশ ক'রতে পারে। তাতে কিছু সুরাহা হয় ভালো, না হ'লেও ভয়ের কিছু নেই। আর্জি নামঞ্জুর হয় হবে। কিন্তু তার জন্যে তো আর চাকরি যাবে না?

কিন্তু আর্জি নিয়ে বড়ো সাহেবের কাছে যাবে কে?

সবাই ব'লছে, এ-কাজের পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত লোক হ'ল হরিশ। যেমন সুন্দর যুক্তি দিয়ে কথা ব'লতে পারে তেমনি সৎলোক হিসেবেও বড়োসাহেবের কাছে তার সুনাম আছে। তার ওপর গায়ের রঙটাও ফর্সা।

তখন ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি।

হরিশের শরীর বেশ কিছুদিন ধ'রেই খারাপ চ'লছে। কাশির কষ্ট আগের বছরের চেয়েও বেড়েছে। কাশতে কাশতে অনেক দিনই তাকে উঠে ব'সে রাত কাটাতে হয়। শুয়ে থাকলে কাশির বেগ যেন ক্রমেই বেড়ে যেতে থাকে। বালিশে ঠেস দিয়ে ব'সে রাত কাটায় হরিশ। বিছানার অন্যপাশে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকে ছোটোবৌ। তাকে সে ইচ্ছে ক'রেই ডাকে না। কাশতে কাশতে ওই কষ্টের ভেতরেই স্মৃতিচারণ করে হরিশ। এত প্রচণ্ড কাশি তো দূরের কথা, সামান্য একটু কাশির শব্দ হ'লেই অঘোর ঘুমের ভেতরেও ঠিক জেগে উঠতো মোক্ষদা। উৎকণ্ঠিত ব্যাকুল স্বরে ব'লতো, হ্যাঁ গা, তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে? বুকে হাত বুলিয়ে দেবো? তেলটা একটু মালিশ ক'রে দেবো?

আপিসের কাজের ফাঁকে ফাঁকেই মাঝে মাঝে অন্যমনস্কভাবে মোক্ষদার কথা ভাবছিল হরিশ। পুবদিকে একদা—ছোটো আদালতের বাড়িটার মাথার ওপর পড়ন্ত রোদের আভা ছড়িয়ে পড়েছে।

এখন অবশ্য ওটা পেটি কোর্ট জেল নয়, মেডিকেল কালেজ। আপিসের পাশের মেহগনি গাছটার পাতার আড়াল থেকে একটা ঘুঘুর ডাক ভেসে আসছে।

একটু পরেই ব্রজ মিত্তির এসে হরিশের পাশে দাঁড়ালে।

হরিশের সঙ্গে তারই নাকি বেশি দহরম-মহরম। তারা দু'জন এক গেলাসের ইয়ার। দিশি পাঞ্চ হাউসে একসঙ্গে ব'সে তারা কাশ্ট্রি লিকার গলায় ঢালে। সেইজন্যেই হরিশকে রাজী করানোর ভারটা সবাই ব্রজ মিত্তিরকে দিয়েছে।

ব্রজ মিত্তিরকে দেখেই হরিশ ব'ললে, আজ আর ওমুখো হবো না দাদা, কালকে রাত্তিরে কাশিতে বড়ো কষ্ট গেচে।

ব্রজ মিত্তির ব'ললে, না হে, সে-কথা ব'লতে আসিনি। সবাই চাইচে, আর্জিটা নিয়ে তুমিই বড়ো সাহেবের কাছে যাও।

হরিশ কয়েকমুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে তারপর ব'ললে, শিখদের সঙ্গে যুদ্ধে কোম্পানির জয় হ'য়েচে, সেই আনন্দেই নাকি গোরা রাইটারদের মাইনে বাড়িয়েচে বড়োসাহেব। এদেশের মানুষ হ'য়ে সেটা কি আমাদের কাছেও আনন্দ সংবাদ যে সেই উপলক্ষ্যে আমাদের মাইনে বাড়িয়ে দেওয়ার আর্জি নিয়ে যাবো?

এরকম একটা প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়ার জন্যে তৈরি ছিল না ব্রজমিত্তির। প্রথমেই কী ব'লবে বুঝতে না পেরে আম্‌তা আম্‌তা ক'রে ব'ললে, এ একটা হক কথা বলেচ বটে ভায়া!—তারপরই একটু ভেবে নিয়ে চাপাস্বরে ব'ললে, কিন্তু আমরাতো ধরো সেই কারণে মাইনে বাড়ানোর আর্জি ক'রচি নে? কোম্পানির মুনোফা দিনকে দিন বাড়চে এটা তো ঠিক?

হরিশ ব'ললে, হ্যাঁ, শুনেচি এ-বছর লাভের অঙ্ক গতবছরের দ্বিগুণ।

—তবেই ব্যাপারটা বুঝে দ্যাখো! একই কাজ ক'রচি, বরঞ্চ আমরাই বেশি খেটে ম'রচি অথচ চামড়া শাদা ব'লে ওদের মাইনে বিশ, তিরিশ, পঞ্চাশ যা খুশি বেড়ে যাবে আর আমরা নেটিব শালারা খালি বুড়ো আঙুল চুষবো?

হরিশ হেসে ব'ললে, রাজার জাত আর প্রজার জাতে এ তফাৎটা তো অনেক আগে থেকেই ক'রে রাখা আছে দাদা, আজই তো নতুন নয়?

—সে তো হাড়ে হাড়েই টের পাচ্চিরে ভাই! ওরা দিব্যি সাহেবি পাঞ্চ-হাউসে ব'সে মৌজ ক'রে হুইস্কি শ্যাম্পেনের গেলাসে চুমুক দেয় আর আমরা শালারা দিশি পাঞ্চ হাউসে ধেনো টেনেই জীবন কাটিয়ে দিলুম!

হরিশের হাসি পেয়ে গেল। ব'ললে, এইটেই তাহ'লে আপনার সবচেয়ে বড়ো অভিযোগ?

ব্রজ মিত্তির গম্ভীর হ'য়ে ব'ললে, না, না, ও-সব ঠাট্টা-তামাশার কথা ছেড়ে দাও ভায়া। আসল কথা হচ্চে, হৌসের প্রচুর মুনোফা হচ্চে। তার পেছনে আমাদেরও যথেষ্ট খাটুনি আচে, এটা তারা একটু বুঝুক। কথাটা ঠিক বলেচি কিনা বলো?

—নিশ্চয়ই ঠিক। যুদ্ধ করে সৈন্যেরা; তারাই মারে, তারাই মার খায়। কিন্তু যুদ্ধে জয় হ'লে নাম হয় সেনাপতির।

ব্রজ মিত্তির একগাল হেসে ব'ললে, বাঃ, বেড়ে উপমাটি দিয়েচ ভায়া! এত সুন্দর ক'রে গুছিয়ে ব'লতে পারো ব'লেই তো তোমার ওপর দায়িত্বটা দিতে সবাই ব্যগ্র। গোরা রাইটারদের মাইনে বাড়িয়েচে বেশ কথা। তা নিয়ে আমাদের বলবার কিছু নেই। তবে কিনা, আমাদের দিকটাও দয়া ক'রে একটু বিবেচনা করুক, এই আমাদের আর্জি। একবার অন্তত বাজিয়ে দেখতে আপত্তি কী?

হরিশ ব'ললে, আর্জির ফলাফল কী হবে জানিনে। তবে হ্যাঁ, মাইনে একটু বাড়লে আমারও কিছুটা সুরাহা হয়। ঠিক আছে, আর্জি নিয়ে বড়ো সাহেবের কাছে যেতে আমি রাজি।

যাক বাবা, বাঁচা গেল!—হাঁপ ছেড়ে ব্রজ মিত্তির ব'ললে, আর ভাবনা নেই। তুমি দরবার ক'রতে গেলে কিছু না কিছু সুরাহা হবেই ভায়া! তাহ'লে কবে যাবে?

—আগামী কাল।

ব্রজ মিত্তির গিয়ে ফিস্ ফিস্ ক'রে সবাইকে জানিয়ে দিলে, পরের দিনই একটা কিছু সুরাহা হ'য়ে যাবে।

সেই রাতেই মনে মনে কত কিছু কল্পনা ক'রতে লাগলো হরিশ। তার মাইনে যদি দু'টো টাকাও বাড়ে, তাতেই সে খুশি হবে। সেই বাড়তি দু'টাকায় সে ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরির সদস্য হবে। তারপর রোজ আপিস ছুটির পর সোজা মেটকাফ হল! চোখের সামনে থরে থরে সাজানো অসীম জ্ঞানভাণ্ডারে অফুরন্ত সম্পদ! তখন সে আর অনধিকারী নয়। লাইব্রেরির সদস্য হিসেবে প্রত্যেকখানি বই পড়বার অধিকার তার আছে। যাঁরা পাল্কি, জুড়ি, ল্যাণ্ডো কিম্বা ফিটনে চেপে লাইব্রেরিতে আসেন, হয়তো তাঁরা অতি দরিদ্র এক নতুন আগন্তুককে দেখে নাক সিঁটকোবেন কিম্বা ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলবেন। তাতে হরিশের কিছুই এসে যাবে না। ইউনিয়ন স্কুলে পড়বার সময় থেকেই ধনী দরিদ্রের পার্থক্যটা সে বেশ ভালোভাবেই দেখেছে, বুঝেছে। এখানেও সেইভাবেই সে চ'লবে। যতক্ষণ পারা যায় পড়বে হরিশ। লাইব্রেরির দরজা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত বই ছেড়ে সে উঠবে না।

বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হবে? তা হোক! একমাত্র মা ছাড়া আর কে-ই বা তার জন্যে দুশ্চিন্তা ক'রবে? বাড়ির যে গভীর আকর্ষণটুকু ছিল, সেটুকুতো কবেই নিঃশেষ হ'য়ে গেছে। খোকাও নেই, তার মা-ও নেই।

ছোটোবৌ নিজে এক অক্ষর লেখাপড়া জানতো না কিন্তু হরিশের পড়াশোনাকে সে বড়ো ভালোবাসতো! জীবিকার সন্ধানে বেরোনোর জন্যে বাধ্য হ'য়ে যেদিন হরিশকে ইউনিয়ন স্কুল ছাড়তে হ'য়েছিল সেদিন তারও চোখ ছল ছল ক'রে উঠেছিল। অথচ তখন ক'মাসই বা মাত্র তাদের বিয়ে হ'য়েছে। অতটুকু মেয়ে তখন বোঝেই বা কতটুকু?

হরিশের সমস্ত চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে একাকার ক'রে দিয়েছিল মোক্ষদা। নিষ্ঠুর বাস্তবের আঘাতে স্বামীর যে আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলো গুঁড়িয়ে গেল, সেগুলোকে সে খোকার ভেতর দিয়ে পূর্ণ করবার স্বপ্ন দেখতো: হরিশের মনের চাপা বেদনার বোঝাকে হালকা ক'রে দেবার জন্যে কতবার সে ব'লেছে, দেখো, আমাদের খোকা বড়ো হ'য়ে বিরাট পণ্ডিত হবে! দেশের লোক তাকে চিনবে!

তারা কেউই নেই। প'ড়ে রয়েছে শুধু দুঃসহ স্মৃতিভার। কত মধুর! কত সুন্দর অথচ কত মর্মান্তিক!

পরের দিন।

পড়ন্ত বেলায় কাজের চাপ একটু হাল্‌কা হওয়ার পর বড়ো সাহেবের খাস কামরায় গিয়ে উপস্থিত হ'ল হরিশ।

নেটিব কর্মচারীকে ব'সতে বলা রীতিবিরুদ্ধ। তাকে ব'সতে না ব'ললেও স্মিত হেসে বড়োসাহেব ব'ললেন, বলো ইয়ংম্যান, তোমার জন্যে কী ক'রতে পারি?

—আমি একটা আর্জি নিয়ে এয়েচি স্যার।

—আর্জি? বলো, কী আর্জি তোমার।

আমার ব্যক্তিগত নয় স্যার। আমাদের নেটিব রাইটারদের পক্ষ থেকে আপনার কাছে এই আবেদন যে, আমাদের কিছু কিছু ক'রে বেতনবৃদ্ধি করা হোক!

—বেতনবৃদ্ধি! নেটিব রাইটারদের?—হাঁ ক'রে কিছুক্ষণ হরিশের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন বড়োসাহেব। বিস্ময়ের ঘোর একটু কেটে যাওয়ার পর ব'ললেন, তোমাকে সবাই প্রতিনিধি ক'রে পাঠিয়েচে?

—আমি নিজেই তাদের প্রতিনিধি হ'য়ে এয়েচি। আমাদের শ্বেতাঙ্গ সহকর্মীদের মাইনে যথেষ্ট বেড়েচে। আমরাও হৌসের কাজে যথাসাধ্য পরিশ্রম করি। তাই আমার মনে হয়, একটু সহৃদয় বিবেচনা আমরাও বোধ হয় প্রত্যাশা ক'রতে পারি!

বড়ো সাহেবের লালমুখ আরো লাল হ'য়ে উঠ্‌লো। নেটিব রাইটারদের ঔদ্ধত্যের বহর দেখে অবাক হ'য়ে গেছেন তিনি। গম্ভীর স্বরে ব'ললেন, একা তোমার জন্যে হয়তো আমি বিবেচনা ক'রে দেখতে পারি, আর কারো জন্যে নয়।

—আমি শুধু নিজের আর্জি নিয়ে আসিনি স্যার। যদি সবায়েরই জন্যে বিবেচনা ক'রতে রাজি হন—

তার কথা শেষ করবার সময় না দিয়েই রাগে, উত্তেজনায় টেবিলের ওপর সজোরে একটা ঘুষি মেরে বড়ো সাহেব চিৎকার ক'রে উঠলেন, অসম্ভব! তোমাদের এতবড়ো দুঃসাহস যে তোমরা শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে নিজেদের তুলনা ক'রতে আরম্ভ ক'রেচ? নেটিব মানেই চোর। ঘুষ খেয়ে তোমরা অনেক টাকা রোজগার করো, তা আমি জানি। তোমাদের মাইনে বাড়ানোর কোনো সঙ্গত কারণ নেই।

অপমানের উত্তেজনায় হরিশের মুখও লাল হয়ে উঠলো। নেটিব মানেই চোর! আর সে-কথা ব'লছেন এমন একজন ব্যক্তি, যাঁর স্বজাতের অজস্র মানুষ চুরি, জোচ্চুরি, উৎকোচ আর ইন্টারলোপিং-এর পথে লাখ লাখ, কোটি কোটি টাকা উপার্জন ক'রে চ'লেছে!

উত্তেজনা যথাসম্ভব প্রশমিত রেখে গম্ভীরস্বরে হরিশ ব'ললে, বেতন বৃদ্ধি করা না করা আপনার ইচ্ছে। কিন্তু কথাবার্তায় ন্যূনতম ভদ্রতাবোধটুকু নিশ্চয়ই আশা ক'রতে পারি।

—ইউ ব্লাডি নিগার, তুমি আমাকে ভদ্রতাবোধ শেখাতে এসেচ? আমি আগেও ব'লেচি, এখনো ব'লচি, নেটিব মানেই চোর!

হরিশ তখন থর্‌ থর্‌ ক'রে কাঁপছে। সে-ও প্রচণ্ড উত্তেজনায় ব'ললে, তাহ'লে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রবার্ট ক্লাইভ, টমাস পিট, ওয়াট্‌স, ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড, হলওয়েল, হেস্টিংস, ভ্যান্‌সিটার্ট, ক্যাম্পবেল, মেজর মারস্যাক্‌—যাঁরা অজস্র বেআইনি পথে উৎকোচের টাকায় এদেশ থেকে লাখোপতি, কোটিপতি হ'য়ে দেশে ফিরে গেছেন, তাঁরাও নিশ্চয়ই ইণ্ডিয়ান নেটিব?

ইউ ব্লাডি নিগার!—চিৎকারে ফেটে পড়লেন বড়ো সাহেব।—তোমার এত বড়ো ঔদ্ধত্য যে, কৃতি শ্বেতাঙ্গ পুরুষদের তুমি এইভাবে কলঙ্কিত ক'রচো?

শান্ত স্বরে হরিশ ব'ললে, মাফ ক'রবেন স্যার, কোনো কোনো সৎ, নিরপেক্ষ শ্বেতাঙ্গদের লেখা থেকেই এ'দের বিবরণ পেয়েচি।

—স্টপ দেয়ার!—নিরুপায় ক্রোধে টেবিলের ওপর আর একবার ঘুষি মারলেন বড়োসাহেব। শুনে রাখো বাবু, নেটিব গোলামদের মাইনে এক পাই-ও বাড়াবো না। মাইনে যা দিই, তাতেই তোমরা চাকরি ক'রতে বাধ্য! যাও—

—তাহ'লে আপনিও শুনে রাখুন, আমাদের জাতি সম্বন্ধে আপনার ওই অভদ্র ইতর মন্তব্যের প্রতিবাদে অন্ততঃ একজন ভারতীয় নেটিব এই মুহূর্ত থেকে আর টলা কোম্পানিতে গোলামি ক'রবে না।

হরিশ বেরিয়ে এলো।

তারপরের ব্যাপারটুকু খুবই সংক্ষিপ্ত। নিজের জায়গায় ফিরে এসে একখানি পদত্যাগপত্র লিখে সরকারবাবুর হাতে দিলে। তারপর আপিস থেকে বেরিয়ে এলো।

ভবিষ্যৎ?

ভগবান জানেন, তার ভবিতব্যে কী লেখা আছে।

॥ চার ॥

বড়ো বৌমার মুখে খবরটা শুনে স্তব্ধ হ'য়ে গেলেন রুক্মিণী।

হরিশ চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছে। অতবড়ো সওদাগরি আপিস; যেখানে মাথা কুটে কিনা একটা চাকরি পায় না লোকে, সেই আপিসে আট বছরের এমন-পাকা চাকরিটা কিনা নিজে ছেড়ে দিলে ছেলেটা। তবে কি সংসারে সত্যিই আর মন নেই হরিশের? বিবাগী হ'য়ে কোথাও চ'লে যাবে?

বুক কাঁপে রুক্মিণীর। না, সুখ তাঁর কপালে নেই। জন্মলগ্নে তাঁর কপালে চিরদুঃখই লিখে রেখেছেন বিধাতাপুরুষ। নইলে সবদিক থেকে এইভাবে একটার পর একটা আঘাত আসে? আগের বৌটা মরবার পর কত সাধ্যসাধনা ক'রে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তবে ছেলেকে আবার বিয়েতে রাজি করিয়েছিলেন তিনি। তখন কি বুঝতে পেরেছিলেন, এই দশা হবে? এ বৌ যেমন দজ্জাল, তেমনি অলুক্ষুণে। অমন ভর্‌-ভরন্ত ডাগর গড়ন, পুরুষমানুষের ছোঁয়া লাগলেই যার পোয়াতি হওয়ার কথা—দু'বছরের ভেতর তার পেটে একটাও এলো না? শেষ পর্যন্ত একটা অলুক্ষুণে বাঁজা মাগীকে ঘরে এনে তুললেন তিনি?

কপাল! সবই রুক্মিণীর পোড়া কপালের ফল। এখন যদি হরিশ বিবাগী হ'য়ে কোথাও চ'লে যায় তাহ'লে এই বুড়ো বয়সে কার কাছে গিয়ে দাঁড়াবেন তিনি? হারাণের ওইতো অবস্থা। এদিকে মা ষষ্ঠীর দয়ায় বড়োবৌ বছর বছর একটা ক'রে বিইয়ে চ'লেছে। আবার কি কয়েক বছর আগের মতো সেই দুর্যোগের ছায়া ঘনিয়ে আসছে?

বড়োবৌয়েরও মুখ শুকিয়ে গেছে। তার স্বামীর পাঁচ টাকা মাইনে সম্বল ক'রে কিভাবে এখন সে সংসার চালাবে? একটি নয়, দু'টি নয়—পাঁচটা ছেলে-মেয়ে কোলে এসেছে। তাদেরই বা খাওয়াবে কী? এবার কি তবে শাশুড়ির প্রথম বয়সের পালা তার কপালেও ঘনিয়ে আসতে চ'লেছে? হারাণের কাছে তাদের ছেলেবেলার গল্প সবই শুনেছে বড়োবৌ। দু'টি নাবালক ছেলেকে নিয়ে গরীব দাদাদের ঘাড়ের উপরেই ব'সে দিন কাটাতে হ'য়েছে। আর বড়োবৌয়ের নিজের তো এরই ভেতর পাঁচটি। বাপের বাড়ি গিয়ে প'ড়ে থাকবারও উপায় নেই। পেটের পাঁচটা শত্তুর সমেত কে তাকে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াবে?

একটা সন্দেহ উঁকি দিয়েছে বড়োবৌয়ের মনে।

এটা ছোটোবৌয়ের একটা কারসাজি নয়তো? ঠাকুরপোকে নিয়ে সে হয়তো আলাদা হ'য়ে যেতে চায়। সেইভাবেই ফুসলেছে সোয়ামিকে। তারই আগে এটা একটা চাল। ঠাকুরপোর যেখানেই হোক একটা চাকরি জুটে যাবে। কিন্তু তখন হাঁড়ি আলাদা। এ সংসারের দিকে আর ফিরেও তাকাবে না ঠাকুরপো।

আগের বার ঘরে এসেছিল লক্ষ্মী। তাই বোধহয় এ-সংসারে সে বেশিদিন রইলো না। সিঁথির সিঁদুর নিয়ে সতীলক্ষ্মীর মতোই সে স্বর্গে চ'লে গেল। আহা, কত পুণ্যির ফল থাকলে তবে ওইভাবে যাওয়া যায়! তার পায়ের ধুলো মাথায় নেবার জন্যে বাড়িতে সেদিন কত এয়োর ভীড় হ'য়েছিল! বড়োবৌ সিঁদুরে সিঁদুরে ভরে দিয়েছিল ছোটোবৌয়ের কপাল। সে তো জা ছিল না, ছিল সোদর বোনের মতো। তার জায়গায় এবার এসেছে এক অলক্ষ্মী ডাইনি।

ঠাকুরপো তার ভালোমানুষ। পর পর দু'টো শোকের আঘাত পেয়েও সংসারের দায়িত্ব সে ভোলেনি। নিজের ছেলে আর ভাইপো-ভাইঝিদের সে আলাদা করে কখনো দেখেনি। সেই মানুষ সত্যিই কি ভিন্ন হাঁড়ি হ'য়ে যাবে।

ভাবতে যত কষ্টই হোক, এ-দুনিয়ায় কী না হয়? ঘষতে ঘষতে পাথরও ক্ষয়ে যায়, আর এ তো মানুষের মন! দিনরাত কানভাঙানি দিলে একটা ভালো মানুষ-ও কতক্ষণ ভালো থাকে? নির্ঘাৎ কানভাঙানি দিয়েছে আঁটকুড়ি মাগী! নিজের কোলে তো কোনোদিনই একটাও আসবে না।

ঠাকুরপো যে ভাইপো-ভাইঝিদের নিয়ে একটু ভুলে থাকবে, বজ্জাত মাগীর তা সহ্য হবে কেন? এমনিই তো উঠতে ব'সতে কত খোঁটাই দেয়। এক এক সময় মনে হয়-যেন বেঁধে রেখে জলবিছুটি দিয়ে মারছে। সংসারটা যে আসলে তার ভাতারের রোজগারেই চ'লছে, সে-কথা কতবার বুঝিয়ে দিয়েছে। ঠারে-ঠোরে নয়, একেবারে সোজাসুজি। কত ছোটো মন মাগীর। আড়চোখে আবার নজর রাখে, বট্ঠাকুর আর ছেলেমেয়েদের জন্যে ভালোটা-মন্দটা কিছু সরিয়ে রাখে কিনা বড়োবৌ। হ্যাঁ, বড়োবৌ মাঝে মাঝে তা করে। কোন্ মেয়ে না চায় যে তার সোয়ামি-পুত্তুর একটু তৃপ্তি ক'রে দু'টো খাক? ওলো আঁটকুড়ি, পেটে তো একটাও ধরলি নে, মায়ের মন তুই কী বুঝবি লা?

আর আগের ছোটোবৌ?

সে তো কোনোদিন আড়চোখে তাকিয়ে অমন ডাইনি মাগীর মতো নজর করেনি! তার মনই সে-রকম ছিল না। সে বরঞ্চ এর উল্টোটাই ক'রতো।

এ-সংসারে খাওয়া ব'লতে তো সেই বুক্ড়ি চালের ভাত, কড়ায়ের ডাল, পোস্ত, শাকভাজা আর ডুমুরের তরকারি। তাও শেষের দু'টো কিনতে হয় না, বাড়ির পেছনের জঙ্গল থেকেই পাওয়া যায়। হারাণ মাঝে মাঝে ছিপ দিয়ে আদিগঙ্গা থেকে কোনোদিন একটা পাঙাশ, কোনোদিন বা দু'একটা আড়-ট্যাংরা কি গল্দা চিংড়ি ধ'রে আনতো। এখন তো তারও সময় হয় না। ছেলে দু'টো মাঝে মাঝে গামছা দিয়ে জল ছেঁকে কিছু কিছু চুনো মাছ ধ'রে আনে আজকাল।

কিন্তু তখন?

মাছ কিনে খাওয়ার তো কোনো প্রশ্নই ছিল না। হারাণের ছিপে দৈবাৎ যদি কোনোদিন একটা আধসের তিনপো মাছ ধরা পড়তো, তার মুড়োটা হরিশের জন্যেই রেখে দিত বড়োবৌ। যার ওপর নির্ভর ক'রে দু'টো ভাত জুটছে, তাকে একটু তোয়াজে রাখতেই হয়!

মোক্ষদা কিন্তু আপত্তি ক'রতো। সে ব'লতো, তোমার ঠাকুরপো যা গব্-গব্ ক'রে খায় দিদি! খাওয়া তো নয় গেলা। ব'সতে না বসতেই উঠে পড়ে। সেই মানুষকে অমন ভালো মুড়োটা দিয়ে নষ্ট ক'রবে কেন, বলোতো? খাবেতো ছাই, আদ্ধেক-ই ফেলে দেবে। তার চেয়ে মুড়োটা তুমি বট্ঠাকুরের পাতেই দিও। উনি র'য়ে ব'সে খান, একটু তারিয়ে তারিয়ে খেতে ভালোবাসেন; তাঁর পাতে পড়লে মুড়োটার তবু সদ্গতি হবে।

মনে মনে খুশি হ'ত বড়োবৌ। তবু একটু আপত্তি না ক'রলে ভালো দেখায় না। সেটুকু মিটে গেলেই মুড়োটা হারাণের জন্যে তুলে রেখে কপট বিরক্তিতে ব'লতো, আমি জানিনে বাপু, তোর যা খুশি কর! মুড়ো হ'লেই তোর বট্ঠাকুর খাবে, আর আমার ঠাকুরপো কি বানের জলে ভেসে এয়েচে?

অবশ্য প্রত্যেকবারেই মোক্ষদার কথা রাখেনি বড়োবৌ। প্রবল আপত্তি জানিয়ে হরিশের পাতেই দিয়েছে মুড়োটা। তা না করলেই বা চ'লবে কেন? ছোটো-ই বা মনে ভাববে কী? মুখে সে যা-ই বলুক, তারও তো ইচ্ছে করে, তার সোয়ামিও একটু ভালোটা-মন্দটা খাক?

কত বড়ো দরাজ মন ছিল ছোটোর! সংসারটাকে সত্যিই খালি করে দিয়ে গেছে! তার সেই খালি জায়গায় কি এই কুচুটে মাগীকে মানায়? সবই ওর ছল, সবই ওর ফন্দি।

ঠাকুরপো নিশ্চয়ই আর কোথাও চাকরি পেয়ে এই চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছে। চাকরি ছাড়ার নাম ক'রে এখন জমি তৈরি ক'রছে। তারপর একদিন নতুন চাকরিতে ঢুকে ফাঁক বুঝে হাঁড়ি আলাদা ক'রে স'রে পড়বে। নিজের সোয়ামির রোজগারে নিজের আলাদা সংসারে পায়ের ওপর পা তুলে ব'সে খাবে ওই হারামজাদি। সেই মতলবেই শুরু হ'য়েছে এইসব ফিকির!

নিজের আশঙ্কার কথা হারণকে ব'লেছিল বড়োবৌ। হারাণ সে-কথার কোনো গুরুত্বই দেয়নি। তামাক টানতে টানতে নির্বিকারভাবে ব'ললে, হরিশ আমার তেমন ভাই-ই নয়।

বড়োবৌ উষ্মার সঙ্গে ব'ললে, ছিল না তা মানচি। কিন্তু দেবতাদেরও যখন মতিভ্রম হয় তখন মানুষের হ'তে কতখন? ধরো যদি হাঁড়ি আলাদা-ই হ'য়ে যায়, তখন কী ক'রবে?

—কিছুই ক'রতে হবে না। আমার সংসারে হরিশ ঠিকই টাকা দিয়ে যাবে।

—তোমার নজ্জা কর'বে না?

—লজ্জা ক'রলে তো আজ এই ক'বছর ধ'রেই ক'রতো। তাছাড়া, নিজের সোদর ভেয়ের কাছে আবার লজ্জা কিসের?

বড়োবৌ আর ধৈর্য রাখতে পারলে না। তীব্র ঝাঁজের সঙ্গে ব'ললে, তোমার নজ্জা নেই, কিন্তু আমার যে নজ্জায় মাথা কাটা যাবে! ছোটোবৌয়ের ঠেস দিয়ে বলা কথাগুলো তো শুনতে হয় না! সেগুলো যে আমাকেই এসে বিঁধবে!

হারাণ ব'ললে, সংসারে সবাই কি সমান হয় বড়োবৌ? কী আর করা যাবে বলো?

এরপর হাল ছেড়ে দিয়েছে বড়োবৌ। তার বাবা বেছে বেছে এমন লোকের হাতেও তাকে তুলে দিয়েছিলেন বটে!

চাকরিতে ইস্তফা দেওয়ার মুহূর্তে ভবিষ্যৎ চিন্তা করবার অবকাশ হরিশের ছিল না। বড়ো সাহেবের সেই মন্তব্যে তার মাথার ভেতর আগুন জ্বলে উঠেছিল। কোন্ কারণে হরিশ ইস্তফা দিয়েছে, তার দিশি সহকর্মীরা পরে সবাই তা জানতে পেরেছে। জেনে তারা অবাক। এইরকম তুচ্ছ একটা কারণে কেউ চাকরি ছাড়ে? একমাত্র সরকারবাবু দু'একজনের কাছে ব'লেছেন, ও ছেলের ধাতই আলাদা জাতের হে! বাঙালির ঘরে জন্মো নেওয়াটাই ছোঁড়ার উচিত হয়নি।

হরিশ নিজে চাকরি ছেড়েছে শুনে ক্ষেপে গেছে ছোটোবৌ।

ক'দিন গুম্ হ'য়ে থাকার পর আর সে চুপ ক'রে থাকতে পারলে না। সরাসরি জিজ্ঞেস ক'রলে, কী এমন জমিদারির মালিক হ'য়েচ যে হুট ক'রে চাকরিটা ছেড়ে দিলে?

—সে তুমি বুঝবে না।

ছোটোবৌ আরো ঝাম্টা দিয়ে ব'ললে, নাঃ, দুনিয়ায় আর কেউ কিছু বোঝে না, দু'পাতা ইঞ্জিরি প'ড়ে তুমি একাই একেবারে সব কিছু বুঝে ফেলেচ! এরপর খাওয়াবে কী?

—দরকার হ'লে না খেয়ে থাকবে।

—কেন না খেয়ে থাকবো? খাওয়া-পরার সব দায়দায়িত্ব নিয়েই না বে' ক'রে এনেচ?

হরিশ এবার ব্যথাহতস্বরে ব'ললে, ছোটোবৌ, দু'টি ভাতের চেয়েও আত্মসম্মানের প্রশ্নটা অনেক সময় বড়ো হ'য়ে ওঠে। সেইরকম কিছু একটা হয়েচিল ব'লেই আমি চাকরি ছেড়েছি।

—ইস্, হদ্দ গরীবের আবার মান-সম্মান!

একটু ম্লান হাসি ফুটে উঠলো হরিশের মুখে। ছোটোবৌয়ের ভাষা রূঢ় হ'লেও কথাটা তো বাস্তব সত্যি! সেদিন ও-রকম একটা ব্যাপার না ঘ'টলে ওই বড়ো সাহেবের অধীনেই আজও সে নির্বিবাদে চাকরি ক'রে চ'লতো! টলা কোম্পানির বিল রাইটার হিসেবেই কেটে যেতে পারতো সারাজীবন।

ছোটোবৌয়ের ঝাঁজালো চোখের দিকে তাকিয়ে নরম স্বরে সে ব'ললে, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রে যাবো। যে-ক'দিন কিছু না হয়, সে-ক'দিন একটু ধৈর্য ধ'রে অপেক্ষা করো। তোমার আগে এ-সংসারে যে ছিল সে কিন্তু হাসিমুখে কষ্টই অনেক সহ্য ক'রেচে। তার তুলনায় তোমাকে কিন্তু এখনো তেমন কোনো কষ্ট ক'রতে হয়নি।

ছোটোবৌ হয়তো বা একটু নরম হ'ত, কিন্তু এই শেষের প্রসঙ্গেই তার চোখে-মুখে ফুটে উঠলো তীব্র জ্বলন্ত আক্রোশ। এই প্রসঙ্গটা সে কিছুতেই সহ্য ক'রতে পারে না। কথায় কথায় মরা সতীনের সঙ্গে তুলনা! সে মাগী কি স্বর্গের দেবী ছিল নাকি?

দাঁতে দাঁত চেপে ছোটোবৌ ব'ললে, খালি সে আর সে! সে মাগীকে যদি না-ই ভুলতে পারবে তো বেহ্মচারি হ'য়ে কাটালেই পারতে! আমাকে বে' ক'রে আনলে কেন? বিছানায় একটা মেয়েছেলের দরকার তাই বে' ক'রেচ, কেমন? নজ্জা করে না তোমার?

দুম্ দুম্ ক'রে পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ছোটোবৌ।

হরিশ চুপ ক'রে রইলো। সবই সে বুঝতে পারছে। বে'চেই থাক আর ম'রেই যাক, সতীনের নাম মেয়েরা সহ্য ক'রতে পারে না। সতীন সম্বন্ধে জাতক্রোধ মেয়েদের রক্তে মিশে আছে। ছোটো ছোটো মেয়েরা পর্যন্ত চলতি ছড়াটাকে কেমন সুর ক'রে আওড়ায়, অসৎ কেটে বসত করি, সতীন কেটে আলতা পরি। বিমাতাদের সম্বন্ধে তার মায়ের প্রতিক্রিয়াও কতবার সে দেখেছে। ছোটোবৌ যত সঙ্কীর্ণমনাই হোক, মেয়ে হিসেবে এই একটা জায়গায় তাকে দোষ দেওযা যায় কি?

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লে হরিশ।

বেশ একটু বিরক্তি আর উত্তেজনার জন্যেই অনেকদিন পরে ছোটোবৌয়ের কাছে মোক্ষদার কথা তুলেছে সে। পারতপক্ষে আজকাল এটা সে করে না। যে প্রথমা তার হৃদয় উজাড়-করা সম্পদ দিয়ে হরিশের মনকে পরিপূর্ণ আপ্লুত ক'রে রেখে অসময়ে তাকে ফেলে চ'লে গেল, তার স্মৃতিটুকু অনাহতভাবে মনের ভেতরেই থাকুক। এই নীচতার ভেতর তাকে টেনে এনে লাভ কী?

কয়েকটা দিন কেটে গেল।

তারপরেই হরিশের নজরে পড়লো একটা চাকরির বিজ্ঞাপন। মিলিটারি অডিটর জেনারেলের আপিসে অল্প কয়েকজন কপিস্ট কেরাণি নেওয়া হবে। মাসিক বেতন পঁচিশ টাকা। শ্বেতাঙ্গ, ইয়োরেশীয় কিম্বা নেটিব যে কেউ আবেদন ক'রতে পারেন। আবেদনকারীকে একটা পরীক্ষা দিতে হবে। পরীক্ষার বিষয় দুটি—ইংরিজি রচনা আর গণিত। পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতেই হবে যোগ্য প্রার্থীদের নির্বাচন।

হরিশ একখানা আবেদন পত্র জমা দিয়ে এলো। নির্দিষ্ট দিনে পরীক্ষাও দিয়ে এলো। পরীক্ষা দিতে গিয়ে দেখতে পেলে, প্রতিযোগীর সংখ্যা দুশোরও বেশি। তার ভেতর আবার শ্বেতাঙ্গ আর ট্যাঁশ ফিরিঙ্গিদের তুলনায় বাঙালির সংখ্যা নিতান্তই কম। সাকুল্যে দশজন কি বারোজন। ক'জন লোক নেওয়া হবে তাও বিজ্ঞাপনে বলা হয়নি। হয়তো দু'জন কি তিনজন। সুতরাং যেখানে শ্বেতাঙ্গ প্রার্থীর সংখ্যা এত বেশি, সেখানে চাকরি পাওয়ার আশা নেই ব'ললেই চলে।

কিন্তু মাসখানেকের ভেতরেই হরিশকে অবাক ক'রে দিয়ে চিঠি এলো মিলিটারি অডিটর জেনারেলের আপিস থেকে। নির্বাচিত প্রার্থীদের ভেতর হরিশ একজন। বাবু হরিশচন্দ্র মুখার্জি যেন অবিলম্বে কাজে যোগদান করেন।

বিস্ময়ের ঘোর কাটতেই কয়েক ঘন্টা লেগে গেল হরিশের। তার অদৃষ্ট যে এত তাড়াতাড়ি প্রসন্ন হবে তা যেন তখনো বিশ্বাস হয়ে উঠ্‌ছিল না!

খবরটা শুনে হেসে কে'দে আকুল হ'লেন রুক্মিণী। সত্যি সত্যি ভগবান আবার মুখ তুলে চাইলেন? কোথায় দশটাকা মাইনে আর কোথায় পঁচিশ টাকা! তার মানে, এক কুড়ি পাঁচ টাকা। বড়বৌ বুঝিয়ে দিলে আগের মাইনের চেয়ে এবার মাইনে নাকি আড়াইগুণ বেশি!

হারাণ বড়োবৌকে ব'ললে, দেখলে তো? আমি ব'লেছিলুম না, হরিশকে বেশিদিন ব'সে থাকতে হবে না?

বড়োবৌ ব'ললে, সে-কথা তুমি আবার কবে বললে গা?

গম্ভীরস্বরে হারাণ উত্তর দিলে, ব'লেছিলুম বৈ কি! তোমার মনে নেই।

এবারে হরিশের নতুন কর্মস্থল ট্যাঙ্ক স্কোয়ার অঞ্চলে।

ট্যাঙ্ক স্কোয়ারের পূব-দক্ষিণ কোণে মিলিটারি অডিটর জেনারেলের আপিস। দীঘির উত্তরপাড়ে পূব-পশ্চিমে প্রায় সবটুকু জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে কোম্পানির রাইটারদের বাসস্থান রাইটার্স বিল্ডিং। বিরাট তিনতলা বাড়ি। ওর ভেতরে যে কতগুলো কুঠুরি আছে তা বোধহয় যারা তৈরি ক'রেছে তারাও এখন হিসেব ক'রে ব'লতে পারবে না।

রাইটার্স বিল্ডিংসের ঠিক পুবেই দাঁড়িয়ে আছে সেন্ট অ্যানড্রুজ চার্চ। ওই গির্জা যখন

ছিল না, তখন নাকি ওখানে ছিল ওল্ড মেয়র্‌স্ কোর্ট। ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে সেই মেয়র কোর্টেই প্রথম আরম্ভ হ'য়েছিল সুপ্রীম কোর্ট। সেখানে ব'সেই হেস্টিংসের বন্ধু সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি স্যার এলিজা ইম্পে বিচারের নামে একটা প্রহসন ক'রে মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসির হুকুম দিয়ে বন্ধুকে নিশ্চিন্ত ক'রেছিলেন।

আজ কোথায় সেই সুপ্রীম কোর্ট!

লাট প্রাসাদের পশ্চিমে গথিক—নক্‌শায় তৈরি করা বাড়িটাকেই সবাই সুপ্রীম কোর্ট ব'লে জানে। মেয়র্‌স্ কোর্ট কবেই উঠে গেছে। তার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে আর্মানি ধাঁচের চূড়োওয়ালা সেন্ট অ্যান্‌ড্রুজ চার্চ। ক্রীশ্চানেরা সেখানে সমবেত হ'য়ে প্রভু যীশুর কাছে প্রার্থনা করে, তাঁর গুণগান করে!

নতুন আপিসে ঢোকার প্রথম দিনেই একটা রোমাঞ্চ-শিহরণ!

আপিসের বাড়িটা পশ্চিমমুখো। দোতলায় যেখানে হরিশকে ব'সতে দেওয়া হ'য়েছে তার কাছেই জানালা। সেই জানালার ভেতর দিয়েই গঙ্গার স্রোতকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে, কত পাল তোলা নৌকোর আনাগোনা। রোদের আলোয় ঝিক্‌মিক্ ক'রছে গঙ্গার জল।

ট্যাঙ্ক স্কোয়ারের পশ্চিমদিকটায় নাকি ছিল কোম্পানির পুরনো কেল্লা। নবাব সিরাজউদ্দৌল্লা যেবার ক'লকাতা আক্রমণ করেন সেবার নাকি বৈঠকখানা থেকে সোজাসুজি কামান দেগেছিলেন কেল্লায়।

ট্যাঙ্ক স্কোয়ারের দক্ষিণ ধার ঘেঁষে যে রাস্তাটা ব্যাঙ্কশালের ভেতর দিয়ে হেয়ার সাহেবের বাড়ির গা দিয়ে পশ্চিমে গঙ্গার পাড়ে গিয়ে মিশেছে, সে রাস্তা হরিশের কত পরিচিত! এই পথেরই শেষপ্রান্তে তার সঙ্গোপন স্বপ্নলোকের সেই বাস্তব রূপকথার রাজপুরী—মেটকাফ হল! হরিশের চেয়ারে ব'সেই মেটকাফ হলের অল্প একটা অংশ চোখে প'ড়ছে!!

ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি!

কতদিনের সযত্নলালিত আশা! কত চাপা দীর্ঘশ্বাসের বেদনা! চোরের মতো কত দিন ভীরু পায়ে মেটকাফ হলের প্রশস্ত সিঁড়ি দিয়ে উঠে ভীরু সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে থরে থরে সাজানো বইগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকা!

এখন থেকে সে বাধা আর থাকবে না।

প্রথম দিনই নতুন আপিসে ব'সে কাজ করতে ক'রতে ঘণ্টায় ঘন্টায়—হয়তো বা মিনিটে মিনিটেই হরিশের বুকের ভেতরটায় ঝিলিক মেরে উঠছিল। এখন থেকে সে পঁচিশ টাকা মাইনের কেরাণি। মাসে দু'টাকা চাঁদার জন্যে আর তাকে চিন্তা ক'রতে হবে না!

চাকরির প্রথম দিনে হরিশের অভিজ্ঞতা অবশ্য তেমন মধুর নয়।

হরিশকে বসবার জন্যে যে চেয়ারখানা দেওয়া হ'য়েছে, তার একটা পায়া ভাঙা। যে টেবিলটা দেওয়া হ'য়েছে তারও একটা পায়া নড়বড়ে। একটু চাপ প'ড়লেই টেবিল কাৎ হ'য়ে যায়, একটু অসাবধান হ'লেই চেয়ার সমেত একদিকে প'ড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি। এত বড়ো আপিসে এরকম তিনপেয়ে টেবিল-চেয়ার কেন তার [illegible] সে উদ্ধার ক'রতে পারলে না। কাউকে কিছু না ব'লে সেই টেবিল চেয়ারেই দু'তিন দিন কাজ চালিয়ে গেল হরিশ।

আপিসে বাঙালি কেরাণির সংখ্যা খুবই কম। ব্রিটিশ আর ট্যাঁশফিরিঙ্গিই বেশি। এবারে মোট পাঁচজনকে নেওয়া হ'য়েছে। তোর ভেতর চারজনই ব্রিটিশ—একমাত্র বাঙালি হরিশ নিজে।

কালীচরণ সোম বছর চারেক আগে চাকরিতে ঢুকেছে। হরিশের চেয়ে বয়সেও কিছু বড়ো। সদালাপী বৈঠকী মানুষ। কালীচরণ ছাড়া আর যে সাতজন মাত্র বাঙালি আছে তারা প্রত্যেকেই বয়সে অনেক বড়ো।

নবাগত বাঙালি সহকর্মীর সঙ্গে নিজেই আলাপ জমিয়ে নিলে কালীচরণ। ব'ললে, অ্যাদ্দিনে

কাছাকাছি বয়েসের একজনকে পেয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম! নতুন ঢুকলে, একটু বুঝে-সমঝে চ'লো ভায়া। এ-আপিসে বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়! অডিটর জেনারেল কর্নেল গোল্ডী আর ডেপুটি অডিটর জেনারেল কর্নেল চ্যাম্পনিজ দু'জনেই যথার্থ ভদ্দরলোক। কিন্তু রেজিস্ট্রার হলিংবেরি সাহেব সম্বন্ধে একটু সাবধান! আর সাবধান থেকো ট্যাঁশ-ফিরিঙ্গিদের সম্বন্ধে। মা পোড়ারমুখি নেটিব হ'য়ে যাওয়ার ফলে ওদের মনে যে কত কষ্ট, আহা! তবু দু'চারজন ব্রিটিশ রাইটার তোমার-আমার সঙ্গে হাসিমুখে দু'টো কথা ব'ললেও ব'লতে পারে কিন্তু ওই মক্কেলদের কাছে সেটা আশা ক'রো না! নেটিবদের ওপর ওদের বড়ো ঘেন্না। ওদের মায়েরা কেউ আয়া, কেউ জমাদারণী, কেউ ঝাড়ুদারণী, কেউ বাজার থেকে আমদানি করা সেবাদাসী—সবাইতো বিলেত থেকে স্পেশিয়াল জাহাজে এদেশে এয়েচিল? নেহাৎ চাঁদপাল ঘাটে নামার পর এদেশের হাওয়া লেগে গায়ের রঙটা কেলে হ'য়ে গেচে, এই যা!

কালীচরণের বলবার ভঙ্গিতে হেসে ফেললে হরিশ। ব'ললে, এর আগে টলা কোম্পানিতে আটবছর চাকরি ক'রেচি। কিছু অভিজ্ঞতা আমার আছে।

—তবে তো কথাই নেই। এখন যাই, পরে আরো আলাপ করা যাবে।

কথাটা ব'লেই হরিশের টেবিলের ওপর ভর্ দিয়ে কালীচরণ প্রস্থানোদ্যত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নড়বড়ে পায়াটা প'ড়ে গিয়ে টেবিল কাৎ হ'য়ে গেল। হরিশ তাড়াতাড়ি কাগজপত্রগুলো চেপে ধ'রে সামলে নিলে।

কালীচরণ অবাক হ'য়ে ব'ললে, একি গো! টেবিলটা যে ভাঙা দেখচি!

মুচ্‌কি হেসে চেয়ারের ভাঙা পায়াটাকেও সরিয়ে দিলে হরিশ। চেয়ার কাৎ হ'য়ে প'ড়লো।

ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইলো কালীচরণ—তুমি এই চেয়ার টেবিলে কাজ ক'রচো?

হরিশ ব'ললে, আপিসে ঢুকে পরশুদিন চতুষ্পদের বদলে এই ত্রিপদীই পেয়েচি যে!

—উঁহু, এ টেবিল চেয়ার তো এখানে ছিল না ভাই! কিছু একটা গোলমাল হ'য়েচে! দাঁড়াও, ব্যাপারটা খোঁজ নিতে হচ্চে!

কালীচরণের কাছে পরের দিনই রহস্যটা জানতে পারলে হরিশ।

ব্যাপারটা স্রেফ একটা কারসাজি। নবাগত নেটিব কেরাণিকে জ্বালাতন করবার জন্যে কয়েকজন ফিরিঙ্গি কেরাণি কাজটা ক'রেছে।

হরিশ কাজে যোগ দেওয়ার আগের দিন পর্যন্ত ওখানে ভালো টেবিল-চেয়ারই ছিল। আগের দিন ছুটির পর সেই ক'জন করিৎকর্মা ফিরিঙ্গি সেই টেবিল চেয়ার অন্য জায়গায় সরিয়ে দিয়ে ওই তিনপায়া টেবিল চেয়ার এনে বসিয়ে রেখেছে।

এই রসিকতার কারণ?

রসিকতা নয়—ঈর্ষার জ্বালা।

পাঁচজন নতুন রাইটার নেওয়া হ'ল, তার ভেতর একজনও ইয়োরেশিয়ান নেই? চারজন ব্রিটিশ ছাড়া পঞ্চম জন যাকে চাকরি দেওয়া হ'ল সে কিনা একটা নেটিব? শুধু তাই নয়, ইংরিজি রচনায় ওই নেটিবটাই নাকি সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছে! আবগারি কমিশনার মিস্টার ম্যাকেঞ্জির ইংরিজি সাহিত্যে পাণ্ডিত্যের সুনাম আছে। তিনি ছিলেন ইংরিজি উত্তরপত্রের পরীক্ষক আর মিস্টার কেলনার ছিলেন গণিতের পরীক্ষক। দু'জনেই হরিশের খাতা দেখে উচ্ছ্বসিত। দু'জনেই ব্রিটিশ অথচ এতগুলো ব্রিটিশ যুবককে ডিঙিয়ে একটা রোগা লিকলিকে নেটিব কিনা তাঁদের হাতে সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়ে গেল? ব্রিটিশ যুবকেরা ইংরিজি লিখতে জানে না, ইয়োরেশিয়ানরা জানে না—জানে শুধু একটা নেটিব যুবক? তাও যদি বা হ'ল, তার ওপরেও ঘোরতর অন্যায় ক'রেছেন মিস্টার ম্যাকেঞ্জি। ওই নেটিব শয়তানটার ইংরিজি লেখা দেখে তিনি নাকি এত বেশি মুগ্ধ হ'য়েছেন যে লোকটাকে নিয়োগের জন্যে নিজে যেচে সুপারিশ পর্যন্ত ক'রেছেন। একজন শ্বেতাঙ্গের পক্ষে এর চেয়ে বড়ো অন্যায় আর কী হ'তে পারে? এর পরেও শাদা চামড়ার ফিরিঙ্গিরা

মুখ বুজে তা সহ্য ক'রবে? কিন্তু সরাসরি কিছু করবার তো উপায় নেই। তাই বাধ্য হয়েই নেটিবটাকে একটু জব্দ করবার জন্যে এই পথটাই তারা বেছে নিয়েছে। তেপায়া টেবিলে কাগজ রেখে কাজ ক'রতে গিয়ে মজাটা বুঝুক! তেপায়া চেয়ারে ব'সে কেমন আরাম লাগে, সেটাও একটু বুঝুক!

সব শুনে খানিকটা হেসে হরিশ ব'ললে, ভালোই ক'রেচে! তবে জব্দ ক'রতে পারলে না, এইটেই যা দুঃখের ব্যাপার!

সেদিন বাড়ি ফেরার পথে একটা উদ্বেল আনন্দে হরিশ এত অন্যমনস্ক ছিল যে বার দু'য়েক গাড়ি চাপা পড়তে গিয়ে বে'চে গেল। একবার তো ফিটন গাড়ির কোচোয়ান প্রাণপণে ঘোড়ার রাশ টেনে না ধ'রলে ঘোড়ার খুরের নীচেই হয়তো সে চাপা প'ড়ে যেতো!

কতদিন পরে তার মনের সেই সংগোপন ক্ষতের জ্বালা জুড়িয়েছে! চাকরি পাওয়ার আনন্দের চেয়েও এই সাফল্যের আনন্দ যেন অনেক বেশি মনে হচ্ছিল তার।

প্রতিযোগিতার পরীক্ষায় সে প্রথম হয়েছে! তার লেখা রচনা পেয়েছে শ্রেষ্ঠ রচনার স্বীকৃতি!

কিন্তু হিন্দু কলেজের সেই সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা?

পুঁথিগত যে বিদ্যেটুকু সম্বল ক'রে এতদিন পরে এই পরীক্ষা সে দিয়েছে সেদিনও সম্বল ব'লতে সেইটুকুই ছিল। বরঞ্চ তখন তা ছিল আরো তর্‌তাজা, আরো টাটকা। যতদূর মনে পড়ে, পরীক্ষা দিয়ে সেদিন বোধহয় আরো সন্তুষ্ট হ'য়েছিল। কিন্তু হিন্দুকালেজের পরীক্ষক সেদিন তার কপালে এ'কে দিয়েছিলেন অযোগ্যতার তিলক! আর এতদিন পরে মিস্টার ম্যাকেঞ্জি নামে অজানা অচেনা ভদ্রলোক হরিশের সেই বেদনার ক্ষত নিরাময় ক'রে দিলেন!

আত্মপ্রত্যয় আবার ফিরে পাচ্ছে হরিশ।

ইউনিয়ন স্কুল ছাড়ার পর এই আট-ন'বছরের দিনগুলো শুধু অন্নচিন্তাতেই তাকে ব্যস্ত ক'রে রেখেছিল। আট বছর ধ'রে ঘাড় গুজে টলা কোম্পানির বিল লিখেই সময় কেটেছে। শুধু নাম, ঠিকানা আর টাকা আনা পাইয়ের হিসেব! তার ভেতর কোথায় চসার, কোথায় মিলটন আর কোথায় শেক্‌সপীয়র!

চার-পাঁচদিন পরের কথা।

হরিশ একমনে কাজ ক'রছে, এমন সময় একজন ফিরিঙ্গি কেরাণি কাছে এসে দাঁড়ালে। তার ঠোঁটের কোণে শাণিত হাসি।

—গুড আফটারনুন বাবু! এ আপিস কেমন লাগচে?

হরিশ মুহূর্তের ভেতরেই বুঝে নিয়েছে ব্যাপারটা। ব'ললে, খুব ভালো লাগচে। এত ভালো আমি আশা-ই করিনি।

ফিরিঙ্গি কেরাণি যেন একটু হতাশ হ'ল। তারপর যেন হঠাৎ নজর পড়েছে এইরকম ভান ক'রে ব'ললে, মাই গড্! তুমি সবে নতুন এসে আপিসে ঢুকলে আর তোমাকে কিনা এইরকম ভাঙা টেবিল-চেয়ার দেওয়া হ'য়েচে? এ-ভাবে কাজ ক'রতে তোমার কোনো অসুবিধে হচ্চে না বাবু?

—কই, না তো! আমি তো বেশ আরামেই কাজ ক'রচি।

ব্যাপারটা কিছুতেই তেমন লাগসই হচ্ছে না দেখে মুচ্‌কি হেসে ফিরিঙ্গি কেরাণি এবার ব'ললে, তোমাদের পক্ষেই সম্ভব। আমরা হ'লে কিন্তু এ-রকম ভাঙা টেবিল-চেয়ারে কিছুতেই কাজ ক'রতে রাজি হতুম না।

হরিশের মুখেও এবার ফুটে উঠলো একটু শাণিত হাসি। ব'ললে, তোমরা হ'লে খাঁটি য়ুরোপীয়ান সাহেব, ইংল্যান্ডে তোমাদের হোম। আর আমি নিতান্তই নির্ভেজাল একজন বাঙালি নেটিব। কার সঙ্গে কার তুলনা? আমরা কালা আদমি বাঙালিরা দু'হাঁটুর ওপর কাগজ রেখে লিখতে পারি সাহেব, তার তুলনায় এই তিনপেয়ে টেবিল তো অনেক ভালো!

ফিরিঙ্গি কেরাণির মুখ ততক্ষণে লাল হ'য়ে উঠেছে। হরিশের বিদ্রূপ বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছে সে। সে যে খাঁটি য়ুরোপীয়ান নয়, সে-কথা নিশ্চয়ই কানে গেছে এই শয়তান কালা আদমিটার। তার বাবা একজন ব্রিটিশ রাইটার, মা এদেশি জমাদারনী। তাই বোধ হয় ব্লাডি ইণ্ডিয়ান নিগারটা ইচ্ছে ক'রেই ওইভাবে 'খাঁটি য়ুরোপীয়ান' আর 'হোম' কথাটার ওপর জোর দিয়ে তাকে বিদ্রূপ ক'রলে।

গম্ভীরভাবে ফিরিঙ্গি কেরাণি ব'ললেন, নেটিবরা তো অনেক কিছুই পারে। তোমরা নেংটি প'রেও কাটাতে পারো, আমরা তা পারিনে। সে যাই হোক, তোমার কথাবার্তার রীতি খুবই আপত্তিকর। অবশ্য একজন নেটিবের কাছে ভদ্রতবোধ আশা করাই আমার অন্যায়।

হরিশ কিছুমাত্র উত্তেজিত হ'ল না। হাসতে হাসতেই ব'ললে, কিছু মনে ক'রো না সাহেব! আসলে আমি আমার নির্ভেজাল শ্বেতাঙ্গ বন্ধুদের উপহার দেওয়া এই পায়া-ভাঙা চেয়ারে ব'সে কথা ব'লচি ব'লেই হয়তো আমার কথাগুলো একটু নড়বড়ে হ'য়ে যাচ্ছে। শুনেছি, কর্নেল চ্যাম্প্‌নিজকে জানালে তিনি নিশ্চয়ই এমন সুন্দর উপহার দুটো সরিয়ে ভালো চেয়ার-টেবিলের বন্দোবস্ত ক'রতেন। কিন্তু আমার এমন মায়া প'ড়ে গেচে যে—

তার শেষের কথাটুকু আর শুনলে না ফিরিঙ্গি কেরাণি। কোনো কথা না ব'লেই আপনমনে গর্‌গর্‌ ক'রতে ক'রতে সোজা নিজের জায়গায় ফিরে গেল।

তারপর থেকে তাদের কেউ আর হরিশকে ঘাঁটাতে আসেনি।

দু'তিন দিন পরেই ভাঙা টেবিল চেয়ার-ও পালটে গেল। হরিশ নিজে কোনো অভিযোগ করেনি। কিন্তু যেমন ক'রেই হোক, ব্যাপারটা কর্নেল চ্যাম্প্‌নিজের কানে পোঁছেছে।

কয়েকদিন বাদে কর্নেল চ্যাম্পনিজের ঘরে ডাক পড়লো হরিশের।

হাসিমুখে অভ্যর্থনা ক'রলেন চ্যাম্প্‌নিজ। আন্তরিকভাবে করমর্দন ক'রে ব'ললেন, তোমাকে বিব্রত করবার জন্যে কয়েকজন রাইটার একটু চেষ্টা ক'রেচিল, সে-কথা আমার কানে এসেচে, বাবু। আশা করি, এরপর আর ও-রকম কিছু হবে না।

প্রশান্তদর্শন মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক। হরিশকে তিনি ব'সতেও ব'ললেন, যেটা শ্বেতাঙ্গদের রীতিবিরুদ্ধ। অল্প কয়েকমিনিটের ভেতরেই হরিশের সঙ্গে আলাপ ক'রে তিনি বেশ একটা অন্তরঙ্গ পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে ফেললেন। তারপর ব'ললেন, চাকরির পরীক্ষার জন্যে তুমি যে রচনা লিখেছিলে, সেটা আমি প'ড়েচি। যিনি তোমার খাতা পরীক্ষা ক'রেছিলেন, তিনিই আমাকে পড়বার জন্যে পাঠিয়েছেন। রচনাটা প'ড়ে আমার মনে হ'ল, শুধু চাকরি ক'রলে হবে না, পড়াশোনার চর্চা তোমাকে রাখতে হবে! তোমার ভেতর যে ক্ষমতা আছে সেটা নষ্ট করা সঙ্গত হবে না।

বিহ্বল আবেগে হরিশ তখন রুদ্ধবাক্‌।

কর্নেল চ্যাম্প্‌নিজ আবার ব'ললেন তোমার নিজের আগ্রহ আছে কি?

কী উত্তর দেবে হরিশ? কেমন ক'রে সে বোঝাবে যে তার আগ্রহের আকুলতা খাঁচায় বন্ধ একটা পাখির মতো সেই কবে থেকে ডানা ছট্‌ফটিয়ে ম'রছে!

ধরা গলায় কোনোমতে হরিশ ব'ললে, আপনার উপদেশের জন্যে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ, স্যার! আমার ইচ্ছে ছিল কিন্তু উপায় ছিল না!

কিছুটা যেন আত্মগতভাবেই কর্নেল চ্যাম্প্‌নিজ ব'ললেন, দারিদ্র্যের চাপে মানুষের কত কৈশোর-স্বপ্ন ব্যর্থ হ'য়ে যায়!

কয়েকমুহূর্ত নীরবতার পর তিনি আবার ব'ললেন, তোমার তরুণ বয়স। উদ্যমের অভাব যদি না থাকে তাহ'লে নতুন ক'রে আরম্ভ করো, বাবু! চাকরি ক'রে কালেজে পড়া সম্ভব নয়। কিন্তু ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরিতে অনায়াসেই তুমি পড়াশোনা ক'রতে পারো। মিস্টার

ম্যাকেঞ্জি সেখানে খুবই পরিচিত। তাঁকে অনুরোধ ক'রলে তিনি সানন্দে তোমার জন্যে একখানা পরিচয়পত্র লিখে দেবেন। সেখানে সদস্য হ'তে তোমার কোনো অসুবিধে হবে না। তুমি রাজি তো?

হরিশের চোখে তখন জল এসে গেছে। অতিকষ্টে আবেগের ঢেউকে বুকের ভেতর চেপে রেখে শুধু ব'লল, আমার অনেক দিনের স্বপ্ন!

—এবার সে স্বপ্ন সফল হ'তে কোনো বাধা থাকবে না। তুমি এগিয়ে যাও—

॥ পাঁচ ॥

বহুদিন অনাহারে থাকার পর সামনে হঠাৎ অঢেল খাবার পেলে বুভুক্ষুর যে অবস্থা হয়, হরিশেরও যেন সেইরকম হ'ল।

এত বই! এত পত্র-পত্রিকা!

সাহিত্য—শিল্প—দর্শন—ইতিহাস—আইন—রাজনীতি—সমাজবিজ্ঞান—ধর্মতত্ত্ব! কিন্তু কোনটা ছেড়ে সে কোন্‌টা আগে পড়বে? কোনোটাই তো সে বাদ দিতে পারবে না। সবই যে তাকে পড়তে হবে—জানতে হবে! জ্ঞানের সীমাবদ্ধ পরিধিকে ক'রতে হবে বিস্তৃত—প্রসারিত!

আরো—আরো—আরো—

মেটকাফ হলের সুবিস্তৃত পাঠকক্ষে ব'সে কত প্রশ্ন জাগে হরিশের মনে। কেবল বই পড়া-ই তো নয়, জ্ঞানের বিষয়বস্তুকে যুক্তি দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে যাচাই ক'রে নিতে হবে। সে শুনেছে, হিন্দু কালেজের ডিরোজিও সাহেবের হাতে গড়া ইয়ং বেঙ্গলেরা এদেশের সব কিছুকে নস্যাৎ ক'রে দিয়েছেন। তাঁদের কাছে য়ুরোপের সব কিছুই ভালো। কিন্তু তা কি ঠিক?

হরিশের নিজের জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ। কতটুকুই বা জানার সুযোগ পেয়েছে সে? য়ুরোপের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ইউনিয়ন স্কুলেই সে প'ড়েছে। গ্রীস আর রোমকে বাদ দিলে বাকি য়ুরোপ সভ্য হ'য়েছে ক'দিন? তার তুলনায় এদেশের সভ্যতা কত প্রাচীন। কিন্তু কোন্ গুণে সেদিনকার সভ্য-হওয়া পশ্চিম আজ এতখানি এগিয়ে গেল, আর কোন্ দোষে এত প্রাচীন সভ্যতার দেশ ভারতবর্ষ গেল এত পিছিয়ে? হ্যাঁ, অন্ধ কুসংস্কার, সঙ্কীর্ণ গোঁড়ামি—সবই এদেশে আছে, তা ঠিক। কিন্তু য়ুরোপ-ও কি সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত? একই খ্রীশ্চান ধর্মকে মেনেও রোমান ক্যাথলিক আর প্রোটেস্ট্যান্টরা পরস্পরের রক্তে ভিজিয়ে দেয়নি সারা য়ুরোপের মাটি? ডাইনি সন্দেহে পুড়িয়ে মারেনি অসহায় নিরপরাধ বৃদ্ধা কিম্বা যুবতীকে? চার্চের সঙ্গে মতে মেলেনি ব'লে দ্রষ্টা বিজ্ঞানীদের প্রাণদণ্ড দেয়নি সভ্য য়ুরোপ? নিজের দেশের মানুষকেই কুকুর-বেড়ালের মতো গণ্য করেনি য়ুরোপের রাজতন্ত্র? নইলে কেন হ'ল ফরাসি বিপ্লব? মানুষের প্রতি মানুষের মতো ব্যবহার-ই যদি ক'রবে তাহ'লে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে কেন একদিন বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রেছিল আমেরিকা? কেন এখনো আমেরিকায়, ওয়েস্ট ইন্ডিজে নিগ্রো ক্রীতদাসের সঙ্গে জানোয়ারের চেয়েও খারাপ ব্যবহার করা হয়?

কত প্রশ্ন, কত জিজ্ঞাসা!

য়ুরোপের সবই ভালো আর এদেশের সবই খারাপ?

মন থেকে কেমন যেন সায় পায় না হরিশ। কিন্তু একটা কথা সে বেশ গভীরভাবেই অনুভব করে। এদেশের মানুষ নিজেকে প্রসারিত ক'রতে ভুলে গেছে। নিজের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভেতর থাকতে থাকতে সে খাঁচার পাখির মতো হ'য়ে গেছে। ডানার শক্তি গেছে হারিয়ে। খোলা আকাশে উড়তে দিলেও উড়তে সে চায় না।

ছেলেবেলা থেকেই কৌলিন্য প্রথার ওপর হরিশের জাতক্রোধ। তার জীবনের সবচেয়ে বড়ো দুর্ভাগ্য, জন্মদাতা পিতাকে সে শ্রদ্ধা ক'রতে পারেনি। হয়তো অবুঝ দুঃখিনী মায়ের কথা ভাবতে ভাবতেই সেই অশ্রদ্ধার সূত্রপাত হ'য়েছিল। বয়স হওয়ার পর মনে মনে তা আরো দানা বেঁধেছে।

সতীদাহ-প্রথা যখন আইন ক'রে রদ করা হ'ল, তখন তার কতই বা বয়স? পাঁচ কি ছ'বছর। কিন্তু মনে আছে, সে খুব খুশি হ'য়েছিল।

হিন্দু সমাজে এখনো কত লজ্জাকর প্রথা আছে—আছে কত সঙ্কীর্ণতা। যদি কোনোদিন সম্ভব হয় তবে এই সব প্রথার বিরুদ্ধে সে লিখবে। অন্তত কৌলিন্য প্রথার বিরুদ্ধে তো লিখবেই! আর লিখবে ভণ্ডামির বিরুদ্ধে। চুরি, জোচ্চুরি, জালিয়াতি, প্রতারণায় হাত পাকিয়ে তারপরে ঘটা ক'রে মন্দিরে পুজো দিলেই সাতখুন মাফ? ছলে, বলে, কৌশলে পরকে পথের ভিখিরি বানিয়ে সপ্তাহে একদিন গির্জায় গিয়ে যীশুর ভজনা ক'রলেই অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণ?

কত প্রশ্ন, কত সংশয় হরিশের মনে। তাকে সব কিছু জানতে হবে, বুঝতে হবে, উপলব্ধি ক'রতে হবে!

নতুন আর দু'তিনজন চাকরিতে ঢুকেছে। তাদের ভেতর বয়সে সবচেয়ে কম গিরীশ। এই সবে উনিশ পেরিয়ে কুড়িতে পা দিয়েছে।

কালীচরণের মুখে গিরীশের কথা শুনে অবাক বিস্ময়ে তাকে দেখতে শুরু ক'রেছে হরিশ। তার সম্বন্ধে হরিশের মনে এমন একটা শ্রদ্ধা সম্ভ্রম জাগলো যে সাহস ক'রে গিরীশের সঙ্গে সে আলাপও ক'রতে পারেনি। ওই গোলগাল, নাদুস-নুদুস চেহারার ছেলেটা একজন লেখক। কয়েকটা পত্র-পত্রিকায় এরই ভেতর নাকি তার কয়েকটা লেখা ছাপা হ'য়ে গেছে এবং পাঠকের কাছে সে সুনাম অর্জন ক'রেছে! ক্যালকাটা রিভিউ, হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার, লিটেরারি ক্রনিক্‌লের মতো নামকরা পত্রিকাগুলো সাগ্রহে তার লেখা ছেপেছে!

প্রথমে বেশ কয়েকদিন গিরীশের সঙ্গে সসম্ভ্রম দূরত্ব বজায় রেখে চ'লেছে হরিশ। তারপর কালীচরণ একদিন গিরীশের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে হরিশকে। আলাপের পরেই হরিশ বুঝতে পারলে, এই বয়সে লেখক খ্যাতি পেলেও গিরীশ একেবারে নিরহঙ্কার। শুধু তাই নয়, বৈঠকী আলাপ জমাতে ওস্তাদ। অল্পদিনের মধ্যেই সম্পর্ক হ'য়ে গেল ঘনিষ্ঠ।

কালীচরণ একদিন হেসে ব'ললে, আমে দুধে মিশে গেল, এখন আঁটি প'ড়ে গড়াগড়ি খাক! একজন উত্তুরে একজন দ'খনো। তোমাদের ভেতর এরই ভেতর যে এত পীরিত জ'মে উঠ্‌বে, তা তো আগে বুঝতে পারিনি বাপু!

গিরীশ উত্তর ক'লকাতার সিমলে অঞ্চলের ঘোষবাড়ির ছেলে। আর হরিশ ভবানীপুরের।

গিরীশও হেসে উত্তর দিলে, দাদা, আমি হলুম কড়াপাক মহল্লার ছেলে। কড়াপাকের কদর যারা জানে তারা ঠিকই আমাকে বেছে নেবে! মনে হচ্চে, হরিশবাবু কড়া পাক পছন্দ করেন।

হরিশ হাসতে লাগলো।

হরিশবাবু থেকে হরিশ সম্বোধনে নেমে আসতেও বেশিদিন লাগেনি গিরীশের। বয়সের তফাৎ তো মোটে পাঁচবছর! তার জন্যে বৈঠকী মেজাজটাকে সব সময় আড়ষ্ট ক'রে রাখতে হবে? ও-সব 'বাবু-টাবু' নয়—সরাসরি 'তুমি'ই ভালো। হরিশও সেটা মেনে নিয়েছে।

দিনের পর দিন যায়, মাসের পর মাস।

ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরিতে হরিশ একদিনও অনুপস্থিত থাকেনি। প্রৌঢ় যে কর্মচারী বই লেন-দেন করেন, তিনিও এই নতুন যুবকসদস্যটির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঠতে পারছেন না। পাঁচমাসের ভেতর প'চাত্তর খণ্ড এডিনবরা রিভিউ পড়া হ'য়ে গেল! অন্যের মুখে শুনলে এ-কথা তিনি বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু তিনি যে নিজের হাতেই বই দিয়েছেন। লাইব্রেরির মেম্বরদের ঘাঁটতে ঘাঁটতে তাঁরও তো কম অভিজ্ঞতা হয়নি? নামী পণ্ডিত ব্যক্তি যাঁরা আসেন, তাঁদের কথা আলাদা। কিন্তু সাধারণ মেম্বরদের ভেতর এ-রকম আর একজন-ও এ-পর্যন্ত তাঁর নজরে পড়েনি।

সেই কবে টলা কোম্পানির ব্রজ মিত্তির মদ ধরিয়েছিল হরিশকে। ধেনো মদের উৎকট গন্ধ

নিয়ে কতদিন বচসা হ'য়েছে নতুন ছোটোবৌয়ের সঙ্গে! সেই মদের নেশাও ভুলে গেছে হরিশ। তার আসল নেশার মদ সে এতদিনে পেয়েছে!

ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি এখন হরিশের তীর্থক্ষেত্র।

শুধু কি জ্ঞানভাণ্ডার? কত জ্ঞানীগুণীদের সমাবেশ হয় এখানে। জ্ঞানগর্ভ আলোচনার আসর বসে লাইব্রেরিয়ান প্যারীচাঁদ মিত্তিরের খাস কামরায়। যাঁরা আসেন তাঁদের বেশির ভাগই ডিরোজিও সাহেবের ছাত্র—বিদ্রোহী ইয়ং বেঙ্গল। তাঁদের ভেতর রামগোপাল ঘোষ, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন, হরচন্দ্র ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখুজ্যে, রাধানাথ শিকদার, শিবচন্দ্র দেব—সবাইকে একে একে চিনে নিয়েছে হরিশ। আরো কত জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি আসেন, তাঁদের সবাইকে এখনো সে চিনে উঠতে পারেনি।

কি প্রচণ্ড আগ্রহ যে জাগে হরিশের মনে! আলোচনার আসরে যাঁরা আসেন তাঁরা কী চিন্তা করেন, কী বলেন, কী ক'রতে চান—তার সামান্য কিছুও যদি সে শুনতে পেতো!

তারপর একসময়ে আগ্রহের রাশ টেনে ধ'রে আপনমনেই হাসে হরিশ। কি অসম্ভবের কল্পনা তার! যাঁদের কথা সে ভাবছে, তাঁরা প্রত্যেকেই সম্ভ্রান্ত ধনী আর দেশবিখ্যাত মানুষ। 'জন বুল'-এর মতো গোঁড়া শ্বেতাঙ্গদের পত্রিকা রামগোপাল ঘোষকে 'ডিমস্থিনিস অব্ ইণ্ডিয়া' খেতাব দিতে বাধ্য হ'য়েছে। শুধু রামগোপাল কেন, এ'দের প্রায় সবাইকেই তারা সমীহ ক'রে চ'লতে শুরু ক'রেছে। তাঁদের মতো বিরাট ব্যক্তিদের আলোচনা-সভায় হরিশের মতো সামান্য একজন গরীব কেরাণীর উপস্থিতি? কল্পনাবিলাসেরও একটা সীমা থাকা উচিত!

আপনমনে একটু ম্লান হাসি হেসেই আবার বইয়ের পাতায় ডুবে যায় হরিশ। তারপর খেয়ালও থাকে না কখন থেকে সে প'ড়ছে।

গিরীশ একদিন ব'ললে, এইবার তুমি কিছু লেখা আরম্ভ করো হরিশ!

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতর যেন একটা ঝিলিক খেলে গেল হরিশের। তার মনের ভীরু সঙ্গোপন আকাঙ্ক্ষার কথা গিরীশ কি বুঝতে পেরেছে? নিজের আকস্মিক অনুভূতিকে সামলে নিয়ে মৃদুস্বরে সে ব'ললে, আমি তো কখনো লিখিনি গিরীশ!

গিরীশ ব'ললে, আমিও কি পত্র পত্রিকায় লেখার আগে কখনো লিখেচি নাকি? যে-লেখাটা প্রথম ছাপা হ'ল সেইটেই আমার জীবনে প্রথম ছাপা লেখা।

কথাটা ব'লেই সে জোরে হেসে উঠলে। তারপর ব'ললে, হিন্দু ইন্টেলিজেন্সারে বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ নতুন নতুন ভালো লেখক খুঁজছেন। তুমি লিখতে আরম্ভ করো। আমার বিশ্বাস, তোমার লেখা তাঁর পছন্দ হবেই!

—আমার সম্বন্ধে এ বিশ্বাস তোমার কেমন ক'রে হ'ল?

—আরে বাবা, সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে।

—কিন্তু কী নিয়ে লিখবো?

—বিষয়বস্তুর অভাব আছে নাকি? আমাদের সামাজিক সমস্যার অন্ত নেই। তারই একটা নিয়ে প্রথমে শুরু ক'রে দাও। তারপর লিখতে লিখতেই কোনো এক সময় নিজের পছন্দ মতো পথটা পেয়ে যাবে।

দিনকয়েক পরের কথা।

গিরীশের হাতে একটা প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি দিলে হরিশ। সসঙ্কোচে ব'ললে, কেমন হ'য়েচে জানিনে। তুমি নিজে একবার প'ড়ে তারপর যদি মনে করো দেবার উপযুক্ত হ'য়েচে তবেই কাশীপ্রসাদবাবুর হাতে দিও।

তিন সপ্তাহ পরে একখানি হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার পত্রিকা এনে হরিশের হাতে দিয়ে গিরীশ ব'ললে, আজই কাগজ বাজারে বেরিয়েচে। আমি কালকে সন্ধ্যের পর গিয়ে তোমার কাপিখানা এনে রেখেচিলুম। সম্পাদকের কেমন লেগেচে, তা জিজ্ঞেস ক'রো না। শুধু এইটুকু ব'লতে

পারি যে, এই নতুন লেখক হরিশচন্দ্র মুখার্জির কাছে তিনি আরো লেখা চেয়েছেন এবং আলাপ ক'রতে সবিশেষ ইচ্ছুক। এই নাও তাঁর ব্যক্তিগত চিঠি—

চাপকানের পকেট থেকে একখানি চিঠি বের ক'রে হরিশের হাতে দিলে গিরীশ। চিঠিখানা নেওয়ার সময় হাত কাঁপতে লাগলো হরিশের। তাহ'লে সে নিতান্ত অযোগ্য নয়?

সেই হ'ল যাত্রারম্ভ।

একটা নতুন উদ্দীপনায় মেতে উঠলে হরিশ। হ্যাঁ, এবার থেকে সে নিয়মিত লিখবে। ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, রাজনীতি, শাসনতান্ত্রিক অবিচার—সব কিছু সম্বন্ধেই তো বলবার কত কথা আছে! নিজের বিবেক, বুদ্ধি আর বিচারশক্তি দিয়ে যা সে যথার্থ ব'লে মনে ক'রবে, তাই লিখবে।

একটার পর একটা পত্রিকায় নবীন লেখকের লেখা বেরোতে আরম্ভ হ'ল। প্রত্যেকটি পত্রিকা থেকেই আরো লেখা চেয়ে সম্পাদকের অনুরোধ আসছে!

আবার একদিন কর্নেল চ্যাম্প্‌নিজের কামরায় ডাক প'ড়লো হরিশের।

হরিশ গিয়ে দাঁড়াতেই কর্নেল চ্যাম্প্‌নিজ নিজে উঠে দাঁড়িয়ে তার সংগে করমর্দন ক'রে ব'ললেন, তোমাকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই! ব'সো, তাছাড়াও তোমার সংগে দরকারি কথা আছে।

কেন যে কর্নেল তাকে এভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছেন সেটা বুঝে উঠতে পারলে না হরিশ।

কর্নেল চ্যাম্প্‌নিজ তাঁর দেরাজের ভেতর থেকে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার কয়েকখানি কপি বের ক'রলেন, যার প্রত্যেকটির ভেতর হরিশের লেখা ছাপা হয়েছে। সেগুলো তার সামনে এগিয়ে দিয়ে ব'ললেন, এ-সব তোমারই লেখা তো?

সলজ্জভাবে হরিশ ব'ললে, হ্যাঁ, স্যার।

কর্নেল চ্যাম্পনিজের মুখে আরো বেশি খুশির উচ্ছ্বাস ফুটে উঠলো। ব'ললেন, তোমার প্রত্যেকটি লেখা আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প'ড়েচি। তোমার মৌলিক বিচার-শক্তি আমাকে মুগ্ধ ক'রেচে।

কয়েকমুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে কর্নেল চ্যাম্প্‌নিজ আবার ব'ললেন, আমার সবচেয়ে আনন্দ হ'চ্চে, তোমাকে আরো পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্যে আমি উৎসাহিত ক'রেচিলুম। তাহ'লে আমার-ও একটু কৃতিত্ব আছে, কি বলো?

তাঁর মুচকি হাসিভরা মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে হরিশ ব'ললে, আমি সে-জন্যে আন্তরিক কৃতজ্ঞ স্যার।

—কৃতজ্ঞতা জানানোর সময় পরে ঢের পাওয়া যাবে, আপাতত জোর কদমে নিজের কাজে এগিয়ে যাও।—ব'লে একটু থেমে ম্লান হেসে কর্নেল চ্যাম্পনিজ আবার ব'ললেন, দারিদ্র্যের তাপ যে কত অঙ্কুরকে অকালে নষ্ট করে! কিন্তু তুমি যে পরাজয় স্বীকার করোনি তা দেখেই আমার বড়ো ভালো লাগচে হরিশ! আমাকে পরাজয় স্বীকার ক'রতে হ'য়েছিল, তার জের এখনো টেনে চ'লেচি!

হরিশ চুপ ক'রেই রইলো। কর্নেল চ্যাম্প্‌নিজের মতো এতবড় অফিসারের জীবনে স্বপ্নভংগের কী ইতিহাস আছে, তা তো তার জানা নেই।

নিজেকে সামলে নিলেন চ্যাম্প্‌নিজ। স্নিগ্ধ হেসে ব'ললেন, তোমার মতো একটা উঠতি প্রতিভা যে আমার অাপিসে কাজ ক'রচে তার জন্যে সত্যিই আমি গর্বিত। অবশ্য সে গর্বের আগেও মিস্টার ম্যাকেঞ্জিকে আমার ধন্যবাদ জানানো উচিত। তিনি যথার্থ পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি যে অপাত্রকে সুপারিশ করেননি, তা তো এখন বেশ স্পষ্টভাবেই বোঝা যাচ্চে। শোনো, ইংলিশম্যান সম্পাদক মিস্টার হ্যারি আমার বিশেষ বন্ধু। তিনি তোমার লেখা ছাপতে ইচ্ছুক। তোমার আপত্তি আছে?

হরিশ সংগে সংগে কোনো উত্তর দিতে পারলে না। ইংলিশম্যান-ই ব'লতে গেলে এদেশে ব্রিটিশদের মুখপাত্র। তার চিন্তা-ভাবনা আর দৃষ্টিভঙ্গির সংগে হরিশের বিলক্ষণ পরিচয় আছে। সেই শ্বেতাঙ্গ-উন্নাসিকতা, সেই নেটিব-বিদ্বেষ!

কর্নেল চ্যাম্প্‌নিজ ততক্ষণে হরিশের মনোভাব বুঝে নিয়েছেন। একটু হেসে তিনি ব'ললেন,

তোমার দ্বিধার কারণ হয়তো আমি বুঝতে পেরেচি। তোমাকে আমি জোর ক'রবো না। তবে এইটুকু ব'লতে পারি, কব্ হ্যারি একটু আলাদা ধাতের মানুষ। সে ইংলিশম্যানের সম্পাদক হওয়ার পর থেকে পত্রিকার সুর আগেকার চেয়ে বেশ কিছুটা পালটে গেচে।

—হ্যাঁ, সেটা লক্ষ্য ক'রেচি।—ব'ললে হরিশ।

কর্নেল চ্যাম্প্‌নিজ একটু রসিকতার ছলে হেসে ব'ললেন, তাছাড়া ইংলিশম্যান তো পুরোপুরি ইংলিশম্যান নয় তোমাদের প্রিন্স দ্বারকানাথের অংশীদারি কিছুটা ছিল, এখনো তাঁর পরিবারবর্গের হাতে সেটা বহাল তবিয়তেই আছে। সে-কথা যাক, আমি কেন এত আগ্রহ দেখাচ্ছি, তার কারণটা তোমাকে বলি। এদেশের মানুষেরা কোন্ দৃষ্টিতে ব্রিটিশকে দেখচে, সেটাও আমাদের উন্নাসিক, আত্মকেন্দ্রিক ব্রিটিশদের জানা দরকার। ইংলিশম্যানের প্রচার সবচেয়ে বেশি। তাই সেখানে লিখলে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ব্রিটিশের চোখে তা প'ড়বে। আমার মনে হয়, এখন তা দরকার।

হরিশ চোখ তুলে ব'ললে, বেশ, আমি লিখবো। কিন্তু—

তাকে বাধা দিয়েই কর্নেল চ্যাপ্‌নিজ ব'ললেন, সে-কথাও আমি তোমাকে জানিয়ে রাখচি। যদি কখনো মনে হয়, তুমি যা লিখতে চাও, তা তোমাকে লিখতে দেওয়া হচ্চে না, সেই মুহূর্তেই তুমি কলম থামিয়ে দেবে। সেক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার তোমাকে আমি অনুরোধ ক'রবো না।

বিহ্বল, অভিভূতের মতো কর্নেল চ্যাম্প্‌নিজের দিকে তাকালে হরিশ। সেই মুহূর্তে একটা কথা-ই তার মনে হচ্ছিল। এদেশে যে ইংরেজরা আসে, তাদের ভেতর একটা বড়ো অংশ যদি রেভারেণ্ড পিফার্ড কিম্বা কর্নেল চ্যাপ্‌নিজের মতো হ'ত!

—কী ভাবচো?

একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে প'ড়েছিল হরিশ। সলজ্জভাবে ব'ললে, না স্যার, তেমন কিছু ভাবচিনে।

কর্নেল চ্যাম্প্‌নিজ ব'ললেন, তুমি ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরিতে নিয়মিত পড়াশোনা ক'রচো ক'রে যাও। আমার একটা ব্যক্তিগত লাইব্রেরি আছে। শখের ভেতর আমার ওই একটিই মাত্র আছে। যদিও আমার লাইব্রেরি নেহাৎই ছোটো তাহ'লেও কিছু দুষ্প্রাপ্য বইপত্র সেখানে পাবে। এ পর্যন্ত যেসব গেজেটিয়ার বেরিয়েচে, সেগুলোও আছে। যদি কখনো তোমার কিছুমাত্র কাজে লাগে, আমার লাইব্রেরির দরজা তোমার জন্যে উন্মুক্ত রইলো!

কী ব'লে যে কৃতজ্ঞতা জানাবে তা যেন ভেবেই পাচ্ছে না হরিশ। ধরা গলায় শুধু ব'ললে, আমি যেন আপনার এই স্নেহ নেওয়ার যোগ্য হ'য়ে উঠতে পারি!

—নিশ্চয়ই পারবে। অপাত্রে স্নেহ বর্ষণ করা আমার স্বভাবে নেই।

একটু থেমেই তার পর নিজের আবেগে কর্নেল চ্যাম্প্‌নিজ ব'ললেন, জানো হরিশ, আমিও খুব গরীবের সন্তান। শৈশবে খুবই অভাব-অনটনের ভেতর কেটেচে। আমার বাবা একটা ওয়্যার হাউসে সামান্য মাইনের চাকরি করতেন। তা-ও রুগ্ন থাকার জন্যে মাঝে মাঝে কামাইয়ের ফলে প্রায়ই মাইনে কাটা যেতো। এমন অনেকদিনই গেছে যে একখানা রুটি আমরা পাঁচ ভাই-বোনে ভাগ করে খেয়েচি। না খেয়েও দিন কেটেচে। এত অভাবের ভেতরেও বাবা কিন্তু আমাদের লেখাপড়া বন্ধ করেননি। ওই অবস্থার ভেতরেই মনে মনে স্বপ্ন দেখতুম, বড়ো হ'য়ে অক্সফোর্ড কিম্বা কেম্ব্রিজের অধ্যাপক হবো! কোথায় কল্পনা আর কোথায় বাস্তব! অসময়ে বাবা মারা গেলেন। দারিদ্র্যের তাড়নায় শেষ পর্যন্ত নাম লেখাতে হ'ল সেনাবিভাগের খাতায়! কোথায় হবো প্রফেসর চ্যাম্প্‌নিজ আর কোথায় কর্নেল চ্যাম্প্‌নিজ! যুদ্ধ বিগ্রহের কাটাকাটি রক্তারক্তি আমার ভালো লাগে না। তাই যে মুহূর্তে এই অডিট আপিসে আসার সুযোগ পেলুম, সেই মুহূর্তেই এটা লুফে নিয়েচি। আমার দ্বারা কাজের কাজ কিছুই তো হ'ল না—হবেও না। তোমাদের ওপর খবরদারি করে এখান থেকেই একদিন আমাকে অবসর নিতে হবে। তারপর যদি দেশে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে তো চ'লে যাবো। আর যদি না যাই তো এখানেই দিব্যি দুর্গোৎসব, চড়ক আর গাজনের সঙ দেখে, হুঁকো টেনে জীবনটা কাটিয়ে দেবো!

কর্নেল চ্যাম্প্‌নিজের মুখে কৌতুকের হাসি।

সে-হাসির আড়ালে এই প্রৌঢ় মানুষটির স্বপ্নভঙ্গের মর্মান্তিক বেদনা বেশ স্পষ্টভাবেই বোঝা যাচ্ছিল।

—তুমি এগিয়ে যাও হরিশ। আমার সাধ্যমতো সবরকম সহযোগিতা তুমি পাবে। শুধু কয়েকটা গতানুগতিক প্রবন্ধ লেখাই নয়, তুমি কিছু মৌলিক চিন্তার পরিচয় দেবে, আমি কিন্তু তোমার কাছে সেই আশা-ই ক'রচি!

হরিশ সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতায় তাকিয়ে ব'ললে, আমি কতদূর কী ক'রতে পারবো জানিনে স্যার। তবে এইটুকু ব'লতে পারি, আমার চেষ্টার ত্রুটি হবে না!

—তা আমি জানি হরিশ। তোমার চরিত্রে ফাঁকি নেই তা আমি বুঝে নিয়েচি। যাকগে, এই নাও অডিটর জেনারেলের একখানা চিঠি। খুলে প'ড়ে দ্যাখো—

একখানা লেফাফা হরিশের হাতে তুলে দিলেন কর্নেল চ্যাম্প্‌নিজ।

কাঁপা হাতে লেফাফা থেকে চিঠিখানা খুললে হরিশ। কাগজের ভাঁজ খুলে সে প'ড়তে লাগলো—

"কপিস্ট বাবু হরিশচন্দ্র মুখার্জির কর্মনিষ্ঠা এবং দক্ষতা লক্ষ্য ক'রে নিম্ন স্বাক্ষরকারী হৃষ্টচিত্তে আগামী মাস থেকে তাঁকে কপিস্ট থেকে উচ্চতর কেরাণি পদে উন্নীত ক'রলেন এবং সেই সঙ্গে তাঁর মাসিক বেতন পঁচিশ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে পঞ্চাশ টাকা হ'ল।"

স্বাক্ষরঃ কর্নেল গোল্ডী
অডিটর জেনারেল।

অভিভূত বিস্ময়ে কর্নেল চ্যাম্প্‌নিজের মুখের দিকে তাকালে হরিশ। তাঁর মুখে তখন মৃদু মৃদু হাসি।

॥ ছয় ॥

কর্নেল চ্যাম্প্‌নিজের সহৃদয় উৎসাহ একটা প্রচণ্ড উন্মাদনা এনে দিয়েছে হরিশকে।

কেবল মৌখিক উৎসাহই নয়, সর্বক্ষণ অভাবের তাড়না তাকে যেন বিব্রত না করে তার জন্যে পঁচিশ টাকা মাইনে বাড়ানোর ব্যবস্থাও ক'রেছেন তিনি। সাধারণ বুদ্ধিতেই বোঝা যায়, এ তাঁরই কাজ। কর্নেল গোল্ডীকে বুঝিয়ে তিনিই এটা ঘটিয়েছেন। নইলে কর্নেল গোল্ডী হঠাৎ এটা ক'রতে গেলেন কেন? তিনি তো হরিশকে এখনো দেখেননি।

এগিয়ে চ'লেছে হরিশ। একের পর এক সে লিখছে।

সংসারে এসেছে সচ্ছলতা। নিশ্চয়ই অপরিমিত নয়। কিন্তু দুঃস্বপ্নের সেই ভয়াবহ দিনগুলির তুলনায় নিঃসন্দেহে পর্যাপ্ত। কেবল আপিসের মাইনেই নয়, লেখার দক্ষিণা হিসেবেও প্রতি মাসেই কিছু টাকা তার হাতে আসছে।

কিন্তু সংসারে শান্তি কোথায়?

মায়ের সঙ্গে ছোটোবৌয়ের ঝগড়াঝাটি দৈনন্দিন ঘটনা। দু'জনেই অসহিষ্ণু। দু'জনেই দু'জনের ছায়া দেখলে ক্ষেপে ওঠে। বৌঠান অসহায়ের মতো মুখ বুজে থাকে।

ছোটোবেলা থেকে দারিদ্র্য, লাঞ্ছনা, গঞ্জনার ভেতরেও মায়ের যে ধৈর্য আর সহিষ্ণুতা দেখেছে হরিশ, এখন আর তার চিহ্নমাত্র নেই। অল্পেই এখন উত্তেজিত হ'য়ে পড়েন, গলা ফাটিয়ে শাপ-শাপান্ত করেন ছোটোবৌকে। উত্তেজনার মাত্রা আরো বেড়ে গেলে হাঁড়ি-কুঁড়ি, থালা-বাসন—হাতের কাছে যা পান, তাই ছুঁ'ড়ে ফেলেন। আর ছোটোবৌ ঘরের ভেতর থেকেই অশ্রাব্য, অশ্লীল ভাষায় শাশুড়ির সঙ্গে সঙ্গে এই সংসারের ওপর বিষ ওগ্‌রাতে থাকে। মুখুজ্যে বাড়ির ঝগড়া আজকাল পাড়ায় একটা মুখরোচক আলোচনার বিষয় হ'য়ে উঠেছে। বড়োবৌ আদিগঙ্গায় স্নান ক'রতে যাওয়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। সবাই আড়চোখে তাকায়, ছোটোবৌ সম্বন্ধে এটা-সেটা

জিজ্ঞেস করে। তার চেয়ে ঘাটে চান ক'রতে না গিয়ে বাড়িতে সেটা সেরে নেওয়াই ভালো। ঠাকুরপো তো বাড়িতে পাতকুয়ো ক'রে দিয়েছে।

বেশ রাত ক'রেই বাড়ি ফেরে হরিশ।

হয়তো খাওয়া-দাওয়ার পর তামাক টানতে টানতে সবে কাগজ-কলম নিয়ে ব'সেছে, তখুনি শুরু হ'য়ে গেল ঝগড়া। তার ভেতর মনোযোগ দিয়ে কিছু লেখা অসম্ভব। তামাক টানতে টানতে ক'লকের আগুন নিবে যায়। কলম নামিয়ে রেখে কোনোদিন শুয়ে পড়ে, কোনোদিন বা রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে গিয়ে ক্লান্ত দেহে পায়চারি ক'রতে থাকে।

ছোটোবৌকে কিছু বলা নিষ্ফল, কিন্তু মা?

হয়তো বয়স হ'য়েছে তাই আর আগের মতো ধৈর্য নেই, সহিষ্ণুতাও নেই। কিন্তু কি এমন বয়স? সেই চন্দরা গয়লানী আজ পর্যন্ত দুধের জোগান দিয়ে চ'লেছে। ছুটির দিনে এখনো মাঝে মাঝে তাকে দেখতে পায় হরিশ। চন্দরা মাসি বয়সে মায়ের চেয়ে হয়তো সামান্য কিছু ছোটো হবে। কিন্তু তার চেহারায় আজ পর্যন্ত বয়সের কোনো ছাপ পড়েনি। আর মুখে সেই স্নেহমাখা হাসিটুকু আজও যেন লেগে আছে। এই কিছুদিন আগে তার একটা মেয়ের বিয়ে হ'য়ে গেল। নদীয়া জেলার কোন্ একটা গ্রামে যেন মেয়েটার শ্বশুরবাড়ি। বিয়ের সময় জামাই দেখার নেমতন্ন ক'রতে ভোলেনি চন্দরা মাসি। বামুনকে তো খাওয়াতে পারবে না। তাই দই-মেঠাই সমেত সিধে পেঁছে দিয়ে গিয়েছিল নিজের হাতে।

একটা নির্বাক যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করে হরিশের মন।

সংসারে এই অশান্তির জন্যে কাকে সে দায়ী ক'রবে—মা অথবা ছোটোবৌ অথবা তার নিজের অদৃষ্ট?

অদৃষ্টে বিশ্বাস করে না হরিশ।

তাহ'লে মা? তিনিই তো বারবার পীড়াপীড়ি ক'রে দ্বিতীয় বিবাহে তাকে বাধ্য ক'রেছেন! তড়িঘড়ি ক'রে একটা অমার্জিত রুচির মেয়েকে ঘরে এনে তুলেছেন তিনি। সে-কাজের ফলভোগ তাঁকে ক'রতেই হবে!

অশান্ত মনে কোনো কোনোদিন কলম রেখে ঘরের ভেতরেই পায়চারি ক'রতে থাকে হরিশ। মায়ের ওপর সব দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে সে নিজে কি নির্দোষ হিসেবে বেকসুর খালাস পেতে পারে?

না, তা পারে না। তার নিজের কোনো দায়িত্ব নেই?

মা যত পীড়াপীড়িই করুন, তার নিজের সম্মতি ছাড়া এ বিয়ে হয়নি। জৈব কামনার অমোঘ নির্দেশে সম্মতি তাকে দিতে হ'য়েছে। অপরের কাছে ছলনা করা চ'ললেও নিজের কাছে তো ছলনা চলে না!

মোক্ষদার স্মৃতি বুকে নিয়েই সে জীবন কাটাবে ভেবেছিল। কিন্তু কোথায় গেল সে সঙ্কল্প? অমার্জিত রুচির জন্যে যে নারীকে সে সহ্য ক'রতে পারে না, তাব সঙ্গে সহবাস সে তো বন্ধ ক'রতে পারেনি? এই ক'বছর ধ'রে আসঙ্গ-লিপ্সায় সেই নারীকেই সে অনায়াসে নির্দ্বিধায় বুকে টেনে নিয়েছে। যতদিন দেহে প্রবৃত্তির তাড়না থাকবে, ততদিন তাই ক'রতে হবে তাকে।

হরিশ অদৃষ্ট মানে না কিন্তু কর্মফলকে মানে। তার কৃতকর্মের ফল তাকেও নিশ্চয়ই ভোগ ক'রতে হবে!

বৌঠান ইদানিং একেবারেই চুপচাপ।

নিরুপায়ভাবে তাকে দু'একবার অনুনয় ক'রে ব'লেছে হরিশ, ছোটোবৌকে কিছু ব'লে তো লাভ নেই, তুমি মাকে অন্ততঃ যেমন ক'রে হোক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত ক'রো বৌঠান।

বড়োবৌ ম্লান হেসে ব'লেছে, তাতে ভুল বোঝাবুঝি আরো বাড়বে ঠাকুরপো।

বৌঠানের কথা অস্বীকার ক'রতে পারেনি হরিশ। দাদার রোজগার কম ব'লে সংসারে কেঁচোর

মতো হ'য়ে থাকে বৌঠান। তার ওপর ছোটোবৌয়ের নাকি ধারণা, বড়োবৌ-ই তার বিরুদ্ধে শাশুড়ির মনকে বিষিয়ে দিয়েছে।

দিনের পর দিন অবসাদে ক্লান্ত হ'তে থাকে হরিশের মন।

তার আকৈশোরের স্বপ্নলোকের তোরণদ্বার সবে খুলতে আরম্ভ ক'রেছে। খুলতে না খুলতেই কি সে-দ্বার আবার চোখের সামনে বন্ধ হ'য়ে যাবে? এই পরিবেশে কেমন ক'রে সে তার সাধনা চালিয়ে যাবে? তবে কি আশাভঙ্গের হতাশ্বাস বুকে চেপেই বাকি জীবনটাকে কোনোমতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে টেনে নিয়ে যেতে হবে? শুধু বাঁচতে হবে ব'লেই বেঁচে থাকা?

হরিশ এখনো হেঁটেই আপিস যাতায়াত করে।

এখন মোটামুটি যা অবস্থা তাতে ইচ্ছে ক'রলে ভাগে-ভাড়ার কেরাঞ্চি-গাড়িতে সে যেতে পারে। ভবানীপুরে আজকাল বসতি অনেক বেড়েছে। আপিস-বাবুদের নিয়ে দু'চার খানা কেরাঞ্চিগাড়ি রোজই আপিসপাড়ায় যায়। ভাড়াও মোটামুটি সাধ্যের ভেতর। রোদের ভেতর অতখানি পথ হাঁটার ধকল-ও কমে।

কিন্তু সেটুকু বিলাসের লোভ সম্বরণ ক'রেছে হরিশ। তাতে যে ক'টি টাকা বাঁচবে তা দিয়ে ভাইপোগুলোর লেখাপড়ার খরচ হ'য়ে যায়। তার নিজের যে আর সন্তান হবে না তা তো এখন বোঝা হ'য়ে গেছে। নিজেদের শৈশবের কথা ভেবে এখনো সে শিউরে ওঠে। ভাইপো-ভাইঝিগুলোকে যেন সে-রকম দুঃসহ অভিজ্ঞতার ভেতর প'ড়তে না হয়!

শুধু ভাইপোদের কেন, ভাইঝি দুটোকেও লেখাপড়া শেখানোর খুব ইচ্ছে তার। সদর ক'লকাতায় মেয়েদের লেখাপড়া শেখার কিছু কিছু ব্যবস্থা হ'য়েছে। এডুকেশন কাউন্সিলের সভাপতি বেথুন সাহেব মেয়েদের জন্যে একটা স্কুল খুলেছেন। বিদ্যাসাগর সেই স্কুল-কমিটির সভাপতি।

বেথুন সাহেবের ফিমেল স্কুল নিয়ে গোঁড়া হিন্দু মহলে 'গেল' 'গেল' রব উঠেছে। এমন কি, ছোটো ছোটো মেয়েগুলো যে গাড়িতে চেপে স্কুলে যাতায়াত করে, সেই গাড়ির ওপর বড়ো বড়ো ঢিল ছুঁড়ে অভিভাবকদের ভয় দেখানোও হ'য়েছিল। তাতে অবশ্য স্কুল বন্ধ হয়নি। রামগোপাল ঘোষ, দেবেন ঠাকুর, এমন কি সংস্কৃত পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার পর্যন্ত বাড়ির ছোটো ছোটো মেয়েদের ভর্তি ক'রে দিয়েছেন বেথুন সাহেবের স্কুলে।

মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর উদ্যোগ দেখে গুপ্তকবি ছড়া কেটেছেন,

> যত ছুঁড়ীগুলো তুড়ী মেরে কেতাব হাতে নিচ্চে স'বে,
> এ বি শিখে, বিবী সেজে, বিলাতী বোল্ কবেই কবে ;
> আর কিছুদিন থাকরে ভাই! পাবেই পাবে দেখতে পাবে,
> আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী, গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।

সে ছড়া প'ড়েছে হরিশ। গোঁড়ামির বহর দেখে সে হেসেছে মাত্র। সতীদাহ প্রথা রদের উদ্যোগও গোঁড়া হিন্দুদের কাছে একদিন কম বাধা পায়নি।

ভাইঝিদের লেখাপড়া শেখানোর প্রবল আগ্রহ হরিশকে পেয়ে ব'সেছে। আজ কিছুদিন ধ'রেই প্রসঙ্গটা তার মাথায় ঘুরছে। তার পেছনে অবশ্য সামান্য একটা ঘটনা আছে। কিন্তু সেই সামান্য ঘটনাই তার কাছে অসামান্য হ'য়ে উঠেছে।

সেদিন ছিল ছুটির দিন।

হরিশ ব'সে কয়েকখানা বইপত্র ঘাঁটাঘাঁটি ক'রছিল। একটু পরে তার গড়গড়ার ক'লকে সেজে নিয়ে টিকেয় ফুঁ দিতে দিতে ঘরে ঢুকলে বড়ো ভাইঝি মাধুরীলতা। বছর আটেক বয়েস। দেখতে যেমন ঢলঢলে, স্বভাবটাও তেমনি মিষ্টি। এই ভাইঝির ওপরেই একটু বেশি টান হরিশের। আর মেয়েটারও যত আবদার, যত মনের কথা তার কাকাবাবুর কাছে। হরিশ তাকে ডাকে মধু-মা।

ক'লকেটা গড়গড়ায় বসিয়ে দিয়ে মাধুরী ব'ললে, নাও, টানো।

হরিশ হেসে ব'ললে, টানচি।

মাধুরী গম্ভীরভাবে ব'ললে, না বাপু, তোমাকে বিশ্বেস নেই। যা ভুলো মন তোমার! হয়তো কেতাবের দিকে তাকিয়েই এক প'র সময় কাটিয়ে দেবে আর টিকের আগুনও নিবে যাবে। তারপর নতুন ক'রে ক'লকে সেজে আনতে সেই আমাকেই তো ছুটতে হবে বাপু!

হরিশ হাসতে হাসতে ব'ললে, ভুলো-মন ছেলের জন্যে তুমি এটুকু না ক'রলে আর কে ক'রবে মধু-মা?

—আমি তো ক'রচিই বাপু! কখনো আপত্তি ক'রেচি?

সস্নেহে ভাইঝির মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে হরিশ ব'ললে, তুমি যে আমার লক্ষ্মী মধু-মা! তোমার বে' হ'য়ে গেলে আমার যে কী দশা হবে, তাই ভাবি!

—আহা, এখুনি যেন আমার বে' হচ্চে! তবে তাও বলি, আমি চ'লে গেলে তোমার দশা খুবই খারাপ হবে, তাতে সন্দ নেই। আমি তো শ্বশুরবাড়িতে গিয়েও সোয়াস্তি পাবো না, তা আমি এখনি হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারচি বাপু! এ-বাড়িতে আমার কথা ছাড়া আর কারুর কথা তো তুমি গেরাহ্যিই করো না!

হরিশ কপট গাম্ভীর্যে ব'ললে, হুঁ, সেটা অবশ্য ঠিকই ব'লেচ মধু-মা! মাতৃ-আদেশ ছাড়া অন্য কোনো আদেশ আমি মানিনে।

মাধুরী আরো গম্ভীরভাবে ব'ললে, তোমাকে অ্যাদ্দিন ধ'রে দেখচি তো? একটু আধটু শাসন না ক'রলেও তো চলে না। দেখে দেখে হন্দ হ'য়ে গেচি ব'লেই বাধ্য হ'য়ে মাঝে মাঝে দু'-একটা কথা ব'লতেই হয়।

—বেশ তো, তোমার যত খুশি শাসন ক'রো। কিন্তু এখন আমাকে একটু ছেড়ে দাও।

—না, তোমার সঙ্গে আমার দরকারি কথা আচে কাকাবাবু।

—দরকারি কথা?

—হ্যাঁ দরকারি বৈ কি! তুমি তো দিনরাত নেকাপড়া নিয়েই মেতে আচো! রাতে যখন বাড়ি ফেরো তখন ঘুমিয়ে পড়ি। এর ভেতর সময়টা কখন হবে শুনি? আমি তোমার কোনো ওজর শুনবো না এখন, আমার দরকারি কথা তোমাকে শুনতেই হবে!

গড়গড়ায় টান দিয়ে হরিশ ব'ললে, বেশ, বলো, আমি শুনচি।

কাকার গা ঘেঁষে দাঁড়ালে মাধুরী। তারপর ব'ললে, দাদারা ছোটো ভায়েরা সবাই পাঠশালায় যায়। বেটাছেলেরাই শুধু নেকাপড়া ক'রবে মেয়েরা করবে না—এইটেই কি কোম্পানির নিয়ম?

হরিশ একটু বিস্মিতভাবে ভাইঝির মুখের দিকে তাকালে। মৃদুস্বরে ব'ললে, তোমার কি লেখাপড়া শিখতে ইচ্ছে হয় মধু-মা?

—পোড়া কপাল আমার! নইলে আর ব'লচি কেন?

হরিশের মুখে ফুটে উঠলো তৃপ্তি। ব'ললে, তোমার এই ইচ্ছের কথা শুনে আমার খুবই ভালো লাগচে মধু-মা। কিন্তু এদিকে যে মেয়েদের কোনো স্কুল নেই!

মাধুরী তাতেও দমবার পাত্রী নয়। ব'ললে, ও ক আর আমি জানিনে? তুমি তো কত ইংরিজি কাগজে নেকো। কোনো কাগজে নিকে আমাদের ইদিকে একটা মেয়েদের পাঠশালা বসানোর হিল্লে করো না বাপু! তুমি বিদ্যেসাগরকে গে' একবার বলো, তিনি যাহোক একটা কিছু ক'রবেনই দেখো। তার আগে তুমি আমাকে দু'একখানা বই-কেতাব কিনে দাও। বাবা আর তুমি সময় ক'রে আমাকে একটু ক'রে পড়িয়ে দেবে। তারপর পাঠশালা হ'য়ে গেলে সেখানে ভর্তি হ'য়ে যাবো।

বিপুল আনন্দের আবেগে ভাইঝিকে বুকে টেনে নিয়ে হরিশ ব'ললে, তোমার জন্যে আজই আমি বই কিনে আনবো মধু-মা!

ছোট্ট মেয়েটা সেদিন হরিশের চোখ খুলে দিলে।

তারপর থেকেই সে ভাবতে শুরু ক'রেছে। মাধুরীর জন্যে সেইদিনই সে বই কিনে এনেচে। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের লেখা 'শিশুশিক্ষা—প্রথম ভাগ'। বিদ্যাসাগর মশাইয়ের সঙ্গে পরিচয় নেই। তবে তাঁর কাছে নাকি যে কেউই অনায়াসে যেতে পারে ব'লে সে শুনেচে। ভবানীপুরের মেয়েদের স্কুল সম্বন্ধে তাঁর কানে একবার কথা তোলা দরকার। মদনমোহন তর্কালঙ্কার স্ত্রীশিক্ষার সমর্থনে যে-বইখানা লিখেছেন তার একখানা হাতের কাছে রেখেছে হরিশ। নতুন ক'রে পড়তে আরম্ভ ক'রেছে সংস্কৃত সাহিত্য, হিন্দু দর্শন, সভ্যতা আর সংস্কৃতির ইতিহাস। এলফিনস্টোনের লেখা ভারতবর্ষের ইতিহাস প'ড়ে তার মন ভরেনি। সে আরো জানতে চায়। ভারতের প্রাচীন সমাজে নারীর যে স্থান ছিল, মনুসংহিতার অনুশাসন প্রচলিত হওয়ার পর সে স্থান কেন এত নীচে নেমে গেল—সব কিছু তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে হবে।

নতুন ক'রে পাঠ নিতে শুরু ক'রেছে সংস্কৃত পণ্ডিতের কাছে। কোনো জ্ঞানকেই অসম্পূর্ণভাবে অধিগত ক'রে আত্মতৃপ্ত হওয়া হরিশের স্বভাবে নেই। বাস্তব কারণেও সব কিছুই তার সম্পূর্ণভাবে জানা দরকার। হিন্দুত্বের নামে যে আচার-সর্বস্ব দল আসল শাঁসকে ফেলে দিয়ে কেবল কতগুলো কুসংস্কারের ছিব্‌ড়ে আঁকড়ে তারস্বরে চিৎকার ক'রছে, তাদের সঙ্গে বাদ-প্রতিবাদে নামতে হ'লে তৈরি হ'য়েই নামতে হবে। সে যাবে বিদ্যাসাগর মশাইয়ের কাছে, যাবে রামগোপাল ঘোষের কাছে। ইয়ংবেঙ্গল রামগোপাল সংস্কারমুক্ত। কেবল স্ত্রী-শিক্ষা সমর্থন-ই নয়, হিন্দু বিধবার সমস্যা নিয়েও তিনি চিন্তা ক'রেছেন। হরিশের মনে প'ড়েছে, রামগোপালের জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকায় হিন্দু বিধবা বিবাহের সমর্থনে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হ'য়েছিল। রামগোপাল নিজে তাঁর মেয়েদের ভর্তি ক'রেছেন বেথুন সাহেবের স্কুলে। সুতরাং তাঁর কাছে হাজির হ'য়ে পরামর্শ চাইলে হয়তো একটা কিছু উপায় হ'তে পারে। কিন্তু অত বিরাট ব্যক্তির কাছে কেমন ক'রে সে যাবে? হরিশকে তিনি তো চেনেন না। কে তাকে নিয়ে যাবে ভারতীয় ডিমস্থিনিসের কাছে?

চার্চ মিশন সোসাইটি কালীঘাটের দিকে মেয়েদের স্কুল ক'রেছে। তাদের কাছে অনুরোধ জানালে তারা হয়তো ভবানীপুরের চালপট্টিতেও একটা স্কুল খোলার তোড়জোড় শুরু ক'রে দেবে। কিন্তু সেটা বোধ হয় ভালো হবে না। যারা শিক্ষাদানকে উপলক্ষ্য ক'রে মেয়েদের ক্রীশ্চান করবার প্রচেষ্টাকেই মূলধন ক'রে কাজে নেমেছে, জেনে শুনে তাদের ডেকে আনা বিপজ্জনক। সেই স্নেহময় রেভারেণ্ড পিফার্ড আজ জীবিত নেই। নইলে তাঁরই কাছে ছুটে যেত হরিশ।......আচ্ছা, ঠাকুরপুকুরের রেভারেণ্ড লঙের সঙ্গে একবার আলোচনা ক'রে দেখলে কেমন হয়? তিনি এদেশকে ভালোবাসেন। লোকে তাঁকে শ্রদ্ধা করে। কিন্তু তিনিও তো মিশনারি প্রচারক। না, তার চেয়ে বিদ্যাসাগর মশাইয়ের কাছে যাওয়াই সবচেয়ে ভালো। বেথুন সাহেবের স্কুলের যে গাড়িতে ক'রে মেয়েরা যাতায়াত করে, তার গায়ে মহানির্বাণ তন্ত্রের এই শ্লোকটা তিনিই তো খোদাই করিয়ে দিয়েছেন,

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ।

এর মাঝে চ্যাম্পুনিজ সাহেবের কুঠিতে গিয়ে একান্ত নিরিবিলিতে বেশ কিছু পড়াশোনা ক'রেছে হরিশ। পাশ্চাত্য দর্শন আর সমাজ-জীবন সম্বন্ধে কত অজানা তথ্য সংগ্রহ ক'রেছে। সে-ক'দিন মেটকাফ হলে তার যাওয়া হ'য়ে ওঠেনি।

অনেকদিন পরে আবার মেটকাফ হল।

এখন বেশ কিছুদিন তাকে আবার নিয়মিত ভাবে এখানেই আসতে হবে। হিন্দু সমাজ-সভ্যতা-দর্শন সম্বন্ধে যে মূল তথ্যগুলো সে জানতে চায়, সেগুলো চ্যাম্পুনিজ সাহেবের লাইব্রেরিতে নেই।

মেটকাফ হলেই প্রথম পরিচয় হয়েছিল শম্ভুনাথ পণ্ডিতের সঙ্গে। শম্ভুনাথ আগে ছিল সদর দেওয়ানি আদালতের মুহুরি; এখন উকিল। আদালতে এরই ভেতর তার বেশ নাম-ডাক হয়েছে, পশার এখন জমজমাট। ভবানীপুরে বাড়ি করার ফলে শম্ভুনাথ হরিশের আরো ঘনিষ্ঠ হ'য়েছে। মাঝে মাঝে তার বাড়িতে আড্ডার আসরও বসে।

মাঝে বেশ কিছুদিন দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি ব'লেই সেদিন হরিশকে দেখেই হাতের ইশারায় কাছে ডাকলে শম্ভুনাথ। একগাল হেসে বললে, ব্যাপার স্যাপার কী হে? অ্যাদ্দিন আড়ালে ব'সে ক্ষুর শাণাচ্ছিলে নাকি?

—ক্ষুর! তার মানে?

—আরে বাবা, তুমি তো ক্ষুর চালাতে শুরু ক'রেচ হে! মানে ক্ষুরধার লেখনী আর কি! যা লিখচো তাতেই ক্ষুরের ধার। ইয়ংবেঙ্গল মহলেও তোমার লেখাগুলো রীতিমতো আলোচনার বিষয় হ'য়ে উঠেচে, সে খবর রাখো কি?

হরিশ সত্যিই কোনো খবর রাখে না। কিন্তু কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তার হৃৎপিণ্ডের ভেতর এক ঝলক রক্ত যেন চ'ল্‌কে উঠ্‌লো। ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে সে ব'ললে, আমি কিছুই জানিনে শম্ভু।

শম্ভুনাথ চোখ বড়ো বড়ো ক'রে ব'ললে, বলো কী হে? এইজন্যেই বোধ হয় লোকে বলে, যার বে' তার হুঁশ নেই, পাড়াপড়শির ঘুম নেই! তোমার লেখাগুলো নিয়ে অনেকেই যে আলোচনা ক'রচেন। জানতে চাইছেন, কে এই হরিশ?

হরিশ মুচ্‌কি হেসে ব'ললে, রাজা হরিশচন্দ্র—যাঁর চালচুলো ছিল না।

শম্ভুনাথও হেসে ব'ললে, চালপট্টির বাসিন্দের চাল নেই, এটা কি একটা কথা হ'ল? সে যাই হোক, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্তির এ'রা খবর পেয়েচেন, তুমি এখানে এসে থাকো। তোমার সঙ্গে আলাপে তাঁরা খুবই উৎসুক। যাবে নাকি?

হরিশ ব'ললে, তাঁদের মতো তেজস্বী পণ্ডিত ব্যক্তিরা আমার সঙ্গে আলাপ ক'রতে চেয়েছেন, এতবড়ো সৌভাগ্যের কথা ভাবতেও আমার ভয় হচ্চে শম্ভু। বিশ্বাস করতেই সাহস পাচ্চিনে! তুমি সত্যি ব'লচো?

শম্ভুনাথ ব'ললে, দ্যাখো হে, উকিল এজলাশে দাঁড়িয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা মিথ্যে কথা ব'ললেও এজলাশের বাইরে কিছু কিছু সত্যি কথা বলে। যেটা ব'ললুম, সেটা নির্জলা সত্যি। প্রসন্ন ঠাকুর মশায়ের সূত্রে বাবু রামগোপালের সঙ্গে সম্প্রতি আমার পরিচয় হ'য়েচে। তিনি নিজে আমাকে ব'লেচেন, এই হরিশ মুখুজ্যে লোকটি কে? চেনো নাকি?

—তুমি কী ব'ললে?—উদ্‌গ্রীব আগ্রহে জিজ্ঞাসা ক'রলে হরিশ।

—তাঁরা তুলসী স্পর্শ করিয়া যাহা সত্য তাহাই বলিয়াছি।—হাসতে হাসতে শম্ভুনাথ ব'ললে, তাঁকে ব'লেচি, হরিশকে একদিন আপনার কাছে নিয়ে আসবো।

—আমি যাবো শম্ভু। তাঁর কাছে নিজের গরজেই একবার যাবার কথা ভাবছিলুম। কিন্তু তাঁর মতো ব্যক্তির সামনে গিয়ে দাঁড়ানোর আগে নিজেকে আরো একটু তৈরি ক'রে নেওয়া দরকার। আমার কোনো লেখা যদি তাঁর ভালো লেগে থাকে তারপর আমার সঙ্গে কথা ব'লে যেন তাঁর আশাভঙ্গ না হয়!

—বাপ্‌রে বাপ্‌, হিসেবি বুদ্ধিতে তুমি দেখচি উকিল-মোক্তার বাবুলেদের চেয়েও অনেক বেশি পাকা হে!

হরিশ মুখ টিপে হাসতে লাগলো।

॥ সাত ॥

কিছুদিন পরের কথা।

সেদিন হরিশ আপিসে যাওয়ার পর দুপুর বেলায় বাড়িতে একটা তুমুল কাণ্ড ঘ'টে গেল।

ক'দিন পরেই পাড়ার একটি মেয়ের বিয়ে। সেদিন তার আইবুড়োভাত। আগের দিন মেয়ের মা এসে নেমন্তন্ন ক'রে গেছে। এই তার প্রথম কাজ। তাই ইচ্ছে, আইবুড়োভাতের দিনে

বাড়িতে কয়েকজন এয়ো আসুক, বাড়িতে একটু হৈচৈ হোক। এয়োরা পান-সিঁদুর তো নেবেই দুপুরে দু'টি ডাল-ভাতও খাবে। দুই বৌ কাছেই ছিল। তাদের সামনেই ব'লে গেছে মেয়ের মা।

দুপুর বেলায় দুই বৌ নেমন্তন্নবাড়ি যাওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে। দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন রুক্মিণী।

বড়ো বৌ জিজ্ঞাসা ক'রলে, কিছু ব'লবেন মা?

—হ্যাঁ বাছা, ব'লবো ব'লেই তো এলুম। ছোটোবৌয়ের গিয়ে দরকার নেই, তুমি একা যাও।

কথাটা কানে যেতেই থেমে গেল ছোটোবৌয়ের হাত। সে তখন সবে চুলে পাতা কাটা সেরে চিরুণিটা রাখতে যাচ্ছিল। ফিরে তাকিয়ে সে ব'ললে, আমি যাবো না কেন?

রুক্মিণী গম্ভীরমুখে ব'ললেন, তোকে নেম্‌তন্ন করেনি।

সঙ্গে সঙ্গে ফুঁসে উঠ্‌লে ছোটোবৌ, মিছে কথা! আমার সামনেই নেম্‌তন্ন ক'রে গেচে। আমি কি কালা যে কানে শুনতে পাইনি?

—তবে রে আঁটকুড়ি মাগী, আমি মিছে কথা ব'লচি? আমাকে তুই মিথ্যুক ব'ললি?

রুক্মিণী ছুটে এসে ছোটোবৌয়ের খোঁপা ধ'রে ঝাঁকাতে লাগলেন। সযত্নে বাঁধা খোঁপা ভেঙে তছ্‌নছ্‌ হ'য়ে গেল, কোথায় ছিট্‌কে প'ড়ে গেল খোঁপায় গোঁজা কাঁকই।

বড়োবৌ প্রথমে একেবারে হতভম্ব। ঝগড়া তো প্রায় রোজই হয়, কিন্তু এ-ধরনের আক্রমণ আজ এই প্রথম। সে ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠ্‌লে, মা—

ছোটোবৌ শাশুড়ির হাত চেপে ধ'রে চিৎকার ক'রে উঠ্‌লে, তুই আমার গায়ে হাত দিলি? বেহায়া দজ্জাল মাগী, তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেচে তাও মিছে কথা ব'লতে তোর নজ্জা করে না?

—কী বললি, আমি বেহায়া? আমি দজ্জাল? ওলো ছেনালি, নজ্জা আমার ক'রবে, না তোর? এয়ো হ'য়েচেন! একটা ভাতার থাকলেই এয়ো হয়? যে মাগীর কোল খালি, সে আবার এয়ো কিসের লা? ওলো শতেকখোয়ারি, তোর ছোঁয়া লাগলে বে'র ক'নেটাও বাঁজা হয়ে যাবে, বুঝলি? এমন একটা শুভকম্মে তোকে আমি যেতে দেবো না!

ছোটোবৌ তখন পুরোপুরি হিংস্র হ'য়ে উঠেছে। সজোরে শাশুড়ির হাত চেপে ধ'রে এক ঝটকায় তাঁর হাতের মুঠো থেকে চুলের গোছা ছাড়িয়ে নিয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো, নিলাজ মাগী, হাত দিস কার গায়ে? এই আঁটকুড়ির ভাতারের রোজগারেই তো মুখে দু'টো ভাত উঠ্‌চে রে!

—আমি খাই আমার পেটের ছেলের রোজগারে। আগে আমার পেটে এয়েচে না তোর ভাতার হ'য়েছে, বল্‌!

ছোটোবৌ তখন কেউটের মতো ফুঁসছে। জ্বলন্ত চোখ থেকে যেন ঠিকরে প'ড়ছে আগুনের ফুলকি। বুক ওঠানামা ক'রছে হাপরের মতো।

রুক্মিণী হাঁপাচ্ছেন। একটু দম নিয়েই আবার চিৎকার ক'রে উঠ্‌লেন, অলুক্ষুণে ডাইনি মাগী, তোকে দিয়ে আমার কোন্ ফল্‌না হবে লা? ছেলের আমি আবার বে' দেবো!

—তা দিবিনে? নিজের তো দুই সতীনের ঘর। তাও ঘর ব'লে যদি কিছু থাকতো! এখন বৌয়ের ওপর সতীন এনে না চাপালে আহিংশে মিট্‌বে কেন? দে না, যত গণ্ডা খুশি বে' দে—

—ওলো যমের অরুচি, তুই মর্‌! ম'রে আমায় নিষ্কিতি দে—

থর্‌ থর্‌ ক'রে কাঁপছেন রুক্মিণী। কাঁপতে কাঁপতে ঘরের মেঝেতে ব'সে প'ড়লেন তিনি।

কাঁপছে ছোটোবৌ-ও। তার দাঁতে দাঁত চেপে বলা কথাগুলো বেশ স্পষ্টভাবেই রুক্মিণীর কানে এসে পোঁছলো, তুই আগে মর্‌! তোর চিতেয় ওঠা দেখে নিশ্চিন্দি হ'য়ে তারপর আমি ম'রবো।

ছোটোবৌ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বড়োবৌ বিমূঢ়ের মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তারপর খুব মৃদুস্বরে বললে, আমি বরঞ্চ ওবেলা একবার ঘুরে আসবো মা। এখন থাক।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল, বিকেল গড়িয়ে রাত।

অন্যদিনের তুলনায় সেদিন একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এলো হরিশ। হাতে একটা মোড়ক। ইংলিশম্যান থেকে একটা লেখার দক্ষিণা সেদিন দিয়েছে।

প্রথমবার লেখার টাকা পেয়ে মায়ের জন্যে থানধুতি আর মামীদের জন্যে শান্তিপুরী শাড়ি কিনেছিল হরিশ। পরের বার মামাদের ফরাসডাঙার ধুতি আর ভাইপো-ভাইঝিদের দিয়েছে আটহাতি-দশহাতি ধুতি-শাড়ি। দাদা আর বৌঠানের পালা গেছে তার পরের বার। সেইবারেই ছোটোবৌয়ের একখানা শাড়িও কেনার ইচ্ছে ছিল কিন্তু টাকা একটু কম পড়ে যাওয়ায় তা আর হ'য়ে ওঠেনি।

আপিস ছুটির পর আজ সোজা ভবানীপুরের রাস্তাই ধ'রেছে হরিশ। বৌঠানের জন্যে ধনেখালি শাড়ি কিনেছিল, ছোটোবৌয়ের জন্যেও তাই কিনেছে। কিনতে গিয়ে সুন্দর একখানা ডুরে শাড়ি পছন্দ হ'য়ে গেল। সেখানাও কিনে নিলে মাধুরীর জন্যে। শাড়ির মোড়ক হাতে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটা কথা ভেবে আপনমনেই হাসছিল হরিশ। বৌঠান মিছে কথা বলে না। ভাইপো-ভাইঝিদের সবাইকেই ঠাকুরপো ভালোবাসে সন্দেহ নেই, কিন্তু ওই পোড়ারমুখির ওপর বেশ একটু একচোখোমি আছে। আজও বৌঠান নিশ্চয় খোঁটা দেবে।

বাড়িতে পা দিয়েই হরিশ বুঝতে পারলে, রীতিমতো একটা থম্‌থমে ভাব। কিন্তু সেটা ঝড়ের পূর্বলক্ষণ না ঝড় মিটে যাওয়ার পরের অবস্থা, তা ঠিক বুঝতে পারলে না। মা ঠাকুর ঘরে, বৌঠান রান্নাঘরে, ভাইপোরা দাদার ঘরে পড়াশোনা ক'রছে।

কাকাবাবুকে এত তাড়াতাড়ি ফিরতে দেখে মাধুরী অবাক। গালে হাত দিয়ে সে ব'ললে, ওমা, আজ হ'ল কী কাকাবাবু? সুয্যি কি পচ্চিমে উঠলো নাকি?

হরিশ হাসতে হাসতে ব'ললে, তাই তো মনে হচ্চে মধু-মা।

—আজ যখন এত তাড়াতাড়ি ফিরেচ তখন তোমাকে ছাড়চিনে। হাত-মুখ ধুয়ে জল-টল খাও, তারপর কিন্তু আমার পড়া দেখিয়ে দিতে হবে, হ্যাঁ!

—দেবো, নিশ্চয়ই দেবো। তার আগে এই নাও। তোমার তো মোটে দু'খানা শাড়ি, তাই আর একখানা নিয়ে এলুম।

মাধুরী তো আহ্‌লাদে আটখানা। একগাল হেসে শাড়িখানা সে হাতে নিলে, কিন্তু তারপরেই তার মুখখানা গম্ভীর হ'য়ে গেল। ব'ললে, তোমাকে নিয়ে আর পারিনে বাপু! এত উট্‌কো খরচার কী দরকার বলো দিকিনি? আমার তো দু'টো শাড়ি আচে, আবার এখুনি একটা আনার কী দরকার ছিল?

সস্নেহে তার ফোলা ফোলা গাল টিপে দিয়ে হরিশ ব'ললে, কী ক'রবো বলো? আমার মধু-মাকে ভারি মানাবে ব'লে পছন্দ হ'য়ে গেল যে! শাড়িটা প'রে একফাঁকে আমাকে দেখিয়ে যেয়ো কিন্তু! কেমন মানিয়েচে, দেখতে হবে তো?

—আচ্ছা বাপু, আচ্ছা।—ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে মাথা নাড়িয়ে রান্নাঘরের দিকে চ'লে গেল মাধুরী। সবচেয়ে আগে মাকে নতুন শাড়িখানা দেখাতে হবে।

নিজের ঘরে ঢুকলে হরিশ।

বিছানায় চুপ ক'রে শুয়ে আছে ছোটোবৌ। মুখখানা আষাঢ়ের মেঘের মতো থমথমে। ঘরের কোণে জ্বলন্ত পিদিমের ক্ষীণ শিখায় ঘরটাও আলো-আঁধারি।

এরকম পরিস্থিতি হরিশের অপরিচিত নয়। সুতরাং তার আশ্চর্য হওয়ারও কিছু নেই। শুধু একটা কারণেই মনটা খাবাপ হ'য়ে গেল। হাতে ক'রে শাড়িখানা এনেচে; এইরকম একটা থম্‌থমে গুমোট অবস্থার ভেতর তা হাতে তুলে দিতে হবে?

হরিশ যেন কিছুই খেয়াল করেনি সেইরকম ভাবে ব'ললে, তোমার কি শরীর ভালো নেই?

ছোটোবৌ নিরুত্তর।

একটু অপেক্ষা ক'রে তারপর ছোটোবৌয়ের কাছে এগিয়ে গেল হরিশ। মোড়ক খুলে শাড়িখানা

ছোটোবৌয়ের হাতের ওপর রেখে ব'ললে, সবাইকেই তো দেওয়া হ'য়েচে, শুধু তোমাকেই দেওয়া হয়নি। তোমার জন্যে আজ এই শাড়িখানা এনেচি।

তারপরেই নিমেষের ভেতর ব্যাপারটা ঘ'টে গেল।

দেহের সমস্ত শক্তি যেন একহাতের মুঠোর ভেতর এনে শাড়িখানা ছুঁড়ে ফেললে ছোটোবৌ। তারপর ঝর্ঝর্ ক'রে কেঁদে ফেললে।

এইবার হরিশ বিস্মিত। এর আগে ছোটোবৌকে সে কোনোদিন কাঁদতে দেখেনি। ফুলে ফুলে কাঁদছে ছোটোবৌ। তার কান্নার শব্দটা যেন বড়ো করুণ!

ছুঁড়ে ফেলা শাড়িখানার দিকে আর তাকিয়ে দেখবার অবকাশ হয়নি হরিশের। তাকালে দেখতে পেতো, তাতে সবে আগুন জ্ব'লতে শুরু ক'রেছে। শাড়িখানা সবেগে গিয়ে পিদিমের পিলসুজে ধাক্কা মেরেছিল। সেই ধাক্কায় জ্বলন্ত পলতে সমেত পিদিমটা উল্টে প'ড়েছে শাড়ির ওপর। সবটুকু তেল ছড়িয়ে গেছে। সেই তেল পেয়ে শাড়িখানা জ্ব'লে উঠেছে।

ছোটোবৌয়ের কাঁধে হাত রেখে হরিশ ডাকলে, ছোটোবৌ!

এবারে বাঁধ ভেঙে বেরোলো উচ্ছ্বসিত বন্যা। আরো ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো ছোটোবৌ। —আমার ছোঁয়া লাগলে একটা আইবুড়ো মেয়ে বাঁজা হ'য়ে যাবে! আমি এতই অপয়া? আমি আঁটকুড়ি! আমি ছেলের মা হ'তে পারিনি! ভগবান আমাকে দেননি, সে কি আমার দোষ? আমারও কি ইচ্ছে করে না, আমি মা হই? আমারও কি সাধ হয়না, কোলজোড়া ছেলে হোক আমার? আমার বুকটা যে খাঁ খাঁ করে, আমার মনটা যে পাগলের মতো হ'য়ে গেচে, তা তোমরা কী বুঝবে? তোমার মা আবার তোমাকে বে' দেবে। তাই ক'রো তুমি। তার আগে আমাকে গলা টিপে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিও—

আগুন! আগুন!

রান্নাঘর থেকে ব্যাকুলভাবে চিৎকার ক'রে উঠলে বড়োবৌ। চমকে উঠে এদিক-ওদিক তাকাতে গিয়ে হরিশ দেখলে নতুন শাড়িখানায় আগুনের শিখা তখন সবে লক্লক্ ক'রে উঠতে শুরু ক'রেছে।

এক গামলা জল ছিল হাতের কাছে। তাই নিয়ে পড়ি মরি ক'রে ছুটে এলো বড়োবৌ। ছুটে এলো ছেলেমেয়েরা। কেউ ঘটি, কেউ ডেকচি, কেউ গেলাস—হাতের কাছে যা পেয়েছে তাই নিয়ে জল ভ'রে তারা ছুটে এসেছে।

আগুন নিবলো। ঘর ভেসে গেল জলে।

রুক্মিণী জপের মালা হাতে নিয়েই ছুটে এসেছিলেন। ব্যাকুল স্বরে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, কিসে আগুন ধ'রেছিল বৌমা? কেমন ক'রে আগুন ধরলো?

বড়োবৌ কিছুই জানে না। সে শুধু আগুন দেখেই ছুটে এসেছে। এখন বুঝতে পারছে, একখানা নতুন শাড়ি। তখনো নতুন সুতোর পোড়া গন্ধ উঠছে। আর উঠছে একটু একটু ধোঁয়া।

ভাবলেশহীন কণ্ঠে হরিশ উত্তর দিলে, তোমার ছোটোবৌমার জন্যে একখানা শাড়ি কিনে এনেচিলুম। অসাবধানে আমিই পিদিমের কাছে রেখেচিলুম। কেমন ক'রে যেন আগুন ধ'রে গেচে মা!

॥ আট ॥

ক'লকাতার ইংরেজমহল বিক্ষোভে উত্তাল।

ডিসেম্বরের শেষের দিকে কোথায় ক্রিসমাসের উৎসব নিয়ে মেতে ওঠার কথা, তার বদলে কিনা প্রতিবাদ সভার আয়োজন নিয়েই তাদের ব্যস্ত থাকতে হ'ল? যে সে ব্যাপার নয়, একেবারে অধিকার রক্ষার প্রশ্ন! শ্বেতাঙ্গের বিশেষ সম্মানের প্রশ্ন তো আছেই। খোদ অ্যাংলো স্যাক্সন

রক্তের অধিকারী তারা—হার গ্রেশাস ম্যাজেস্টি কুইন ভিক্‌টোরিয়ার প্রজা। আইনের নামে ওপর এতবড়ো একটা বেআইন চাপিয়ে দিলে তারা মানবে কেন?

একে আইন বলে না, একে বলা যায় কালা কানুন—ব্ল্যাক অ্যাক্‌ট্‌।

বিরাট সভা হ'য়ে গেল টাউন হলে। ভীড় যেন উপচে প'ড়ছে। সভার উদ্যোক্তা বিখ্যাত ব্যারিস্টার মিস্টার ডিকেন্স, মিস্টার টর্টন এবং আরো কয়েকজন। সভার সমর্থক এদেশবাসী প্রায় সমস্ত ব্রিটিশ। যারা ক'লকাতা কিম্বা ধারে-কাছে থাকে তারা সবাই টাউন হলে উপস্থিত। ইংরেজ-পরিচালিত সমস্ত পত্রিকার সুর এক হ'য়ে গেছে।

আইন অবশ্য এখনো পাশ হ'য়ে যায়নি, কেবল তার খস্‌ড়া প্রস্তাব গেজেটে বেরিয়েছে। এই খস্‌ড়া যদি সত্যিই আইন হিসেবে পাশ হ'য়ে যায় তাহ'লে নেটিবদের কাছে রাজার জাত ইংরেজের সম্মান যে ধুলোয় লুটোবে! যেমন ক'রেই হোক এই কালা কানুনের প্রস্তাবকে অঙ্কুরেই পিষে থেঁৎলে দিতে হবে! ব্রিটিশেরই হাতে ব্রিটিশ আভিজাত্যের এতবড়ো অপমান মেনে নেওয়া অসম্ভব।

এই কালাকানুনের নাটের গুরু হ'ল ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন।

কেম্ব্রিজের র‍্যাংলার ব'লে লোকটা যেন মাথা কিনে নিয়েছে! এদেশে এসে তার প্রধান কাজই হ'য়েছে স্বজাত ব্রিটিশদের অপদস্থ করা। তাছাড়া আর কী?

একই সঙ্গে গবর্নর জেনারেলের কৌন্সিলের মেম্বার আর এডুকেশন কৌন্সিলের সভাপতি। কেন যে কোম্পানির কোর্ট অব্‌ ডাইরেক্‌টরেরা এইরকম একটা পাজি লোককে এদেশে পাঠিয়েছে!

নাম কেনার শখ হ'য়েছে!

নেটিব নিগারগুলো তো এরই ভেতর লোকটাকে মাথায় তুলে নাচতে আরম্ভ করেছে। সংস্কৃত কলেজের সেই পাংখাপুলারের মতো কুৎসিত-দর্শন প্রিন্সিপ্যাল বিদ্যাসাগর নামে লোকটার সঙ্গে দোস্তির শেষ নেই। দু'একজন ব্রিটিশ সিবিলিয়ান ছাড়া লোকটার সব বন্ধুই নেটিব। আরে বাপু, নেটিবদের কাছে নাম কেনার এতই যদি শখ, তাহ'লে যা ক'রছিলি তাই ক'রলেই হত? নেটিব মেয়েগুলোর জন্যে স্কুল ক'রে দিয়েছিস, তাই নিয়েই থাক। ইচ্ছে হয়, আরো দু'চারটে স্কুল খুলে দে, দু'চারটে নেটিবকে শিক্ষক ক'রে কাজে লাগিয়ে দে, তাতেই ওরা খুশি হবে। ওদের গডেস কালীর কাছে তোর নামে পুজো দেবে। তারপর আরো মাথায় ক'রে নাচবে। সে-পথ ছেড়ে দিয়ে তোর এ-দুর্মতি হ'ল কেন? আইন পালটানোর দিকে নজর প'ড়লো কেন তোর? এদেশবাসী ব্রিটিশের আলাদা ইজ্জত সই কলমের এক খোঁচায় কেড়ে নিবি? আর নেটিব নিগারদের মতো ব্রিটিশ সমাজ ভয়ে ভয়ে তা মুখ বুঁজে মেনে নেবে? ব্যাপারটা কি এতই সহজ?

চারটে আইনের খসড়া পেশ ক'রেছেন বেথুন।

কোম্পানির যাবতীয় ফৌজদারি আদালতের এক্তিয়ার থেকে শ্বেতাঙ্গদের যে স্বাভাবিক অব্যাহতি আছে, তা বিলোপ করা হবে।

হার ম্যাজেস্টির য়ুরোপীয় প্রজাদের সুযোগ-সুবিধা নির্ধারিত ক'রে দেওয়া হবে।

বিচার বিভাগের বিচারক ও কর্মিদের নিরপেক্ষ বিচারের সুযোগ দানের জন্যে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কোম্পানির আদালতে জুরি-ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হবে।

গেজেটে আইনগুলোর খসড়া প্রকাশ হ'তে না তেই হৈ হৈ প'ড়ে গিয়েছিল। এখন বিক্ষোভ তুঙ্গে। আন্দোলন চালানোর জন্যে হাজার হাজার টাকা চাঁদা উঠেছে। কেউ ব'লছে তিরিশ হাজার, কেউ ব'লছে চল্লিশ হাজার, কেউ বা ব'লছে পঞ্চাশ হাজার। যত টাকাই লাগুক জুগিয়ে যাবে তারা। গবর্নর জেনারেলের কৌন্সিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন তো চ'লবেই, সেই সঙ্গে ইংল্যান্ডেও চালিয়ে যেতে হবে জোরালো আন্দোলন।

কালাকানুনে একাকার ক'রে দেবার ষড়যন্ত্র হ'য়েছে! ব্রিটিশ আর নেটিবে কোনো তফাৎ থাকবে না? একমাত্র সুপ্রীম কোর্ট ছাড়া আর কোনো আদালতে কোনো শ্বেতাঙ্গের বিরুদ্ধে

ফৌজদারি মামলা করা যায় না—আইন নেই। শ্বেতাঙ্গের এই অধিকার তো আজকের নয়? সেই অপদার্থ নবাবী-আমলের ফৌজদারি আদালতগুলো অকেজো হ'য়ে যাওয়ার পর থেকেই এ-আইন চ'লে আসছে। ইংরেজের এই ন্যায্য মৌলিক অধিকারটার ওপরেই সবচেয়ে আগে তরোয়ালের কোপ দেবার ষড়যন্ত্র ক'রেছে বেথুন! ইংরেজদের দুর্ভাগ্য যে, বেথুনের মতো একটা কুচক্রী লোক তাদেরই স্বজাত! কে জানে, হয়তো তার নেটিব বন্ধুদের পরামর্শেই এমন একটা অপমানজনক উদ্ভট আইন-সংস্কারের বদ মতলব তার মাথায় এসেছে!

আইন-সংস্কারের নামে কতবড়ো একটা অবিচার চাপিয়ে দেওয়ার ফন্দি!

সামান্য আত্মসম্ভ্রমবোধও যার আছে, সেরকম কোনো ব্রিটিশ-ই এই কালাকানুনকে মেনে নিতে পারে না! জেলা আদালতে, মহকুমা আদালতে নেটিবদের সঙ্গে শ্বেতাঙ্গের-ও বিচার হ'তে পারবে? এই চূড়ান্ত অপমান মেনে নিয়ে বাস ক'রতে হবে কোম্পানির রাজত্বে?

টাউনহলের সভার পর আন্দোলন বেশ দানা বেঁধে উঠেছে। ইংলিশম্যান, হরকরা, ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়ায় প্রতিদিন হচ্ছে বেথুনের মুণ্ডপাত। ঠাট্টা, বিদ্রূপ, ইতর গালিগালাজ—কিছুই বাদ নেই।

নতুন আইন-সংস্কারের খসড়াটা কৌন্সিলে পেশ করা হ'লেও যাঁকে পরামর্শ দেওয়ার জন্যেই কৌন্সিলের অস্তিত্ব, সেই গবর্নর জেনারেলের ওপর কিন্তু শ্বেতাঙ্গদের তেমন কিছু ক্ষোভ নেই। লর্ড হার্ডিঞ্জের পর এই বছর তিনেক হ'ল, গবর্নর জেনারেল হ'য়ে এসেছেন লর্ড ডালহৌসি। তিনি যে ব্যক্তিগতভাবে ব্রিটিশদের স্বার্থ এবং সম্মান সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন, সে-বিশ্বাস তাদের আছে। দায়িত্ব নিয়ে এদেশে এসেই তার নিদর্শন তিনি দেখিয়েছেন। পাঞ্জাবের শিখদের একেবারে নাস্তানাবুদ ক'রে দিয়ে গোটা পাঞ্জাবকেই দখলে এনে ফেলেছেন লর্ড ডালহৌসি। ডক্‌ট্রিন অব্ ল্যাপ্‌স্‌কে ঠিকমতো কাজে লাগিয়ে পশ্চিমভারতের সামন্তরাজ্য সাতারা আর সম্বলপুরের রাজপ্রাসাদের চূড়োয় উড়িয়েছেন পবিত্র ইউনিয়ন জ্যাক।

সেইজন্যেই আশ্চর্য লাগে, তাঁর মতো গবর্নর জেনারেলের কাছাকাছি বেথুনের মতো একটা কুগ্রহ রয়েছে কেন? আর লর্ড ডালহৌসিই বা লোকটাকে এত প্রশ্রয় দিয়ে চ'লেছেন কেন? তাঁকে বোঝাতে হবে। ইংল্যাণ্ডে পার্লামেন্টের সদস্যদের বোঝাতে হবে! এই কালাকানুন তুলে নিতে বাধ্য ক'রতে হবে সরকারকে। সেইজন্যেই তো আন্দোলন!

সেদিন ছুটির পর হরিশ ব'ললে, চলো গিরীশ, আজ তোমাদের পাড়ার দিকে যাবো।

—ডফ্ সাহেবের লেক্‌চর আছে নাকি আজ?

—হ্যাঁ। চলো হাঁটতে হাঁটতে যাওয়া যাক।

—চলো।

আপিস ছুটির পর গিরীশ ভাগে-ভাড়ার ছক্কোরগাড়িতে বাড়ি ফেরে। কিন্তু হরিশকে গাড়িতে ওঠানো যাবে না, তা সে ভালো ক'রেই জানে। অগত্যা হরিশের সঙ্গে চিৎপুর রোড ধ'রে হাঁটতে আরম্ভ ক'রলে।

কিছুক্ষণ হাঁটার পর গিরীশ ব'ললে, ডফ্ সাহেবের লেক্‌চর শুনে আনন্দ পাও, তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু এটা কি তুমি ভালো ক'রচো হরিশ?

—কোনটা?

—এই যে সাত সকালে কোনোমতে দু'টো নাকে-মুখে গুঁজে আপিসে আসো, তারপর সারাদিন তো পেটে কিছু পড়ে না। লেক্‌চর শুনে তো সেই আবার হাঁটতে হাঁটতে দুপুর রাতে বাড়ি ফিরবে। শরীরের ওপর একটু বেশি অত্যাচার হ'য়ে যাচ্ছে নাকি?

হো হো ক'রে হেসে উঠলে হরিশ।—ওহে বাপু, এতো আর সিমলের ঘোষবাড়ির দুধ-ঘি-মাখনে তৈরি গোপালের শরীর নয়, এ হ'ল খাঁটি নৈকষ্য কুলীনের ব্রহ্মতেজে তৈরি শরীর। ছেলেবেলা থেকে না-খাওয়ার অভ্যেসটাই বেশি। তুমি তো এখন দেখচো হে। টলা কোম্পানিতে কাজ করবার সময় প্রথম বছর তিনেক যে মাঝে মাঝে ডফ্ সাহেবের লেকচর শুনতে হেদুয়ায় আসতুম,

তখন তো ব'লতে গেলে সকালেও পেটে কিছু পড়তো না। ও'দের চার্চের ঝগড়াঝাটির পর ডফ্ সাহেব যখন ফ্রি চার্চ দলের হ'য়ে নিমতলা পাড়ায় চ'লে এলেন, তারপরেও এয়েচি। সেই জের এখনো চ'লচে।

গিরীশ ব'ললে, শুনেচি, ডফ্ সাহেব নাকি শীগ্‌গিরই আবার হেদুয়ায় ফিরে যাবেন।

—গেলে যাবেন। আমিও তখন চিৎপুর রোডের বদলে পুরনো রাস্তা ধ'রবো।

—ডফ্ সাহেবের লেক্‌চর শোনার জন্যে তোমার এত আগ্রহ কেন? জর্ডনের জল মাথায় নেবার ইচ্ছে আছে নাকি?

—এখন পর্যন্ত তেমন কোনো সম্ভাবনা দেখচিনে। তবে হ্যাঁ, হিন্দু বামুনের ছেলে হ'য়েও ব'লচি, তেত্রিশ কোটি দেবতার পুজো আমার ভালো লাগে না। ঈশ্বর যদি কেউ থাকেন, তিনি এক এবং অদ্বিতীয়।

—সে তো ব্রাহ্মরাও ব'লচেন।

—উপনিষদের ওপর ভিত্তি ক'রেই ব্রাহ্মধর্ম। সুতরাং একেশ্বরবাদ হিন্দুধর্মেও আছে গিরীশ। তার জন্যে জর্ডনের জল মাথায় নিয়ে একটা চমক সৃষ্টি ক'রে বিখ্যাত হওয়ার কোনো বাসনাই আমার নেই। আমি তো ডফ্ সাহেবের ধর্মব্যাখ্যা শুনতে যাইনে, আমি যাই অন্য কারণে। তাঁর দর্শন আর মনোবিজ্ঞানের আলোচনা আমার ভালো লাগে।

—তারপর সেই ভালো-লাগার খেসারৎ দেওয়ার জন্যে রাতদুপুরে নিমতলা থেকে হাঁটতে হাঁটতে ভবানীপুর?

হরিশ এবার হেসে ব'ললে, তুমিতো এরই ভেতর ঘেমে উঠেচ দেখচি। হাঁটতে কষ্ট হচ্চে নাকি?

বিব্রতভাবে গিরীশ ব'ললে, না, না কষ্ট হবে কেন? মানুষের সব রকম অভ্যেসই থাকা উচিত।

—মানুষের ব'লো না, বোলো নেটিবদের সবরকম অভ্যেসই থাকা উচিত। তোমাকে কেন হাঁটাচ্চি জানো? আজ ক'দিন ধ'রে একটা বিষয় আমার মনের ভেতর আথালি-পাথালি ক'রচে, অথচ সেটা নিয়ে একটু মন খুলে কথা বলবার অবকাশ পাচ্চিনে। গোরাদের ব্ল্যাক আক্‌ট্ মুভ্‌মেন্টের চেহারাটা লক্ষ্য ক'রেচ?

—ক'রেচি বৈ কি! দেখচি আর ভাবচি, আমরা কত অসহায়!

—আমরা আসলে অসহায় না নির্ঝন্‌ঝাটে থাকার জন্যে অসহায়তার ভান ক'রচি, সেইটেই আমি বুঝতে পারচি নে।

—আমাদের করবার কী আছে?

—করবার অনেক কিছুই আছে। তুমি দ্যাখো, ব্রিটিশদের সবগুলো পত্র-পত্রিকা একসুরে সুর মিলিয়েচে। তারা সবাই মিলে বেথুন সাহেবকে নোংরাভাবে আক্রমণ ক'রে এতবড়ো একটা অন্যায়কে জীইয়ে রাখার জন্যে উঠে প'ড়ে লেগেচে। অথচ আমরা নির্বিকার। বাঙালির পত্র-পত্রিকা যা দু'চারখানা আছে তারা সবাই নীরব! যেন কিছুই হয়নি!

গিরীশ ব'ললে, হয়তো ভয় পাচ্চে।

হরিশ উত্তেজিতভাবে ব'ললে, 'হয়তো' নয় গিরীশ, সত্যিই ভয় পাচ্চে। তোমাকে নাম ব'লচিনে, ব্ল্যাক আক্‌ট্ মুভমেন্টের নোংরামিটা দেখিয়ে এক দিশি পত্রিকার এডিটরকে আমি একটা নিবন্ধ দিয়েচিলুম, তিনি খুব সুন্দর কৌশলে পাশ কাটিয়ে গিয়ে সেটা আমাকে ফেরত দিয়েচেন। ঘেন্নায় ইংলিশম্যান কাগজে লেখা আমি বন্ধ ক'রে দিয়েচি।

গিরীশ ব'ললে, যতদূর শুনেচি, বেথুন সাহেবের সমর্থনে রামগোপাল ঘোষ বোধ হয় একটা কিছু লিখচেন।

হরিশ ভীষণভাবে উত্তেজিত হ'য়ে ব'ললে, চমৎকার! একা রামগোপাল ঘোষের ওপর সব দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে আমরা আর সবাই নিরাপদ্ন দূরত্বে দাঁড়িয়ে থাকবো? ইংরেজরা আন্দোলন

ক'রে জিতে গেলে আমরা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে কুর্নিশ ক'রে ব'লবো, আমরা তো তোমাদের জয়ের জন্যেই নারায়ণকে রোজ তুলসী দিয়েচি সাহেব! আবার রামগোপালের জয় হলে অমনি তাঁকে গিয়ে ব'লবো, আমাদের একান্ত সমর্থন আপনারই পেছনে ছিল স্যার!

হরিশের দিকে তাকিয়ে গিরীশের মুখে সেই মুহূর্তে কোনো কথা জোগালো না। এর আগে হরিশের এত উত্তেজিত চেহারা সে দেখেনি।

—উঃ গিরীশ, এই সময় আমাদের নিজস্ব একটা পত্রিকা যদি থাকতো! তাহ'লে ওই ব্যারিস্টার ডিকেন্স আর টর্টনের দলকে বুঝিয়ে দিতুম, ওরা যে গাজোয়ারি বেআইনি আইনটাকে জীইয়ে রাখার জন্যে মরীয়া হ'য়ে উঠেচে, সেইটেই আসলে কতখানি বীভৎস কালা আইন। মফস্বলের আদালতকে কেয়ার ক'রতে হয় না ব'লে বাঙলাদেশের জেলায় জেলায়, গ্রামে গ্রামে কি তাণ্ডব ওরা চালিয়ে যাচ্চে! তোমার আমার জন্মের আগে থেকে নীলকরদের অত্যাচারে গরীব চাষী রায়ত কেবল চোখের জলই ফেলে আসচে! সাহেবদের নামে নালিশ করবার আইন যে নেই!

উত্তেজনার তীব্রতায় হাঁপাতে লাগলো হরিশ।

গিরীশ ব'ললে, গত বছর-ই নীলকরদের অত্যাচার সম্বন্ধে ক্যালকাটা রিভিউতে কিছু বিবরণ বেরিয়েছিল।

—আমি প'ড়েচি। সে কিছুই নয় গিরীশ, কিছুই নয়! একটা বিরাট বিকট দানোর হাতের আঙুলের একটা করকে এক লহমার জন্যে দেখানো মাত্র! কর্নেল চ্যাম্প্নিজের লাইব্রেরিতে নদীয়া, যশোর, চব্বিশ-পরগণা, মুর্শিদাবাদ, পাবনার ডিস্ট্রিকট গেজেটিয়ারগুলো আমি প'ড়েচি। তাওতো সেখানে অনেক কিছুই রেখেঢেকে লেখা হ'য়েচে। কিন্তু তাই প'ড়েই আমি শিউরে উঠেচি। আচ্ছা গিরীশ, তুমি তো কৈলাস বোসের সঙ্গে মিলে একটা পত্রিকা ক'রেচিলে? কত টাকার দরকার হতে পারে বলোতো?

গিরীশ ব'ললে, অনেক। এখন সে-চিন্তা আকাশ-কুসুম।

হরিশের উত্তেজিত মুখে ফুটে উঠ্লো একটু হাসি। ব'ললে, ছেলেবেলায় এক মাতাল গোরাকে ঠেঙিয়ে হাতে-খড়ি হ'য়েছিল। এখন এই দাঁতাল গোরাগুলোকে একবার ঠেঙাতে পাবলে একটু মনের সুখ হত!

গিরীশ বিস্মিত হ'য়ে ব'ললে, তুমি গোরা ঠেঙিয়েচ! তার মানে, হাতাহাতি ক'রেচ?

হরিশ হেসেই ব'ললে, হাতাহাতি আর হ'ল কোথায়—শুধুই হাতা। সে বেচারা আর হাতি করবার সুযোগ পায়নি।

ইউনিয়ন স্কুলের সেই ঘটনা বেশ রসিয়ে রসিয়ে ব'ললে হরিশ। রেভারেণ্ড পিফার্ডের প্রসঙ্গ আসতেই কিন্তু শ্রদ্ধায় আবেগে গলা ধ'রে এলো তাব। ব'ললে, ফাদার পিফার্ডও ব্রিটিশ ছিলেন গিরীশ, বেথুন সাহেবও ব্রিটিশ। হেয়ার সাহেব স্কচ হ'লেও আমাদের চোখে তো সেই ধলা আদমি! কিন্তু তাঁদের সঙ্গে এই ব্যারিস্টার ডিকেন্স, টর্টনের মতো লোকগুলোর কি দুস্তর ব্যবধান! এরা শিক্ষিত ব্যারিস্টার হ'য়ে টৌন হলের মিটিঙে বেথুন সাহেবকে যে ভাষায় গালিগালাজ দিয়েচে সে ভাষা আমাদের খেউড়-আখড়াইয়ের ভাষাকেও লজ্জা দেয়!

কথা ব'লতে ব'লতে কোম্পানির বাগান এসে গেছে। এবারে হরিশকে ঘুরতে হবে বাঁ দিকে ডাফ সাহেবের নতুন কলেজের দিকে।

গিরীশ ব'ললে, ওই যাঃ, মনে মনে ভেবে রেখেচিলুম, জোড়াসাঁকো থেকে কোণাকুণি রামবাগানের ভেতর দিয়ে পথ-সংক্ষেপ ক'রে তোমাকে নিয়ে সোজাসুজি বাড়ি যাবো, তোমার গল্পে মশগুল হ'য়ে সেটা একেবারে ভুলে গেচি।

হরিশ হেসে ব'ললে, তোমার খেয়াল থাকলেও আমার পাল্লায় প'ড়ে সেটা আর হ'ত না হে!

—কেন?

—কোণাকুণি মেরে পথ-সংক্ষেপ করা হরিশ মুখুজ্যের কুষ্ঠিতে নেই হে। আমার সঙ্গে চ'লতে হ'লে একেবারে নাক বরাবর সিধে পথ।

গিরীশ ব'ললে, তাই সই বাপু। এখান থেকে আমার বাড়িতো নাকবরাবর সিধে পথেই প'ড়বে? শুধু বাঁদিকে না ঘুরে ডানদিকে ঘুরতে হবে, এই যা তফাৎ। চলো, যাহোক একটু জল খেয়ে তারপর জ্ঞানার্জনে আসবে। লেক্‌চরের এখনো বেশ কিছু সময় বাকি আছে। আমার বাড়ি থেকে ডফ সাহেবের ডেরায় পেঁছিতে তোমার পাঁচ মিনিটও লাগবে না। চলো।—

হরিশ ব'ললে, বামুনকে যখন ফলারের লোভ দেখাচ্চো তখন সেটা প্রত্যাখ্যান করা শাস্ত্রমতে অন্যায়। তোমার বাড়িতে সেই যে একদিন বৌমার হাতের লুচি আর মোহনভোগ খেয়েছিলুম, এক কথায় অপূর্ব!

—বেশ তো, তুমি সেই পাকা ফলার-ই পাবে। তোমার মুখ থেকে অত উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শোনার পর থেকে তোমার বৌমা-ও যথেষ্ট উৎসাহিত হ'য়ে আচেন। তাঁকে একবার ব'ললেই হ'ল। পনেরো মিনিটের ভেতর পাকা ফলার তোমার সামনে এসে হাজির হবে!

হরিশ বললে, বৌমা চির-এয়োতি হোন! এরপরেও না গেলে গেরস্তের অকল্যাণ করা হয়। চলো—

কয়েকমাস পরেই আগুনে যেন ঘি প'ড়লো।

ইংরেজরা যাকে ব্ল্যাক আক্‌ট্‌ ব'লে তারস্বরে গলা ফাটিয়েছে, তারই সমর্থনে রামগোপাল ঘোষের পুস্তিকা। ইংরেজদের কদর্য অন্যায় আর অশালীন আবদারকে তীব্রভা ধিক্কার দিয়েছেন রামগোপাল।

গভীর রাত।

বিভোর হ'য়ে রামগোপালের লেখা প'ড়ে চ'লেছে হরিশ। তার বুকের ভেতর রক্তস্রোত দ্বিগুণ ভাবে বইছে।

হ্যাঁ, এদেশেব মান বাঁচিয়েছেন রামগোপাল!

অর্থপিশাচ, ধূর্ত, কপট, অত্যাচারী শ্বেতাঙ্গদের কোনো দুনী নিদর্শনই উল্লেখ ক'রতে তিনি ভোলেননি। অর্ধশতাব্দী ধ'রে বাঙলাদেশের গ্রাম-গ্রামান্তরে নীলচাষকে উপলক্ষ্য ক'রে এদেশের অসহায় গরীব রায়তদের ওপর নীলকর সাহেবেরা যে অমানুষিক অত্যাচার ক'রে আসছে, তার কিছু ছবি যেমন দিয়েছেন, তেমনি প্রচলিত আইনে তাদের নিরঙ্কুশ ক্ষমতার পরিণাম যে আরো কতখানি ভয়াবহ হ'য়ে উঠতে পারে, তার ইঙ্গিত-ও স্পষ্টভাবেই দিয়েছেন। তারা রায়তের ঘর জ্বালিয়ে দিক, ফসল কেড়ে নিক, ঘরের বৌঝিদের জোর ক'রে নীলকুঠিতে ধ'রে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করুক—তার প্রতিকার নেই। জেলা সদর কিম্বা মহকুমা আদালতে তাদের নামে নালিশ করা যাবে না। কারণ তারা ব্রিটিশ আইনের প্রজা, কোম্পানির আইন-আদালত তাদের স্পর্শ ক'রতে পারে না। এরই নাম আইন, এরই নাম সভ্য, শিক্ষিত শ্বেতাঙ্গের আইন শৃঙ্খলা! নেটিব নিগারদের সব সময় মনে রাখতে হবে, শ্বেতাঙ্গেরা উন্নত সভ্যতায় অভ্যস্ত মানুষ। যে আইনে এদেশের অশিক্ষিত, বর্বর নেটিবদের বিচার হয়, ... সে আইনের উর্ধ্বে।

অস্থিরভাবে ঘরের ভেতরেই কিছুক্ষণ পায়চারি ক'রলে হরিশ। ছোটোবৌ কখন ঘুমিয়ে প'ড়েছে। মোমবাতিটা ফুরিয়ে এসেছে। আর একটা মোমবাতি জেবলে আবার চেয়ারে গিয়ে ব'সলে হরিশ। দ্রুত হাতে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্‌টে একটা জায়গায় এসে থামলে।

স্যার এডোয়ার্ড রায়ানের অভিমত!

একদা কলকাতা সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এডোয়ার্ড রায়ান স্পষ্টভাবে ব'লেছেন, ভারতবর্ষের গ্রাম-গ্রামাঞ্চলের সর্বস্তরের শ্বেতাঙ্গ এবং নেটিবদের যদি একই আইন আর বিচার-ব্যবস্থার অধীনে না আনা হয় তাহ'লে সমস্ত বিচারব্যবস্থাই একটা বিরাট প্রহসনে পরিণত হবে।

আজ থেকে বাইশ বছর আগে এই স্পষ্ট অভিমত জানিয়ে দিয়ে গেছেন একজন নিরপেক্ষ, দূরদর্শী ব্রিটিশ বিচারপতি।

এ প্রহসন যে কতবড়ো সত্য, তা নিপুণভাবে বিশ্লেষণ ক'রেছেন রামগোপাল। এডোয়ার্ড রায়ান ব'লেছেন, শ্বেতাঙ্গ জমিদার অথবা নীলকর যদি কোনো রায়তের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়, মেরে পিঠের মেরুদণ্ড ভেঙে দেয় কিম্বা চোখের সামনে মেয়েদের ইজ্জৎ নষ্ট করে তবু সেই শ্বেতাঙ্গের বিরুদ্ধে জেলা সদর আদালতে নালিশ জানানোর অধিকার নেই হতভাগ্য নেটিব রায়তের। নালিশ যদি ক'রতেই হয়, তাহ'লে তাকে ছুটতে হবে ক'লকাতার সুপ্রীম কোর্টে—যেখানে আইন আলাদা, ভাষা ইংরিজি এবং সে-বেচারার ওপর সহানুভূতি জানানোর কেউ যেখানে নেই!

বইখানা রেখে অস্থির উত্তেজনায় আবার পায়চারি ক'রতে লাগলো হরিশ। বিচারের নামে এই মর্মান্তিক প্রহসনকে টিকিয়ে রাখার জন্যে সংঘবদ্ধ হয়েছে গর্বোদ্ধত ইংরেজের দল। যে আইন গাঢ় কালিমালিপ্ত, সেই আইন সংশোধনের নামেই তারা ক্রোধে দিশেহারা হ'য়ে প'ড়েছে। তাদের হ'য়ে দরবার করবার জন্যে ব্যারিস্টার মিস্টার টর্টন রওনা হ'য়ে গেছেন ইংল্যাণ্ডে। নির্লজ্জতার কি রমণীয় নিদর্শন!

লর্ড এলেনবরা নারকীয় হত্যাকাণ্ড চালিয়েছেন কাবুলে। গায়ের জোরে দখল ক'রেছিলেন সিন্ধু প্রদেশ। গর্বভরে ব'লেছিলেন, আমরা তরোয়ালের জোরে ভারত-সাম্রাজ্য অধিকার ক'রেছি, তরোয়ালের জোরেই সে-সাম্রাজ্য দখলে রাখবো!

কিন্তু ব্ল্যাক অ্যাক্ট্ আন্দোলনের এই নির্লজ্জতা যে এলেনবরার ঔদ্ধত্যকেও ছাপিয়ে গেছে! এদেরই দেশে জন্মেছিলেন চসার, পোপ, ড্রাইডেন, মিলটন, শেক্স্পীয়র! এরাই গীর্জায় গির্জায় পরম করুণাময় যীশুর গুণগান করে; প্রার্থনা করে, তাদের জীবন ভ'রে উঠুক পবিত্র আনন্দ আর প্রেমের স্নিগ্ধ ধারায়?

রাত তিনটে বেজে গেল।

সদর দেওয়ানি আদালতের পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং ঢং ক'রে তিনটে ঘন্টা প'ড়লো।

হয়তো ঘুম আর আসবে না। তবু একটু শুয়ে নেওয়া দরকার। ফুঁ দিয়ে বাতিটা নিবিয়ে বিছানার দিকে এগিয়ে গেল হরিশ।

তাকেও যে এবার এগিয়ে যেতে হবে! কিন্তু কিভাবে? কোন্ পথে?

এবার তাকে আইন প'ড়তে হবে। ব্রিটিশ আইন আর কোম্পানির আলাদা আইনের রহস্য তাকে জানতেই হবে!

ঘুম আসছে না। মাথার ভেতর দপ্ দপ্ ক'রছে।

আদালতের পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে চারটে বাজলো। নাঃ, আজ রাতে আর ঘুম হবে না। একটু পরেই তো ফুটে উঠ্বে ভোরের আলো।

॥ নয় ॥

একটা চলতি কথা আছে, শঙ্খচূড় সাপ ছোবল নাকি মাথার ওপরেই মারে। ছোটোবৌ প্রায় তাইই ক'রেছে। মাথায় না মেরে ছোবল মেরেছে হরিশের বুকে। মোক্ষদার স্মৃতিকে কেন্দ্র ক'রে তার মনের কোণে যে জায়গাটা সবচেয়ে বেশি দুর্বল, ঠিক সেই জায়গাকেই ক্ষতবিক্ষত ক'রে উগ্র বিষ ঢেলে দেবার জন্যে সেদিন যেন মরীয়া হ'য়ে উঠলে ছোটোবৌ। মোক্ষদার স্মৃতি জড়িয়ে আছে, এমন একগাছা কুটোও ঘরে রাখতে সে রাজি নয়।

ছুটির দিন। সকাল ন'টা।

হিন্দু ইন্টেলিজেন্সারের জন্যে একটা প্রবন্ধ আধাআধি লেখা হ'য়েছিল। সেটা সম্পূর্ণ ক'রে রেখে একবার শম্ভুনাথের বাড়ি ঘুরে আসার কথা ভেবে রেখেছে হরিশ। আইনের দু'টো একটা খুঁটিনাটি নিয়ে তার সঙ্গে একবার আলোচনা করা দরকার।

কাগজ কলম নিয়ে সবে বসেছে হরিশ, এমন সময় মাধুরীর আগমন।

কাকাবাবুর হাতে কলম দেখে একটু দূরে সে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো। এ-সময় কোনো কথা ব'ললে কাকাবাবুর খুব বিরক্তি হয়, তা সে জানে।

—কী আদেশ মধু-মা?

কাকাবাবু নিজে যেচে কথা ব'লতেই সাহস পেয়ে গেল মাধুরী। ব'ললে, আমার হাতের লেখার কাগজ ফুরিয়ে গেচে।

—এই কথা?

সহাস্যে হরিশ ব'ললে, ছেলে এত লিখচে আর মায়ের লেখার কাগজ ফুরিয়ে যাবে, এটা একটা কথা হ'ল? কাগজ তুমি এখুনি পাবে। কিন্তু তার আগে বলো কদ্দুর এগিয়েচ?

সোৎসাহে মাধুরী ব'ললে, সংযুক্ত বর্ণ আমিতো এখন ভালোই লিখতে পড়তে পারি। দ্বিতীয়ভাগ প্রায় শেষ হ'য়ে এলো!

—তাই নাকি, বাঃ! তুমি তো তবে সুন্দর এগিয়েচ!

এইবার স্বমূর্তি ধ'রলে মাধুরী। ব'ললে, আহা, তুমি ভারী খোঁজ রাখো! তোমার তো সময়ই হয় না। শুধু বই কিনে দিয়েই খালাশ! বাবা আর দাদাদেব সাধ্যিসাধনা ক'রে তবে আমি যেটুকু করবার ক'রেচি!

দ্বিতীয়ভাগ ব'লতে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের শিশুশিক্ষা দ্বিতীয় ভাগ। বেথুন সাহেবের ফিমেল স্কুল আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মদনমোহন তাঁর দুই মেয়ে ভুবনমালা আর কুন্দমালাকে সেখানে পড়তে পাঠিয়েছেন। বাঙলা শেখার মতো কোনো শিশুপাঠ্য বই নেই ব'লে তিনি কয়েক-মাসের ভেতরেই শিশুশিক্ষা লিখে ছেপেছিলেন। তার প্রথম ভাগ আর দ্বিতীয়ভাগ মাধুরীকে কিনে দিয়েছে হরিশ। তৃতীয় ভাগও নাকি শিগ্‌গিরই বেরোবে। মাধুরী আগেই ব'লে রেখেছে, তৃতীয় ভাগ বেরোলেই কিনে দিতে হবে। তা নইলে দ্বিতীয় ভাগ শেষ ক'রে সে হাঁ ক'রে ব'সে থাকতে পারবে না।

হরিশ ব'ললে, তুমি রাগ ক'রো না মধু-মা। আজ ওবেলা আমার হাতে তেমন কোনো কাজ নেই, ওবেলা তোমাকে নিয়ে ব'সবো। কাগজ এখুনি দিচ্চি, কিন্তু প্রথম ভাগের সেই পদ্যটা মুখস্ত আছে কিনা একবার পরীক্ষা দাও তো!

ঠোঁট উলটে মাধুরী ব'ললে, এই কথা? —ব'লেই সে গড়গড় ক'রে আওড়াতে লাগলো,—

পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল।
কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল॥
রাখাল গরুর পাল, লয়ে যায় মাঠে।
শিশুগণ দেয় মন, নিজ নিজ পাঠে॥
ফুটিল মালতী ফুল, সৌরভ ছুটিল।
পরিমল লোভে অলি, আসিয়া জুটিল॥
গগনে উঠিল রবি, লোহিত বরণ।
আলোক পাইয়া লোক—

—থাক্ থাক্ ঠিক আছে। পরীক্ষা পাশ! শুধু পাশ নয়, একশোর ভেতর পুরো একশো। দাঁড়াও, তোমাকে কাগজ দিচ্চি, ওবেলা আগে তোমাকে পড়িয়ে তারপর অন্য কাজ!

টেবিলের এককোণে চাপা দিয়ে জড়ো ক'রে রাখা কিছু কাগজ টেনে বের ক'রলে হরিশ। তার ভেতর থেকে মাধুরীর জন্যে কয়েকখানা কাগজ বের ক'রে দিতে গিয়ে হঠাৎ কয়েক মুহূর্তের জন্যে যেন অসাড় হ'য়ে গেল; একটা প্রচণ্ড আকস্মিক আলোড়নে বুকের ভেতরটা কেমন যেন ক'রতে লাগলো।

শ্রীমতী মোক্ষদাসুন্দরী দেব্যা।

সাকিম চাউল পটি ভবানীপুর মুকুজ্যাবাটী।

চার-পাঁচখানা কাগজ ভাঁজ ক'রে বেঁধে-দেওয়া একখানা খাতা। বিবর্ণ কাগজের ওপর মোক্ষদার নিজের হাতের গোটা গোটা কাঁচা লেখার অক্ষরগুলো এখনো বেঁচে আছে!

হরিশই গোপনে গোপনে অক্ষর পরিচয় করিয়েছিল মোক্ষদাকে। তুলট কাগজে এ-খাতা তারই হাতে বাঁধা!

পাশে, যে মাধুরী দাঁড়িয়ে আছে, তাও ভুলে গেল হরিশ। খাতা খুলে একটার পর একটা পৃষ্ঠা সে উল্‌টে যেতে লাগলো। মনে প'ড়ছে, অক্ষর পরিচয় হ'য়ে যাওয়ার পর এ-খাতাখানা সযত্নে সে বেঁধে দিয়েছিল মোক্ষদাকে। প্রথম কয়েকটা পৃষ্ঠায় এলোমেলো অসংলগ্ন কয়েকটা কথা লেখা রয়েছে,—কদমগাছ, বেণে বৌ, আমের বোল, দোয়েল, ওতোর পাড়া, কুলের আচার ইত্যাদি। একটা পৃষ্ঠায় শুধু এইটুকুই লেখা, আমাদের খোকা খুব বড় পণ্ডিত হবে। তারপরের পৃষ্ঠাগুলো ফাঁকা-ই রয়ে গেছে।

জানালার কপাট খুললে দেখা যায়, এমন একটা জায়গায় ছোট্ট একটা কদমগাছের চারা নিজের হাতে পুঁতেছিল মোক্ষদা। সেই গাছটা এখন কত বড়ো হ'য়ে গেছে! জানালা দিয়ে একবার বাইরের দিকে তাকালে হরিশ।

মাধুরী এতক্ষণ ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে কাকাবাবুকে দেখছিল। অনেকক্ষণ হ'য়ে গেছে। আর কতক্ষণ সে চুপ ক'রে থাকবে?

উস্‌খুস্ ক'রে মাধুরী ব'ললে, ওটা কিসের খাতা কাকাবাবু?

অন্যমনস্কভাবে হরিশ ব'ললে, সে তুমি বুঝবে না মধু-মা। এটা আমার একটা দরকারি খাতা। হারিয়ে গিয়েচিল, খুঁজে পাচ্ছিলুম না। এটা আগে তোরঙ্গে তুলে রেখে তারপর তোমাকে কাগজ দিচ্চি, কেমন?

কোঁচার খুঁটে বারবার ক'রে খাতার ধুলো মুছতে লাগলো হরিশ। সেইসময় ঘরে ঢুকলে ছোটোবৌ। স্নান ক'রতে যাবে ব'লে সে শাড়ি নিতে এসেছে।

খাতাখানা মুছে আর একখানা কাগজে মুড়ে খাটের তলা থেকে মোক্ষদার তোরঙ্গটা টেনে বের ক'রলে হরিশ। তার শাড়ি, আয়না, চিরুণি সব এখনো সেই তোরঙ্গেই প'ড়ে রয়েছে।

তোরঙ্গটা আবার খাটের তলায় ঢুকিয়ে দিয়ে টেবিলের কাছে ফিরে এলো হরিশ। মাধুরীর হাতে কয়েকখানা কাগজ দিয়ে ব'ললে, খাতাখানা নিজে বেঁধে নাওগে, কেমন?

মাথা নেড়ে কাগজ নিয়ে চ'লে গেল মাধুরী।

—সাধের তোরঙ্গে অত যতন ক'রে কী রাখা হ'ল শুনি?

নির্লিপ্ত হরিশ ব'ললে, তোমার দরকারি কিছু নয়। তুমি তোমার কাজে যাও।

হরিশ আবার লেখায় মন দিলে।

একটু পরেই পেছনদিকে একটা শব্দ শুনে সে ফিরে তাকালে।

খাটের তলা থেকে তোরঙ্গটা টেনে বের ক'রে তার ডালা খুলে ফেলেছে ছোটোবৌ। তার হাতে সেই খাতা!

চিৎকার ক'রে উঠলে হরিশ, কী ক'রচো? ওটাকে টেনে বের ক'রেচো কেন?

ছোটোবৌয়ের চোখ দুটো জ্বলছে।

—আগে বলো, এটা কী?

—ওটা যাই হোক, তুমি রেখে দাও।

—না, রাখবো না। আমি কচি খুকি নই! সেই মাগীকে নেকাপড়া শেখানো হত, তাই না? অ্যাদ্দিন পরে বুঝি নাগরীর নেকা খুঁজে পেয়েচ? এই রাখো তোমার নাগরীর সিঁতিচিন্ন!

দ্রুতহাতে খাতাখানা ছিঁড়তে লাগলো ছোটোবৌ।

হতভম্ব অবস্থায় প্রথম কয়েকমুহূর্ত কেটে যাওয়ার পর চেয়ার থেকে উঠে হরিশ যখন তার

কাছে ছুটে গেল তখন কাগজের টুক্‌রোগুলোকে দু'পায়ে দ'লে পিষে তোরঙ্গ থেকে মোক্ষদার সবচেয়ে প্রিয় ঢাকাই শাড়িখানা তুলে নিয়ে ছিঁড়তে উদ্যত হ'য়েছে ছোটোবৌ। পাগলের মতো ঝাঁপিয়ে প'ড়ে তার হাত চেপে ধ'রলে হরিশ। মট্‌ ক'রে ভেঙে গেল ছোটোবৌয়ের হাতের শাঁখা। কিন্তু তার আগেই আঁচলের দিক থেকে শাড়িখানা দু'তিন হাত পর্যন্ত ছিঁড়ে ফালা হ'য়ে গেছে।

সেই মুহূর্তে চোখের জল সামলাতে পারেনি হরিশ।

ক'কিয়ে কেঁদে উঠলে ছোটোবৌ। হরিশের হাতের কঠোর কর্কশ চাপে তার কব্‌জি টন্‌ টন্‌ ক'রে উঠেছে।

মেঝের ওপর ব'সে প'ড়ে হাউ হাউ ক'রে কাঁদতে লাগলো ছোটোবৌ।—সোয়ামি হ'য়ে নিজের বে' করা পরিবারের হাতের শাঁখা তুমি ভেঙে দিলে!

কাঁপতে কাঁপতে ছোটোবৌয়ের দিকে একবার শুধু তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল হরিশ। তার আগে দেরাজ থেকে টাকার গেঁজেটা বের ক'রে নিলে।

কিছু একটা হ'য়েছে অনুমান ক'রে দাওয়া থেকে রুক্মিণী ব'ললেন, অ হরিশ, এই অসময়ে কোথায় চ'ললি বাবা?

মায়ের কথারও কোনো উত্তর হরিশ দিলে না।

সারাদিনটা ঘুরে ঘুরেই কেটেছে। বিরাগ, বিতৃষ্ণা আর দুঃসহ বেদনার মিশ্রণে মনের ভেতরে যে একটা উত্তাল মন্থন চ'লছে! এই মন নিয়ে কোথায় যাবে? কোথায় ব'সে শান্তিতে দু'দণ্ড কথা ব'লবে?

শেষ পর্যন্ত বেলা একটা প'ড়ে আসতে গিরীশের বাড়িতে গিয়েই উঠলো হরিশ। গিরীশের দাম্পত্য জীবনে বড়ো সুখ, বড়ো শান্তি। তার বাড়ির পরিবেশেব ভেতরে গিয়ে দাঁড়ালেই যেন শুচিতার একটা স্নিগ্ধ স্পর্শ পাওয়া যায়!

গিরীশের সঙ্গে নানা আলোচনায় নিজেকে অনেকক্ষণ ভুলিয়ে রেখেছিল হরিশ। তারপর একসময় বেরিয়ে প'ড়তেই হ'ল। তখন রাত আটটা বেজে গেছে।

আর তো কোনো উপায় নেই! আবার সেই ভবানীপুরেই ফিরতে হবে। সেই ঘর—সেই ছোটোবৌ!

কত রাত ক'রে বাড়ি ফিরলে ভালো হয়? রাত বারোটা—একটা—দুটো?

যত দেরি হয় ততই ভালো। সবাই ঘুমিয়ে পড়ুক, তারপর সে বাড়িতে ঢুকবে। অন্তত ছোটোবৌ ঘুমিয়ে না পড়া পর্যন্ত ওই ঘরে গিয়ে শুতে সে পারবে না।

মাথার ভেতরে একটা অসহ্য প্রদাহ। মনও সহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রছে। এ-মনকে ভুলিয়ে রাখার সহজতম পথ তো তার জানা-ই আছে!

টিরেটা বাজার পেরিয়ে একটা সাহেবি পাঞ্চ-হাউসে ঢুকে প'ড়লে হরিশ। হুইস্কি, শেরি, শ্যাম্পেনের অনেক দাম। এমন মদ চাই যার দাম কম, কিন্তু বিবশ করবার ক্ষমতা বেশি। ওয়েটারের পরামর্শে ক্ল্যারেডাচ বেছে নিলে হরিশ।

পাঞ্চহাউস থেকে বেরিয়ে সোজা কসাইটোলার পথ ধ'রলে না সে। তাহ'লে তো অনেক তাড়াতাড়ি বাড়ি পেঁৗছে যেতে হবে। বাঁদিকে বৌবাজার ধ'রে হাঁটতে শুরু ক'রলে। বিশ্বনাথ মতিলালের বাজার থেকে আবার বাঁক নেবে দক্ষিণে। ব্যাপারিটোলা আর খালাসিটোলার ভেতর দিয়ে ধ'রবে বামুনবস্তির পথ। তাতে যা সময় লাগে লাগবে। অবশ্য সন্ধ্যের পর খালাসিটোলা একটু অস্বস্তিকর। খদ্দের ধরবার আশায় ঝাঁকে ঝাঁকে বাজারের মেয়ে বেরিয়ে আসে রাস্তায়। হাত ধ'রে টানাটানিও করে। কিন্তু শুধু খালাসিটোলার দোষ দিয়ে লাভ কী? উত্তরে সোনাগাছি থেকে দক্ষিণে খালাসিটোলা পর্যন্ত সব এলাকাতেই আস্তানা ক'রেছে তারা। ভদ্রপাড়ার ভেতরে পর্যন্ত ঢুকে গেছে। মেডিক্যাল কালেজের দক্ষিণে নিমু খানসামার গলি তো তাদের রাজত্বই হ'য়ে

গেছে। খালাসিটোলা আর জানবাজারের বৈশিষ্ট্য হ'ল, বাঙালি, বিহারী, ওড়িয়া, গোরা ফিরিঙ্গি—সব জাতের খদ্দেরের আনাগোনায় সমস্ত অঞ্চলটাই বিচিত্র হ'য়ে ওঠে। এতদিন ধ'রে হে'টে যাতায়াত ক'রে কোনো পতিতা পল্লীই তার অচেনা নয়। কত আগে ডফ্ সাহেবের লেক্‌চর শুনেও সে এইসব পথ দিয়েই হে'টে ভবানীপুরে ফিরেছে। আশে-পাশে যা খুশি হয় হোক, সে তার নিজের মতো হে'টে গেলেই হ'ল।

তেলের টেমি জ্ব'লছে দূরে দূরে ল্যাম্পপোস্টের মাথায় মাথায়।

সে আলোর ক্ষীণ শিখায় আলোর উৎসটাকেই কোনোমতে চেনা যায়, আর কিছু বিশেষ নজরে পড়ে না।

অনেকদিন পরে আজ মদ খেয়েছে হরিশ। একটু নেশা হ'য়েছে। পা দু'টো একটু একটু টলছে।

ব্যাপারিটোলার নাম এখন ওয়েলিংটন স্কোয়ার। লটারি কমিটি সেই নামই ক'রে দিয়েছে। তা হোক তাতে কার কী এসে যায়?

ব্যাপারিটোলার মোড় পেরিয়ে সোজা খালাসিটোলার পথ ধ'রলে হরিশ। বেশ কিছুটা এগিয়েছে। চারপাশ থেকে রাস্তাটা প্রায় ছে'কে ধ'রেই দাঁড়িয়ে আছে পণ্যাঙ্গনার দল। গানের শব্দ ভেসে আসছে, ভেসে আসছে ঘুঙুরের শব্দ।

একটা গাছের তলায় আবছা অন্ধকারে হরিশের পথরোধ ক'রে দাঁড়ালে একটি মেয়ে।

—কার ঘরে যাচ্চো গো লাগর? আমার ঘরেই আজ লয় এসো না মাইরি!

মেয়েটির বয়স হয়তো উনিশ কুড়ি হবে। মুখ দিয়ে ভক্‌ভক্ ক'রে দিশি মদের গন্ধ বেরোচ্ছে। তার সঙ্গে মিশে গেছে শস্তা প্রসাধনদ্রব্যের উগ্র ঝাঁজালো গন্ধ।

হরিশ কিছু বলবার আগেই খপ্ ক'রে তার একখানা হাত ধ'রলে মেয়েটি। ব'ললে, আসবে বাবু? আজ এই আকন ইস্তক একটা মিন্‌সেও আসেনি ঘরে। একটা পয়সাও কামাই হয়নি আমার।

হরিশের সারা দেহে একটা চকিত প্রবাহ খেলে গেল। ছোটোবৌয়ের কাছে মনের দিক থেকে সে তো নিঃস্বই, দেহের দিক থেকেও দীর্ঘদিনের উপবাসী। সে নিজেই নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে অথবা ছোটোবৌ-ই নিজেকে গুটিয়ে ফেলেছে, তাও মনে করবার মতো ক্ষমতা তার নেই। বারবণিতা মেয়েটির ছোঁয়ায় শরীরে একটা শিহরণ খেলে গেলেও নিজের মনকে সামলে নিলে হরিশ। আস্তে মেয়েটির হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ব'ললে, তুমি লোক চিনতে ভুল ক'রেচ। আমি বাড়ি ফিরচি।

মেয়েটি ফিক্ ক'রে হেসে বল'লে, আহা, কি সতিনক্কি মিন্‌সে গো! ফুত্তি ক'রে বুঝি বাড়ি ফেরা যায় না।

গাছের তলায় আবছা অন্ধকার। মেয়েটির মুখও ভালো ক'রে দেখা যাচ্ছে না। শুধু তার হাসির শব্দটা কানে বাজতে লাগলো।

মেয়েটি আবার হরিশের হাত চেপে ধ'রে বললে, তৈরি হ'য়েই তো পাড়ায় এয়েচ ভাই। মুখ দিয়ে দিব্যি মিঠে সরাপের বাস আসচে!

হরিশ ঈষৎ জড়িত স্বরে ব'ললে, হুঁ, বিলিতি মদ টেনেচি আজ। আজই বৌনি!

—তাই নাকি? তবে আমারও বৌনি ক'রে দিয়ে যাও!

—আমার প্রবৃত্তি হয় না।

—দূর শালা ভীতুর ডিম ড্যাকরা! ঘরের পরিবারকে বুঝি ভারী ভয়?

—ভয়? ভয় আমি কাউকে করিনে।

—তবে এত ন্যাকামো করচো কেন মাইরি?

—আমি মদ খেয়েচি কিন্তু তোমাদের মতো মেয়েদের সঙ্গে কখনো সম্পর্ক করিনি।

আবার খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠলে মেয়েটি। ব'ললে, সব মিন্সেই তো একদিন প্রথম বৌনি করে লাগর! মায়ের পেট থেকে প'ড়েই কি মাগীপাড়ায় ছোটে? চলো—

হরিশের হাতে আল্‌তো ক'রে একটু চাপ দিয়ে মৃদুভাবে টানলে মেয়েটি। ব'ললে, এ আমার ভালোই হ'ল আজ। আনকোরা লতুন বাবু দিয়ে বৌনি!

হরিশ ব'ললে, আমার হাত ধ'রে টানলেই কি আমাকে তোমার ঘরে নিয়ে যেতে পারবে?

এক ঝটকায় হরিশের হাতখানা ছুঁড়ে দিয়ে ঝাঁজালো স্বরে মেয়েটি ব'ললে, মরণ! মদ গিলে মাগীপাড়ায় এসে ছুক্‌ছুক্ ক'রে বেড়াচ্ছিস, তার আবার সতীপনার বহর কত! ফুর্তি করবার বুকের পাটা নেই তো রেতের বেলায় ম'ত্তে এ-পাড়ায় এয়েচিস কেন?

কখন সেই সন্ধ্যে থেকে এতক্ষণ পর্যন্ত আশায় আশায় দাঁড়িয়ে থেকে বিফল হ'য়ে মেয়েটি তখন বেপরোয়া হ'য়ে উঠেছে। তার দেহে যৌবনজোয়ারের ঘাটতি নেই, কিন্তু মুখখানা সুন্দর নয়। যে মুখ দেখে মিন্সেগুলো ভোলে, তেমন মুখ নয় ব'লেই সে ইচ্ছে ক'রেই গাছের তলায় আবছা অন্ধকারে দাঁড়ায়। মিন্সেগুলো ভারী অদ্ভুত! আরে বাপু, এয়েচিস তো গতরটা নিয়ে দাপাদাপি ক'রতে, মুখ দিয়ে ক'রবি কী? গতর তো সব মেয়েরই একরকম। মুখ সুন্দর না হ'লে ফুর্তি লুটতে কিছু আটকায়?

ঝটকা মেরে হরিশের হাত সরিয়ে দিলেও মেয়েটি কিন্তু এরই ভেতর বুঝে নিয়েছে, তার পাকড়ানো মানুষটা এ-পাড়ায় সত্যিই আনকোরা। পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতায় মানুষ চেনার কিছু কিছু ক্ষমতা তার হয়েছে। এ-মানুষটা যে বিশেষ কোনো মেয়েকে তাক্ ক'রে আসেনি, তাও সে বুঝে নিয়েছে। যে মিন্সেগুলো'র হরদম যাতায়াত, তাদের রকম-সকমই আলাদা। আর এ মিনসে একেবারে আনাড়ি। ফুর্তি ক'রতেই এসেছে, তবে কিনা নতুন ব'লে লজ্জা পাচ্ছে। এই রকম আনকোরা আনাড়ি শিকারকেও সে যদি গেঁথে না তুলতে পারে তাহ'লে এ-পেশা তার ছেড়ে দেওয়াই উচিত।

হরিশ ততক্ষণে হাঁটতে আরম্ভ ক'রেছে।

ছুটে এগিয়ে গেল মেয়েটি। এবারে আর শুধু হাত চেপে ধরা নয়, নিজের হাতে হরিশের একখানা হাত জড়িয়ে তার গায়ে গা লাগিয়ে ফিস্‌ফিস্ ক'রে ব'ললে, নজ্জার কী আচে বাবু? এখেনে তোমাকে কে চিনতে যাচ্ছে বলো? বেশ তো একটা রাতই লয় আমার ঘরে ব'সো। যদি পছন্দ না হয়, আর কোনোদিন মোক্ষদার ঘরে এসোনি!

কী নাম? কী নাম ব'ললে তোমার?—হরিশ নিজেই চেপে ধ'রলে মেয়েটির হাত।—তোমার নাম মোক্ষদা?

—হ্যাঁ গো। ওইটেই আমার ভালো নাম। তবে এ-পাড়ায় আমার ডাকনামেই সবাই জানে। ডাকনাম ফুলকি।

হরিশ তখনো ফুলকির হাতখানা ধরে রেখেছে।

—কি গো মন উঠেচে? পছন্দ হ'য়েছে?

—কত ক'রে নাও তুমি?

—আট আনা, একটাকা—যে বাবু খুশি হ'য়ে যা দেয়।

ইচ্ছে ক'রেই একটু বাড়িয়ে ব'ললে ফুলকি। দু'আনার খদ্দেরই তার বেশি। তাই পেলেই সে বেঁচে যায়।

—যদি সারারাত তোমার কাছে থাকতে চাই তাহ'লে কত নেবে?

এবার ফুলকিই অবাক হ'য়ে তাকালে তার শিকারের দিকে। মিন্সেটাকে বড়ো অদ্ভুত লাগছে। হরিশের গায়ের সঙ্গে নিজের গা আর সামান্য একটু বেশি ছুঁইয়ে গলার স্বর যথাসম্ভব মোলায়েম ক'রে ব'ললে, খুশি মনে তোমার যা দিতে হয় তাই দিও। সত্যিই সারারাত থাকবে?

আচ্ছন্ন জড়িত স্বরে হরিশ ব'ললে, হ্যাঁ থাকবো। চলো—

॥ দশ ॥

সব ঘটনাগুলোই যেন ভৌতিক ছায়াবাজির মতো ঘ'টে গেল।

ব্যারিস্টার টর্টন সাহেবের ইংল্যাণ্ডে যাওয়ার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'য়েছে। সফল হয়েছে তাঁর ওকালতি। ইংল্যাণ্ডে ব'সে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃপক্ষ বুঝতে পেরেছেন, ভারতবাসী শ্বেতাঙ্গ আর নেটিবদের একই ফৌজদারি আইনের আওতায় আনা চলে না। এডোয়ার্ড রায়ান একসময় কলকাতার সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি ছিলেন, এখন তিনি প্রিভি কৌন্সিলের একজন বিচারক। কিন্তু তিনি তো শাসক ন'ন, তাঁর অভিজ্ঞতা শুধুমাত্র বিচার ব্যবস্থার ভেতরেই সীমাবদ্ধ। আইন সম্বন্ধে তিনি একজন অসাধারণ পণ্ডিত তাতে অবশ্য কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু রাজ্যশাসন ক'রতে গেলে যে কতরকম জটিলতার মুখোমুখি হ'তে হয়, তার খবর কতটুকু রাখেন তিনি? আর ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন? লোকটাকে এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভারতবর্ষ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারলেই বাঁচা যায়!

ব্যবস্থাপক সভা থেকে প্রত্যাহার ক'রে নেওয়া হ'য়েছে 'কালা কানুন।'

হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে এদেশের ইংরেজ-সমাজ। পরবের পর পরব। হিন্দুদের পরবের চেয়েও সংখ্যায় যেন বেশি হ'য়ে যাচ্ছে। একটার পর একটা জয়। কখনো রাজ্যজয়, কখনো বিপন্ন-সম্ভ্রম পুনরুদ্ধার। উৎসব না ক'রলে চলে?

আবার বল নাচ, আলোকসজ্জা আর সরগরম পানশালা। বেথুনের থোঁতা মুখ ভোঁতা হ'য়েছে। আচ্ছা জব্দ হ'য়েছে তো লোকটা। এইবার যদি কিছু শিক্ষা হয়!

জয়ের পরেও কিন্তু জের মিট্‌লো না। এখনো প্রতিশোধ নেওয়া বাকি আছে।

সেই কতকাল আগে মিশনারি কেরি সাহেব প্রতিষ্ঠা ক'রেছিলেন এগ্রিহর্টিকালচারাল সোসাইটি। ব্ল্যাক আক্‌টের সবচেয়ে বড়ো সমর্থক ওই দুশ্‌মন নেটিব রামগোপাল ঘোষ এখনো সেই সোসাইটির সহ-সভাপতির চেয়ারে জাঁকিয়ে ব'সে আছে। ইংরেজের রাজত্বে বাস ক'রে যে নেটিব ব্ল্যাক আক্‌টের সাফাই গেয়ে কলম ধ'রতে পারে, তার ওপর কিসের দয়া? এত খাতির ক'রে লাভ কী? হটাও নেটিবটাকে!

তাই হল। সে চেষ্টাও তাদের ব্যর্থ হ'ল না। অধিকাংশ ইংরেজ সদস্যের দাবিতে সমিতির সহ-সভাপতির পদ থেকে রামগোপাল হ'লেন বিতাড়িত।

মিস্টার সিসিল বিডন সম্ভ্রান্ত বংশীয় মার্জিত রুচির মানুষ। তিনিও সমিতির কর্মনির্বাহ পরিষদের একজন বিশিষ্ট সদস্য। স্বজাতি ইংরেজদের এই কদর্য প্রতিশোধস্পৃহা দেখে ঘৃণায়, বিরক্তিতে সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ ক'রলেন তিনি।

আর বেথুন সাহেব?

কোম্পানির কর্মকর্তারা তাঁকে আর ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ পায়নি। একবছর ধ'রে স্বজাতি ইংরেজদের ঠাট্টা, বিদ্রূপ, শ্লেষ আর গঞ্জনায় ক্ষতবিক্ষত। নিষ্ফল উত্তেজনায় তাঁর স্নায়ুগুলো বিপর্যস্ত। বছর দেড়েক যেতে না যেতেই ভরা বর্ষার এক বিষণ্ণ দিনে চিরকালের মতো চোখ বুজলেন তিনি। কেঁদে আকুল হ'ল স্কুলের ছোটো ছোটো মেয়েরা। আর কোনোদিন সাহেব এসে তাদের মা ব'লে ডেকে আদর ক'রবেন না, আর কোনোদিন তিনি তাদের জন্য হাতে ক'রে মেঠাই এনে সবাইকে কাছে ডাকবেন না, আর কোনোদিন নিজে ঘোড়া হ'য়ে তাদের পিঠে চাপিয়ে ঘরময় ঘুরে ঘুরে খেলতে আসবেন না!

বেথুন সাহেবের কফিনের সঙ্গে সমাধিক্ষেত্রে যাঁরা গিয়েছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই বাঙালী। শ্বেতাঙ্গ মুষ্টিমেয়। গিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর, মদনমোহন, রামগোপাল, প্যারীচাঁদ, দক্ষিণামোহন—এ'রা সবাই।

লোয়ার সার্কুলার রোডের সমাধিক্ষেত্রে গিয়েছিল হরিশ। তখন ঝির্ ঝির্ ক'রে বৃষ্টি

প'ড়ছিল। তারই ভেতর সমাধিস্থ হ'ল বেথুনের দেহ। এদেশকে ভালোবেসেছিলেন ব'লেই হয়তো এদেশের মাটিতেই নিজের জায়গা ক'রে নিলেন তিনি!

দিশি প্রথায় জুতো খুলে রেখে খালি পায়ে দাঁড়িয়ে হৃদয়বান শ্বেতাঙ্গ মানুষটির উদ্দেশ্যে শেষ প্রণাম জানিয়েছিল হরিশ। বৃষ্টির জলে সারা দেহ তখন ভিজে গেছে। চোখ দু'টোও শুকনো নেই। নিজে থেকেই চোখ দু'টো কখন জলে ভ'রে উঠে ঝাপ্সা হ'য়ে এসেছিল।

ফেরার পথে ইংরেজদের এই অতি সঙ্কীর্ণতার কথা নিয়ে শম্ভুনাথ নানা কথা-ই ব'লছিল। হরিশ ম্লান হেসে ব'ললে, তবু বেথুন সাহেবকে এরা কিছুটা দয়া ক'রেচে শম্ভু! দয়া ক'রে তাঁর মৃতদেহকে ক্রীশ্চান কবরখানায় মাটি নিতে দিয়েচে! বেচারা হেয়ার সাহেবকে তো সেটুকু দয়া-ও দেখায়নি! তাঁকে ক্রীশ্চান ব'লেই তারা মানেনি। ভাগ্যিস গোলদীঘিতে হেয়ার সাহেবের নিজের জমি ছিল ব'লে সেখানে তাঁকে সমাধি দিতে পারা গেল, নইলে সেই নাস্তিক বেচারার মৃত্যুর পরেও কি দুর্গতি হ'ত, বলোতো?

একটু থেমে আবার সে ব'ললে, ভাবচি, ভবিষ্যৎকালের মানুষ কাদের কথা মনে রাখবে; হেয়ার বেথুন না এইসব শ্বেতাঙ্গকে?

কয়েকদিন পরে একটা খবর নিয়ে এলো শম্ভুনাথ।

রামগোপালের অপমান আর বেথুন সাহেবের অকাল মৃত্যুতে সমস্ত শিক্ষিত বাঙালির মনে চেতনা এসেছে। ইংরেজরা দেখিয়ে দিলে আন্দোলনের নামে সমস্বরে চেঁচিয়ে আর দাপাদাপি ক'রে যা খুশি তাই আদায় করে নেওয়া যায়। তাই বাঙালিদেরও সংঘবদ্ধ হওয়া দরকার। নিজেদের একটা সমিতি গ'ড়ে তোলা এখন একান্ত প্রয়োজন ব'লে সবাই অনুভব ক'রছেন। সেই সমিতির মঞ্চ থেকেই চালাতে হবে ইংরেজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন।

কিন্তু কিভাবে গড়া হবে সমিতি?

তারও ব্যবস্থা হ'য়েছে। প্রিন্স দ্বারকানাথ গ'ড়েছিলেন বেঙ্গল ল্যান্ড হোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন আর জর্জ টমসন গ'ড়েছিলেন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি। দু'টোই তো এখন নামেমাত্র টিঁকে আছে, কাজ ব'লতে কিছু নেই। সেই দু'টো সমিতিকে একসঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে গড়া হবে নতুন সমিতি—ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন।

হরিশ হেসে ব'ললে, ব্রিটিশের অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন করবার জন্যে যে সমিতি গড়া হবে, সেটা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান কেন? কেন শুধু ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন নয়?

শম্ভুনাথ পণ্ডিতের মতো জাঁদরেল উকিলও এই জেরার মুখে প'ড়ে প্রথমে একটু হক্‌চকিয়ে গেল। তারপর একটু সামলে নিয়ে ব'ললে, দু'টো পুরোনো সমিতির নামের একটু ক'রে অংশ রেখে দেবার জন্যেই বোধহয় এই ব্যবস্থা হ'য়েছে। তাছাড়া, আন্দোলন ক'রবো ব'লে আমরা তো ব্রিটিশের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ ক'রচিনে?

—সে তো বটেই। কিন্তু প্রিন্স দ্বারকানাথের সমিতি তো ছিল ধনী-জমিদারদের ব্যাপার। তাঁদের তরফ থেকে কেউ কেউ নিশ্চয়ই থাকচেন?

—অবশ্যই। রাজা রাধাকান্ত, রাজা কালীকৃষ্ণ, রাজা সত্যচরণ ঘোষাল, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, প্রিন্সের ছেলে ব্রাহ্মসমাজের দেবেন ঠাকুর—এ'রা সবাই থাকচেন। শুনচি, দেবেন ঠাকুরকেই সেক্রেটারি করা হবে। তবে রাজা-মহারাজা ছাড়া রামগোপাল, প্যারীচাঁদের মতো ব্যক্তিরাও থাকবেন। আমার মতো চুনোপুঁটিও দু'একটা থাকতে পারে।

হরিশ ব'ললে, পুকুর থাকলেই রুই কাৎলার সঙ্গে কিছু চুনোপুঁটি, গেঁড়িগুগলিও থাকবে, এ তো সাধারণ নিয়ম। কিন্তু শম্ভু, ওইসব রাজাবাবুরা প্রাণে ধ'রে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে কিছু ব'লতে পারবেন কি? বিশেষ, যাঁকে সম্পাদক করা হবে ব'লচো, ইংলিশম্যান পত্রিকায় তাঁদের পরিবারের তো অংশীদারি আছে ব'লে শুনেচি। আন্দোলন চালাতে অসুবিধে হবে না তো হে?

শম্ভুনাথ একটু ক্ষুণ্নস্বরে ব'ললে, তুমি কি এ'দের ওপর আস্থা রাখতে পারচো না হরিশ?

—আমার মতো অতি সামান্য একটা লোকের আস্থা-অনাস্থায় কিছুই এসে যাবে না শম্ভু! আমি ভাবচি, বাস্তব অবস্থার কথা। হিন্দু সমাজের দগ্‌দগে ঘা ভর্তি গায়ে একটা আঁচড় লাগলে এ'রা হয়তো ফুঁসে উঠবেন, দরকার হ'লে দশ-বিশ কি পঞ্চাশ হাজার টাকাও খরচ ক'রে যে লোকটা খোঁচা দিয়েচে, তাকে শায়েস্তা করবার চেষ্টা করবেন। কিন্তু ইংরেজের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা আর হিন্দু সমাজ সংস্কার করা এক নয় শম্ভু, এককথায় সেটাকে হ'তে হবে রাজনৈতিক আন্দোলন। তার চরিত্র আলাদা। মাঝে মাঝে সাহেব-বিবিদের ডিনার দেবো, বাগান-বাড়িতে নেমন্তন্ন ক'রে একসঙ্গে ফূর্তি ক'রবো আবার তাদেরই বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আন্দোলনে নামবো—এ দু'টো বোধ হয় একসঙ্গে চলে না।

—তোমার কথা সবটুকু না মানলেও মূল বক্তব্যকে আমি স্বীকার ক'রচি হরিশ। তবে রামগোপালের মতো ব্যক্তি যতক্ষণ অ্যাসোসিয়েশনে থাকবেন ততক্ষণ রাজনৈতিক আন্দোলন রাজনৈতিক-ই থাকবে ব'লে আমার বিশ্বাস।

—এ-সম্বন্ধে অবশ্য আমি একমত। তবে তিনি কতদিন টিঁকতে পারবেন, সেইটে নিয়েই আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে। হোক্ তোমাদের ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন! নেই মামার চেয়ে কাণা মামাও ভলো!

শম্ভুনাথ ব'ললে, মামা কাণা হবে না হরিশ, তার দু'টো চোখ-ই থাকবে।

॥ এগারো ॥

সেদিন রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর ইংলিশম্যান কাগজখানা খুলে ব'সলে হরিশ! নতুন খবরটা খুবই অর্থবহ। একটু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প'ড়তে হবে।

সাতারা আর সম্বলপুরের পর এবার উদয়পুর!

দ্য মোস্ট নোব্‌ল গবর্নর জেনারেল অব্ ইণ্ডিয়া লর্ড ডালহৌসি এবার তাঁর থাবা বসিয়েছেন সামন্তরাজ্য উদয়পুরে। অজুহাত সেই একই—ডক্‌ট্রিন অব্ ল্যাপ্‌স্।

ডক্‌ট্রিন অব্ ল্যাপ্‌স্—স্বত্ব-বিলোপ আইন।

ভারত সাম্রাজ্য শাসনের জন্যে কোম্পানির তৈরি করা নিজস্ব আইন। ব্যবস্থাপক-সভায় পাশ করা প্রস্তাব। সুতরাং কেউ বলতে পারবে না, এটা কোনো আইন নয়।

গবর্নর জেনারেল হ'য়ে আসার পর প্রথম দু'বছরেই এই আইনের জোরে লর্ড ডালহৌসি গ্রাস করেছিলেন সাতারা আর সম্বলপুর। মাঝে দু'টো বছর নিষ্ফলা গেছে। কোনো নিঃসন্তান সামন্তরাজার মৃত্যু হয়নি। দু'বছর পরে এতদিনে আর একটা সুযোগ এসেছে।

হিন্দু আইনে দত্তক-পুত্র সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। কিন্তু কোম্পানি সরকারকে তো হিন্দু আইন মতে চ'ললে চলে না, তাকে চ'লতে হয় কোম্পানির নিজস্ব বিধিবদ্ধ আইন অনুসারে। সেই আইন ব'লছে, কোনো পুত্রহীন সামন্তরাজার মৃত্যু হ'লে দত্তক-পুত্রের অধিকার হবে অগ্রাহ্য। সে রাজ্য চ'লে আসবে ব্রিটিশ শাসনের অধীনে। তবে হ্যাঁ, কোম্পানি সরকার অবিবেচক নয়। মৃত রাজার কোনো দত্তক-পুত্র থাকলে সরকার থেকে আমরণ সে একটা মাসোহারা পাবে। পদমর্যাদা অনুসারে মাসোহারায় যাতে তার রাজকীয় বিলাস-বাসন সমেত জীবন নির্বাহ হয় সেদিকে নিশ্চয়ই দৃষ্টি রাখবে কোম্পানি।

সামন্তরাজ্য উদয়পুরও এবার এসে গেল ব্রিটিশ-সিংহের থাবার তলায়। প্রতিবাদ করা চলবে না। সামনে উদ্যত রয়েছে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পবিত্র আইন ; পেছনে উদ্যত ব্রাউন বেস আর ম্যাচ্‌লক্ বন্দুকে সজ্জিত পল্টন। অনুগত সেনাবাহিনীর হাতে চোখ-ঝলসানো তরোয়াল আর

অগ্নিবর্ষী কামান-বন্দুক। তার তুলনায় কতটুকু শক্তি একটা সামন্তরাজ্যের সেপাইদের? কার হবে প্রতিবাদ করবার দুঃসাহস?

পলাশীর প্রান্তরে যার শুরু তার শেষ কোথায়? কোন্ পর্যন্ত এগোতে চায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি? উদয়পুরের পর কার পালা আসছে?

—হরিশ!

ঘরে এসে ঢুকলেন রুক্মিণী। হরিশ অন্যমনস্ক হ'য়েই ডালহৌসির কথা ভাবছিল। মায়ের ডাকে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে ব'ললে, কিছু ব'লচো মা?

—হ্যাঁ বাবা, তোকে তো দু'দণ্ডও ফাঁকা পাওয়া যায় না। দিনরাত কেবল বই নিয়েই আচিস! আজ ভাবলুম, এই ফাঁকে কথাটা তোকে জানিয়ে রাখি।

—কী কথা?

—মাধুর জন্যে একটা সুপাত্তর পাওয়া গেছে।

হরিশ ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে ব'ললে, কী ব'লচো মা! এখুনি ওইটুকু মেয়ের বে' দেবার কী দরকার?

—ওইটুকু মেয়ে কী বলচিস বাবা, এইতো দশবচর বয়েস চ'লচে। হারাণ ব'লচিল, এমন সুপাত্তর পেয়ে হাতছাড়া করা ঠিক হবে না। আমিও তো এই বয়েসেরই মেয়ে ঘরে এনেচিলুম বাবা! কপালে নেই, তাই টি'কলো না।

হরিশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর ব'ললে, এর ভেতর দিনকালও তো অনেক পালটেচে মা! মেয়েটার লেখাপড়া শেখার বড়ো আগ্রহ। মাথাও বেশ ভালো। এরই ভেতর বেশ কিছুটা এগিয়েও গেচে। এখুনি ওর বে'র জন্যে ব্যস্ত হওয়ার কী আছে? আর দু'একবছর যাক না, ভালো পাত্র পরেও পাওয়া যাবে।

রুক্মিণী এ-কথায় মোটেই খুশি হ'লেন না। ব'ললেন, মেয়েছেলের এত নেকাপড়া দিয়ে কী হবে শুনি? যার যা কাজ। ঘর-সংসার ক'রবে, ছেলেপুলে মানুষ ক'রবে, সোয়ামি-পুত্তুরের যত্ন-আত্তি ক'রবে, এই তো বাপু মেয়েছেলের ধম্মো! তুইই বাপু এই নেকাপড়া নেকাপড়া ক'রে নাই দিয়ে ছুঁড়িটাকে মাথায় তুলেচিস!

হরিশ গম্ভীরস্বরে ব'ললে, হ্যাঁ, আমি ওকে উৎসাহ দিয়েচি তা সত্যি। তবে তাকে 'নাই' দেওয়া বলে না মা। এখন কত মেয়ে নিয়মিত স্কুলে গিয়ে লেখাপড়া ক'রচে তার খপর রাখো? ও বেচারা সে সুযোগও পায়নি।

—পেলেই বা কী এমন স্বগ্গের সিঁড়ি তৈরি হ'ত শুনি? আর নেকাপড়া দিয়ে কী হবে? বিবি সেজে গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে যাবে?

—গুপ্ত কবির ছড়া আওড়ালে?

—কেন আওড়াবো না? আমরা তো আর গোরা ফিরিঙ্গি নই, বেহ্মও নই যে ওইসব মেলেচ্ছ আচার ঘরে ঢোকাবো? হিঁদু বামুনের মেয়ে, বয়েসকালে যেমন বে' হয় তেমনি হবে। ভালো পাত্তর যখন পাওয়া গিয়েচে তখন হাতছাড়া ক'রবো কেন, বল্?

—তুমি আমাকে শুধু খপরটাই জানাতে এয়েচ না। আমার মতামত চাও?

—তোর মতামত-ও দরকার আচে বৈ কি বাবা?

—যদি আমার মতামতই জানতে চাও তাহ'লে শুনে রাখো, বাল্যবিবাহে আমার আপত্তি আছে।

রুক্মিণী রীতিমতো বিরক্তস্বরে ব'ললেন, তুইও কি বিদ্যেসাগরের চেলা হলি নাকি? তুই অমত করিসনি বাবা! হারাণ ঠিকুজি মিলিয়ে এনেচে। একেবারে রাজযোটক!

এইবার পায়ে পায়ে ঘরে এসে ঢুকলে বড়োবৌ। এতক্ষণ দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে কান খাড়া ক'রে সব কথাই সে শুনেছে। তার মুখ শুকিয়ে গেছে।

বৌঠানকে দেখে হরিশ ব'ললে, এবার কি জুনিয়র উকিল?

বড়োবৌয়ের মুখে রসিকতার কোনো উত্তর নেই। মৃদু করুণ স্বরে সে ব'ললে, কিন্তু তাদের যে কথা দেওয়া হ'য়ে গেছে ঠাকুরপো!

—কথা দেওয়া পর্যন্ত চুকিয়ে ফেলেচ?

রুক্মিণী তাড়াতাড়ি ব'ললেন, না, মানে, পাকা দেখাটা তো এখনো হয়নি? তবে কিনা, হারাণ যখন কথা দিয়ে ফেলেচে, তখন সে-কথার খেলাপি ক'রলে নোকে যে আমাদের ছি ছি ক'রবে বাবা!

হরিশ গুম্ হ'য়ে গেল!

রুক্মিণী বাকিটুকু ব'লতে লাগলেন, সেই ও-মাসে বড়োবৌমা বাপের বাড়ি গিয়েচিলেন, সেই সময়েই বিধির নিব্বন্ধে যোগাযোগটা ঘ'টে গেল। মাধুকে দেখে একবাক্যিতে তাদের পছন্দ হ'য়েচে। পেজাপতির নিব্বন্ধ না থাকলে কি আর এমনটি হয়, বল্? তাই ব'লচিলুম, মেয়ে তো একদিন পার ক'রতেই হবে? তা এমন ভালো সমন্দটা যখন যেচে এসে গেল, তখন শুভকাজটা চুকিয়ে ফেলাই ভালো।

হরিশ ক্লান্ত অবসন্ন স্বরে ব'ললে, তোমরা যখন এতদূর পর্যন্ত এগিয়েই গেছ, তখন আমার আর বলবার কী আছে? তোমরা যা ভালো বোঝো তাই করো।

বড়োবৌয়ের মুখে হাসি ফুটলো। শাশুড়ীর উদ্দেশে ব'ললে, দেখলেন তো মা? আমি ব'লেচিলুম না, সব কথা শুনলে ঠাকুরপো অমত ক'রবে না?

রুক্মিণী-ও একগাল হেসে ব'ললে, তা কি আর আমি জানিনে? মাধুকে ও বড়ো বেশি ভালোবাসে। সেই মেয়েকে পরের ঘরে পাঠাতে হবে শুনে তাই হঠাৎ মনটা খারাপ হ'য়ে গেচে আর কি! হরিশ, তাহলে দিনক্ষণ সব ঠিক ক'রে ফেলতে বলি হারাণকে?

নির্জীব স্বরে হরিশ উত্তর দিলে, বলো।

মা আর বৌঠান বেরিয়ে যাওয়ার পর চুপ ক'রে ব'সে রইলো হরিশ।

কয়েক দিন পরের কথা।

হরিশ আপিসে রওনা হওয়ার একটু আগে টুপ ক'রে কখন বেরিয়ে প'ড়লে মাধুরী। বাড়ি থেকে একটু উত্তরে রাস্তার ওপর বড়ো আমগাছটার পাশে একটা কনক ধুতরোর ঝোপ আছে। তার আড়ালে লুকিয়ে ব'সে রইলো সে। হরিশ বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমগাছের কাছাকাছি আসতেই ঝোপের আড়াল থেকে চাপাস্বরে মাধুরী ব'ললে, আজ কিন্তু একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এসো কাকাবাবু, আমার খুব দরকার।

প্রথমে একটু চমকে গিয়েছিল হরিশ। ভাইঝিকে আর ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতে ব'ললে না। মেয়েটা কী ব'লতে চায় তার কিছুটা তো সে বুঝতেই পারছে। তাড়াতাড়ি ফিরবে কথা দিয়ে সে রওনা হ'য়ে গেল।

আপিসে ব'সে সারাদিন কাজ ক'রতে ক'রতে মাধুরীর সেই করুণ অনুনয়ের কথাটা কেবলই তার কানে বেজেছে। ছুটির পর সেদিন পাবলিক লাইব্রেরিতে যাওয়ার কথা ছিল। সেখানে না গিয়ে সে বাড়ির পথেই রওনা হ'ল।

মা ঠাকুরঘরে সন্ধ্যাহ্নিক ক'রছেন। দুই বৌ রান্নাঘরে। জলখাবার নিয়ে ঘরে ঢুকলে মাধুরী। তার মুখখানা শ্রাবণের জলভরা মেঘের মতো থম্ থম্ ক'রছে।

হরিশ ব'ললে, তোমার কী দরকারি কথা আছে, বলো মা!

—তুমি আগে জল খেয়ে নাও।

চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো মাধুরী। হরিশের খাওয়া শেষ হ'লে গেলাস, রেকাবি নামিয়ে রেখে ছল ছল চোখে সে ব'ললে, তুমি সত্যিই মত দিয়েচ কাকাবাবু?

কী ব'লবে হরিশ? তার যে এখনো বিন্দুমাত্র সম্মতি নেই অথচ মায়ের চাপে নিরুপায় অবস্থায় মত দিতে হ'য়েছে, সে-কথা মেয়েটাকে ব'লেই বা লাভ কী?

মাধুরীর গলার স্বর আরো ধ'রে এলো। সে ব'ললে, তুমি বে' বন্দ ক'রে দাও কাকাবাবু!

—আমি কেমন ক'রে বন্ধ ক'রবো মা?

—কেন, খরচ-খরচা তো সব তোমাকেই দিতে হবে। তুমি না দিলেই বন্দ হ'য়ে যাবে।

—তা কি হয় মা? দাদা যে কথা দিয়ে ফেলেচেন।

মাধুরী এবার ঝর্ ঝর্ ক'রে কেঁদে ফেললে।—তোমাকে একটা কথাও না জানিয়ে কেন সবাই মিলে সব কিছু ঠিক ক'রে ফেললে? তোমার কাছে সবাই কথা চেপে গেচে। আমাকে দেখানোর জন্যেই মামাবাড়ি নিয়ে যাওয়া হ'য়েচিল, তা জানো? জানতে পারলে আমি কিছুতেই যেতুম নি। তুমি যেমন ক'রে হোক বে' বন্দ ক'রে দাও কাকাবাবু, আমি আরো লেখাপড়া ক'রতে চাই!

হরিশ নিরুত্তর। তার চোখ দু'টোও জলে ঝাপ্সা হ'য়ে উঠেছে।

সবই তাহ'লে পূর্বপরিকল্পিত? হঠাৎ যোগাযোগ নয়! সব হিসেব ঠিকই ক'রেই মেয়েকে নিয়ে বাপের বাড়ি গিয়েছিলেন বৌঠান!

—কথা ব'লচো না কেন?—ধরা গলায় মাধুরী ব'ললে।

হরিশের গলা তখন যেন আটকে যাচ্ছে। মেয়েটাকে বুকে টেনে নিয়ে ভাঙা গলায় সে ব'ললে, তুমি আমার মেয়ে হ'লে তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমি কিছুতেই জোর ক'রে তোমার বে' দিতুম না মা! কিন্তু তোমার মা-বাপের ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমি কী ক'রবো, বলো?

আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মাধুরী। তার দিকে আর তাকাতে পারছিল না হরিশ।

মাধুরী বেরিয়ে যাওয়ার পর ব'সে থাকাও যেন কষ্টকর হ'য়ে উঠ্লো। চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘরের ভেতর অস্থিরভাবে পায়চারি ক'রতে লাগলো হরিশ। নিষ্ফল রাগে, উত্তেজনায়, বিতৃষ্ণায় তার মাথার ভেতরটা তখন দপ্ দপ্ ক'রছে। মেয়েটার আকুল মিনতি তার বুকটাকে যেন ভেঙে, দুমড়ে, মুচড়ে দিয়ে গেছে। হ্যাঁ, দাদা কথা দিয়ে এলেও বিয়ের ব্যয় সবই হরিশকে বহন ক'রতে হবে। সে যদি টাকা না দেয়, বিয়ে বন্ধ হ'য়ে যাবে। কিন্তু মা যে তার মুখ থেকে সম্মতি আদায় ক'রে নিয়েছেন। যত অনিচ্ছাতেই হোক, মাকে কথা দিয়েছে সে। এখন কেমন ক'রে ফিরিয়ে নেবে সে-কথা? অথচ এই ছোট্ট অবুঝ মেয়েটার কি অসহায় আকুতি! শেষ আশ্রয় হিসেবে তার কাকাবাবুকেই সে আঁকড়ে ধ'রেছে!

গৌরীদান! পুণ্যার্জন! পরলোকে অক্ষয় বৈকুণ্ঠলোকে বাসের আগাম ব্যবস্থা! এর নাম যদি ধর্ম হয়, তাহ'লে অধর্ম কী?

তিনমাস পরে মাধুরীলতার বিয়ে হ'য়ে গেল।

হরিশ আগেই জানিয়ে রেখেছিল, বিয়ের দিন সে বাড়িতে উপস্থিত থাকবে না। তার জেদ থেকে কেউ তাকে টলাতে পারেনি।

রুক্মিণী ভেবেছিলেন, তিনি পারবেন। তিনি ব'ললেন, তোর এত আদরের ভাইঝির বে', তুই সেদিন বাড়িতেই থাকবি নে, এটা কী ব'লচিস বাবা?

হরিশ গম্ভীর স্বরে ব'ললে, তোমার প্রথম আদেশ আমি মেনেচি মা, কিন্তু এ আদেশ তুমি আমাকে ক'রো না।

সুর নরম ক'রে রুক্মিণী ব'ললেন, আচ্ছা, তা নয় ক'রচিনে। কিন্তু পাড়াপড়শি পাঁচজন ব'লবে কী?

—মা, জীবনে এ-পর্যন্ত আমি তোমাকে কোনোদিন অমান্য করিনি। শুধু তোমার ইচ্ছে ব'লেই নিজের সম্পূর্ণ আপত্তি সত্ত্বেও মধু-মা'র বিয়েতে সম্মতি দিতে বাধ্য হ'য়েচি। অবশ্য, সে তো আমার মেয়ে নয়! আমার সম্মতি-অসম্মতির মূল্যই বা কতটুকু? দাদা আর বৌঠান গৌরীদান ক'রে পুণ্যার্জন ক'রতে চান করুন! সবাই মিলে কচি মেয়েটাকে জোর ক'রে ধ'রে-বেঁধে পার ক'রে এত পুণ্য অর্জনের সুযোগ যখন হ'য়েই গেল, তখন তার সঙ্গে পাড়ার লোকের দু'টো বাঁকা কথা তোমরা নয় হজম-ই ক'রলে? তোমাদের হিন্দুত্বের জয়ধ্বজা উড়ুক। ও পুণ্যে

আমার লোভ নেই। তাছাড়া, আমাকে গরহাজির দেখে পাড়ার লোকে কী ব'লবে তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই।

রুক্মিণী কাঁদো কাঁদো হ'য়ে ব'ললেন, এ-সব তুই কী ব'লচিস বাবা? তুই কি নাস্তিক হ'য়ে গেলি নাকি?

হরিশ তেমনি উত্তেজিত ভাবেই ব'ললে, জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই তো হিন্দু ধর্মের কৌলিন্যের মহিমা দেখে আসচি! এবারে আর এক মহিমা দেখচি। এই রকম ধর্ম পালনের চেয়ে নাস্তিক হ'তে পারা অনেক ভালো। সে যাই হোক, মন থেকে আমি যা একেবারেই সহ্য ক'রতে পারচি নে, তার ভেতর তোমরা আমাকে জোর ক'রে ধ'রে রাখার চেষ্টা ক'রো না মা। তোমাদের ধর্ম কর্ম সব মিটে যাক, তারপর আমি বাড়ি ফিরবো। টাকাকড়ি তো তোমার কাছে দিয়েই রেখেচি, আশা করি টান প'ড়বে না।

—তা নয় না পড়লো, কিন্তু তুই কোথায় গিয়ে থাকবি?

—আমার থাকার জায়গার অভাব হবে না।

বিয়ের পর পুরো একটা বছর-ও যায়নি, মাথায় কপালের সিঁদুর মুছে, হাতের শাঁখা নোয়া খুলে ফিরে এলো মাধুরী। যক্ষ্মারোগ ছিল, সেটা কেউ আগে বুঝতে পারেনি।

বড়োবৌ বুক চাপড়ে কাঁদছে, রুক্মিণী কপাল চাপড়ে কাঁদছেন, হারাণ শুধু কোঁচার খুঁটে চোখের জল মুছছে আর মাঝে মাঝে ছাড়ছে দীর্ঘশ্বাস।

একমাত্র হরিশই কাঁদেনি। তার কান্না হ'য়ে গেছে জমাট-বাঁধা পাথর। মধু-মার এ চেহারার দিকে তাকাতে পারছে না হরিশ। বাড়িটা অসহ্য হ'য়ে উঠেছে, অসহ্য হ'য়ে উঠেছে দিন-রাত্রির প্রতিটি মুহূর্ত।

মাধুরী বিধবা হ'য়ে ফিরে আসার ক'দিন পরে কী যেন একটা কথা ব'লতে হরিশের কাছে এসেছিল। সেই একটা দিনই কান্নার বেগ সামলাতে পারেনি হরিশ। মেয়েটাকে বুকে জড়িয়ে সে ঝর্ ঝর্ ক'রে কেঁদে ফেলেছিল।

মাধুরী ব'ললে, কাঁদচো কেন কাকাবাবু? যার কপালে যা নেকা থাকে, তা কি কেউ খণ্ডাতে পারে? আমার কপালে যা নেকা ছিল তাই হয়েচে।

উদ্‌ভ্রান্ত, উন্মাদের মতো কয়েকটা দিন কেটে গেল হরিশের।

মদ আর মদ।

প্রতিদিনই মদ খেয়ে বিস্মরণের চেষ্টা চ'লতে লাগলো তার। মদের বোতল এবার বাড়িতেই আসতে শুরু হ'ল। মদ খেয়ে বেহুঁশ না হ'লে, রাতে ঘুম আসে না। ঘুম না এলে দপ্ দপ্ ক'রতে থাকে মাথার ভেতর। গুমরে-ওঠা একটা কান্নার বেগ বারবার গলার কাছে এসে ঢেউয়ের মতো আছড়ে প'ড়তে থাকে। মাধুরীর মুখখানা চোখের সামনে যেন ভেসেই থাকে!

এই বালবিধবা মেয়েটা কী নিয়ে কাটাবে সারাজীবন? নিরামিষ আহার, হরতুকি, রুদ্রাক্ষের মালা আর নিরম্বু একাদশী পালন? তার সঙ্গে ইন্দ্রিয় দমনের ধর্মীয় উপদেশ আর অক্ষয় বৈকুণ্ঠ-লাভের আশ্বাস?

কেন ক'রবে? কেন সে সারাজীবন হ'য়ে থাকবে এক বিষাদ-প্রতিমা?

॥ বারো ॥

আপিস ছুটি হ'তে একটু সময় বাকি।

পকেট থেকে চেনঘড়িটা বের ক'রে একবার দেখে নিলে হরিশ। হাতে এখনো কিছু কাজ

বাকি। সেগুলো সেরে ফেলতে খুব বেশি হ'লে মিনিট দশেক সময় লাগবে। ফোর্ট উইলিয়মের একজন ক্যাপ্টেনের কয়েকখানা বিল রয়েছে। তারই একখানা টেনে নিয়ে সবে সে দেখতে আরম্ভ ক'রেছে, এমন সময় খোদ অডিটর জেনারেল কর্নেল গোল্ডীর ঘরে তার ডাক প'ড়লো। কাগজপত্র গুছিয়ে রেখে সে উঠে প'ড়লো। কর্নেল গোল্ডীর কামরায় গিয়ে দেখলে কর্নেল চ্যাম্প্‌নিজ-ও সেখানে ব'সে আছেন।

—ব'সো বাবু। আগে বলো, এই আপিসের কাজ তোমার কেমন লাগচে?—কর্নেল গোল্ডী ব'ললেন।

হরিশ মৃদু হেসে ব'ললে, জীবিকার জন্যে যে কাজ ক'রতে হয়, তার ভালো-লাগা মন্দ-লাগার বিচার ক'রতে যাওয়া নিষ্ফল, স্যার!

—ঠিক বলেচ!—টেবিলের ওপর সজোরে একটা চাপড় মেরে হা হা ক'রে হেসে উঠলেন কর্নেল গোল্ডী।—দূর, দূর, এ আবার একটা কাজ নাকি? সারা বছর ব'সে ব'সে খালি সংখ্যার পোকা বাছো আর মিলিটারির জাঁহাবাজ শয়তানের চুরি-জোচ্চুরির হিসেব করো। উঃ, কোম্পানির কর্তারা বেছে বেছে মিলিটারিতে অফিসার সব পাঠায় বটে! সবাই এখানে আখের গোছাতে আসে, বুঝলে? দেশে থাকলে হয়তো কোনো কারখানার গুদামঘরে পিপে ঠেলে মরতে হ'ত, আর এখানে এসে তাদের নবাবীর বহর কত! যেন সব ব্যাটাই এক-একটা আর্ল কিম্বা ব্যারণের বাচ্চা! এই ফ'তো নবাব-গুলোকে আমি মোটেই সহ্য করতে পারিনে।

কর্নেল চ্যাম্প্‌নিজ তাঁর ওপরঅলাকে বেশ ভালোভাবেই জানেন। এদেশে এসে হঠাৎ নবাব সেজে-বসা স্বজাত ইংরেজদের ওপর তিনি হাড়ে হাড়ে চটা। তাদের পারোয়া ক'রেও কথা বলেন না। পরোয়া করবার দরকারও নেই তাঁর। কারণ, সামরিক বিভাগের আয়-ব্যয়ের হিসেবটা সম্পূর্ণই তাঁর নিয়ন্ত্রণে। ফোর্ট উইলিয়মের জাঁদরেল অফিসারদেরও অনেক সময় নিজেদের গরজেই তাঁকে তোয়াজ ক'রে চ'লতে হয়। একেবারে খোলা মনের মানুষ, সেই কারণে মুখের আগল-ও নেই! স্বজাত ইংরেজের ফ'তো নবাবীর গরম আর এদেশের রোদের গরম—দুটোই তাঁর কাছে অসহ্য। আর একটা ব্যাপার তিনি বরদাস্ত ক'রতে পারেন না—এদেশের মানুষের হ্যাংলামি। ইয়োরেশিয়ানদের দেমাকের ব্যাপারেও তিনি রীতিমতো অসহিষ্ণু।

একবার মন খুলে কথা আরম্ভ হ'য়ে গেলে তাঁকে আর আটকানো যাবে না বুঝে কর্নেল চ্যাম্পনিজ তাড়াতাড়ি ব'ললেন, মাফ ক'রবেন স্যার, আমরা বোধহয় আসল প্রসঙ্গ থেকে একটু দূরে স'রে যাচ্ছি।

—তাই তো! ঠিক ধরিয়ে দিয়েছ। এই জন্যেই তোমাকে আমার এত ভালো লাগে চ্যাম্প্‌! শোনো বাবু, তোমাকে কেন ডেকে পাঠিয়েচি। সত্যি কথা ব'লতে কি, তোমাকে নিয়ে আমি আজকাল খুব গর্ব ক'রে বেড়াচ্ছি! আমার আপিসের একজন কর্মচারি এত বিখ্যাত লোক হয়ে প'ড়েছে, এতে আমার গর্ব হওয়া উচিত কিনা, বলো?

হরিশ বিব্রত হ'য়ে প'ড়লে। কর্নেল চ্যাম্প্‌নিজের মুখে মুচকি মুচকি হাসি। তিনি ব'ললেন, হরিশ নিজের মুখে সে-কথা কেমন ক'রে বলবে স্যার?

কর্নেল গোল্ডী একটু ভেবে নিয়ে ব'ললেন, ও, তাইতো! সে যাই হোক, আমি যে গর্বিত, সেটা ওকে আমার জানানো উচিত! অবশ্য এর জন্যে ধন্যবাদ তোমারই প্রাপ্য, কারণ এই বাবুকে তুমিই আবিষ্কার ক'রেচ!

কর্নেল চ্যাম্প্‌নিজ মৃদু হেসে ব'ললেন, এটা নিছক-ই একটা যোগাযোগ স্যার। আমার বিশ্বাস, হরিশ যেখানেই থাকতো, সেখান থেকেই ফুটে বেরোতো!

কর্নেল গোল্ডী সহাস্যে হরিশকে বললেন, চ্যাপ্‌নিজ যে তোমাকে কী চোখেই দেখেচে বাবু! অবশ্য আমি তোমার কাজের রেকর্ড দেখেছি। তুমি এত বিখ্যাত হ'য়েচ, তোমাকে লেখার জন্যে কত সময় দিতে হয় তা সত্ত্বেও তুমি একটা দিন আপিস কামাই করোনি, একটা কাজও কখনো ফেলে

রাখো না। আমার অফিসের রাইটারদের ভেতর এত নিষ্ঠাবান কর্মী আর কেউ আছে বলে তো আমার মনে হয় না! তার ওপর তুমি একজন চিন্তাশীল লেখক! চ্যাম্পনিজ ব'ললে, তুমি যেখানেই থাকতে ফ্যুটে বেরোতে! তা আমার খপ্পরে যখন এসে প'ড়েচ, তখন যেমন ক'রেই হোক, তোমাকে এখানে আটকে রাখায় আমাদেরও স্বার্থ আছে, কী বলো চ্যাম্পনিজ? লোকে ব'লবে, বাবু হরিশ মুখার্জি কাজ করে মিলিটারি অডিটর জেনারেলের আপিসে! শোনো হরিশ, তুমি প্রাণের আনন্দে লিখে যাও। ব্রিটিশ—নেটিব বাছবিচার ক'রবে না। যেখানেই বেয়াড়াপনা দেখবে, সেখানেই হাঁকড়ে দাও চাবুক। আমি অডিটর জেনারেল, আমার কাজ হ'ল সঠিক হিসেব রাখা আর চোর-জোচ্চোরদের হিসেবের কারচুপি ধরা। কারো তোয়াজ করা তো আমাদের কাজ নয়। এই আপিসের কর্মচারি হ'য়ে তুমিই বা কেন কাউকে তোয়াজ করতে যাবে?

কর্নেল চ্যাম্পনিজ ব'ললেন, হরিশ সেটা করে না বলেই ওর লেখা প'ড়ে অনেকের টনক ন'ড়েচে স্যার। আমাদের শ্বেতাঙ্গ সমাজেও—

আরে, তুমি কী ব'লবে, আমি সবই জানি।—কর্নেল চ্যাম্পনিজের কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে কর্নেল গোল্ডী ব'ললেন, হরিশ মুখার্জি নামে একজন নেটিব আজকাল নানা বিষয়ে লিখচে, তার ভেতর আমাদের য়ুরোপীয়দের ওপর অনেক সময়েই বেশ চোখা চোখা খোঁচা থাকচে। সে লোকটা নাকি আপনার আপিসে কাজ করে? তাকে আপনি বরদাস্ত ক'রচেন কেন?—তার জবাবে আমি কী ব'ললুম জানো? স্পষ্টই ব'লে দিলুম, আমার খুশি, আমি বরদাস্ত ক'রবো। শ্বেতাঙ্গেরা কি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে যে তাদের দোষত্রুটি থাকবে না? যার দেখার চোখ আছে, সে দেখবে এবং বলবে। আপনাদের কিছু প্রতিবাদ থাকলে যুক্তি দিয়েই তা করুন!

হরিশ নির্বাক হ'য়ে কর্নেল গোল্ডীর কথাগুলো শুনছিল। এর আগে তাঁকে দূর থেকেই দেখেছে হরিশ। তাঁর রাশভারি চালচলনের আড়ালে যে এইরকম ক্ষ্যাপাটে একরোখা একটা মানুষ আছে, তা আগে সে ভাবতেই পারেনি।

এইবার কর্নেল গোল্ডী ব'ললেন, শোনো বাবু, চ্যাম্পনিজের কাছে তোমার সাংসারিক দায়দায়িত্বের কথা আমি শুনেচি। আমি ভেবে দেখলুম, অর্থচিন্তা যাতে তোমার এই উদ্যমের পথে বাধা হ'য়ে না দাঁড়ায়, সেইজন্যে তোমার মাইনে আরো কিছু বাড়িয়ে দেওয়া আমার উচিত। তোমার মাইনে আরো পঞ্চাশ টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হ'ল।

কর্নেল চ্যাম্পনিজের মুখে সেই স্নিগ্ধ হাসি। অর্থাৎ এর পেছনেও তাঁর হাত আছে।

সকৃতজ্ঞ চিত্তে কর্নেল চ্যাম্পনিজের দিকে একবার তাকিয়ে কর্নেল গোল্ডীর হাত থেকে তাঁর স্বাক্ষর করা কাগজখানা নিলে হরিশ। এই আপিসে পঁচিশ টাকা মাইনেয় সে ঢুকেছিল। আজ তার মাইনে দু'শো টাকা।

কর্নেল চ্যাম্পনিজের কাছে হরিশের কৃতজ্ঞতার ঋণ যেন ক্রমেই বেড়ে চ'লেছে। হরিশের জ্ঞানচর্চায় যাতে বাধা না পড়ে তার দিকে কতখানি সতর্ক দৃষ্টি তাঁর। কিন্তু এই স্নেহ, এই মমতা দিয়েও কি হরিশকে তিনি আগলাতে পারবেন?

কর্নেল গোল্ডীর কামরা থেকে বেরিয়ে এসে অনেকক্ষণ নিজের চেয়ারে ব'সে রইলো হরিশ। আপিস ছুটি হ'য়ে গেছে, সবাই চলে গেছে, সে একা।

বাড়ির পরিবেশ অসহ্য হ'য়ে উঠেছে। লিখতে হ'লে সেই বাড়িতে ব'সেই তো লিখতে হবে তাকে!

,আপনমনে কত কথা ভাবছিল হরিশ।

এবার কলকাতায় একটা ছোটোখাটো বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকলে কেমন হয়? বাড়িতে যারা আছে তারা সেখানেই থাকুক, সংসারের আর্থিক দায়দায়িত্ব সবই সে পালন ক'রে যাবে। তার শুধু দরকার ওই দমবন্ধ করা দুঃসহ পরিবেশ থেকে মুক্তি!

সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ পরিবেশ। একটু নিশ্চিন্তে নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ। নইলে তার এত সাধনার সবটুকুই যে নিষ্ফল হ'য়ে যাবে!

মাধুরী বিধবা হ'য়ে বাড়ি ফেরার পর বৌঠানের স্বভাবে একটা প্রচণ্ড রুক্ষতা এসেছে। মেয়েটাকে বৌঠান এখন দু'চোখে দেখতে পারেন না। মাধুরীর পূর্বজন্মের কোনো মারাত্মক পাপের ফলেই নাকি তার এই দশা হয়েছে। নইলে রাজযোটক দেখে যেখানে বিয়ে দেওয়া হ'ল সেখানে এ ঘটনা ঘটতে পারে?

হরিশের পতিতালয়ে যাওয়ার কথাও বাড়িতে আর কারো অজানা নেই। পাঁচকান হ'য়ে কার মুখ দিয়ে যেন ছোটোবৌয়ের কানে কথাটা এসেছিল। এর আগে সে কেবল সন্দেহের জ্বালায় জ্ব'লেই ম'রেছে। তখনো হরিশ ততদূরে নামেনি। কিন্তু কথাটা কানে আসার পর ছোটোবৌ যেদিন সরাসরি জিজ্ঞেস ক'রে ব'সলে, সেদিন, হরিশও স্পষ্টভাবেই উত্তর দিলে, হ্যাঁ, গেছি। মাঝে মাঝে যাই।

তারপর থেকে ছোটোবৌ নিজের বিছানাও আলাদা ক'রে নিয়েছে। দু'জন একঘরেই শোয়—এইটুকুই মাত্র দাম্পত্য সম্পর্ক। ছোটোবৌয়ের সঙ্গে আজকাল বাক্যালাপও নেই। সেটা একদিক থেকে হয়তো হরিশের পক্ষে ভালোই হ'য়েছে।

শম্ভুনাথ মাঝে মাঝে বাইজীর নাচ দেখতে যায়। তার এক অবাঙালি ধনী মক্কেল প্রায়ই মাইফেল বসায়। শম্ভুনাথের সঙ্গে সেখানে দু'একবার গেছে হরিশ। হরিশের বারাঙ্গনা-গমন নিয়ে শম্ভুনাথ মাথা ঘামায় না। এটা তো একটা চালু রেওয়াজ। এ নিয়ে কিছু প্রশ্ন করবার কী আছে? তাছাড়া, হরিশের পারিবারিক অশান্তির কথা কিছু কিছু জানে শম্ভুনাথ।

আপিস থেকে বেরিয়ে সেদিন একটা পাঞ্চ-হাউসে ব'সে আরো কিছু সময় কাটিয়ে দিলে হরিশ। সামনে হুইস্কির বোতল, স্নায়ুতে নেশার আবেশ-শিথিলতা কিন্তু সজ্ঞান চেতনায় একরাশ প্রশ্নের ভীড়।

লিখতে আরম্ভ ক'রেই সে স্বীকৃতি পেয়েছে। শুধু লেখার জন্যেই তো লেখা নয়, তার ভেতর দিয়ে সমাজের যেটুকু সেবা করা সম্ভব তাই সে ক'রতে চেয়েছে। উৎসাহ পেয়েছে সহকর্মী বন্ধুদের কাছে, উৎসাহ পেয়েছে কর্নেল চ্যাম্পনিজের কাছে। একজন নেটিব কেরানির পক্ষে একেবারেই অপ্রত্যাশিত। কিন্তু সেই অপ্রত্যাশিত ব্যাপারই তো ঘ'টেছে। মাঝে মাঝে এমন সন্দেহ-ও হরিশের মনে উঁকি দিয়েছে এটা কর্নেল চ্যাম্পনিজের একটা কূট কৌশল নয় তো? সূক্ষ্ম বুদ্ধি রাখেন ব'লেই হয়তো তিনি নেটিব-বিদ্বেষী গর্বোদ্ধত ব্রিটিশদের পথে না গিয়ে একেবারে বিপরীত পথ ধ'রেছেন।

তারপর নিজের কাছেই নিজে লজ্জাবোধ ক'রেছে হরিশ। সব ব্রিটিশই কি শয়তান হ'তে পারে? এডোয়ার্ড রায়ান-ও তো ব্রিটিশ। কিন্তু কোম্পানির সুবিধেবাদী আইনকে ধিক্কার দিতে তিনি দ্বিধা করেননি। স্বজাতি ব্রিটিশের কাছেই লাঞ্ছিত হ'য়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ ক'রেছেন বেথুন সাহেব। মিস্টার সিসিল বিডন সিবিলিয়ান হিসেবে যথেষ্ট উঁচু পদমর্যাদার অধিকারী। তিনিও রামগোপালের ওপর একদল উদ্ধত নেটিব-বিদ্বেষী ব্রিটিশের কদর্য আচরণকে ধিক্কার জানিয়েই এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটি থেকে পদত্যাগ ক'রেছেন।

কর্নেল চ্যাম্প্‌নিজ এ'দেরই সগোত্র।

তাঁর কৈশোর স্বপ্নে চোখের সামনে ভাসতো অক্সফোর্ড কিম্বা কেম্ব্রিজের এক খ্যাতনামা প্রফেসর চ্যাম্প্‌নিজ। কিন্তু বাস্তব তাঁকে টেনে নিয়ে এলো সেনাবাহিনীতে! স্বপ্নভঙ্গের বেদনা তাঁর মনের গভীরে লুকিয়ে আছে। হয়তো সেই জন্যেই এই নিঃসন্তান প্রৌঢ় কাছে টেনে নিয়েছেন হরিশকে। খুলে দিয়েছেন তাঁর নিজস্ব লাইব্রেরি। এমন কি, ব্রিটিশ শাসনেরই যে-সব কলঙ্কজনক কাহিনী নেটিবদের চোখের সামনে থেকে সরিয়ে রাখতে চায় কোম্পানির শাসকেরা—তেমন অনেক নথিপত্রও তিনি প'ড়তে দিয়েছেন হরিশকে।

সেটা তাঁর কোন্ স্বার্থে?

নিজের কাছেই নিজে লজ্জিত বোধ করে হরিশ। যে মানুষটা তার জন্যে এত ক'রছেন, তাঁর উদ্দেশ্য নিয়ে কোনো সন্দেহ করা হরিশের নিজের পক্ষেই অপরাধ। কর্নেল চ্যাম্প্‌নিজ ব্রিটিশ হ'লেও বিবেকবান মানুষ। তাঁকে সন্দেহ করা মানে নিজেরই মনের সঙ্কীর্ণতাকে প্রকাশ করা।

কিন্তু যে বিশ্বাসে কর্নেল চ্যাম্প্‌নিজ তার জন্যে এত ক'রছেন, সে বিশ্বাসের মর্যাদা সে রাখতে পারবে কি? একজন জ্ঞানী ব্যক্তি হিসেবে হরিশের প্রতিষ্ঠা লাভেই হয়তো কর্নেল চ্যাম্প্‌নিজের তৃপ্তি হবে। তিনি নিজে আজ পর্যন্ত নিয়মিত পড়াশোনা করেন। লন্ডন থেকে সমস্ত ভালো ভালো পত্র-পত্রিকা তাঁর কাছে আসে। নিজের যে-আশা পূর্ণ হয়নি, হয়তো সেই আশারই কিছুটা অন্তত হরিশের ভেতর পূর্ণ হওয়ার স্বপ্ন দেখেই এই নিঃসন্তান প্রৌঢ় তাকে এমন ক'রে উৎসাহিত ক'রছেন।

কিন্তু হরিশ নিজেই যে মাঝে মাঝে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে।

সেই কবে টলা কোম্পানির ব্রজরাজ মিত্তির শোক-দুঃখ ভোলার উপায় হিসেবে মদ খেতে শিখিয়েছিল। মাঝে সে অভ্যাস ভুলেও গিয়েছিল হরিশ। কিন্তু আবার তা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। ক্রমেই তাকে টেনে নিয়ে চ'লেছে নিজের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। ছোটোবৌয়ের ওপর তীব্র বিতৃষ্ণায় মন জ্বলতে থাকে। মোক্ষদা নামের জাদুমন্ত্রটা সেই যে একদিন তাকে বিবশ বিহ্বল ক'রে টেনে নিয়ে গেল এক বারাঙ্গনার ঘরে, তারপর থেকে দেহোপজীবিনীর হাতছানিতে সে অনায়াসেই এগিয়ে যায়। ছোটোবৌ তার বিছানা আলাদা ক'রে নেবার পর জেদ যেন আরো বেড়ে গেছে। মাঝে মাঝে মোক্ষদা নামের সেই মেয়েটা কি এক সম্মোহনে তাকে প্রবলভাবে টানে। তার কাছেই ছুটে যায় সে। আবার অন্য কোনোদিন অন্য কোথাও।

তাই আত্মবিশ্বাস মাঝে মাঝে শিথিল হ'য়ে পড়ে। সে যা হ'তে চায় তা হ'তে পারবে না তলিয়ে যাবে?

কয়েকদিন পরের কথা।

আপিস ছুটির একটু আগে শম্ভুনাথ এসে উপস্থিত। গায়ে আদালতের পোশাক-ই রয়েছে। চোখে মুখে বেশ একটা খুশির ভাব।

হরিশ একটু বিস্মিত হ'য়ে ব'ললে, কী ব্যাপার শম্ভু? হঠাৎ সরাসরি একেবারে আপিসে এসে হাজির?

—গরজ আছে ব'লেই আসতে হ'ল। পোশাক দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারচো, সিধে কোর্ট থেকেই আসচি? আমি তো জানি, ছুটির এক সেকেণ্ড আগেও তুমি আপিস থেকে বেরোবে না! তাই কোর্টের কাজ চুকতেই বেরিয়ে প'ড়েচি। তোমার নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা আছে। আমার ওপর হুকুম আছে, তোমাকে দরকার হ'লে পাঁজাকোলা ক'রেও নিয়ে যেতে হবে।

—কোথায়?

মুচকি হেসে শম্ভুনাথ ব'ললে, ধরো, কলকাতার উর্বশী হীরে বুলবুলের নৃত্যসভায়? আপত্তি আছে নাকি?

হরিশ-ও হেসে ব'ললে, ওহে পণ্ডিত, বামনকে চাঁদ ধরবার জন্যে উস্‌কে দিয়ো না! হীরে বুল্‌বুলের দরজায় হাজির হ'তে হ'লেও কমপক্ষে চারঘুড়ি গাড়ি চাই; মহারাজা, রাজা—নিদেন-পক্ষে জমিদার লেবেলটা গায়ে সাঁটা থাকা চাই, সেটুকু অন্তত আমি জানি। জানোই তো বাপু, হরিশ মুখুজ্যের দৌড় বড়োজোর জানবাজারে, খালাসিটোলা কি নিমু খানসামার গলি পর্যন্ত?
—তা ব্যাপার কী? তোমার বন্ধুর বাড়িতে আজ কোনো নতুন নাচওয়ালি আসচে নাকি?

—সে তো রোজই একজন না একজন নতুন তার চাই। সে-কথা ছেড়ে দাও। ছুটি হ'য়ে গেচে, ওই দ্যাখো সবাই বেরোতে শুরু ক'রেচে। চলো—

—কোথায় নিয়ে যাবে সেটাই তো ব'ললে না?

—ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন।

—সে কি, সেখানে আমার মতো অভাজনকে কেন?

—প্রসন্ন ঠাকুর এক্সিকিউটিভ কমিটি থেকে ইস্তফা দিয়েচেন। সেখানে একজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে নেওয়া দরকার।

বিমূঢ়ের মতো হরিশ ব'ললে, তুমি কি আমার কথা ব'লচো?

—আমি বলিনি। তোমার নাম প্রস্তাব ক'রেছেন আর-জি-জি। আমার ওপর কেবল দায়িত্ব প'ড়েচে তোমাকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে যাওয়ার।

—রামগোপাল ঘোষ আমার নাম প্রস্তাব ক'রেচেন!—কিছুটা স্বগতোক্তির মতো উচ্চারণ ক'রলে হরিশ। তারপর শম্ভুনাথের দিকে তাকিয়ে ব'ললে, তাঁর মতো ব্যক্তি আমাকে এত স্নেহ করেন শুনে আমি অভিভূত হ'য়ে যাচ্চি শম্ভু। কিন্তু তুমিতো, জানো, আমি একটু সোজাসুজি কথা ব'লতেই ভালোবাসি? তাছাড়া, দেশের সবচেয়ে ধনী আর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের ওই সমিতির ভেতর আমার মতো অনভিজাত একটা গরীব কেরাণিকে বড়ো বেশি বেমানান লাগবে না কি?

—তুমি গরীব হ'লেও তোমার কলমটা যে গরীব নয়, সে-কথা তাঁরা ভালো ক'রেই জানেন। অ্যাসোসিয়েশন এখন আমাদের মুখপাত্র। তোমাকে সেখানে টেনে নেওয়ার গরজ কারো ব্যক্তিগত নয়, এটা দেশের গরজ। সেইজন্যেই তোমার নাম প্রস্তাব ক'রেছেন আর-জি-জি। আজ মিটিঙ আছে। তোমার উপস্থিতি দরকার ব'লেই আমাকে ছুটে আসতে হয়েচে। আমি জানি, তুমি একবার অ্যাসোসিয়েশনে এলে তার চেহারাটাই পালটে যাবে! আমিও সেইজন্যে আন্তরিকভাবে সেটা চাই!

হরিশ ব'ললে, ব্যক্তিগত ভাবে তুমি আমাকে এত ভালোবাসো ব'লেই তোমার বিশ্বাসে যতো না যুক্তি, হয়তো তারচেয়ে বেশি আবেগ আছে! তুমি অ্যাসোসিয়েশনের একজন উৎসাহী কর্মঠ সদস্য; তোমার আন্তরিকতা সম্বন্ধে আমার কোনো সন্দেহ নেই শম্ভু। কিন্তু তোমাকে আমি আগেও ব'লেচিলুম, এখনো ব'লচি, একটা সংশয় আমার মনে থেকেই যাচ্চে। ইংরিজিটা যত জোরালোই হোক আবেদন-নিবেদন পত্র লিখে সত্যিই কি কোনো লড়াই করা যায়?

—উঃ! তুমি একেবারে বেহদ্দ গোঁয়ার বটে! আর জন্মে বোধ হয় বাঙাল দেশের মানুষ ছিলে তুমি! আচ্ছা, এটা কেন বুঝতে পারচো না যে, আপাতত এই অবস্থায় এইটেই একমাত্র পথ? কোম্পানির যে কোনো অবিচারের বিরুদ্ধে জোরালো আবেদন ক'রে আমরা সেটা অন্তত ইংল্যাণ্ডের কর্তৃপক্ষের নজরে আনতে পারি?

—নিশ্চয়ই।—হরিশ হেসে ব'ললে, আবার তারপরেই মিস্টার টর্টনের মতো কোনো ঝানু ব্যারিস্টার ইংল্যাণ্ডে গিয়ে আমাদের আবেদনপত্র বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দেওযার বন্দোবস্ত-ও অনায়াসে করতে পারেন!

—তাহ'লেও চুপ ক'রে থাকার চেয়ে কিছু বলাও তো ভালো?

—হ্যাঁ, তা ভালো। শম্ভু, আমি নিজে ব্যক্তিগত ভাবে আমার দুই ব্রিটিশ ওপরওয়ালার কাছে কৃতজ্ঞ! তাঁদের চরিত্রে ভদ্র মানবিকতা আছে ব'লে তাঁদের আমি শ্রদ্ধাও করি। কিন্তু তোমার আমার কারো পক্ষেই তো ভুললে চলবে না যে, আমাদের দেশটা ব্রিটিশ জাতের সোনার ডিম-পাড়া হাঁসের মতো উপনিবেশ? আমরা আবেদনপত্র নিয়ে যত মাথা কুটেই মরি না কেন, নিজেদের স্বার্থের বিরুদ্ধে কোম্পানির কোর্ট অব্ ডাইরেকটর্স্ এক ইঞ্চিও সরবে না।

—তাই ব'লে আমরা কোনো আন্দোলন-ই ক'রবো না?

—একে আন্দোলন ব'লে মেনে নিতে আমার আটকায় শম্ভু। কর্নেল চ্যাম্প্ নিজের কল্যাণে ব্রিটিশ শাসনের আরম্ভ থেকে আজ পর্যন্ত সময়ের অনেক তথ্যই আমি বিভিন্ন গেজেটিয়ারে পড়বার সুযোগ পেয়েচি। তাতে দেখেচি—

—কী দেখেচো?—একটু অসহিষ্ণুভাবে প্রশ্ন ক'রলে শম্ভুনাথ।

হরিশ হেসে ব'ললে, দেখেচি, কোম্পানির জুলুম অবিচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন যারা ক'রেচিল, তাদের হাতে সুন্দর ইংরিজিতে লেখা কোনো আবেদন-পত্র ছিল না। তার বদলে ছিল তীর-ধনুক, লাঠি, বল্লম আর টাঙ্গি। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় সন্ন্যাসী বিদ্রোহ থেকে আরম্ভ ক'রে রঙপুরে কৃষক বিদ্রোহ, সন্দীপের বিদ্রোহ, বীরভূম-বাঁকুড়ার পাহাড়ী বিদ্রোহ, হাজারিবাগে বিরসা মুণ্ডার বিদ্রোহ, তীতুমীরের বিদ্রোহ—এমন কি এখনো যার জের মেটেনি, মালাবার উপকূলে সেই মোপলা বিদ্রোহ-ও তার সাক্ষী।

—সেগুলো তো অশিক্ষিত গোঁয়ার চাষাভুষো আর জংলি মানুষের কাণ্ডকারবার। সেগুলোকে আন্দোলন ব'লো না।

—সেইগুলোই সম্ভবত আন্দোলন। তাদের বিক্ষোভের চেহারা আলাদা। তাদের পেটে টান প'ড়েচে, স্বধীনতায় হাত প'ড়েচে তাই তারা রুখে দাঁড়িয়েচে। কামান-বন্দুকের সঙ্গে তীরধনুকের লড়াই চলে না। তা জেনেও কিন্তু তারা ঝাঁপিয়ে প'ড়েচে, প্রাণের পরোয়া করেনি।

—তাদের হার স্বীকার ক'রতে হ'য়েচে, এটা মানচো তো? কিন্তু আমরা তো তা চাইনে। আমরা নিয়মতান্ত্রিক পথের ওপর দিয়ে এগিয়েই আমাদের পাওনাটা আদায় ক'রবো।

—অর্থাৎ সাপও ম'রবে, লাঠিও ভাঙবে না, কেমন? কিছু মনে ক'রো না শম্ভু, আমার মনে হয়, এই পিটিশন-লেখা আন্দোলনে শেষ পর্যন্ত লাঠিখানাই ভাঙবে, সাপ ম'রবে না।

শম্ভুনাথ একটুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে তারপর ব'ললে, তাহ'লে তুমি কি অ্যাসোসিয়েশনে যোগ দিতে অনিচ্ছুক।

—না, অনিচ্ছুক নই। রামগোপাল আমাকে স্নেহ ক'রে ডেকেচেন, তুমি আমার বন্ধু ব'লে এত আগ্রহী হ'য়ে এয়েচ, এ-দুটোর কোনোটারই অমর্যাদা আমি ক'রবো না। আমি যাবো। অন্তত এই সুযোগে এজুকেটেড নেটিব মহলের নানা চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার একটা মস্ত বড়ো সুযোগ পাবো আমি। তবে ভাই, এ সন্দেহ কিন্তু আমার র'য়েই গেল, আবেদন-নিবেদনের নরম বালিমাটির রাস্তার ওপর দিয়ে আন্দোলনের ফিটন বগি এক ইঞ্চিও এগোতে পারবে কিনা!

—বেশ তো, তুমি যোগ দিয়ে আন্দোলনকে জোরদার ক'রে তোলো। আমিও তো তা চাই!

কর্মনির্বাহ পরিষদের নতুন সদস্য বাবু হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়!

করমর্দন ক'রলেন সম্পাদক বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সহ সম্পাদক বাবু দিগম্বর মিত্র। করমর্দন ক'রে অভিনন্দন জানালেন উপস্থিত অন্যান্য সদস্য। একমাত্র রামগোপাল করমর্দনের পর বুকে জড়িয়ে ধ'রলেন হরিশকে। ব'ললেন, তোমার কাছে আমার অনেক প্রত্যাশা হরিশ!

সভা সমাপ্তির পর স্বাস্থ্যপানের আয়োজন।

পর্যাপ্ত পরিমাণে হুইস্কি আর শ্যাম্পেনের ব্যবস্থা ছিল। রাণী ভিক্টোরিয়ার দীর্ঘায়ু কামনা ক'রে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যেরা আনন্দ-উৎসব উদ্‌যাপন ক'রলেন।

অনুষ্ঠান শেষে শম্ভুনাথের বগি গাড়িতেই ফিরছিল হরিশ।

এসপ্ল্যানেডের ওপর দিয়ে যেতে যেতে হরিশ হেসে ব'ললে, আজ আমি জাতে উঠলুম! কত বড়ো বড়ো রাজা-মহারাজারা আমার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক ক'রলেন। হাতের তালুটা এখনো গরম হ'য়ে রয়েচে! তার ওপর অত দামী শ্যাম্পেন, আঃ! তুমি যে এইভাবে হুট ক'রে আমাকে জাতে তুলে দিলে, এর ফলভোগ কিন্তু তোমাকেই ক'রতে হবে, তা ব'লে রাখচি!

শম্ভুনাথ হেসে ব'ললে, করবো।

—অবিশ্যি ফলভোগ আরম্ভই হ'য়ে গেচে ব'লতে পারো। নিজের গাড়িতে ক'রে হরিশ

মুখুজ্যেকে ভবানীপুরে নিয়ে যেতে হচ্ছে! শম্ভু, জীবনে আজ এই প্রথম আমি গাড়ি চেপে বাড়ি ফিরচি!

—তুমি অনায়াসেই এখন একখানা গাড়ি ক'রতে পারো হে! ক'রে নাও—

—আরে বাপু, কুকুরের পেটে কি ঘি সহ্য হয়? পায়ের তলায় তিল আছে, দিব্যি হাঁটতে পারি। গাড়ির আমার দরকার কী?

—বেশ তো গাড়ি না করো, একটা বাড়ি করবার কথা অন্তত ভাবো। দ্যাখো হরিশ, গোপন দান-ধ্যান যা-ই করো, নিজের কথাটা একেবারে ভুলে থেকো না।

হরিশ একটু অপ্রতিভভাবে ব'ললে, কী যা তা ব'লচো? আমার সংসারে নুন আনতে পান্তা ফুরোয়—আমি যাবো দান ক'রতে? তোমার কি মাথা খারাপ?

—জনার্দন মিত্তিরের অন্ধ মাকে মাসে পাঁচটা ক'রে টাকা দাও না? গঙ্গা ভশ্চায্যি মাসের গোড়ায় একবার ক'রে ঘুরে যায় না তোমার কাছে? কেদার চক্কোত্তির বিধবা এই মাস দুয়েক আগে মেয়ের বে' দিলে কার টাকায়?

হরিশ অপ্রস্তুতের হাসি হেসে ব'ললে, একটু অসুবিধেয় প'ড়েই ব'লেচিলেন আর কি! সে যাই হোক, তুমি আসলে উকিল না গোয়েন্দা তাই তো বুঝতে পারচি নে।

—দু-ই। উকিলকে দুনিয়ার খপরই রাখতে হয় হে হরিশচন্দর! লোকের উপকার ক'রতে চাও করো, তবে কিনা নিজের দিকটাও একটু খেয়াল রেখো। ছোটোখাটো যা-ই হোক, একটা বাড়ি তোলার চেষ্টা করো।

হরিশ শুধু ব'ললে, দেখি, কী করা যায়!

ভাদ্রের শেষ।

আকাশ থেকে বর্ষার ঘন কালো মেঘ এবার যেন একটু আগেই বিদায় নিয়েছে। শরতের নীল আকাশে দেখা দিয়েছে পেঁজা তুলোর মতো শাদা মেঘের দল। দুর্গোৎসব প্রায় এসে প'ড়েছে।

হঠাৎ একদিন গিরীশ ব'ললে, তোমাকে এমন একটা খবর দিতে পারি হরিশ, যা তুমি কল্পনা-ও ক'রতে পারবে না।

—কী এমন খবর?

গিরীশ আরো কৌতূহল সৃষ্টি ক'রে ব'ললে, এমন কি, সে খবর শুনে তুমি হয়তো চেয়ার ছেড়েও লাফিয়ে উঠত পারো!

হরিশ হেসে ব'ললে, অজ্ঞান হ'য়ে যাবো না তো? মেডিকেল কালেজে গিয়ে শয্যে নিতে হবে নাকি?

—তাও হ'তে পারে।

—উত্তম বন্ধুবাৎসল্য! স্বয়ং লর্ড ডালহৌসি যে হাসপাতালের নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ক'রেচেন, সেখানে পাঠিয়ে চিকিচ্ছে করাবে, এ তো সৌভাগ্যের কথা! তবে কিনা সামন্তরাজার দত্তকপুত্র নই, এই যা দুঃখু! নাও, এখন তোমার সিম্‌লেই রহস্য ভেঙে বলো দিকি আসল ব্যাপারটা কী?

গিরীশ ব'ললে, তুমি তো প্রায়ই আক্ষেপ ক'রে বলো যে, নিজেদের একটা পত্রিকা থাকলে একটু মন খুলে লেখা যেত?

—সে কথা তো একশোবার। এখনো ব'লচি।

—ব্যবস্থা হচ্ছে।

—অ্যাঁ, বলো কী?

হরিশ সত্যি সত্যিই চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলে।—কোথায় ব্যবস্থা হচ্ছে? তুমি ক'রচো? কবে থেকে পত্রিকা বেরোবে? নাম কী ঠিক হ'লো?

এক নিঃশ্বাসে প্রশ্নগুলো ক'রে আকুল আগ্রহে গিরীশের হাত চেপে ধ'রলে হরিশ। গিরীশ বেশ বুঝতে পারলে, উত্তেজনায় হরিশের হাত কাঁপছে।

গিরীশ ব'ললে, আমি জানতুম, এ-খবর শুনলেই উত্তেজনায় তুমি অধীর হ'য়ে উঠবে। শোনো, কথাবার্তা পাকা; আশা করি দু'তিন মাসের ভেতরেই আমরা পত্রিকা প্রকাশ ক'রতে পারবো। তুমি তো জানো আমার বড়দাদা ক্যালকাটা কালেক্‌টরেটে চাকরি করেন? তাঁর বিশেষ বন্ধু বড়োবাজারের মধুসূদন রায়। কলাকার স্ট্রীটে তাঁর বিরাট ব্যবসা। মধুসূদনবাবুর ইচ্ছে, একখানা ইংরিজি সাপ্তাহিক পত্রিকা চালাবেন। বড়দাদার কাছে তিনি ইচ্ছেটা প্রকাশ ক'রেচেন। বড়দাদা বিশেষ ক'রে আমার কথা ভেবেই রাজি হ'য়েচেন। কিন্তু মধুবাবুর ইচ্ছে, বড়দাদা, আমি আর আমার ছোটোভাই ক্ষেত্তর—তিনজনেরই নাম সম্পাদক হিসেবে থাকবে।

—লেগে যাও, লেগে যাও! শুভস্য শীঘ্রম্‌!—সজোরে গিরীশের হাত ধ'রে ঝাঁকুনি দিলে হরিশ।

—আহা, অত জোরে লাগিও না! সম্পাদনা করবার আগেই ডানা ভেঙে যাবে যে!

—এ ডানা ভাঙবার নয়।

—উঃ, যা জোরে ঝাঁকুনি দিয়েচিলে! যাকগে সে-কথা, আমি কিন্তু গোড়াতেই একটা কথা ব'লে রাখচি হরিশ। বড়দাদা রাজি হ'য়েচেন আমার ভরসায় আর আমি রাজি হ'য়েচি কিন্তু তোমার ভরসায়!

—অভয় দিলুম!—গম্ভীর মুখে কথাটা ব'লেই আবার হাসিমুখে উষ্ণ আবেগে গিরীশের হাত চেপে ধ'রে হরিশ ব'ললে, নাম কিছু ঠিক হ'য়েচে?

—হ্যাঁ, তা-ও হ'য়েচে। নতুন প্রেস কিনচেন মধুবাবু। সেদিকটা একটু গুছিয়ে নিতে পারলেই পত্রিকা আলোর মুখ দেখবে।

—সবই বুঝলুম কিন্তু নামটা যে ব'ললে না?

ইংলিশম্যানের যোগ্য জবাব দেওয়ার মতো একটা নাম হওয়া উচিত, কি বলো?

—নিশ্চয়ই! কী নাম ঠিক হ'য়েচে সেটা শুনি?

—হিন্দু পেট্রিয়ট।

—চমৎকার! সুন্দর নাম!—আপন মনেই কয়েকবার বিড়বিড় ক'রে উচ্চারণ ক'রলে হরিশ, হি-ন্দু পে-ট্রি-য়-ট—হি-ন্দু পে-ট্রি-য়-ট!

তারপর থেকে প্রতিদিনই গিরীশের কাছে একবার ক'রে খোঁজ নেয় হরিশ।—কন্দুর এগোলো?

—প্রেস কেনা হ'য়ে গেচে। ঝক্‌ঝকে নতুন নতুন টাইপ আসচে।

—এতদিনে কন্দুর এগোলো?

—আমাদের তিনজনকে নিয়ে মধুবাবু একদিন আলোচনায় ব'সচেন।

—এবার?

—জানুয়ারির প্রথমেই বোধ হয় পত্রিকা বের করা সম্ভব হবে। প্রথম সংখ্যাতেই তোমার লেখা চাই কিন্তু!

—তুমি যেদিন ব'লবে তার তিনদিনের ভেতরেই পাবে।

হরিশের আর যেন সবুর সইছে না। কবে ঝক্‌ঝকে ছাপা হ'য়ে প্রথম বেরোবে হিন্দু পেট্রিয়ট? কবে লোকের হাতে হাতে ঘুরবে নতুন সাপ্তাহিক হিন্দু পেট্রিয়ট?

সেদিন হরিশের শরীরটা তেমন ভালো ছিল না। অথচ আপিসের পরে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে একবার যেতে হবে। রামগোপাল বিশেষভাবে খবর পাঠিয়েছেন।

অ্যাসোসিয়েশনের আপিস থেকে যখন সে বেরোলো তখন রাত প্রায় আটটা। সঙ্গে শম্ভুনাথও ছিল। তার গাড়িতেই ভবানীপুরে ফিরলে সে।

বাড়ির দোরগোড়ায় পা দিতেই বৌঠানের তীব্র ঝাঁজালো চিৎকার কানে এলো হরিশের।

—মর্ আবাগি, তুই মর্! ম'রে আমায় নিষ্কিতি দে! চোখের সুমুখে এ-জ্বালা আমার আর সহ্যি হয় না!

বাড়ির ভেতর ঢুকে সরাসরি বৌঠানের সামনে গিয়ে হরিশ জিজ্ঞেস ক'রলে, কী হ'য়েচে?

বড়ো বৌ হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠ্লে।—কী হ'য়েচে তা তোমার গুণধরী ভাইঝিকেই শুধিয়ে দ্যাখো ঠাকুরপো! ক'ড়ে রাঁড় হ'য়েচিস তাও ভুলে গেলি? আজ একাদশীর দিন ঢক্ ঢক্ ক'রে এক ঘটি জল তুই খেয়ে ফেললি? ওলো সব্বোনাশী, ভাতারটাকে তো খেয়ে এয়েচিস, এখন নিজের পরকালের ভয়-ডরও কি নেই লা রাক্কুসী? এ-মেয়েকে নিয়ে আমি কী ক'রবো ঠাকুরপো? এ মেয়ে যে কুলে কালি দেবে! হায়, হায়, আমার কপালে তুমি এই নিকেচিলে ভগমান! ওলো, তুই মর্, আমি জ্বালা জুড়োই!

কপাল চাপ্ড়ে হাউ হাউ ক'রে কাঁদতে লাগলো বড়োবৌ।

পাপের ভয়ে রুক্মিণী পাথর হ'য়ে গেছেন। তাঁর মুখ দিয়ে কোনো কথা স'রছে না। ছোটোবৌ নির্বাক। হরিশের সঙ্গে সে তো কথা-ই বলে না।

—সে কোথায়? থম্থমে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস ক'রলে হরিশ।

—ওইতো, ও-ঘরে কুলুপ দিয়ে রেখেচি।—বড়োবৌ কাঁদতে কাঁদতেই ব'ললে।

—কুলুপ দিয়ে রেখেচ!—হরিশের গলার স্বর যেন আর্তনাদের মতো শোনালো।

—না দিয়ে কী ক'রবো? যদি আবার কিছু মুখে দেয় রাক্কুসী?

—চাবি কোথায়? নিয়ে এসো চাবি! আনো ব'লচি!

হরিশের প্রচণ্ড চিৎকারে বাড়ির ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা ভয় পেয়ে গেল। রুক্মিণী পর্যন্ত সভয়ে ছেলের দিকে তাকালেন।

ঠাকুরপোর এ-মূর্তি কোনোদিন দেখেনি বড়োবৌ।

ভয়ে তার কান্নাও স্তব্ধ হ'য়ে গেল। আঁচলে চোখ চেপে রান্নাঘর থেকে তালার চাবিটা বের ক'রে এনে কাঁপা হাতে হরিশের হাতে দিয়ে সে রান্নাঘরে ঢুকে গেল।

তালা খুলে ঘরে ঢুকলে হরিশ।

মাধুরী তখন মেঝেয় উপুড় হ'য়ে প'ড়ে অঝোরে কাঁদছে।

—মধু-মা!

কাকাবাবুর গলার সাড়া পেয়ে একবার তার দিকে তাকালে মাধুরী। তারপর হরিশের পা দু'খানা জড়িয়ে ধ'রে ঝর্ঝর্ ক'রে কাঁদতে কাঁদতে ব'ললে, তুমি পেত্যয় যাও কাকাবাবু, আমি মাত্তর এক চুমুক জল খেয়েচিলুম, এক ঘটি খাইনি। বড়ো তেষ্টা পেয়েচিল তাই—আমি আর কোনোদিন খাবো না—আর কোনোদিন না—

—তুমি কেনো অন্যায় করোনি মধু-মা!

টপ্ টপ্ ক'রে জল পড়ছে হরিশের দু'চোখ দিয়ে। মাটিতে ব'সে প'ড়ে মাধুরীর মাথা কোলে টেনে নিয়ে ধরা গলায় হরিশ ব'ললে, কেন ম'রতে হিন্দুর ঘরে জন্ম নিয়েচিলি মা?

সে রাতে হরিশ কিছুই খেলো না। শুধু এক বোতল উগ্র ঝাঁজালো হুইস্কি গলায় ঢেলে দিলে। নইলে মেয়েটার বুকফাটা কান্না সে যে ভুলতে পারছে না।

॥ তেরো ॥

হারাণ-ই খবরটা প্রথম নিয়ে এলো।

কিছুক্ষণের জন্যে একেবারে বোবা হ'য়ে গিয়েছিলেন রুক্মিণী। তারপরেই ডুক্রে কেঁদে উঠে তিনি কপাল চাপড়াতে লাগলেন।—এ আমার কী হ'ল? হে মা কালী, আমার এমন সব্বোনাশ

তুমি কেন ক'রলে মা? তোমার পায়ে আমি কী পাপ ক'রেচি যে আমাকে এমন সাজা দিলে তুমি? আমার সোনার চাঁদ ছেলের এ দুর্ম্মতি তুমি কেন হ'তে দিলে মা? এ-কথা শোনার আগে কেন তুমি আমাকে তোমার পায়ে টেনে নিলে না মা কালী?

হরিশ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিয়েছে।

খবরটা ছড়িয়ে প'ড়তেও দেরি হয়নি। দোকানের কাজ সেরে রোজ শম্ভু পণ্ডিতের বাড়ির পাশ দিয়েই হারাণকে ফিরতে হয়। সেখানেই রাস্তায় দাঁড়িয়ে জটলা ক'রছিল কয়েকজন। তাদের আলোচনায় একটু কান পেতেই ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে হারাণ।

হরিশ মুখুজ্যে হিঁদুয়ানি ছেড়ে বেম্ম হ'য়েছে। হবে না কেন? সে এখন কলকাতায় একজন কেউকেটা ব্যক্তি। কত রইস্ আদমির সঙ্গে তার ওঠা-বসা। সেই দেওয়ানজী, যাকে এখন লোকে রাজা রামমোহন ব'লে জানে, তাঁর আমল থেকেই তো এই ম্লেচ্ছ অনাচার আরম্ভ হ'য়েছে। তারই জের চ'লছে আর কি!

ক'লকাতার বুকে এখন যে ক'জনা নামজাদা ইংরিজিনবিশ, তারা সবাই প্রায় বেম্ম। তাদের সঙ্গে ওঠা-বসা ক'রতে হ'লে কতদিন আর হিঁদুয়ানি বজায় রাখা যায়? হিঁদু হ'য়ে থাকলে তাদের সমাজে ক'ল্কেই বা পাওয়া যাবে কেন? তবু ভালো, কেরেস্তান না হ'য়ে বেম্ম হ'য়েছে!

একজন ব'ললে, আরে বাবা, ব্যাপারতো সেই একই হে! কেরেস্তানেরা গীর্জেয় গে' যীশুর নাম-গান করে আর বেম্মরা সমাজমন্দিরে গে' পরমবেম্মর ভজনা করে। ও তোমরা ধ'রে রেখে দাও, কেরেস্তান আর বেম্ময় কোনো তফাৎ নেই।

আর একজন ব'ললে, আরে বাবা, ইংরিজি পড়িস আর যাই করিস, নৈকষ্য কুলীন বামুনের ছেলে হ'য়ে কিনা চোদ্দপুরুষের ধম্মো ত্যাগ ক'রলি? ছ্যা ছ্যা ছ্যা—

হারাণ আড়ালে ছিল। অন্ধকারে আড়াল দিয়েই বাড়ির পথে রওনা হ'ল। হরিশ নাকি তখন শম্ভু পণ্ডিতের বৈঠকখানায় ব'সে আছে। খবরটা সত্যি না হ'লে পাড়ার পাঁচজনে এত কথা ব'লবে কেন? ঠাকুর-দেবতা নিয়ে হরিশ কখনো মাথা ঘামাতো না, তা অবশ্য হারাণ জানে। কিন্তু হিন্দুধর্মে এমন কী অভক্তি হ'ল যে বাড়িতে কিছু না জানিয়ে, কাউকে কিছু না ব'লে সে একেবারে ব্রাহ্মসমাজে গিয়ে দীক্ষা নিলে?

একটা আশঙ্কায় হারাণের বুক দুরু দুরু ক'রতে লাগলো। এরপর হরিশ এ-বাড়িতে থাকবে তো? যদি না থাকে, যদি খরচপত্র না দেয় তাহ'লে হারাণ যে অকূলে পড়বে!

বাড়িতে ফিরে বড়োবৌকে সবচেয়ে আগে খবরটা দিয়েছে হারাণ। সেই সঙ্গে বারবার সাবধান ক'রে দিয়েছে, হরিশকে যেন এমন কোনো কথা বলা না হয় যাতে সে বিরক্ত হতে পারে। খবর যদি সত্যি হয় তাহ'লে এখন থেকে সব দিক ভেবে খুব সাবধানে চ'লতে হবে!

বড়োবৌকে সাবধান ক'রে দিয়ে তারপর মাকে খবরটা দিয়েছে হারাণ। হরিশ তখনো বাড়ি ফেরেনি। এমনিই তো তার বাড়ি ফিরতে দেরি হয়। তার ওপর যখন ফেরে তখন মদে চুর। মাইনে বেড়ে যাওয়ার পর বিলিতি মদ ধ'রেছে, সেটা তবু মন্দের ভালো। মাঝে মাঝে কি মিষ্টি গন্ধ ভুর্‌ভুর করে! হারাণের বেশ ভালোই লাগে। কখনো কখনো একটু চেখে দেখতেও ইচ্ছে করে। কিন্তু হাজার হোক, ছোটো ভাই। তাকে তো আর বলা যায় না, দে, একটু চেখে দেখি?

রুক্মিণী সেই যে কাঁদতে ব'সেছেন, সে কান্না আর থামে না। হাতের জপের মালা অভ্যেসের ওপরেই ঘুরে যাচ্ছে বটে, কিন্তু ইষ্টমন্ত্র যেন আর মুখে আসছে না। সব যেন কেমন এলোমেলো হ'য়ে যাচ্ছে। জলের ধারা ব'য়ে চ'লেছে দু'চোখ দিয়ে। মাঝে মাঝে একটা ক'রে বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস।

হরিশ বাড়ি না ফেরা পর্যন্ত তবু মনে মনে একটা ক্ষীণ আশা ছিল রুক্মিণীর। হয়তো খবরটা সত্যি নয়। কিন্তু ছেলে বাড়ি ফেরার পর সে আশাও নির্মূল হ'য়ে গেল।

হ্যাঁ, হরিশ ব্রাহ্ম হ'য়েছে। পৈতেটাও সে খুলে ফেলেছে।

ভাঙাগলায় রুক্মিণী ব'ললেন, তোর এমন কী হ'ল বাবা যে বাপ পিতেম'র সনাতন ধম্মো ত্যাগ ক'রলি?

—বড়ো দুঃখে ত্যাগ করেচি মা!— হরিশ অচঞ্চল স্বরে উত্তর দিলে।

—আমরাও কি তোর পর হ'য়ে গেলুম?—চোখের জল মুছে বললেন রুক্মিণী।

মায়ের বেদনার্ত মুখের দিকে তাকিয়ে ব'ললে, তুমি কী ব'লচো মা? সন্তান কি মায়ের কাছে কখনো পর হয়? ধর্মমত এখন আমার যা-ই হোক, তুমি যে আমার মা, এ তো চিরদিনের সত্য।

এত বেদনার ভেতরেও গর্বে ভ'রে উঠ্‌লো রুক্মিণীর বুক। না, তাঁর হরিশ পর হ'য়ে যায়নি। চোখের জল এবার যেন একটু প্রবোধ মানছে। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে ব'ললেন, ছোটো-বৌমার কী হবে? তাকেও কি ধম্মোত্যাগ ক'রতে হবে?

—তা কেন? আমার স্ত্রী ব'লে আমার ধর্মবিশ্বাস তার ওপর আমি চাপিয়ে দেবো কেন? তোমরা সবাই তোমাদের ধর্ম নিয়ে থাকো, আমি কোনো কথাই ব'লতে যাবো না। কেবল আমার ধর্মমতে তোমরা কোনো আঘাত ক'রো না, এইটুকুই আমার বক্তব্য।

সেইদিন থেকে চুপ ক'রে গেছেন রুক্মিণী।

কিন্তু পাড়ায় কানাকানি সমানে চ'লছে। অনেকদিন পরে একটা মুখরোচক বিষয়বস্তু পাওয়া গেছে। সেটা কি এত তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেওয়া যায়?

সেই যে বছর দশেক আগে সদর আদালতের ডাকসাইটে উকিল রাজনারাণ দত্তের হিন্দু কালেজে পড়া ছেলেটা কেরেস্তান হ'তে গিয়ে সারা ক'লকাতায় কি হুলস্থুল কাণ্ডই না বাধিয়ে দিয়েছিল। খিদিরপুরের রাজনারাণ দত্ত একে সদর অদালতের পয়লা নম্বর উকিল তায় আবার নাকি যশোরের নামজাদা জমিদার। সে-ই বা কম যায় কিসে? পাদ্রিদের খপ্পর থেকে ছেলেকে বের ক'রে আনার জন্যে লেঠেল পাইক সবই তো পাঠিয়েছিল। কিন্তু কোম্পানির পাদ্রিদের সঙ্গে পারবে কেন? নাকের ডগায় দু'হাত অন্তর বন্দুকধারী গোরা সেপাই পাহারা রেখে পাদরিরা ছেলেটাকে কেরেস্তান ক'রে তবে ছাড়লে! ছেলেটা কেরেস্তান হওয়ার পর মাইকেল না কী যেন নাম হ'য়েছিল। ব্যাপারটা যাই হোক, বেশ জমজমাট হ'য়েছিল বটে! আর হরিশ ছোঁড়ার বেহ্ম হওয়া? বড়ো বেশি সাদামাটা।

বলরাম চাটুজ্যের বাড়ি গোটা তিনেক বাড়ির পরেই। তিনি ব'ললেন, দ্যাখো, এই আমি ব'লে রাখচি, হরিশ ছোঁড়ার এই হ'ল পেত্থম ধাপ। মদ খাওয়া কি রাঁড়বাজির কথা ছেড়েই দাও, তা নিয়ে আমি কিছু ব'লচিনি। কিন্তু পেত্থম ধাপে যে বেহ্ম হ'ল, এর পরের ধাপে কেরেস্তান হ'য়ে পিতৃ-বংশ, মাতুল বংশের মুয়ে যদি চুণকালি না দেয় তো আমি জয়কেষ্ট চাটুজ্যের বেটাই নই!

এরই মাত্র মাস দু'য়েক পরের কথা।

বলরাম চাটুজ্যের বালবিধবা মেয়েটা নিরুদ্দেশ। তার সঙ্গে নিরুদ্দেশ আদিগঙ্গার ধারে ছোটো সদ্‌গোপ বসতির একটা জোয়ান ছেলে। বলরাম চাটুজ্যের মেয়ে কুসুমকুমারী বারোবছর বয়সে বিধবা হ'য়েছিল। দশবছর ধ'রে বৈধব্য পালন ক'রেছে। বাইশ বছরে এসে আর নিজেকে সামলাতে পারেনি।

এই খবর পাওয়ার পর ভয়ে পাগলের মতো হ'য়ে গেছে বড়োবৌ।

তার ঘরেও তো বালবিধবা মেয়ে। তার কপালেও কি এইরকম পরিণতি লেখা আছে? মাধুও কি একদিন—

আর ভাবতে পারে না বড়োবৌ। বুকের রক্ত হিম হ'য়ে আসে।

ভয়ে, ভাবনায় হারাণেরও মুখ শুকিয়ে গেছে। মেয়েটার এখনো তেমন ক'রে কিছু বোঝবার বয়স হয়নি। কিন্তু বয়স যখন বাড়বে তখন? কার অদৃষ্টে কী লেখা আছে, কে ব'লতে পারে?

বলরাম চাটুজ্যে একঘ'রে। ধোপা-নাপিত-হুঁকো বন্ধ। এমন কি, পাড়ার ছোটো ছোটো

ছেলেমেয়েরাও তাঁর বাড়ির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলতে যায় না। বলরাম চাটুজ্যে ঘরে ব'সে থাকে। তার তো মুখ দেখানোর উপায় নেই।

সেদিন রাতে হরিশ একটা লেখা নিয়ে ব'সেছে এমন সময় প্রায় পাগলের মতো ঘরে এসে ঢুকলে বড়োবৌ। কোনো ভূমিকা না ক'রেই সে ব'ললে, চাটুজ্যেবাড়ির কুলখাকি মেয়েটার কথা শুনেচো ঠাকুরপো?

বড়োবৌয়ের দিকে না তাকিয়েই হরিশ উত্তর দিলে, হুঁ, শুনেচি। তবে সে যা ক'য়েচে তার ভেতর আমি কোনো অন্যায় দেখতে পাচ্চিনে।

—কী ব'লচো তুমি!—বড়ো বৌ কাঁদো কাঁদো স্বরে ব'ললে, বামুনের রাঁড় মেয়ে একটা সদ্‌গোপের ছেলের সঙ্গে বেরিয়ে গেল, তার ভেতর তুমি কোনো অন্যায় পাচ্চ না? এমন সব্বুনেশে কথা ব'লো না ঠাকুরপো! কুসুমের কীর্তি শোনার পর নিজের মেয়েটার কথা ভেবে ভেবে যে আমার হাত পা পেটের ভেতর সেঁদিয়ে যাচ্চে!

—মেয়েটাকে গলা টিপে কিম্বা বিষ খাইয়ে মেরে ফেলে দাও, তাহ'লে আর ভয় থাকবে না।

ঝর্ ঝর্ ক'রে কেঁদে ফেললে বড়োবৌ।—তুমি তখন বে' দিতে মানা ক'রেচিলে, তা আমার মনে আচে ঠাকুরপো। আমি তোমার বৌঠান হ'য়ে তোমার কাছে ঘাট মান্‌চি, তুমি বাঁচাও! বাড়িতে তোমাকেই ও সবচেয়ে বেশি মান্যি করে। দোহাই তোমার ঠাকুরপো, মেয়েটাকে একটু বুঝিয়ে ব'লো, ও যেন এইভাবে কুলে কালি না দেয়।

কঠিন স্বরে হরিশ ব'ললে, সত্যিই তো প্রকৃতির নিয়মের চেয়ে তোমাদের কুলধর্ম কত বড়ো, কত পবিত্র! শোনো বৌঠান, ও যদি আমার মেয়ে হ'ত তাহ'লে ওকে তোমাদের হিন্দুধর্মের জেলখানা থেকে বের ক'রে নিতুম আমি! দরকার হ'লে ধর্মান্তরিত ক'রে ওর আবার বে' দিতুম। কিন্তু সন্তান তোমাদের, আমার তো সে অধিকার নেই!

বড়োবৌ কয়েকমুহূর্ত বোবার মতো হরিশের দিকে তাকিয়ে থেকে তারপর আঁচলে চোখ চেপে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কলম নামিয়ে স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইলো হরিশ।

॥ চৌদ্দ ॥

আঠারো শো তিপ্পান্ন সালের জানুয়ারি মাসের ছ'তারিখ বৃহস্পতিবার।

বড়োবাজারের কলাকার স্ট্রীটে হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার ছাপাখানায় সন্ধের পর ব'সে আছে হরিশ, গিরীশ আর ক্ষেত্রচন্দ্র। ভেতর দিকে অন্য একটা ঘরে বসে কথাবার্তা ব'লছেন পত্রিকার মালিক মধুসূদনবাবু আর গিরীশের বড়দাদা শ্রীনাথবাবু।

আজই প্রথম আলোর মুখ দেখেছে হিন্দু পেট্রিয়ট।

স্বত্ত্বাধিকারী বাবু মধুসূদন রায়, সম্পাদক শ্রীনাথ ঘোষ, গিরীশচন্দ্র ঘোষ এবং ক্ষেত্রচন্দ্র ঘোষ।

অনুষ্ঠানের কোনো ত্রুটি রাখেননি মধুবাবু। ভালো কাগজ, নতুন টাইপে ঝক্‌ঝকে ছাপা, আকার-আয়তনও প্রচলিত সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই করা হ'য়েছে।

আপিস ছুটির সঙ্গে সঙ্গে উন্মুখ আগ্রহে কলাকার স্ট্রীটের দিকে ছুটেছে তিনজন—গিরীশ, হরিশ আর ক্ষেত্র। বছরখানেক আগে সে-ও মেজদাদার আপিসেই চাকরিতে ঢুকেছে।

ওরা যখন গিয়ে পেঁছিলো তার একটু আগেই এসে গেছেন শ্রীনাথ। দুই সম্পাদক এবং এক লেখককে সমাদর ক'রে বসালেন মধুবাবু।

সমাদরের চেয়ে পত্রিকার খবরটা জানবার জন্যে তখন ছট্‌ফট্ ক'রছে গিরীশের মন। আগের রাতেই পত্রিকা ছাপা সম্পূর্ণ হ'য়ে গেছে, আজ সকালে হকারের নিয়ে যাওয়ার কথা। সে ব্যবস্থাও মধুবাবু ক'রে রেখেছিলেন।

গিরীশের গলার স্বরে আগ্রহ, উৎকণ্ঠা, প্রত্যাশা সব কিছু একসঙ্গে মিশেছে। সে ব'ললে, আগে পত্রিকার খবর বলুন? এবেলা হকার এয়েচিল?

—হ্যাঁ।

—তাঁর রিপোর্ট কী? কতগুলো বিক্রি হ'য়েছে?

মধুবাবু শ্রীনাথের মুখের দিকে তাকালেন। শ্রীনাথ ব'ললেন, বিক্রি তেমন কিছু হয়নি। সব মিলিয়ে খান ষাটেক হবে।

মুখ কালো হ'য়ে গেল গিরীশের—মোটে ষাটখানা! হরিশের লেখা রয়েচে তবু এত কম বিক্রি হ'ল?

হরিশ ব'ললে, আরে বাবা, হরিশ তো আর গন্ধর্ব কিন্নর নয় যে, তার নামের মায়াজালে প'ড়ে খদ্দের কাগজ কিনবে? নতুন পত্রিকা—সবে আজই বেরিয়েচে, সেটা মনে রাখতে হবে তো?

—আপনি ঠিক কথাই ব'লেছেন হরিশবাবু। পত্রিকার নামই লোকে জানে না, সেটা জানতেও কিছুটা সময় দিতে হবে তো? আরো দু'চার হপ্তা যাক, তখন দেখবেন খুচরো বিক্রিও বাড়চে, গ্রাহক-ও হ'চ্চে। বিশেষত হরিশবাবু আর আপনার লেখা নিয়মিত থাকচে এটা যখন লোকে জেনে যাবে তখন দেখবেন পেট্রিয়টের কদর কত বেড়ে গেচে! আজই এত মুষড়ে পড়বার কী আছে?

মধুবাবু খুব শান্তভাবে কথাগুলো ব'ললেন। তিনিই টাকা লগ্নী ক'রেছেন, তাঁর মুখে কিন্তু কোনো উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তার লক্ষণ নেই।

হরিশ ব'ললে, গোরা সাহেবরা তো আর তোমার হিন্দু পেট্রিয়ট কিনতে আসবে না? খদ্দের ব'লতে বাঙালি। তুমি কি ভেবেচিলে প্রথম দিনেই বাজারে প'ড়তে না পড়তে ইংলিশম্যানের মতো কাগজ কেটে যাবে?

গিরীশ একটু রেগে ব'ললে, সারাদিনে তুমিও তো কম জল্পনা-কল্পনা করোনি বাপু! এখন একা আমাকে দুষচো কেন?

সবাই হেসে ফেললে। ক্ষেত্র ব'ললে, আমার তো মনে হয় এখন এ নিয়ে তর্ক বিতর্কের চেয়ে আগামী হপ্তা থেকে পত্রিকার আকর্ষণ আরো কেমন ক'রে বাড়ানো যায়, তাই নিয়ে আলোচনা করাই ভালো।

মধুবাবু ব'ললেন, হ্যাঁ, আমিও তাই বলি। আপনারা বরঞ্চ সেই ব্যাপারেই কিছু চিন্তা করুন গিরীশবাবু। আমি ততক্ষণে শ্রীনাথবাবুর সঙ্গে অন্য প্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ কথাবার্তা সেরে ফেলিগে।

মধুবাবু আর শ্রীনাথবাবু পাশের ঘরে চ'লে গেলেন।

পরের সপ্তাহে যে লেখাগুলি ছাপা হবে সেগুলো নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা হ'ল। দু'একটা আপাতত ধ'রে রাখার সিদ্ধান্ত হ'ল, নতুন দু'একটা বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ দেওয়ার কথা হ'ল। গিরীশের মুখ কিন্তু ভার হ'য়েই আছে।

হরিশ ব'ললে, দ্যাখো গিরীশ, তোমার মুখখানা এমনিই মেয়েদের মতো গোলগাল। তার ওপর মুখের যা অবস্থা ক'রেচ তাতে দেখাচ্চে ঠিক তেলো হাঁড়ির মতো। একটু হাসো দিকিনি?

জানুয়ারি—ফেব্রুয়ারি—মার্চ।

তিনমাস ধ'রে হিন্দু পেট্রিয়ট নিয়মিত বেরোচ্ছে, কিন্তু পাঠক কোথায়? কোথায় গ্রাহক? খুব বেশি হ'লে বার্ষিক গ্রাহক সংখ্যা হ'য়েছে প'য়ত্রিশ, কি চল্লিশ, আর খুচরো বিক্রি বড়োজোর শ'দুয়েক। লোকসানের পর লোকসান চ'লেছে। মধুবাবুও যেন একটু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।

এরই ভেতর অডিট আপিসে একদিন একটা কাণ্ড ঘ'টে গেল।

হরিশের সরাসরি ওপরওয়ালা র‍্যাম্‌জে সাহেব। তাকে সেই র‍্যাম্‌জে সাহেবের কাছেই কাগজপত্র পাঠাতে হয়।

হলিংবেরি আর র্যাম্‌জে—এই দুই সাহেবের কাছেই হরিশ চক্ষুশূল। কর্নেল গোল্ডী আর চ্যাম্পনিজ এই নেটিবটাকে এত বেশি মাথায় তুলেছেন যে তা ভাবতেই তাদের গা রী রী ক'রে ওঠে। অথচ সোজাসুজি তাকে অপদস্থ করবার-ও উপায় নেই। কাজে কোনো গল্‌তিই নেই লোকটার। একটা কোনো সুযোগ না পেলে তো কিছু করাও যায় না! সেই সুযোগ একদিন জুটে গেল।

প্রচণ্ড মাথা ধ'রেছিল হরিশের।

কিছু দরকারি কাগজ তখনো দেখা হয়নি ব'লেই পাঠাতে তার একটু দেরি হচ্ছিল। মাথা ধরা নিয়েও কাগজপত্রগুলো দেখে যখন সে র্যামজে সাহেবের কামরায় পাঠানোর উদ্যোগ ক'রছে, সেই সময় হলিংবেরি তার সামনে এসে উপস্থিত।

—কী ক'রচো বাবু, কোনো জার্নালের লেখা তৈরি ক'রচো নাকি? কিছু টাকা আয় হবে?

মুখ লাল হ'য়ে উঠলো হরিশের। গম্ভীরস্বরে সে ব'ললে, আপিসে এসে আমি আপিসের কাজই করি মিস্টার হলিংবেরি, জার্নালের লেখা তৈরি করিনে।

—মিস্টার র্যাম্‌জে ব'লচিলেন, তুমি সময় মতো কাগজপত্র পাঠাও না।

—তিনি ঠিক কথা বলেননি।

—তার মানে? তুমি কি ব'লতে চাও, মিস্টার র্যাম্‌জে মিথ্যেবাদী?

—এতবছর চাকরির ভেতর কেবল আজই আমার একটু দেরি হ'য়েছে কারণ আমার প্রচণ্ড মাথা ধ'রেচে। তবু তারই ভেতর আমার কাজ আমি সেরে ফেলেচি। এই দেখুন, এগুলো তাঁর কাছে পাঠানোর জন্যে তৈরি হ'য়ে গেচে।

হলিংবেরির ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠলো একটু বাঁকা হাসি। একটু দূরে ব'সে কাজ ক'রছিল একজন শ্বেতাঙ্গ কেরাণি। তার দিকে তাকিয়ে তিনি ব'ললেন, লোকটার রকম দেখেচ? আশ্চর্য, নেটিবরা বেকায়দায় প'ড়লেই মিথ্যে অজুহাত তৈরি করবার ক্ষমতা রাখে বটে!

হলিংবেরি চ'লে গেলেন।

কয়েকমিনিট স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইলো হরিশ। তারপর কাগজপত্রগুলো র্যাম্‌জে সাহেবের ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে একখানা শাদা কাগজ টেনে নিলে। খস্‌ খস্‌ ক'রে কয়েকটা লাইন লিখে সই ক'রে কাগজখানা পাঠিয়ে দিলে কর্নেল চ্যাম্প্‌নিজের কামরায়।

পাঁচ মিনিটও পার হয়নি, কর্নেল চ্যাম্প্‌নিজের আর্দালি এসে জানালে, সাহেব সেলাম জানিয়েছেন।

হরিশ গিয়ে দাঁড়াতেই তার থম্‌থমে মুখখানা ভালো ক'রে লক্ষ্য ক'রে নিয়ে কর্নেল চ্যাম্প্‌নিজ ব'ললেন, ব'সো। এটা কী ধরনের পাগলামি?

হরিশ ব'ললে, আমি খুবই দুঃখিত স্যার! কিন্তু আত্মসম্মান বজায় রেখে কাজ করা যদি সম্ভব না হয়, তাহ'লে পদত্যাগ পেশ করা ছাড়া আমার উপায় নেই।

হরিশের লেখা পদত্যাগপত্রের কাগজখানা তুলে ধ'রে চ্যাম্প্‌নিজ ব'ললেন, এতে পদত্যাগের কোনো কারণ তো তুমি উল্লেখ করোনি হরিশ! কী হ'য়েচে?

হরিশ ঘটনাটা ব'ললে।

কর্নেল চ্যাম্প্‌নিজ খুব ভালোভাবেই হলিংবেরি আর রাম্‌জেকে জানেন। একটু চুপ ক'রে থেকে তারপর তিনি ব'ললেন, আচ্ছা, আজ থেকেই যদি এমন ব্যবস্থা করা যায় যে, তোমার কাগজপত্র র্যাম্‌জেকে না পাঠিয়ে তুমি আমার কাছেই পাঠাবে, তাহ'লে এটা প্রত্যাহার ক'রে নিতে তোমার আপত্তি নেই তো?

হরিশ কিছু ব'লতে পারলে না। চুপ ক'রে কাগজখানার দিকে তাকিয়ে রইলো।

কর্নেল চ্যাম্প্‌নিজ স্নিগ্ধ গম্ভীর গলায় ব'ললেন, তোমার আত্মসম্ভ্রমবোধে যে আঘাত লেগেছে, তার প্রতিকার করবার উপায় যদি আমার না থাকতো তাহলে এ পদত্যাগপত্র ফিরিয়ে নিতে তোমাকে আমি অনুরোধ ক'রতুম না হরিশ। কিন্তু যারা তোমার মর্যাদায় আঘাত দিয়েছে তাদের ওপর-

ওয়ালা হিসেবে সে-ক্ষমতাটুকু যখন আমার হাতে আছে, তখন আমার অনুরোধ, এটা তুমি ফিরিয়ে নাও। আমি এখুনি লিখিত নির্দেশ পাঠিয়ে দিচ্ছি, তোমার কাগজপত্র সোজা আমার কাছেই আসবে। এই নাও, এ-কাগজখানা ছিঁড়ে ফেলে দাও।

হরিশ হাত বাড়িয়ে কাগজখানা নিলে।

কর্নেল আবার ব'ললেন, ও কাগজখানা পেয়ে আমি খুবই অবাক্ হ'য়েছিলুম, এখন কিন্তু অদ্ভুত সুন্দর একটা তৃপ্তি পাচ্চি। তুমি যে আমার অনুরোধ রাখলে, তার জন্যে তৃপ্তি তো বটেই, তাছাড়াও তৃপ্তি পাচ্ছি আত্মসম্মান সম্বন্ধে তোমাকে এত সচেতন দেখে! জীবনে আরো প্রতিষ্ঠা পাও, এই শুভকামনাই করি। তারপর যদি কোনোদিন এই চাকরি তোমার প্রতিষ্ঠার পথে বাধা হ'য়ে দাঁড়ায়, সেদিন আমাকে ব'লো। তোমাকে ছাড়তে আমার কষ্ট হ'লেও সেদিন আমি সানন্দেই তোমাকে চাকরির বেড়াজাল থেকে মুক্তি দিয়ে দেবো। মনে রেখো, তার আগে কিন্তু কিছুতেই নয়!

এই ঘটনার অল্প কয়েকদিন পরেই মধুবাবুর কাছ থেকে একটা চমক।

—পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব আপনি নিতে পারেন হরিশবাবু?

হরিশ হতবাক্। সবে তিনমাস হ'ল হিন্দু পেট্রিয়ট বেরিয়েছে। লোকসান অবশ্য পুরোমাত্রায় চ'লছে, তা ঠিক। কিন্তু এরই ভেতর এমন কী হ'ল যে, সম্পাদক পরিবর্তন ক'রতে হবে?

হরিশ ব'ললে, আপনার এ প্রস্তাবের তাৎপর্য আমি ঠিক বুঝতে পারচিনে।

মধুবাবু যেন কিছু একটা গোপন করবার চেষ্টা ক'রলেন। ব'ললেন, না, মানে, আমি ভাবচিলুম পত্রিকা যখন একটা ক'রেই ফেলেচি, তখন সেটাকে যথাসাধ্য চেষ্টায় বাঁচিয়ে রাখা উচিত। শ্রীনাথবাবু ঠিক সময় দিতে পারচেন না আর গিরীশবাবুও আপনার বয়োকনিষ্ঠ। ক্ষেত্তরবাবুও তো ততোধিক। তাই ভাবচিলুম, সম্পাদনার ভারটা আপনার হাতে তুলে দিলে কেমন হয়?

হরিশ ব'ললে, মধুবাবু, গিরীশ আমার বয়োকনিষ্ঠ হ'লেও অন্তরঙ্গ বন্ধু। তারই উৎসাহে এই পত্রিকার সঙ্গে আমার যোগাযোগ। আপনার প্রস্তাবে আমার আনন্দ হ'লেও গিরীশকে ডিঙিয়ে আমি সম্পাদক হ'য়ে ব'সতে পারিনে।

মধুবাবু মৃদুস্বরে ব'ললেন, আপনার দিক থেকে আপনি ঠিক কথাই ব'লেচেন। আমি ভেবেচি, গিরীশবাবু এর ভেতর হয়তো আপনাকে কিছু ব'লে থাকবেন।

—না, সে তো আমায় কিছু বলেনি।

—তাহ'লে আপনিই তাঁর সঙ্গে একবার কথা ব'লে দেখুন।

হঠাৎ হরিশের মনে প'ড়ে গেল, গিরীশ তাকে একটা কথা ব'লেছিল বটে। যেদিন হলিংবেরির ব্যাপারটা নিয়ে সে খুব উত্তেজিত ছিল, ঠিক সেইদিনই প্রথম বেলায় হাসতে হাসতে গিরীশ ব'লেছিল, হিন্দু পেট্রিয়টের হালটা ধ'রবে নাকি হরিশ?

হরিশও হেসেই ব'লেছিল, না বাপু, আমি দাঁড়ী মাঝি আছি তাই থাকবো, হাল ধরবার হিম্মৎ আমার নেই।

কথাটা মনে প'ড়ে যেতেই লজ্জিতভাবে হরিশ ব'ললে, আমি আপনাকে ভুল ব'লেচি মধুবাবু। কিছুদিন আগে গিরীশ ঠাট্টাচ্ছলে আমাকে একটা কথা বলেচিল। কিন্তু একটা কারণে সেদিন আমার মন খুব চঞ্চল ছিল ব'লে কথাটা আমি ভুলেই গিয়েচিলুম। এখন মনে প'ড়েচে।

—কী ব'লেচিলেন তিনি?

—হাসতে হাসতে ব'লেচিল, আমি পেট্রিয়টের হাল ধ'রতে পারি কি না? কিন্তু আমি সে-কথার কোনো গুরুত্ব দিইনি।

—একটু গুরুত্ব দিন। আপনি নয় ক'দিন ভেবেচিন্তেই তারপর আমাকে জানাবেন।

পরের দিনই আপিসে ছুটির পর গিরীশের কাছে প্রসঙ্গটা উত্থাপন ক'রলে হরিশ। কথায়

কোনো মারপ্যাঁচ-ও নেই, গোপনতাও নেই। সোজাসুজি সে জিজ্ঞেস ক'রলে, তোমরা তিনভাই সম্পাদনা ক'রবে এই শর্তেই পেট্রিয়ট আরম্ভ হ'য়েচে। কিন্তু তুমিই বা সেদিন হঠাৎ আমায় ও-কথা ব'ললে কেন, আর মধুবাবুই বা কাল আমাকে এ-প্রস্তাব দিলেন কেন?

গিরীশ কয়েকমুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে তারপর ব'ললে, সেদিন ঠাট্টাচ্ছলে যেটা ব'লেচিলুম ব'লে তুমি মনে ক'রচো, সেটা ঠাট্টা নয়। ঠিক সেইদিনই অমন একটা কাণ্ড ঘ'টে গেল ব'লে আমি এর ভেতর আর প্রসঙ্গটা তুলিনি। হয়তো দু'একদিনের ভেতরেই তোমাকে বলতুম, তার আগেই মধুবাবু ব'লেচেন। শোনো হরিশ, তোমাকে তিনি যে প্রস্তাব দিয়েচেন সেটা মেনে নাও।

—অসম্ভব! নেমকহারামি আমার দ্বারা হবে না গিরীশ।

—আমি যখন তোমাকে অনুরোধ ক'রচি তখন এর পেছনে একটা গভীর কারণ নিশ্চয়ই কিছু আছে। ভয় নেই, সম্পাদনার দায়িত্ব নিলে তোমার পক্ষে সেটা নেমকহারামি হবে না। তুমি দায়িত্ব নিতে না চাইলে হয়তো আগামী মাসের পর হিন্দু পেট্রিয়ট উঠে যাবে!

—আমি দায়িত্ব নিলেই কি সমস্যার সমাধান হ'য়ে যাবে? মধুবাবু কি মনে ক'রচেন, তারপর লাভের মুখ দেখবেন?

—লাভ-লোকসানের ব্যাপার নয় হরিশ। ব্যাপারটা অন্যরকম।

—সেটা কী?

গিরীশ আবার একটুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে তারপর ব'ললে, ঠিক আছে, ব্যাপারটা তাহ'লে তোমাকে খুলেই বলি। কিছুদিন আগে কোনো একটা বিষয়ে মধুবাবুর সঙ্গে বড়দাদার প্রচণ্ড মনোমালিন্য হ'য়েচে। তারপর থেকে বড়দাদাও আর ওখানে যান না, মধুবাবুও সম্পাদক হিসেবে বড়দাদার নাম রাখতে অনিচ্ছুক। এক্ষেত্রে, আমাদের দু'ভায়ের পক্ষেও আর সম্পাদক থাকা শোভন হয় না। তাতে পারিবারিক অশান্তির সম্ভাবনাও অনিবার্য। আজ হোক, কাল হোক, আমাদেরও ইস্তফা দিতে হবে। সেইজন্যেই আমি অনুরোধ ক'রচি, সম্পাদনার দায়িত্ব তুমি নাও। তুমি দায়িত্ব না নিলে মধুবাবু হয়তো পত্রিকা-ই বন্ধ ক'রে দেবেন। সেটা আমি চাইনে হরিশ!

—তুমি তাহ'লে কী ক'রবে?

—তোমার পাশে থেকে আমার যথাসাধ্য সহযোগিতা আমি ক'রবো। ভেবে দ্যাখোতো, নিজেদের মনের মতো একটা পত্রিকার জন্যে কত আগ্রহ ছিল আমাদের? এতদিনে সেটা যখন আমরা পেয়েচি, তখন তাকে অঙ্কুরেই নষ্ট হ'তে দিও না!

গিরীশের দু'চোখ তখন ছলছল ক'রছে।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে হরিশ ব'ললে, বেশ, তাই হবে। এতবড়ো সুযোগটাকে নষ্ট হ'তে দেওয়া যায় না। কিন্তু গিরীশ, সম্পাদনার কোনো অভিজ্ঞতাই যে আমার নেই!

—তার জন্যে কোনো ভাবনা নেই হরিশ। বড়দাদার সঙ্গে মনোমালিন্য হ'লেও মধুবাবু আমাকে আগের মতোই স্নেহ করেন। আমি উপস্থিত থেকে সবরকম সাহায্যই ক'রতে পারবো। কেবল সম্পাদক হিসেবে আমার নাম থাকা চলবে না।

মে মাসের একটা দিন।

হিন্দু পেট্রিয়টের গ্রাহক-পাঠকেরা দেখলে, পত্রিকার সম্পাদক পরিবর্তন হ'য়ে গেছে। নতুন সম্পাদক হরিশ মুখুজ্যে।

আপিস—ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশন—হিন্দু পেট্রিয়ট—

দম ফেলার অবকাশ নেই হরিশের। প্রথম দিকে দু'তিন দিন ক'রে পেট্রিয়ট আপিসে আসতো। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের নানা কাজ তারই ওপর এসে প'ড়ছে। এখন সে সপ্তাহের একটা দিন—বড়ো জোর দু'দিন রাধাবাজারে যায়। পত্রিকার আপিস এখন

রাধাবাজারে। সেই একদিন বা দু'দিনেই নতুন নতুন প্রবন্ধ, বিদেশি পত্রিকার সংক্ষিপ্ত সংবাদ, সম্পাদকীয়—এক বৈঠকে সম্পূর্ণ ক'রে যখন সে ওঠে তখন গভীর রাত।

হাতে কলম, পাশে মদের বোতল।

কলম চ'লতে থাকে, মদের বোতল কখন নিঃশেষ হ'য়ে যায় খেয়াল থাকে না।

মধুবাবু মাঝে মাঝে বলেন, মদ্যপানের মাত্রাটা এত দ্রুত বাড়িয়ে যাওয়া কি ঠিক হচ্চে হরিশবাবু?

ম্লান, বিবর্ণ হাসি হেসে বলে, এ হ'ল আমার মনের দোয়াতের কালি মধুবাবু! এ কালি না হ'লে লিখতেই পারিনে।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সনদের মেয়াদ ফুরিয়ে আসছে।

যে সনদের জোরে কোম্পানি সরকার ভারত শাসন ক'রে চ'লেছে, তার মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার পর কোম্পানিকে যাতে আর নতুন সনদ না দেওয়া হয় তার জন্যে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে আবেদন করবার সংকল্প নিয়েছে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন। ব্রিটিশ সরকার সরাসরি ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করুক, এই হবে আর্জি।

আবেদনপত্র রচনার দায়িত্ব প'ড়েছে হরিশের ওপর। দায়িত্ব দিয়েছেন রামগোপাল। এমন ইঙ্গিত-ও তিনি দিয়েছেন যে দরকার হ'লে ভারতবাসীর প্রতিনিধি হ'য়ে তাকে ইংল্যাণ্ডেও যেতে হতে পারে। রামগোপাল প্রকাশ্যেই বলেন, প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের পর কোম্পানির রেগুলেশন সম্বন্ধে সবচেয়ে বড়ো বিশেষজ্ঞ এখন হরিশ।

কথাটাকে নিতান্ত একটা কথার কথা হিসেবে মেনে নিতে সদস্যদের তেমন বিশেষ আপত্তি ছিল না কিন্তু ক্ষোভের কারণ হ'য়েছে ওই বিলেত পাঠানোর ব্যাপারটায়। হাজার হোক, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের একটা আভিজাত্য আছে। সেই প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসেবে পাঠানো হবে একটা অতি সাধারণ ঘরের ছেলেকে? দেওয়ানজী রামমোহন রাজা খেতাব নিয়ে একটা ফয়সালার জন্যে বিলেত গিয়েছিলেন। দেশের প্রতিনিধি ক'রে যাকে পাঠানো হবে তার যে কোনো একটা দিকে তো অন্তত আভিজাত্য থাকা উচিত? হরিশের না আছে বংশ গৌরব, না আছে টাকা! রাজা রামমোহন কিম্বা প্রিন্স দ্বারকানাথের পর একটা হদ্দ গরীব বামুনের ছেলেকে এদেশের প্রতিনিধি হিসেবে দেখে ওদেশের সাহেবেরাই বা কী ভাববে?

কানাকানি ভালোভাবেই চ'লেছে। হরিশের কানেও এসেছে। একদিন সে শম্ভুনাথকে ব'ললে, কি হে উকিলসাহেব, অ্যাসোসিয়েশনের নৈকষ্য কুলীনদের বয়ান শুনেচ?

—শুনেচি। ও তুমি গায়ে মেখো না।

—গায়ে আমি মাখিনি। কারণ, আমি তো গোড়া থেকেই তৈরি আছি। তবে বেচারা রাজাবাহাদুর জমিদারবাহাদুরদের রাতের ঘুম যাতে নষ্ট না হয় সেইজন্যে তোমাকে জানিয়ে রাখচি, আমি বিলেতে যাবো না—আমার মায়ের নিষেধ। তুমি এ-খবরটা একটু ছড়িয়ে দিও নইলে দেশপ্রেমিক রাজা-জমিদারেরা মিছেমিছি দেশের সম্মান নিয়ে দুশ্চিন্তা ক'রতে ক'রতে শরীর খারাপ ক'রে ফেলবেন!

আবার ডক্‌ট্রিন অব্ ল্যাপ্‌স্! স্বত্ত্ববিলোপ নীতির থাবা!

এবার ব্রিটিশ সিংহের থাবা প'ড়েছে ঝাঁসি রাজ্যের ওপর। নিঃসন্তান রাজা গঙ্গাধর রাওয়ের মৃত্যু আবার একটা সুযোগ এনে দিয়েছে গবর্নর জেনারেল ডালহৌসির সদা উদ্যত থাবার সামনে।

সম্পাদনার দায়িত্ব নেওয়ার আগে মধুবাবুর কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় ক'রে নিয়েছিল হরিশ যে সম্পাদনা কিম্বা প্রকাশিত লেখার মতামতের ওপর তিনি কোনো হস্তক্ষেপ ক'রবেন না।

হিন্দু পেট্রিয়টের পৃষ্ঠায় এবার কলম ছুট্‌লো।

লর্ড ডালহৌসির নির্লজ্জ সাম্রাজ্য বিস্তার—কোম্পানির নিজস্ব আইনের কারচুপি—ভারতীয় এবং য়ুরোপীয় সভ্যতার তুলনা।

হৈ চৈ প'ড়ে গেল ব্রিটিশ মহলে।

ভারতীয় সভ্যতার তুলনায় ব্রিটিশ সভ্যতাকে এত হেয় ক'রে দেখানো হ'য়েছে! ব্রিটিশ সভ্যতা নাকি সেদিনকার শিশু! টমাস মনরো নাকি ব'লেছিলেন, ভারতবর্ষ আর ইংল্যাণ্ডের মধ্যে সভ্যতার বিনিময় করা হ'লে ইংল্যাণ্ডই লাভবান হ'বে? নিতান্ত নির্বোধ ছাড়া এ-কথা কেউ ব'লতে পারে? যদি ব'লে থাকে তাহলে টমাস মনরো হয় নির্বোধ নয়তো বদ্ধ উন্মাদ!

ক'দিন পরেই কর্নেল গোল্ডীর ঘরে একদিন ডাক প'ড়লো।

হরিশ ঢুকতেই টেবিল চাপড়ে গোল্ডী ব'ললেন, এসো হে দুশমন, এসো! তুমি যে একেবারে কেলেঙ্কারী কাণ্ড শুরু ক'রেছ হে!

কর্নেল গোল্ডীর কথার উদ্দেশ্যটা বুঝতে হরিশের অসুবিধে হয়নি।

গোল্ডী হাঃ হাঃ ক'রে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হাসি হেসে ব'ললেন, তুমি কী সব কাণ্ডকারবার আরম্ভ ক'রেছ বলো দিকি? কোম্পানিকে ঠুকচো, গবর্নর জেনারেলকে ঠুকচো, তার ওপর এখন আবার দুই সভ্যতার তুলনা ক'রে হুলুস্থুলু কাণ্ড বাধিয়ে দিলে? তোমার লেখাটা আমি প'ড়েচি। আমি তো অবাক হ'য়ে গেচি, এদেশের সভ্যতা এত প্রাচীন? গ্রীক সভ্যতার চেয়ে প্রাচীন আর কোনো সভ্যতা হ'তে পারে, তা তো আমার ধারণা-ই ছিল না! আমাকে কিছু বইপত্তর দিও তো, আমি একটু প'ড়ে দেখবো।

হরিশ ব'ললে, আমার নিজের তো বেশি বই নেই স্যার। আমাকে লাইব্রেরির ওপর নির্ভর ক'রেই পড়াশোনা ক'রতে হয়।

—তাই তো, ওই মাইনেতে সংসার চালাবে না বই কিনবে? ঠিক আছে, তুমি আমাকে ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে কিছু ভালো বইয়ের একটা তালিকা ক'রে দিও।

—নিশ্চয়ই দেবো স্যার। আমি ভেবেচিলুম, এ-লেখাটা নিয়ে ব্রিটিশ পত্র-পত্রিকায় খুব হৈ-চৈ হবে। সেরকম কিছু অবশ্য দেখচিনে।

—হৈ-চৈ ক'রবে কে? ও লেখার প্রতিবাদ ক'রতে গেলে পেটে কিছু বিদ্যে তো থাকা চাই? চ্যাম্প্নিজ ব'লচিল, লেখাটার ভেতর নাকি অসাধারণ পাণ্ডিত্যের ছাপ আছে। আমি তাকে ব'ললুম, এটা এমন কী নতুন কথা? আরে বাবা, পাণ্ডিত্য আমার আপিসে থাকবে না তো কি ফোর্ট উইলিয়মে থাকবে? তুমি লিখে যাও, থামবে না। হ্যাঁ, আমাকে তোমার হিন্দু পেট্রিয়টের গ্রাহক ক'রে দিও তো! চাঁদা কত?

—বার্ষিক দশটাকা।

—এখন গ্রাহক কত? নিশ্চয়ই হাজার খানক হবে?

—না স্যার, এখনো একশো পঁচিশ ছাড়ায়নি।

—বলো কী?—চোখ বড়ো বড়ো ক'রে কয়েকমুহূর্ত হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইলেন কর্নেল গোল্ডী। —তাহ'লে কাগজ কেমন ক'রে চ'লচে?

—লোকসানে।

—তাহ'লে এক কাজ করো, আমার সঙ্গে চ্যাম্প্নিজকেও গ্রাহক ক'রে নাও। ওর হ'য়ে টাকাটা আমিই এখন দিয়ে দিচ্চি, পরে নিয়ে নেবো।

হরিশ হেসে ব'ললে, কর্নেল চ্যাম্প্নিজ আগেই গ্রাহক হ'য়েচেন স্যার।

—তাইতো, তাহ'লে কী করা যায়?—একটু ভেবে গোল্ডী ব'ললেন, তাহ'লে মিস্টার ম্যাকেঞ্জিকে গ্রাহক ক'রে নাও। তিনি পণ্ডিত ব্যক্তি। তোমার পত্রিকা তাঁকেও পড়ানো দরকার।

কুড়িটা টাকা হরিশের হাতে তুলে দিলেন কর্নেল গোল্ডী। ভাবখানা এমন যেন তাঁরা দু'জন গ্রাহক হ'লেই হিন্দু পেট্রিয়ট লোকসান কাটিয়ে উঠে লাভের মুখ দেখবে!

আন্তরিক আগ্রহেই পত্রিকা প্রকাশ ক'রেছিলেন মধুবাবু। পত্রিকার টাকায় প্রচুর লাভের পরিকল্পনা তাঁর ছিল না। অন্যান্য ব্যবসা থেকেই আয়ের পরিমাণ যথেষ্ট। একটা ছাপাখানা ক'রলে সেই বাবদ কিছু টাকা তো ঘরে আসবেই, কারণ ছাপাখানার চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। তার সঙ্গে একটা পত্রিকা যদি নিজের আয়েই নিজের ব্যয় মিটিয়ে চ'লতে পারে তো মন্দ কী? ক'লকাতার শিক্ষিত সমাজে তাঁর নামটাও পরিচিত হবে, নিজের একটা শখও মিটবে। এই ছিল মোটামুটিভাবে মধুবাবুর হিসেব।

কিন্তু সব হিসেবেই গোলমাল হ'য়ে গেল।

প্রথম ক'মাসের লোকসানকে তিনি গায়ে মাখেননি। হরিশ মুখুজ্যের হাতে কাগজের দায়িত্ব তুলে দেওয়ার পর বছরখানেকের ভেতরেই পত্রিকা লোকসানের ধাক্কা অন্তত কাটিয়ে উঠবে, এটুকু আশা তিনি ক'রেছিলেন। কিন্তু তা হ'ল না।

নানা কারণে স্বাস্থ্যও ভেঙে প'ড়েছে। ডাক্তারের পরামর্শে হাওয়া-বদলের জন্যে বেশ কয়েক মাসের জন্যে পশ্চিমে গিয়ে থাকার পরিকল্পনা ক'রলেন মধুবাবু। একদিন হরিশকে ব'ললেন, দু'বছরের ওপর তো লোকসান টেনেই চ'লেচি হরিশবাবু, আর টানা সম্ভব হচ্চে না। ভাবছি, কাগজটা বন্ধ ক'রে দেবো।

হরিশের মাথায় যেন বাজ পড়লো।

মধুবাবু ব'লতে লাগলেন, কাগজের নাম হ'য়েচে, বিক্রিও আগের চেয়ে অনেক বেশি হচ্চে তা সত্ত্বেও লোকসান তো ঠেকানো যাচ্চে না। অথচ কাগজটা তুলে দিতেও মায়া লাগচে। এই দু'বছর ধ'রে আপনিও একটা কানাকড়ি নেননি অথচ প্রাণ দিয়ে খেটেচেন। সেইজন্যে ভাবচিলুম, ছাপাখানাটা আমার থাক। কিন্তু কাগজটা তুলে না দিয়ে ওর রাইট আপনি যদি কিনে নেন তো আমারও একটু শান্তি হয়।

হরিশের মাথার ভেতর সব যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। মধুবাবু হিন্দু পেট্রিয়টের স্বত্ব তার হাতে তুলে দিতে চাইছেন!

—আমার তো সেরকম টাকা নেই মধুবাবু!

—আপনি যা পারেন তাই দেবেন। আমার যা লোকসান গেচে সে তো আর ফিরবে না? আর, সে দায় আপনার ওপরেও আমি চাপাবো না। কাগজটাকে আপনি কতখানি ভালোবাসেন, সে তো দু'বছরে দেখলুম? আপনার লেখায় দেশের উব্গার হবে। তা জানি ব'লেই কাগজটা আপনার হাতে তুলে দেওয়ার জন্যেই আমার এত ইচ্ছে! আপনি যদি মনে করেন, রাইট বাবদ একটা টাকার বেশি দিতে পারচেন না, তাইই দেবেন! কাগজটা বে'চে থাক্!

অভিভূত স্বরে হরিশ ব'ললে, আমাকে তাহলে দয়া ক'রে কয়েকটা দিন সময় মঞ্জুর করুন মধুবাবু!

—স্বচ্ছন্দে। পশ্চিমে যেতে আমার এখনও মাসখানেক বাকি।

পরের দিনই কর্নেল চ্যাম্প্‌নিজের সঙ্গে দেখা ক'রে সব কথা ব'ললে হরিশ। মনোযোগ দিয়ে শুনলেন চ্যাম্প্‌নিজ। তারপর ব'ললেন, তোমার সামনে একটা বিরাট সুযোগ এসেছে হরিশ! এ সুযোগ তুমি হাতছাড়া ক'রো না! ভদ্রলোক তোমাকে যে প্রস্তাব দিয়েছেন, সে-প্রস্তাব কোনো ব্যবসায়ী দেয় না। কিন্তু এটাও ঠিক, একটা টাকা তো হাতে তুলে দেওয়া যায় না? আমার মনে হয়, অন্তত পাঁচশো টাকা দিতে পারলে তোমার সম্মানটাও বজায় থাকবে!

—কিন্তু আমার টাকা কোথায় স্যার?

—যেমন ক'রে হোক জোগাড় ক'রতেই হবে। তোমার আত্মসম্মানে আঘাত লাগতে পারে ভেবেই আমি একথা ব'লতে চাইছি না যে, আমি ধার দিতে পারি। তুমি মাসে মাসে কিছু কিছু ক'রে শোধ দিয়ে দিও।

হরিশ চুপ ক'রে রইলো। সে কী ব'লবে বুঝতে পারছে না।

কর্নেল চ্যাম্প্‌নিজ স্নিগ্ধ হেসে ব'ললেন, উঃ, জেদি ছেলে বটে তুমি! তোমার কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাছেও ধার নিতে পারো না?

—সেটা আমার ইচ্ছে নয় স্যার।

কর্নেল চ্যাম্প্‌নিজ কয়েকমুহূর্ত কী যেন ভাবলেন। তারপর ব'ললেন, ঠিক আছে তোমার নিজের টাকাতেই হবে।

হরিশ ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ ক'রে তাকিয়ে রইলো।

—তোমার দু'মাসের মাইনে আমি আগাম মঞ্জুর করিয়ে দিচ্চি। কিস্তিতে শোধ ক'রে দিও। এবার তো আপত্তি নেই?

হরিশের মুখে হাসি ফুট্‌লো। ব'ললে, না স্যার।

—তবে সেই সঙ্গে তোমাকে আর একটা পরামর্শ আছে। তোমার কলম তো কাউকে মানবে না তা আমি বেশ ভালো ক'রেই জানি। কখন কী রাজদ্রোহী লেখা লিখে ব'সবে, আর কোম্পানিও তোমার কাগজ বাজেয়াপ্ত ক'রে নেবে। এদিকে আবার সরকারি চাকরি। তাই আমার মনে হয়, যাকে তুমি বিশ্বাস ক'রতে পারো, এমন কোনো নিকট আত্মীয়ের নামে স্বত্ব কিনে নাও। তুমি সম্পাদক থাকো তবে স্বত্ত্বাধিকারী তোমার না থাকাই ভালো।

সব ব্যবস্থা হ'য়ে গেল।

ভবানীপুরে ব্রাহ্মসমাজের সত্যজ্ঞান সঞ্চারিণী সভা হিন্দু পেট্রিয়ট ছাপতে রাজি হ'য়েছে।

পাঁচশো এক টাকা নিয়ে ভবানীপুরনিবাসী বাবু হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের হাতে হিন্দু পেট্রিয়ট সাপ্তাহিক পত্রিকার স্বত্ব বিক্রয় ক'রলেন বাবু মধুসূদন রায়। পত্রিকায় সম্পাদক যিনি ছিলেন তিনিই রইলেন—বাবু হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

বিহ্বল আনন্দে হরিশ দিশেহারা!

হিন্দু পেট্রিয়ট এখন তার! হরিশের পেট্রিয়ট এখন সম্পূর্ণ মুক্ত, অবাধ, স্বাধীন!

॥ পনেরো ॥

আষাঢ়ের শুরু থেকেই বর্ষার সজল কালো ঘনঘটায় আকাশ এ-বছর মেতে উঠেছিলো। ভাদ্র প্রায় শেষ হ'তে চ'ললো কিন্তু বর্ষার জের এখনো মেটেনি।

বৃষ্টি! বৃষ্টি! বৃষ্টি!

এ-ক'মাস ধ'রে বৃষ্টি চ'লেছে অবিশ্রান্ত ধারায়। এর ভেতর মাঝে মাঝে হয়তো কয়েকদিন রোদের মুখ একটু দেখা গেছে; তা-ও ভাঙা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে। কয়েক বছরের ভেতর এত বৃষ্টি হয়নি। সেটা পুষিয়ে নেবার জন্যেই যেন আকাশ ভেঙে জল নেমেছে এবার। বৃষ্টিতো নয়, যেন, আকাশ-ভাঙা ঢল্‌!

আজ সকাল থেকে আকাশ তবু যাহোক একটু পরিষ্কার ছিলো। কিন্তু বিকেল থেকেই আকাশ আবার কালো হ'য়ে এলো। অবিশ্রান্ত মুষলধারে বৃষ্টি। রাত আটটা নাগাদ বৃষ্টি একটু ধ'রেছে। তার কিছুক্ষণ পরে হারাণ আর হরিশ একসঙ্গেই বাড়ি ফিরেছে।

হারাণ এখন হিন্দু পেট্রিয়টের ম্যানেজার। তার নামে পত্রিকার স্বত্ব কিনে নেবার পর পেট্রিয়টের তদারকি, বিলি-ব্যবস্থা সব দায়িত্ব তারই ওপর। সত্যজ্ঞান সঞ্চারিণী প্রেসে রোজ তাকে যেতে হয়। হরিশ তার আপিস ছুটির পর সোজা সেখানে আসে। আজ তো একেবারে কাক-ভেজা ভিজেই এসেছে। ভাড়াটে ছ্যাকরা গাড়িতে কি আর এই বৃষ্টি মানায়? পোশাক-পত্তর ভিজে একেবারে এক্‌সা! সেই ভেজা গায়ে ব'সেই প্রুফ দেখেছে, ডাকের চিঠিপত্র প'ড়েছে, তা-ছাড়াও দু'চারটে টুক্‌টাক্‌ কাজ সেরেছে।

হারাণ একবার ব'লেছিলো, এই ভিজে গায়ে এখানে ব'সে প্রুফগুলো না দেখে তুই বরঞ্চ বাড়িতে নিয়ে যা। কাল সকালে আসার সময় আমি হাতে ক'রে নিয়ে আসবো।

কিন্তু কে শোনে কার কথা? সে যা ক'রবে তা ক'রবে। শুধু কি আজ? এই বর্ষা আরম্ভ হওয়ার পর থেকে এই ক'মাসে বেশ কয়েকদিন এইভাবে আপিস ফেরতা পথে ভিজে চুপ্‌সে এসেছে, কাজ ক'রতে ক'রতে এখানে ব'সেই গায়ে জল শুকিয়েছে, তারপর বাড়ি ফিরতে কোনোদিন রাত দশটা, কোনোদিন বা এগারোটা। কোনো কোনোদিন গায়ের জল-ও হয়তো শুকোয় না। হরিশ নির্বিকার। সেই অবস্থাতেই কাজ ক'রে চলে!

প্রায় তিনবছর আগে এক বৃহস্পতিবারে হিন্দু পেট্রিয়ট প্রথম বেরিয়েছিলো। তখন থেকে সেই নিয়ম-ই চ'লে আসছে। পত্রিকা ভবানীপুরে চ'লে আসার পরেও সে-নিয়মের ব্যত্যয় ঘটেনি। ঝড়, জল, ভূমিকম্প যা-ই হোক না কেন, প্রতি বৃহস্পতিবার হিন্দু পেট্রিয়ট বেরোবেই।

নিজের সহোদর ভাই। হরিশের একরোখা জেদের সংগে হারাণের আশৈশব পরিচয়। সুতরাং এই ধরনের ব্যাপারে তার অবাক হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু এটা সে কিছুতেই বুঝতে পারে না, নিতান্ত কোনো কার্য-কারণে কোন একটা সপ্তাহে পত্রিকা যদি একদিন পরেই বেরোয়, তাতে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়ে যাবে?

রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে দিব্যি মেজাজে ব'সে হুঁকো টানছিলো হারাণ। আজ ক'দিন ধ'রেই একটা প্রসংগ নিয়ে হরিশের সংগে তার একটু আলোচনা করবার ইচ্ছে, কিন্তু অবকাশ-ই হচ্ছে না। তাছাড়া, হরিশ নিজে প্রসংগটা না তুললে তার পক্ষে আগ বাড়িয়ে তা নিয়ে কথা বলা ঠিক হবে কিনা, সে-সম্বন্ধেও হারাণের দ্বিধা আছে।

যে-প্রসংগ নিয়ে হরিশের সংগে একবার আলোচনা করবার আগ্রহ হারাণের, সেটা সে শুনেছে হরিশের ঘনিষ্ঠ বন্ধু শম্ভুনাথ পণ্ডিতের কাছে। হরিশ নিজে কিন্তু কিছুই বলেনি। অথচ হারাণ তো পত্রিকার ম্যানেজার? পত্রিকার আরো উন্নতির জন্যে তারও তো চিন্তা-ভাবনার দায়-দায়িত্ব আছে?

আবার ঝম্‌ঝম্‌ ক'রে বৃষ্টি নামলো।

তার একটু পরেই হেঁসেলের পাট চুকিয়ে ঘরে এলো বড়োবৌ। চূড়ান্ত বিরক্তির সংগে বরুণদেব এবং বিধাতাপুরুষের উদ্দেশ্যে একটা স্বগতোক্তি ক'রে সে আলনার কাছে এগিয়ে গেল। একে হেঁসেলের কাপড়, তায় আবার দফায় দফায় ভিজেছে।

হারাণ জিজ্ঞেস ক'রলে, হরিশ খেয়েচে?

আলনা থেকে একখানা ধোয়া শাড়ি নিতে নিতে বড়োবৌ ব'ললে, ঠাকুরপোর খাওয়া তো নয়, গেলা। ভাত বেড়ে দিতে না দিতেই খাওয়া শেষ। গপ্‌ গপ্‌ ক'রে গোগ্গেরাসে গিলেই উঠে পড়ে। ওইভাবে খেয়ে কোনো তিপ্তি হয় গা?

হারাণ হেসে ব'ললে, ছেলেবেলা থেকেই ওই তো ওর স্বভাব!

—তা আর জানিনে? গপ্‌গপ্‌ ক'রে গিললেও আগে তবু দু'মুঠো ভাত পেটে যেতো। একন তো আর সে-বালাইও নেই! দিন-রাত অত মদ গিললে কি পেটে জায়গা থাকে?

হারাণ কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে তারপর ব'ললে, হুঁ, মদ খাওয়াটা ওর দিনকে-দিন বেড়েই চ'লেছে দেখচি। ওর বন্ধু যারা পত্রিকার আপিসে আসে তারাও একই কথা বলে।

—তা আর ব'লবে না কেন? শুধু মদ খাওয়া হ'লেও বা কথা ছিলো, তার সংগে যে অন্য উপসংগ-ও দেখা দিয়েচে! মাঝে মাঝে রাতে যে বাড়ি ফেরে না, তা জানো? কোথায় যায়?

হারাণ ব'ললে, কোথায় আবার? বন্ধুবান্ধবের বাগানে।

মুচ্‌কি হেসে বড়োবৌ ব'ললে, ওই বিশ্বেস নিয়েই থাকো! তোমার সোদর ভাই, শুনলে তোমার খারাপ লাগবে, তাই আমি কিছু বলিনে। বেশতো, ছোটোবৌ যদি মন যোগাতে না পারে

তো আর একটা ডাগরডোগর মেয়েকে বে' ক'রে ঘরে নিয়ে এলেই হয়! মদ খেয়ে রাঁঢ় মাগীদের ঘরে প'ড়ে থাকার দরকার কী?

হারাণ সবই জানে, সবই শুনেছে।

তার ধারণা, বাড়ির আর কারো কানে এসব কথা যায়নি। সুতরাং কাউকে কিছু বলবার-ও দরকার নেই। যে বড়োবৌয়ের কাছে সব কথা না ব'ললে তার পেটের ভেতর গজগজ করে, সেই বড়োবৌকে পর্যন্ত সে কিছু বলেনি। এখন দেখা যাচ্ছে, বড়োবৌ সবই জানে!

আজকের কলকাতায় হরিশ মুখুজ্যে একটা অতিপরিচিত নাম। হরিশ যদি আর পাঁচজন ছাপোষা গেরস্তের মতো একজন হ'ত তা'হলে তার ব্যাপারে নিতান্ত আত্মীয়-স্বজন পাড়াপড়শি ছাড়া আর কেউ গুজগুজ ফুস্‌ফুস্‌ ক'রতো না। তার গতিবিধি নিয়েও এত খোঁজ-খবর রাখ'তো না সাধারণ মানুষ।

কিন্তু হরিশ মুখুজ্যের কথা যে একেবারে আলাদা! বড়োলাট, ছোটলাট থেকে শুরু ক'রে এদিকে ইংরিজিনবিশ বাঙালি বাবুরা সবাই জানে তাকে। সেই কারণেই তার সব রকম গতিবিধির কথা লোকের মুখেই ছড়িয়ে পড়ে। হারাণের কাছেও তো পাঁচকান হ'য়েই কথাটা এসেছে।

হুঁকোয় মৌজ ক'রে একটা টান দিয়ে একগাল ধোঁয়া ছেড়ে হারাণ ব'ললে, দ্যাখো বড়োবৌ, এসব নিয়ে মিছে মাথা না ঘামানোই ভালো। সত্যি কথা ব'লতে কি, যাদের সঙ্গে হরিশের ওঠা-বসা, তাদের কাছে দু'টো মেয়েছেলে রক্ষিতা রাখা কিম্বা একটু আধটু পতিতা-পল্লীতে যাওয়া নেহাৎ-ই ডাল-ভাতের মতো।

—নিকুচি ক'রেছে তোমার ডাল-ভাতের! এদিকে ঘরের মাগেরা শুকিয়ে হেদিয়ে মরবে আর ঊদিকে বাবুরা যাবেন বাজারের মেয়েছেলে নে' ফুর্ত্তি করতে!

একটু থেমেই বড়োবৌ আবার ব'ললে, আর ছোটোবৌকেও বলিহারি যাই! ঝগড়ুটে অলুক্ষুণে স্বভাব তো জীবনে শোধরাতে পারবি নি, তাই ব'লে নিজের ভাতারকে কেমন ক'রে বশে রাখ'তে হয়, এতখানি বয়েসে তা-ও শিখলি নি?

হারাণ নীরবে হুঁকো টানতে লাগলো।

সে ভাসুর। ভাদ্দরবৌ সম্বন্ধে এ-জাতীয় আলোচনায় তার বড়ো সঙ্কোচ। কিন্তু উপায় নেই। বড়োবৌ যতক্ষণ বক্‌বক্‌ ক'রে যাবে, ততক্ষণ তাকে শুনতেই হবে।

বড়োবৌ ব'লতে লাগলো, পাজির পা-ঝাড়া মাগী বটে! হাসিমুকে একটা কথা ব'লতে জানে না গা? দিনের পর দিন এই ক'রেই তো ঠাকুরপোর মনটাকে একেবারে তিতি-বিরক্ত ক'রে ছেড়েচে! যার স্বভাব এমনধারা, তার ভাতার কিসের টানে তাকে সোয়াগ ক'রতে যাবে বলো?

হারাণ মৃদুস্বরে ব'ললে, এসব কথা থাক বড়োবৌ!

—আমি তো আর পাড়াপড়শিকে ডেকে বলতে যাচ্চিনি, তোমার কাছেই বলচি। সত্যি কথা ব'লতে কি আবাগির ওপর যতো রাগই হোক না কেন, মাঝে মাঝে ওর কথা ভেবে বড়ো কষ্টও হয় গো! ঠাকুরপোর দেশজোড়া এত নাম-ডাক, অথচ তেমন মানুষের পরিবার হ'য়েও কিনা কপালে ওর কোনো সুখ নেই? নিজে তো সুখ-সোয়াগের মাথা খেয়েচে, এমন কি, ঠাকুরপোর সুখ-শান্তিটুকু পজ্জন্ত নষ্ট ক'রেচে?

হারাণ একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ব'ললে, সবই কপাল বড়োবৌ!

বড়োবৌ শাড়ি পালটে একটা পান মুখে দিলে। জর্দার শিশি থেকে একটু জর্দা ঢেলে নিলে হাতের তেলোয়।

হারাণ হেসে ব'ললে, তোমার জর্দার সুগন্ধ দিনকে দিন বাড়চে দেখচি!

অপাঙ্গে তাকিয়ে কিশোরী-সুলভ একটু মুচকি হেসে বড়োবৌ ব'ললে, বাড়বেই তো! নাও, এখন হুঁকোর ভড়্‌ভড়্‌ থামাও দিকিনি!

—নেশা ব'লতে সামান্য এই একটু তামাক খাই, তাতেই তোমার এত আপত্তি? আর যদি হরিশের মতো মদ খেতুম?

—ইস্, খেতে দিলে তো? মদের বোতল ছুঁড়ে ফেলে দিতুম না আমি? না বাপু, তোমাকে আর মদ-টদ খেতে হবে না, ওই হুঁকো পজ্জন্তই তোমার বরাদ্দ। তুমি কেনই বা খাবে শুনি? যারা ইংরিজি প'ড়েচে, তারা মদ খায়। তুমি তো আর ইংরিজি পড়োনি?

বড়োবৌয়ের কথাটা সংশোধন ক'রে দিয়ে হারাণ ব'ললে, যারা ইংরিজি প'ড়েচে, তারা খায় বিলিতি মদ, যারা ইংরিজি পড়েনি, তারা খায় ধেনো।

বড়োবৌ ব'ললে, যার যা খুশি করুক, তোমাকে আমি ও-সব ছাই-পাঁশ গিলতে দেবো না বাপু!

—তোমার কোনো চিন্তা নেই বড়োবৌ, এতখানি বয়েস পজ্জন্ত যখন হুঁকো আর তোমাকে নিয়েই জীবন কেটে গেল, তখন বাকি জীবনটাও তাই কেটে যাবে।

বড়োবৌ আর একবার অপাঙ্গে তাকিয়ে মুচ্‌কি হাসলে। সোয়ামিকে সে কুন্‌কি হাতির মতো বশে রেখেছে, এ তার রীতিমতো দেমাক।

একটু পরেই বড়োবৌয়ের গলার স্বর কেমন যেন একটু আবিষ্টের মতো হ'য়ে গেল। হারাণের পাশে ব'সে মৃদুস্বরে সে ব'ললে, হ্যাঁ গা, তুমিও ইংরিজি প'ড়লে বোধ হয় ভালোই হ'ত! ঠাকুরপোর মতো কত নামডাক হ'ত তোমার!

হারাণ হেসে উত্তর দিলে, ইংরিজি প'ড়লেই কি যে কেউ হরিশ মুখুজ্যে হ'তে পারে বড়োবৌ? ওর সঙ্গে আমাকে তুলনা ক'রতে যেও না।

—কেন?

একটু যেন আহত স্বর বড়োবৌয়ের।

ভ্রাতৃগর্বে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো হারাণের মুখ। বড়োবৌয়ের আহত কণ্ঠস্বর তার কানে বাজেনি। আপন আবেগেই সে ব'ললে, শুধু আমি ব'লচিনে বড়োবৌ, হরিশের বন্ধুরাই বলে, ওর ভেতর নাকি বিরাট প্রতিভা আছে। তার তুলনায় আমি? ইংরিজি পড়লে বড়োজোর একটা রাইটার হ'তে পারতুম, তার বেশি নয়।

আরো ক্ষুব্ধ বেদনাহত স্বরে বড়োবৌ ব'ললে, তোমরা তো সোদর ভাই; দু'জনার গায়ে একই রক্ত বইচে। নিজেকে তুমি এত ছোটো ভাবো কেন গা?

—ছোটো বড়োর কথা নয় বড়োবৌ! যা সত্যি তাই ব'লচি। গায়ে একই রক্ত থাকলে কী হবে, হরিশ একেবারে আলাদা ধাতের মানুষ। ওকে তো আজ তুমি এই নতুন দেখচো না, সেই ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসচো! কি রকম এক বগ্‌গা জেদি ছেলে, তা একবার ভেবে দ্যাখো দিকিনি? ওর সেই ছোটোবেলার কথাটা তোমার মনে আচে? সেই পাদরি সাহেবের ইস্কুলে পড়বার সময় একটা মাতাল গোরাকে ঠেঙিয়েচিলো?

—মনে নেই আবার? মাগো মা! ওই একরত্তি ছেলে একটা গোরা সাহেবকে ঠেঙিয়ে এয়েচে শুনে ভয়ে আমার তো হাত-পা সিঁটিয়ে গিয়েচিলো গা!

—তখন ঠেঙিয়েচিলো হাতে, এখন ঠেঙাচ্চে কলমে!—উচ্ছ্বসিত আবেগে হারাণ ব'ললে, ফি হপ্তায় ওর যে লেখাগুলো পেট্রিয়টে বেরোয় তার যে কি তেজ তা আমি কাগজের আপিসে ব'সে থাকি ব'লে বুঝতে পারি! ওর যে-সব বন্ধুরা আসে, তাদিগের আলাপ-আলোচনা থেকে কিছুই বুঝতে আমার বাকি থাকে না। ওর সঙ্গে ইস্কুলে পড়তো সেই যে কালাচাঁদ আর যদুগোপাল, তারা না লিখলেও মাঝে মাঝে আসে। তারা এখন সদর আদালতের উকিল। কালাচাঁদ মাঝে মাঝেই আমাকে আড়ালে ডেকে বলে, হারাণদা, আমি অন্তত জানতুম, ও এইরকম-ই একটা কিছু হবে! ঠিকই বলে তারা। আমি তো ছাই ইংরিজি বুঝিনে, কিন্তু এটুকু বুঝতে পারচি, কাউকেই পরোয়া ক'রে চ'লতে ও রাজি নয়। কোম্পানির আপিসে চাকরি ক'রেও গোরা

সায়েবদের অনেষ্য কাজের বিরুদ্ধে কলম ধ'রতে ও পেছপা নয়। তুমি যা-ই বলো বড়োবৌ, এতখানি বুকের পাটা দেখানো আমার পক্ষে সম্ভব হ'ত না, তা আমি অকপটে স্বীকার ক'রচি।

কয়েকমুহূর্ত স্বামীর মুখের দিকে চুপ ক'রে তাকিয়ে রইলো বড়োবৌ। তারপর স্নিগ্ধ মৃদুস্বরে ব'ললে, না গো, ঠাকুরপোকে আমি খাটো ক'রচিনে। সব রকম গুণই কি সব্বায়ের চরিত্তিরে থাকে? তবে কিনা, এই যে সোদর ভেয়ের উপর তোমার এত মনের টান, এ-ও কি কিছু কম?

—হাজার হোক রক্তের টান তো! তাছাড়া এমন সোদর ভাইকে নিয়ে কার না গর্ব হয় বলো? জানো বড়োবৌ, আমি হরিশ মুখুজ্যের দাদা শুনলে লোকে রীতিমতো সমীহ ক'রে আমার দিকে তাকায়!

এ-ব্যাপারটা বড়োবৌ নিজেও কিছু কিছু বুঝতে পেরেছে। একসময় এ-সংসারে ব'লতে গেলে চালচুলো ব'লে কিছু ছিলো না। এখন তা আর বোঝবারও উপায় নেই। বিশেষত, ঠাকুরপো এই নতুন বাড়িটা তোলার পর থেকে পাড়াপড়শির চোখে সবিস্ময় সম্ভ্রমের চাউনিটা সে বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পারে। সে-চাউনির ভেতর ঈর্ষার জ্বালাও মিশে থাকে। তা থাকে থাক। বড়োবৌ তা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না। হরিশের বড়ো ভাজ হিসেবে এখন তার খাতির-ই আলাদা। আর শাশুড়ির ব্যাপারে তো কথাই নেই। হরিশ মুখুজ্যের মা ব'লে তাঁরও এখন খাতির কত! যারা কোনোদিন ডেকে খবর নেয়নি, তারাই এখন কত ছল-ছুতো ক'রে আসে, কত তোয়াজ ক'রে কথা বলে!

রুক্মিণী তো আজকাল প্রায়ই জাঁক ক'রে বলেন, দ্যাখো বড়ো বৌমা, ব'লেচিলুম না, আমার হরিশ একদিন মানুষের মতো মানুষ হবে? একডাকে আমার হরিশকে লোকে চিনবে?

আগে কখনো শাশুড়ি এ-কথা এমন জোর দিয়ে ব'লেছেন ব'লে মনে পড়ে না বড়োবৌয়ের। তবুও শাশুড়িকে খুশি করবার জন্যে সায় তাকে দিতেই হয়। সে বেশ ভালো ক'রেই জানে, মা-অন্ত প্রাণ ঠাকুরপোর। ইংরিজিনবিশ পণ্ডিত-ই হোক আর বেহ্ম-ই হোক, মায়ের কোনো কথা অমান্য করে না ঠাকুরপো। সেই মানুষের রোজগারেই এতবড় সংসারটা চ'লছে। আর, সংসারের বোঝা ব'লতে তার দিকেই তো পাল্লা ভারী। হারাণ না হয় আজ মাস তিনেক হ'ল ইংরিজি কাগজটার ম্যানেজার হ'য়েছে। তাও সেই ছোটো ভাইয়ের-ই দয়ায়।

নতুন ছোটোবৌ যে আঁটকুড়ি, সে তো বড়োবৌয়ের পক্ষে ভগবানের আশীর্বাদ! নইলে এই কয়েক বছরের ভেতর সে আবাগী যদি পেটে কয়েকটা ধরতো আর ঠাকুরপোও যদি স্বার্থপর হ'ত তাহ'লে এতগুলো ছেলেপুলে নিয়ে কী হাল হ'ত আজ তার? সেই কবে থেকে মুখ বুজে দাদার সংসারের সব ঝক্কি পুইয়ে চ'লেছে ঠাকুরপো। এমন লক্ষ্মণের মতো ভাই ক'জন পায়?

—কী ভাবচো?

হারাণের গলায় স্বরে সম্বিত ফিরে পেয়ে বড়োবৌ ব'ললে, তোমার কথাই ঠিক গো!

একগাল আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে হারাণ ব'ললে, দ্যাখো, হারাণ মুখুজ্যে মুখ্যু হ'তে পারে কিন্তু বেঠিক কথা বলে না। এইতো দ্যাখো, হরিশকে নিয়ে এত বাখান করচি অথচ একসঙ্গে কাজ ক'রতে গিয়ে এরই ভেতর একটা ব্যাপারে হরিশের ওপর আমি বিলক্ষণ রেগে গেচি।

সভয়ে বড়োবৌ ব'ললে, কেন, কী হ'য়েচে?

—আর বলো কেন? ওর ওই একরোখা গোয়ার্তুমির জন্যে এমন একটা ভালো সুযোগ বোধহয় হাতছাড়া হ'য়ে যাবে।

—কিসের সুযোগ?

—আমাদের পেট্রিয়টের। কাগজের গ্রাহক দিনকে দিন বাড়চে, কদর-ও বেড়ে চ'লেচে। অথচ ছাপার এমনি হাল যে, লোকের পাতে দেওয়া যায় না! আরে বাবা, বেহ্ম ছাপাখানা হ'লেই হ'ল? মান্ধাতার আমলের ভাঙা ভাঙা টাইপ দিয়ে কি আর ছাপার কাজ চলে? এই যে ইংলিশম্যান,

হরকরা, ফ্রেন্ড অব্ ইণ্ডিয়া, ক্যালকাটা রিভিউ—সব কাগজ-ই তো আমাদের আপিসে আসে। কি ঝক্‌ঝকে ছাপা! আর আমাদের? কোথাও টাইপ ভাঙা, কোথাও ছাপা জেব্‌ড়ে গেচে, কোথাও বা ছাপাই পড়েনি! এত সত্ত্বেও পেট্রিয়ট এখনো বাজারে প'ড়তে পায় না, বেরোতে না বেরোতেই বিক্রি হ'য়ে যায়। অথচ সেই কাগজের ম্যানেজার হিসেবে এত খারাপ ছাপা আমার ভালো লাগে, বলো?

বড়েবৌ সহজ সমাধান ক'রে দিলে, তা, ভালো ক'রে ছাপলেই তো ঝামেলা চুকে যায় বাপু!

—আহা, কত সহজে ঝামেলা চুকিয়ে দিলে তুমি! কেমন ক'রে ছাপা হয়, তা জানো? ছাপাখানা কখনো চোখে দেখেচো?

—মরণদশা! আমি ঘরের বৌ, আমি আবার ছাপাখানা দেখতে যাবো কোন দুঃখে?

উত্তেজিতভাবে হুঁকোয় একটা বড়ো টান দিয়ে হারাণ ব'লল, সীসের তৈরি টাইপ সাজিয়ে ছাপার মেশিনে চাপিয়ে তাতে কালি মাখিয়ে তবে ছাপা হয়, বুঝেচো? —পাইকপাড়ার সিংঘি রাজাদের নাম শুনেচো?

আচম্‌কা সীসের টাইপ থেকে প্রসঙ্গটা পাইকপাড়ার সিংঘি রাজাদের ওপর গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার ফলে কিছুই বুঝতে না পেরে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে বড়োবৌ ব'ললে, কে আবার সিংঘি রাজা? না বাপু তাদের নাম আমি জানিনে।

—অবিশ্যি তুমিই বা জানবে কোত্থেকে? পাইকপাড়ার রাজারা দুই ভাই—প্রতাপ সিংঘি আর ঈশ্বর সিংঘি। বড়ো রাজা প্রতাপ সিংঘি নাকি নিজে যেচে ব'লেচেন, পেট্রিয়ট পত্রিকার জন্যে নতুন নতুন টাইপ কিনে একেবারে আন্‌কোরা নতুন একটা ছাপাখানা ক'রে দিতে তিনি রাজি আছেন। কিন্তু তিনি রাজি থাকলে কী হবে, শুই গোঁয়ারটা যে রাজি নয়!

চোখ বড়ো বড়ো ক'রে বড়োবৌ ব'ললে, কী ব'লচো গো! এমন সুযোগ কেউ হাতছাড়া করে? ঠাকুরপো রাজি হচ্চে না কেন?

—সে কথা তোমার ঠাকুরপোকেই জিজ্ঞেস ক'রে দেখো। আচ্ছা, বলো দিকি, অতবড়ো রাজাবাহাদুর লোক যেচে এতবড়ো উব্‌গারটা ক'রতে চাইচেন আর তুই কিনা নারাজ হলি? এমন ক'রে সাধা-লক্ষ্মী কেউ পায়ে ঠেলে?

বড়োবৌ কিছু একটা ব'লতে যাচ্ছিলো, কিন্তু তার মুখের কথা মুখেই র'য়ে গেল। হঠাৎ মট্‌মট্ ঝন্‌ঝন্ শব্দে সারা বাড়িটা উচ্চকিত হ'য়ে উঠ্‌লো। মাটির হাঁড়িকুড়ি, কাঁসার বাসন সব গিয়ে আছড়ে প'ড়ছে ভেতরের উঠোনে। বৃষ্টির ঝম্‌ঝম্ শব্দ আর সেই সঙ্গে রুক্মিণীর তীক্ষ্ন, কর্কশ চিৎকার।

—ওলো আঁটকুড়ি, ওলো কপালখাগি, তুই কি এ-সংসারে আগুন না জ্বালিয়ে ছাড়বি নে? ভর-ভরন্ত একাদশীর দিন এয়োরা ধুম জ্বর গায়েও আঁশমুখ করে। আর তুই কিনা বাড়া-ভাতে জল ঢেলে শগ্‌ড়িমুখ না ক'রেই পালঙ্কে শুতে গেলি? ওলো হারামজাদি মড়ি পোড়ানীর ঝি, ওলো শতেক খোয়ারি, যার নামে তোর হাতের নোয়া, সি'তের সি'দুর তার ভালোমন্দের কথা ভেবেও তোর বুক একবার কাঁপে না লা? হায় ভগমান, এ কী ডাইনি মাগীই তুমি আমার কপালে দিলে গো!

মাটির হাঁড়িকুড়ি একটাও আস্ত রইলো না। উঠোনে জল থাকায় কাঁসার বাসন দু'একখানা ছাড়া বাকিগুলো ফাটতে পারেনি। কিন্তু কারো কিছু করবার নেই। ঘরের বাসনকোসন সবগুলো যতক্ষণ না উঠোনে গিয়ে আছড়ে পড়বে ততক্ষণ থামবেন না রুক্মিণী। শেষ বাসনখানা ছুঁড়ে ফেলে হাঁপাতে থাকেন, তারপর হয়তো ঝর্‌ঝর্ ক'রে কেঁদে ফেলবেন। যতক্ষণ দম থাকবে ততক্ষণ চ'লবে অবিশ্রান্ত চিৎকার আর গালিগালাজ।

আগে এতখানি ছিলো না। আজকাল কিছুদিন হ'ল, এই উপসর্গ দেখা দিয়েছে। প্রচণ্ড রেগে গেলে হাঁড়ি-কুড়ি বাসন-কোসন সব ছুঁড়ে ভেঙে তবে তাঁর শান্তি।

হ্ুঁকোটা নামিয়ে রেখে হারাণ বেরোতে যাচ্ছিলো, বড়োবৌ তাকে বাধা দিলে।

—তুমি আবার যাচ্চো কেন?

—একজন কেউ যেতে হবে তো? একাদশীর নিরম্বু উপোসে থেকে এখন এই মাঝরাতে এইভাবে নাগাড়ে চেঁচাতে থাকলে মায়ের শরীর-ই অসুস্থ হ'য়ে প'ড়বে যে!

—তুমি গিয়েও কি মাকে থামাতে পারবে? সবই তো জানো। বাসন-কোসন সব ফেলা হ'য়ে গেলে মা নিজেই থেমে যাবেন। হয়তো ছোটোবৌ ওখানেই দাঁড়িয়ে রয়েচে। তোমার গে' দরকার নেই, আমিই যাচ্চি।

ছোটোবৌ আজ রাতে যে কিছুই মুখে দেয়নি, বড়োবৌ তা জানে। বড়ো জাকে আগেই সে ব'লেছিলো, মাথা ধ'রেছে। বড়োর যত জ্বালা! ছোটো জায়ের কাছে নিত্য তিরিশদিন ভাতের খোঁটা খেয়েও তাকে তোয়াজ ক'রেই চ'লতে হয়। বড়োবৌ তাকে আর পেড়াপীড়ি করেনি।

সবই হয়তো চাপা থাকতো কিন্তু হারাণের মেজো মেয়ে কুমুদিনী গিয়েই রুক্মিণীর কানে কথাটা তুলেছে।—জানো ঠাক্‌মা, আজ রাতে খুড়িমা কিছুই খেলে না।

তারপরই ঘটনার সূত্রপাত।

হরিশ তন্ময় হ'য়ে পরের সপ্তাহের পেট্রিয়টের কয়েকটা লেখা নিয়ে ব'সেছিলো। ছোটোবৌ কখন ঘরে এসে শুয়ে প'ড়েছে তাও সে খেয়াল করেনি।

ডাচ্‌ ক্ল্যারের একটা বোতল নিঃশেষ প্রায়। দু'টো প্রবন্ধও সম্পূর্ণ হ'য়ে গেছে। বোতলের বাকি পানীয়টুকু গলায় ঢেলে দিয়ে সবে সে তৃতীয় প্রবন্ধে হাত দিয়েছে, সেই সময়েই শুরু হ'ল ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ আর রুক্মিণীর চিৎকার।

সুর কেটে গেল হরিশের।

তীব্র বিরক্তিতে ভ'রে উঠ্‌লো তার মুখ। কলমটা রেখে সে উঠে দাঁড়ালে।

বিছানায় নিঃসাড়ে শুয়ে আছে ছোটোবৌ। টেবিলের সেজবাতি থেকে এক চিলতে আলোর রশ্মি গিয়ে প'ড়েছে তার মুখের ওপর। না, সে ঘুমোয়নি। চোখ চেয়ে নির্বিকার অবহেলায় শাশুড়ির সব কথাই সে শুনছে। কোনো প্রতিক্রিয়া নেই, কোনো উত্তেজনা নেই—সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত একটা বোবা পুতুল যেন!

হরিশের সঙ্গে চোখাচোখি হ'তেই মুহূর্তের ভেতর কী যেন হ'য়ে গেল ছোটো বৌয়ের। চোখ দু'টো ছল ছল ক'রে উঠলো তার। ক্ষীণ আলোতেও দেখা গেল, নির্বিকার বোবা পুতুলটার চোখের কোণে ওইটুকু দু'ফোঁটা জলের ভেতরেই উদ্গত কান্নার একরাশ ঢেউ এসে যেন আছড়ে প'ড়ছে।

রুক্মিণী তখনো তারস্বরে চিৎকার ক'রে চ'লেছেন।

বাইরে বৃষ্টির প্রচণ্ড ঝম্‌ঝম্‌ শব্দ। তারই ভেতর তখনো একটা দু'টো বাসন ছুঁড়ে ফেলার ঝন্‌ঝনানি।

হরিশের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন একটা দূরাগত নিস্পৃহ স্বরে ছোটোবৌ ব'ললে, আমাকে নিয়ে তোমাদের সংসারে বড়ো অশান্তি, তাই না গো?

॥ ষোলো ॥

কলকাতায় দুর্গোৎসবের পালা এ-বছরের মতো মিটেছে।

কয়েকদিনের জন্যে হঠাৎ বড়ো বেশি চটুল হ'য়ে ওঠে দুর্গোৎসবের কলকাতা। প্রতি বছর-ই সে চটুলতা যেন বাড়ছে।

আগে যখন রাজা নবকৃষ্ণ, দেওয়ান শান্তিরাম সিংঘি কিম্বা দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংঘি দুর্গোৎসব ক'রেছেন তখন তার জৌলুষ ছিল আলাদা। এখন ক'লকাতায় নেটিব জেন্টুদের

সংখ্যাও যেমন বেড়েছে তেমনি হালচালেও ঘ'টেছে হেরফের। শুধু পুরনো বনেদি ঘরেই দুর্গাপুজো সীমাবন্ধ নেই, ছড়িয়ে প'ড়েছে নতুন নতুন উঠ্‌তি ঘরেও।

পুজোর মাস দুয়েক আগেই কর্মচঞ্চল হ'য়ে ওঠে কুমোরটুলি আর সিদ্ধেশ্বরীতলা। কৃষ্ণনগর থেকে আসতে শুরু করে প্রতিমা গড়ার কারিগরেরা। শান্তিপুর আর ঢাকা থেকে কাপড়ের পাইকার-মহাজনদের আনাগোনা শুরু হ'য়ে যায়। আতরওয়ালার দল সারা বছরের রোজগার এই মরশুমে তুলে নেওয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। দোকানে দোকানে নতুন সাজ। নতুন নতুন রংবাহারি টুপি, চাপকানের বোঁচকা কাঁধে নিয়ে দোরে দোরে ঘুরে বিক্রি ক'রে বেড়ায় দর্জিরা। দুর্গোৎসবের সময় ছোটো ছোটো ছেলেদের নতুন পোশাক দেওয়ার রেওয়াজ বেশ চালু হ'য়ে গেছে।

আর একদিকে দুর্গোৎসবের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটা রূপ। সে রেওয়াজটাও অবশ্য আগে থেকেই চ'লে আসছে। বাইজি, বিলিতি মদ আর দিশি-বিলিতি খানার পেছনে লাখো লাখো টাকা ব'য়ে বেরিয়ে যায় জলস্রোতের মতো। সাচ্চা জরির কাজ-করা চোখ-ধাঁধানো সল্‌মা-চুমকির জৌলুষ-ভরা শাটিনের পোশাক ঝল্‌সে উঠতে থাকে রূপসী যুবতী বাইজির অঙ্গে। বেলজিয়ম কাচের বহু দামী ঝাড়লণ্ঠনের আলোয় ঝিলিক মারতে থাকে বাইজির দেহাবরণ; উন্মুখর হ'য়ে ওঠে তার বিলোল কটাক্ষের ভাষা। কিছুকাল আগে পর্যন্তও সেরা বাইজিদের পোশাকের সঙ্গে নাকি থাকতো ঢাকাই মস্‌লিনের মানানসই মেশামিশি—মস্‌লিনের আবক্ষ ফ্রিল আর মস্‌লিনের ওড়না। এককালের সেরা বাইজি ছিল নিকি বাইজি। রাজা রামমোহনের বাড়িতে আর প্রিন্স দ্বারকানাথের বাগান বেলগাছিয়া ভিলার মাইফেলে সে বেশ কয়েকবার নেচে গেছে। তার পরণের ঘাঘরায় নাকি রঙীন মস্‌লিনের ফ্রিল দেওয়া থাকতো। এখন আর মস্‌লিন কই? ম্যাঞ্চেস্টারের মিহি কাপড়ই এখন বাইজির মস্‌লিনের অভাব মেটায়।

আগেকার মতো পোশাক নেই ব'লে কি বাইনাচ হবে না? বন্ধ হয়নি বাইনাচ। পোশাকের ধরন পাল্‌টেছে। মুজ্‌রো দেনেওয়ালা বাবুদের মদের ঘোরে লাল চোখকে তৃপ্তি দেবার জন্যে পোশাকে যেটুকু পরিবর্তন করা দরকার, তা ক'রে নিয়েছে চৌকস বাইজিরা। সারেঙ্গি-তবলার তান-লয়ের সঙ্গে তালে তালে ঝুম্‌ ঝুম্‌ ক'রে ওঠে বাইজির পায়ের ঘুঙুর, ঝিলিক মারতে থাকে জরি-বসানো কাঁচুলি, উৎসারিত হ'য়ে যায় মদের ফোয়ারা, উদ্‌যাপিত হয় দুর্গোৎসব—দ্য গ্র্যান্ড ফেস্টিভ্যাল! ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সযত্নে তা-দেওয়া ডিম ফুটে বেরোনো দেওয়ান, বেনিয়ান, মুন্‌শি, মুৎসুদ্দি আর দালালদের কলকাতা যেন দিশেহারা হ'য়ে ওঠে দুর্গোৎসবে। খোলা সড়ক আর চোরা-সুড়ঙ্গে রোজগারকরা অজস্র টাকা খরচ করবার জন্যে মনের মতো একটা উপলক্ষ্য তো চাই? তাই দরাজ হাতে ব্যয়।

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বিদায়, কাঙালি বিদায়—কোনো অনুষ্ঠানই বাদ নেই। পূর্বপুরুষেরা যেগুলো চালু ক'রে রেখে গেছেন, সেগুলো বনেদিয়ানার অংশ। তার ভেতর বিদায় যেমন আছে, তেমনি আছে বাইনাচ। বাগানবাড়ি, রক্ষিতা আর মদের ফোয়ারা তো সারা বছরই থাকবে। সেই একঘেঁয়েমির ভেতর হঠাৎ কয়েকদিনের জন্যে উদ্দাম মাতোয়ারা হ'য়ে ওঠার ভেতর একটা আলাদা উন্মাদনা আছে। সেই অবকাশটুকুই ক'রে দেয় দুর্গোৎসব। নাটমণ্ডপে ঘটা ক'রে পুজো, চণ্ডীপাঠ সবই হয়, কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা উৎসব। সাহেবরা বলে, দ্য গ্র্যান্ড হিন্দু ফেস্টিভ্যাল।

সাহেব বিবিরাও আমন্ত্রিত হয় উৎসবে। আমন্ত্রণের সবটুকুই একেবারে উদ্দেশ্যবিহীন লৌকিকতা নয়। খুশি রাখতে হয় সাহেব-বিবিদের। যাদের দয়ায় এই বাড়-বাড়ন্ত অবস্থা, তাদের খুশি রাখতে পারলে আখেরে লাভ। তাছাড়া, নিজের অর্থ-কৌলিন্য দেখানোর একটা সুযোগ তো বটে!

বনেদি পরিবারগুলোর ভেতর একটা অঘোষিত নীরব প্রতিযোগিতা চলে দুর্গোৎসবে। কে এবার কত লাখ টাকা খরচ ক'রেছে—শোভাবাজার, না কলুটোলা? কার বাড়িতে কত সাহেব এসেছিল—মল্লিক বাড়ি না সিংঘিবাড়ি? কে কত বেশি মুজরোর বাইজি নাচিয়েছে—কুমোর-

টুলির সরকার, বৌবাজারের মতিলাল, বড়োবাজারের শেঠ, খিদিরপুরের ঘোষাল না পাথুরেঘাটার ঠাকুরবাড়ি? সব হিসেব-ই লোকের মুখে মুখে ফেরে।

একসময় শেষ হয় দুর্গোৎসব। তারপরই আবার সেই কর্মব্যস্ত জীবন। দেওয়ান, বেনিয়ান, মুন্শি, গোমস্তা আর দালাল নেটিব জেন্টুরা কোমর বেঁধে নেমে পড়ে তাদের রোজগারের সেই মসৃণ সুড়ঙ্গ-সড়কে। ব্যস্ত আনাগোনা শুরু হ'য়ে যায় গোরাদের হৌসে আর দপ্তরে। বড়োবাজার, চীনেবাজার, টিরেটাবাজার, কলুটোলা আবার জমজমাট।

এবারেও সেই একই চিত্র। কোনো ব্যতিক্রম নেই। বৈচিত্র্যের ভেতর এইটুকু যে, বিদ্যাসাগর মশাই বিধবা-বিবাহের ব্যাপারে খুব উঠে-পড়ে লাগার ফলে তাঁর বিরুদ্ধ পক্ষ রাজা রাধাকান্ত দেবের ধর্মসভার দল-ও রীতিমতো কোমর বাঁধছে। বাঙালী হিন্দু মহলে এখন এইটেই সবচেয়ে আলোচ্য বিষয়। একদিকে গুপ্ত কবির সম্বাদ প্রভাকর সুযোগ পেলেই বিধবা-বিবাহ নিয়ে টিপ্পনি কাটছে অন্যদিকে গুড়গুড়ে ভট্‌চাজের সম্বাদ ভাস্কর বিদ্যাসাগরকে সমর্থন জানিয়ে চ'লেছে। দুর্গোৎসবের পর থেকে বিধবা-বিবাহ নিয়ে জল্পনা-কল্পনা আরো বেড়েছে।

প্রথম হেমন্তের পড়ন্ত বিকেল!

শীতের হাওয়া এখনো বইতে শুরু করেনি বটে কিন্তু তার একটু আমেজ সবে দেখা দিয়েছে।

সেদিনটা ছুটির দিন। দমদম সাতপুকুর অঞ্চলে নিজের বাড়ির বৈঠকখানায় ব'সে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে প্রতীক্ষা ক'রছে কিশোরীচাঁদ। তার বিশেষ আমন্ত্রণে হরিশ, গিরিশ আর শম্ভুনাথের আজ এখানে আসার কথা। হরিশের সঙ্গে একটা বিশেষ ব্যাপারে আলোচনার জন্যে তার আজকের এই বৈঠকের আয়োজন। কেবল আলোচনা-ই নয়, যেমন ক'রে হোক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে হরিশকে রাজী করানো দরকার।

কিন্তু সেই ব্যাপারেই সন্দেহ আছে কিশোরীচাঁদের।

হরিশের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ পরিচয় খুব বেশি দিনের নয়। বড় জোর বছর দেড়েক। কিন্তু এই অল্প সময়ের ভেতরেই সে বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছে, একরোখা জেদি মানুষ কাকে বলে! পাছে হরিশকে সে একা রাজি করাতে না পারে, সেইজন্যে গিরীশ আর শম্ভুনাথকেও ডেকেছে। তাদের দু'জনকে আসল ব্যাপারটা জানিয়েও রেখেছে, কেবল হরিশকেই কিছু বলেনি। গিরীশ আর শম্ভুনাথ হরিশের অনেক দিনের বন্ধু। তারা কিশোরীচাঁদের সমর্থনে দু'টো কথা বললে হয়তো হরিশের কাছে তার একটা মূল্য থাকবে।

কলকাতার শিক্ষিত সমাজে রীতিমতো নামী ব্যক্তি নিমতলার মিত্তির বাড়ির প্যারীচাঁদ মিত্তির। কেবল ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান ব'লেই নয়, খ্যাতি তাঁর সব দিকে। সুলেখক, সুবক্তা এবং সমাজ সংস্কারক।

সেই প্যারীচাঁদেরই ছোটোভাই কিশোরীচাঁদ।

হিন্দু কালেজ থেকে বেরিয়ে সরাসরি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরী পেয়েছিল। আটবছর ধ'রে মফস্বলে ঘুরে ঘুরে কাজ করবার পর এই সবে বছর দেড়েক হ'ল কলকাতায় বদলি হ'য়ে এসেছে কিশোরীচাঁদ। পুলিশ কোর্টের প্রবীণ ম্যাজিস্ট্রেট বাবু হরচন্দ্র ঘোষের পদোন্নতি হ'ল। জজ হ'য়ে তিনি চ'লে গেলেন ছোটো আদালতে। তাঁর জায়গায় কলকাতার পুলিস ম্যাজিস্ট্রেট হ'য়ে এলো বত্রিশ বছর বয়সের নবীন যুবক কিশোরীচাঁদ।

কিশোরীচাঁদের এই নিয়োগ নিয়ে পত্র-পত্রিকায় বেশ লেখালিখিও হ'য়েছিল। ইংলিশম্যান লিখেছিল একটু বাঁকাভাবে। সাড়ে তিনশো টাকা মাইনের একজন নেটিব ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট একেবারে এক ধাক্‌কায় আটশো টাকা মাইনের পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটের চেয়ারে এসে ব'সে গেল, এ-খবরটা ছাপলেও ব্যাপারটাকে ইংলিশম্যান প্রসন্ন মনে নিতে পারেনি। নতুন পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটের সততা কিম্বা ন্যায়নীতিবোধ নিয়ে অবশ্য কোনো প্রশ্ন তোলার অবকাশও ছিল না। ইংলিশম্যানের

যা কিছু আপত্তি তা ওই 'নেটিব' পরিচয়টা নিয়ে। এদিকে বাঙালী যুবকের এই পদোন্নতিতে গুপ্ত কবির প্রভাকর তো একেবারে উচ্ছ্বসিত!

কলকাতায় আসার পরই ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে কিশোরীচাঁদের যোগাযোগ। সেই সূত্রেই হরিশের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ পরিচয়।

মফস্বলে দিন কাটলেও হিন্দু পেট্রিয়টের সুবাদে হরিশের নামের সঙ্গে তার বিলক্ষণ পরিচয় ছিল। সাক্ষাৎ পরিচয়টা ঘ'টলো কলকাতায় আসার পরে। এই অল্পদিনের ভেতরেই সে-পরিচয় বেশ অন্তরঙ্গতার স্তরে পেঁাছেছে। বয়স-ও দু'জনের কাছাকাছি। বরঞ্চ কিশোরীচাঁদই বছর দুয়েকের বড়ো। সেই কারণেই হাসি-তামাশার অবসরে হরিশ মাঝে মাঝে বলে, ইয়োর অনার দাদা।

বিকেলের আলো আরো ম্লান হ'য়ে এলো।

কাশীপুরের ওপাশে পশ্চিম আকাশে ঢ'লে প'ড়েছে সূর্য। তার এক চিলতে রশ্মি এসে ঘরে লুটিয়ে প'ড়েছে।

কলকাতায় বদলি হ'য়ে আসার পর থেকে কয়েকমাস আগে পর্যন্তও কাশীপুরে একটা বাগান-বাড়িতে ছিল কিশোরীচাঁদ। গত জুন মাসের মাঝামাঝি এক নম্বর দমদম রোডের এই বাড়িতে উঠে এসেছে। কাশীপুরে থাকার সময় সকাল-বিকেল কিম্বা চাঁদনি রাতে গঙ্গার শোভায় তার দৃষ্টির ছিল অবাধ অধিকার। শুধু তাই বা কেন, জন্ম থেকে প্রথম যৌবন পর্যন্ত কেটেছে নিমতলার পৈতৃক বাড়িতে। গঙ্গার জোয়ার ভাঁটা আর তার বিভিন্ন সময়ের বিচিত্র সৌন্দর্যের সঙ্গে কিশোরীচাঁদের আবাল্য পরিচয়। এতকাল পরে কলকাতায় ফিরে এসে কাশীপুরে উঠে আবার সেই গঙ্গার সান্নিধ্য সে পেয়েছিল। কিন্তু ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের গায়ে এই বাড়িটা কিনে এখানে উঠে আসার পর আগের মতো দৃষ্টির সেই অবাধ অধিকার থেকে সে বঞ্চিত। এখান থেকে গঙ্গা বেশ কিছুটা দূরে। এ-বাড়ির জানালা দিয়ে পশ্চিম দিকে তাকালে যদিও বা গঙ্গার ওপারের গাছপালা দেখা যেতো, সে-পথও রুদ্ধ ক'রে দিয়েছে গঙ্গার তীরে কাশীপুরের বাড়িগুলো। তাই পশ্চিমে তাকালে গঙ্গার জলস্রোত চোখে পড়ে না—চোখে পড়ে খোয়া-বাঁধানো ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, গাড়ি-ঘোড়া আর পথচারীর দল।

এখন কার্তিক মাস।

গঙ্গার জল এখন আর নিশ্চয়ই ঘোলাটে নেই। আগের চেয়ে নিশ্চয়ই অনেক টল্‌টলে। সেই টল্‌টলে জলের ওপর লুটিয়ে প'ড়ে ঝিক্‌মিক্‌ ক'রছে হেমন্ত-গোধূলির পাণ্ডুর সোনালি রোদ। জলের ওপর প্রতিবিম্বিত হ'য়েছে পশ্চিম আকাশের বিচিত্র সুন্দর বর্ণচ্ছটা। নৌকোগুলোকে দেখাচ্ছে কালো কালো। বড়ো বড়ো পানসি নৌকোর পালে দিনের মতো শেষ আলোর স্পর্শ দিয়ে যাচ্ছে অস্তায়মান সূর্য। গঙ্গার জলের ওপর আস্তে আস্তে নেমে আসছে অন্ধকারের ছায়া।

অন্যমনস্ক হ'য়ে প'ড়েছিল কিশোরীচাঁদ।

সদর দেউড়ির কাছে ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা যেতেই তার অন্যমনস্কতায় ছেদ প'ড়লো। ব্যস্তভাবে বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালে কিশোরীচাঁদ। হ্যাঁ, ওইতো শম্ভুনাথের ফিটন বাড়ির সীমানায় ঢুকে প'ড়েছে!

গাড়ি থেকে নামলে শম্ভুনাথ, হরিশ আর গিরীশ। হরিশকে নিয়েই ভবানীপুর থেকে রওনা হ'য়েছিলো শম্ভুনাথ। পথে সিম্‌লে থেকে গিরীশকে তুলে এনেছে।

কিশোরীচাঁদের সঙ্গে করমর্দন ক'রে শম্ভুনাথ ব'ললে, নাও হে ম্যাজিস্ট্রেট, আসামীকে ধ'রে এনেচি।

গিরীশ হেসে ব'ললে, হ্যাঁ, কোম্পানির রাজত্বে বিচার এখন অনায়াসেই চ'লতে পারে। নাই বা রইলো ফ'রেদি—আসামী, উকিল আর ম্যাজিস্ট্রেট তো আছে?

সজোরে হেসে উঠ্‌লে হরিশ। —বাঃ, চমৎকার ব'লেচে গিরীশ! এই না হ'লে সিমলের

কড়াপাক? সে যাই হোক, বামুনকে নেমন্তন্ন ক'রে ভর্ সন্ধ্যেবেলায় সেই ভবানীপুর থেকে এই পাকপাড়ায় আনালে কিশোরী! ফলারের আয়োজন কেমন ক'রেচ? আর সোমরস?

কিশোরীচাঁদ ব'ললে, তোমাকে নেমন্তন্ন ক'রে ফলারের আয়োজন রাখার দরকার কি তেমন আছে?

—কেন, গিরীশের বাড়িতে পাকা ফলারের গন্ধ পেলেই তো আমি ছুটি হে!

—কোন্নগরের মেয়ের হাতের লুচি তরকারিটা সত্যিই অপূর্ব! তুমি তো তুমি, আমি ফলারে বামুন না হ'য়েও গিরীশের বাড়ির লুচি-মাংসের নেমন্তন্নের জন্যে মুখিয়ে থাকি!

কোন্নগরের মেয়ে ব'লতে গিরীশের স্ত্রী কৈলাসকামিনী। আলিপুরের ডেপুটি কালেক্টর শিবচন্দ্র দেবের মেয়ে সে। শিবচন্দ্র হিন্দু কালেজের ছাত্র এবং সাক্ষাৎ ডিরোজিয়ো-শিষ্য। মেয়েদের তিনি কিছুটা লেখাপড়াও শিখিয়েছেন। কৈলাসকামিনীর ছোটো বোনেরা বেথুন সাহেবের স্কুলে প'ড়েছে।

শম্ভুনাথ হেসে ব'ললে, কোন্নগরের মেয়ের রান্নায় হাতযশ আছে জানি, কিন্তু ব্রাদার, খিদিরপুরের মেয়ের-ও যে সে-বিষয়ে পারদর্শিতা নেহাৎ কম ব'লে তো মনে হয় না! খিদিরপুরের মেয়ের উপাদেয় রন্ধনের দৌলতে নিজেতো দিনের পর দিন দেহে মেদবৃদ্ধি ক'রচো, আর আমাদের বেলায় পার্টি দিলেই সাহেবি হোটেল থেকে খানা আসে। উঁহু, এটা নিতান্ত অনুচিত। কী বলো হরিশ?

—বিলক্ষণ! বিশেষ, কৈলাসকামিনীই আমাদিগে ফলার জুগিয়ে যাবেন আর কৈলাসবাসিনীর রন্ধনপটুতার কোনো পরিচয়-ই আমরা পাবো না, এটা ঘোরতর প্রতিবাদের বিষয়। বৌঠানকে এ-কথা ব'লো কিশোরী!

কিশোরীচাঁদ হেসে ব'ললে, নিশ্চয়ই ব'লবো। তোমাদের এই দাবিতে তিনি যে আন্তরিক সুখী হবেন, এ-কথা আমি হলপ ক'রে ব'লতে পারি।

কলকাতার কালেক্টর রামধন ঘোষ খিদিরপুরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তাঁরই ভাইঝি কৈলাস-বাসিনী। হিন্দু কালেজের মধুসূদন দত্ত নামে যে যুবকটি ক্রীশ্চান হ'য়ে ক'লকাতায় শোরগোল ফেলে দিয়েছিল, তার বাবা রাজনারায়ণ দত্তের সঙ্গে রামধনের অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব। বাড়িও পাশাপাশি। কাজে কাজেই দুই পরিবারে অনেকদিন থেকেই মাখামাখি। যে মধুসূদন মাইকেল হ'য়েছে, তাকে ছেলেবেলা থেকেই চেনে কৈলাসবাসিনী। তাকে সে মধুদাদা ব'লেই ডাকতো। ক্রীশ্চান-ই হোক আর যা-ই হোক, ক্যাপটিভ লেডি কাব্যের কবি যে তার সহোদর দাদার-ই মতো, এটা কৈলাসবাসিনীর খুব গর্বের বিষয়। ইংরিজি না জানলেও বাঙলা লেখাপড়া সে মোটামুটি ভালোই শিখেছে। লুকিয়ে লুকিয়ে দু'চারটে কবিতা-ও লিখেছে। সে-কথা অবশ্য কিশোরীচাঁদ জানে না।

শম্ভুনাথ ব'ললে, সুখী হবেন, এ-কথা তো একশোবার। কৈলাসকামিনী আর কৈলাসবাসিনী—দু'য়েরই অর্থ গিয়ে দাঁড়ায় অন্নপূর্ণা। সুতরাং আমাদের নিবেদন রইলো, অন্নপূর্ণার সুবিধেমত তাড়াতাড়ি-ই একদিন ফলারের আয়োজন করো।

—তোমাদের যেদিন সুবিধে হবে, সেইদিনই ধার্য হবে।

—ব্যস্, মিটে গেল। ফলার যেদিন হবে হোক, আজ সোমরস মজুত আছে তো?

—নিশ্চয়ই। তোমাকে নেমন্তন্ন ক'রে সেটার ব্যবস্থা না রাখলে যে ব্রাহ্মণ-সেবার পুণ্যফলটুকু পাওয়া যাবে না, তা কি আর আমি জানিনে? তবে কিনা হরিশ, শুভার্থী হিসেবে আমার একটা অনুরোধ, তোমার মদ্যপানের মাত্রা এখন থেকেই কমিয়ে ফেলা প্রয়োজন।

হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌লে হরিশ।—কী যে বলো, ইয়োর অনার দাদা! বোতল নেই অথচ হরিশ মুখুজ্যে আছে, এটা কি সম্ভব? তুমি তো ভাই কলকাতায় আসার পর থেকেই সামাজিক উন্নতি নিয়ে উঠেপ'ড়ে লেগেচো! তোমার সমাজোন্নতিবিধায়িনী সুহৃদ সমিতির মতো আবার

একটা মদ্যপানবিরোধিনী সমিতি গড়ার মতলব আছে নাকি? সেটা ক'রলে কিন্তু আমাকে সদস্য হিসেবে পাবে না, সে-কথা আগেই জানিয়ে রাখচি!

সবাই হেসে উঠলে।

কিশোরীচাঁদ হেসে ব'ললে, আপাতত তেমন কোনো সম্ভাবনা দেখচিনে। মদ্যপান তো আমিও করি, কিন্তু তোমার মতো হিসেবের বাইরে যাইনে।

—আরে বাপু, তুমি হ'লে মিত্তির কায়েত, সব কিছুতেই তোমাদের হিসেব চাই। কিন্তু আমার কথাটা একবার চিন্তা ক'রে দ্যাখো! ভরদ্বাজ গোত্রের মুখ্য কুলীন হে বাবা! আকণ্ঠ সোমরস পান ক'রে না নিলে যাগযজ্ঞ, পঠনপাঠনে ভরদ্বাজ মুনির মুড্-ই আসতো না, তা জানো?

শম্ভুনাথ ব'ললে, হ্যাঁ, গোত্রাচার্যের ওপর হরিশের অচলা ভক্তি, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে কিনা, ভরদ্বাজ মুনির ধর্মটাকে খারিজ ক'রে দিয়ে শুধু তাঁর সোমরসপানের আদর্শটাকেই ও আঁকড়ে রেখেচে, এই যা!

মুহূর্তের ভেতর হরিশের পরিহাসরত মুখখানি ম্লান হ'য়ে গেল। দৃষ্টিতে একটা বিক্ষুব্ধ বেদনার ইঙ্গিত।

গম্ভীর, শান্ত স্বরে হরিশ ব'ললে, শম্ভু, পুরাণ আর ইতিহাস যা বলে, তাতে মনে হয়, ভরদ্বাজ মুনিদের আমলে হিন্দুত্ব ব্যাপারটা নিছক নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন একটা লোকাচার-সর্বস্ব ধর্ম ছিল না। তার প্রাণ ছিল, গতি ছিল। সে-যুগে অজস্র বালবিধবাকে সারাজীবন কেবল চোখের জল আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে জীবন কাটাতে হয়নি; সমাজ থেকে স'রে গিয়ে পতিতার বৃত্তিও নিতে হয়নি। সে-যুগের সমাজে উদারতা ছিল ব'লেই ক্ষেত্রজ সন্তান সামাজিক মর্যাদা পেয়েচে। এমন কি কানীন সন্তানও সম্পূর্ণ সামাজিক সম্ভ্রম পেয়েচে—কর্ণ তার সাক্ষী। মহর্ষি ব্যাসদেব তো আরো বড়ো সাক্ষী। সে-হিসেবে মনুসংহিতার শেকলে বাঁধা এখনকার হিন্দু সমাজের চেহারাটা কেমন, তুমিই বলো? হিন্দু সমাজে যদি এত গ্লানি না-ই থাকবে তাহ'লে কয়েকশো বছর আগে থেকে এত হিন্দু কেন মুসলমান হ'য়ে গেল? কেন এখনো সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে প'ড়ে ক্রীশ্চান মিশনারিরা তাদের দল ভারী ক'রে চ'লেছে? আর এই উনিশের শতাব্দীতে তোমরাই বা সবাই মিলে রীতিমতো কোমর বেঁধে হিন্দু সমাজের সংস্কারে নেমে প'ড়েচো কেন?

কিশোরীচাঁদ সোৎসাহে ব'ললে, এ-ব্যাপারে কোনো বিতর্কের অবকাশ নেই শম্ভু! হরিশের প্রত্যেকটি কথাই সত্যি।

হিন্দু সমাজের কুসংস্কারগুলো নিয়ে কিশোরীচাঁদের বিক্ষোভ অনেকদিনের। ছাত্রজীবনেই সে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখা আরম্ভ ক'রেছিল। কিন্তু ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হ'য়ে কলকাতার বাইরে চ'লে যাওয়ার পর ঠিক মনের মতো কাজ করবার সুযোগ সে পায়নি। কলকাতায় বদলি হ'য়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই সে কাজে নেমে প'ড়েছে। কাশীপুরের ভাড়া বাড়িতে থাকতেই গত বছর ডিসেম্বর মাসে তার বিশেষ উদ্যোগে স্থাপিত হয় সমাজোন্নতিবিধায়িনী সুহৃদ সমিতি। জোড়াসাঁকোর দেবেন ঠাকুর হ'লেন সভাপতি, সম্পাদক হিসেবে কাজ করবার দায়িত্ব পড়লো তত্ত্ববোধিনীর অক্ষয় দত্ত আর কিশোরীচাঁদের ওপর। রাজেন্দ্রলাল মিত্তির, যাদব মুখুজ্যে, গৌরদাস বসাক, দিগম্বর মিত্তির, শ্যামাচরণ সেন এবং আরো অনেকেই সে-সমিতির উৎসাহী সদস্য। হরিশ-ও সমিতির সদস্য হ'য়েছে।

হরিশ ব'ললে, শম্ভু, আমি যে হিন্দুত্ব ছেড়ে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ ক'রেচি, তার কারণ যদি জানতে চাও তাহ'লে ব'লবো, ধর্মমতের ওপর যতটা না আকর্ষণ, তার চেয়ে অনেক বেশি হ'ল হিন্দু সমাজের নিষ্ঠুর লোকাচারের ওপর বিতৃষ্ণা।

শম্ভুনাথ চুপ ক'রে রইলো। হরিশের পারিবারিক অশান্তির অনেক খবর-ই সে জানে। কুলীন ব্রাহ্মণের দায়িত্বজ্ঞানহীন বহুবিবাহ সম্বন্ধে হরিশের জ্বলন্ত ক্ষোভের প্রকাশ সে অনেকবারই দেখেছে। বালবিধবা ভাইঝির কথা ব'লতে ব'লতে হরিশের চোখ দিয়ে টপ্‌টপ্ ক'রে জল

ঝ'রতেও সে দেখেছে। কিশোরীচাঁদের সমাজোন্নতিবিধায়িনী সমিতির প্রস্তাবগুলির ভেতর বিধবাবিবাহ প্রচলনের জন্যে আন্দোলনের আহ্বান তাকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট ক'রেছিল, তাও জানে শম্ভুনাথ। সুতরাং আর কথা না বাড়িয়ে এখানেই এ-প্রসঙ্গের ইতি ক'রে দেবার জন্যে তাড়াতাড়ি একটু চেষ্টাকৃত মুচ্‌কি হাসি হেসে ব'ললে, ওহে ভরদ্বাজের চেলা, পেট্রিয়টের পাতায় জ্বালাময়ী ক্ষুর চালাতে চালাতে সামান্য একটু রহস্য-রসিকতাও ভুলতে ব'সেচো দেখচি!

গিরীশ এতক্ষণ চুপ ক'রে সব কথা শুন্‌ছিল। এবারে সে ব'ললে, আমি কিন্তু একটা কথা না ব'লে পারচিনে শম্ভু! কিছুদিন ধ'রে এই কথাটাই আমার বারবার ক'রে মনে হচ্চে যে, ব্রাহ্মধর্ম সম্ভবত একদিক থেকে হিন্দুধর্মের সেফ্‌টি-ভাল্‌ভ্‌ হিসেবেই কাজ ক'রচে!

—তার মানে? জিজ্ঞেস ক'রলে শম্ভুনাথ।

গিরীশ ব'ললে, মানেটা খুব জটিল নয়। কয়েকশো বছর আগে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে হিন্দু ধর্মটা যে-ভাবে রক্ষে পেয়েচিলো, বর্তমানে ব্রাহ্মধর্মমতটা দেখা দেওয়ায় সেই একই ব্যাপার ঘ'টেচে। মহাপ্রভুর বৈষ্ণবধর্মের আশ্রয় না পেলে সেদিন দলে দলে হিন্দু হ'য়ে যেতো মুসলমান, আর এখনকার দিনে ব্রাহ্মধর্মের সেফ্‌টিভাল্‌ভ্‌টা খোলা না থাকলে মিশনারি পাদরিরা দলে দলে হিন্দুদের মাথায় জর্ডনের জল ছিটিয়ে দিয়ে তাদের অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে যাওয়ার ঢালাও সুযোগ পেয়ে যেতো!

কিশোরীচাঁদ ব'ললে, গিরীশের ব্যাখ্যাটা সত্যিই ভেবে দেখবার মতো। তোমার কী মনে হয় শম্ভু?

শম্ভুনাথ কিছু বলবার আগেই হরিশ ব'ললে, সদর আদালতের ডাকসাইটে উকিল, বাবা! ও কি আর কথাটা শোনবার সঙ্গে সঙ্গেই 'হ্যাঁ' 'না' কিছু ব'লবে? তোমার ব্যাখ্যাটা আমার কিন্তু মনে ধরেছে গিরীশ! কিন্তু একটা কথা আছে। ব্রাহ্মধর্ম কেবল কলকাতার শিক্ষিত বাঙালির ভেতরেই সীমাবদ্ধ রয়েচে গ্রাম-গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়েনি।

গিরীশ ব'ললে, হ্যাঁ, এ-কথা অবিশ্যি ঠিক-ই ব'লেচো! ক্রীশ্চান ধর্মটা রেভারেণ্ড কেষ্টমোহন, মহেশ ঘোষ, জ্ঞানেন ঠাকুরের মতো ইয়ং বেঙ্গল থেকে শুরু ক'রে একেবারে অজ পাড়াগাঁয়ের রামা-শ্যামা পর্যন্ত যেমন পৌঁছেচে, কিন্তু ব্রাহ্মধর্মের সে-রকম কোনো অবকাশ-ই হয়নি। শুনেচি, দেবেন ঠাকুর মশাই নদীয়ার কোন্ গ্রামে তাঁর জমিদারির এলাকায় কিছু লোককে খাতাই ব্রাহ্ম ক'রে এয়েচেন।

হরিশ হেসে ব'ললে, হয়তো বেচারাদের খাজনা-টাজনা অনেক বাকি প'ড়ে গিয়েচিলো, খাতায় নাম লিখিয়ে খাতাই ব্রাহ্ম হ'য়ে আত্মরক্ষে ক'রেচে আর কি! তবে চৈতন্যদেবের যতদূর জানি জমিদারি ছিল না। তবু তাঁর প্রচার কিন্তু নবদ্বীপেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, চারিদিকে ছড়িয়ে প'ড়েচিলো। তোমার সেফ্‌টিভাল্‌ভ্‌ তত্ত্বটা হয়তো মিথ্যে নয়, কিন্তু তার পাশাপাশি এ-কথাও মনে রাখতে হবে গিরীশ, বাঙলাদেশের গ্রামে গ্রামে নিরক্ষর গরীব মানুষের কাছে ব্রাহ্মধর্মের আবেদন পৌঁছয়নি ব'লেই বর্ধমান, হুগলি, মুর্শিদাবাদ, যশোর, নদীয়া—সমস্ত জেলার ক্রীশ্চান মিশনারিরা নিরুদ্বেগে তাঁদের কাজ ক'রে চ'লেছেন। জেলায় জেলায় কত বাউরি, বাগদি, নমশূদ্র গরীব চাষীরা দু'টি পেটে-ভাতে থাকার আশায় ক্রীশ্চান হ'য়েচে, তার খবর রাখো?

গিরীশ লজ্জিত ভাবে ব'ললে, অকপটে স্বীকার ক'রচি হরিশ, এদিকটা আমি ভেবে দেখিনি।

—তাহ'লে ভাবতে শুরু করো। এ-যাবৎ পেট্রিয়টের পাতায় জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সব বিষয়ের ওপরেই তো কিছু না কিছু লিখেচো। মায় চীনদেশের রাজনীতি নিয়েও লিখে ছেড়েচো। এবার তোমার এই সেফ্‌টি-ভাল্‌ভ্‌ তত্ত্বটা নিয়ে গোঁড়া হিন্দু আর গোঁড়া ব্রাহ্মদের বেশ ভালোমতো একটা নাড়াচাড়া দিয়ে দাও দিকি!

বাইরে দাঁড়িয়ে কথা ব'লতে ব'লতেই সন্ধ্যের অন্ধকার নেমে এসেছে। কিশোরীচাঁদ মৃদু

হেসে ব'ললে, আজকের সমস্ত আলোচনা পর্ব কি এই বাইরে দাঁড়িয়েই হবে? গরীবের বৈঠকখানায় অভ্যাগত সুধীজনের পদধূলি প'ড়বে না?

—পড়বে বৈ কি, নিশ্চয়ই পড়বে ইয়োর অনার!—কিশোরীচাঁদের হাত ধ'রে ঝাঁকুনি দিয়ে হরিশ ব'ললে, নেমন্তন্ন পেয়ে বামুনের ছেলে এতখানি পথ ব'য়ে এয়েচি। ফলার না সেরেই এখান থেকে চ'লে যাবো, তা কি হয়? চলো হে শম্ভু, গরীব ম্যাজিস্ট্রেটের গরীবখানায় ব'সে এবার সোমরসে মগ্ন হওয়া যাক!

মদ্যপানের প্রথম পর্ব মিট্‌লো।

তারপরেই আসল প্রসঙ্গের অবতারণা ক'রলে কিশোরীচাঁদ। হরিশের অজ্ঞাতে শম্ভুনাথ আর গিরীশের সঙ্গে একবার চোখের ইশারা সেরে নিয়ে সে ব'ললে, আচ্ছা হরিশ, রাজাবাহাদুরের যে-প্রস্তাবটা তোমাকে জানিয়েচিলুম, সেটা নিয়ে কিছু ভেবেচো?

কোন্ রাজাবাহাদুর?

—আশ্চর্য লোক তুমি! পাকপাড়ার বড়ো রাজা প্রতাপচন্দ্র। ব্যাপারটা তুমি কি একেবারেই ভুলে গেচো?

—না, না, মনে প'ড়েচে। কিন্তু আমি তো সেদিনই তোমাকে ব'লেচি কিশোরী, তাঁর প্রস্তাবের জন্যে ধন্যবাদ, কিন্তু তাঁর অনুগ্রহ নিতে আমি অক্ষম। নতুন ক'রে আবার সে-কথা কেন?

—আমার বিশ্বাস, দেশের স্বার্থ আর সেই সঙ্গে পেট্রিয়টের-ও স্বার্থ ভেবে কথাটা তুমি আর একবার বিবেচনা ক'রে দেখবে!

শম্ভুনাথ ব'ললে, এত ভালো একটা প্রস্তাবে তোমার গররাজি হওয়ার কারণ কী?

শ্যাম্পেনের গেলাসে একটা চুমুক দিয়ে মৃদু হেসে হরিশ ব'ললে, দ্যাখো শম্ভু, তুমি জাঁকিয়ে ওকালতি ক'রচো, তাই করো; দালালির বাজারে আর নেমো না! আমাকে ধ'রে-বেঁধে নিয়ে গিয়ে রাজা-উজিড়-জমিদারদের ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের জোয়ালে সেই যে জুতে দিয়েচিলে, সে-জোয়াল এখনো কাঁধ থেকে নামাতে পারিনি। আরে বাবা, হন্দ গরীবের ছেলে, জম্মো থেকেই পেটে গামছা বেঁধে দিন কেটেচে, ওই সব রাজা-মহারাজাদের আসরে কি আমাকে মানায়?

—মানায় কি না মানায়, সেটা দেশের লোকে ভালোভাবেই জানে হরিশ! তাছাড়া, সেখানে সবাই যদি রাজা মহারাজা হ'ত তাহ'লে হরিমোহন, উমেশ, জগদানন্দ কিম্বা আমার মতো সাধারণ মানুষের জায়গা সেখানে নিশ্চয়ই হ'ত না!

—আরে বাবা, কাজ করিয়ে নেবার জন্যে কিছু পাইক বরকন্দাজের দরকার হয়। আমরা হলুম তাই। নেহাৎ রামগোপাল দাদাকে নিজের বড়ো ভাইয়ের মতো শ্রদ্ধা করি এবং তিনিও বেঁধে রেখেচেন, তাই ছাড়তে পারচি নে। নইলে সত্যি কথা ব'লতে কি, আবেদন আর তোষামোদের রাজনীতি দেখতে দেখতে আমি হাঁপিয়ে প'ড়েচি।

প্রসঙ্গটা একেবারে অন্যদিকে চ'লে যাচ্ছে দেখে কিশোরীচাঁদ তাড়াতাড়ি ব'ললে, অ্যাসোসিয়েশনের ব্যাপার নিয়ে আর একদিন নয় আলোচনায় বসা যাবে হরিশ। আজ বরঞ্চ যে-প্রসঙ্গটা উঠেচে, তার একটা নিষ্পত্তি হ'য়ে যাওয়া দরকার।

হরিশ হেসে ব'ললে, নিষ্পত্তি? তার চেয়ে সোজা কথায় বলো না বাপু, রাজা প্রতাপচন্দ্রের অনুগ্রহের দান নিতে তুমি রাজি হ'য়ে যাও হরিশ!

ঈষৎ বিরক্তির সঙ্গে কিশোরীচাঁদ ব'ললে, প্রথম থেকেই তুমি সেই একই গোঁ ধ'রে ব'সে আছো! আমি ব'লচি, বড়োরাজার সঙ্গে আমার বিশদ আলোচনা হ'য়েচে। তুমি বিশ্বাস করো, এটা তাঁর অনুগ্রহের দান নয়। দেশের স্বার্থেই পেট্রিয়টকে তিনি বাঁচিয়ে রাখতে চান!

শ্যাম্পেনের গেলাসে আর একটা চুমুক দিয়ে হরিশ ব'ললে, কেন, পেট্রিয়টের কি নাভিশ্বাস

উঠেচে? পত্রিকার কাটতি তো দিব্যি বেড়েই চ'লেচে! দ্যাখো কিশোরী, হরিশ মুখুজ্যে যতদিন বেঁচে থাকবে, পেট্রিয়ট ততদিন ম'রবে না! আমি গরীব হ'তে পারি কিন্তু কোনো রাজা-মহারাজার দয়ার দান নিয়ে আমার কলমের স্বাধীনতাকে বিকিয়ে দিতে আমি রাজি নেই।

—তোমার কলমের স্বাধীনতা কিনে নেবার কোনো ইচ্ছে বড়োরাজার নেই। তাঁর উদ্দেশ্য ভিন্ন।

—কী সে উদ্দেশ্য? পেট্রিয়টের পৃষ্ঠায় রাজবন্দনা?

এবারে বেশ একটু অসহিষ্ণু স্বরে কিশোরীচাঁদ ব'ললে, প্রথম থেকে তুমি সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আচো! তুমি জেনে রাখো, বড়োরাজা প্রতাপচন্দ্র আর ছোটো রাজা ঈশ্বরচন্দ্র এই দু'ভাইয়ের স্বভাব আর পাঁচজন ধনী জমিদরের মতো নয়। তুমি কি লক্ষ্য করোনি, যে কোনো রকম সমাজ সংস্কারের কাজে তাঁরা সবসময়েই এগিয়ে আসেন? হিন্দু পেট্রিয়ট যে এখন আমাদের নেটিবদের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার, সেটা অনুভব ক'রেচেন ব'লেই তাঁর এত আগ্রহ। পেট্রিয়ট ক্রমেই জনপ্রিয় হচ্চে অথচ তার ছাপার হাল দিনকে দিন খারাপ হ'য়ে চ'লেচে—এ-ব্যাপারটা তাঁকে খুবই পীড়া দিয়েচে। শুধু তিনি কেন, আমরা সকলেই অনুভব করচি, ইংলিশম্যান, হরকরা, ফ্রেন্ড অব্ ইণ্ডিয়া কিম্বা ক্যালকাটা রিভিউয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লড়াই ক'রতে হ'লে পেট্রিয়টের কাগজ, ছাপা সবই ঝক্‌ঝকে হওয়া দরকার। এই তো পেট্রিয়টের প্রথম সম্পাদকদের একজন এখানে উপস্থিত, সে-ই বলুক আমার কথাটা সঙ্গত কিনা?

গিরীশ ব'ললে, বড়োরাজার প্রস্তাব তুমি গ্রহণ ক'রবে কিনা, সেটা তোমারই বিবেচ্য হরিশ। কিন্তু পেট্রিয়টের ছাপার ব্যাপারে কিশোরী যা ব'লচে তার সঙ্গে আমিও একমত। নতুন টাইপ না হ'লে ছাপার উন্নতির কোনো সম্ভাবনা নেই, আশা করি সে-কথা তুমিও নিশ্চয়ই স্বীকার ক'রবে?

হরিশ চুপ ক'রে রইলো।

শম্ভুনাথ ব'ললে, তুমি যদি রাজা প্রতাপচন্দ্রের কাছে নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি পাও যে, পেট্রিয়টের স্বাধীনতায় কোনোরকম হস্তক্ষেপ হবে না, তাহ'লেও কি তুমি সম্মত নও?

মৃদু হেসে হরিশ ব'ললে, মৌখিক প্রতিশ্রুতির মূল্য কতটুকু শম্ভু?

কিশোরীচাঁদ ব'ললে, তিনি কথার মানুষ; তাঁর কথার মূল্য আছে হরিশ।

গিরীশ ব'ললে, অন্তত পেট্রিয়টের গুরুত্ব বুঝে তাকে আরো সুন্দরভাবে বাঁচিয়ে রাখবার আগ্রহ নিয়ে আর কেউ তো এখনো এগিয়ে আসেননি? তাই মনে হয়, তাঁর এ-প্রস্তাবের ভেতর যথার্থ আন্তরিকতা আছে।

কিশোরীচাঁদ ব'ললে, তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ, তিনি উপযাচক হ'য়ে আমার কাছে এ-প্রস্তাব রেখেছেন। ভবানীপুরের যে কোনো জায়গায় নিজের পছন্দ এবং প্রয়োজন অনুসারে পেট্রিয়টের জন্যে নতুন ছাপাখানা ক'রে নিতে পারো তুমি। তার সমস্ত ব্যয়ভার তিনি সানন্দে বহন করবেন। এতবড়ো জোরালো একটা হাতিয়ার যাতে বিলুপ্ত না হ'য়ে যায়, এইটুকুই তাঁর উদ্দেশ্য।

হরিশ যেন আপনমনেই ব'লতে লাগলো, পেট্রিয়টের কাগজ আরো ঝক্‌ঝকে হোক, ছাপা আরো ঝর্‌ঝরে নিখুঁৎ হোক, তা কি আমিও চাইনে? টাকার জোর নেই ব'লেই প্রতি সপ্তাহে ওইভাবে ছেপেই পত্রিকা বের ক'রতে হচ্চে!

কিশোরীচাঁদের দিকে তাকিয়ে গিরীশ ব'ললে, আজ হয়তো রাজাবাহাদুরের অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই, কিন্তু ভবিষ্যতে যদি কোনোদিন সেরকম কিছু প্রকাশ পায়?

কিশোরীচাঁদ ব'ললে, গিরীশ, আমি নিজে এক কথার মানুষ! তাই বিশ্বাসযোগ্য অপর ভদ্রব্যক্তিকেও সেইভাবেই দেখি। ভবিষ্যতে যদি কোনোদিন তাঁর অন্য কোনো উদ্দেশ্য প্রকাশ পায়, তাহ'লে নিজের বিবেক-বিবেচনা অনুসারে কাজ করবার সমস্ত স্বাধীনতাই হরিশের থাকবে। আমি তখন একবার-ও বলতে যাবো না, তুমি রাজা প্রতাপচন্দ্রের হুকুম মেনে চলো হরিশ!

হরিশ মুখ তুলে কিশোরীচাঁদের দিকে তাকালে। তারপর শান্তস্বরে ব'ললে তোমরা সবাই

পেট্রিয়টের শুভাকাঙ্ক্ষী। আর গিরীশতো পেট্রিয়টের প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। পত্রিকার ওপর ওর মমতার টান আমার চেয়ে কিছু কম নয়। পেট্রিয়টের স্বাধীনতায় যদি হস্তক্ষেপ না করা হয় তাহ'লে তোমাদের সবায়ের এই আগ্রহকে আমি অমর্যাদা ক'রতে চাইনে। রাজা প্রতাপচন্দ্রকে ব'লো, আমি রাজী।

॥ সতেরো ॥

উত্তরভারতে সামন্তরাজ্য অযোধ্যার পালা এবার!

কোম্পানি সরকারের কূট চক্রান্তের ইঙ্গিত কিছুদিন থেকেই একটু একটু ক'রে টের পাওয়া যাচ্ছিলো। এবারে তার উলঙ্গ প্রকাশ। অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ আলির বিরুদ্ধে অপশাসনের অভিযোগ!

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সর্বোচ্চ পদাধিকারী শাসক 'দ্য মোস্ট নোব্‌ল্‌ গবর্নর জেনারেল অব ইণ্ডিয়া' লর্ড ডালহৌসি এবং তাঁর মন্ত্রণাদাতা কৌন্সিল মনে করেন, সামন্তরাজ্য অযোধ্যায় দীর্ঘদিন ধ'রে চ'লছে অপশাসন আর অরাজকতা! সেখানে আইন-শৃঙ্খলা ব'লে কিছু নেই। তাই জনসাধারণের নিরাপত্তা এবং আইন-শৃঙ্খলার স্বার্থে অপদার্থ নবাব ওয়াজিদ আলির শাসন থেকে অযোধ্যাকে অবিলম্বে মুক্ত করা প্রয়োজন! অপশাসিত, অরাজক অযোধ্যাকে রক্ষা ক'রতে হ'লে ব্রিটিশ শাসনের অধীনে আনা ভিন্ন গত্যন্তর নেই।

লর্ড ডালহৌসির সুতীক্ষ্ম থাবা অব্যর্থ লক্ষ্যভেদী।

সেই অব্যর্থ থাবার নখরাঘাত যখনই সেখানে প'ড়েছে, তখনই সেখানে আকাশের বুক চিরে উড়েছে ইউনিয়ন জ্যাক।

ভারতের মানচিত্রেও রঙের পরিবর্তন!

নতুন ব্রিটিশ-অধিকৃত অঞ্চল রঞ্জিত হ'য়ে চ'লেছে লাল রঙে। তার অর্থ, এখানেও বিস্তৃত হ'ল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য।

পঞ্জাবের রঞ্জিৎ সিং ভবিষ্যদ্বাণী ক'রেছিলেন, সব লাল হো যায়েগা! তাঁর সে-কথা নির্ভুল। লর্ড ডালহৌসির স্থির লক্ষ্য অতি দ্রুত ভারতবর্ষের মানচিত্রকে পুরোপুরি লাল রঙে রাঙাতে চ'লেছে।

এই আট বছরের ভেতর দেখতে দেখতে ভারতের মানচিত্র লাল হ'য়ে গেল কত অঞ্চল! লাল হ'য়ে যাওয়ার অনিবার্য ভবিষ্যতের আশঙ্কায় কত অঞ্চল সশঙ্ক রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা ক'রছে!

শক্তিমানের অভিপ্রায়েরই তো আর এক নাম আইন! শক্তিমানের স্বার্থকে অটুটভাবে রক্ষা করবার জন্যেই আইনের সৃষ্টি।

লর্ড ক্লাইভ থেকে লর্ড ডালহৌসি!

একশো বছরের ভেতর কোম্পানি তার স্বার্থের অজস্র শেকড় পাঠিয়ে দিয়েছে এদেশের মাটির গভীরে।

কত আইন এলো, কত আইন গেল! ফলে-ফুলে-পাতায় আরো সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠতে লাগলো বিদেশাগত রাজশক্তির মহীরুহ। হয়তো মাঝে-মধ্যে ক্ষুব্ধ কোনো ভারতবাসী সে মহীরুহের কয়েকটা ফুল-পাতা ছিঁড়ে ফেলেছে কিম্বা একটা ডাল ভেঙে দিয়েছে। তার বেশি কিছু নয়। তার গুঁড়িতে কেউ আঁচড় লাগাতে পারেনি; একটা ছোটো শেকড়কেও উপ্‌ড়ে ফেলতে পারেনি কেউ।

ডক্‌ট্রিন অব্‌ ল্যাপ্‌স্‌—স্বত্ত্ববিলোপ আইন!

গবর্নর জেনারেল হ'য়ে এদেশে আসার সঙ্গে সঙ্গেই এই মোক্ষম অস্ত্রটি হাতে এসেছিল লর্ড ডালহৌসির। তার সদ্ব্যবহার ক'রতে এতটুকু ইতস্তত করেননি তিনি। সাতারা, সম্বলপুর, ঝাঁসি, নাগপুর—একটার পর একটা সামন্তরাজ্য চ'লে এসেছে ব্রিটিশ রাজশক্তির অধিকারে।

আইনের ওপর তো কোনো কথা নেই!

ব্রিটিশ-ভারতের ন্যায়-নীতি আইন-শৃঙ্খলার রক্ষক কোম্পানি সরকারের স্বত্ত্ব-বিলোপ আইনে স্পষ্টই বলা হ'য়েছে, নিঃসন্তান কোনো সামন্তরাজার মৃত্যু হ'লে তাঁর দত্তক-পুত্রের উত্তরাধিকার স্বীকার করা হবে না। সুতরাং সে-রাজ্য চ'লে আসবে কোম্পানি-সরকারের অধিকারে। দত্তক-পুত্র বৈধ প্রমাণিত হ'লে অবশ্য একটা মাসোহারা পাবেন।

তঞ্চকতার লেশমাত্র নেই কোম্পানি সরকারের আইন-কানুনে! কেউ ব'লতে পারবে না যে 'হার গ্রেশাস ম্যাজেস্টি' কুইন ভিক্টোরিয়ার ব্যবস্থাপক সভার অনুমোদন ছাড়াই কোম্পানি সরকার এদেশে কোনো আইন প্রয়োগ ক'রেছে!

বিচার-ব্যবস্থায় ভেদাভেদ?

সেও তো রীতিসিদ্ধ আইন। শাসক শ্বেতাঙ্গ আর শাসিত কৃষ্ণাঙ্গের ভেতর এটুকু পার্থক্য না থাকলে এতবড়ো একটা সাম্রাজ্যকে সুশৃঙ্খলভাবে শাসন করা কঠিন।

শিক্ষিত নেটিবদের কেউ কেউ এ নিয়ে মাঝে মাঝে সভা সমিতি করে, আবেদনপত্র পাঠায়। তা নিয়ে কোনো দুশ্চিন্তা নেই ডালহৌসির। তাঁর আগে অন্য গবর্ণর জেনারেলদের আমলে মাঝে মাঝে এ-রকম সভাসমিতি হ'য়েছে, ঈষদুষ্ণ বক্তৃতাও হ'য়েছে। তিনি আসার আগে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর তো জর্জ টমসনকেও এদেশে নিয়ে এসেছিলেন। তাতে কোনো ক্ষতিই হয়নি কোম্পানি সরকারের।

এ-দেশ শাসনের অভিজ্ঞতা প্রায় আট বছর হ'য়ে গেল। এই আটবছরে অনেক কিছুই তাঁর জানা হ'য়ে গেছে। সাধারণ নিয়মে গবর্ণর জেনারেলদের কার্যকাল পাঁচবছর হওয়ার কথা। কিন্তু তাঁর সাম্রাজ্য-বিস্তারের কুশলতায় মুগ্ধ হ'য়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কোর্ট অব ডিরেক্টরস্ তাঁর ক্ষেত্রে সে সময়-সীমা বাড়িয়ে দিয়েছেন। সুতরাং তার প্রতিদানে নিজের কুশলতার আরো কিছু পরিচয় রেখে যেতে হবে বৈ কি!

গবর্ণর হাউসে ব'সে সাফল্যের স্বপ্ন দেখেন লর্ড ডালহৌসি। কূট পরিকল্পনার জাল বুনে চলেন সঙ্গোপনে, সন্তর্পণে।

উত্তর ভারতের গুরুত্বপূর্ণ সামন্তরাজ্য অযোধ্যা।

উর্বর, শস্যশ্যামল এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড এখনো রয়েছে অযোধ্যা রাজ্যের অধিকারে। অনেক আগেই অবশ্য দোয়াব আর রোহিলাখণ্ড নিয়ে সে রাজ্যের অর্ধেকেরও বেশি অংশ কোম্পানির জন্যে গ্রাস ক'রে রেখে গেছেন মার্কুইস অব ওয়েলেস্‌লি! তাঁর অসমাপ্ত কাজটুকু সম্পূর্ণ করবার দায়িত্ব এবার লর্ড ডালহৌসির।

অযোধ্যায় যেমন আছে উর্বর শস্যক্ষেত্র, তেমনি আছে রুক্ষ, অনুর্বর পাথুরে জমি। বিলাস-ব্যসনে লখ্‌নৌয়ের প্রাসাদে একদিকে যেমন ব'য়ে যায় প্রাচুর্যের উচ্ছ্বলিত স্রোত, অন্যদিকে তেমনি অসহনীয় দারিদ্র্য। কোম্পানির সেনাবাহিনীর সমস্ত নেটিব রেজিমেন্টে অযোধ্যার অধিবাসীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। দলে দলে অযোধ্যার গরীব নেটিবগুলো কোম্পানির নিমক খেয়ে বহাল-তবিয়তে বেঁচে রয়েছে অথচ সেই অযোধ্যার রাজধানী লখ্‌নৌয়ে এখনো সদম্ভে ওড়েনি ইউনিয়ন জ্যাক?

ভারতের মানচিত্রে ওই অংশটুকুর দিকে তাকালেই চোখে যেন বড়ো বেশি পীড়া দেয় লর্ড ডালহৌসির। মনে হয়, ব্রিটিশ সিংহ যেন অহেতুক তার ন্যায্য প্রাপ্য থেকে নিজেকে বঞ্চিত ক'রে এতদিন হাত-পা গুটিয়ে ব'সে আছে!

লর্ড এলেনবরার মতো দুর্ধর্ষ গবর্ণর জেনারেল সুদূর সিন্ধু আর আফগানিস্তান পর্যন্ত পাঠাতে পেরেছিলেন বীর ব্রিটিশ বাহিনীকে, অথচ এত কাছের এই অযোধ্যার ওপর তাঁর দৃষ্টি পড়েনি, সেইটেই আশ্চর্য! একটার পর একটা আঘাতে শিকার তো আহত হ'য়েই প'ড়ে আছে।

কেবল চূড়ান্ত আঘাতে তার প্রাণটুকু বের ক'রে দিয়ে তাকে কাঁধে ফেলে সফল শিকারীর মতো ঘরে ফেরার কাজটুকু বাকি।

লর্ড ওয়েলেস্‌লির তৈরি ক'রে রেখে-যাওয়া বিশাল গবর্ণমেন্ট হাউসের সুসজ্জিত কক্ষে কাশ্মিরী কার্পেটে ঢাকা মেঝের ওপর পায়চারি ক'রতে ক'রতে আত্মতৃপ্তিতে উল্লসিত হ'য়ে ওঠে লর্ড ডালহৌসির মুখ। আগেকার অনেক গবর্ণর জেনারেলের চেয়ে তিনি অনেক বেশি সফল!

রেলওয়ে আর টেলিগ্রাফ যোগাযোগে ব্রিটিশ-ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল এরই ভেতর সংযুক্ত হ'য়েছে, আরো হ'চ্ছে। রেলগাড়ি পেয়ে নেটিবগুলো মহা খুশি। কত অল্প সময়ে কত তাড়াতাড়ি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়া যায়! রেলওয়ের জাল বিস্তার ক'রতে পেরে লর্ড ডালহৌসি নিজেও পরিতৃপ্ত। দরকার হ'লে ভবিষ্যতে পল্টনকে-পল্টন সেপাই কত তাড়াতাড়ি এক ছাউনি থেকে আরেক ছাউনিতে পাঠানো যাবে! কলকাতার প্রাসাদে ব'সেই মুহূর্তের ভেতর দূর-দূরান্তরের খবর পাওয়া যাবে টেলিগ্রাফে। এর পরেও যদি কোম্পানির শাসক আর সেনাপতিরা ভারতবর্ষের মানচিত্রে এ প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত লালরঙে রাঙিয়ে ফেলতে না পারে তাহলে তারা অপদার্থ!

ডকট্রিন অব্ ল্যাপস্!

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আইন তৈরির কামারশালায় সুকৌশলে তৈরি ক'রে নেওয়া এই ধারালো অস্ত্রের আঘাতে পাঁচটা বড়ো বড়ো সামন্তরাজ্যকে শিকার করতে সক্ষম হ'য়েছেন লর্ড ডালহৌসি। তাঁর সেই কৃতিত্বের তালিকা থেকে অযোধ্যার মতো একটা অর্ধ-পদানত রাজ্যই বা আর বাকি থাকে কেন?

কিন্তু একটা বাধা আছে।

অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ আলি এখনো জীবিত! তাছাড়া নবাবটা নিঃসন্তানও নয়। নবাবের মৃত্যু হ'লে কোনো ভাবনা-ই ছিল না। কোম্পানির আদালত থাকতে নবাবের বৈধ সন্তানকে অবৈধ প্রমাণ ক'রতে কতক্ষণ? কিন্তু বর্তমান অবস্থায় সে পথ-ও বন্ধ। ডক্‌ট্রিন অব্ ল্যাপ্‌সের মতো মোক্ষম অথচ মসৃণ ধারালো অস্ত্রটাকে আপাতত অযোধ্যার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা কঠিন।

একটাই মাত্র পথ সামনে এখন। অপশাসন আর চূড়ান্ত অরাজকতার অভিযোগ এনে কার্য উদ্ধার!

অযোধ্যার শাসকের বিরুদ্ধে সে-অভিযোগ কিছু নতুন হবে না। এর ভিত্তিতেই প্রায় চল্লিশ বছর আগে অযোধ্যার শাসন-ব্যবস্থার ওপর প্রভাব বিস্তার ক'রে নিতে পেরেছিলো কোম্পানি। কিন্তু তারপর থেকে এত বছর কেটে গেল—সবাই যেন নির্বিকার! গবর্ণর জেনারেলেরা আত্মতুষ্ট, অন্যদিকে ব্রিটিশ রেসিডেন্টের দল অজস্র উৎকোচের টাকায় লাল হয়েছে। অযোধ্যা অযোধ্যাই র'য়ে গেছে। ওয়ারেন হেস্টিংসের মতো অর্থলোলুপ শাসকেরা কেবল তাদের ব্যক্তিস্বার্থের কথা-ই ভেবেছে। কোম্পানির স্বার্থ, ব্রিটিশ জাতির স্বার্থ—সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থের কথা তারা ভাবেনি। হিসেব ক'রতে গেলে বেশির ভাগ রেসিডেন্ট অফিসার-ই সেই চরিত্রের লোক। দেশে ফিরে গিয়ে এই সব ব্রিটিশ স্বার্থ বিরোধী রেসিডেন্টদের বিরুদ্ধে একটা বিস্তৃত অভিযোগপত্র পেশ ক'রবেন লর্ড ডালহৌসি। যারা ব্রিটিশ হ'য়েও ব্রিটিশ জাতির স্বার্থের বদলে কেবল নিজের স্বার্থ-ই দেখে আসছে, তাদের ক্ষমা নেই!

অযোধ্যা সম্বন্ধে পরিকল্পনা প্রস্তুত। কেবল কাজটা সম্পন্ন ক'রতে যতটুকু সময় লাগে!

লাট-প্রাসাদের খাস-কামরায় উজ্জ্বল ঝাড়লন্ঠনের আলোয় চক্‌চক্ ক'রতে থাকে লর্ড ডালহৌসির শাণিত দৃষ্টি। দক্ষিণে ফোর্ট উইলিয়মের মাথায় ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই আবার সগর্বে উড়বে উইনিয়ন জ্যাক। লর্ড ডালহৌসির মনে হচ্ছে, এই রাতের অন্ধকারের ভেতরেও সেই পবিত্র পতাকা যেন পত্‌পত্ ক'রে উড়ছে আর তাঁর দিকে ইঙ্গিতে একটা সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে চলেছে—অযোধ্যা—অযোধ্যা—অযোধ্যা—

॥ আঠারো ॥

দেওয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে দু'টো ঘণ্টা বাজলো।

রাত দু'টো বাজে কিন্তু কোনো হুঁশ নেই হরিশের। সেই যে পেট্রিয়ট আপিস থেকে ফিরে টেবিলের সামনে ব'সেছে, তারপর থেকে কেবল নথি-পত্র প'ড়েই চ'লেছে।

এই ক'দিনে একটা স্তূপ জ'মে উঠেছে টেবিলের ওপর। কত নথি-পত্র, বই আর গেজেটিয়ার। কত দলিল-দস্তাবেজের অনুলিপি।

আজ ক'দিন ধ'রে কেবলই জ'মছে আর জ'মছে! এক নাগাড়ে চ'লছে তথ্য-সংগ্রহের কাজ। কোনোদিন রাত একটা, কোনোদিন দু'টো, কোনো দিন বা তিনটে বেজে যায়। কোনোদিন রাত হ'য়ে যায় ভোর।

বাড়িতে সবচেয়ে আগে ঘুম ভাঙে রুক্মিণীর। বিপিন বৈরাগী ভোরের টহল দিতে আসার আগেই ব্রাহ্ম মুহূর্তে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েন তিনি। প্রায় রোজই নজরে পড়ে, হরিশের পড়ার ঘরে তখনো আলো জ্বলছে! এ কেবল একদিনেরই ব্যাপার নয়, অনেকদিন থেকেই চ'লছে। ছেলেকে ব'লে ব'লে হাল ছেড়ে দিয়েছেন তিনি।

রুক্মিণীর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম ভাঙে মাধুরীর। বিধবা যুবতী সে। ঠাকুরমার কাছেই তার শোয়ার ব্যবস্থা। অনেকদিনই ঘুম ভাঙার পর কাকাবাবুর পড়ার ঘরে আলো দেখে দেখে তার অভ্যেস হ'য়ে গেছে। ঠাকুরমা হাল ছাড়লেও সে কিন্তু হাল ছাড়েনি! এইভাবে রাতের পর রাত বোতল বোতল মদ খেয়ে পড়াশুনো ক'রলে তার কাকাবাবুর শরীরটা কতদিন টিঁকবে?

মাধুরী বেশ ভালোভাবেই জানে, বাড়িতে একমাত্র তার কথাতেই কিছু কাজ হ'তে পারে। ঠাক্‌মা, মা—কারো কথায় নয়। আর খুড়িমার প্রশ্ন তো ওঠেই না।

কাকাবাবুর দেখাশোনা, তদারকির কাজটা মাধুরীই করে। তাঁর হুঁকো সেজে দেওয়ার কাজটা এখনো তাকে ক'রতে হয়। শৈশবের সেই সরল চাপল্য এখন আর নেই, থাকা সম্ভব-ও নয়। বড়ো বেশি শান্ত আর গম্ভীর হ'য়ে গেছে মাধুরী। এখন আর শৈশবের মতো মিষ্টি শাসন করে না বটে, কিন্তু মৃদু অনুযোগ করে মাঝে মাঝে।—ও-সব ছাই-পাঁশ না খেয়ে তুমি তামাক-ই যতো খুশি খাওনা কাকাবাবু। যতবার ব'লবে, আমি ততবার সেজে দেবো।

হরিশের মুখে ফুটে ওঠে মৃদু হাসি।

অভাগিনী ভাইঝির মমতা-স্নিগ্ধ অনুযোগে সে-হাসি কেমন যেন করুণ, বিষন্ন হ'য়ে ওঠে। কোনোদিন ওই ম্লান হাসিটুকু দিয়েই নীরবে সে তার মধু-মা'র অনুযোগের উত্তর শেষ করে, কোনোদিন বা ম্লান স্বরে উত্তর দেয়, আমি অভ্যেসের দাস হ'য়ে গেচি মধু-মা! তুমি বারবার ও-কথা আর ব'লো না। মদ ছাড়লে আমি লিখতেই পারবো না। আমার পেট্রিয়ট-ও উঠে যাবে!

এ-কথার পরেও দু'একবার ক্ষীণভাবে চেষ্টা ক'রেছে মাধুরী। ব'লেছে, ছেড়ে দেবার কথা তো আমি বলিনি কাকাবাবু, সে তুমি এখন পারবে না। আমি ব'লচি, মাত্রা কমিয়ে দাও। নইলে তোমার শরীর ভেঙে যাবে যে!

নিরুপায়ভাবে সেই ম্লান হাসিই হাসে হরিশ। এই অবধারিত সত্যকে জেনেও মদ্যপানের মাত্রা কমিয়ে আনার উপায় এখন আর তার নেই!

সাজা ক'লকেটা গড়গড়ার মাথায় চাপিয়ে দিয়ে হয়তো একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় মাধুরী। নিজের মা-বাবা সবাই আছেন। কিন্তু ভগবান না করুন, তার এই কাকাবাবুর হঠাৎ ভালো-মন্দ একটা কিছু হ'য়ে গেলে এ-সংসারে তার সত্যিকারের আপনজন আর বোধহয় কেউ থাকবে না!

আজ ক'দিন ধ'রে অযোধ্যা রাজ্য সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহে ব্যস্ত আছে হরিশ। কয়েকখানা মূল্যবান দলিলপত্র দিয়েছেন কর্ণেল চ্যাম্পনিজ। গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসি যে অযোধ্যার ওপর দ্রুত

হস্তক্ষেপ ক'রতে চ'লেছেন, সে-খবর তিনি ভালোভাবেই পেয়ে গেছেন। কানাঘুষো আর ভেতরকার খবর সব সময়েই কিছু পার্থক্য থাকে। এবার কিন্তু সে-পার্থক্য আর নেই।

আজকাল আর অবাক হয় না হরিশ।

কর্নেল চ্যাম্প্‌নিজ সত্যিই অন্য ধাতে গড়া ইংরেজ। এ-দেশের অন্যান্য সিবিলিয়ান কিম্বা সামরিক বাহিনীর হোমরা-চোমরাদের সঙ্গে তাঁর ধরন-ধারণ একেবারেই মেলে না। তাঁর প্রথম কৈশোরের স্বপ্ন ছিলো, অক্সফোর্ড কিম্বা কেম্ব্রিজের একজন জ্ঞানতপস্বী অধ্যাপকের জীবন। বাস্তবের সে স্বপ্ন সফল হয়নি কিন্তু কল্পনায় সে-স্বপ্নের ঘোর যেন এখনো লেগে রয়েছে!

লর্ড ডালহৌসির অযোধ্যা নীতি নিয়ে হরিশ কিছু লিখতে চায় শুনে উপযাচক হ'য়ে তিনি নিজেই একদিন ব'ললেন, আমার লাইব্রেরিতে কিছু পুরনো নথি-পত্র আছে। হয়তো এ-ব্যাপারে তোমার কাজে লাগতে পারে।

কর্ণেল চ্যাম্প্‌নিজের কুঠিতে ব'সেই কথা হচ্ছিলো সেদিন।

নথিপত্রগুলো আগেই গুছিয়ে রেখেছিলেন তিনি। হরিশের সামনে এগিয়ে দেওয়ার সময় ব'ললেন, কাজ হ'য়ে গেলে আমার কুঠিতেই ফেরৎ দিয়ে যাবে, আপিসে নিয়ে যেয়ো না।

সামনে পানীয় আর পানপাত্র।

পানপাত্রে ধীরে ধীরে কয়েকটা চুমুক দেবার পর কর্ণেল ব'ললেন, কতদিন আয়ু আছে জানিনে। অবসর নেবার পর যদি বেঁচে থাকি আর দেশে ফিরে যাই তাহ'লে কবরে যাওয়ার আগে অন্ততঃ একটা কাজ ক'রে যাওয়ার ইচ্ছে আছে হরিশ! চসার, মিলটন, শেক্‌স্‌পীয়র, নিউটন আর স্যার হামফ্রে ডেভির দেশের লোক হ'লেও বিদেশে এসে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে আমরা যে কত নীচে নামতে পারি, তার কিছু বিবরণ আমি নিশ্চয়ই লিখে রেখে যাবো! আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইণ্ডিজে আমার স্বজাতের বীভৎস চেহারাটা আমি চোখে দেখিনি, পত্র-পত্রিকায় প'ড়েচি মাত্র। কিন্তু এ-দেশে সে-চেহারা তো নিজের চোখেই দেখচি!

হরিশ কিছু বলবার আগেই কর্ণেল আবার ব'ললেন, অবশ্য আমাদেরই বা দোষ কী বলো? প্রতি পদে তোমাদের দেশের লোকের সাহায্য না পেলে একশো বছরের ভেতর কোম্পানির পক্ষে এত আধিপত্য বিস্তার করা কি সম্ভব হ'ত?

হরিশের মুখে ফুটে উঠলো ক্ষুব্ধ বেদনার্তের নিরুপায় লজ্জার অভিব্যক্তি। সে ব'ললে, এ-কথা আমি সম্পূর্ণভাবেই স্বীকার করি স্যার। পলাশীর প্রান্তরে মীরজাফর অতবড়ো বিশ্বাসঘাতকতা না ক'রলে—

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে কর্ণেল ব'ললেন, ভুল হরিশ ভুল! মীরজাফর তো বলির পাঁঠা মাত্র! ষড়যন্ত্রের প্রধান নায়ক ছিলো টাকার কুমীর মারোয়াড়ি জগৎশেঠ।

উগ্র সুরার পানপাত্রে আর একবার চুমুক দিয়ে কর্ণেল ব'ললেন, অপেরায় নর্তকীর নাচ নিশ্চয়ই দেখেচো? ভেবে দ্যাখো, অপেরা হাউস থেকে বেরিয়ে আসার পরেও নর্তকীর নাচের ভঙ্গিমাগুলোই আমাদের চোখের সামনে ভাসতে থাকে। আড়ালে ব'সে যে যন্ত্রীরা সুর-তাল দিয়ে ওই নাচকে আমাদের চোখের সামনে প্রাণবন্ত ক'রে তোলে, তাদের কথা আমরা কিন্তু বেমালুম ভুলে যাই! তাই নয় কি?

হরিশ সায় দিলে।

কর্ণেল আবার ব'লতে লাগলেন, সেই সময়কার বেশ কিছু নথিপত্র ঘেঁটে দেখার সুযোগ আমার হয়েছে হরিশ। আমাদের দেশের লোক এ-দেশে নিছক ব্যবসা ক'রতে এসে কেমন ক'রে এতবড়ো একটা উপনিবেশের কর্তৃত্ব পেয়ে গেল, তা জানার কৌতূহল আমার অনেকদিন থেকেই ছিল। আমি কী দেখেচি জানো? তোমাদের নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার চরিত্রে হয়তো ত্রুটি কিছু ছিল, কিন্তু সেইটেই ষড়যন্ত্রের প্রধান কারণ নয়। কোটিপতি মারোয়াড়ি জগৎশেঠ আর পাঞ্জাবী আমীর চাঁদ নবাব আলীবর্দীর আমলে নবাব-সরকারের রাজকোষকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ

ক'রতো। তরুণ যুবক সিরাজ বাঙলার নবাব হ'য়েই তাতে আপত্তি জানালে। ওদিকে ঢাকায় রাজা রাজবল্লভের যে জমিদারি ছিল, তার বার্ষিক খাজনা প্রায় দু'লক্ষ টাকা। নবাব আলীবর্দীর আমলে রাজা রাজবল্লভ একটা পাই পয়সাও কখনো জমা দেননি নবাবের খাজাঞ্চিখানায়। নবাব হ'য়েই তাঁর কাছে রাজকোষের প্রাপ্য খাজনা দাবি ক'রে ব'সলেন সিরাজ। তখনই যোগাযোগ হ'ল মারোয়াড়ি, পাঞ্জাবী আর বাঙালীর। সেই থেকে ষড়যন্ত্রের আরম্ভ। নিজেদের দল ভারী করবার জন্যে তাঁরা ডেকে আনলেন নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র আর নাটোরের রাণী ভবানীকে। কারণ, তাঁরা জানতেন যে, হিন্দু স্ত্রীলোক সম্বন্ধে নবাবের কিছু উচ্ছৃঙ্খল আচরণের জন্যে এ'রা দু'জন আগে থেকেই ক্ষুব্ধ ছিলেন। বিশেষত রাণী ভবানীর পরমা রূপসী বিধবা মেয়েটির ওপর নবাব সিরাজের লালসার্ত দৃষ্টি প'ড়েছিল ব'লে রাণী নিজে ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠেছিলেন নবাবের ওপর। তারপর নবাবীর লোভ দেখিয়ে জগৎশেঠ, আমীরচাঁদ আর রাজবল্লভ-ই বলির পাঁঠা হিসেবে মীরজাফরকে দলে টেনে নিলেন! নবাব হওয়ার সুযোগ পেলে কোন্ সেনাপতি তা ছাড়ে বলো?

হরিশ গভীর মনোযোগে শুনছে কর্ণেলের বিশ্লেষণ।

মৃদু হেসে কর্ণেল ব'ললেন, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে পানপাত্রের ওপর তোমার বড়ো বেশি অবহেলা দেখানো হ'য়ে যাচ্ছে হরিশ! ও বেচারা তোমার ওপর অভিমান ক'রে ব'সতে পারে।

হেসে পানপাত্র হাতে নিলে হরিশ।

কর্ণেল চ্যাম্পনিজ তাঁর প্রসঙ্গের সূত্র ধ'রে আবার ব'লতে আরম্ভ ক'রলেন, লর্ড ক্লাইভকেও আমি দোষ দিতে পারিনে হরিশ। ব্যবসা ক'রতে এসে একেবারে আচমকা একটা রাজত্ব পেয়ে যাওয়ার দুর্লভ সুযোগ কেউ কি হাতছাড়া ক'রতে চায়? জগৎশেঠের দলের আমন্ত্রণ গ্রহণে তাই তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি। চারদিক থেকে জাল গুটিয়ে আনা এতবড়ো একটা চক্রান্তের পরিণাম যা হওয়ার, তাই-ই হ'ল!

কর্ণেল একটু থামলেন।

গভীর বেদনার্ত স্বরে হরিশ ব'ললে, বিশ্বাসঘাতকদের জন্ম নেওয়ার পক্ষে আমাদের দেশের মাটি বোধ হয় বড়ো বেশি উর্বর!

মৃদু হেসে কর্ণেল ব'ললেন, বিশ্বাসঘাতকদের জন্ম সব দেশেই কিছু না কিছু হয়, হরিশ! হয়তো এই পটভূমিতে এদেশে কিছু বেশি হ'য়েছিল। তবে হ্যাঁ, এখানেও আলাদা ক'রে আমার বলবার কথা একটা আছে। আমরা এখন তোমাদের দেশের ওপর ছড়ি ঘোরাচ্ছি বটে, কিন্তু প্রাচীন সভ্যতা সংস্কৃতির একটা পীঠস্থান হিসেবে ব্যক্তিগতভাবে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমার মনে শ্রদ্ধা আছে। এদেশে আসার পর থেকে তোমাদের দেশের ইতিহাস যতখানি পারি আমি প'ড়েছি। ইতিহাস প'ড়ে একটা কথাই আমার বারবার মনে হয়, ভৌগোলিক দিক থেকে এ-দেশ নিঃসন্দেহে অখণ্ড কিন্তু জাতীয়তার দিক থেকে তোমাদের একটা অঞ্চল আর একটা অঞ্চল থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এক-এক সময় এক একজন শক্তিমান রাজা এসেছেন, নিজের কৃতিত্বে তিনি এই গোটা দেশটার ভেতর কাজ-চালানো গোছের একটা ঐক্য বজায় রাখতে পেরেছেন। তাঁর মৃত্যুর পরেই সে ঐক্য আবার কোথায় মিলিয়ে গেছে! যাকগে, যে-কথা বলছিলাম! সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের এক নম্বর নায়ক রাজপুতানার মারোবাড় অঞ্চলের মানুষ। রাজপুতানার ইতিহাসে আমি একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য ক'রেছি হরিশ। একদিকে রাজপুত জাতের জ্বলন্ত দেশপ্রেম, অন্যদিকে ছল, চাতুরি, প্রবঞ্চনা আর চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা! এই শেষের অংশটার পীঠস্থান হ'ল মারোবাড়। রাজপুতানার রাজপুতদের বীরত্ব আর সংস্কৃতির যে ঐতিহ্য আছে, তা থেকে মারোয়াড়িরা কিন্তু একেবারেই বাদ—তা কি তুমি লক্ষ্য ক'রেচো? মারোয়াড়িদের একমাত্র সংস্কৃতি হ'ল টাকা। টাকা ছাড়া ওরা কিছু চেনে না, বোঝে না। তাই জগৎশেঠ যে সিরাজের ওপর ক্ষেপে যাবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। তবু পলাশীর যুদ্ধ সম্বন্ধে আমার কী মনে হয় জানো? দলবদ্ধ

বিশ্বাসঘাতকতা সত্ত্বেও হয়তো তোমাদের নবাবকে সেদিন পরাজয় বরণ ক'রতে হ'ত না, কারণ, তখনো মোহনলাল, মীরমদনের মতো দক্ষ সেনাপতিরা তাঁর পক্ষে ছিল। তারা বোধহয় জিততেও পারতো কিন্তু নবাবের ভাগ্য বিরূপ তাই মুষলধারে বৃষ্টি নামলো সেদিন।

স্তব্ধ হ'য়ে শুনছে হরিশ।

হ্যাঁ, সতেরোশো সাতান্ন সালের তেইশে জুন প্রবল বর্ষায় ধারাস্নান ক'রেছিল পলাশীর প্রান্তর! সেই বর্ষণের কিছুক্ষণ পরেই জয়োল্লাসে কেঁপে উঠেছিল ক্লাইভের শিবির। আর নবাব পক্ষের অদৃষ্টে বর্ষার ধারাস্নানের পর পরাজয়ের রক্তস্নান! ছত্রভঙ্গই হ'য়ে গেল নবাবের সেনাবাহিনী।

কর্নেল ব'ললেন, নবাবপক্ষের কামানের জন্যে মজুত করা বারুদের স্তূপে কোনো আবরণ ছিল না। বৃষ্টিতে ভিজে বারুদ হ'য়ে গেল কাদা। কামান তখন অসহায়। সেই সুযোগে আরম্ভ হ'লো ক্লাইভের নতুন উদ্দীপনায় আক্রমণ। গোলার আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে প'ড়লেন নবাবের বিশ্বস্ত সেনাপতি মোহনলাল, মীরমদন। বৃষ্টি এসে বিজয়ী ক'রে দিয়ে গেল রবার্ট ক্লাইভকে, একটা সাম্রাজ্য তুলে দিলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাতে!

বৃষ্টি!—কি স্নিগ্ধ! আবার কখনো কখনো কত নির্মম!

দু'হাজার বছরেরও আগেকার কথা। ভারতবর্ষের ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে আর একটা ঘটনা যেন ভেসে উঠলো হরিশের চোখের সামনে। সে-ও বিদেশী শক্তির আবির্ভাব। সেবারেও প্রবল বর্ষণ-ই ঘটিয়েছিল ভারতবর্ষে ভাগ্য বিপর্যয়; বিদেশী শক্তিকে ক'রেছিল বিজয়ী!

দিগ্বিজয়ী আলেকজান্দার দুর্বার বেগে দেশের পর দেশকে পদানত করে এগিয়ে এসেছেন পঞ্চনদে শতদ্রু নদীর তীরে। কিন্তু খরস্রোতা শতদ্রুকে অতিক্রম করা তাঁর পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হচ্ছে না। নদীর এ-পারে বিশাল বাহিনী নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁকে অভ্যর্থনার জন্যে অপেক্ষা ক'রছেন রাজা পুরু। তাঁর বাহিনীর একেবারে সামনে দু'শো হাতির বিরাট প্রাচীর। হাতির সারির পেছনে তীরন্দাজের দল, তাদের পেছনে পদাতিক বাহিনী।

এক-একটা ক'রে দিন যাচ্ছে আর শতদ্রুর ওপারে ক্রোধে, ক্ষোভে, হতাশায় ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠছেন দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজান্দার। যে অশ্বারোহীবাহিনী তাঁর যুদ্ধজয়ের সবচেয়ে বড়ো সম্বল, তা-ও তখন নিরুপায়, নিষ্ক্রিয়। নদী পার না হ'তে পারলে জয়ের কোনো সম্ভাবনা নেই। নদী পার হ'লেও ওই বিশাল হস্তীবাহিনীর ব্যূহ ভেদ ক'রে যুদ্ধজয়ের আশাও ক্ষীণ!

তবে কি দিগ্বিজয় সম্পূর্ণ না ক'রে হিন্দের এই নদীতীর থেকেই ব্যর্থ হ'য়ে ফিরে যেতে হবে মাসিদোনিয়ার অধিপতিকে?

কেটে গেল কয়েকটা দিন।

তারপরেই এক রাতে বজ্র-বিদ্যুৎ আর তীব্র বায়ুবেগকে সঙ্গী ক'রে আকাশ থেকে নেমে এলো প্রবল বর্ষণ। সেই সুযোগ নিলেন চতুর আলেকজান্দার। নদীর দু'পারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এই ক'দিন কেটেছে দু'পক্ষের। মুষলধারায় বৃষ্টির ভেতর মূল শিবির থেকে বেশ কিছুটা দূরে স'রে গিয়ে নৌকোর পর নৌকো জুড়ে একটা সেতু তৈরি ক'রে ফেললে গ্রীকবাহিনী। প্রচণ্ড দুর্যোগের ভেতরেই রাতের অন্ধকারে তারা নদী পার হ'ল।

পরের দিন সকালে পরিষ্কার স্বচ্ছ আকাশ। সকালের সোনালি আলো লুটিয়ে প'ড়লো শতদ্রুর তীরে। অবাক হ'য়ে পুরু দেখলেন, গ্রীকবাহিনী এপারে এসে গেছে, তারা আক্রমণের উদ্যোগ ক'রছে।

যুদ্ধ আরম্ভ হ'য়ে গেল।

ক্ষিপ্রবেগে পুরুর বাহিনীকে আক্রমণ ক'রলে গ্রীক অশ্বারোহীবাহিনী।

অসহায় হস্তীবাহিনী—অসহায় তীরন্দাজের দল! সারা রাতের প্রবল বর্ষণে নদীতীরের মাটি ভিজে কাদা হ'য়ে গেছে। পা রাখতে পারছে না হাতির দল। দিশেহারা মরীয়ার মতো মাহুতেরা

কেবল-ই তাদের অঙ্কুশ বিঁধ ক'রছে। করুণ আর্তনাদ ক'রে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হ'য়ে এদিক-ওদিক ছুটছে রাজা পুরুর সবচেয়ে বড়ো নির্ভরস্থল সেই সুশিক্ষিত বিপুলবপু জীবগুলি। তারা তখন দিক্‌ভ্রান্ত, ছত্রভঙ্গ।

তীরন্দাজী বাহিনীও অসহায়।

আকার-আয়তনে গ্রীক ধনুকের চেয়ে ভারতীয় ধনুক অনেক বড়ো। ধনুকের একটা দিক মাটিতে চেপে ধ'রে বেঁকিয়ে তাতে গুণ্ পরাতে হয়। কিন্তু তখন কোনো উপায় নেই। মাটিতে রেখে বাঁকাতে গেলে কাদায় ব'সে যাচ্ছে ধনুক। এই অবস্থার ভেতর ঝড়ের গতিতে এসে ঝাঁপিয়ে প'ড়লো গ্রীক অশ্বারোহী বাহিনী। ছিন্নভিন্ন হ'য়ে গেল ভারতীয় বাহিনীর দৃঢ় ব্যূহ। দিনের শেষে পরাজয় বরণ ক'রলেন ভারতীয় রাজা পুরু।

উদ্‌গ্রীব হ'য়ে হরিশের মুখ থেকে কাহিনীটা শুনছিলেন কর্নেল চ্যাম্পনিজ। হরিশ থেমে যাওয়ার পরেও বেশ কয়েক মুহূর্ত নীরবে ব'সে রইলেন তিনি। তারপর আপনমনেই ব'ললেন, অদ্ভুত সাদৃশ্য!

তখন বেশ কিছুটা রাত হ'য়েছে।

শীতের কলকাতায় পথ-ঘাটও বেশ জনবিরল হ'য়ে এসেছে। আর বেশি দেরি করা ঠিক নয়!

কর্নেল ব'ললেন, তোমাকে যে-সব নথি-পত্র দিলুম, তার ভেতর কোম্পানির রাজ্যলাভের সময় থেকে ইতিহাসের অনেক রসদ-ই তুমি পাবে। হয়তো অনেক কাহিনীই তোমার কাছে মনে হবে রূপকথার মতো!

মৃদু হেসে হরিশ ব'ললে, বিশ্বাসঘাতকতার রূপকথা!

কর্নেল হেসে ব'ললেন, তা যা ব'লেচো! শুধু বিশ্বাসঘাতকতা কেন, ছল-চাতুরি, জালিয়াতি, প্রবঞ্চনা—রহস্য রোমাঞ্চের সব রকম উপাদানই আছে। ভালো কথা, বিশ্বাসঘাতকতার আবর্জনা থেকে কুড়িয়ে পাওয়া একটা তারিফ করবার মতো ঘটনার কথা তখন আমি তোমাকে ব'লতে যাচ্ছিলুম কিন্তু পলাশী আর শতদ্রুতে প্রবল বৃষ্টি নেমে সে-কথাটা তখন আমাকে বেমালুম ভুলিয়ে দিয়েছে।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে হরিশ ব'ললে, তারিফ করবার মতো ঘটনা?

—হ্যাঁ। আমি নাটোরের রাণী ভবানীর কথা ব'লচি। তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবতী গোঁড়া হিন্দু নারী। বিধবা হিন্দু রাণী তাঁর রূপসী কন্যার ওপর সিরাজের লোলুপ দৃষ্টি এবং আরো কিছু হিন্দু নারীর সতীত্ব নষ্ট করবার অভিযোগে যুবক নবাবের ওপর বিরূপ হয়ে উঠেচিলেন ব'লেই নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে তিনি যোগ দিয়েচিলেন, তাই তো?

—সেইরকম-ই তো শুনেচি।

—তিনি যে পলাশীর যুদ্ধের অনেক আগেই ষড়যন্ত্র থেকে স'রে দাঁড়িয়েচিলেন, তা জানো?

—তাও শুনেচি। কিন্তু কেন স'রে দাঁড়িয়েচিলেন, সে সম্বন্ধে আমার কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই।

—তাঁর গভীর দূরদর্শিতা। আমি অবাক হ'য়ে ভাবি হরিশ, কতখানি দূরদৃষ্টি ছিল এই ভদ্রমহিলার। তোমাদের দেশে মুসলমান শাসনের যুগ আরম্ভ হওয়ার পর হিন্দু এবং মুসলমানের ভেতর ক্রমেই একটা ব্যবধানের প্রাচীর গ'ড়ে উঠেছে। পরস্পরের প্রতি একটা বিদ্বেষ আর ঘৃণার ভাব দুই পক্ষের দিক থেকেই ঐতিহাসিক সত্য।

—তার বিপরীত ছবিও আছে স্যার!—হরিশ ব'ললে, মোগল আমলে পাঠান মুসলমান আর বাঙালি হিন্দু কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দিল্লীর মোগল বাদশাহীর বিরুদ্ধে লড়াই ক'রেছে, তাও তো ঐতিহাসিক সত্য।

—হ্যাঁ, সেটা ঠিকই ব'লেচো! শুধু তোমাদের দেশের কথা বলি কেন, আমাদের দেশ-ও তো ধর্মের নামে রক্তপাত থেকে মুক্ত নয়। রোমান ক্যাথলিক আর প্রোটেস্ট্যান্টের সংঘর্ষে কত রক্ত ঝ'রেছে। আজও রক্ত ঝ'রছে আয়ার্ল্যাণ্ডে! তবুতো হিন্দু আর মুসলমান ধর্ম একেবারেই দু'টো আলাদা ধর্ম। আর আমরা দু'পক্ষই ক্রীশ্চান হ'য়ে পরস্পরের রক্তে মাটি ভিজিয়েছি! যাই হোক,

যে-কথা ব'লছিলুম। রাণী ভবানীর দূরদৃষ্টি সত্যিই আমাকে অবাক ক'রেছে হরিশ। গোঁড়া হিন্দু মহিলা হিসেবে মুসলমান নবাবের ওপর তাঁর বিতৃষ্ণা হয়তো ছিল কিন্তু তিনিই বোধহয় সবচেয়ে আগে বুঝতে পেরেছিলেন, যুবক নবাবের ওপর আক্রোশ মেটাতে গিয়ে রবার্ট ক্লাইভকে ডেকে আনার পরিণাম কী হতে পারে! আমি একজন ব্রিটিশ হিসেবে রবার্ট ক্লাইবের সাফল্যের সুফল আজ পুরোমাত্রায় ভোগ ক'রচি! কিন্তু জাতিত্বের প্রশ্ন সরিয়ে রেখে একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে ব'লচি, রাণী ভবানী আমার শ্রদ্ধা অর্জন ক'রেছেন। নবাবের ওপর তাঁর যত বিতৃষ্ণা থাক, প্রতিশোধ নিতে গিয়ে নিজের দেশের সঙ্গে তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করেননি। নবাবকে সিংহাসন থেকে সরানোর জন্যে রবার্ট ক্লাইভকে ডেকে আনার পরিণাম সম্বন্ধে তিনি সবাইকে সতর্ক ক'রেছিলেন। কিন্তু তাঁর চেষ্টা বিফল হ'য়ে গেল। জগৎশেঠ, আমীরচাঁদ, রাজবল্লভের দল তখন বেপরোয়া। ব্যর্থ হ'য়ে ষড়যন্ত্র থেকে স'রে দাঁড়ালেন রাণী ভবানী। একজন নারীর পক্ষে এটা বড়ো কম কথা নয়, হরিশ!

একটু থেমে আবেগ-মেশানো স্বরে কর্ণেল চ্যাম্প্‌নিজ আবার ব'ললেন, আমার কী মনে হয়, জানো? এ-ঘটনা যদি আমাদের দেশে ঘট্‌তো তাহ'লে এইরকম মহীয়সী মহিলাকে আমরা জাতীয় বীরাঙ্গনার আসনে বসাতুম। কারণ, দেশের স্বার্থকে তিনি ধর্মীয় রক্ষণশীলতার ওপরে স্থান দিতে পেরেছিলেন!

নির্বাক হ'য়ে ব'সে রইলো হরিশ।

কর্ণেল তাঁর পানপাত্রে শেষ চুমুক দিয়ে ব'ললেন, আমার হ'য়েচে জ্বালা! এদেশে আমার স্বজাত শ্বেতাঙ্গদের চাল-চলন দেখে ঘৃণায় গা রী রী ক'রে ওঠে, আবার তোমাদের দেশের অর্থলোভী, বিবেকহীন মানুষগুলোকে দেখেও প্রচণ্ড ঘৃণা হয়। আমার তো মনে হয়, তুমি কিম্বা তোমার মতো সামান্য দু'চারজন মানুষ কলম ধ'রে কোম্পানির অনাচারের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিকার-ই ক'রতে পারবে না। কারণ, নেটিব দেওয়ান, বেনিয়ানের সংখ্যা তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি। তাদের শক্তি রয়েছে কোম্পানির পেছনে। একটা সিক্‌কা টাকাও রোজগারের উপায় যতক্ষণ পর্যন্ত আছে, ততক্ষণ কোম্পানির অনাচারের সঙ্গে তারা জড়িয়ে থাকবেই!

তীব্র ঘৃণার অভিব্যক্তিতে ভরে উঠ্‌লো কর্ণেলের মুখ। তারপরেই একটু হেসে ব'ললেন, এক-এক সময় মনে হয়, নিরুপায় ভাবে প্রতিমুহূর্তে চোখের সামনে সততার অপমান দেখার চেয়ে কোনো নির্জন দ্বীপে গিয়ে বাস ক'রতে পারলে বোধ হয় একটু শান্তি পাওয়া যেতো!

মৃদু হেসে হরিশ ব'ললে, যতক্ষণ একা, ততক্ষণ হয়তো চিন্তার কিছু থাকতো না। কিন্তু আর একজন এলেই তখন চিন্তার কারণ ঘ'টতো। কারণ, তার সঙ্গে সেখানে সভ্যতা নামক বস্তুটির আবির্ভাব ঘটতো!

হো হো ক'রে হেসে উঠলেন কর্ণেল চ্যাম্পনিজ।

॥ উনিশ ॥

কর্নেল চ্যাম্প্‌নিজ এতটুকুও বাড়িয়ে বলেননি।

এ যেন সত্যিই রূপকথার কাহিনী। কিম্বা তার চেয়েও অবিশ্বাস্য, তার চেয়েও রোমাঞ্চকর! এ-কাহিনীর মায়াবিনী ডাইনীর মায়া-মন্ত্র আর ছলা-কলা যেন আসল রূপকথার রোমাঞ্চকেও হার মানায়!

আজ ক'দিন ধ'রে সেই নথি-পত্রগুলো প'ড়ছে হরিশ।

পড়া তো নয়, যেন শিশুর মতো বিভোর হ'য়ে অবাক বিস্ময়ে রূপকথার গল্প শোনা। গ্রীস, রোম আর ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়া তার সেই কবে হ'য়ে গেছে। প'ড়েছে ভারতবর্ষের ইতিহাস। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেক তথ্য-ই তার অজানা ছিল। হয়তো ছিল

একটা অস্পষ্ট ধারণা মাত্র। সেই আব্ছা-জানা ইতিহাসের কত নতুন তথ্য এখন তার হাতের মুঠোয়! সে যেন রূপকথার গল্প-ই শুনছে। তার ভেতর দম নেবার অবসর নেই। যেন একটা কথা-ও না বাদ হয়! তাই কোনোদিন হ'য়ে যায় রাত দু'টো, কোনোদিন চারটে, কোনোদিন রাত শেষ হ'য়ে ফুটে ওঠে ভোরের আলো।

অযোধ্যা আর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রূপকথা।

পলাশীর প্রান্তরে সদ্য বিজয়ের পর রবার্ট ক্লাইভ যখন বাঙলার মস্নদে নবাব-স্রষ্টার ভূমিকায় অবতীর্ণ, দিল্লীর সিংহাসনে সম্রাট হ'য়ে ব'সে আছেন তখন অপদার্থ, অকর্মণ্য দ্বিতীয় আলমগীর। প্রধানমন্ত্রীর চক্রান্তে কার্যত তিনি নজরবন্দী আর মোগল যুবরাজ শাহ্ আলম রোহিলাখণ্ডে গিয়ে পলাতকের জীবন-যাপন ক'রছেন। অযোধ্যা আর এলাহাবাদের সম্মিলিত শক্তির সাহায্য নিয়ে শাহ্ আলম তাঁর বন্দী পিতাকে মুক্ত করবার চেষ্টা ক'রে চ'লেছেন।

সিরাজউদ্দৌল্লার পরাজয়ের পর সুবে বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার অবস্থা তখন বিপর্যস্ত, অরাজক। অযোধ্যা আর এলাহাবাদের শাসকের লোলুপ দৃষ্টি প'ড়েছিল সেই সুবাগুলোর ওপর। তারা সায় দিলে শাহ্ আলমের প্রস্তাবে। নিজেদের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্যে দিল্লীর বাদ্শার বংশধরের নাম ব্যবহার ক'রতে পারা তো একটা বিরাট সুযোগ!

সম্মিলিত বাহিনী অতর্কিতে বিহার আক্রমণ ক'রলো।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অবস্থা তখন সঙ্গীন। যে অযোধ্যাকে আজ পূর্ণগ্রাস ক'রতে চ'লেছেন লর্ড ডালহৌসি, সেই অযোধ্যাই সেদিন বাঁচিয়েছিল কোম্পানিকে।

সম্মিলিত বাহিনীর সঙ্গে প্রথম বিশ্বাসঘাতকতা ক'রলেন অযোধ্যার নবাব। এলাহাবাদের সুবেদারের অনুপস্থিতির সুযোগে বিহার জয়ের পরিবর্তে তিনি জয় ক'রে নিলেন এলাহাবাদের দুর্গ।

ব্যর্থ হ'ল শাহ্ আলমের পরিকল্পনা। বিহার-যুদ্ধে আবার সদম্ভে বিজয়ী হ'ল রবার্ট ক্লাইভের বাহিনী। নিরুপায় শাহ্ আলম তাঁরই কাছে আশ্রয় ভিক্ষা ক'রলেন।

কিছুদিনের ভেতরেই মন্ত্রীর চক্রান্তে নিহত হ'লেন দিল্লীর বাদশা দ্বিতীয় আলমগীর। দিল্লীর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী শাহ্ আলম। তিনিই হ'লেন নতুন বাদশা। অযোধ্যার নবাব নিযুক্ত হ'লেন বাদশার উজীর-এ-আজম। তাঁদের সঙ্গোপন লক্ষ্য হ'ল, বিদেশি বেনিয়াকে দেশছাড়া ক'রে সারা হিন্দুস্তানে আবার মোগল শাসনের পুনরুজ্জীবন।

এই সময়েই বাঙলার নবাব মীরকাশিমের সঙ্গে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বিরোধ উঠ্লো চরমে। পর পর কয়েকটা যুদ্ধে ইংরেজের কাছে পরাজিত হ'য়ে নবাব মীরকাশিম শেষ পর্যন্ত অযোধ্যার শক্তিমান নবাবের কাছে সাহায্য চাইলেন।

এক ঢিলে দুই পাখি মারবার এতবড়ো সুযোগ হাতছাড়া ক'রতে চাইলেন না অযোধ্যার নবাব। মীরকাশিমকে সাহায্যের নাম ক'রে সুবা বাঙলাকে গোরা বেনিয়াদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে পারলে তাঁর বাঙলা অধিকারের স্বপ্নও সফল হয় আর সেই সঙ্গে ফিরিয়ে আনা যায় দিল্লীর বাদশার হৃত কর্তৃত্ব!

কিন্তু বক্সারের যুদ্ধে গোরাবাহিনীর কামানের গোলায় ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে গেল মীরকাশিম আর অযোধ্যার নবাবের মিলিত বাহিনী।

দ্বিতীয়বার ঘ'ট্লো অযোধ্যার পক্ষ থেকে বিশ্বাসঘাতকতা!

ব্রিটিশ শক্তির স্বরূপ দেখে বিচলিত অযোধ্যার নবাব ত্যাগ ক'রলেন বিপন্ন আশ্রয়প্রার্থী নবাব মীরকাশিমকে। মনে ভাবলেন, তিনি হয়তো রক্ষা পাবেন।

কিন্তু সদ্য বিজয়ী ব্রিটিশ বাহিনী তখন উন্মত্ত—উদ্দাম!

অল্প সময়ের ব্যবধানে দু'টো বড়ো বড়ো যুদ্ধের সাফল্য তখন তাদের দুঃসাহসী ক'রে তুলেছে। যুদ্ধ জয়ের আনন্দটুকুই পর্যাপ্ত নয়, তার সঙ্গে চাই আরো কিছু। চাই যুদ্ধ-জয়ের স্থায়ী কোনো পুরস্কার!

বিজয়গর্বে ব্রিটিশবাহিনী এগিয়ে চ'ললো অযোধ্যার রাজধানী লখ্‌নৌয়ের দিকে। হতবল অযোধ্যার সৈন্যবাহিনী তাদের প্রতিরোধ ক'রতে পারেনি। নবাব সুজাউদ্দৌল্লার প্রাণ নেওয়ার ইচ্ছে তখন অন্ততঃ ক্লাইভের ছিলো না। নবাব প্রাণে বাঁচলেন কিন্তু লখ্‌নৌয়ের অধিকার তুলে দিতে হ'ল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাতে।

ক্লাইভের পরে ওয়ারেন হেস্টিংস্।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার আর সেই সঙ্গে ব্যক্তিগত অর্থভাণ্ডারের স্ফীতি—দু'দিকেই সমানভাবে নজর ছিল রবার্ট ক্লাইভের। কিন্তু ওয়ারেন হেস্টিংস ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের চেয়েও নিজের অর্থসম্পদ বৃদ্ধির জন্যে বেশি ব্যগ্র। নতুন পাওয়া উপনিবেশ শাসনের দায়িত্বে এসে তিনি কেবল রাজ্যশাসনই ক'রবেন? দেশে ফেরার সময় ফিরবেন খালি হাতে?

শাহ্ আলম দিল্লীর লুপ্ত গৌরব উদ্ধারে উদ্‌গ্রীব।

অযোধ্যার নবাব নিজের রাজ্যকে আরো প্রসারিত করবার আশায় সুযোগ সন্ধানে রত। তাঁর সুযোগ-ও ছিল। তিনিই দিল্লীর বাদ্‌শার প্রধান উজীর। সঙ্গোপন চুক্তি হ'ল ব্রিটিশ গর্বণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের সঙ্গে। শাহ্ আলম তা জানতেও পারলেন না। রোহিলাখণ্ডকে বিভক্ত ক'রে এলাহাবাদ আর কোরা অঞ্চল সমেত এক বিরাট ভূখণ্ড এসে গেল অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার অধিকারে। এ-কাজে ব্রিটিশ বাহিনীর সাহায্য-ও পেলেন তিনি। সাহায্যের মূল্য হিসেবে হেস্টিংস উৎকোচ পেলেন পঞ্চাশ লাখ সিক্‌কা টাকা। দু'পক্ষই তৃপ্ত।

সুজাউদৌল্লা আর ওয়ারেন হেস্টিংস। অযোধ্যার নবাবের সঙ্গে ব্রিটিশপক্ষের কি নিবিড় বন্ধুত্ব তখন! কিন্তু তার মেয়াদ কতদিন?

পঞ্চাশ লাখ টাকাই-তো শেষ কথা নয়! উৎকোচের প্রথম কিস্তি হিসেবেই সে টাকা নিয়েছিলেন তিনি। গোপন চুক্তির শর্ত অনুযায়ী হেস্টিংসের পাওনা যে আরো অনেক বেশি!

ক্রমাগত চাপ দিতে লাগলেন হেস্টিংস। নবাব যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তার বাকি টাকা কোথায়?

বন্ধুত্বের চুক্তি নবাবের কাছে হ'য়ে উঠলো বোঝাস্বরূপ। নিরুপায় হ'য়ে আরো কয়েক লাখ টাকা দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তাতেও নাকি হেস্টিংসের ন্যায্য প্রাপ্য সবটুকু মেটেনি।

এর কিছুকাল পরে মৃত্যু হ'ল সুজাউদ্দৌল্লার। অযোধ্যার নবাব হ'লেন তাঁর পুত্র আসফ-উদ্দৌল্লা।

নবাবের মৃত্যু হ'তে পারে কিন্তু তাই বলে নবাবের দেওয়া প্রতিশ্রুতি কি তামাদি হয়? প্রাপ্য টাকার জন্যে নতুন নবাবকে চাপ দিতে শুরু করলেন হেস্টিংস। সে দাবি পূরণ করবার সামর্থ্য নতুন নবাবের ছিল না। কিছু মকুব করবার প্রার্থনা জানালেন তিনি। তখন অর্থভাণ্ডার সমৃদ্ধ করবার অন্য সহজ উপায় আবিষ্কার ক'রলেন হেস্টিংস। অযোধ্যার রাজপ্রাসাদের হারেমে বেগম আর নবাবজাদীদের ব্যক্তিগত মূল্যবান রত্নরাজির কথা ছিল প্রবাদবাক্যের মতো। তাঁর দৃষ্টি প'ড়লো সেদিকে। ব্রিটিশ গবর্ণর জেনারেলের আদেশে লুণ্ঠিত হ'ল সেই ধনরত্ন। তার সঙ্গে অন্যান্য ধনী আমীর-ওম্‌রাহের ভাণ্ডার থেকে লুণ্ঠিত সম্পদ এসে যুক্ত হ'ল। কোম্পানির আইনের ভাষায়, সে-সব সম্পত্তি হ'ল বাজেয়াপ্ত। আইন-প্রয়োগের এই কাজে দৈহিক নির্যাতন, মহিলাদের দেহ-তল্লাশি—কিছুই বাদ গেল না।

হেস্টিংস্ চ'লে যাওয়ার পর এলেন লর্ড কর্ণওয়ালিস।

অযোধ্যার নবাবের কাছে দাবির পরিমাণ কমিয়ে তিনি ধার্য ক'রলেন বার্ষিক পঞ্চাশ লাখ টাকা। কিন্তু নতুন গবর্ণর জেনারেলের এই অসীম সদাশয়তার প্রতিদানে অযোধ্যার নবাবকে অবশ্য আর একটু মূল্য ধ'রে দিতে হ'ল।

অযোধ্যা রাজ্যের সামরিক ব্যবস্থার দায়িত্ব নিলেন ব্রিটিশ সরকার।

অবশ্য আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থার কর্তৃত্বভার নবাব-সরকারের হাতেই রইলো। হাজার হোক, ব্রিটিশ সরকারের তো একটা বিবেচনা আছে!

আসফ-উদ্দৌল্লার মৃত্যু হ'ল।

নবাবী-তখ্‌তে বসতে গেলে নতুন আইনে তখন ব্রিটিশ রেসিডেন্টের সম্মতি চাই। সেই সম্মতি পেয়ে নতুন নবাব হ'লেন মৃত নবাবের পুত্র ওয়াজির আলি। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের কী এক গোপন অভিপ্রায়ে সিংহাসনের অধিকার হারাতে হ'ল ওয়াজির আলিকে। ঘোষণা করা হ'ল, তিনি নাকি মৃত নবাবের অবৈধ সন্তান। এবারে নবাবের তখ্‌তে বসানো হ'ল তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আর ওয়াজির আলির নসীবে জুটলো বেনারসের কারাগারে বন্দী জীবন। অপমানে উন্মাদপ্রায় ওয়াজির আলি কারাগার থেকে পালিয়ে হত্যা ক'রলেন বেনারসের ব্রিটিশ রেসিডেন্টকে —ওড়ালেন বিদ্রোহের ধ্বজা। কিন্তু তাঁর সামর্থ্য কতটুকু? বিদ্রোহ হ'ল ব্যর্থ—হতভাগ্য প্রাক্তন নবাবের হ'ল মৃত্যুদণ্ড।

কর্ণওয়ালিসের আমল শেষ। এলেন মার্কুইস অব্ ওয়েলেস্‌লি।

এদেশ থেকে ব্রিটিশের সবচেয়ে বড়ো প্রতিদ্বন্দ্বী ফরাসী-শক্তিকে সমূলে উৎপাটিত করবার ব্রতে সবচেয়ে বেশি মনোযোগ দিয়েছিলেন তিনি। তার জন্যে বিপুলভাবে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করা দরকার। তা ক'রতে গেলে প্রচুর অর্থবলের প্রয়োজন। কিন্তু সে-ব্যয়ভার বহন করবার সামর্থ্য কোথায় কোম্পানির?

চারদিকে উপায় সন্ধান ক'রতে ক'রতে ওয়েলেস্‌লির দৃষ্টি প'ড়লো অযোধ্যার ওপর। অযোধ্যার নবাবের ওপর জারি হ'ল নতুন ফর্‌মান। ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর একটা বিশাল অংশের ব্যয়ভার বহন ক'রতে হবে ব্রিটিশ-বন্ধু অযোধ্যার নবাবকে।

করুণ অনুনয়ে নবাব জানালেন, এত অর্থব্যয়ের সামর্থ্য তাঁর রাজকোষের নেই। তাছাড়া, এ-জাতীয় অনুরোধ দুই সরকারের পূর্ব নির্ধারিত চুক্তির শর্ত ভংগ ক'রছে।

নবাব তখনো বুঝতে পারেননি যে, এটা অনুরোধ নয়—আদেশ।

আদেশ-ই গেল আযোধ্যায়। কেবল তার ভাষার ওপর অনুরোধের একটা মসৃণ প্রলেপ মাত্র। লখ্‌নৌ কিম্বা এলাহাবাদে ব'সে আগে যে চুক্তিই হ'য়ে থাক না কেন, তার চূড়ান্ত ব্যাখ্যা করবার অধিকার ব্রিটিশ জেনারেলের। তাই মার্কুইস অব্ ওয়েলেস্‌লির সংগত ব্যাখ্যা অনুসারে, ব্রিটিশ সরকার অযোধ্যার নবাবকে যে ব্যয়ভার-ই বহন ক'রতে ব'লবেন, নবাব তা ক'রতে বাধ্য! তার জন্যে দরকার হ'লে নিজস্ব সেনাবাহিনীকে ভেঙে দিতে হবে।

অযোধ্যার নবাব তাতে অনিচ্ছুক।

সামান্য একটা নেটিব নবাবের স্পর্ধায় ক্ষিপ্ত হ'য়ে ব্রিটিশ সরকারের মহামান্য গবর্ণর জেনারেল সমস্ত অযোধ্যা রাজ্যই দাবি ক'রে ব'সলেন। সে দাবির পরিণাম বুঝতে অসুবিধে হয়নি নবাবের। ব্রিটিশ শক্তিকে প্রতিহত করবার শক্তি তাঁর নেই।

শেষ পর্যন্ত একটা আপোস-রফা হ'ল।

বার্ষিক খাজনার দাবি ত্যাগ ক'রলেন ব্রিটিশ সরকার। গুটিয়ে নিলেন নতুন ফর্‌মান। কিন্তু লাভের অঙ্ক দাঁড়ালো অনেক বেশি। রোহিলাখণ্ড আর দোয়াব অঞ্চল সম্পূর্ণভাবে এলো সরকারের অধিকারে। রাজ্যের বেশির ভাগ অংশটাই ব্রিটিশের হাতে তুলে দিয়ে অবশিষ্ট অংশের ওপর কোনোমতে রাজত্ব করবার অধিকারটুকু মাত্র রক্ষা ক'রতে পারলেন অযোধ্যার নবাব।

তারপর গবর্নর জেনারেল লর্ড ময়রার আমল।

এই আমলে আর সব সামন্তরাজ্য শঙ্কিত হ'য়ে উঠ্‌লো, কিন্তু অযোধ্যা রইলো নিরাপদ। ব্রিটিশের নেপাল যুদ্ধের অর্ধেক ব্যয়ভার-ই বহন ক'রেছিলেন নবাব গাজীউদ্দীন হায়দার। তাছাড়াও তাঁর কাছে উপহার হিসেবে কোম্পানি সরকার পেয়েছিল এককোটি টাকা। কয়েক লক্ষ টাকা উৎকোচ পেয়েছিলেন ব্রিটিশ রেসিডেন্ট মর্ডান্ট রিকেট্‌স্।

গাজীউদ্দিনের পর নবাব হ'লেন তাঁর পুত্র নাসিরউদ্দিন হায়দার। পিতার মতো ধূর্তবুদ্ধি ছিল না তাঁর। শাসনদক্ষতাও অকিঞ্চিৎকর।

আবার নতুন সুযোগের হাতছানি!

নবাব নাসিরুদ্দিন হায়দার অক্ষম, দুর্বল, শক্তিহীন! এক অপদার্থ নবাবের অক্ষমতায় অযোধ্যার মতো একটা সামন্তরাজ্য অরাজকতায় তলিয়ে যাবে, শুভার্থী ব্রিটিশ সরকার চোখের সামনে তা কেমন ক'রে সহ্য ক'রবে?

এগিয়ে এলো কোম্পানি সরকার।

সামরিক বিভাগের কর্তৃত্ব সে তো আগেই হাতে তুলে নিয়েছিল। বাকি ছিল আভ্যন্তরীণ শাসন। এবারে তার কলকাঠিটাও হাতে নিলে ব্রিটিশ সরকার। কথা রইলো, রাজ্য শাসনের সমস্ত ব্যয়-নির্বাহের পর উদ্বৃত্ত রাজস্ব জমা প'ড়বে নবাবের খাজাঞ্চিখানায়!

কিন্তু কোনোদিন-ই তা হয়নি। নবাবের রাজকোষে জমা প'ড়েছে নিতান্ত নামে মাত্র রাজস্ব। আর রেসিডেন্ট থেকে শুরু ক'রে সামান্য একজন গোরা সেপাই পর্যন্ত সব ক'জন শাদা চামড়ার মানুষ দেখতে দেখতে হ'য়ে উঠলো এক-একজন ছোটোখাটো নবাব! সব জেনে, সব বুঝেও নবাব অসহায়। তিনি শুধু নীরব দর্শক!

এইভাবেই কেটে এসেছে এতগুলো বছর।

বলির পাঁঠাকে অনেক আগেই হাড়কাঠে ফেলে রাখা হ'য়েছে। এখন শুধু খাঁড়ার একটা কোপের অপেক্ষা! তার ব্যবস্থাই ক'রছেন ডালহৌসি!

ঢং ঢং ক'রে দেওয়াল ঘড়িতে চারটে বাজলো।

হরিশের কোনো খেয়াল নেই! আগামী কালই কাগজ-পত্রগুলো কর্নেল চ্যাম্পনিজকে ফিরিয়ে দেওয়ার কথা। নিজের কথার খেলাপ করে না হরিশ। এক্ষেত্রেও ক'রবে না। দরকারি তথ্যগুলো সবই প্রায় লিখে নেওয়া হ'য়ে গেছে। যেটুকু বাকি আছে, সেটুকু আজ রাতেই শেষ ক'রতে হবে। চোখে ক্লান্তি নেমে এলেও তাকে প্রশ্রয় দেওয়ার অবকাশ কোথায়?

আবার একটা নতুন মদের বোতলের ছিপি খুলে যায়। উত্তেজিত মস্তিষ্ক একটু একটু ক'রে ঠাণ্ডা হ'তে থাকে। যে উগ্র সুরা অপরের কাছে উত্তেজক, সেই জিনিস-ই হরিশের কাছে বিপরীত। মদের উগ্র ঝাঁজালো প্রতিক্রিয়া তার উত্তেজনাকে করে প্রশমন।

অপশাসন—অরাজকতা—বিশৃঙ্খলা।

কি অপূর্ব স্ববিরোধী যুক্তি লর্ড ডালহৌসির! অযোধ্যা সত্যিই যদি অরাজক হ'য়ে থাকে তবে তার দায়িত্ব নবাবের চেয়েও তো কোম্পানির অনেক বেশি। তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর হ'য়ে গেল অযোধ্যার শাসনভার রয়েছে ব্রিটিশ সরকারের নিয়ন্ত্রণে। অরাজকতার দায়িত্ব তাহ'লে কার—নবাব না কোম্পানির? এ প্রশ্নের কী কৈফিয়ৎ দেবেন 'দ্য মোস্ট নোবল্ গবর্নর জেনারেল অব ইণ্ডিয়া'?

আর কোম্পানির নিজস্ব সাম্রাজ্যে শাসন?

উৎকোচ আর দস্তুরির স্তূপের নীচে চাপা প'ড়ে গেছে ন্যায়-নীতি-সততা। বিচার-ব্যবস্থায় ধূর্ত, নির্লজ্জ অসাম্য। মফস্বলের কোনো ফৌজদারি আদালতে কোনো শ্বেতাঙ্গের বিচার হ'তে পারবে না! এই নির্লজ্জ অসাম্যের প্রতিকার ক'রতে গিয়ে স্বজাতি শ্বেতাঙ্গদের কাছে বেথুন সাহেব হ'য়েছিলেন লাঞ্ছিত। এর প্রতিকারের খসড়া প্রস্তাবকেই ব্ল্যাক অ্যাক্ট ব'লে ধিক্কার দিয়ে ক্রোধে, ক্ষোভে দিশেহারা হ'য়ে উঠেছিল বর্ণগর্বী শ্বেতাঙ্গ-সমাজ। ক্রোধে উন্মাদ হ'য়ে উঠেছিল ইংলিশম্যান, হরকরা আর ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া!

ব্রিটিশ সরকারের ন্যায়-নীতি?

শ্বেতাঙ্গ নীলকরদের নির্দয় বীভৎস অত্যাচারে বাঙলাদেশের গ্রামে গ্রামে নিঃসহায় রায়তের ঘরে উঠেছে কান্নার রোল। ঘর জ্বলছে, মাথা ফাটছে, রক্তে লাল হ'য়ে যাচ্ছে নীল-চাষ অঞ্চলের মাটি। ঘরের বৌ-ঝিদের সম্ভ্রম-শালীনতায় প'ড়ছে শ্বেতাঙ্গ নীলকরের হিংস্র লোলুপ কালো থাবা। —তার প্রতিকার কোথায়?

—কাকাবাবু!

মাধুরীর গলার সাড়া পেয়ে চোখ তুলে তাকালে হরিশ। দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে মাধুরী।

উদ্বিগ্নস্বরে হরিশ ব'ললে, কী হ'য়েছে মধু-মা?

—আমার আবার কী হবে? কিন্তু তোমার কি খেয়াল আছে, ক'টা বাজে এখন?

দেওয়ালঘড়ির দিকে তাকিয়ে ধরা-প'ড়ে-যাওয়া দুষ্টু ছেলের মতো একটু অপ্রতিভ হাসি হেসে হরিশ ব'ললেন, তাইতো মা, আজ একটু বেশি রাত হ'য়ে গিয়েচে দেখচি!

—এর নাম একটু বেশি রাত? গরম কাল হ'লে এ-সময় কখন ভোরের আলো ফুটে যেতো! আশ্চয্যি বটে, এই কন্‌কনে শীতের ভেতর ওই একটা মাত্তর কামিজ গায়ে তুমি সারারাত কাটিয়ে দিলে?

এগিয়ে এলো মাধুরী। নিজের গায়ের চাদরখানা সযত্নে হরিশের গায়ে জড়িয়ে দিয়ে ব'ললে, এভাবে অত্যেচার ক'রলে তোমার শরীর যে ভেঙে যাবে কাকাবাবু! তুমি কি সংসারে কারো কথা শুনবে না ব'লে পণ ক'রেচ?

বাইরে দু'একটা কাক ডাকতে শুরু ক'রেছে। দূরে সদর দেওয়ানি আদালতের পেটা ঘড়িতে ঢংঢং ক'রে পাঁচটা ঘন্টা প'ড়লো।

জেরার মুখে বিপাকে প'ড়ে কৈফিয়ৎ দেওয়ার ভঙ্গিতে হরিশ ব'ললে, তোমার কথা তো আমি শুনি মা! আসলে ব্যাপারটা কী হ'য়েছে জানো? এই কাগজপত্তরগুলো আজই ফেরৎ দিতে হবে। অথচ হাতে তো আর সময় নেই? তাই একটু রাত জাগতে হ'ল। কিন্তু মা, তোমার গায়ের চাদরখানা আমাকে দিলে কেন?

মাধুরী ব'ললে, খুড়িমা ঘুমুচ্চেন। তোমার ঘরে অন্ধকারে আমি কোথায় চাদর খুঁজতে যাবো? এই ভোরের হাওয়ায় গায়ে একটা কিছু না থাকলে ঠাণ্ডা লেগে যাবে তোমার।

—তোমার ঠাণ্ডা লাগবে না?

—আমি বিধবা মেয়ে, আমার কিছু হবে না।

একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো হরিশের বুকের ভেতর থেকে। সত্যিইতো, হিন্দু বিধবার কোনো কিছুই লাগে না!

মাধুরী ব'ললে, এখন ঘন্টাখানেক অন্তত ঘুমিয়ে নাওগে কাকাবাবু। আপিস যাওয়ার বেলা হ'লে আমি ডেকে দেবো।

মৃদুপায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মাধুরী।

আকাশে ভোরের আলো একটু একটু ক'রে ফুটে উঠ্‌ছে। কা কা ক'রে ডাকতে ডাকতে বাসা ছেড়ে বেরিয়ে প'ড়ছে কাকের দল। প্রতিদিনের নিয়ম মতো খঞ্জনী বাজিয়ে প্রভাতী টহল গাইতে গাইতে এগিয়ে চ'লেছে পুবপাড়ার বিপিন বৈরাগী—

ময়ূর ময়ূরী ডাকে কোকিলের ধ্বনি।
কত নিদ্রা যাও হে আমার গোরা গুণমণি—

গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত—কোনো ঋতুতেই কামাই নেই বৈরাগীর। ভোরের আলো ফোটার আগেই খঞ্জনী হাতে সে বেরিয়ে পড়ে। ডিহি বির্‌জি থেকে দক্ষিণ মুখে চ'লতে চ'লতে ঢুকে পড়ে কাঁসারিপাড়ায়। সেখান থেকে চালপট্টি। কালীঘাটের প'টো পাড়ায় গিয়ে শেষ হয় তার প্রভাতী টহল। মাস ফুরোলে গেরস্তরা এক পয়সা, দু'পয়সা যে যা দেয় তাইই হাসিমুখে হাত পেতে নেয় বিপিন বৈরাগী। আগে তার বোষ্টুমিও সঙ্গে থাকতো। দু'জনের সাধা-গলার সুর ঘুম ভাঙাতো গেরস্তদের। বোষ্টুমি মারা যাওয়ার পর থেকে বিপিন একাই টহলে বেরোয়।

আপনমনেই মাধুরীর কথাটা মনে মনে একবার আওড়ালে হরিশ, আমি বিধবা মেয়ে, আমার কিছু হবে না।

বিধবার ভূমিকায় কত নির্বিকারভাবে জীবন কাটিয়ে চ'লেছে মেয়েটা! তার এই দুর্ভাগ্যের জন্যে যারা দায়ী, তাদের ওপর কোনো ক্ষোভ নেই, সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোনো নালিশ নেই—আছে শুধু অদৃষ্টবিশ্বাস! সবে চৌদ্দ বছরে পা দিয়েছে মেয়েটা। এরই ভেতর নিষ্ঠুর আত্মপীড়নের সংস্কারগুলোকে কত সহজে মানিয়ে নিয়েছে! সামনে প'ড়ে রয়েছে সারা জীবন। কতদিন আয়ু আছে অভাগিনীর, কে জানে!

চোখের পাতা ভিজে আসে হরিশের।

দু'জনই মাত্র এই বাড়িটায় টেনে রেখেছে তাকে—মা আর এই ভাইঝি। আর সবায়ের ওপর তো কেবল কর্তব্যের দায়! এরা দু'জন না থাকলে কবে সে কলকাতায় গিয়ে একটা ভাড়া বাড়িতে থাকতো!

দূর থেকে বিপিন বৈরাগীর গানের কলি অস্পষ্টভাবে ভেসে আসছে, ওঠো ওঠো গোরাচাঁদ রাতি পোহাইল। জানালা দিয়ে ব'য়ে-আসা এক ঝলক মৃদু হাওয়া গায়ে এসে লাগলো। কাগজগুলো চাপা দিয়ে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালে হরিশ।

সামন্তরাজ্য অযোধ্যা!

নীচতা আর বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী তার ইতিহাসেও বড়ো কম নেই। কিন্তু আইনের নামে ব্রিটিশের সর্বগ্রাসোন্মুখ অভিসন্ধির মূর্তিটা যে আরো ভয়ংকর! এইভাবেই একটু একটু ক'রে তারা গ্রাস ক'রবে সারা ভারতবর্ষ!

আর দ্বিধার অবকাশ নেই। লর্ড ডালহৌসির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেই হবে!

॥ কুড়ি ॥

উন্মুখর হয়ে উঠলো হিন্দু পেট্রিয়ট।

কলম ছুটেছে হরিশের, কলম ছুটেছে গিরীশের। একজনের কলমে তীব্র ভাষায় তীক্ষ্ন বিশ্লেষণের শাণিত চাবুক; আরেকজনের কলমে শাণিত বিদ্রূপের বন্যা। প্রতি সপ্তাহে পেট্রিয়টের পৃষ্ঠায় লর্ড ডালহৌসির নির্লজ্জ অপকৌশল উদ্ঘাটিত—ধিক্কৃত!

কন্‌স্টান্টিনোপল!

সাম্রাজ্য-বিস্তারের উদগ্র লালসায় পঙ্কিল আর একটি প্রায় সমধর্মী কাহিনী।

ক্রীশ্চান জনসাধারণের নিরাপত্তা চাই।

অজুহাত তৈরি করে নিতে বিলম্ব হ'ল না। রাশিয়ার জার নিকোলাস ঝাঁপিয়ে পড়লেন তুরস্কের ওপর। তাঁর সে আকাঙ্ক্ষা অবশ্য শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। কন্‌স্টান্টিনোপ্‌ল্‌ যায়নি জারের অধিকারে। কিন্তু নিকোলাসের লোভাতুর হিংস্র ঈগল-চক্ষুকেও যেন লজ্জায় ম্লান ক'রে দিয়েছে বৃটিশ-ঈগলের তীক্ষ্ণতর দৃষ্টি!

অতি নগণ্য একটা নেটিব সাপ্তাহিকের ধিক্কার?

তাকে অগ্রাহ্য করতে গেলে ভারত শাসনের গুরুত্ব পালন করা যায় না। তবু বিরক্তিতে ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে যায় গবর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসির। এত বেশি দুঃসাহস এই নেটিব পত্রিকার। তাঁকে নিকোলাসের সঙ্গে তুলনা করে নিকৃষ্টতর বলতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি হিন্দু পেট্রিয়ট?

সমস্ত খবরই নিতে হয়েছে গবর্নর জেনারেলকে। যে নেটিব জানোয়ারটা এই পত্রিকার সম্পাদক, সে কোম্পানির-ই মিলিটারি অডিটর জেনারেল আপিসের একজন কর্মচারী। অথচ এত সাহস সে কোথায় পায়? সে-খবরও কিছু কিছু কানে এসেছে লর্ড ডালহৌসির। অডিটর জেনারেল কর্নেল গোল্ডী একটা ক্ষ্যাপাটে মানুষ। অডিটের নামে কোম্পানির জাঁদরেল সব সামরিক অফিসারকে নাস্তানাবুদ করাই তার একমাত্র কাজ। আর ডেপুটি অডিটর জেনারেল কর্নেল চ্যাম্প্‌নিজ একটা আস্ত শয়তান। নিজে বৃটিশ হয়েও এ দেশের বৃটিশ আর ইয়োরেশিয়ান

অধিবাসীদের সে লোকটা নাকি দু চোখে দেখতে পারে না। হায় ঈশ্বর, একজন বৃটিশ রক্তের অধিকারী যদি তার স্বজাতিকে সহ্য করতে না পারে তাহলে নেটিবদের সঙ্গে তার পার্থক্য রইলো কোথায়?

এই দুই ওপরওয়ালাই দায়ী।

গোয়েন্দা দপ্তরের পাঠানো খবর প্রতিদিনই আসে লাট-প্রাসাদে। কর্নেল গোল্ডী আর কর্নেল চ্যাম্পনিজের আস্কারা পেয়েই নেটিব কর্মচারীটা মাথায় উঠেছে। নইলে বৃটিশ-ভারতের রাজধানী খাস কলকাতার বুকের ওপর বসে বৃটিশ গবর্নর জেনারেলকে এইভাবে আক্রমণ করে লিখতে সে সাহস পায়?

গরম কেকের মতো হু হু করে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে হিন্দু পেট্রিয়ট। এমন কি, ব্রিটিশ মহলেও নাকি কিছু কিছু কাটতি হচ্ছে কাগজটার। তার জন্য অবশ্য বিচলিত নন লর্ড ডালহৌসি। কিন্তু স্বদেশ-স্বজাতির ভবিষ্যৎ স্বার্থে একটা বড়ো কাজে হাত দেওয়ার পূর্ব মুহূর্তে এ রকম খবর কিছুটা বিরক্তির কারণ তো বটে?

লাট-প্রাসাদ—গবর্নমেন্ট হাউস!

চৌদ্দ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সযত্নে গ'ড়ে-রেখে-যাওয়া লর্ড মর্নিংটনের অতি প্রিয় প্রাসাদ। লর্ড মর্নিংটন না মার্কুইস অব ওয়েলেসলি? এ দেশে লোকে তাকে লর্ড ওয়েলেস্‌লি বলেই জানে।

সামনের প্রশস্ত মসৃণ দেওয়ালে লর্ড ওয়েলেস্‌লির জীবন্ত তৈল-চিত্র। তিনি যেন গভীর প্রতীক্ষায় তাকিয়ে রয়েছেন উত্তরসাধক লর্ড ডালহৌসির দিকে। অযোধ্যা রাজ্যের অর্ধেকেরও বেশি অংশ তিনি বৃটিশ অধিকারে এনে রেখে গেছেন। বাকিটুকু অধিকার করবার দায়িত্ব লর্ড ডালহৌসির। তেল-রঙে আঁকা লর্ড মর্নিংটনের ছবির উজ্জ্বল চোখ দুটো সত্যিই যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে! উত্তর-সাধকের উদ্দেশ্যে জানাচ্ছে অসম্পূর্ণ কাজকে দ্রুত সম্পন্ন করবার আহ্বান।

লখ্‌নৌ দরবারে সম্পন্ন হ'ল লর্ড ডালহৌসির আরব্ধ ব্রত।

অরাজক, অপশাসিত অযোধ্যার প্রজাসাধারণের স্বার্থে রাজ্যের শাসনভার সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করলেন বৃটিশ সরকার। সিংহাসন থেকে অপসারিত হলেন নবাব ওয়াজিদ আলি। লখ্‌নৌয়ের রাজপ্রাসাদে উড্ডীন হ'ল বৃটিশ ইউনিয়ন জ্যাক। ফোর্ট উইলিয়মের তোপধ্বনি কাঁপিয়ে তুললো বৃটিশ-ভারতের রাজধানী কলকাতার আকাশ-বাতাস।

কয়েকদিন পরের কথা।

সেদিন আপিস ছুটির পর একসঙ্গে বেরোলো হরিশ, গিরীশ আর কালীচরণ। রাস্তায় নেমে হাসতে হাসতে কালীচরণ বললে, কি হে পেট্রিয়টের দল, ডালহৌসির এত ছেরাদ্দ ক'রেও অযোধ্যাকে রাখতে পারলে না?

গিরিশ-ও হেসে বললে, সামান্য একটু ভুল হ'য়ে গিয়েছে কালীদা। ছেরাদ্দের ক্রিয়া কলাপে আমরা অনুষ্ঠানের ত্রুটি রাখিনি। কিন্তু গয়ায় পিণ্ডি না দেওয়ার ফলেই প্রেতাত্মাটা জ্যান্ত রয়ে গিয়েচে আর কি!

হো হো ক'রে হেসে উঠলে কালীচরণ।

গম্ভীর মুখে হরিশ বললে, কালী, তুমি জন্মান্তরবাদে বিশ্বেস করো?

—করি বৈকি! আমি বাপু হিঁদুর ছেলে, হিঁদু ধম্মো মানি। তোমার মত নাস্তিক বেহ্ম তো হ'য়ে যাইনি?

হরিশ আগের মতো গম্ভীর মুখেই বললে, নাস্তিক বেহ্ম হয়েও আজকাল জন্মান্তরে বিশ্বেস করতে শুরু করেচি হে!

সাগ্রহে কালীচরণ বললে, সত্যি?

—হুঁ। আজ ক'দিন থেকে আমার মনে হচ্ছে, জন্মান্তর আছে। পূর্বজন্মের একটা গণ্ডার,

একটা কুমীর আর একটা নেকড়ের আত্মা একসঙ্গে মিললে তবে পরের জন্মে একটা বৃটিশ গবর্নর জেনারেল হয়!

কালীচরণ আবার হো হো করে হেসে উঠ্‌লে। হাসির বেগ সামলাতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগলো তার। তারপর বললে, তোমাকে তো কাঠখোট্টা বলেই জানি হরিশ! তোমার ভেতর যে এমন রসিকতার মেজাজ আছে, তা তো জানতুম না ভাই!

গিরীশ বললে, শম্ভু পণ্ডিতের বাড়ির মজলিশে একদিন গেলেই বুঝতে পারবে, মেজাজ খুলে গেলে এই কাঠখোট্টার মুখে রসের ফোয়ারা কেমন ছোটে!

হরিশ হেসে বললে, দিনকে দিন অবস্থা যা দাঁড়াচ্ছে গিরীশ, তাতে ফোয়ারা শুকিয়ে যাবে বলেই মনে হচ্ছে। সে যাকগে, তোমার লেখাটা কদ্দুর?

—ভিয়েন চাপিয়ে দিয়েচি, পাক-ও প্রায় শেষ। এবার উনুন থেকে কড়াটা নামালেই হয়। দ্যাখো বাপু, সিমলে পাড়ার ছেলে আমরা। সন্দেশের পাকটা ঠিকমতো না হ'লে আমরা কি মাল বাজারে ছাড়তে পারি?

হরিশ বললে, দেখো হে, তোমার তাড়ু নাড়তে নাড়তে খন্দের আবার যেন সরে না পড়ে!

খন্দের মানে লর্ড ডালহৌসি। তাঁর জায়গায় নতুন গবর্নর জেনারেল আসছেন লর্ড ভাইকাউন্ট ক্যানিং। তিনি কলকাতায় এসে পেঁছুলেই এদেশ থেকে বিদায় নিয়ে ইংল্যাণ্ডে ফিরে যাবেন ডালহৌসি।

গিরিশ হেসে বললে, আরে বাবা, এ তো আর ভবানীপুর গাঁয়ের জলবিছুটি নয় যে গাছ থেকে পাতা ছিঁড়েই অমনি ঘষে দিলুম? তোমার কলমের জলবিছুটি তো এতদিন বেচারাকে যথেষ্ট জ্বালিয়েচে, এবার চলে যাওয়ার আগে সাহেব না হয় সিমলের কড়া পাক একটু পরখ করে যাক?

—কড়া পাকটা সামনের হপ্তার পেট্রিয়টে পরিবেশন করা যাবে তো?

—নিঃসন্দেহে! —বললে গিরীশ, আজ তো সবে শুক্কুরবার। পরশু রবিবার আমি নিজে গিয়ে পেঁছে দিয়ে আসবো ভবানীপুরে। মনে হয়, কালকে রাতেই লেখাটা শেষ হয়ে যাবে। তারপরেও তো তোমার হাতে দিন তিনেক সময় রইলো!

কথার নড়চড় হয়নি গিরীশের. রবিবার বিকেল চারটে নাগাদ পেট্রিয়ট আপিসে এসে গেল সে। হাতে প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি।

এখন নতুন আপিস পেট্রিয়টের। ছাপাখানা নিজস্ব। হিন্দু পেট্রিয়টের জন্যে দরকারি যাবতীয় সরঞ্জাম কিনে দিতে কার্পণ্য করেননি রাজা প্রতাপচন্দ্র।

কয়েকদিন আগে মুচকি হেসে কিশোরীচাঁদ বলেছিল, কি হে হরিশ, রাজ-ভীতি কেটেছে? এই কিছুদিন ধরে গবর্নর জেনারেলের মুণ্ডুপাত করে চলেচো, তাতে কোনো বাধা এয়েচে?

সত্যিই কোনো বাধা আসেনি। বরঞ্চ, লোকমুখে বড়ো রাজার উৎসাহব্যঞ্জক মন্তব্যই কানে এসেছে হরিশের। লোকে তো সবই জানে। স্বয়ং গবর্নর জেনারেলও নিশ্চয়ই জানেন যে, কার টাকায় নতুন ছাপাখানা হ'ল। কার টাকায় এমন ঝকঝকে ছাপা হয়ে তাঁর অযোধ্যা-গ্রাসের ওপর প্রতি সপ্তাহে এমন শাণিত আক্রমণ চালিয়ে আসছে হিন্দু পেট্রিয়ট।

হরিশের সামনে পাণ্ডুলিপি রেখে গিরীশ বললে, নাও তোমার অযোধ্যা। আয়তনে একটু বড়ো হ'য়ে গিয়েচে হে!

হেড কম্পোজিটর গোবিন্দকে ডেকে লেখাটা তখনই কম্পোজ ঘরে পাঠিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ করলে হরিশ। গিরীশ বললে, আহা, লেখাটা ঠিক হয়েছে কিনা, সেটা একবার অন্তত দেখে নাও!

—এখন পড়ে ফেললে তোমার মিছরির ছুরির রসটুকু যে পুরনো হয়ে যাবে!

—এ লেখাটায় আর মিছরির ছুরি চালাতে পারিনি হরিশ। এবারে কলমটা একটু বিগড়ে গিয়ে অন্য পথ ধরেচে।

কথাটা প্রথমেই হঠাৎ বুঝতে পারেনি হরিশ। গিরীশের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে কৌতূহলে পাণ্ডুলিপি খুলে সে পড়তে আরম্ভ করলে।

আর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ নয়, প্রথম থেকেই ধিক্কারের তীব্র কশাঘাত!

"প্রতিবেশী রাজ্য অযোধ্যার প্রতি সাম্প্রতিক আচরণের ভেতর দিয়ে ভারতের বৃটিশ সরকার সুস্পষ্টভাবে এ কথা প্রমাণ করলেন, যে, এ যাবৎ মানুষের পরিচিত সমস্ত রকম অপরাধের বাইরেও দুনিয়ায় এমন অপরাধের অবকাশ আছে, যা এখনো মানুষ করেনি। বৃটিশ সরকার প্রমাণ করলেন, মানুষের শঠতার দীর্ঘ ইতিহাসে এ যাবৎকাল পর্যন্ত যে ধরনের কোনো শঠতার সংজ্ঞা কিম্বা নামের উল্লেখ পর্যন্ত নেই, সেই ধরনের অভূতপূর্ব নীচ শঠতার প্রয়োগ এখনো সম্ভব।"

রুদ্ধশ্বাসে পড়তে লাগলো হরিশ।

দীর্ঘ প্রবন্ধে অযোধ্যা আর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সম্পর্ক-ঘটিত ইতিহাস নিপুণ ভাবে বিশ্লেষণ করে শেষ অনুচ্ছেদে এসে ঘৃণা আর ধিক্কারে ফেটে পড়েছে গিরীশের ভাষা।

"গবর্ণর জেনারেলের ঘোষণা পত্রে অযোধ্যা রাজ্যকে বৃটিশ সরকারের শাসনাধীনে আনার অজুহাত হিসেবে যে কারণগুলি দেখানো হয়েছে, সেগুলি নির্জলা মিথ্যা। নগ্ন মিথ্যার কদর্য গ্লানি তার ভেতর থেকে এত প্রকটভাবে ফুটে উঠেছে যে, আমাদের মনে হয়, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দুর্নীতির পঙ্ক-লিপ্ত একটা আদালতের যে কোনো একজন পেশাদার সাক্ষী—যে কিনা মাত্র এক আনা পয়সার বিনিময়ে অম্লান বদনে বিবেক বিসর্জন দিতে পারে—সেও এ জাতীয় মিথ্যা উচ্চারণ করতে গিয়ে লজ্জা বোধ করতো।"

মুখ তুলে তাকালো হরিশ। তার আয়ত চোখ দুটি জ্বলজ্বল করছে।

মুচকি হেসে গিরীশ বললে, কি হে, সন্দেশের পাকটা ঠিকমতো হয়েচে তো?

—কড়া পাক তোমার সার্থক!—উচ্ছ্বসিত স্বরে হরিশ বললে, আমি কল্পনাই করতে পারিনি, তোমার স্বভাবসিদ্ধ ব্যঙ্গ শ্লেষের পথ ছেড়ে এ-কদিন তুমি এইভাবে তোমার কলমটাকে শানিয়েচ!

গোবিন্দকে ডেকে পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে দিলে হরিশ। তারপর আলমারি থেকে বেরোলো ক্ল্যারের বোতল আর গেলাস।

গিরিশ বললে, ওহে, এখনো যে সূর্যাস্ত হয়নি!

—তাই বলে হরিশ মুখুজ্যের আবেগ তো অপেক্ষা করে থাকতে পারে না গিরীশ! নাও, অন্তত এই মুহূর্তে আমার আবেগের মর্যাদা দিতে সোমরস একটু পান করো!

গিরীশ হেসে বললে, তথাস্তু। তবে কি না, কায়েতের ছেলে তো? তোমার মত ব্রহ্মতেজ নেই। বেশি দিলে সহ্য করতে পারবো না!

কিছুক্ষণ কেটে গেল।

মদের গেলাসে কয়েকটা চুমুক দেওয়ার পর কেমন একটু ম্লান হাসি হেসে হরিশ বললে, আজকাল আমি আর মদ খাইনে গিরীশ, মদ-ই আমাকে খায়।

গিরীশ বললে, সে তো বিলক্ষণ দেখতেই পাচ্ছি!

হরিশ হাসতে হাসতেই বললে, যা দেখচো দেখে যাও! কিশোরীর মতো আবার তত্ত্বজ্ঞানের লেকচর যেন শুরু করো না। বেচারা কিশোরী! হিন্দু সমাজের আপাদ-মস্তক সংস্কারের বুরুশ ঘষে ছাল চামড়া না তুলে ও ছাড়বে না। ইয়োর অনারকে আমি কিছুতেই বোঝাতে পারচি নে যে, টৌন হলে লেকচর দিয়ে কোনো সংস্কারই করা যাবে না। সমাজকে পরেও সংস্কার করা যাবে কিন্তু তার আগে দরকার রাজনৈতিক চেতনার।

গিরীশ বললে, তোমারও গোয়াতুর্মি বড়ো কম নয় হরিশ! তুমিও সেই একই গোঁ আঁকড়ে ধরে রেখেচ, সেখান থেকে আর নড়ন-চড়ন নেই।

কথায় কথায় এলো বিধবা বিবাহের প্রসঙ্গ। আরো কত কথা।

বিদ্যাসাগর মশাই যে-ভাবে উঠে প'ড়ে লেগেছেন তাতে আইন খুব শীগগিরই পাশ হয়ে যাবে

বলে সবাই বলছে। ওদিকে রাজা রাধাকান্তের ধর্ম-সভাও কোমর বেঁধে লেগেছে, যাতে বিধবা-বিয়ের আইন হয়ে হিন্দুর জাত-জন্ম না যায়। জোড়াসাঁকোর সিংঘি-বাড়ির সাতু সিংঘির ষোল বছর বয়েসের ছেলে কালীপ্রসন্ন রীতিমতো তোড়জোড় করে বিদ্যোৎসাহিনী সভা নামে একটা সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছে। ঠাকুরপুকুরের পাদরি লঙ সাহেব শ্বেতাঙ্গ সমাজের চক্ষুশূল হয়ে উঠেছেন। যত দিন যাচ্ছে, লঙ সাহেবের ওপর তাদের আক্রোশ ততই যেন বাড়ছে।

আক্রোশের কারণ আছে বৈ কি!

মিশনারি হয়ে এদেশে এসেছ, মিশনারির মতোই থাকো না বাপু! হিদেন নেটিবগুলোর মন জয় করবার জন্যে একটু-আধটু সেবা-যত্ন, দান-ধ্যান করতে হয় করো। কিন্তু আসল উদ্দেশ্যটা ভুললে চলবে কেন? অজ্ঞানের অন্ধকারে ডুবে আছে হিদেন নেটিবগুলো। সেই অন্ধকার থেকে খ্রীস্টধর্মের আলোকে তাদের নিয়ে আসাই তো মিশনারির আসল কাজ! সে কাজ তো গোল্লায় গেছে, উলটে স্বজাত শ্বেতাঙ্গদের পেছনেই লেগেছে লোকটা!

হাজার হোক, এ দেশের কালো নেটিবগুলো এখন ব্রিটিশ সরকারের প্রজা। লোকগুলো দেখতে নিরীহের মতো হলে কী হবে, আসলে বেয়াদপের একশেষ। তাদের শাসনে রাখতে গেলে বুটের লাথি লাগাতেই হবে। তাতেও না কুলোলে তখন কামান-বন্দুকের গোলাগুলি কিছু খরচ করতেই হয়! নইলে এত বড়ো রাজ্যটা শাসন করা সম্ভব? আর, এত বড়ো একটা দায়িত্ব পালন করতে গেলে কিছু কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি হতেই পারে। তাই বলে সেইগুলোকেই বড়ো করে দেখতে হবে?

পাদ্রিটা তাই-ই করছে।

নিজে শ্বেতাঙ্গ হয়ে শ্বেতাঙ্গদের সামান্য দুর্নীতি কিম্বা অপকর্মকে কড়া ভাষায় সমালোচনা করে। শিক্ষিত নেটিব জেন্টুরা মাঝে মাঝে যে সব সভা সমিতি করে, সেখানে লোকটার হাজির থাকা চাই। শুধু তাই নয়, কোম্পানির আইন-কানুন বিচার নিয়ে বিরক্তিকর কড়া সমালোচনার ঝড় তোলে। নেটিবগুলো ওই বদ্মাশ পাদরিটাকে মাথায় তুলে নাচছে! মিশনারি তো কলকাতায় আরো কত আছে। তারা কেউ তো লঙের মতো এমন বেয়াড়া নয়?

আসলে বেয়াড়া পাদরিটা জাতে আইরিশ। দুনিয়ার লোক জানে, ব্রিটিশদের ওপর হতভাগা আইরিশগুলোর একটা জাতক্রোধ আছে। এ দেশের ব্রিটিশদের এখন আর বুঝতে কিছু বাকি নেই। নইলে নিজে শ্বেতাঙ্গ হয়ে স্বজাতকেই নাকাল করবার আনন্দে কেউ মেতে ওঠে? তাও আবার নিজেদের দেশে নয়—বিদেশে। ব্রিটিশ সরকার নিতান্ত উদার বলেই পার পেয়ে গেল লোকটা। অন্য কোনো কড়া সরকারের পাল্লায় পড়লে জব্দ হত পাদরি। তারা কি ওই বেয়াদপ আইরিশটার নষ্টামি একটা দিনও সহ্য করতো?

বেশ রসিয়ে রসিয়ে লঙ সাহেবের প্রসঙ্গটা বলছিল গিরীশ।

কিশোরীচাঁদ মাঝে মাঝেই তার দমদম-সাতপুকুরের বাড়িতে পার্টি দেয়। কিছুদিন তেমনি একটা পার্টিতে আমন্ত্রিতদের ভেতর ছিলেন রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন, আগা বেগ, পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট ফেগান আর তাঁরই এক বন্ধু মেজর ডানকান। গিরীশ তো ছিলই।

মেজর ডানকানের নেশার মাত্রা একটু বেশিই হয়ে গিয়েছিল। নেশার ঝোঁকে রেভারেণ্ড লঙের শ্রাদ্ধ করছিলেন তিনি। মিস্টার ফেগান বিব্রত কিন্তু বন্ধুকে তিনি কিছুতেই সামলাতে পারছিলেন না। কিশোরীচাঁদও বিব্রত বোধ করছিলেন। কেবল তাই নয়, বিরক্তিতে তার মুখ ক্রমেই গম্ভীর হয়ে উঠছিল। রেভারেণ্ড লঙকে সে শ্রদ্ধা করে। তাঁর সঙ্গে বেশ অন্তরঙ্গ সম্পর্কও গড়ে উঠেছে। কিন্তু মেজরকে সে কিছুই বলতে পারছিল না, কারণ তিনি অতিথি। শেষ পর্যন্ত মিস্টার ফেগান-ই পরিস্থিতি সামলে দিলেন। বন্ধুকে এক রকম জোর করে ধরে নিয়েই চলে গেলেন তিনি।

মেজর ডানকানের এই কথাগুলোই টীকা-ভাষ্য সহযোগে হরিশকে বলছিল গিরীশ।

সন্ধ্যে কখন ঘুরে গেছে।

একটু আগে এসে টেবিলে বাতি রেখে গেছে নন্দরাম। তারই কিছুক্ষণ পরে কয়েকটা লেখার প্রুফ রেখে গেল গোবিন্দ। কোনো খেয়ালই নেই হরিশের। রেভারেন্ড লঙের কথা শুনতে শুনতে তার মন কখন চলে গেছে শৈশব-স্মৃতির রাজ্যে।

ফাদার পিফার্ড। ইউনিয়ন স্কুল!

আপনজনের মতো যাঁরা এ দেশের মানুষকে ভালবাসতে পারেন, তেমন শ্বেতাঙ্গদের সংখ্যা কত কম!

হঠাৎ হরিশ বললে, আচ্ছা গিরীশ, অযোধ্যা রাজ্যের পক্ষ নিয়ে আমরা কেন এত লিখচি?

প্রচণ্ড বিস্ময়ের সঙ্গে গিরীশ বললে, তোমার মুখে এ কী কথা?

হরিশ বললে, এক পক্ষ নতুন উপনিবেশ পেয়ে তার সীমা বাড়ানোর জন্যে মরীয়া হয়ে উঠেচে। আর এক পক্ষ সামন্ততন্ত্রের একেবারে নির্ভেজাল উদাহরণ। প্রজাশোষণ, বিশ্বাসঘাতকতা, সুবিধেবাদ—কোনটাই তো অযোধ্যার নবাবদের ইতিহাসে বাদ নেই! বৃটিশ সরকার নিজের স্বার্থে উদয়পুর, সম্বলপুর, সাতারা, ঝাঁসি কিম্বা সদ্য এই অযোধ্যা গ্রাস না করলেও কি এই সব সামন্ত রাজ্যগুলোয় স্বর্গরাজ্য থাকতো?

গিরীশ কোনো উত্তর দেওয়ার আগেই হরিশ আবার বললে, কালকের ফ্রেন্ড অব ইণ্ডিয়ায় একটা খবর পড়েচ? গত কয়েকমাস ধরে ভাগলপুর থেকে এ পাশে বীরভূম পর্যন্ত এলাকা জুড়ে সাঁওতালদের যে বিদ্রোহ চলচিলো, কঠোর হাতে তাকে দমন করায় গবর্নর জেনারেলকে অজস্র ধন্যবাদ জানিয়েচে ফ্রেন্ড অব ইণ্ডিয়া।

গিরীশ বললে, খবরটা আমি পড়িনি বটে, কিন্তু হঠাৎ তোমার এই প্রসঙ্গ উত্থাপনের তাৎপর্য ঠিক বুঝতে পারচিনে হরিশ!

হরিশ মৃদু হেসে বললে, তাৎপর্য কিছু আছে বৈ কি! কিছুদিন ধরে আমার কী মনে হচ্চে জানো? মনে হচ্চে, সজ্ঞানেই বোধহয় আমাদের দায়িত্বের বেশ বড়ো একটা অংশকে আমরা অবহেলা করে চলেচি। আমাদের চিন্তা-ভাবনা একটা জায়গায় গণ্ডীবদ্ধ হয়ে আছে। আমাদের আন্দোলন মানে তো টৌন হলে কিছু লেক্‌চর আর পিটিশন। একটু অনুগ্রহ, একটু সুবিবেচনা, দুটো ভালো চাকরি—এই তো আমাদের লক্ষ্য? আমরা সামন্তরাজ্যে বৃটিশের হস্তক্ষেপে ক্ষুব্ধ হ'য়ে প্রতিবাদ করচি, কিন্তু সত্যিই যারা দেহের রক্ত দিয়ে বৃটিশের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েচে, তাদের কথা আমাদের মনেও পড়ে না!

—তুমি কি ওই বুনো সাঁওতালদের কথা বলচো?

—হ্যাঁ। আমরা নেটিব বাবু, আমরা সহজেই পোষ মানি। ওই জংলি মানুষগুলো কিন্তু এত সহজে পোষ মেনে নেওয়ার পাত্র নয়। কোম্পানির আমলে ওরা অনেক বার বিদ্রোহ করেচে, এখনো করচে।

—হ্যাঁ, চোয়াড়-বিদ্রোহের কথা শুনেচি।

মৃদু শ্লেষের হাসি ফুটে উঠলো হরিশের মুখে। বললে, বৃটিশের ঘেন্নাভরে দেওয়া নাম চোয়াড়। হ্যাঁ, তারই কথা বলচি। আমাদেরও জন্মের আগে থেকে এ পর্যন্ত বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর আর ছোটনাগপুরে ওই জংলি মানুষগুলো অন্তত চার-পাঁচবার কোম্পানির বিরুদ্ধে প্রচণ্ডভাবে রুখে দাঁড়িয়েচে। স্বাধীনতা তাদের সবচেয়ে প্রিয় জিনিস! কোম্পানি সেখানে হাত দিতে গেলেই তারা গর্জন করে উঠেচে। কী ছিল তাদের সম্বল? তীর-ধনুক, টাঙ্গি, বল্লম আর বেপরোয়া মনের জোর। তাই নিয়েই বৃটিশের কামান-বন্দুকের মুখে বুক পেতে দাঁড়িয়েচে তারা। দলে দলে প্রাণ দিয়েচে কিন্তু হার মানেনি; নিজেদের ভেতর কেউ কারো সঙ্গে বেইমানিও করেনি। আমরা এ জিনিস কল্পনা করতে পারি? আমাদের বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের একবার জিজ্ঞেস করে দেখলে হয়!

কথার শেষের দিকে হরিশের শ্লেষের হাসিটুকু যেন আরো স্পষ্ট হয়ে তার চোখের চাউনিতেও পরিব্যাপ্ত হয়ে গেল।

গিরীশ হেসে বললে, লোকে বলে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের তুমি নাকি প্রাণ। দেহের সম্বন্ধে প্রাণের যদি এই সংশয় দেখা দেয় তাহলে তো বড়ো চিন্তের কথা হরিশ!

আমার পক্ষেই চিন্তের কথা গিরীশ, অন্য সদস্যদের পক্ষে সম্ভবত নয়। বেশ কিছুদিন ধরে অ্যাসোসিয়েশনের ব্যাপারে আমি আর তেমন মনের সাড়া পাচ্চিনে। তবু তার সঙ্গে সম্পর্কটা রেখেচি, তার কারণ এই মুহূর্তে সেটা একেবারে কেটে দেওয়া বোধ হয় ঠিক হবে না।

একটু থেমে হরিশ আবার বললে, অযোধ্যার ব্যাপারে পড়াশোনা করতে গিয়ে আমার একটা মস্ত বড়ো লাভ হয়েচে গিরীশ। হয়তো সেই জন্যেই বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সম্বন্ধে আমার মোহ বেশ কিছুটা কেটে গেছে। ইতিহাস পড়তে গিয়ে দেখলুম, কোম্পানির রাজত্ব কায়েম হওয়ার সময় থেকে আজ পর্যন্ত কোম্পানির সঙ্গে সত্যিই যারা লড়াই করেচে, তারা আমাদের সমাজের নীচু স্তরের মানুষ। নবাব মীরকাশিমের হুকুমে ত্রিপুরার বিদ্রোহী চাষীদের নেতা সমশের গাজীকে তোপের মুখে বেঁধে তোপ দেগে তার দেহটাকে ছিন্ন ভিন্ন করা হয়েছিল, সেই থেকে বোধ হয় শুরু। তারপর থেকে একে একে সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ, তাঁতী-বিদ্রোহ, রেশমচাষীদের বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, মুণ্ডা বিদ্রোহ—একটার পর একটা দেখা দিয়েচে। আর এদিকে আমাদের দেওয়ান আর বেনিয়ানবাবুরা বৃটিশের সঙ্গে বখরায় কারবার করে ফুলে ফেঁপে উঠেচেন! তুমি, আমি—সবাই আমরা এজুকেটেড নেটিব হয়ে নিশ্চিন্তে কোম্পানির সেবা করচি! আর গালিগালাজ করচি।

অস্থির উত্তেজনায় চেয়ার থেকে উঠে পায়চারি করতে লাগলো হরিশ। তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে গিরীশ বললে, পেট্রিয়টকে হাতিয়ার করে তুমি যে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছ, তাকে তুমি পর্যাপ্ত মনে করো না হরিশ?

মনে করতে পারলে তো বেঁচে যেতুম! কিন্তু তা পারচি না! পেট্রিয়টের পৃষ্ঠায় তবু মন খুলে দুটো কথা বলবার সুযোগ পাই, কিন্তু অ্যাসোসিয়েশন আমাকে ক্রমেই বড়ো হতাশ করে তুলচে গিরীশ। সেখানে কর্মকর্তারা সবাই রাজা, মহারাজা, নিদেনপক্ষে জমিদার। আমার মতো গরীব বামুনের ছেলেকে সেখানে মানাচ্চে না।

—তুমি ছেড়ে এলে অ্যাসোসিয়েশনের এত দাপট থাকবে না হরিশ।

—হাত জোড় করে 'জো হুজুর' বলবার জন্যে দাপটের দরকার হয় না গিরীশ; দরকার হয় বিগলিত দেঁতো হাসি আর হিসেবি স্বার্থবুদ্ধির। তার উপযুক্ত অনেকেই সেখানে আছেন, তাঁরাই চালাতে পারবেন। সাজিয়ে গুছিয়ে দরখাস্ত লেখার দরকার ছাড়া হরিশ মুখুজ্জেকে তাঁদের আর কোনো দরকার নেই, তা আমি বেশ ভলো করেই জানি! তা সত্ত্বেও সংস্রব ছাড়তে পারিনি কেন জানো? আর-জি-জি আমাকে আটকে রেখেচেন। অথচ যে রামগোপালের তেজে বৃটিশও একদিন ভয় পেয়েচে, সেই মানুষটা কত দ্রুত মডারেট হয়ে যাচ্চেন! আর-জি-জিকে আমি নিজের দাদার মতোই শ্রদ্ধা করি গিরীশ; কিন্তু আমারই এখন ভয় হয়, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের ওই পরিবেশের ভেতর থেকে বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে আমিও হয়তো মডারেট হয়ে যাবো!

'তুমি যা করচো, তার চেয়ে আর বেশি কী করতে চাও?'

—জানি নে কী করতে চাই। কিন্তু প্রতি মুহূর্তেই আমার মনে হচ্চে, আমরা বড়ো পোশাকি! সমাজ-সংস্কারের চেয়েও রাজনৈতিক চেতনা নিয়ে আসা এখন আমাদেব পক্ষে অনেক বেশি দরকার, অথচ তা পারচি নে!

—বৃটিশ সরকারের সঙ্গে রাজনৈতিক সংঘর্ষে নামতে চাও নাকি?

—সেটা করতে পারলে আমার মনটা হয় তো শান্তি পেতো!

—তুমি বড় বেশি চরমপন্থী হয়ে যাচ্ছ হরিশ! বুঝতে পারচো না, সেটা আমাদের পক্ষে এখন নিতান্তই অবাস্তব — স্বপ্নেরও অতীত?

—সত্যিই তো! সংঘর্ষ করবে গাঁয়ের চাষা-ভুষো আর জঙ্গলের সাঁওতাল-মুণ্ডা—ওঁরাওঁয়ের দল। আমরা এজুকেটেড নেটিবরা আমাদের রাজভক্তি অক্ষুণ্ণ রেখে কেবল পিটিশনের পর পিটিশন করে যাবো!

গিরীশ চুপ করে রইলো। এখন হরিশকে কিছু বোঝাতে যাওয়া নিষ্ফল। একটু পরে নিজেই নীরবতা ভেঙে হরিশ বললে, নতুন গবর্নর জেনারেল আসচেন। দেখা যাক্, বৃটিশ সরকার এবার আমাদের কোথায় নিয়ে যায়!

॥ একুশ ॥

কলকাতায় হৈ হৈ পড়ে গেল।

বিধবা-বিয়ের আইন পাশ হয়ে গেছে; এখন থেকে কোনো হিন্দু বিধবা আবার বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চাইলে কেউ তাকে আটকাতে পারবে না।

জিতে গেছে বিদ্যেসাগর; হেরে ভূত রাজাদের দল। তিন পো কলিতো আগেই পূর্ণ হয়েছে কোম্পানির জবরদস্তি আইনে এবার কলিকালে চার পো পূর্ণ হতে চললো।

রাতের পর রাত জেগে মাসের পর মাস সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরিতে বসে পুঁথি ঘেঁটেছে বিদ্যেসাগর। হিন্দু বিধবার বিয়েতে যে শাস্ত্রের নিষেধ নেই, তার প্রমাণ বের করে তবে ছেড়েছে। একরোখা, গোঁয়ার মানুষটাকে ভবপারে পাঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও হয়েছিল, কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয়নি। বিদ্যেসাগরের বাবা ঠাকুরদাস তাঁর ছেলের বিপদ আশঙ্কা করে বীরসিংহ থেকে তার অনুগত ওস্তাদ লেঠেল শ্রীমন্তকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। দৈত্যের মতো চেহারা শ্রীমন্তের। যেমন চওড়া ছাতি, তেমনি দুর্জয় সাহস। কলকাতার পথে ঘাটে দেহরক্ষী হিসেবে সে সব সময় আছে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে। তাকে দেখে ভাড়াটে খুনীরাও হাত গুটিয়ে সরে পড়েছে।

আইন পাশ হল ভরা বর্ষায় জুলাই মাসে। আঠারো শো ছাপ্পান্ন সালের পনেরো আইন। সফল হ'ল বিদ্যাসাগরের এতদিনের স্বপ্ন।

দুর্গোৎসবের কিছুদিন আগের কথা।

বিদ্যাসাগরের বৃন্দাবন মল্লিক লেনের বাসাবাড়িতে বসে কথা হচ্ছিল বিদ্যেসাগর আর গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ওরফে গুড়গুড়ে ভট্চাযের ভেতর। আইন পাশ হওয়ার পর রাজার দলের প্রতিক্রিয়া কতদূর গড়িয়েছে, তার কিছু খবর পেয়েছেন গুড়গুড়ে ভট্চায। নিতান্ত বেঁটেখাটো মানুষটি বলে লোকের দেওয়া 'গুড়গুড়ে' নামটা শুধু মেনে নেওয়া নয়, স্বচ্ছন্দে এবং সানন্দে নিজেও ব্যবহার করেন গৌরীশঙ্কর। নিজেই ঠাট্টা করে বলেন, দ্যাখো বাপু, বেঁটে বক্কেশ্বর বলে তোমাদের কলকেতাই ভাষায় শ্রীহট্টের এই বামুনকে গুড়গুড়ে নামটা যা দিয়েচ, তা মেনে নিচ্চি; তাই বলে এই শ্রীহট্টিয়া বাঙাল কিন্তু কোনো ঢাক ঢাক গুড়গুড়ের ভেতর থাকতে পারবে না বাপ!

বিচিত্র মানুষ এই গুড়গুড়ে ভট্চায।

শ্রীহট্ট জেলার ইটা-পঞ্চগ্রামে ছিল বাড়ি। কৈশোরের প্রথম পর্বেই হারিয়েছিলেন মা-কে। তারপর কৈশোর পেরিয়ে তারুণ্যে পৌঁছনোর মুখে মুখেই হারালেন বাপকে। একেবারে নিরাশ্রয় হয়ে ভেসে যেতে হত, সংসারের অবস্থা ঠিক তেমন খারাপ ছিল না। কিন্তু মা-বাবা দুজনকেই হারিয়ে পনেরো বছর বয়সের বেঁটেখাটো ছেলেটি এক রাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিল। গ্রামের চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত ব্যাকরণ আর সাহিত্য পড়া অনেকখানিই এগিয়ে ছিল। সেই বিদ্যে সম্বল

করেই বন্ধনমুক্ত সদ্য-তরুণ ছেলেটি রওনা হ'ল নবদ্বীপের পথে। নবদ্বীপের বদলে আশ্রয় জুটলো ভাটপাড়ায় নীলমণি ন্যায়পঞ্চাননের কাছে। নিঃসন্তান ন্যায়পঞ্চানন নিজের ছেলের মতোই স্নেহ করতেন নতুন ছাত্রটিকে। ভাটপাড়া থেকে তর্কবাগীশ উপাধি নিয়ে গৌরীশঙ্কর যখন কলকাতায় এলেন তখন দেওয়ানজী রামমোহন কলকাতায় নানা বিষয়ে আলোড়ন তুলেছেন। রামমোহনের ধর্মসংস্কার আর সমাজ-সংস্কারের আন্দোলন আকর্ষণ করলো তরুণ যুবককে। বেশ কিছুদিন কাটলো রামমোহনের সঙ্গে। তারপরেই মতবিরোধ। রামমোহনের ব্রাহ্মসভা ছেড়ে তিনি গিয়ে ভিড়লেন নন্দলাল ঠাকুরদের ধর্মসভায়। তারপরেই যোগাযোগ ইয়ং বেঙ্গলের চাঁই দক্ষিণারঞ্জন মুখুজ্যের সঙ্গে। ডিরোজিওর ছাত্র দক্ষিণারঞ্জন আর ভট্টপল্লীর সংস্কৃত পণ্ডিত নীলমণি ন্যায়পঞ্চাননের ছাত্র গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ। দক্ষিণারঞ্জনের জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকায় সরাসরি সম্পাদকীয় কাজ চালানোর দায়িত্বই প্রায় পড়ে গেল ভট্টপল্লীর তর্কবাগীশ উপাধি-পাওয়া যুবকের ওপর।

ইয়ং বেঙ্গলদের মুখপাত্র জ্ঞানান্বেষণের বিরুদ্ধে সে-সময় সাজ-সাজ রব পড়ে গিয়েছিল রক্ষণশীল হিন্দু মহলে। দক্ষিণারঞ্জন আর গৌরীশঙ্করকে লক্ষ্য করে 'সম্বাদ তিমির নাশক' পত্রিকা লিখলে, "ইনি বাবু সূর্যকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র বাঙ্গালা লেখাপড়া কিছুই জানেন না এবং বাঙ্গালা কহিতে ভালো পারেন না তাহাতে রুচিও নাই তথাচ বাঙ্গালা সমাচার কাগজের এডিটর না হইলেই নয় মাতামহদত্ত কিঞ্চিৎ সঞ্চিত অর্থ আছে তাহা তাবৎকে বঞ্চিত করিয়া ঐ কাগজের জন্য কথঞ্চিৎ কিছু ব্যয় করেন একজন নাটুরে ভাট মদ্যপায়ীকে পণ্ডিত জানিয়া চাকর রাখিয়াছেন সে নাস্তিক হিন্দুদ্বেষী কাগজ আরম্ভাবধি কেবল ধার্মিকবর চন্দ্রিকাকর মহাশয়কে কটু কহে আর হিন্দু শাস্ত্র ভাল নহে তাহারি দোষ আপন বুদ্ধিতে যাহা আইসে তাহাই লেখে এজন্য ভদ্রলোকমাত্র কেহ ঐ কাগজ পাঠ করেন না তথাচ কাগজ ছাপা করিয়া জন ক এক লোকের বাটিতে পাঠাইয়া দেন।"

কোনো কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করেননি গুড়গুড়ে ভট্চায।

সতীদাহ, গঙ্গাসাগর থেকে শুরু করে এই বিধবা বিবাহ আন্দোলন পর্যন্ত যে-কোনো সংস্কারের কাজের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে তাঁর জোরালো কলম। বেথুন সাহেবের ভিক্টোরিয়া হিন্দু ফিমেল স্কুলের সপক্ষেও তাঁর সম্বাদ ভাস্করের পৃষ্ঠায় জোরালো সমর্থন জানিয়েছিলেন গুড়গুড়ে ভট্চায।

কে বলবে এই ভাস্কর-সম্পাদকই একযোগে চালিয়ে আসছেন সম্বাদ রসরাজের মতো খিস্তি-খেউড়ের কাগজ? রসরাজের সম্পাদক হিসেবে তাঁর নাম কখনোই ছাপা হয়নি, কিন্তু দেশশুদ্ধ সবাই জানে রসরাজের পেছনে আসল লোকটি কে! এই তো ন'দশ বছর আগে গুপ্ত কবির 'পাষণ্ড পীড়ন' আর রসরাজের ভেতর খেউড়ের লড়াই এমন জমে উঠেছিল যে কাগজ আর পড়তে পায় না। কাগজ বেরোতে না বেরোতেই ফতুর। কয়েকমাস পরে সে লড়াই থেমে গেল বটে, কিন্তু তার জের এখনো মেটেনি। খেড়ড়ের লড়াই থেমে যাওয়ার কারণ হিসেবে লোকে বলে, গুপ্তকবিরই জিৎ হয়েছে, গুড়গুড়ে ভট্চায বাধ্য হয়ে রণে ভঙ্গ দিয়েছে। জিৎ হয়তো গুপ্ত-কবিরই হয়েছিল কিন্তু লড়াই থেমে যাওয়ার আর একটা বড় কারণ আছে। সে কারণ হ'ল শোভাবাজার রাজবাড়ির কমলকৃষ্ণ দেবের অনুরোধ।

তর্কবাগীশের একজন বড়ো পৃষ্ঠপোষক কমলকৃষ্ণ। তিনিই তাঁর শোভাবাজারের বালাখানার বাগানে একটা বাড়ি দিয়েছেন তর্কবাগীশকে। তাঁর অনুরোধে ক্ষান্ত হয়েছিলেন তর্কবাগীশ। তাছাড়া, আর একটা কারণও থাকতে পারে। তার আগেই রসরাজে অশ্লীল রচনা প্রকাশের দায়ে তর্কবাগীশের কপালে বেশ কয়েকবর জরিমানা আর কারাবাসও ঘটে গেছে। তার ওপর, গুপ্ত কবি আর গুড়গুড়ে ভট্চাযের অশ্লীল রচনার জোয়ারে জ্বালাতন হয়ে ঠাকুরপুকুরের পাদরি

লঙ সাহেব অশ্লীলতা নিবারণ আইনের জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন। সব মিলিয়ে দুই কাগজের লড়াই থামলো।

সেই রসরাজের গুড়গুড়ে ভট্‌চায যখন ভাস্কর-সম্পাদক, তখন তাঁর মূর্তি একেবারে আলাদা। সেই মূর্তিকে শ্রদ্ধা করেন বিদ্যাসাগর। বয়সেও তর্কবাগীশ অনেক বড়ো — একুশ বছরের পার্থক্য।

তর্কবাগীশ থাকেন শোভাবাজারের বালাখানার বাগানে। তাঁর ভাস্কর-ও সেখানেই ছাপা হয়। রাজা রাধাকান্ত দেবের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত কোনো বিরোধ নেই; বরঞ্চ নানারকম সৎকাজে রাধাকান্তের উৎসাহ আর অংশগ্রহণের প্রতি তাঁর রীতিমতো শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু বিরোধ বেধেছে এই বিধবা-বিবাহ নিয়ে। বিদ্যাসাগর যখন থেকে এই ব্যাপারটা নিয়ে উঠে পড়ে লেগেছেন, ভাস্করও প্রায় তখন থেকে তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

অনেক খবরই কানে এসেছে তর্কবাগীশের; এসেছে বিদ্যাসাগরের কানেও। আইন পাশ হয়ে যাওয়ার ফলে রাজার দলের ধর্মসভা একটা জোর ধাক্কা খেয়েছে বটে, কিন্তু বিরোধিতার ঝোঁক তাতে কিছুমাত্র কমেনি, বরঞ্চ তার সঙ্গে আক্রোশ মিশে ঝোঁকটা যেন আরো বেড়ে উঠেছে। এখন চেষ্টা চলছে, ছলে-বলে কৌশলে যেমন করে হোক, হিন্দু বিধবার বিয়ে ঠেকাতে হবে।

বিদ্যাসাগর বললেন, মোটামুটি সবই আমি জানি ভট্‌চাযমশাই। আর যেটুকু জানিনে, সেটুকু অনুমান করে নিতেও খুব একটা অসুবিধে হয় না। ও'রা চেষ্টার তো কসুর করেননি, এখনো করে চলবেন, তাতে আর অবাক হওয়ার কী আছে?

এক গাল হেসে গুড়গুড়ে ভট্‌চায বললেন, ওই সব সমাজপতিদের আমি নির্বাক করে দিতে পারি হে ঈশ্বর! রাজা-মহারাজা, উজির-নাজির-সবায়েরই ঘরের কেচ্ছাই তো গুড়গুড়ে ভট্‌চাযের দপ্তরে আছে! তেমন দরকার হ'লে একটা একটা করে কেচ্ছা ছেপে যাবো রসরাজের পাতায়।

—দোহাই, ওটা আর করবেন না। তাতে আমাদের কাজ তো কিছু এগোবে না, বরঞ্চ আরো অসুবিধে দেখা দেবে। তার চেয়ে যতো তাড়াতাড়ি পারা যায় একটা বে'র ব্যবস্থা করে ও'দের তাক্ লাগিয়ে দেওয়া যাক্।

—তাক্ আর লাগাবে কি হে? তোমার আইন পাশ হওয়ার আগেই তো ফরাসডাঙা এলেকার চালদা গাঁয়ের এক শূদ্র গেরস্ত তার বিধবা মেয়েটার বে' দিয়ে বৌনি করেচে। খবরটা তুমি শোনোনি?

—শুনেচি। গত ফেব্রুয়ারি মাসের ন' তারিখে বালবিধবা মেয়ের বে' দিয়ে বুকের পাটা দেখিয়েচে সেই গেরস্ত। অপরকে দিয়ে লিখিয়ে নেওয়া তার একখানা চিঠিও আমি পেয়েছিলুম। চিঠিখানা যত্ন ক'রে রেখে দিয়েচি।

—তার একটা কাপি দাও না, ভাস্করে ছেপে দিই।

দরকার বোধ করলে নিশ্চয়ই দেবো। তবে তার দ্বারা আমাদের কাজে খুব যে একটা সাহায্য হবে তা মনে হয় না। কোথায় কোন্ শূদ্রের বিধবা মেয়ের বে' হয়েচে, তা নিয়ে বামুন—কায়েতের সমাজ মাথা ঘামাবে না। হিন্দু সমাজ বলতে তারা বোঝে নিজেদের সমাজ। সেইজন্যেই বামুন—কায়েতের ঘর থেকেই আমাদের এখন পাত্র-পাত্রী খুঁজে বের করতে হবে। ঝুঁটি ধরে নাড়া না দিলে এদের চৈতন্য হবে না, তা আপনিও বিলক্ষণ জানেন।

—জানি বৈকি! রীতিমতো মর্মে মর্মে জানি। এদিকে পনেরো আইন পাশ হওয়ার পর মুখে মুখে একটা খবর রটেচে, তা শুনেচ? যে কোনো লোক তার বিধবা মেয়ের বে'র ব্যবস্থা করতে পারলে বিদ্যেসাগর নিজে সে বে'র সব খরচ-খরচা দেবে। তুমি এ কথা বলেচ নাকি?

—কাউকে ডেকে বলিনি বটে, তবে কথাটা ঠিকই। মনে মনে সেইভাবে তৈরি হয়েই আমি নেমেচি।

—সব্বোনাশ করেচ! এমনিতেই তোমাকে ভাঙা কাঁটাল পেয়ে যেমন-তেমন ছলে দু'দশ টাকা

হাতিয়ে নেওয়ার মতো মহাত্মার অভাব কলকেতায় নেই, তার ওপর এই হুজুগে দানছত্তর খুলে বসে শেষকালে সামলাতে পারবে তো?

শেষকালের কথা তো শেষকালে, প্রথমকালই আসুক আগে! এত দিন পরে যে চেষ্টা করে একটা কিনারা করা গেছে, তার ঝক্কি তো কিছু পোয়াতেই হবে। আপনার ভাস্কর নিয়ে এযাবৎকাল তো আপনি আমার প্রতি যথেষ্ট দাক্ষিণ্য করেছেন; এইবার খুঁজে দেখুন দিকি, একটা পাত্রী পাওয়া যায় কি না! শুধু পাত্রী পেলেও তো হবে না, তাকে বে' করবার মতো হিম্মতওয়ালা পাত্রও তো চাই? আমি কথা দিচ্ছি, বরপক্ষ-কনেপক্ষের সব খরচ-খরচার দায়-দায়িত্ব আমার।

হুঁকোয় বেশ মৌজ করে একটা টান দিয়ে একগাল হেসে গুড়গুড়ে ভট্চায বললেন, হুঁ, দায়িত্ব একটা দিচ্ছ বটে! এতকাল এডিটরি করেচি, এবার ঘটকালিতে একবার নেমে দেখি, ফলাফলটা কী দাঁড়ায়!

বিদ্যাসাগর মুচ্কি হেসে বললেন, ঘটকালি যে জীবনে করেননি, এমন কথা তো হলপ করে বলতে পারবেন না ভট্চাযমশাই! শুধু ঘটকালি নয়, সিভিল ম্যারেজের সাক্ষী হিসেবে দস্তখৎ পর্যন্ত করেচেন, কেমন কিনা?

আবার একগাল হেসে গুড়গুড়ে ভট্চায বললেন, নাঃ, তোমাকে যত মারাত্মক ভাবতুম, এখন দেখচি তুমি তার চেয়েও মারাত্মক লোক হে!

বিদ্যাসাগর হাসতে লাগলেন।

বেশ কিছুকাল আগের কথা। বিদ্যাসাগর তখন বিদ্যাসাগর হননি, সংস্কৃত কলেজের ছাত্র।

বর্ধমানের পরলোকগত মহারাজা তেজেশ্চন্দ্রের বিধবা ছোটোরাণী বসন্তকুমারীর সঙ্গে বেশ বড়ো রকমের এক ফৌজদারি মামলা শুরু হ'ল পরাণবাবু আর তাঁর পরিবারবর্গের। পরাণবাবুর প্রভাব যথেষ্ট, কৌশলেও তিনি রীতিমতো দক্ষ। অন্যদিকে বসন্তকুমারীব কোনো অভিজ্ঞতাই নেই ফৌজদারি সম্বন্ধে। দক্ষিণারঞ্জন মুখুজ্যের সঙ্গে পরিচয় ছিল তাঁর। তিনি দক্ষিদারঞ্জনের সাহায্যপ্রার্থিনী হলেন। ভট্টপল্লীর তর্কবাগীশ পদবীধারী গৌরীশঙ্করের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ওপর অগাধ আস্থা ছিল ডিরোজিও-শিষ্য দক্ষিণারঞ্জনের। তিনিই সুপারিশ করে মহারাণীর পক্ষে মোক্তার নিযুক্ত করে তাঁকে পাঠালেন' আস্থার মর্যাদা রেখেছিলেন গৌরীশঙ্কর। কিছুদিন পরে বেপরোয়া ইয়ংবেঙ্গল দক্ষিণারঞ্জন কলকাতায় আনিয়ে ফেললেন বিধবা যুবতী মহারাণী বসন্তকুমারীকে; পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট বার্চ সাহেবের এজলাশে যথারীতি সাক্ষীসাবুদ রেখে সিভিল ম্যারেজ আইনে বিয়ে করলেন তাঁকে। সেই বিয়ের অন্যতম সাক্ষী ছিলেন এই গুড়গুড়ে ভট্চায। তাঁর সই করা সে নথি আছে পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটের মহাফেজখানায়। সুতরাং, শুধু ঘটকালিই নয়, বিদ্যাসাগরের অনেক আগেই বিধবা-বিবাহের যোগাযোগে তিনি হাতে খড়ি দিয়ে রেখেছেন।

বিদ্যাসাগরের মুচ্কি-হাসি ভরা মুখের দিকে তাকিয়ে গুড়গুড়ে ভট্চায বললেন, দ্যাখো বাপু, মিঞা বিবি রাজি তো ক্যা করেগা কাজি? সে ক্ষেত্রে মিঞা-বিবি নিজেরাই যা করবার করেছিলেন, আমি তো নিমিত্ত মাত্র। এখন তোমার এই সঙ্কটকালে নিতান্তই যদি জবরদস্তি করো তো সাতান্ন বছর বয়েসের বেঁটে খাটো একটা পাত্র নয় দিতে পারি, কিন্তু পাত্রী? তাও তো তুমি আবার বহুবিবাহ কিম্বা বার্ধক্যে বিবাহ পছন্দ করো না! মুশকিল কি একটা?

বিদ্যাসাগরও হেসে বললেন, ওই যা বলেচেন। মুশকিল একাধিক। বরঞ্চ, আত্মোৎসর্গ না করে একটা বলির পাঁঠা যোগাড় করে দিন।

গুড়গুড়ে ভট্চায হাসতে হাসতে বললেন, এমন একটা তৈরি পাত্তর হাতে পেয়েও যখন ছেড়ে দিচ্ছ, তখন কপালে তোমার কষ্ট আছে!

—আমার কপালে যে কষ্ট আছে, সে তো গোড়া থেকেই বুঝে আসচি ভট্চায মশাই। আশীর্বাদ করুন, কষ্ট যতই হোক, সঙ্কল্পে যেন সিদ্ধ হই।

বাইরে ঝম্‌ঝম করে বৃষ্টি নেমেচে।

এবারে রঙ্গ-রহস্য ছেড়ে দিয়ে গুড়গুড়ে ভট্‌চায বললেন, সিদ্ধি তোমার হবেই ঈশ্বর! ঐকান্তিক দৃঢ়তা থাকলে সাফল্য একদিন না একদিন আসবেই। এই আইন পাশ হওয়ার পর ক'দিন ধরে একটা কথাই আমি ভাবচি। চৌদ্দ বছর আগে ইয়ংবেঙ্গল রামগোপালেরা 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' নামে যে ইংরিজি কাগজ বের করেচিল, সে কাগজে বিধবা-বিবাহের বৈধতা নিয়ে বেশ জোরালো যুক্তি হাজির করা হয়েচিল। এমন কি, পরাশর সংহিতার যে শ্লোকটির ওপর ভিত্তি করে তুমি তোমার এই আন্দোলনকে এতখানি সাফল্যের পথে এনে দাঁড় করালে, সেই 'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ইত্যাদি' শ্লোকটি পর্যন্ত সেই ইংরিজি কাগজে উদ্ধৃত্ত করা হয়েচিল। অথচ কয়েক মাস পরে তাঁদের কাগজে আন্দোলন কোথায় মিলিয়ে গেল। কিন্তু তুমি যখন আসরে নামলে, তখন এস্‌পার-ওস্‌পার করে তবে ছাড়লে! আচ্ছা ঈশ্বর, কেউ কেউ বলচে, ও শ্লোকটা নাকি তুমিই ওদের হাতে যুগিয়েছিলে?

—আজ্ঞে, সেটা সত্যি নয়। শ্লোকটা ও'দের হাতে যুগিয়েছিলেন তর্কালঙ্কার মশাই।

মদনমোহন?

হ্যাঁ। সত্যি কথা বলতে কি, শ্লোকটার সন্ধান আমার আগে জানা থাকলে রাতের পর রাত জেগে সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরিতে বসে আমাকে এত পুঁথি হাতড়ে মরতে হত না। ওই যে বললেন, কপালে কষ্ট — তাই আর কি!

গুড়গুড়ে ভট্‌চায বললেন, হৃদয়ের ভেতর থেকে সাড়া না পেলে কেউ কি আর এত কষ্ট করতে পারে হে ঈশ্বর?

আমার মাতৃদেবীর প্রেরণাই আমাকে শক্তি দিয়েচে ভট্‌চায মশাই!

মাতৃদেবী! — একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে গুড়গুড়ে ভট্‌চায বললেন, তুমি যে কত ভাগ্যবান ঈশ্বর! আর আমি সেই কোন্ ছেলেবেলায় মাকে হারিয়েচি, তা মনেও পড়ে না। মাতৃস্নেহ যে কী বস্তু তা অনুভব করবার সুযোগই জীবনে ঘটলো না। সে যাই হোক, তোমার মাতৃদেবীর প্রেরণায় তুমি এত বড়ো কঠিন একটা কাজে হাত দিয়ে এই যে সাফল্য অর্জন করলে তার জন্যে তাঁকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই!

ভগবতী দেবীর প্রসঙ্গ মাত্রেই আপ্লুত হয়ে আসে বিদ্যাসাগরের হৃদয়। ভাবাবেগে ধরা গলায় তিনি বললেন, ধর্মসভার কর্তাব্যক্তিরা তো রটিয়েচেন, বিদ্যেসাগর নাস্তিক। তাঁদের কথা এক অর্থে মিথ্যে নয়, কারণ ঠাকুর-দেবতা নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় আমি পাইনে। কিন্তু পিতৃদেব এবং মাতৃদেবীকেই মাত্র আরাধ্য দেব-দেবী জ্ঞান করা যদি নাস্তিক্য হয় তাহলে আমি ঘোরতম নাস্তিক।

কিছুক্ষণ দুজনেই নীরব।

বৃষ্টির বেগ আগের চেয়ে একটু কমেছে। একটু পরে বিদ্যাসাগর আবার বললেন, সাফল্যের প্রথম ধাপ পর্যন্ত পেঁছানো গেচে ভট্‌চায মশাই, আসল কাজটাই এখনো বাকি। সমাজপতিদের চোখের সামনে একটা বিবাহের অনুষ্ঠান সম্পন্ন না করা পর্যন্ত সিদ্ধিলাভ হ'ল বলে আমি মনে করতে পারচি নে।

দুর্গোৎসবের কিছুদিন আগেই এ সব কথাবার্তা হয়েছিল।

অল্প কয়েকদিন পরেই তর্কবাগীশ গুড়গুড়ে ভট্‌চাযের কথা খেটে গেল। নদীয়া শান্তিপুরের এক ধনী বিধবা লক্ষ্মীমণি দেবী হঠাৎ একদিন বিদ্যাসাগরের কাছে এসে উপস্থিত।

কয়েকদিন আগে সুপ্রীম কোর্টে এক মামলা দায়ের হয়েছে। মামলার বাদিনী লক্ষ্মীমণি দেবী, বিবাদী মুর্শিদাবাদ সার্কেলের জজপণ্ডিত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। প্রতারণার অভিযোগে বেশ মোটা অঙ্কের টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করে বিদ্যারত্নের বিরুদ্ধে মামলা এনেছেন বাদিনী। তাঁর অভিযোগ, রামধন তর্কবাগীশের মতো বিখ্যাত ব্যক্তির পুত্র শ্রীশচন্দ্র বাদিনীর বালবিধবা কন্যা

কালীমতীকে বিবাহ করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মাতা-কন্যাকে কলকাতায় আনিয়েছেন কিন্তু এখন তিনি প্রতিশ্রুতি পালনে সম্মত নন। তার ফলে বাদিনীর সামাজিক সম্ভ্রমহানি ঘটেছে।

সমস্ত বিবরণই শুনলেন বিদ্যাসাগর। শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন তাঁর নিতান্তই পরিচিত এবং ঘনিষ্ঠ জন। তার নামে সুপ্রীম কোর্টে মামলা রুজু হয়েছে, সে খবরও তিনি রাখেন। বিদ্যাসাগরকে বিবাদীর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি জেনেও বাদিনী নিজেই বিদ্যাসাগরের কাছে এসে উপস্থিত হবেন, সেটা তিনি ভাবতে পারেননি। কিন্তু তাই-ই হল।

রাজা রামমোহনের ছেলে রমাপ্রসাদ সদর দেওয়ানি আদালতের নামজাদা উকিল। বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনের সঙ্গে রমাপ্রসাদের যোগ আছে জেনে তারই সঙ্গে প্রথম দেখা করেছিলেন লক্ষ্মীমণি দেবী। রমাপ্রসাদ তাঁকে বিদ্যাসাগরের কাছে পাঠিয়েছে।

লক্ষ্মীমণির শ্বশুরবাড়ি শান্তিপুরের কাছে পলাশডাঙা গ্রামে। স্বামীর নাম ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়। চার বছর বয়সে নদীয়ারাজের গুরুবংশীয় রুক্মিণীপতি ভট্টাচার্যের ছেলে হরমোহনের সঙ্গে মেয়ে কালীমতীর বিয়ে দিয়েছিলেন লক্ষ্মীমণি। বিয়ের মাত্র দু বছর পরে ছ বছর বয়সে কালীমতী বিধবা হ'ল। বিধবা বালিকাকে বুকে চেপে চার বছর ধরে চোখের জল ফেলেছেন বিধবা লক্ষ্মীমণি। বিদ্যাসাগরের আন্দোলন সম্বন্ধে যতখানি সম্ভব খোঁজখবর রেখে চলছিলেন তিনি। আইন পাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মনস্থির করে ফেললেন তিনি। টাকার অভাব তাঁর নেই। পিতৃকুলে একমাত্র সন্তান বলে বিষয়-সম্পত্তির একমাত্র ওয়ারিশ তিনি। স্বামীকুলেও সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ করবার মতো শরিক নেই। ফলে, দুই তরফের বিষয়-সম্পত্তির অধিকারিণী লক্ষ্মীমণি তাঁর দশ বছর বয়সের বিধবা মেয়ের নতুন করে বিয়ে দেওয়ার সংকল্পে একেবারে অটল হয়ে উঠলেন। আত্মীয় স্বজনেরা তাঁকে ভালো করেই জানতেন। বাধা দিয়েও নিরস্ত করা যাবে না জেনে তাঁরা অগত্যা সম্মতি দিলেন। ঘটনাচক্রে যোগাযোগ হল শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের সঙ্গে। বয়সে নবীন হলেও কোম্পানির আদালতের একজন জজপণ্ডিতের কথার ওপর আস্থা রেখেছিলেন লক্ষ্মীমণি। মেয়েকে নিয়ে তিনি কলকাতায় এসেছেন। তারপরেই কানাঘুষোয় জানতে পারেন, বিদ্যারত্ন নাকি তার মত পরিবর্তন করেছে। রামধন তর্কবাগীশের মতো দেশবিখ্যাত মানুষের ছেলের পক্ষে এই দুর্বলতা সহ্য করেননি লক্ষ্মীমণি। ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়ে তাই সুপ্রীম কোর্টে মামলা রুজু ক'রছেন তিনি।

সমস্ত বিবরণ শোনার পর বেশ কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ গম্ভীরভাবে বসে রইলেন বিদ্যাসাগর। তারপর বললেন, শ্রীশ তোমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা যদি পালন করে তাহলে মামলা তুলে নিতে তোমার আপত্তি নেই তো মা?

—আপত্তি থাকবে কেন? আমি তো তার কথার ওপর নির্ভর করেই এতখানি এগিয়েছিলুম বাবা! তার নামে আমাকে আদালতে নালিশ করতে হবে তা তো স্বপ্নেও ভাবিনি।

হুঁ। আচ্ছা, আমি একবার চেষ্টা করে দেখি।

—সেইজন্যেই তো আপনার কাছে ছুটে এলুম বাবা! আপনার অন্তর মায়ের অন্তর। নইলে আবাগী মেয়েগুলোর দুঃখে আপনার অন্তর এমন ভাবে কাঁদতো না! আপনার ওপরেই আমি নির্ভর করে রইলুম। শ্রীশ যদি রাজি না-ও হয়, অন্য পাত্তর ঠিক করে আপনি বে'র ব্যবস্থা করুন। আমার জ্ঞাত-কুটুম, গাঁয়ের লোক, এমন কি সারা দেশের লোক যে যা বলে বলুক, আমি পিছিয়ে যাবো না। টাকার অভাব হবে না, টাকা আমার আছে। আমার মেয়েকে দিয়েই আপনার অ্যাদ্দিনকার চেষ্টার পেথম ফল ফলুক!

—তাই যেন হয় মা, তাই যেন হয়!

আবেগে চোখে জল এসে গেছে বিদ্যাসাগরের। চোখের সামনে ভেসে উঠছে মা ভগবতী দেবীর মুখখানি। মায়ের সেই কথাগুলো যেন কানে বাজছে, হ্যাঁরে ঈশ্বর, তুই তো কত পুঁতি

পড়েচিস, শাস্তর পড়েচিস! এই বালবিধবা মেয়েগ্নলোর মনের ব্যথা দ্নর করবার কোনো বিহিত কি তোদের শাস্তরে নেই?

লক্ষ্মীমণি গলবস্ত্র হয়ে বিদ্যাসাগরকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালো। ধরা গলায় বিদ্যাসাগর বললেন, তুমি এসে আজ আমাকে অনেকখানি শক্তি জ্নগিয়ে গেলে মা! সংকল্পে অবিচল থাকলে পৃথিবীতে কোনো বাধাই বাধা নয়!

অল্পই ক'দিনের ভেতরেই সব বাধা দ্নর হয়ে গেল।

যাদের ভয়ে শ্রীশ বিদ্যারত্ন পিছিয়ে গিয়েছিল তাদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তি বিদ্যাসাগরের। শ্রীশ তার প্রতিশ্রুতি পালনে রাজি, ভয়কে মন থেকে সে দ্নর করেছে। স্নপ্রীম কোর্টের মামলা তুলে নিলেন লক্ষ্মীমণি। শ্নর্ন হয়ে গেল বিয়ের উদ্যোগ আয়োজন।

বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ বন্ধ্ন রাজকৃষ্ণ বাড়্নজ্যে। তাঁর বারো নম্বর স্নকিয়াস স্ট্রীটের বাড়িতেই বিয়ের আসর হবে ঠিক হল।

হৈ হৈ পড়ে গেল কলকাতায়।

বিদ্যাসাগর সত্যি সত্যিই একটা বিধবা মেয়ের বিয়ে ঠিক করে ফেলেছেন শ্ননে লোকের কৌত্নহলের শেষ নেই। তাও আবার বাম্ননের মেয়ে! সব মিলিয়ে ব্যাপারটা কেমন দাঁড়ায় একবার দেখতে হবে!

রাগে ফ্নসছে ধর্মসভার দল। কিন্তু বিদ্যাসাগরের পাশে এসে দাঁড়ালেন রামগোপাল আর প্যারীচাঁদের মতো মার্কা মারা ইয়ংবেঙ্গল। গ্নড়গ্নড়ে ভট্‌চায তো আছেনই। জোড়াসাঁকোর ষোলো বছর বয়সের জমিদার কালীপ্রসন্ন একদিন এসে প্রস্তাব দিলে, এ-বিয়ের সমস্ত ব্যয়ভার বহনে সে প্রস্তুত। হেসে বিদ্যাসাগর বললেন, ব্যয় তোমাকে কিছ্ন করতে হবে না, কারণ পাত্রীর মায়ের যথেষ্ট সচ্ছলতা আছে। তাছাড়া, এটা আমার প্রথম কাজ; অতএব বাদবাকি যা লাগে তা আমাকেই দিতে হবে। পাত্র-পাত্রীকে তোমার খ্নশিমতো যৌতুক তুমি দিও। তবে তার চেয়েও বেশি দরকার, বে'র আসরে উপস্থিত থাকা। ও পক্ষ তো শ্ননচি, বে'র দিন বরকে ঠ্যাঙাবে, তাই আমার তরফেও দ্ন-একটা বাঘ-সিংগি হাজির থাকা উচিত। হাজার হোক, তুমি একটা সিংহ-শাবক।

রসিকতাট্নকু উপভোগ করে কালীপ্রসন্ন বললে, দাঁত-নখ কি তৈরি রাখবো না এমনিতেই কাজটা নির্বিঘ্নে সমাধা হবে?

বিদ্যাসাগর সপ্রশ্ন দ্নষ্টিতে তাকালেন। দাঁত-নখ বলতে ছেলেটা কী বোঝাতে চাইছে, তা ঠিক তাঁর মাথায় ঢোকেনি।

কালীপ্রসন্ন ম্নদ্নস্বরে বললে, ওই যে বললেন, বরকে নাকি ঠ্যাঙানোর ফন্দি আঁটা হয়েচে, তাই বলচিল্নম, লেঠেল পাইক কিছ্ন তৈরি রাখতে হবে?

—না, না, তার দরকার নেই। গবর্নমেন্ট থেকে প্রচুর প্নলিশম্যান দেবে। শ্রীশের যাত্রাস্থল থেকে রাজকেষ্টর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তার দ্ন'পাশে মোতায়েন থাকবে তারা। মজা দেখার জন্যে ভীড়ও খ্নব হবে শ্ননচি। তাদের সামলাতেও তো প্নলিশম্যানের দরকার?

বিয়ের দিন এগিয়ে আসছে।

তারিখ ঠিক হয়েছে তেইশে অগ্রহায়ণ রবিবার। ইংরিজি সাতই ডিসেম্বর। কোনো আয়োজনে ত্রন্টি রাখছেন না বিদ্যাসাগর। প্রচলিত বিয়ের অন্নষ্ঠানে যা যা পালন করা হয়, তার সব কিছ্নই করতে হবে, এই তাঁর জেদ।

রামগোপালের বাড়িতে এই বিয়ের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল রামগোপাল, প্যারীচাঁদ, কিশোরীচাঁদ, রমাপ্রসাদ আর হরিশের ভেতর। বরের পালকির ওপর একটা আক্রমণ হতে পারে, এ কথা সকলেরই কানে এসেছে।

কথায় কথায় হঠাৎ রামগোপালের দিকে তাকিয়ে হরিশ বললে, একটা কথা বলবো দাদা?

আক্রমণের কথা যখন শোনাই যাচ্চে তখন চারদিক ঢাকা পাল্কির বদলে খোলা গাড়িতে বরকে আনার ব্যবস্থা করলে কেমন হয়?

রামগোপাল কিছু বলবার আগেই রমাপ্রসাদ বললে, তুমি কী বলচো হরিশ? তাতে যে বিপদের আশঙ্কা আরো বেড়ে যাবে!

—উলটোটাও হতে পারে রমাপ্রসাদ। ঢাকা পাল্কির ওপর কিছু ইঁট-পাটকেল ছুঁড়বে বলে যারা হাত শানাচ্চে, খোলা গাড়ি দেখলে হকচকিয়ে গিয়ে তারা হয়তো হাত গুটিয়ে নিতে বাধ্য হবে। আমার ধারণা, সেই সম্ভাবনাই বেশি। অবশ্য সব কিছুই নির্ভর করচে বিদ্যেসাগরের সম্মতি-অসম্মতির ওপর।

বিদ্যাসাগরের সম্মতি পাওয়া গেল।

প্রস্তাবটা শুনেই তিনি প্রায় লাফিয়ে উঠলেন।—হ্যাঁ, খাঁটি কথা বলেচে হরিশ! ভয়ের কাছে যত নত হবে, ভয় আরো ততই চেপে বসবে! ঠিক আছে, খোলা গাড়িতেই আসবে শ্রীশ! কিন্তু কার গাড়ি পাওয়া যাবে?

গাড়ি দেবেন রামগোপাল। স্টুয়ার্ট কোম্পানি থেকে ফরমাশ দিয়ে তৈরি করা তাঁর ঝকঝকে জুড়ি গাড়িতেই আসবে বর। বিয়ে করে সেই গাড়িতেই বৌ নিয়ে ফিরে যাবে সে।

বিয়ের দিন সারা কলকাতা যেন ভেঙে পড়লো সুকিয়াস স্ট্রীট অঞ্চলে। বরের গাড়ির পাশে পাশে হেঁটে এলেন বিদ্যাসাগর নিজে; তাঁর পেছনে রামগোপাল, প্যারীচাঁদ, আর নীলকমল মুখুজ্যে। গুড়গুড়ে ভট্চায আগেই বলে রেখেছেন, দ্যাখো বাবা, আমি বেঁটে খাটো মানুষ, ভীড়ের ভেতর বালক মনে করে কেউ হয়তো মাথায় চাঁটি মেরে বসবে। তার চেয়ে হরিশ আর আমি—এই দু'জন এডিটর বরণ্ড অভ্যর্থনার দিকটিতেই থাকি। ইঁট, লাঠি, জুতো, ছাতা যা আসে সবাইকেই অভ্যর্থনা করে নেবো। ছাঁদা বেঁধে নিয়ে বরবধূকে গন্তব্যস্থানে পোঁছে দিয়ে রামগোপালের গাড়িতেই কালকে আবার চলে যাবো দ্বিতীয় বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠানে। সেখানেও যদি কিছু ছাতা জুতো প্রাপ্তিযোগ হয়; তাহলে বাকি জীবনটা আর কিনতে হবে না।

দ্বিতীয় বিধবা বিবাহ কথাটা কাল্পনিক নয়। পরের দিনই কলকাতায় ঈশান মিত্তিরের বারো বছর বয়সের একটি বালবিধবা মেয়ের সঙ্গে পেনেটির নামজাদা কুলীন কায়স্থ কৃষ্ণকালী ঘোষের ছেলে মধুসূদন ঘোষের বিয়ে ঠিক হয়ে আছে।

দশ বছরের মেয়ে কালীমতীর বিয়ে হয়ে গেল। সম্প্রদান করলেন লক্ষ্মীমণি নিজে। একটু দূরেই দাঁড়িয়ে আছেন বিদ্যাসাগর। তাঁর চোখে তখন জলের ধারা নেমেছে।

পাশে দাঁড়িয়ে গুড়গুড়ে ভট্চায, রামগোপাল, হরিশ আর কালীপ্রসন্ন। হরিশের চোখের সামনে কেবলই ভেসে উঠছে মাধুরীর মুখ। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সে বিদ্যাসাগরকে বললে, এই মুহূর্তে চোখের জল ফেলচেন কেন দাদা?

—চোখের জল নয় হরিশ, এ আমার হাসি। আমি হাসচি, প্রাণ ভরে হাসচি ভাই!

॥ বাইশ ॥

কলকাতার উত্তর পুবে কোম্পানির বিরাট পল্টন ছাউনি দমদম ক্যান্টনমেন্ট। গোরা পল্টনেরাই তাদের আদর মেশানো ঠাট্টায় বলে সীড-বেড।

এক অর্থে তাই-ই বটে।

কলকাতার কাছাকাছি আরো বড়ো বড়ো দুটো পল্টন ছাউনি আছে—একটা ব্যারাকপুরে, আর একটা বহরমপুরে। কিন্তু দমদম ক্যান্টনমেন্টের গুরুত্ব আলাদা। নতুন নতুন সব তালিমের ব্যাপারগুলো এখানেই হয়। রেজিমেন্টের পর রেজিমেন্ট আসে, তালিম নেয়; তারপর আবার যে যার জায়গায় ফিরে যায়।

দমদম ক্যান্টনমেন্ট তাই কোম্পানির সামরিক বাহিনীর বীজতলা। কি গোরাপল্টন, কি নেটিব পল্টন—ডাক পড়লে সবাইকে এসে একবার ঘাম ঝরিয়ে যেতেই হবে। সেই কারণেই পল্টন ছাউনি এলাকা প্রায় সারাবছর ধরেই সকাল-সন্ধ্যে জমজমাট।

সূর্য ওঠা থেকে অস্ত যাওয়া পর্যন্ত প্রায় দম ফেলার অবকাশ নেই সেপাইদের। নিয়মিত হিসেব মাফিক প্যারেড তো আছেই, তার ওপর ইদানিং আবার জোর কদমে শুরু হয়েছে নতুন আমদানি এনফিল্ড রাইফেলের তালিম। বেশ কয়েকটা নেটিব রেজিমেন্ট এসেছে দমদমে। শুরু হয়েছে তাদের এনফিল্ড রাইফেলে তালিম দেওয়ার পালা।

এতদিনের চলতি ব্রাউন বেস বন্দুক বাতিল হতে চলেছে।

ব্রাউন বেস বড়ো বেশি সাবেকী, পাল্লাও অনেক কম। নতুন রাইফেলের সঙ্গে তার কোন তুলনাই চলে না। এনফিল্ড এখন সারা পৃথিবীতে সেরা রাইফেল। এ রাইফেলের যেমন তেজ, তেমনি পাল্লা। তাই হয়তো এনফিল্ড হাতে নিলেই বুকের রক্ত যেন চনমনিয়ে ওঠে। হাতিয়ারের মতো হাতিয়ার।

একটাই মাত্র অসুবিধে এনফিল্ডের।

কার্তুজগুলোকে তাজা রাখবার জন্যেই নাকি মোম মাখানো একরকম পুরু কাগজের একটা আধা-শক্ত মোড়কে মোড়া থাকে তার মুখ। সেই মোড়কটা ছিঁড়ে ফেলে রাইফেলের নলে পুরতে হয় কার্তুজ।

কিন্তু হাতে ছেঁড়ার সময় কোথায়? লড়াইয়ে নেমে দুশমনের মুখোমুখি হলে দুশমন কি তার বিপক্ষের সেপাইয়ের রাইফেলের কার্তুজ ভর্তি করবার সময় দেওয়ার জন্যে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকবে?

তাই হাতের বদলে দাঁত।

হাতে করে কার্তুজ তুলে নাও, দাঁতে মোড়ক কেটে লহমার ভেতর পুরে দাও রাইফেলে। তারপরেই ট্রিগার টানো!

জোর তালিম চলছে দমদম ক্যান্টনমেন্টে।

হপ্তায় হপ্তায় গাদা গাদা কার্তুজ ভর্তি পেটি আসছে ফোর্ট উইলিয়াম থেকে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, সব ক'টি রেজিমেন্টকে এনফিল্ড রাইফেলে সাজিয়ে তুলতে হবে। যে কোনো মুহূর্তে লড়াইয়ের জন্যে তৈরি হতে পারে, তবেই তো বাহাদুর সেপাই! আর সেই বাহাদুর সেপাইয়ের হাতে যদি থাকে এনফিল্ড রাইফেলের মতো তেজী হাতিয়ার, তাহলে কাকে ভয়?

রাইফেলের চাঁদমারির ফাঁকে ফাঁকে ভাঙা হিন্দীতে নেটিব সেপাইদের কাছে ছোটোখাটো বক্তৃতাও করেন গোরা ওপরওয়ালার দল। কেউ বা লেপ্টেন্যান্ট, কেউ ক্যাপ্টেন, কেউ মেজর। এ দেশকে সুষ্ঠুভাবে শাসন করতে গেলে দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন কোম্পানিকে করতেই হবে। আর তা করতে গেলে মাঝে মাঝে লড়াই অনিবার্য। সুতরাং কোম্পানির সেপাইরা যত পটু হয়ে উঠবে, ততই ভালো। শক্তিমান না হলে কেউ কি মানে?

সারাদিন কর্মচঞ্চল পল্টন ছাউনি।

দুপুরে স্নান-খাওয়ার জন্যে ঘন্টা দুয়েকের ছুটি ছাড়া বিশ্রামের আর অবকাশ নেই বললেই চলে। দু'ঘন্টা ছুটির পর আবার কুচকাওয়াজ, আবার এনফিল্ড রাইফেলের চাঁদমারি।

এরই ভেতর শীতের দুপুরে একদিন ছোট্ট একটা ঘটনা ঘটলো।

ভোর থেকে দফায় দফায় কুচকাওয়াজ হয়েছে। এই শীতের ভেতরেও প্রত্যেক দিনই বেলা একটু বাড়তেই গা দিয়ে ঘাম ছোটে। খিদেয় পেট চন্‌চন্ করতে থাকে। কিন্তু উপায় নেই। কুচকাওয়াজে কোনো ঢিলেমি চলবে না। সত্যিকারের ভালো সেপাই হতে গেলে ফৌজী কানুন মানতে হবে অক্ষরে অক্ষরে। ফৌজের মালিক যে-ই হোক, তার দেওয়া নিমক যখন পেটে পড়েছে তখন তার আইন-ই আইন, তার হুকুম-ই হুকুম। এই যে কিছুদিন আগে কোম্পানি যখন লখনৌয়ের নবাব ওয়াজিদ আলিকে হটিয়ে দিয়ে অওধ-রোহিলাখণ্ডে কোম্পানি-রাজ কায়েম করলে,

তখন উনিশ আর চৌত্রিশ নম্বর নেটিব রেজিমেন্ট তাদের ফৌজী দায়িত্ব পালন করে আসেনি? ওই দুটো রেজিমেন্টে বলতে গেলে প্রায় সব সেপাইগুলোই তো অযোধ্যা এলাকার আদমি, কিন্তু কোম্পানির সঙ্গে নেমকহারামি কেউ করেনি। কোম্পানির ফৌজে চাকরির দৌলতেই যখন রুটি-রুজির সংস্থান, তখন ফৌজী কানুনকে তারা অমান্য করবে কেন?

দুপুরের খাওয়া দাওয়ার একটু পর থেকেই আবার শুরু হবে কুচকাওয়াজ।

স্নান সেরে একটু জোরে জোরে পা চালিয়েই কয়েকজন সেপাই ব্যারাকের দিকে আসছিল। তাদের প্রত্যেকেরই হাতে জল ভর্তি লোটা।

—এ পাড়েজী! এ চৌবেজী!

হঠাৎ একটা অচেনা গলার ডাকে ব্যারাকপুর থেকে তালিম নিতে আসা সেই সেপাই ক'জন দাঁড়িয়ে পড়লো।

রাস্তার পাশেই একটা বড়োসড়ো কাঠ বাদামের গাছ। সেই গাছটার গুঁড়িতে হেলান দিয়ে মাটিতে বসে আছে একটা মাঝ বয়সী লোক। তার মাথায় রুক্ষ কাঁচা-পাকা চুল, চোখ দুটো কোটরে বসা, দড়ি পাকানো শরীর। পাশে পড়ে রয়েছে একটা ঝাড়ু আর নোংরা সাফাইয়ের জন্যে লম্বা হাতলওয়ালা একটা বুরুশ। লোকটা ধুঁকছে।

সেপাই ক'জন দাঁড়িয়ে যেতেই কাঁপা কাঁপা হাত দুটো জোড় করে ক্ষীণ, নির্জীবস্বরে লোকটা বললে, মেহেরবানি করে তোমাদের কারো লোটা থেকে আমার আঁজলায় একটু জল ঢেলে দেবে সেপাইজী? জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে, মাথা তুলতে পারচি নে। তিয়াসে ছাতি ফেটে যাচ্ছে কিন্তু উঠে গিয়ে যে একটু জল খাবো, তাও পারচি নে। উঠতে গেলেই মাথা ঘুরে যাচ্ছে। তোমরা কেউ মেহেরবানি করে দেবে একটু জল?

হতবাক্ হয়ে সেপাইরা এ ওর মুখের দিকে তাকালে।

লোকটাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে, সে একটা ভাঙ্গি মেথর। পল্টন ছাউনিতে ওদের বলা হয় লস্কর। একটা অচ্ছুৎ মেথরের এতখানি বুকের পাটা যে, ব্রাহ্মণের লোটা থেকে জল খেতে চায়? কোম্পানির পল্টন ছাউনিতে কি হিন্দুর জাতপাতের বালাই উঠে যেতে চলেছে? অচ্ছুৎ ভাঙ্গিরাও কি মাথায় উঠে বসবে?

লোকটি আর একবার কাতর মিনতি করতেই সেপাইদের ভেতর থেকে একজন গর্জন করে উঠল, শালা খান্‌কি কুত্তার বাচ্চা, তুই কিনা বাভনের লোটা থেকে জল খেতে চাইছিস? ভাগ শালা—

চূড়ান্ত বিরক্তি আর ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সেপাইরা চলতে শুরু করলে। লস্কর লোকটা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে তারপরই তার নির্জীব অবসন্ন গলায় যতখানি সম্ভব জোরে চিৎকার করে উঠলে, বাভন? খুব বাভনাই ফলাচ্ছ, কেমন? তোমাদের কারো জাত থাকবে না সেপাইজী! বাভন চামার মেথর সব এক হয়ে যাবে—

ফেটে-পড়া রাগে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়লে সেপাই ক'জন। এত বড়ো কথা! ব্রাহ্মণ আর চামার এক হয়ে যাবে?

অসুস্থ লস্কর তখন ক্ষ্যাপার মতো বলে চলেছে, আমি অচ্ছুৎ মেথর বলে জ্বরে কাহিল আমার তেষ্টার মুখে একটু জল তোমরা দিলে না সেপাইজী! আমার কাছে না হয় জাত বাঁচালে কিন্তু গোরাদের কাছে হিন্দু মুসলমান কেউ তোমরা জাত বাঁচাতে পারবে? নয়া কিসিমের বন্দুকে তালিম নিচ্ছ না? যে টোটা দাঁতে কেটে বন্দুকের নলে পুরতে শেখাচ্চে, তার কাগজে কোন্ চীজ মাখানো আছে তার খবর নিয়েচ? মোম নয়—বসা। গোরু আর শুয়োরের বসা মিশিয়ে দিয়েচে, বুঝেচ বাভন সেপাইজীরা?

ভূত দেখার মতো আতঙ্কে চোখ বড়ো বড়ো হয়ে গেল সেপাইদের।

লস্কর লোকটা তখন আরো হাঁপাচ্ছে। হাঁপাতে হাঁপাতেই সে বলতে লাগলো, যাও বাভন সেপাইজীরা, গোরুর বসা মাখানো কাগজ দাঁতে কেটে বন্দুক চালিয়ে জাত বাঁচাও গে। তোমাদের

জন্যে গোরু আর মুসলমান সেপাইদের জন্যে শুয়োরের বসার বন্দোবস্ত করেচে কোম্পানি। জাত থাকবে না—হিন্দু মুসলমান কোনো সেপাইয়ের জাত থাকবে না। সবাইকেই ইশাই-ভজা কেরেস্তান করে ছাড়বে—

হাত-পা থরথর্ করে কাঁপতে লাগলো সেপাইদের। কথাটা কি সত্যি? না কি শালা অচ্ছুৎ জানোয়ারটা জল না পেয়ে তাদের জব্দ করবার জন্যে বানিয়ে বানিয়ে বলছে? কি ভয়ঙ্কর কথা! সবায়েরই চোখে-মুখে আতঙ্ক। সত্যিই তো, যে কার্তুজ সরাসরি বন্দুকের নলে পুরে দুশ্‌মনের বুকে টিপ করবার কথা, সেই কার্তুজকে দাঁতে কেটে বন্দুকে পোরার ব্যবস্থা হয়েছে কেন?

জ্বরের তাড়সে লস্কর লোকটা এমনিই কাহিল ছিল। তার ওপর উত্তেজনায় অতখানি চিৎকার করে তখন একেবারে নেতিয়ে পড়েছে। বাদাম গাছের গুঁড়িতে মাথা এলিয়ে দিয়ে সে ঝিম্ মেরে পড়ে রইলো।

কয়েক মুহূর্তের জন্যে সেপাইরা সবাই যেন বোবা হয়ে গেছে। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে সব কটি মুখ। কথাটার কোনো ভিত্তিই যদি না থাকবে তাহলে লস্করটা এত জোর দিয়ে বলবার সাহস পেলো কোথায়?

সবাইকে নিজের জাত-ধর্ম খুইয়ে কেরেস্তান হয়ে যেতে হবে!

ফ্যাকাসে মুখে কাঁপা গলায় একজন সেপাই বললে, ও শালা কার কাছে কথাটা শুনেচে একবার জিজ্ঞেস করে দেখলে হয় না?

কথাটা লস্করের কানে গেল। আবার চোখ মেলে তাকালে সে। চোখ দুটো জবা ফুলের মতো লাল। গলা শুকিয়ে কাঠ। তবু তারই ভেতর তীব্র শ্লেষের সঙ্গে সে বললে, আরে বাভন সেপাইজী, গন্দা সাফাই করতে এই শালা অচ্ছুৎ মেথরকে কাপ্তান, মেজর—সব সাহেবের বাংলোয় যেতে হয়, তা জানো তো? তাদের আলাপ-সালাপের কিছু কিছু খবর আমি রাখি। যাও, লোটা নিয়ে এখন ছাউনিতে যাও, জাত রাখো গে। এখন গরুর বসা চাখিয়ে নিচ্চে, এরপর যখন তোমাদের সবাইকে গোরুর গোস্ত খাওয়াবে, তখন একদিন তোমাদের লোটা থেকে জল খেয়ে আসবো, কেমন?

অদ্ভুত বীভৎসভাবে হাসতে লাগলো লোকটা। প্রবল কাশির দমকে তার হাসি চাপা পড়ে যাচ্ছে, তবুও সে হাসছে।

যে সেপাইরা লড়াইয়ের মাঠে নেমে এ পর্যন্ত কোনোদিন জীবনের পরোয়া করেনি, তারা তখন হঠাৎ এমন বেগে ব্যারাকের উদ্দেশ্যে হাঁটতে শুরু করলে যেন লড়াইয়ে হেরে দুশ্‌মনের হাত থেকে বাঁচার জন্যে মরীয়ার মতো পিছু হটছে।

॥ তেইশ ॥

কয়েক মাস পরে আজ ফুলকির ঘরে এসেছে হরিশ।

খাটের ওপর বাজুতে হেলান দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় গড়গড়া টানতে টানতে আপনমনে সে যেন কী ভাবছে। খাটের অন্য প্রান্তে পা গুটিয়ে বসে কি এক প্রচণ্ড বিস্ময়ে আজ এই বাবুটির মুখের দিক তাকিয়ে আছে ফুলকি। কেবল বিস্ময়ই নয়, আজ তার চাউনিতে পেশা-দুরস্ত বিলোল কটাক্ষের বদলে কেমন যেন একটা মুগ্ধ সন্ত্রস্ত ভাব। তার এই প্রায় বারো বছরের অভ্যস্ত পতিতা-জীবনে হঠাৎ যেন একটা প্রচণ্ড চমক!

অবশ্য চমকটা লেগেছিল ক'দিন আগেই।

কিন্তু যাকে ঘিরে চমক, তারই দেখা নেই। বাবু এবার বেশ অনেকদিন পরে তার ঘরে এসেছে। দরজার কাছে বাবুকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই তার বুকের ভেতরটা সেই যে এক দিশেহারা আনন্দে ছলাৎ করে উঠেছিল, তার জের এখনো যেন কাটেনি!

বাবু আজ যেন তার কাছে একেবারে নতুন!

অথচ গত সাত-আট বছরের ভেতর এই একই মানুষ কতবার তার কাছে এসেছে, তার দেহটাকে নিয়ে পাগলা হাতির মতো মাতামাতি করেছে, শখ মিটিয়ে দাম ধরে দিয়ে চলে গেছে। সব খদ্দেরই তাই করে। এই বাবুর ক্ষেত্রে একটাই কেবল পার্থক্য ছিল—দাম বলে যা দিত তা অন্য খদ্দেরদের চেয়ে বেশি। কখনো হাতে গুঁজে দিত দুটো টাকা, কখনো তিনটে টাকা।

খদ্দের হল লক্ষ্মী। খদ্দের হয়ে যে মানুষটাই আসুক, তাকে খুশি করতে হবে—এই হল এ পেশার চিরকেলে নিয়ম। কী হবে তার নাম-ধাম, জাত-জন্ম দিয়ে? কোনো মেয়েই সে সব নিয়ে মাথা ঘামায় না। তবু এরই ভেতর যাদের কপাল ভালো, তাদের কথা আলাদা। রূপের তেমন চটক থাকলে কোনো না কোনো বাবুর নজরে পড়ে যায় তারা। বশ করে ফেলতে পারলে তো আর কথাই নেই। বাবুর বাঁধা মেয়ে হয়ে কপাল তখন খুলে যায়। আবার তেমন কোনো বড়লোক রইস বাবুর নজরে পড়ে গেলে সারাজীবন এই নরকেও কাটাতে হয় না। বাবু তাকে রক্ষিতা করে উঠিয়ে নিয়ে যায় অন্য কোনো বাড়িতে কিম্বা জায়গা করে দেয় বাগানবাড়িতে। এমন কি বুড়ো বয়সের জন্যে সহায়-সম্পত্তিও কিছু লিখে দেয়! সারাজীবন ধরে ভালো ভালো গয়না-পোশাক-মদ আর ফুর্তির ছড়াছড়ি! কিন্তু তেমন ভাগ্য ক'টা মেয়েরেই বা হয়?

ফুলকি জানে, তেমন ভাগ্য তার অন্তত কোনোদিনই হবে না। যৌবনের জোয়ারে গতরটা যতই উপচে পড়ুক, রূপ না থাকলে তার চৌদ্দ আনাই বিফল। ফুলকির রূপ নেই।

এ পেশার আসল পুঁজি রূপ-যৌবন আর ছলা কলা। ভরভরন্ত বয়স ফুলকির। যৌবনের ঢল তার সর্বাঙ্গে। কিন্তু যেমন তরো রূপের ঝলক থাকলে গতর-মাতাল বেটাছেলের চোখে চড়া নেশা ধরানো যায়, আগুন জ্বালানো যায় তার বুকের ভেতর, তেমন রূপ নিয়ে তো সে আসে নি! তাই কপালকে মেনে নিয়ে মনকেও সে মানিয়ে নিয়েছে। সে জানে, খালাসিটোলার এই বাড়িতেই তাকে কাটাতে হবে সারাজীবন। কিন্তু যেদিন বয়েস হবে, দেহের যৌবনে পড়বে ভাঁটির টান, সেদিন কী হবে? সে কথা ভাবতে গেলেই বুক ছম্‌ছম্‌ করে। কোনো মেয়েই আগে থেকে সে কথা ভেবে মন ভারী করতে চায় না। ফুলকিও করে না। সে বয়েস যখন আসবে তখনই তার কথা ভাবা যাবে। তার এখনো অনেক দেরি!

ফুলকির জানাশোনার ভেতর এই ক'বছরে তিনটে মেয়ের কপাল খুলে গেছে। চার-পাঁচটা বাড়ির পর গোলাপি রঙের দোতলা বাড়িটায় থাকতো মানদা। যেমন রূপ, তেমনি রঙ। কেমন তাড়াতাড়ি এক মল্লিকবাবুর নজরে পড়ে গেল। তাঁরই পোষা মাগী হয়ে চলে গেছে কলুটোলার একটা বাড়িতে। পীরিতের প্রথম ধাক্কাতেই বাড়িটা নাকি মানদার নামে লিখে দিয়েছেন তার বাবু। মানদা ছাড়া আর দু'জন হল বিন্দু আর বাতাসী। তারা দুই বাবুর বাঁধা মাগী হয়ে এই পাড়াতেই অবশ্য আছে। কিন্তু তাদের কপাল যেমন খুলেছে তেমনি খুলেছে ঘর-দোরের জৌলুস। কে বলবে, বছর দুয়েক আগেও তাদের রাস্তায় দাঁড়িয়ে খদ্দের ধরে এনে তবে দুটো ভাতের বন্দোবস্ত করতে হত! এখন বিন্দু আর বাতাসী রয়েছে রাজরাণীর হালে!

আর ফুলকি?

হাজার দীর্ঘশ্বাস ফেলেও বুকের বোঝা হালকা হয় না। হিংসের আগুনে মন পুড়েই চলে। বিন্দু আর বাতাসী দুজনেই তার প্রায় সমবয়সী। অথচ আজ তারা কোথায় আর ফুলকিই বা কোথায়? ওদের বাবুরাও হয়তো আজ না হোক কাল মানদার বাবুর মতো বাড়ি লিখে দেবে, বুড়ো বয়সের দুর্ভাবনা দূর করবে। কিন্তু ফুলকির দিন কাটবে এইভাবে খুচরো খদ্দেরের দয়ার ওপর নির্ভর করে। বাছ-বিচারের কথাই ওঠে না। বাঙালী, বেহারী, ওড়িয়া, ট্যাঁশ ফিরিঙ্গি—যেই আসুক, তার সঙ্গে শুতে হবে।

ফুলকির পাশের বাড়িটাতেই থাকে বিন্দু।

যে চমকের ছোঁয়ায় ফ্‌লকির মনে সেদিন শিহরণ খেলে গেছে, সে চমক বিন্দু মেয়েটাই তাকে দিয়েছিল। বিন্দুর বাবু নিজ মুখে বলেছে তাকে।

ক'মাস পরে আজ ঠিক সন্ধ্যের মুখেই এই বাবুকে দোরগোড়ায় দেখে তাই হঠাৎ বুকের ভেতরটায় ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল ফুলকির। এই সেই মানুষ। বিন্দুর বাবু এ'রই কথা বলেছে!

আজ ফুলকির চলন-বলন একেবারে অন্যরকম। অন্য দিন হলে হয়তো গায়ে ঢলে পড়ে চোখ টিপে অভ্যস্ত রসিকতাই করতো সে, হায় গো লাগর, রাইকিশোরী জুটেচে নাকিনি? লইলে চন্দাবলীর কুঞ্জের পথ এমনধারা ভুলে গেলে ক্যানে গো?

সবই ছক বাঁধা রসিকতা। তবুও এ সব বাসি রসিকতা, রঙ-তামাশা করতেই হয়। খদ্দের তাতে খুশি হয়। খুশি হয়েই যদি ফিরে না গেল তো ফিরে একই দোকানে আবার আসবে কেন? দোকান তো কতই রয়েছে। ফুর্তি কেনা নিয়ে কথা। যে কোনো দোকানে ঢুকে পড়লেই হল।

এই বাবুর সংগেই কতবার ছক-বাঁধা রসিকতা করেছে ফুলকি। একই রসিকতার উত্তরে অন্য খদ্দেরবাবুদের কেউ কেউ আখড়াই গানের সরেস দুটো কলি গেয়ে গাল টিপে দেয়, কেউ বা গতরটাকে নিজের গতরের সংগে লেপটে নিয়ে হ্যা হ্যা করে হাসে। এ বাবু কিন্তু কখনো সে রকম কিছু করেনি। বাবু শুধু হাসতো। তবে হ্যাঁ, মেয়েছেলের উদোম গতর দিয়ে দাপাদাপি করবার তাড়নায় আর পাঁচটা বেটাছেলে যেমন আসে, এ বাবুও তেমনি এসেছে। একই উদ্দেশ্য, একই আচরণ। বরঞ্চ অন্য অনেক বেটাছেলের চেয়ে যেন আরো বেশি দামাল। পরে হাসি পেতো ফুলকির। মেয়েছেলের গতর নিয়ে যে মানুষ এমন অসুরের মতো ক্ষেপে উঠতে পারে, তাকে কি না কত সাধ্যি সাধনায় রাস্তা থেকে একদিন প্রথম শিকার করে আনতে হয়েছিল! বেশ্যাপাড়ায় সেইদিনই বাবুর হাতে খড়ি। নিজের কৃতিত্বে সেইটুকুই যা গর্ব ছিল ফুলকির। তবে সাত-আট বছর আগেকার সে সব স্মৃতি এখন অনেক ঝাপসা হয়ে এসেছে।

আজকের সন্ধ্যেটা ফুলকির একেবারে আলাদা।

সাজগোজ করে সবে সে রাস্তায় যাওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছিল ঠিক সেই সময় বাবু এসে দোরগোড়ায় দাঁড়ালো। হঠাৎ চমকের প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে নিয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় সে কেবল বললে, এসো বাবু! কদ্দিন পরে এলে!

হরিশকে বসতে দিয়েই সংগে সংগে দরজায় হুড়কো এ'টে দিয়েছিল ফুলকি। তামাক সেজে এনে বাবুর হাতে গড়গড়ার নলটা তুলে দিয়ে প্রায় ছুটে যাওয়ার মতোই সে চলে গিয়েছিল ভেতরে তার ছোট্ট ঘরখানায়। আয়না ধরে বেশ কিছুক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছে নিজেকে। প্রতিদিনের নিয়ম মতো আজও আঙুলের ডগায় যৎসামান্য একটু হেজলিন আর পমেটম দিয়েই প্রসাধন সেরে নিয়েছিল সে। তার সংগে সস্তা দরের একটু আতর বেশি করে শাড়িতে দিয়ে নিলে গন্ধে গা ভুরভুর করে। হেজলিন আর পমেটমের দাম বড়ো বেশি। তাই বেশ হিসেব করেই রেখে-সেখে এক একটা শিশিতে অনেকদিন চালাতে হয় তাকে।

আজ কিন্তু সে কথা ভুলে গেল ফুলকি।

আবার নতুন করে শুরু হল তার প্রসাধন। বেশ কিছুটা হেজলিন—পমেটম আঙুলে তুলে নিয়ে সযত্নে আবার মুখে মেখে নিলে। হ্যাঁ, আয়নায় এবার অনেক বেশি ঝকঝকে দেখাচ্ছে তাকে! তোরঙ্গ টেনে বের করলে তার একমাত্র ঢাকাই জামদানি শাড়িখানি। আগের শাড়ি পালটে ঢাকাই শাড়ি পরে বারবার নিজেকে দেখে নিলে আয়নায়। তারপর মদের গেলাস সমেত ট্রে হাতে সামনের ঘরে এলো। মদের বোতল বাবু নিজেই নিয়ে আসে; আজও এনেছে।

ফুলকির প্রসাধনের মিষ্টি গন্ধে আবার ভুর ভুর করে উঠলো ঘর। দু তিন পেগ মদ গলায় ঢেলে দিয়ে হরিশ তামাক টানতে লাগলো।

ফুলকি নীরব।

সেই যে হরিশের পায়ের দিকে খাটের ছত্রী ধরে দাঁড়িয়েছিল, সেই ভাবেই ঠায় দাঁড়িয়ে আছে আর মাঝে মাঝে আড়চোখে হরিশকে দেখছে।

মেয়েটার এই আকস্মিক নীরবতা হরিশের কাছেই কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হল। এক সময় সে বললে, আজ তোমার কী হয়েছে? কোনো কথাই বলচো না যে?

—আজ তোমাকে একটু ভালো করে দেখচি বাবু! —মৃদুস্বরে বললে ফুলকি।

—আমাকে নতুন করে দেখার কী আছে?

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলো ফুলকি। তারপর বললে, তোমার নাম হরিশ মুকুজ্যে?

—হ্যাঁ, লোকে তো তাই বলে। —হাসতে হাসতে বললে হরিশ।

—তুমি অনেক পণ্ডিত নোক? ইংরিজিতে খুব নেকাজোকা করো?

—হ্যাঁ, তা একটু করি। কিন্তু তুমি সে কথা কোত্থেকে শুনলে?

—শুনেচি। হ্যাঁ গা বাবু, তোমার নেকা পড়ে কোম্পানির নাটসাহেব ইস্তক নাকি তোমাকে ভয় পায়?

হেসে ফেললে হরিশ। বললে, ভয় পায় কিনা তা লাটসাহেবই জানে। কিন্তু তোমার তো ভয় পাওয়ার কিছু নেই?

সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে নিজের মনের ভেতর জড়ো হয়ে থাকা প্রশ্নগুলোই করতে লাগলো ফুলকি, হ্যাঁ গা বাবু, কলকেতার বাবু ভেয়েরা সবাই নাকি তোমাকে খুব মান্যি করে?

—সে কথা তাদেরই শুধিয়ে দেখো। আমি কেমন করে বলবো?

পতিতা মেয়েটির চোখে-মুখে এই কৌতূহল আর বিস্ময়ের ভাবটুকু দেখে হরিশের বেশ মজা লাগছিলো।

ফুলকি ততক্ষণে খাটের ছত্রী ছেড়ে দু পা এগিয়ে হরিশের পায়ের দিকে খাটের ওপর উঠে পা গুটিয়ে বসে পড়েছে। এতক্ষণে তার মুখে কথার খৈ ফুটতে শুরু করেছে। সে বলতে লাগলো, আমার পুব ধারের বাড়িটায় বিন্দু নামে আমারই মতো আর এক আবাগী মাগী থাকে, তার এক ইংরিজিনবীশ বাবু জুটেচে। সেই বাবু তোমাকে চেনে গো! একদিন নাকি তোমাকে আমার ঘরে আসতে দেকেচিলো। সেই বাবু তোমার কথা বলেচে বিন্দুকে। আমি শুনেচি বিন্দুর মুয়ে। মাইরি বলচি, বিন্দু যা বললে এত বড়ো কতাটা তো আমার জানা হতনি!

হরিশ মদের গেলাসে চুমুক দিতে দিতে ফুলকির কথাগুলো শুনছিল। —একটু থামতেই সে হেসে বললে, এত বড়ো কথাটা জেনে তোমার কোনো লাভ হল কি?

—আমার কোনো লাভ হল কি না, তা আমি কেমন করে তোমাকে বোঝাব বাবু? আবেগে কাঁপা গলায় ফুলকি বলতে লাগলো, বিন্দুর মুয়ে যেদিন আমি পেত্থম তোমার কতা শুনেচি, সিদিন থেকে দেমাকে আমার বুক ফুলে উঠেচে। এ পাড়ায় তো আরো কত মাগী রয়েচে কিন্তুক আমার মতো এমন ভাগ্যি কার? টাকাওলা বড়োনোক বাবু অনেকেই ধত্তে পারে কিন্তুক এমন দেশজোড়া নামজাদা পণ্ডিত বাবু কার ঘরে যেচে ধরা দিয়েচে?

হরিশ হাসতে হাসতেই বললে, যেচে ধরা দিইনি ফুলকি, তুমিই একদিন রাস্তা থেকে পাকড়াও করে এনেচিলে মনে আছে?

তা এনেচিলুম, সে কথা মানচি। কিন্তুক সিদিন অমনধারা ধরে না আনলে আজ তো আমার এমন ভাগ্যি হতনি?

আবেগে গলা প্রায় ধরে এসেছে ফুলকির। হরিশের পায়ের ওপর ডান হাতে মৃদু চাপ দিয়ে ছুঁয়ে রেখে সে আবার বলতে লাগলো, আর জন্মের পাপে এ জন্মে বেশ্যে মাগী হয়েচি! আমি জন্মো-বেশ্যে নই বাবু! গেরস্ত ঘরের মেয়ে, বাপ বে দিয়েচিল। আট বছর না দশ বছর বয়েসে যেন বেধবা হলুম। তারপর ভরা বয়েসে নিজের মনটাকে আর সামলাতে পারলুমনি। কুলে কালি দিয়ে এক রাতে গাঁয়ের মিত্তির বাড়ির হারাধন মিত্তিরের সঙ্গে কলকেতায় পালিয়ে এলুম।

তারপর মাসখানেক বাদে কোথায় হারাধন আর কোথায় আমি! তার ফুত্তির শখ তো মিটে গিয়েচে, কিন্তুক আমার পেট চালায় কে? আর কোনো পথ না পেয়ে এই পথেই পা দিলুম।

কয়েক মুহূর্তের নীরবতা।

একটা প্রচণ্ড বোবা-ব্যথা হঠাৎ জেগে উঠে উন্মনা বিহ্বল করে দিয়েছে ফুলকিকে। কিন্তু তা ওই কয়েক মুহূর্তের জন্যেই। তারপরই নিজেকে সামলে নিয়ে হরিশের পা আরো নিবিড়ভাবে চেপে ধরে সে বললে, তুমি আমার ঘরে এসো বাবু, য্যাখন খুশি এসো। যিদিন ইচ্ছে হয় পয়সা দিও, যিদিন ইচ্ছে না হয় দিওনি। কিন্তুক আমাকে য্যান একেবারে ভুলে যেয়োনি, তোমার পা ধরে এই আমার আর্জি!

হরিশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। ফুলকির অভিভূত বিহ্বল আবেগ-উচ্ছ্বসিত কম্পনের স্পর্শ তার হাতের ভেতর দিয়ে হরিশের পায়েও এসে যেন লাগছে। ফুলকির মুখে-চোখে এমন একটা ভাব যেন হরিশের ওপর তার একটা অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।

একটু পরে হরিশ বললে, তুমি তো জানো, আমি কখন কোথায় কার কাছে যাবো তার কোনো ঠিক নেই। তবু মাঝে মাঝে তোমার কাছে আসি তার কারণ পয়সা দিয়ে দেহ কেনার অভিজ্ঞতা তোমার কাছেই আমার প্রথম। তাছাড়াও—

কী একটা কথা যেন বলতে গিয়েও থেমে গেল হরিশ। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে ফুলকি বললে, তাছাড়াও আর কী বাবু?

—কিছু নয়।

কথাটা বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিয়ে শুধু একটু ম্লান হাসলে হরিশ। প্রবৃত্তির তাড়নায় অনেক স্ত্রীলোকের কাছেই সে যায় কিন্তু মাঝে মাঝে ছোট বৌয়ের কাছ থেকে পাওয়া রূঢ় আঘাত যখন তাকে দিশেহারা করে তোলে তখন মোক্ষদা নামের এই অতি সাধারণ পতিতা মেয়েটার কাছেই সে ছুটে আসে। আগের রাতেই সে রকম একটা ব্যাপার ঘটেছে।

ফুলকির ঘর দোতলায়।

নীচে রাস্তা দিয়ে সুর করে বেলফুলের মালা হেঁকে চলেছে ফেরিওয়ালা। উলটো দিকের বাড়ি থেকে বেশ সুরেলা নারীকণ্ঠে গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দর পালায় হীরা মালিনীর একটা গান ভেসে আসছে। সেই সঙ্গে ডুগি তবলার বোল আর ঘুঙুরের শব্দ। নাচ-গানের সে শব্দকে ছাপিয়ে রাস্তা থেকে কোনো মাতাল ফিরিঙ্গির নেশা জড়ানো গলায় উচ্চগ্রামে বেসুরো গান ভেসে এলো,—

ইফ্ আই সারভাইভ
আই উইল হ্যাভ ফাইভ
ট্রা—লা—লা—লা—লা—

আজ বাবুকে দেখে দেখে ফুলকির যেন আশ মিটছে না! গান জানে না সে। তা নিয়ে কোনোদিন মাথা ঘামায়নি। কিন্তু আজ তার বড়ো ক্ষোভ হচ্ছে। কেন সে গান গাইতে শেখেনি? নাচ-গান জানা থাকলে শুধু দেহ ছাড়াও এত বড়ো নামজাদা মানুষটাকে সে আরো একটু বেশি তৃপ্তি দিতে পারতো!

হরিশের অন্যমনস্কতার ভেতরেই দরজা খুলে কাকে যেন ডেকে দু'ছড়া বেলফুলের মালা আনিয়ে নিয়েছে ফুলকি। এত রাতেও বাবুর ওঠার নাম নেই দেখে সে বুঝে নিয়েছে, বাবু আজ রাতে থাকবে। বেলফুলের মালা আনার ফাঁকে মাংস, পরোটা আর তার সঙ্গে আরো কী সব খাবার আনানোর ব্যবস্থাও করে রেখে এসেছে।

একটা মদের বোতল শেষ হয়ে গেছে, আর একটা বোতল খুলে গেলাসে কিছুটা মদ ঢেলে নিলে হরিশ। গত কয়েক দিনের ঘটনাগুলো এলোমেলো ভাবে তার মনে এসে ভিড় করছে। চোখের সামনে কখনো ভেসে উঠছে ছোটোবৌয়ের মুখ, কখনো বিপিন বৈরাগীর, কখনো বা

রামগোপালের। একটু আগে ধরা গলায় ফুলকি যখন তার অতীত জীবনের কথা বলছিল তখন চকিতে তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল, গত মাসে সুকিয়াস স্ট্রীটে রাজকৃষ্ণ বাড়ুজ্জের বাড়িতে বিধবা বিবাহের সেই রাতের ছবি। পাশাপাশি আর একখানা করুণ মুখ ভেসে উঠেছিল তার চোখের সামনে—মাধুরীলতা। তার বড়ো আদরের মাধু-মা।

আবার নতুন মদের বোতল খুলতে দেখে মৃদুস্বরে ফুলকি বললে, বিনি চাটেই ত্যাখন থেকে এতখানি নিজ্জলা মদ খেয়ে চলেচো বাবু! একটু কিছু আনিয়ে দিই?

—না! হরিশ মুখুজ্যে নির্জলা মদই খায় মোক্ষদা।

হঠাৎ বুকের ভেতর একটা প্রচণ্ড শিহরণ খেলে গেল ফুলকির। তার নাম যে একদিন মোক্ষদা ছিল, সে কথা সে নিজেও ভুলে গেছে! উত্তেজনায়, রোমাঞ্চে তার বুকের ভেতরটা যেন থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগলো। নারী-দেহের পসরাটুকুকে সম্বল করে যেদিন থেকে এই জীবিকায় সে নেমেছিল, সেইদিন থেকেই মায়া-মমতা, আবেগ-অনুরাগ সব কিছুকেই মন থেকে বিসর্জন দিতে হয়েছে। আবেগ-অনুভূতি নিয়ে এ পেশায় থাকা চলে না। টাকার বিনিময়ে দেহ, দেহের বিনিময়ে টাকা। আবেগের দাম বলে একটা কানাকড়িও কেউ দেবে না। অথচ এই মুহূর্তে বাবুর মুখে ছোটোবেলার সেই মোক্ষদা নামটা শুনে কী এক দিশেহারা উত্তেজনায় তার বুকের ভেতরটা যেন আথালি-পাথালি করছে। হঠাৎ পায়ের কাছ থেকে উঠে হরিশের বুক ঘেঁষে বসে যৌবনের উত্তাপ ছড়িয়ে দিয়ে ধরা গলায় সে বললে, আজ তুমি হঠাৎ আমার ভালো নাম ধরে ডাকলে কেন গো বাবু?

হরিশ কোনো উত্তর দিলে না। ফুলকির উত্তপ্ত নিঃশ্বাস তার চোখে-মুখে লাগছে। দেহের উত্তাপ সঞ্চারিত হচ্ছে শিরায় উপশিরায়।

ফুলকির যেন আর তর সইছে না। নীরব হরিশের মুখখানা দু হাতে ধরে নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে আবার বললে, কেন ও নামে ডাকলে বলো না বাবু?

একটা দুঃসহ বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন স্বরে হরিশ বললে, যেদিন তোমার সঙ্গে প্রথম আলাপ সেদিন তোমার মুখে ওই নামটাই শুনেছিলুম।

দীর্ঘশ্বাস চেপে আবার মদের গেলাস হাতে তুলে নিলে হরিশ।

ফুলকির মুখে তখন খুশির ঝিলিক। হরিশের আধ-শোয়া বুকের ওপর গা এলিয়ে দিয়ে মুচকি হেসে বললে, আমার সঙ্গে পেত্থম আলাপের দিনটা তোমার এখনো মনে আচে? আশ্চয্যি! সে তো কত বচ্চর আগের কতা গো! মাগো মা, কি আনাড়ি-পানাই না করেচিলে সিদিন!

কলকের আগুন নিবে গেছে, তামাক নিঃশেষ। হরিশ বললে, আর একবার তামাক সেজে আনো।

—আনচি।

হরিশের বুকের ওপর মুখখানা একটু ঘষে দিয়ে উঠে পড়লে ফুলকি। তারপর কলকেটা তুলে নিয়ে পেছন ফিরে একটু মুচকি হেসে পাশের ঘরে চলে গেল।

আরো কয়েক চুমুক হুইস্কি নেমে গেল গলা দিয়ে।

গত রাতের স্মৃতি ভেসে উঠছে মনে। ঘটনাগুলো আবার যেন নতুন করে চোখের সামনে ঘটছে।

রাত তখন প্রায় দুটো।

টেবিলে অনেকগুলো কাগজপত্র ছড়িয়ে আপন মনে কাজ করছিল হরিশ। প্রতিদিনের নিয়ম মতো ছোটোবৌ কখন শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। অন্তত হরিশ তাই জানে। কিন্তু সে যে ঘুমোয়নি অথবা কখন তার ঘুম ভেঙে গেছে, কিছুই খেয়াল করেনি হরিশ। সে তখন খস্ খস্ করে লিখে চলেছে। কোম্পানির ফৌজে নেটিব সেপাইদের ভেতর অসন্তোষের বারুদ জমতে শুরু করেছে। ওদিকে ভাগলপুর, দুমকা থেকে বাঁকুড়া বীরভূম পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়া সাঁওতাল

বিদ্রোহকে নির্মম হাতে দমন করা হলেও আগুন যে নিবে যায়নি তার প্রমাণ প্রায় প্রতি সপ্তাহেই পাওয়া যাচ্ছে। রাণীগঞ্জে গোরা সেনাপতিদের বাংলোয় মাঝে মাঝেই গভীর অন্ধকার রাতে উড়ে এসে পড়ছে জ্বলন্ত মশাল। আবার কখনো বা জ্বলন্ত আগুন বয়ে নিয়ে ছুটে এসে পড়ছে সাঁওতালী তীর। চোখ কান বুজে না থাকলে এর মানে বোঝা কিছু কঠিন নয়। কামান বন্দুকের শক্তির কাছে হার মানতে বাধ্য হলেও মনে মনে হার স্বীকার করেনি সেই স্বাধীনতাপ্রিয় আরণ্যক মানুষের দল। সময় আর সুযোগ পেলেই আবার বিদ্রোহ অনিবার্য।

অন্যদিকে ইংরেজের খোদ সেনাবাহিনীতেই চাপা বিক্ষোভের উত্তাপ।

ডালহৌসির অযোধ্যা দখলের পর থেকেই বিক্ষোভ বড়ো দ্রুত উত্তাপ সঞ্চয় করে চলেছে। নেটিব সেপাই মহল বিভ্রান্ত, শঙ্কিত, বিক্ষুব্ধ। ক্ষমতার মদমত্ততায় কোম্পানি সরকার আত্মহারা। সে বুঝতে পারছে না নেটিব সেনাবাহিনীতে সঞ্চিত হচ্ছে বারুদের স্তূপ।

দ্রুত হাতে লিখে চলেছে হরিশ। হঠাৎ তার হাতের ওপর আর একখানা নরম হাতের কঠিন চাপ পড়লো। কলমটা ছিটকে গেল হাত থেকে—এলোমেলো কয়েকটা আঁচড় পড়ে গেল পাণ্ডুলিপিতে।

—এ কি, হাত চেপে ধরলে কেন?

কঠিন, ভয়াল দৃষ্টি ছোটবৌয়ের। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে। দাঁতে দাঁত চেপে সে বললে, তার আগে বলো, আমাকে বে করেচিলে কেন?

এই ক'বছরে এই একই প্রশ্নের উত্তর কতবার দিতে হয়েছে হরিশকে।

প্রথমদিকে সে উত্তরের ভাষায় মিশে থাকতো কিছুটা অসহায় সহানুভূতি। তারপর মাসের পর মাস কেটেছে, বছরের পর বছর। কোথায় মিলিয়ে গেছে সেই সহানুভূতি! উত্তরের ভাষা হয়েছে কঠোর, কথার প্রতিটি শব্দে ঝরে পড়েছে নির্মম ঔদাসীন্য। ছোটবৌয়ের রুচিহীন তীব্র শ্লেষ-ব্যঙ্গ আর অবহেলা দিনে দিনে হরিশকেও করে তুলেছে নিষ্ঠুর।

ছোটোবৌ তখনো হরিশের হাতখানা চেপে ধরে আছে। তার হাতখানা যে কাঁপছে তাও বুঝতে পারছে হরিশ। কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় তখন তার নেই। সজোরে ছোটো-বৌয়ের হাত সরিয়ে দিয়ে সে বললে, তোমাকে আমি বারবার বলেচি, লেখার সময় আমাকে বিরক্ত করো না, তুমি কি কিছুতেই সে কথা শুনবে না?

—নেকা! নেকা! নেকা! —খপ্ করে পাণ্ডুলিপির কাগজগুলো টেবিল থেকে তুলে নিয়ে পাগলের মতো ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেললে ছোটোবৌ। তার এলো খোঁপা খুলে পড়েছে, লুটিয়ে পড়েছে বুকের আঁচল—কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। দু'চোখে আগুন জ্বলছে। যেন বন্ধ উন্মাদিনী।

—ছোটোবৌ! —তীব্র স্বরে গর্জন করে উঠলো হরিশ, এটা কী করলে তুমি?

—বেশ করেচি। আমাকে নিয়ে তুমি যা করেচ তাই করলুম।—হাঁপাতে হাঁপাতে বললে ছোটোবৌ, তুমি ইংরিজিনবীশ পণ্ডিত নোক, তাই না? কত নাম ডাক, কতো জৌলুষ! থুঃ থুঃ, ঘরের মাগে পণ্ডিতের মন ওঠে না তাই বাজারের রেণ্ডি মাগী চাই! বাজারের নটী না হলে বাবুর ফুর্তির ফোয়ারা ছোটে না, বাঈজী মাগীদের দাপনা না দেখলে অঙ্গ শেতল হয় না কেমন?

—সবই তুমি যখন জানো, তখন নতুন করে আমাকে শুধিয়ে লাভ কী?

—কেন তা হবে? কেন হবে? কেন? কেন? কেন?

ছোটোবৌ তখন দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা। মুহূর্তের ভেতর টেবিলের ওপর থেকে একটার পর একটা বই টেনে নিয়ে সে ছিঁড়তে লাগলো। হরিশ বাধা দিতেই প্রচণ্ড জোরে তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে। তারপর টেবিলের ওপর হাতের কাছে যা পেলো সব ছুঁড়ে ফেলতে লাগলো। দোয়াতদানটা ছিটকে গিয়ে লাগলো হরিশের বুকে। কালিতে মাখামাখি হয়ে গেল সর্বাঙ্গ। ঘরময় বইয়ের ছেঁড়া পাতা, কাগজ আর কালির ছড়াছড়ি। বেশ খানিকটা কালি ছিটকে গিয়ে পড়লো বিছানার

ধব্‌ধবে সাদা চাদরে। ছোটোবৌয়ের উন্মাদ হাতের ধাক্কায় সেজবাতিটা উলটে পড়ে গেল মেঝের ওপর। ঝন্ ঝন্ করে ভেঙে গেল কাচের চিমনি।

সমস্ত ঘর অন্ধকার।

ব্যাপারটা ঘটে গেল কয়েক পলকের ভেতর। ছোটোবৌয়ের স্বভাব জানা থাকা সত্ত্বেও হঠাৎ এই ধরনের একটা ঘটনায় হরিশও কয়েক মুহূর্তের জন্যে হতচকিত হয়ে পড়েছিল।

—কেন আমাকে বে' করেচিলে? কেন? —কেন? —কেন?

আবার সেই একই প্রশ্ন।

নিরুত্তর হরিশের মুখের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে এবার ছুটে এলো ছোটোবৌ। হরিশের বুকের কাছে কামিজ মুঠো করে ধরে দেহের সমস্ত শক্তিতে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বলতে লাগলো, কেন আমাকে এমন করে দূরে ঠেলে দিয়েচ? কেন? কেন?

নিরুত্তাপ, নিষ্প্রাণ স্বরে হরিশ বললে, আমি ঠেলে দিইনি ছোটোবৌ, তুমি নিজেই নিজেকে সরিয়ে নিয়েচ।

—মিছে কথা! —ফুঁসে চিৎকার করে উঠলে ছোটোবৌ। —সেই মোক্ষদা সব্বোনাশীই আমার এই সব্বোনাশ করে রেখে গিয়েচে।

—ছোটোবৌ! —প্রচণ্ড গর্জন করে উঠলো হরিশ। —তার নাম তুমি উচ্চারণ করো না।

—করবো, একশোবার করবো। পিরিতের মুয়ে আগুন! এতই যদি পিরিতের বহর তো তারই সঙ্গে চিতেয় উঠে ওপারে গিয়ে এক বিছানায় শুতে পারোনি? আমারও জ্বালা জুড়োতো!

কোনো কথা না বলে ছোটোবৌয়ের অন্ধকারে আবছা দেহটার দিকে একবার শুধু তাকালে হরিশ। দেহ ছাড়া দাম্পত্য জীবনের অন্য কোনো অনুভূতিই যার কাছে মূল্যহীন, তাকে এ কথার উত্তর দিয়ে লাভ কী?

ঝর্ ঝর্ করে কাঁদতে কাঁদতে বিছানার ওপর গিয়ে আছড়ে পড়লো ছোটোবৌ। তার কান্নার শব্দ কানে বাজতে লাগলো।

অন্ধকারেই আস্তে আস্তে দেওয়াল আলমারির কাছে এগিয়ে গেল হরিশ। হাতের সামনে যে বোতলটা পেলো সেইটে খুলেই ঢক্‌ঢক্ করে বেশ কিছুটা মদ গলায় ঢেলে দিয়ে উত্তরের জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালে সে। একটা [illegible] খুলে দিতেই হু হু করে পৌষের হিমেল হাওয়া এসে গায়ে লাগলো।

মোক্ষদার সেই পাখির মতো নরম তুলতুলে দেহটা আজ কত বছর হয়ে গেল তার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে! কিন্তু সে কি কেবল তার উদ্ভিন্ন যৌবনের আকর্ষণটুকু দিয়েই হরিশকে জয় করেছিল? এই ছোটোবৌকে হরিশ কেমন করে বোঝাবে যে, দেহ-মনের যা কিছু অনুভূতি সব একাকার হয়ে গিয়েছিল তার প্রেমে। নিজের সত্তার সর্বস্ব উজাড় করে দিয়েই হরিশের সর্বস্ব অধিকার করে নিতে পেরেছিল সে। তার প্রেম ছিল উজ্জীবনী মন্ত্রের মতো। বেঁচে থাকার কি ব্যাকুল বাসনা ছিল তার! হরিশকে ছেড়ে চলে যাওয়ার কথায় যার চোখে জল এসে যেতো, সে-ই কত তাড়াতাড়ি হরিশকে নিঃসঙ্গ করে দিয়ে চলে গেল! কি মর্মান্তিক হাহাকারে চিরদিনের মতো নিস্তব্ধ হয়ে গেল তার প্রাণশক্তিটুকু!

তার পাশে এই ছোটোবৌ?

মানিয়ে নেওয়ার বহু চেষ্টা করেছে হরিশ কিন্তু পারেনি।

অথবা মোক্ষদার স্মৃতি কিছুতেই তাকে মানিয়ে নিতে দেয়নি? কোনটা সত্যি?

হরিশ নিজে অন্তত জানে, অন্য সব অনুভূতির মতো তার দেহ-কামনাও বড়ো প্রবল, প্রচণ্ড। মোক্ষদা তার বুকে মুখ গুঁজে গভীর আবেগে বলতো, তুমি অসুর। কিন্তু প্রথম তারুণ্যের স্বল্পস্থায়ী দাম্পত্য জীবনে হরিশের সেই উগ্র প্রচণ্ড আসঙ্গলিপ্সাকে স্নিগ্ধ শীতলতায় পরিপূর্ণ করে দেওয়ার ক্ষমতা সে-ই রাখতো।

না, আজকের এই পরিবর্তিত পরিণতির জন্যে এই ছোটোবৌকেও দায়ী করতে পারে না হরিশ। দায়ী সে নিজে। উদ্দাম প্রবৃত্তিকে সে বশে রাখতে পারেনি!

দ্বিতীয় বিবাহের পর নিজেকে সংযত করবার বহু চেষ্টা করেছে হরিশ। নতুন ছোটোবৌয়ের ভেতরেই খুঁজে নিতে চেয়েছে সান্ত্বনা আর তৃপ্তি।

কিন্তু কোথায় সান্ত্বনা? কোথায় তৃপ্তি? অগ্নি সাক্ষী করা কয়েকটা মন্ত্রের অধিকারে অনায়াসলভ্য হয়েছে একটি যুবতী নারীদেহ, কিন্তু কোথায় অন্তরের সেই স্নিগ্ধ স্পর্শ? কোথায় সেই সহমর্মী কল্যাণী হৃদয়?

পর পর কেবল কতগুলো শূন্যের অঙ্ক!

বন্ধ্যা বলে শাশুড়ি, বড়োজা, পাড়াপড়শি—সবায়ের কাছেই নিষ্ঠুর গঞ্জনা সইতে হয়েছে ছোটবৌকে। এক সময় সমবেদনার স্পর্শ দিয়ে তাকে সেই গ্লানি ভুলিয়ে দিতে চেষ্টা করেছে হরিশ। কিন্তু নিষ্ফল সে চেষ্টা। উলটে আঘাত পেতে হয়েছে তাকে। স্বামীর সহানুভূতিকে বিদ্রূপ বলে মনে করেছে ছোটোবৌ। তীব্র ব্যঙ্গে হরিশকে সে করেছে জর্জরিত। তারপর ব্যবধানের প্রাচীরটা একটু একটু করে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। একই বিছানায় শুয়ে কেটেছে রাতের পর রাত। দেহের কামনা উত্তাল কিন্তু অন্তরে একটা প্রবল বিতৃষ্ণা। আর ছোটোবৌ হয়তো আত্মধিক্কারেই নিজেকে একেবারে সঙ্কুচিত করে নিয়েছিল। আজ এই ক'বছরে একদিকে সেই আত্মধিক্কার আর অন্যদিকে ব্যর্থ যৌবনের হাহাকার মিলে মিশে রূপান্তরিত হয়েছে এক বীভৎস জ্বালায়।

—তামাক সেজে এনেচি বাবু!

হঠাৎ ফুলকির গলা শুনে সম্বিত ফিরে পেলো হরিশ।

—আনমনা হয়ে কী অত ভাবচো গো বাবু? নেকার কতা? মা গো মা, সেই কখন কলকে সেজে এনে বসিয়ে দিয়েচি, তোমার হুঁশই নেই! কী ভাবচিলে গা?

সে তুমি বুঝবে না।

সটকা টেনে নিয়ে আবার তামাক টানতে শুরু করলো হরিশ। দু'এক টান দিয়ে বললে, আজ রাতে বাড়ি যাবো না, এখানেই থাকবো।

—তা আমি জানি। আমি খাবার-দাবার আনতে দিয়েচি।

রাত যত বাড়ছে, এ পল্লীর জীবনে যে ততই বেশি জোয়ারের ঢেউ লাগছে। নারীকন্ঠের খিল্‌খিল্‌ হাসি, গান, ঝগড়া, মাতালের চিৎকার, ছক্কোড় গাড়ির শব্দ, ফেরিওয়ালার হাঁক—আরো কত কী!

এই পরিবেশে এই মুহূর্তে কেন যে হঠাৎ প্রৌঢ় বিপিন বৈরাগীর মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠলো, নিজেই তা বুঝতে পারলে না হরিশ।

উদাসী বিপিন বৈরাগী মাসে একটা দিন করে আসে।

শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই, বর্ষা নেই—রোজ ভোরে টহল দিয়ে সে নামগান শুনিয়ে যায় বলে পাড়ার কেউ কেউ মাসকাবারে এক আনা, দু'আনা যাহোক কিছু দেয়। হরিশ দেয় একটা করে টাকা।

যে যাই দিক, হাসিমুখে হাত পেতে নিয়ে কপালে ঠেকায় লোকটা। হসিটুকু যেন মুখের একটা অঙ্গেরই মতো।

একদিন হাসতে হাসতেই বিপিন বলেছিল, আচ্ছা ছোটঠাউর, তুমি তো বেহ্ম হয়ে গিয়েচ, তুমি আমাকে ভিক্কে দাও কেন বলো দিকিনি?

হরিশও হেসে বললে, বাড়িতে তো দুর্গোৎসবও করি।

—সে তো তুমি যেচে করো না, মাঠাকরুণের ইচ্ছেয় করো, তা আমি জানি। সত্যি কথা বলতে কি ছোট্‌ঠাউর, মাঝে মাঝে আশ্চায্যি হয়ে আমি ভাবি, বেহ্ম হয়েও তুমি মাসান্তে আমাকে ভিক্কে

দিয়ে চলেচ, তাও আবার হিন্দু গেরস্তদের চেয়ে ষোলো আনা বেশি—একেবারে একটা টাকা! এটা কেমন করে হয়?

হরিশ আরো একটু হেসে বললে, তাহলে বুঝতেই পারচো গোঁসাই, খাঁটি ব্রাহ্ম আমি বোধহয় হতে পারিনি।

স্নিগ্ধ, প্রশান্ত দৃষ্টি ফুটে উঠলো বিপিন বৈরাগীর চোখে। হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে সে বললে, এইটে তো ঠিক বললেনি ছোটঠাউর! আমার গোরাচাঁদের দুনিয়ায় আসল তত্ত্ব একবার যার মরমে পশেচে, তার কি আর ভেদাভেদ জ্ঞান থাকে গো?

আসল তত্ত্ব!

বিপিন বৈরাগীর সেই কথাটা মনে পড়তেই আপনমনে একটু হাসলে হরিশ! সামনে প্রায় ফুরিয়ে আসা হুইস্কির বোতল, পাশে পানপাত্র, অদূরে দেহসম্ভোগের উপচার নিয়ে প্রস্তুত এক বারবণিতা যুবতী।

আপনমনে হেসেই পানপাত্রে আবার কিছুটা পানীয় ঢেলে নিলে হরিশ। বিপিন বৈরাগী তার এ চেহারাটা তো দেখেনি।

কয়েকদিন আগে কামারহাটিতে রামগোপাল ঘোষের বাড়িতে একটা মজলিশ বসেছিল। কিশোরীচাঁদ, গিরীশ আর শম্ভুনাথ তো হাজির ছিলই, আরো হাজির ছিল কিশোরীর বন্ধু পুলিশ কোর্টের দোভাষী ক্যাপটিভ লেডির কবি মধুসূদন। রামগোপাল আর প্যারীচাঁদ মিত্তিরের বিশেষ আগ্রহে কৃষ্ণনগরের রামতনু লাহিড়ী মশাইও উপস্থিত ছিলেন সে মজলিশে।

নিমন্ত্রণ মানেই ভোজন এবং পান।

কিশোরীচাঁদের বন্ধু মধুসূদন চেনে না, এমন কোনো মদ নেই। রয়ে সয়ে পান করাও তার কুষ্ঠিতে নেই। সেই মধু পর্যন্ত হরিশের মদ খাওয়ার বহর দেখে হতবাক্।

এক সময় ক্রোধে, বিরক্তিতে কঠিন হয়ে উঠলো রামগোপালের মুখ। ডিরোজিও শিষ্য রামগোপাল প্রথম যৌবনে যথেষ্ট মদ্যপান করেছেন, এখনো করেন। কিন্তু নেশাকে তিনি হরিশের মতো এমন রাশছাড়া হতে দেননি।

শেষ পর্যন্ত বিরক্তি আর উত্তেজনায় শুদ্ধাচারী রামতনুবাবুর সামনেই হরিশকে তীব্র ভর্ৎসনা করলেন রামগোপাল, আজ তুমি আমার অতিথি, তোমাকে কিছু বলা আমার পক্ষে শোভন নয় হরিশ। কিন্তু তোমার অমিতাচারের নমুনা দেখে একটা কথা তো কিছুতেই না বলে আমি পারচি নে। তুমি কি বুঝতে পারো না, দেশের প্রয়োজনে তোমার জীবন কত মূল্যবান? এইভাবে যেচে অকালমৃত্যুকে ডেকে আনচো কেন?

হরিশ নিরুত্তর।

রামগোপালকে সে নিজের বড়ো ভাইয়ের মতোই দেখে। নিজের ত্রুটির কথাও সে বুঝতে পারে। কিন্তু নিজের মদ্যাসক্তির ওপর আজ আর তার নিয়ন্ত্রণ নেই!

হরিশের পিঠে হাত রেখে এবার সস্নেহে রামগোপাল বললেন, এই যে সামনে বসে আছেন রামতনুবাবু—ইনি ঋষিকল্প ব্যক্তি তা তো তুমি জান হরিশ! আমরা পুজো করে ঠাকুর দেবতার চন্নামেত্য খাই। আমার বিশ্বাস, রামতনুবাবুর পাদোদক খেলেও আমাদের পুণ্য হতে পারে। এঁর সামনে তুমি প্রতিজ্ঞা করো যে, ভবিষ্যতে আর কখনো বেহিসেবি ভাবে মদ্যপান করবে না?

করুণ চোখে তাকালো হরিশ। মৃদুস্বরে বললে, দাদা, আপনি তো জানেন মিছে কথা আমি বলি নে। আমি অপরাধ স্বীকার করচি, কিন্তু যে প্রতিজ্ঞা করে তার মর্যাদা আমি রাখতে পারবো না, তেমন প্রতিজ্ঞার কথা বলে আমাকে আরো অপরাধী করবেন না!

একটু পরে হরিশকে বাইরে ডেকে নিয়ে গেলেন রামগোপাল। একটু ইতস্তত করে বললেন, একটা কথা সরাসরি তোমাকে জিজ্ঞেস করতে আমার স্বাভাবিকভাবেই সঙ্কোচ বোধ হচ্ছে হরিশ।

কিন্তু দেশ এবং পেট্রিয়ট কাগজের স্বার্থের কথাটা ভেবেই সেটা আমাকে করতে হচ্চে। শুনতে পাই, তোমার পতিতালয়ে যাতায়াত হালফিল যথেষ্ট বেড়ে গিয়েচে? তাও আবার নিকৃষ্ট শ্রেণীর?

—আপনি যা শুনেচেন তা সত্যি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন রামগোপাল। আর কোনো প্রশ্ন না করে শুধু বললেন, সব বিষয়েই তুমি বড় এক্সট্রিমিস্ট হরিশ। এই জন্যেই তোমাকে নিয়ে আমার বড়ো ভয় হয়। সবে বত্রিশ-তেত্রিশ বছর বয়েস, বাকী জীবনটা সামনে পড়ে আছে। দেশ তোমার কাছে অনেক কিছু প্রত্যাশা করে। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্চিনে; শুধু একটা অনুরোধ, সব কিছুরই চরমে গিয়ে একটা মারাত্মক ক্ষতি ডেকে এনো না!

রামগোপালের সেদিনকার কথাগুলো কানে বাজছে। অন্তর থেকে স্নেহ করেন বলেই এ কথা এমন করে বলেছিলেন তিনি।

—বাবু, খালি পেটে আর মদ গিলোনি। মাংস পরোটা আনিয়ে রেকেচি তাই নয় এটুকুন খেয়ে তারপর মদ খাও!

ফুলকির মুখের দিকে ফিরে তাকালে হরিশ। আলো পড়ে তার নাকছাবিটা চিক্‌চিক্ করছে। তার চেয়েও যেন চিক্‌চিক্ করছে তার চোখ দুটো। একটা পতিতা মেয়ের চোখে কি সুন্দর এক টুকরো মমতার স্পর্শ!

রামগোপালের বলা কথাগুলো ভাবতে ভাবতে অভ্যাসবশেই অজ্ঞাতে মদের গেলাসে চুমুক দিয়েছিল হরিশ। ফুলকির দিকে তাকিয়ে কেমন একটু বিশীর্ণ হাসি হেসে বললে, আচ্ছা, তোমার নিষেধই মানলুম। এখন আর খাবো না।

খুশিতে বুক ভরে উঠলো ফুলকির। এত বড়ো পণ্ডিত মানুষ তার মতো একটা নষ্ট মেয়ের কথা মানছে।

কয়েক মুহূর্ত ফুলকির মুখের দিকে তাকিয়ে তার খুশিভরা চাউনিটুকু উপভোগ করলে হরিশ। এতেও যেন কী একটা তৃপ্তি!

আবার চোখের সামনে ভেসে উঠছে বিপিন বৈরাগীর মুখ।

বিপিন একদিন বলেছিল, ভাঁটির টানে তো যেমন তেমন মাঝিও নৌকো ভাসাতে পারে ছোটঠাউর, কিন্তুক উজোন গাঙে পারে ক'জন? তুমি তো বাপু সেই উজোন গাঙেই নৌকো ভাসিয়েচ শুনি!

সে সময়টা লর্ড ডালহৌসির বিরুদ্ধে হরিশের কলম বেশ জোর কদমেই চলছে। বিপিন কী মনে করে কথাটা বলেছে বুঝতে না পেরে হরিশ বললে, তোমার কথা তো আমার বোধগম্য হল না গোঁসাই? কোন্‌টা উজোন গাঙ?

—কেন ছলনা কচ্চো ছোটঠাউর? তুমি ভালো করেই জানো কোন্‌টা উজোন গাঙ। বাবুভেয়েরা সব্বাই যে সোতে গা ভাসিয়ে দিয়েচে, তুমি তো সে সোতে গা ভাসাওনি গো! তুমি তো আচ্ছামতে রুকে দাঁড়িয়েচ।

তুমি কি পেট্রিয়ট পড়ো নাকি?

—কী যে বলো ছোটঠাউর! আমি মুখ্যুসুখ্যু বৈরিগী মানুষ, তোমার ইংরিজি নেকা আমি কি পড়তে পারি? রইলোই বা ভাষার বাধা, কিন্তু ভাবের দুনিয়ায় তো কোনো বাধা নেই গো? তুমি যা নিকে চলেচ তার ভাব কি আর অপ্পকট আচে ভেবেচ? নোকের মুখে মুখে ঘুরে বেড়ায়। নাট সায়েবের গা-জোয়ারি আইন কানুনকে তুমি আচ্ছা ঠোকান ঠুকচো, সব্বাই সে কতা শুনেচে, তাই আমিও শুনেচি।

একটু থেমে বিপিন আবার বললে, নিকে যাও ছোট্‌ঠাউর, নিকে যাও! সব্বাই শুনি বিলিতি মালিকের তোয়াজ করে যে যার আখের গুছিয়ে নিয়ে চলেচে। তাদের কত রমরমা, কত জৌলুষের

ভেলকি! তাদের দলে না ভিড়ে তুমি যে স্রোতের উজোনে চলেচ তা ভাবতেই আমার পুলক হয় ছোটঠাউর! তোমার কথা আমি যে কতজনাকে বলি!

আসল তত্ত্ব! উজান স্রোতের মাঝি!

নিরক্ষর বিপিন বৈরাগীর আন্তরিক বিশ্বাস, আসল তত্ত্বকে জেনেছে বলেই ভেদবুদ্ধির ঊর্ধ্বে উঠে গেছে তার ছোটঠাউর। তার ভাষায়, উজোন গাঙে নৌকো ভাসিয়েছে হরিশ।

হ্যাঁ, নৌকো সে উজানেই ভাসিয়েছে। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের হোমরা চোমরা রাজা-মহারাজা কর্মকর্তারা তো বটেই, অন্যান্য এজুকেটেড নেটিব বন্ধুদের অনেকের সঙ্গেই তার মতে মেলে না। তাঁরা শুধু টৌন হলে বক্তৃতা করে কোম্পানি সরকারের কাছে আবেদন করতে পারলেই খুশি। এমন কি, যে রামগোপাল কিছুদিন আগে পর্যন্ত-ও বক্তৃতায়, লেখায়, শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়কে কাঁপিয়ে দিয়েছেন, তিনিও আজকাল কত নরম হয়ে গেছেন! রামগোপাল মডারেট হয়েছেন দেখে জোড়াসাঁকো, পাথুরেঘাটা, শোভাবাজার খিদিরপুরের রাজা-জমিদারেরা কত যে খুশি!

হরিশের উজোনমুখো নৌকোর গলুইকে ভাঁটিমুখো করতে চেয়েছিলেন ডালহৌসি। পেট্রিয়টের পৃষ্ঠায় দিনের পর দিন কড়া সমালোচনায় উত্যক্ত হয়ে বাঙলার লেপ্টেন্যান্ট গবর্নর ফ্রেডরিক হ্যালিডেকে একান্ত গোপনীয় একখানি চিঠি লিখেছিলেন দোর্দণ্ডপ্রতাপ লর্ড ডালহৌসি। —হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক ওই বিরক্তিকর দুর্মুখ নেটিবটাকে বেশ মোটামাইনের বড়ো সড়ো রকম একটা পদে বসিয়ে দিয়ে ওর মুখ বন্ধ করা যায় না?

সত্যিই একটা প্রস্তাব এসেছিল হরিশের কাছে। শ্বেতাঙ্গ মালিকের বহুল প্রচারিত ইংরিজি দৈনিক পত্রে সহকারী সম্পাদকের পদ। মাইনের অঙ্ক তার বর্তমান মাইনের চারগুণ।

ধুরন্ধর গবর্নর জেনারেল ডালহৌসির গোপন অভিপ্রায়ের বিন্দু বিসর্গও তখন জানে না হরিশ। জানে না, একজন বেয়াড়া নেটিব কলমচিকে বঁড়শিতে গেঁথে তোলার জন্যে সে টোপ ফেলেছেন বেলভেডিয়ার হাউস থেকে হ্যালিডে।

তাতে অবশ্য কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হয়নি হরিশের।

প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করে সেদিন সবিনয়ে এই কথাই সে জানিয়েছিল যে, তার মতো সামান্য একজন নেটিবকে অত বড়ো সংবাদপত্রে প্রত্যাশার অতীত বেতনের অঙ্কে নিয়োগের প্রস্তাবে কর্তৃপক্ষকে সে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে, কিন্তু আন্তরিক দুঃখের সঙ্গে এ কথাও জানাচ্ছে যে, কর্তৃপক্ষের এই সদয় প্রস্তাব গ্রহণে সে অক্ষম।

তার এই প্রত্যাখ্যানের প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল, তা জানতে পারেনি হরিশ। জানার কোনো চেষ্টাও করেনি। হয় তো আর কোনো উদ্যমও দেখাননি ডালহৌসি। তাঁর কার্যকাল তখন প্রায় শেষ হয়েছে। নতুন গবর্নর জেনারেল হয়ে কলকাতায় আসছেন লর্ড ভাইকাউন্ট ক্যানিং। তিনি মাদ্রাজে পৌঁছে গেছেন। সেখান থেকে কলকাতায় এসে পৌঁছতে যে কদিন সময়। হয়তো সেই জন্যেই একটু নির্লিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন ডালহৌসি। নইলে মাত্র আট বছরের ভেতর ভারতের এতগুলো পরাক্রান্ত সামন্তরাজ্যকে যিনি ব্রিটিশ সিংহের সামনে নতজানু করাতে পেরেছেন, তিনি সামান্য একটা নেটিবের এত বড়ো ঔদ্ধত্যকে খর্ব করবার চূড়ান্ত চেষ্টার কসুর নিশ্চয়ই করতেন না।

কাহিনী আর সে পর্যন্ত গড়ায়নি।

লীপ ইয়ার গেছে গত বছর। ফেব্রুয়ারি মাসের ঊনতিরিশ তারিখে সূর্যাস্তের একটু আগে নতুন গবর্নর জেনারেলের জাহাজ এসে ভিড়লো চাঁদপাল ঘাটে। জাহাজ থেকে নেমেই গবর্নমেন্ট হাউসে গিয়ে তখনি গবর্নর জেনারেল হিসেবে শপথ গ্রহণ করলেন লর্ড ক্যানিং। দায়িত্ব শেষ হল ডালহৌসির।

সেদিনটা ছিল শুক্রবার।

তার আগের দিনই বেরিয়েছে সে সপ্তাহের হিন্দু পেট্রিয়ট। কটাক্ষ বেশ ভালোভাবেই ছিল

ডালহৌসির ওপর। কিন্তু মনের ক্ষোভ মনে চেপে রেখেই এ দেশ থেকে বিদায় নিতে হল তাঁকে। স্পর্ধিত নেটিবটার ওপর প্রতিশোধ নিয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হয়নি।

এর কয়েকদিন পরেই কর্নেল চ্যাম্পনিজের মুখ থেকে ডালহৌসি আর হ্যালিডের সেই চক্রান্তের রহস্যটা জানতে পারে হরিশ। কর্নেল চ্যাম্পনিজ এমন একজন বিশ্বস্ত বন্ধুর কাছে খবরটা শুনেছিলেন, যাঁর বেলভেডিয়ারে নিয়মিত যাতায়াত আছে।

হরিশের কাছে যখন প্রস্তাবটা আসে, তখনই সেটা জেনেছিলেন কর্নেল চ্যাম্পনিজ। হরিশ নিজেই তাঁকে বলেছে। তিনি অবশ্য হরিশের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ওপর কোনো কথা বলেননি। কিন্তু প্রস্তাবটা হরিশ প্রত্যাখ্যান করবার পর মনে মনে তিনি প্রচণ্ড খুশি হয়েছিলেন। তারপর যেদিন চক্রান্তের রহস্যটা তাঁর কাছে ফাঁস হল, সেদিন কেবল খুশিই নয়, আনন্দে অধীর হয়ে উঠেছিলেন তিনি। মোটা মাইনের টোপ গিলে হরিশ যে ওদের শিকারে পরিণত হয়নি—কর্নেল চ্যাম্পনিজের কাছে সেটা হয়ে দাঁড়ালো একটা বিজয় গর্বের মতো। নিজের বাড়িতে ডিনারে নিমন্ত্রণ করলেন তিনি হরিশকে। তা তিনি আগেও অনেকবার করেছেন। কিন্তু এবারের সমস্ত ব্যাপারটাই যেন আলাদা। এইটেই তাঁর সবচেয়ে বড়ো গর্ব যে, মানুষ চিনতে তাঁর ভুল হয়নি। অবশ্য বাইরে ঠাট্টার সুরে বলেছিলেন, তোমার দ্বারা কিছু হবে না হরিশ। হাজার বারোশো টাকা মাইনের চাকরি যেচে এলো আর তুমি কিনা সেটাকে হেলাফেলা করে অডিট আপিসের এই তিন শো টাকা মাইনের চাকরিতেই পড়ে রইলে?

হঠাৎ একটা বিশ্রী, কর্কশ নারীকণ্ঠের চিৎকারে চিন্তাসূত্র কেটে গেল হরিশের। বাইরের দালানে চিৎকার করছে মেয়েটা। গালিগালাজ করছে কোনো পুরুষমানুষকে। খিস্তি-খেউড়ের ছড়াছড়ি।

ফুলকির মুখখানা কেমন যেন অপ্রতিভ হয়ে গেল। সে তাড়াতাড়ি বললে, উদিকে তুমি কান দিওনি বাবু, ও প্রায় নিত্যি তিরিশদিন লেগেই আচে। মিন্সেটা সদুর ভাতার। সে-ই নিজের মাগকে এ পথে নামিয়েচিল।

নিজের বে' করা পরিবারকে?

—তাই তো শুনি। আবার একটা মাগীকে বে করেচে। নজ্জার মাতা খেয়ে ওই সদুর কাচেই আবার ফুর্ত্তি নুটতে আসে।

চুপ করে রইলো হরিশ।

তার মুখের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে ফুলকি বললে, রাত অনেক হয়েচে বাবু, এবার যা হোক কিছু একটু খেয়ে নিলে হত নি?

—দাও।

এক ঝলক তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠলো ফুলকির মুখে। বললে, এখুনি আনচি।

॥ চব্বিশ ॥

স্ফুলিঙ্গ থেকে প্রধূমিত বহ্নিশিখার সঞ্চার! তারপর একদিন সেই শিখা থেকে লেলিহান দাবানল। পাঁচজন সেপাইয়ের মুখ থেকে দশজন, দশজন থেকে একশোজন—নিমেষে একশো থেকে হাজার—হাজার থেকে কয়েক হাজার। দমদম পল্টন ছাউনিতে জানুয়ারির এক শান্ত দুপুরে কয়েকজন ব্রাহ্মণ সেপাইয়ের উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত সেই পিপাসার্ত অস্পৃশ্য লস্করের কথা ক'টি যেন ঝড়ো বাতাসের বেগে ছড়িয়ে পড়লো ছাউনিতে ছাউনিতে।

দমদম—ব্যারাকপুর—হুগলি—বহরমপুর—ঢাকা—

সমস্ত পল্টন ছাউনিতে নেটিব সেপাইদের কানের কাছে বাতাস যেন প্রতি মুহূর্তে একটাই শব্দ বয়ে এনে দিচ্ছে—ধর্মনাশ! ধর্মনাশ! ধর্মনাশ!

আতঙ্ক-বিহ্বল দৃষ্টিতে প্রত্যেকের উদ্দেশ্যেই প্রত্যেকের জিজ্ঞাসা, যা রটেছে তা কি সত্যি?

সত্যি! নিশ্চয়ই সত্যি! নইলে এমন খবর রটেছে কেন?

হিন্দু, মুসলমান—কোনো সেপাইয়ের রেহাই নেই! ভেবে চিন্তে দু' সম্প্রদায়েরই জাত নেওয়ার ধূর্ত ব্যবস্থা করেছে কোম্পানি। হিন্দুর জন্যে গোরুর চর্বি আর মুসলমানের জন্যে শুয়োরের চর্বি।

যে ধর্মের জন্যে জান্ দিতে পারার শিক্ষা আছে, রুটির দায়ে সেই ধর্মকে বিসর্জন দিতে হবে?

মুসলমানদের ওপর ফিরিঙ্গিদের রাগ থাকতে পারে। নবাব সিরাজদ্দৌলার হাতে নাস্তানাবুদ হয়েছিল তারা। ফোর্ট উইলিয়মের ওপর হামল করেছিলেন নবাব। আবার সেই নবাবকেই পলাশীর আমবাগানে হারিয়ে দিয়ে সুবে বাঙলার রাজতক্ত দখলের সুযোগ পেয়েছে কোম্পানি।

নবাব সিরাজের পর আর এক নবাব মিরকাশিম। সেই তেজী নবাবের হাতেও কম নাকাল হতে হয়নি ফিরিঙ্গির দলকে। একই সঙ্গে তাদের লড়াই করতে হয়েছে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা আর দিল্লীর মোগল যুবরাজ শাহ্ আলমের বিরুদ্ধে। অবশ্য সব লড়াইতেই শেষ পর্যন্ত জিতেছে কোম্পানি। একশো বছরের ভেতর সারা হিন্দুস্থানের প্রায় অর্ধেকের ওপর আজ তাদের কর্তৃত্ব। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মুসলমানদের সঙ্গে লড়াই করে জিততে হয়েছিল কোম্পানিকে। তাই মুসলমানদের ওপর তাদের জাতক্রোধ থাকা স্বাভাবিক।

কিন্তু হিন্দু?

নবাব সিরাজের আমলে জগৎ শেঠ, আমীর চাঁদ, রাজা রাজবল্লভ দু হাতে সাহায্য করেছে কোম্পানিকে—হাত বাড়িয়ে অভ্যর্থনা করে এনে কোম্পানিকে দিয়েছে রাজস্বের অধিকার। সেইদিন থেকে আজ পর্যন্ত হিন্দু সেপাইরা কোম্পানির হয়ে অগুন্তি লড়াই করেছে—কোনোদিন বেইমানি করেনি।

তবু হিন্দু সেপাইদের ওপর আক্রোশ কেন? যে হিন্দুর কাছে জাত আর ধর্ম সবচেয়ে পবিত্র, সেই হিন্দুর জাত নষ্ট করবার জন্যে কেন গোরা ফিরিঙ্গিদের এই কূট চক্রান্ত?

না, কোম্পানির গোরাদের কাছে এখন আর হিন্দু-মুসলমান বাছ-বিচার নেই। হিন্দুস্তান তাদের হাতের মুঠোয়। হিন্দুস্তানের মানুষকে তারা মানুষ বলে গণ্য করে না। দেখতে পাও না, ফৌজের সামান্য একটা সেকেণ্ড লেপ্টেন্যান্ট গোরা সাহেব পর্যন্ত 'ব্লাডি ইণ্ডিয়ান নিগার' ছাড়া সম্বোধন করে না? কুচকাওয়াজে সামান্য ভুলচুক হলে বুটের লাথি মারে? মানুষকে যারা মানুষ বলেই গ্রাহ্য করে না, তারা তার ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামাবে কেন? ফিরিঙ্গিরা তো কথায় কথায় বলে নেটিব জানোয়ার। জনোয়ারের আবার ধর্ম কী?

উত্তরভারতে সমস্ত পল্টন ছাউনিতে চাপা গুঞ্জন।

জানুয়ারি মাসের এক ভরদুপুরে হিন্দুস্তানের পূর্বপ্রান্তে কোম্পানি সরকারের রাজধানী খাস কলকাতার অদূরে দমদমের পল্টন ছাউনিতে যে আতঙ্কের সূত্রপাত, ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি পার না হতেই বন্যাস্রোতের মতো সে আতঙ্কের দ্রুত বিস্তার।

দানাপুর—এলাহাবাদ—লখনৌ—কানপুর—মীরাট—বেরিলি—আগ্রা—দিল্লী—আম্বালা—জলন্ধর—

কোনো ছাউনিতে কোনো নেটিব সেপাইয়ের জানতে বাকি নেই যে, এনফিল্ড রাইফেলের নতুন কার্তুজের ছদ্মবেশে আসছে তাদের ধর্মনাশের চরম পরোয়ানা।

কোথায় কেমন করে খবরটা পাওয়া গেল তা নিয়ে কারো মাথাব্যথা নেই। সত্যি না হলে সারা হিন্দুস্তানের সমস্ত পল্টন ছাউনিতে একই কথা ভেসে আসছে কেন?

চক্রান্ত কি শুধুমাত্র কার্তুজেই?

আরো খবর আছে। আজ ক'দিন হল মীরাটের পল্টন ছাউনিতে কেমন করে যেন ভেসে এসেছে সেই খবর। কেবল সেপাইদেরই নয়, গেরস্ত মানুষের জন্যেও কূট চক্রান্ত শুরু করেছে কোম্পানি।

এ বছরটা খরায় অজন্মা হয়েছিল বেশ কয়েকটি অঞ্চলে। সারা উত্তর ভারত জুড়ে দুর্ভিক্ষের মতো অবস্থা। সেই সুযোগটা ভালভাবেই নিতে চাইছে কোম্পানি আর ইশাই পাদরির দল। সরকার থেকে গ্রামে-গঞ্জে বিনি পয়সায় আটা বিলি করা হচ্ছে। খবর এসেছে, সেই আটায় মেশানো হচ্ছে জানোয়ারের হাড়ের গুঁড়ো। কোন্ জানোয়ার কে জানে! সেই হাড়ের গুঁড়ো মেশানো আটা-ই কদিন পরে আসতে শুরু করবে ফৌজী রসদখানায়। হিন্দু মুসলমান সব সেপাইকেই খেতে হবে সেই আটার রুটি!

তারপর?

ফিরিঙ্গিদের চক্রান্ত হবে সফল। দুদিক থেকেই জাত হারাবে হিন্দু, জাত হারাবে মুসলমান। খিদের জ্বালায় কোম্পানির দেওয়া সেই আটার রুটি যে একবার খেয়েছে; ওপরওয়ালা সাহেবের হুকুমে নতুন কার্তুজ একবার যে দাঁতে কেটেছে, তার আর রেহাই নেই! কি হিন্দু, কি মুসলমান—নিজের জাতে, নিজের সমাজে আর কোনদিন সে ঠাঁই পাবে না। নিজের ধর্ম-ই যে রাখতে পারেনি, সে আবার মানুষ কিসের? সমাজ-ধর্ম থেকে পতিত হয়ে সে এক দুঃসহ জীবন!

তখনই এক মুখ হাসি নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াবে ফিরিঙ্গি পাদরি। বলবে, কেরেস্তান হও। অন্ধকার থেকে আলোয় এসো!

আধা-দুর্ভিক্ষের সুযোগ নিয়ে খাবার বিলিয়ে, টাকা বিলিয়ে অনেক রঙীন ভবিষ্যতের লোভ দেখিয়ে এরই ভেতর দেহাতে তারা বেশ কিছু গরীব লোককে কেরেস্তান করে নিয়েছে। এইভাবে নির্বিবাদে তারা যদি তাদের কাজ হাসিল করে যেতে থাকে তাহলে দশ-বিশ বছর পরে হিন্দুস্তানে হিন্দু বলে কেউ থাকবে না, মুসলমান বলে কেউ থাকবে না! এদেশের মানুষগুলোকে দলে ভিড়িয়ে নিয়ে চিরকালের মতো এদেশে পাকা-পোক্ত হয়ে বসবে ফিরিঙ্গি বেনিয়ার দল। সেই উদ্দেশ্যেই ধর্মনাশের এই আয়োজন!

ছাউনিতে ছাউনিতে অবিশ্রান্ত চাপা গুঞ্জন।

গোরা ফিরিঙ্গিরা কী না পারে? ছলে, বলে, কৌশলে একটার পর একটা রাজত্ব দখল করে নিয়ে আজ প্রায় সারা হিন্দুস্তানের মালিক হয়ে বসেছে বেনিয়া কোম্পানি। নিজেদের দরকার মতো এক-একটা নিয়ম তৈরি করে তাকেই তারা বলে আইন। গায়ের জোরে সেই আইনকেই মানতে বাধ্য করে হিন্দুস্তানের মানুষকে।

সাতারায় কেন কোম্পানির ঝাণ্ডা উড়লো?

সাতারার রাজা হল মারাঠী বীর শিবাজীর বংশধর। কোম্পানি কথা দিয়েছিল, শিবাজীর রাজ্যে তারা কোনদিন হাত দেবে না। কিন্তু সে কথা তো তারা রাখেনি!

নিঃসন্তান রাজা আপ্পা সাহেবের মৃত্যু হল। সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভুলে গেল কোম্পানির ফিরিঙ্গিরা। সাতারা চলে এলো কোম্পানির অধিকারে।

সাতারা, সম্বলপুর, নাগপুর, ঝাঁসি—সব রাজ্যেই তো একই চাতুরির ইতিহাস! এখন পর্যন্ত কোম্পানির ধারালো খাঁড়ার সব শেষ কোপ পড়েছে লখনৌয়ের নবাব ওয়াজিদ আলির ওপর। নবাবকে তারা চালান দিয়েছে কলকাতায়। নবাব নজরবন্দী আর কোম্পানীর রেসিডেন্ট সাহেব এখন ছড়ি ঘোরায় লখনৌয়ের দরবারে। যে দিল্লী-বাদশার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে এদেশে কারবার করবার সনদ পেয়েছিল কোম্পানি, আজ সেই দিল্লী বাদশার বংশধরকে রক্তচক্ষু দেখিয়ে সেই কোম্পানির সাহেবেরা হা হা করে অট্টহাসি হাসে!

শুধু রাজা, বাদশা, নবাবের কথাই বা কেন—গরীব রায়তের হাল?

চুরি, ডাকাতি, খুন-জখম আর রাহাজানিতে ভরে গেছে সারা হিন্দুস্তান। নবাবের শাসনে রাজ্য অরাজক হওয়ার অজুহাত দেখিয়ে যে অযোধ্যা রাজ্য খাস করে নিলে কোম্পানি, সেই অযোধ্যাতেই এখন সবচেয়ে বেশি অরাজকতা। ক্ষেতি-চাষীর ঘরে ঘরে অভাবের হাহাকার, খিদের জ্বালায় লোকে চুরি করছে, করছে ছিনতাই আর রাহাজানি। নবাবী সেপাইদের সরিয়ে দিয়ে

কোম্পানি সেখানে মোতায়েন করেছে গোরা পল্টন। রুজির পথ বন্ধ হয়েছে হাজার হাজার সেপাইয়ের। তারা এখন মরীয়া। হয়তো কোম্পানীর হিন্দুস্তানী সেপাইদেরও একদিন ওই দশা হবে। যেদিন কাজ পুরোপুরি হাসিল হয়ে যাবে, সেদিন কোম্পানি দূর, দূর করে তাড়িয়ে দেবে নেটিব সেপাইদের। রাজা-বাদশার রাজত্ব কেড়ে নিতে যাদের আটকায় না, গরীব সেপাইদের গাঁও-দেহাতের সামান্য সম্বল জমিজমাটুকু কেড়ে নিতে তাদের ক'দিন সময় লাগবে?

সেপাইরা এই একশো বছরে কখনো বেইমানি করেনি। কিন্তু ইমানদারির ইনাম তারা কতটুকু পেয়েছে? গোরা ওপরওয়ালার উদ্ধত, দুর্বিনীত ব্যবহার, অশ্রাব্য গালিগালাজ, অবহেলা আর সামান্য কয়েক সিক্কা টাকা বেতন। তা-ও যেন দয়ার দান!

নেটিব সেপাইদের ধর্মনাশের চেষ্টা কি ফিরিঙ্গিদের এই প্রথম? এই এনফিল্ড রাইফেল আর হাড়ের গুঁড়ো মেশানো আটা দিয়েই কি তার শুরু?

না, সে বিশ্বাস নিয়ে বসে থাকার উপায় আর নেই। এমন অনেক কথাই সেপাইদের কানে আসতে আরম্ভ করেছে, যে সব কথা এর আগে তারা কখনো শোনেনি।

অন্তত পঞ্চাশ বছর আগের কথা।

কোম্পানির লাটবাহাদুর তখন কে এক বার্লো সাহেব। তিনি হঠাৎ হুকুম জারি করলেন, হিন্দু সেপাইরা তিলক কাটতে পারবে না, বড়ো বড়ো দাড়ি রাখতে পারবে না মুসলমান সেপাই। পাগড়ির বদলে সেপাইদের পরতে হবে চামড়ার টুপি।

হুকুম জারি হওয়ার পর ছাউনিতে ছাউনিতে দানা বেঁধে উঠলো অসন্তোষ। কেরেস্তান গোরা সেপাইদের অনেকের সঙ্গেই থাকে ইশাই ধর্মের চিহ্ন একটা ক্রশ। তাদের বেলায় তো কোনো হুকুম নেই?

দক্ষিণ ভারতের ভেলোরে এক পল্টন ছাউনিতে প্রতিবাদ জানালো সেপাইরা, এই একচোখো হুকুম তারা মানবে না।

কিন্তু না মানলে কোম্পানি শুনবে কেন? রাজভক্ত বৃটিশের কাছে রাজার চেয়ে বড়ো আর কেউ নেই। সেই রাজার প্রতিনিধি গবর্নর জেনারেল। তার আদেশ অলঙ্ঘ্য। বেয়াদপ বিদ্রোহী নেটিব সেপাইদের শায়েস্তা করতে এগিয়ে এলো পল্টন ছাউনির এক তরুণ সেনাপতি কর্নেল গিলেস্পি।

রাজাদেশ অমান্য করার শাস্তি বড়ো ভয়ঙ্করই হয়ে থাকে। বেশ কয়েকজন সেপাইয়ের প্রাণ গেল, কিছু হল বিকলাঙ্গ, অঙ্গে ক্ষতচিহ্ন নিয়ে বিতাড়িত হল বহু বিদ্রোহী সেপাই।

কর্নেল গিলেস্পির বিভীষিকায় স্তব্ধ হয়ে গেল ভেলোরের বিদ্রোহ।

তারপর আবার আর একবার।

লর্ড আমহার্স্ট তখন ভারতের গবর্নর জেনারেল।

বেনিয়া ইংরেজ যেদিন হিন্দুস্তানের মাটিতে পা রাখে, সেদিন ব্যবসা-বাণিজ্যই ছিল তার লক্ষ্য। এ দেশে রাজ্য জয়ের কথা সে স্বপ্নও ভাবেনি। কিন্তু পলাশীর মাঠে লড়াই-লড়াই খেলার ভেতর দিয়ে সত্যিই যেদিন সে রাজ-কর্তৃত্ব পেয়ে গেল, সেইদিন থেকে তার লোভের জিভ হয়ে উঠেছে সাপের জিভের মতো চঞ্চল, অসহিষ্ণু। শুধু হিন্দুস্তানে তার মন উঠছিলো না—তখন আরো চাই!

ব্রহ্মদেশ জয়ের জন্যে যাত্রার উদ্দেশ্যে কোম্পানির ফৌজ তৈয়ার।

কিন্তু বেঁকে বসলো হিন্দু সেপাইদের সব কটি রেজিমেন্ট। তাদের কথা, কালাপানি পার হওয়া হিন্দুশাস্ত্রে নিষেধ। তারা ধর্ম নষ্ট করতে পারবে না।

কিসের ধর্ম? যে কোনো একটা কুসংস্কারকে আঁকড়ে ধরে নেটিব হিদেন বর্বরগুলো বলবে, এই তাদের ধর্ম?

লাটপ্রাসাদের সুসজ্জিত কক্ষে উপস্থিত হলেন ফোর্ট উইলিয়মের কয়েকজন সেনানায়ক।

বিরক্ত, উত্তেজিত গবর্নর জেনারেল ইন কৌন্সিল লর্ড আমহার্স্ট শুধু এইটুকুই বললেন, এই অশিক্ষিত, বর্বর নেটিব সেপাইগুলোর সব আবদারই যদি আমাদের মেনে নিতে হয় তাহলে বৃটিশ সিংহের সাম্রাজ্য বিস্তারের সমস্ত স্বপ্নই যে বিলীন হয়ে যাবে! কোম্পানির ডাইরেক্টরদের কাছে কী কৈফিয়ৎ দেবো আমি? কী জবাবদিহি করবো মহান ব্রিটেনের মহামান্য সম্রাটের সামনে?

না, নেটিব সেপাইদের কোনো অজুহাত মানা হবে না! ফৌজের চাকরি যখন নিয়েছ তখন অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে ফৌজী হুকুম।

এবারে কর্নেল গিলেস্‌পির ভূমিকায় নামলেন সেনাপতি এডোয়ার্ড প্যাজেট। সাফল্যে তিনি তাঁর পূর্বসূরীকেও ছাড়িয়ে গেলেন।

কে কালাপানি পার হবে না?

সেপাইদের নেতৃত্বে যারা ছিল তাদের অনেকেরই প্রাণ গেল গোরা সেপাইদের গুলিতে। কারো কারো জন্যে বরাদ্দ হল ফাঁসির দড়ি। বাকি সেপাইরা ত্রাসে বিহ্বল, দিশেহারা। সাফল্যের হাসি ফুটে উঠলো এডোয়ার্ড প্যাজেটের মুখে-চোখে।

রুল ব্রিটানিয়া রুল দ্য ওয়েভ্‌স!

কোথায় গেল ধর্ম? কোথায় গেল বিদ্রোহ? যে অবাধ্য নেটিব কুকুরগুলো বেশি ঘেউ ঘেউ করেছিল, তাদের সব কটাকেই চিরকালের মতো থামিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাদের পেছনেও সার দিয়ে দাঁড়িয়েছিল কয়েকটা কুকুর। তাদের জায়গা দেওয়া হল পল্টন ছাউনির কয়েদখানায়।

কুকুরগুলোর তেজ কমেছে কিনা পরখ করে দেখবার জন্যে প্যাজেট তার সাঙ্গোপাঙ্গোদের নিয়ে কয়েকবার কয়েদখানায় ঘুরে এসেছে। জানোয়ারগুলো এখন ভয়ে সিঁটিয়ে আছে। বুটের গোড়ালি দিয়ে মুখে লাথি মারলেও আর বিদ্রোহ করে না। ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে মুখের রক্ত মুছতে থাকে।

ধর্ম!

যার শক্তি আছে, ধর্ম কেবল তাকেই মানায়। শক্তিই হল ধর্ম। যাদের জায়গা বুটের তলায় তাদের আবার ধর্ম কী?

পুরনো ফৌজী আমলের আরো কত কাহিনী আসছে এই জমানার সেপাইদের কানে। এ-কান থেকে সে-কান, সে-কান থেকে আরেক কান।

এতদিন নিমকের মান রাখতে কোম্পানির হয়ে তারা জান দিয়ে লড়েছে। এ সব কাহিনী কিছুই তাদের জানা ছিল না। যারা জানতো, তারা কবে ফৌজ থেকে অবসর নিয়ে দেহাতে চলে গেছে। কেউ বা মরে গেছে, কেউ বা বেঁচে আছে।

কিন্তু সেপাইদের কানে এ সব কথা শুনিয়ে গেল কে?

কোনো একজনের পক্ষে তা কি সম্ভব? বাঙলা মুলুকে সেই দমদম ব্যারাকপুর থেকে উত্তর ভারতে আম্বালা জলন্ধর পর্যন্ত সব পল্টন ছাউনিতে এইটুকু সময়ের ভেতর কোনো একজন কি তা পারে?

দেশময় ঘুরে বেড়ায় কত সন্ন্যাসী-ফকির-দরবেশ।

এই দু-তিন মাসের ভেতর তাদের আসা-যাওয়া যেন আরো বেড়ে গেছে। হাট-বাজার, গ্রাম-গঞ্জ, শহর-বন্দর, ধনীর প্রাসাদ, গরীবের কুটির—সর্বত্র তাদের গতিবিধি। তারাই ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে যায় পুরনো জমানার এই সব খবর।

এর চেয়েও আর একটা উত্তেজক খবর ছড়াতে শুরু করেছে। সেটা শুনে চাপা উত্তেজনা ক্রমেই বাড়ছে।

বিধির অমোঘ বিধান!

হিন্দুস্তানে ব্রিটিশ বেনিয়াদের রাজত্বের মেয়াদ নাকি ঠিক একশো বছর। সেই একশো বছর পূর্ণ হতে চলেছে। ফিরিঙ্গিদের এবার চলে যেতেই হবে!

দিল্লী থেকে অতি গোপনে উর্দুভাষায় একখানি বেনামী ইস্তাহার বেরিয়েছে। তার দু চারখানা যেমন করেই হোক পেঁছে গেছে আগ্রা, মীরাট আর বেরিলির পল্টন ছাউনিতে। সে ইস্তাহারে লেখা রয়েছে, বিদেশী ব্রিটিশদের শাসনে হিন্দুস্তান তার স্বাধীনতা হারিয়েছে, জনসাধারণ সর্বস্বান্ত, খাদ্য নেই, বস্ত্র নেই, অসম্ভব করভারে দেশের মানুষ জর্জরিত, নারীর সম্মান বিপন্ন। হিন্দুস্তানের মানুষ আর কতদিন মুখ বুজে এই অপমানজনক দাসত্ব সহ্য করবে?

যারা নিজে সে ইস্তাহার পড়েছে, তাদের রক্ত চন্‌মনিয়ে উঠেছে। যারা অন্যের মুখে শুনেছে তারাও উত্তেজনায় অধীর।

উর্দু ইস্তাহার ছড়িয়ে গেছে হিন্দুস্তানের হাটে-মাঠে-ঘাটে। ছড়িয়ে গেছে গ্রামে-গঞ্জে। সব চেয়ে বেশি ছড়িয়েছে অযোধ্যা রাজ্যের অন্তে-প্রত্যন্তে। সেই অযোধ্যা—যে রাজ্যকে আর কোনো অজুহাতে দখল করতে না পেরে অরাজকতার অজুহাতে গ্রাস করেছে কোম্পানি। সেই অযোধ্যা—যেখানে চাষী জমি চাষ করবার সময়েও তার সর্বক্ষণের সংগী ঝক্‌ঝকে তরোয়ালখানি জমির আলের ওপর শুইয়ে রাখে। সেই অযোধ্যা—যেখান থেকে সংগ্রহ করা হয় কোম্পানির নেটিব রেজিমেন্টের অর্ধেকেরও বেশি সেপাই।

ইস্তাহার পেঁছেছে ব্যারাকপুর আর বহরমপুরে।

চাপা উত্তেজনা আর চাপা থাকতে চাইছে না। বিধ্বংসী বন্যাস্রোতের মতো উদ্দাম, উন্মত্ত কলরোলে বৃটিশ রাজশক্তির একশো বছরে গড়া বাঁধের ওপর সে আছড়ে পড়তে চায়।

ফকির-দরবেশদের কথা যদি সত্যি হয় তাহলে সময় তো এসে গেছে! এর পরেও আর কত দেরি?

॥ পঁচিশ ॥

উনতিরিশে মার্চ রবিবার।

ব্যারাকপুরে গঙ্গার ওপর দিয়ে শেষ-বসন্তের সূর্য সরে পশ্চিম আকাশে হেলতে শুরু ক'রেছে। পল্টন ছাউনির সীমানায় বড়ো বড়ো কয়েকটা সেগুন, শিশু আর আমগাছের উঁচু মাথার আড়ালে সবে ঢাকা প'ড়েছে মধ্য-চৈত্রের সেই উত্তপ্ত অগ্নিগোলক। অলস মধ্যাহ্নের বাতাসে ঈষৎ উত্তাপের হল্‌কা। গাছ-গাছালির আড়াল থেকে মাঝে মাঝে ভেসে আসছে ঘুঘুর ডাক। উনিশ নম্বর রেজিমেন্টের ছাউনির পেছনে বিরাট উঁচু শিমুল গাছটার পাতা ঝ'রে গেছে। সারা গাছ এখন ফুলে ফুলে লাল। টক্‌টকে লাল শিমুল ফুলগুলোর আড়ালে কোথায় যেন ব'সে একটা কোকিল ডাকছে কু-উ, কু-উ—

পল্টন ছাউনিতে রবিবার বিকেলটা পুরোপুরি ছুটি—কুচকাওয়াজ নেই।

ক'লকাতায় গিয়ে একটু আমোদ-ফুর্তি ক'রে আসার ধুম প'ড়ে যায় এদিন গোরা-ফিরিঙ্গি মহলে। একেবারে নীচুতলার লেপ্টেন্যান্ট থেকে শুরু ক'রে ক্যাপ্টেন, মেজর, লেপ্টেন্যান্ট কর্নেল এমন কি, বিগ্রেডিয়ার কিম্বা মেজর জেনারেল পর্যন্ত সবাই উন্মুখ হ'য়ে থাকে রবিবার বিকেলের জন্যে। আজও গোরা অফিসারদের কুঠিতে কুঠিতে তারই প্রস্তুতি চ'লছে। রোদের তাপ একটু ক'মলেই ক'লকাতার পথে রওনা হবে সাহেবের দল।

অন্যদিকে আর একটা প্রস্তুতি চ'লছে তখন।

চৌত্রিশ নম্বর নেটিব ইন্‌ফ্যান্‌ট্রির বারাকে কেমন যেন একটা চাপা থম্‌থমে ভাব। যে যার মাস্কেট রেখেছে হাতের কাছে। সঙ্গে বেশ কিছু ক'রে কার্তুজ।

পল্টন ছাউনির সবচেয়ে বড়ো অফিসার জেনারেল হিয়ার্‌সে সাহেব দুপুরেই রওনা হ'য়ে গেছেন বেথুন সাহেবের ফিমেল স্কুলে। সেখানে আজ পুরস্কার-বিতরণী অনুষ্ঠান। পুরস্কার

বিতরণ করবেন জেনারেল সাহেব। তাঁর ফিরে আসতে কিছু দেরি হবে। ছোটো-বড় অন্য সব ওপরওয়ালা সাহেবই এখন ফুর্তির মেজাজে। সুতরাং উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে এই হ'ল মাহেন্দ্রক্ষণ!

হাতের কাছে হাতিয়ার।

কোনো কোনো সেপাইয়ের মনে বেশ কিছু দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকলেও তাদের গোপন নেতার ডাকে সাড়া না দিয়ে তারা পারেনি।

নেতার নাম মঙ্গল পাণ্ডে।

তরতাজা নওজোয়ান সেপাই। যে অযোধ্যার চাষী জমি চাষ করবার সময়েও সর্বক্ষণের প্রিয় সঙ্গী ঝমঝকে তরোয়ালখানি সযত্নে জমির আলের ওপর রেখে দেয়—সেই অযোধ্যার জোয়ান মরদ। চৌত্রিশ নম্বর নেটিব রেজিমেন্টে যে ক'জন খুব বেশি মিশুকে আর ফুর্তিবাজ সেপাই আছে তাদের ভেতর মঙ্গলের নামটাই বোধহয় সবচেয়ে আগে মনে পড়ে সেপাইদের। শুধু ফুর্তিবাজ আমুদে ছেলেই নয়, গানের গলাও ভারী মিঠে আর সুরেলা। লড়াইয়ের ময়দানে যখন বন্দুক ধ'রে দাঁড়ায় তখন তার চেহারা অন্যরকম। আবার লড়াইয়ের ময়দান থেকে দূরে অবসর সময়ে যখন তুলসীদাসজীর রামচরিতমানস গলায় তুলে নিয়ে গান গায় তখন তাকে যেন চেনাই যায় না! গানের সুরে সে ভাসিয়ে নিয়ে যায় সবাইকে। শ্রোতাদের চোখের সামনে যেন জীবন্ত হ'য়ে ওঠে রামজী, সীতামাঈ আর বজরঙ্গবলীজীর সেই অমর কাহিনী। চোখের জল সামলাতে পারে না শ্রোতার দল। নিজেদের অজ্ঞাতেই চোখের জল মুছে নিয়ে মুগ্ধ আবেগে তারা তাকিয়ে থাকে ভাব-বিহ্বল বিভোর গায়কের দিকে। তখন কে ব'লবে, বন্দুক হাতে এই নওজোয়ান-ই যখন দুশ্‌মনের মুখোমুখি দাঁড়ায় তখন তার হাতের একটা গুলিও ফস্‌কায় না? কে ব'লবে, ট্রিগারে হাত দিলে এই সুদর্শন জোয়ান ছেলেটাই হ'য়ে ওঠে ভয়ঙ্কর?

কিন্তু আসল দুশ্‌মন কে?

সেই প্রশ্নটাই সঙ্গী সেপাইদের সামনে তুলে ধ'রেছে মঙ্গল। কোম্পানির গোরা-ফিরিঙ্গিরা এসেছে কালাপানির পারে সেই কোন্ এক দূর মুলুক থেকে। এ-দেশের কতগুলো বেইমানকে হাত ক'রে তারা সেজে ব'সেছে হিন্দুস্তানের রাজা। রাজত্ব কায়েম রাখবার গরজেই তাদের দরকার জোরদার ফৌজ—দরকার হাজর হাজার সেপাই। অত গোরা কোথায়? তাই নিজেদের গরজেই এ-দেশের লোককে সেপাইয়ের চাকরি দিয়ে ফৌজী দলে ভিড়িয়েছে কেম্পানি। সারাবছর ঘরে দানাপানি জোটে না বলেই তো হাজার হাজার হিন্দুস্তানী আদমি বাধ্য হয়ে এসে নাম লেখায় কোম্পানির খাতায়। তারপর থেকে গোরা সাহেবদের হুকুমে ওঠে, তাদের হুকুম বসে। আর সব শেষে তাদেরই হুকুমে জান দেয় লড়াইয়ের ময়দানে।

কিন্তু লড়াইটা কার সঙ্গে?

হিন্দুস্তানের আদমির সঙ্গেই কোম্পানির লড়াই। সেই একশো বছর আগে কয়েকজন বেইমান জানোয়ারের মদত নিয়ে এই বাঙলা মুলুকে ফিরিঙ্গিরা কোম্পানি-রাজের ভিত্ গেড়েছিল, তারপর থেকে এই একশো বছর পর্যন্ত সারা হিন্দুস্তানের মাটি তারা রক্তে লাল ক'রেছে আর একটার পর একটা মুলুক দখল ক'রেছে। কিছু গোরা পল্টন তাদের আছে বটে, কিন্তু তাদের হিম্মত কতটুকু? হিন্দুস্তানী সেপাইদের জান্-কবুল মদত না পেলে হিন্দুস্তানের এত মুলুক দখল করবার শক্তি তাদের হত?

নিমকের মান রাখতে এতদিন পর্যন্ত বেইমানি করেনি হিন্দুস্তানী সেপাই। গোরার দল নাক উঁচু ক'রে বলে নেটিব আর্মি। গোরা সেপাইরা যে তন্‌খা পায় তার চারভাগের একভাগও পায় না হিন্দুস্তানী সেপাই। সমান সমান সুযোগ-সুবিধে তো স্বপ্নেরও নাগালের বাইরে। গোরা সাহেবের হুকুম তামিল করেও সামান্য গল্‌তি হলেই জোটে গালিগালাজ আর বুটের লাথি।

এবার তার চেয়েও বেশি সর্বনাশ ঘনিয়ে আসছে।

নতুন রাইফেল আর দাঁতেকাটা নতুন কার্তুজের ভেতর দিয়ে এসেছে সেই সর্বনাশের ইশারা।

হিন্দুস্তানের হিন্দু-মুসলমানের জাত-ধর্ম নষ্ট করবার ফিকির তাদের অনেকদিনের। খুব সাবধানে একটু একটু ক'রে এগোচ্ছে। এই তো হিন্দুর ধর্ম নষ্ট করবার জন্যে বিধবা-বেওয়া আওরতের শাদীর আইন পাশ হ'য়ে গেল! বাঙালী বাবুরা তাতে খুব মদত দিয়েছে কোম্পানিকে।

জানের চেয়েও বড়ো হ'ল জাত-ধরম!

সেই জাত-ধরমই যদি চ'লে গেল তাহ'লে বেঁচে থেকে লাভ কী? শুধু রুটিরুজির চিন্তা ছাড়া আর কোনো চিন্তার দরকার নেই? ইমানদারি? ইনসানিয়াৎ?

কোম্পানি এখন বেপরোয়া।

অযোধ্যা দখল তো বেশিদিনের কথা নয়। সেখানে কী কী ঘ'টেছে সবই তো নিজের চোখে দেখে এসেছে বেঙ্গল আর্মির উনিশ আর চৌত্রিশ নম্বর নেটেব ইন্‌ফ্যান্‌ট্রির সেপাইরা। দরকারে লাগতে পারে ব'লে এই দুটো বাহিনীকেই তখন নিয়ে যাওয়া হ'য়েছিল লখ্‌নৌ শহরে।

এখন সেখানে বুক ফুলিয়ে ফর্‌মান জারি ক'রছে কোম্পানির রেসিডেন্ট; বুক চিতিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে গোরা সেপাইদের দল। ইচ্ছে খুশিমতো তারা লুঠতরাজ ক'রছে, বেয়নেট বুকে ধ'রে টেনে নিয়ে আসছে ঘরের জেনানাদের। ইজ্জৎ হারানোর পর তারা কেউ নিরুদ্দেশ, কেউ উন্মাদিনী, কেউ বা নিরুপায় হয়ে ঘর নিচ্ছে গিয়ে কস্‌বী মহল্লায়! নবাবের রাজত্ব যখন নিতে পেরেছে তখন ছোটখাটো জমিদার তালুকদারেরা ভয়ে ভয়ে দিন কাটাচ্ছে, কখন তাদের ওপর কোম্পানির হুকুম জারি হয়!

নবাব-বাদশা থেকে জমিদার তালুকদার পর্যন্ত সবায়ের যখন এই দশা তখন গরীব চাষী-ঘরের সন্তান সেপাইদের ভবিষ্যৎ কী? দেহাতে যে সামান্য জমি-জমাটুকু আছে, কলমের এক আঁচড়ে সেটুকুও যদি কোম্পানি খাস করে নেয়?

এ-সব চিন্তা আসছে কেন?

লক্ষণ দেখা যাচ্ছে ব'লেই তো চিন্তাগুলো মাথায় এসে ভীড় ক'রছে! গোরা সাহেবেরা ভালো করেই জানে, তাদের বিপদে আপদে পাশে দাঁড়ানোর মতো এদেশী বহু বেইমান কুত্তা সব সময়েই তারা পাবে। ক'লকাতায় আছে হঠাৎ ফুলে ফেঁপে-ওঠা বাবুর দল আর হিন্দুস্তানের অন্য সব মুলুকে আছে বড়ো বড়ো জমিদার, তালুকদার আর কারবারী মহাজন। তা জানে বলেই এত সাহস পেয়েছে কোম্পানি। এবার তারা উদ্যত হ'য়েছে পল্টনের সেপাইদের জাতধরম নেওয়ার জন্যে। না নিয়ে তারা ছাড়বে না।

জীবনে কোন্‌টা বড়ো—রুটি-রুজি না ইনসানিয়ৎ?

জিন্দগী তো চিরদিন থাকবে না! একদিন না একদিন সবাইকেই এ-দুনিয়া থেকে চ'লে যেতে হবে। সেই জীবনটার ভয়ে জাত-ধরম-ইমানদারিকে বিকিয়ে দেবে হিন্দুস্তানের সেপাই? তারা কি এত ভীরু? এত কাপুরুষ?

সব খবরই গোপনে এসে গেছে পল্টন ছাউনিতে। কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম আর মীরাটের গোলা-বারুদের কারখানায় চর্বি-মাখানো কার্তুজ তৈরি বেশ কয়েকমাস আগেই আরম্ভ হয়ে গেছে। পাঁচ ছ'মাস আগে নাকি প্রায় পঞ্চাশ হাজার কার্তুজ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে আম্বালা আর শিয়ালকোট ক্যান্টনমেন্টে। সেখান থেকেই আস্তে আস্তে সইয়ে সইয়ে নতুন কার্তুজ পাঠানোর ব্যবস্থা হ'য়েছে আগ্রা, দিল্লী, বেরিলি, দানাপুর—যেখানে যেখানে আছে নেটিব রেজিমেন্টের বড়ো বড়ো ঘাঁটি। ব্রাউন বেস মাস্কেট সরিয়ে নিয়ে হাতে তুলে দেবে এনফিল্ড রাইফেল। তার সঙ্গে হাতে তুলে দেবে জাত-ধরম নষ্ট করবার সর্বনাশা বিষ—চর্বি মাখানো নতুন কার্তুজ।

মঙ্গল পাণ্ডের প্রত্যেকটি কথাই সমর্থন ক'রেছে জমাদার ঈশ্বরীপ্রসাদ পাণ্ডে। সে যদিও উঁচু পদে আছে কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে সাধারণ সেপাইদের সঙ্গে তার তো কোনো পার্থক্য নেই।

কর্তব্য স্থির ক'রে ফেলেছে সবাই।

চৌত্রিশ নম্বর রেজিমেন্টের সেপাই মঙ্গল তাদের নেতা। তাই চৌত্রিশ নম্বরকে নিয়েই সে

প্রথম বেরিয়ে পড়বে। তারপরে বেরোবে উনিশ নম্বর। তারা নেমে পড়লেই সংগে সংগে ব্যারাক থেকে হাতিয়ার হাতে বেরিয়ে আসবে নেটিব সেপাইদের অন্য সবগুলো বাহিনী।

শিমুল গাছটার গুচ্ছে গুচ্ছে লাল ফুলের ওপর লুটিয়ে পড়েছে চৈত্রের ঝলসানো রোদ। কোকিলটা তখনো মাঝে মাঝে ডেকে চলেছে কু-উ, কু-উ—

বন্দুক হাতে সোজা হ'য়ে দাঁড়ালে মংগল পাণ্ডে।

সংগীদের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে চাপা গম্ভীর স্বরে সে ব'ললে, ভাইসব, সাধু-সন্ত, ফকির দরবেশরা মিছে কথা বলে না। তারা যখন ব'লেচে, একশো বছর পূরণ হ'লে হিন্দুস্তানে কোম্পানি-রাজ খতম হবে, তখন তা হবেই! কিন্তু সেটা তো আপনা-আপনি হবে না, আমাদের হিম্মৎ দিয়েই তা করতে হবে! —তোমরা তৈয়ার?

—তৈয়ার!

—জয় আমাদের অনিবার্য! উদ্দীপ্তস্বরে ব'লতে লাগলো মংগল, এই ব্যারিকপুরে গোরা সেপাই যা আছে, আমাদের সংখ্যার তুলনায় তা নগণ্য। তাদের আমরা খুব মামুলি মেহনতেই খতম ক'রে দিতে পারবো। আর ওপরওয়ালা অফ্‌সর? তারা তো কেবল হুকুমই করে; লড়াই করি তো আমরা! আমাদের হাতিয়ারের সামনে তারা দাঁড়াতেই পারবে না। ব্যারিকপুর দখল ক'রেই আমরা রওনা দেবো কলকাত্তার পথে—দখল ক'রতে হবে ফোর্ট উলিয়ম! কোম্পানির রাজধানীর বুকে তাদের সবচেয়ে বড়ো সেই ঘাঁটি যদি আমরা দখল ক'রে নিতে পারি তাহ'লে লেজ গুটিয়ে হিন্দুস্তান থেকে পালাতে হবে পরদেশি বেনিয়ার দলকে। জাত বাঁচবে হিন্দুর, জাত বাঁচবে মুসলমানের। পরদেশি ম্লেচ্ছ জাতের হুকুমের গোলাম হ'য়ে তাদের বুটের লাথি আর আমাদের সহ্য ক'রতে হবে না!

মংগল পাণ্ডের বড়ো বড়ো চোখ দু'টো জ্বলছে। উন্মাদনার শিহরণে কাঁপছে তার সর্বাংগ। হাতের মুঠো দু'টো কঠিন হ'য়ে উঠেছে। উত্তেজনায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসছে তার নাক দিয়ে।

জমাদার ঈশ্বরী পাণ্ডে ব'ললে, ফিরিঙ্গিদের ফৌজে আমি জমাদার—তোমাদের ওপরওয়ালা। কিন্তু আমাদের এই লড়াইতে আমি আর ওপরওয়ালা নই—আমিও একজন মামুলি সেপাই হ'য়েই ল'ড়বো। আমাদের কমাণ্ডার হবে এই জোয়ান মংগলজী। মনে রেখো ভাইসব, আমরা হিন্দুস্তানী! লড়াইয়ে নেমে আমরা পিছু হ'টবো না! হাতিয়ারের চোট আমরা বুক পেতেই নেবো—পিঠে যেন হাতিয়ারের দাগ না পড়ে! আমাদের মা-বাপ, জরু-বেটি কেউ যেন ব'লতে না পারে যে আমরা ভীরুর মতো পালিয়েছি ব'লেই দুশমন আমাদের পিঠে হাতিয়ার চালিয়েছে!

—পাণ্ডেজীর কথা মনে রেখো ভাইসব!—ব'ললে মংগল, আর সময় নেই, এবার আমাদের নেমে প'ড়তে হবে। চলো—

উদ্দাম কলরোলে ব্যারাক ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো চৌত্রিশ নম্বর রেজিমেন্টের সেপাইদল। তারপরই উনিশ নম্বর।

দুম্—দুম্—দুম্—

মুহুর্মুহু গুলির শব্দে সচকিত হ'য়ে উঠ্‌লো ব্যারাকপুর পল্টন ছাউনি। বহুকন্ঠের উন্মত্ত কলরোলে সংকেত পেয়ে বেরিয়ে এলো অন্যান্য রেজিমেন্টের নেটিব সেপাইয়ের দল। গুলি ছু'ড়তে ছু'ড়তে বিক্ষিপ্তভাবে তারা এগিয়ে চ'ললো গোরাসাহেবদের কুঠি আর ব্যারাকের দিকে।

দাউ দাউ ক'রে আগুন জ্ব'লে উঠলো।

আগুন বন্দুকের ব্যারেলে, আগুন সেপাইদের চোখের দৃষ্টিতে, আগুন কুঠিতে কুঠিতে। এলোমেলো গুলি ছু'ড়ে চ'লেছে সেপাইরা। একটার পর একটা অফিসার-কুঠিতে লাগিয়ে চ'লেছে আগুন।

মধ্য-চৈত্রের বেলা তিনপ্রহরে জ্ব'লে উঠ্‌লো বিদ্রোহের প্রথম বহ্নি!

একদিকে ধাবমান সেপাইয়ের উন্দাম, উন্মত্ত কলরব, অন্যদিকে শ্বেতাঙ্গ নারী-পুরুষের কণ্ঠের আকুল আর্তনাদ, হেল্প্! হেল্প্!

সমস্ত ব্যাপারটাই শ্বেতাঙ্গদের কাছে আকস্মিক।

নেটিব সেপাইরা দল বেঁধে ঝাঁপিয়ে প'ড়েছে শ্বেতাঙ্গদের ওপর! কোম্পানির গোরা রেজিমেন্টের ব্যারাকের দিকে ছুটে চ'লেছে একদল, আর একদল ছুটেছে কমাণ্ডিং অফিসারদের কুঠির দিকে। উদ্যত মাস্কেট আর ঝল্সানো খোলা তরোয়াল হাতে তারা ছড়িয়ে প'ড়েছে ক্যান্টনমেন্টের চতুর্দিকে।

আগুন! আগুন!

চৈত্রের উত্তপ্ত বিশুষ্ক বাতাসের সাহায্য পেয়ে মুহূর্তের ভেতর আগুনের এক শিখা হ'য়ে উঠেছে শত শিখা। দেখতে দেখতে কুঠির ছাত ছাড়িয়ে অজস্র লেলিহান শিখা প্রসারিত হ'য়ে যাচ্ছে আরো অনেক উঁচুতে। আগুন ছড়িয়ে প'ড়ছে এক কুঠি থেকে আর এক কুঠিতে। ভয়ার্ত পাখির দল গাছ-গাছালি ছেড়ে উড়ে পালাচ্ছে। একজন মেজরের কুঠির পেছনে বিরাট উঁচু একটা শিরীষ গাছের পাতা-ঝরা ডালে ডালে লেগেছে আগুন। ফট্ ফট্ ক'রে ফেটে দূরে দূরে ছিট্কে প'ড়ছে বড়ো বড়ো শিমের মতো ফলের জ্বলন্ত বীজগুলো। আগুনের হল্কায় উত্তপ্ত হ'য়ে উঠেছে ক্যান্টনমেন্টের বাতাস। সূর্য সবে পশ্চিম আকাশে পড়ন্ত। আলোয় তখনো লালের আভা তেমন ক'রে দেখা দেয়নি। কিন্তু আগুনের হল্কা আর ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন ক্যান্টনমেন্টের আকাশ তখন লালে লাল।

এ-ধরনের একটা ঘটনা অকল্পনীয়।

শ্বেতাঙ্গ সেনাপতিদের বেশির ভাগই যখন ফূর্তির মেজাজে ক'লকাতায় যাওয়ার জন্যে তৈরি হ'চ্ছে, তখনই এই অতর্কিত সন্ত্রাস!

অবাক্ পরিস্থিতি বুঝতেই কিছুটা সময় গেল।

আশ্চর্য! যে ব্লাডি নেটিবগুলো হুকুমের গোলাম, একমাত্র নেড়ি কুত্তার সঙ্গেই যাদের তুলনা চলে, তাদের এ কী মূর্তি?

কিছুদিন থেকেই একটা গোপন খবর কানে আসছিল বটে!

নতুন এনফিল্ড রাইফেলের কার্তুজ নিয়ে নেটিব সেপাইমহলে কী একটা গুজব নাকি ছড়িয়েছে। ধর্ম নষ্ট হওয়ার ভয়ে একটু অসন্তোষ নাকি দেখা দিয়েছে ওদের মনে। সিলি থট্! সেপাই মানে সেপাই—কমাণ্ডারের হুকুমে লড়াই করাই তার ধর্ম। সেপাইয়ের আবার অন্য ধর্ম কী? হিদেন হিন্দু! ন্যাষ্টি মুসলমান! তারাই আবার জাঁক ক'রে ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামায়! দুনিয়ায় ক্রীশ্চান ধর্ম ছাড়া আর কোনো ধর্ম আছে? নতুন কার্তুজের গায়ে কী মাখানো হ'য়েছে, তা অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরির কর্তারাই জানে। কিন্তু সত্যিই যদি বীফ-সোয়েট আর হগ স্লার্ড মেশানো হ'য়ে থাকে, তাতে কিছুমাত্র অন্যায় হয়নি। গোরু কিম্বা শুয়োরের চর্বি মুখে লাগলেই যাদের ধর্ম যায়, তাদের সে ঠুন্কো ধর্ম না থাকাই ভালো।

নেটিব সেপাইদের গুজব আর কানাকানির কথা ভাসাভাসা ভাবে কানে এলেও তার কোনো গুরুত্ব দেননি জেনারেল হিয়র্সে। গুরুত্ব দেবার মতো ব্যাপার ব'লে মনে করেননি তাঁর অধস্তন বৃটিশ সেনাপতিরাও। তাছাড়া, ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্টে এনফিল্ড রাইফেলের তালিম দেওয়া এখনো শুরু হয়নি। যখন শুরু হবে তখন দেখা যাবে।

কিন্তু আজ হঠাৎ কেন এ বিস্ফোরণ?

পাগলা কুকুরের মতো ছুটে বেরিয়ে প'ড়েছে নেটিব সেপাইয়ের দল! হুকুমের নোকর হাতিয়ার বাগিয়ে ধ'রেছে তার মালিকের বুকের ওপর?

মুহুর্মুহু গুলির শব্দ, কোলাহল আর আর্ত চিৎকার মিলে সে এক ভয়ঙ্কর পরিবেশ। কুঠিতে কুঠিতে নারীকণ্ঠের আর্ত বিলাপ, হেল্প্—হেল্প্। সেভ আস ওহ্ গড!

হতচকিত ভাবটুকু কেটে যেতে অবশ্য বেশি সময় লাগলো না। সেনাপতিরা বুঝতে পেরেছে, সত্যিই বিদ্রোহ ক'রেছে চৌত্রিশ নম্বর নেটিব ইন্ফ্যান্ট্রি।

মিউটিনি!

উন্মত্ত, বেপরোয়া উচ্ছৃংখলতার সঙ্কেত! সুস্পষ্ট রাজদ্রোহ। কোম্পানির আইন-শৃংখলাকে অস্বীকার! ব্রিটিশ-শক্তির প্রবল প্রতাপের ওপর ভ্রূকুটি। বিদ্রোহ তো কেবল কোম্পানির বিরুদ্ধে নয়—এ বিদ্রোহ 'হার মোস্ট গ্রেশাস ম্যাজেস্টি কুইন ভিক্টোরিয়া'র বিরুদ্ধে!

রুল ব্রিটানিয়া রুল দ্য ওয়েভ্স!

যে ব্রিটিশ রাজশক্তি বিপুল, বিশাল সমুদ্রের প্রমত্ত তরঙ্গমালার ওপর পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তার ক'রেছে, যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পৃথিবীব্যাপী উপনিবেশ-সীমানায় সূর্য কখনো অস্ত যায় না—সেই রাজশক্তির বিরুদ্ধে সামান্য কয়েকজন নেটিব সেপাইয়ের এতবড়ো ঔদ্ধত্যের প্রকাশ?

মঙ্গল পান্ডের নির্দেশ, জেনানার গায়ে হাত দেবে না কেউ; হাত দেবে না বাল-বাচ্চার গায়ে। আগুন লাগাতে হয়, তাদের বের ক'রে দিয়ে তারপর আগুন লাগাবে কুঠিতে। কিন্তু ছাড়বে না একটাও গোরা মরদকে। যারা এতদিন চোখ রাঙিয়ে আমাদের দমিয়ে রেখেছে, যাদের বুটের লাথির দাগ আমাদের গতর থেকে এখনো মিলিয়ে যায়নি, তাদের একজনও যেন রেহাই না পায়!

দুম্ দুম্ ক'রে অবিশ্রান্ত বন্দুকের গুলি—বারুদের গন্ধ—উল্লাস আর আর্তনাদ।

তারই ভেতর কুঠি থেকে খিড়কিপথে বেরিয়ে কয়েকজন সেনানায়ক ছুটে চ'ললো গোরা সেপাইদের ব্যারাকের দিকে। তাদের কেউ বা ক্যাপ্টেন, কেউ মেজর, কেউ কর্নেল। পদমর্যাদা নিয়ে বিচার করবার সময় তখন নেই। সব ক'জনেরই উদ্দেশ্য এক। গোরা সেপাইদের সংহত ক'রে রুখে দাঁড়াতে হবে নেটিবগুলোর মুখোমুখি। হঠাৎ আক্রান্ত হ'য়ে প্রথমদিকে একেবারে হক্‌চকিয়ে গিয়েছিল গোরা সেপাইরা। ততক্ষণে হাতিয়ার নিয়ে তারাও তৈরি হ'য়ে গেছে।

সময় কম, কিন্তু সুযোগ-ও আছে।

না, সমস্ত নেটিব কোম্পানিগুলো ঝাঁপিয়ে প'ড়েনি। একমাত্র চৌত্রিশ আর উনিশ নম্বর ছাড়া অন্য বাহিনীর সেপাইরা হাতিয়ার হাতে কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো যে যার ব্যারাকের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। বিদ্রোহীদের চেয়ে অনুগত সেপাইদের সংখ্যাই তাহ'লে বেশি!

কিন্তু বিশ্বাস করা যায় না নেটিবদের। যাদের অনুগত ব'লে মনে হচ্ছে, তারা হয়তো এখনো সংশয়ের দোলায় দুলছে। বিদ্রোহীরা এই মুহূর্তেই যদি ব্যারাক থেকে ওদের টেনে নিয়ে দলে ভেড়াতে পারে তাহ'লে আর পরিত্রাণ নেই। একজন শ্বেতাঙ্গ-ও বেঁ'চে থাকবে না ক্যান্টনমেন্টে। বিদ্রোহীদের ডাকে সাড়া দেওয়ার আগেই ওদের কাজে লাগানো চাই! এতক্ষণ পর্যন্ত ওরা যখন তান্ডবে মেতে ওঠেনি, তখন আশা আছে। কম্যান্ডিং অফিসার সামনে গিয়ে দাঁড়ালে তাঁর ফৌজী হুকুম না মেনে ওরা পারবে না। ওদের চোখে-মুখে এখনো ভয়ের চিহ্ন!

জেনারেল হিয়ার্সেকে খবর জানাতে দ্রুতবেগে ক'লকাতায় ছুট্লো দু'জন ব্রিটিশ অশ্বারোহী সৈনিক। তিনি তখন নিশ্চিন্তে নিরুদ্বেগে বেথুন সাহেবের ফিমেল স্কুলে পুরস্কার বিতরণী উৎসবে সভাপতিত্ব ক'রছেন।

কয়েক মিনিটের ভেতরেই পায়ের তলায় মাটি পেয়ে গেল ব্রিটিশ সেনাপতিরা। গোরা সেপাইরাতো আগেই প্রতিরোধ গ'ড়ে তুলেছে, এবারে সাহেব সেনাপতির সম্মোহনী হুকুমে হাতিয়ার হাতে ব্যারাক থেকে বেরিয়ে এলো বাকি নেটিব রেজিমেন্টগুলোর ভীত-সন্ত্রস্ত সেপাইয়ের দল।

ফৌজী কানুন!

জান্ গেলেও সেনাপতির আদেশ মানতে হবে!

—ফায়ার!—ক্রুদ্ধ চিৎকারে হুকুম বেরিয়ে এলো সাহেব সেনাপতির গলা থেকে।

তারা উঁচিয়ে ধ'রলে তাদের বন্দুক। তাক্ ক'রলে বিদ্রোহীদের দিকে। দুম্ দুম্ ক'রে ছুটতে লাগলো অবিশ্রান্ত গুলি।

—চার্জ! —আবার এলো সাহেব সেনাপতির নির্দেশ।

বন্দুকের এলোমেলো গুলি, তরোয়ালের ঝন্‌ঝনানি আর আর্তনাদে মুখর হ'য়ে উঠ্‌লো পল্টন ছাউনি। রক্তের ফিন্‌কিতে মাটি লাল।

—কেড়ে নাও! হাতিয়ার কেড়ে নাও!

হঠাৎ নিজেদের দেশোয়ালি সেপাইদের দিক থেকে আক্রমণ হওয়ায় বিমূঢ় হ'য়ে প'ড়লো বিদ্রোহীদল। এ-রকম কথা তো ছিল না!

—চার্জ! বেয়নেট চার্জ করো! মাটিতে লুটিয়ে দাও নেমকহারাম কুত্তাদের! —প্রচণ্ড চিৎকারে আদেশ আসছে ব্রিটিশ সেনাপতিদের কাছ থেকে। একদিক দিয়ে এগিয়ে আসছে গোরা সেপাইরা, অন্যদিক থেকে অনুগত নেটিব বাহিনী। বিক্ষিপ্ত হ'য়ে প'ড়েছে বিদ্রোহীরা। কেউ বা হতচকিত হ'য়ে স্তব্ধগতি। আহত কয়েকজন বিদ্রোহী সেপাই মাটিতে প'ড়ে 'জল' 'জল' ব'লে ক্ষীণ আর্তনাদ ক'রছে।

ঈশ্বরী পাণ্ডের গায়ে তরোয়ালের একটু আঘাত লেগেছে কিন্তু মঙ্গল তখনো অক্ষত। বন্দুকের গুলি ফুরিয়ে গেছে। পাশের একজনের হাত থেকে একখানা তরোয়াল টেনে নিয়ে সে উদ্দামবেগে সামনের দিকে এগিয়ে চ'ললো।

উদ্‌ভ্রান্ত নিঃসঙ্গ নায়ক! দু'চোখে তখন তার বিক্ষুব্ধ ঘৃণার জ্বলন্ত বহ্নি। ব্রিটিশ সেনাপতির হুকুমে অন্য যে-সব নেটিব সেপাই বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে হাতিয়ার বাগিয়ে ছুটে এসেছে, তারাই তখন তার লক্ষ্য।

যে-গলায় রামচরিত-মানস গেয়ে শ্রোতাদের আপ্লুত ক'রে দেয় মঙ্গল, সেই গলাই হ'য়ে উঠলো তীব্র, কর্কশ, বজ্রনাদী।

—কাদের হুকুমে হাতিয়ার ধ'রলে ভাইসব? কাদের হুকুমে গুলি ছুঁড়চো দেশোয়ালি ভাইয়ের বুকে? বন্দুক ঘুরিয়ে ধরো—ঘুরিয়ে নাও তলোয়ার! তাক্ করো আসল দুশ্‌মনের কলিজা। ওরা হিন্দুস্তানের সবচেয়ে বড়ো দুশ্‌মন, ওরা হিন্দুস্তানের সর্বনাশ ক'রতে এসেচে। ওরা এসেছে আমাদের ধর্মনাশ ক'রতে। ওদের হুকুম আমরা মানি না, ওদের জুলুম—

আর বলা হ'ল না মঙ্গলের। পেছন দিক থেকে চার-পাঁচজন গোরা সেপাই এসে ততক্ষণে তাকে জাপ্‌টে ধ'রেছে। সাহস পেয়ে কয়েকজন দেশি সেপাইও এসে সামনে থেকে চেপে ধ'রলে মঙ্গলকে। পেছন দিক থেকে একখানা তরোয়ালের খোঁচায় ঝর্‌ঝর্ ক'রে রক্ত ঝ'রতে লাগলো তার বাহুমূল থেকে।

একজন মেজর চিৎকার ক'রে উঠ্‌লে, মুখ চেপে ধরো বদ্‌মাশটার!

গোরা সেপাইদের একজন তাড়াতাড়ি হাতের সামনে একজন দেশি সেপাইয়ের মাথার পাগড়ি খুলে নিয়ে তার খানিকটা গুঁজে দিলে মঙ্গলের মুখের ভেতর। বাকি অংশ দিয়ে বেঁধে ফেললে তার মুখ।

মঙ্গল পাণ্ডের শেষ কথা অসমাপ্ত-ই রয়ে গেল। দেশি সেপাইদের সাহায্য নিয়ে গোরা সেপাইরা তাকে বেঁধে নিয়ে চ'লে গেল ক্যান্টনমেন্টের কয়েদখানায়।

বন্দী হ'ল ঈশ্বরী পাণ্ডেও। মঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গে সে-ও যে সেপাইদের উস্‌কে দিয়েছিল, ততক্ষণে ব্রিটিশ সেনাপতিদের তা জানা হ'য়ে গেছে।

সূর্য তখন সবে অস্ত গেছে।

অন্ধকার নেমে আসছে পৃথিবীর বুকে। অন্ধকার নেমে এলো ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্টে। স্তব্ধ, নির্বাক পল্টন ছাউনি।

উদ্ধত বিদ্রোহী সেপাইদের নিরস্ত্র করা হ'ল দশ মিনিটের ভেতর। চৌত্রিশ নম্বর নেটিব ইন্‌ফ্যান্ট্রির প্রত্যেকটি সেপাইকে আলাদা ক'রে ফেলে তাদের অন্তরীণ করা হ'ল গোরা সেপাইদের

ব্যারাকে। অন্য সব রেজিমেন্টের নেটিব সেপাইরা ভয়ে বিবর্ণ হ'য়ে গেছে তখন। এমন কি কোম্পানির অনুগত সেপাইরা পর্যন্ত নিস্তব্ধ, নির্বাক।

শ্বেতাঙ্গ সেনাপতিরা উল্লাসে দিশেহারা।

এত অল্প সময়ের ভেতর এমন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি যে আয়ত্তের ভেতর এসে যাবে, একটু আগেও তা ছিল তাদের কল্পনার বাইরে।

ওহ্ লর্ড, আওয়ার সেভিয়ার!

পরম করুণাময় ঈশ্বরের অপার অনুগ্রহ যে, বেঙ্গল আর্মির বেশির ভাগ রেজিমেন্টই এখনো ব্রিটিশ সম্রাজ্ঞীর অনুগত আছে! বদমাশ সেপাই মঙ্গল পান্ডের ডাকে তারা সবাই যদি সাড়া দিত, তাহ'লে ধুলোয় মিশে যেত ব্যারাকপুর, বিপন্ন হ'য়ে প'ড়তো ফোর্ট উইলিয়ম!

বিদ্রোহী সেপাইদের গোপন পরিকল্পনার সব কথাই ফাঁস হ'য়ে গেছে।

কথা ফাঁস ক'রেছে চৌত্রিশ নম্বরেরই কয়েকজন সেপাই। প্রাণের ভয়ে সব কথা ব'লেছে তারা। নেটিব কুত্তাগুলোর মুখ থেকে কথা বের ক'রতে অবশ্য তেমন কোনো মেহনতই ক'রতে হয়নি। পাঁজরে আর ঘাড়ে ফৌজী বুটের কয়েকটা লাথি, উরুর মাংসপেশীতে ধারালো বেয়নেটের কয়েকটা এ-ফোঁড়—ও-ফোঁড় খোঁচা আর নাক-মুখ-চোখে কয়েকটা ঘুষি—ব্যস্! পাঁজরের দু'তিনখানা হাড় মট্‌মট্ ক'রে ভেঙে গেলে কিম্বা নাক দিয়ে গল্‌গল্ ক'রে রক্তের ধারা বেরোতে থাকলে সত্যিই যে কেমন লাগে, সেটা মালুম হওয়ার পর কুত্তীর বাচ্চাগুলো আর অবাধ্য হয়নি। ব্যারাকপুর থেকে ফোর্ট উইলিয়ম পর্যন্ত ধাওয়া করবার গোপন ফন্দি-ফিকিরগুলো সবই তারা কবুল ক'রেছে।

হেভেনলি গ্রেস অব অলমাইটি!

পরম করুণাময় ঈশ্বর একটা আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা ক'রেছেন!

ওহ্ লর্ড, আওয়ার সেভিয়ার!

ছোটোখাটো সেনাপতিরা যতই উল্লসিত হোক, জেনারেল হিয়ার্সের মুখে কিন্তু চিন্তার রেখা ফুটে উঠ্‌লো। কেমন যেন একটা অশুভ ইঙ্গিত!

ফৌজী কানুনে বিদ্রোহীর ক্ষমা নেই। কোর্ট-মার্শাল ক'রতেই হবে। নিতান্ত সাধারণ একটা আকস্মিক বিক্ষিপ্ত ঘটনা হ'লে কোর্ট মার্শালে কিছুটা নরম ব্যবস্থা নিলেও হয়তো চ'লতো। কিন্তু এ-ঘটনা আকস্মিক-ও নয়, বিক্ষিপ্ত-ও নয়। ব্যারাকপুরে আজ যা ঘটলো, একমাস আগে বহরমপুরেই তা ঘ'টতে পারতো। তেতাল্লিশ নম্বর নেটিব রেজিমেন্ট ফেব্রুয়ারি মাসেই বেঁকে ব'সেছিল বহরমপুরে। তাদের সংগে নেটিব গোলন্দাজ বাহিনীও প্রায় যোগ দিয়েছিল আর কি! তারাও কার কাছে শুনেছে, নতুন কার্তুজের মোড়কে নিষিদ্ধ জানোয়ারের চর্বি মাখানো হ'য়েছে। তাছাড়াও, উত্তর ভারতের বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্ট থেকে গোপন খবর এসেছে, ফৌজী রসদখানা থেকে নেটিব সেপাইরা আটা নিতে অস্বীকার ক'রেছে। এমন কি, এ-ব্যাপারে সমবেতভাবে দরখাস্ত-ও নাকি কোথাও কোথাও পেশ করা হ'য়েছে।

অনেক খবরই রাখতে হয় জেনারেলকে।

কার্তুজে চর্বির গুজবটা এখন আর কেবল এই বাঙলা মুলুকেই সীমাবদ্ধ নেই, বিহারের দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট থেকে শুরু ক'রে উত্তরে আম্বালা, জলন্ধরের ক্যান্টনমেন্ট পর্যন্ত বাতাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে-গুজব। সব খবর পাওয়া না গেলেও অনেক খবরই এসেছে ফোর্ট উইলিয়মে। সমস্ত উত্তরভারত জুড়ে কিছুদিন ধ'রে চলছে একটা রহস্যময় ব্যাপার। চাপাটি নামে যে রুটি নেটিবদের খাবার—রহস্য সেই চাপাটিকে নিয়ে। হাতে হাতে ঘুরছে চাপাটি। এক হাত থেকে অন্য হাত, এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রাম, এক জেলা থেকে অন্য জেলায়। কোনো একটা ইঙ্গিত, কোনো কিছু সঙ্কেত আছে এই চাপাটি চালাচালির ভেতর; কিন্তু সেই সঙ্কেতের রহস্য কিছুতেই ধরা যাচ্ছে না।

নেটিবরা কী ক'রতে চায়? তার একটা চকিত আভাস বোধহয় পাওয়া গেল!

একটা স্ফুলিঙ্গ মাত্র। তাকে নিবিয়ে দিতে অবশ্য খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি। কিন্তু দৃষ্টির অগোচরে একটা স্ফুলিঙ্গ যদি কখনো বারুদের স্তূপের ওপর গিয়ে পড়ে?

না, কোনো কোমলতা নয়!

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রত্নখনি উপনিবেশ এই ভারতবর্ষ! ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজকীয় মুকুটের উজ্জ্বলতম রত্ন! গত একশো বছরে গ্রেট ব্রিটেনের উপ্‌চে-পড়া সম্পদের উৎস এই দেশ। কোনো দুর্লভ মণি-মাণিক্যের বিনিময়েও এ-সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব হারাতে পারে না ব্রিটিশ জাতি। সেক্ষেত্রে সামান্য কয়েক হাজার মূর্খ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন নেটিব সেপাইয়ের অসন্তোষকে এতখানি গুরুত্ব দিতে হবে? অঙ্কুরেই বিনাশ ক'রতে হবে এই বিদ্রোহের বীজ। বিশেষত হিয়ার্‌সের নিজের ক্যান্টনমেন্টেই যখন প্রকাশ্য অবাধ্যতার প্রথম দৃষ্টান্ত দেখা দিয়েছে তখন জেনারেল হিসেবে তাঁর দায়িত্ব এখন সবচেয়ে বেশি। এই মুহূর্তে সামান্য বিচলিত হ'লে সারা ভারতের ব্রিটিশ মহলে তাঁর নামে ছি ছি প'ড়ে যাবে। সে ধিক্কার অসহ্য!

নিষ্ঠুরতম দণ্ড দিতে হবে বিদ্রোহীদের নেতাকে। এমনভাবে সে দণ্ডের আয়োজন ক'রতে হবে যা দেখে শিউরে ওঠে প্রত্যেকটি নেটিব সেপাই।

হ্যাঁ, ফাঁসি!

কোর্ট মার্শাল হবে—হুকুম হবে ফাঁসিতে প্রাণদণ্ড। ক্যান্টনমেন্টের প্রকাশ্য স্থানে সমস্ত নেটিব সেপাইদের দাঁড় করিয়ে ফাঁসির দড়িতে ঝোলানো হবে মঙ্গল পাণ্ডে নামে ওই দুর্বিনীত শয়তানটাকে।

আর ঈশ্বরী পাণ্ডে?

যদিও বন্দী হওয়ার পর লোকটা নাকি হাতে পায়ে ধ'রে ক্ষমা চেয়েছে, তবুও তাকে রেহাই দেওয়া সম্ভব নয়। সামান্য দয়া দেখানো-ও এখন বিপজ্জনক।

সারা হিন্দুস্তানের বর্বর, মূর্খ, ধর্মান্ধ নেটিব সেপাইগুলো যেন বুঝতে পারে, বিন্দুমাত্র অবাধ্যতা সহ্য ক'রবে না ব্রিটিশ সরকার। শক্তির দাপটেই এ-সাম্রাজ্য তারা অধিকার ক'রেছিল, শক্তির দাপটেই এ-সাম্রাজ্যে তারা চিরকাল প্রভুত্ব ক'রবে!

॥ ছাব্বিশ ॥

উন্মত্ত, উদ্দাম কালবৈশাখী।

আকাশের ঈশান কোণে কখন যেন দেখা দিয়েছিল এক টুক্‌রো কালো মেঘ। দেখতে দেখতে সেই ছোট্ট কালো মেঘের টুক্‌রোটা নিকষ কালো পেখম তুলে ঢেকে দিলে সারা আকাশ। তারপরেই হু হু ক'রে ছুটে এলো দামাল ক্ষ্যাপা বাতাস। ধুলোর ঝড়ে ঝাপ্‌সা হ'য়ে গেল ট্যাঙ্ক স্কোয়ারের চারদিক। আরম্ভ হ'ল কালবৈশাখীর প্রথম বর্ষণ।

প্রশস্ত জানালা দিয়ে অতর্কিতে ছুটে-আসা দম্‌কা হাওয়ায় টেবিলের কাগজপত্র সব লণ্ডভণ্ড। কিছু কাগজ ঝ'ড়ো হাওয়ায় পাক খেয়ে খেয়ে ঘরের অন্যদিকে উড়ে বেড়াতে লাগলো।

জানালার কাছে হরিশের টেবিল।

তাড়াতাড়ি কোনোমতে কাগজপত্রগুলোকে চাপা দিয়ে রেখে জানালার কাছে এগিয়ে গেল সে! কিন্তু তখন কার সাধ্য যে ওই দুরন্ত দামাল ঝ'ড়ো হাওয়ার ঝাপ্‌টা এড়িয়ে জানালা বন্ধ করে! ধুলোর ঝড়ে আগেই ঝাপ্‌সা হ'য়ে গেছে ট্যাঙ্ক স্কোয়ার এলাকা। প্রায় অদৃশ্য হ'য়ে গেছে রাইটার্স বিল্ডিংস আর কেন্ট অ্যান্ড্রুজ গির্জা। পশ্চিমদিকে ব্যাঙ্কশালের ওপর দিয়ে গঙ্গা পর্যন্ত যতদূর নজর চলে—শুধু একটা ঝাপ্‌সা আবরণ।

বড়ো বড়ো ফোঁটায় বৃষ্টি নামলো।

অনেক কষ্টে টেনে-আনা জানালার ভারী ভারী পাল্লাগুলো দামাল হাওয়ার দাপটে দু'তিনবার

হরিশের হাত থেকে ছিটকে গেছে। কালীচরণ এগিয়ে এসে সাহায্য করায় শেষ পর্যন্ত জানালা বন্ধ করা সম্ভব হ'ল।

মুচকি হেসে কালীচরণ ব'ললে, কলমের খোঁচায় তো ফি-হপ্তায় রাজা-উজীর মারচো হে, আর ওই হাতে সামান্য এই দুটো জানালার পাল্লা টেনে বন্ধ ক'রতে পারো না?

হরিশ-ও মুচকি হেসে উত্তর দিলে, কী ক'রবো, বলো? এ-যাবৎ কেবল দরজা-জানালার কপাটগুলো খুলে দেওয়ার অভ্যেসটাই রপ্ত ক'রে এয়েচি, বন্ধ করবার বিদ্যেটাতো শেখা হ'য়ে ওঠেনি? ওটা তোমাদের এজুকেটেড নেটিব জেন্টুদেরই ভালো আসে!

—তার মানে?

—খুবই সোজা। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের দৌলতে এই ক'বছরে তোমাদের এই গরীব বামুনের ছেলে যেটুকু জ্ঞান অর্জন ক'রেচে, তারই ভিত্তিতে বলা যায়, দরজা-জানালা তো তুচ্ছ, নিজেদের চোখ-দু'টি বন্ধ ক'রে রাখবার বিদ্যেটাই বোধ হয় ওই এজুকেটেড নেটিব জেন্ট্‌ল-ম্যানদের রপ্ত হ'য়েচে সবচেয়ে বেশি।

—খোঁচাটা বিশেষ কাউকে দিলে, না সবাইকে দিলে, সেটা সম্যক বোঝা গেল না হে! কিন্তু সেটা কি নিজের গায়েও কিঞ্চিৎ লাগচে না? তুমি যে বর্তমানে একজন ডাকসাইটে এজুকেটেড নেটিব ব'লে মার্কা পেয়ে গিয়েচ, সেটা তো ভুললে চ'লবে না হরিশ!

—আমি যে একজন ডাকসাইটে নেটিব তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, কিন্তু এজুকেটেড ব'লে নিজেকে দাবি করিনে। আমি হিন্দু কালেজেও পড়িনি, বাপের জমিদারিও নেই আর বেনিয়ানগিরি করাও আমার দ্বারা হ'ল না!

কালীচরণের মুখে মৃদু হাসি। হিন্দু কালেজ সম্বন্ধে তোমার উষ্মাটা আর গেল না দেখচি! সে যাই হোক, রামগোপালবাবু, প্যারীচাঁদবাবু, এমন কি তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু কিশোরী মিত্তির, মাইকেল দত্ত—যাঁদের সঙ্গে তোমার আজকাল নিত্য ওঠা-বসা, তাঁদের সঙ্গেও কি এইরকম খোঁচা মেরে কথা বলো নাকি?

একটু চুপ ক'রে রইলো হরিশ। তারপর ব'ললে, জানো কালীচরণ, যতই দিন যাচ্চে, অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে ততই যেন আমার মতের অমিল বেড়ে চ'লেচে। অতবড় তেজস্বী পুরুষ রামগোপাল কেমন ক'রে এতখানি মডারেট হ'য়ে গেলেন, তা ভাবতে আমার যেমন অবাক্ লাগে, তেমনি দুঃখ-ও হয়! তাঁর রাজনৈতিক মতামতগুলোকে আজকাল আমি কিছুতেই আর মনে প্রাণে মেনে নিতে পারচি নে। এক এক সময় অবাক হ'য়ে ভাবি, ইনিই কি সেই রামগোপাল ঘোষ, যিনি ব্রিটিশদের ব্ল্যাক অ্যাক্ট মুভমেন্টের বিরুদ্ধে অমন জোরালো কলম ধ'রেচিলেন? মতের মিল হ'চ্ছে না ঠিকই, তবু রামগোপালদাদাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে আন্তরিক শ্রদ্ধা করি। ব'লতে গেলে, একমাত্র তাঁরই স্নেহের টানে আমি এখনো ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে আছি। এই বন্ধনটা না থাকলে কবে ওই জমিদারবাবুদের কত্তা-ভজা বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে আসতুম! হয়তো আরো কিছুদিন পরে বাধ্য হ'য়ে আমাকে তাই ক'রতে হবে।

—না, না হরিশ, তোমার এ-সিদ্ধান্ত আমি সমর্থন ক'রতে পারচি নে। মতবিরোধ হ'চ্চে ব'লে তুমি অ্যাসোসিয়েশন ছেড়ে দেবে কেন? বরঞ্চ, তোমার যুক্তিগুলো তাঁদের বোঝানোর চেষ্টা করো!

—তা বোধহয় আর সম্ভব নয়। রাজা-গজা-জমিদারদের কথা ছেড়ে দাও, রামগোপাল, প্যারীচাঁদের পর্যন্ত ধারণা, আমি দিন দিন চরমপন্থী হ'য়ে যাচ্চি। এদিকে আমার ধারণা, তাঁরা-ই দিন দিন নরমপন্থী হ'য়ে প'ড়চেন। এ-দুটোই যদি সত্যি হয় তাহ'লে দু'পক্ষের ভেতর আপোস হওয়া যে কত কঠিন, তা বুঝতেই পারচো? তাছাড়া, আমি নিজেও অনুভব ক'রচি, দেশের সামান্য সেবা-ও যদি ক'রতে পারি, তা পারবো আমার ওই পেট্রিয়টের পৃষ্ঠায়। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের আবেদন নিবেদনের দরখাস্ত মুসোবিদে

ক'রতে ক'রতে আমি একেবারে হাঁপিয়ে উঠেচি। মাঝে মাঝে মনে হয়, তার চেয়ে কোনো যাত্রানাটক কিম্বা নটী নাচ দেখলেও সময়টা ভালো কাট্‌তো! এই তো সামনের বেস্পতিবার অ্যাসোসিয়েশন একটা মিটিঙ ডেকেচে। আমি সাফ্ জানিয়ে দিয়েচি, সেদিন আমি জোড়াসাঁকোয় নাটক দেখতে যাবো, মিটিঙে যাওয়া সম্ভব হবে না।

জোড়াসাঁকোয় নাটক? কার বাড়ি?

ওই তো সিংঘিদের বাড়ি। সাতু সিংঘির ছেলে কালীপ্রসন্ন ছোকরা সত্যিই একটা করিৎকর্মা ছেলে। পনেরো-ষোলো বছর তো বয়েস, এরই ভেতর বিদ্যোৎসাহিনী সভা নামে একটা সত্যিকারের ভালো সমিতি ক'রেচে। সেদিন তাদের বেণীসংহার নাটক। ছেলেটা আমাকে যথার্থই ভালোবাসে; না গেলে দুঃখ পাবে।

কালবৈশাখী থেমে গেছে।

জানালার কপাট খুলে দিতেই ঘরের ভেতর এসে লুটিয়ে পড়লো বেলাশেষের একফালি পড়ন্ত আলো। কে ব'লবে, একটু আগে হ'য়ে গেছে বৃষ্টি আর দামাল বাতাসের দাপাদাপি!

ছুটির সময়ও হ'য়ে গেছে। কাগজপত্র গুছিয়ে রেখে বেশির ভাগ রাইটার কেরাণিই বেরিয়ে পড়বার উদ্যোগ ক'রছে তখন। কালীচরণ নিজের টেবিলের কাছে চ'লে গেল। হরিশ আবার ব'সে প'ড়লে তার চেয়ারে।

একটু পরে কাছে এসে দাঁড়ালে গিরীশ।—কি হে হরিশ, বেরোবে না?

—আজ আমার একটু দেরি হবে ভাই।

—কেন, কর্ণেল থাকতে ব'লেচেন?

—না হে, নিজের গরজ!—রীতিমতো বিস্মিত স্বরে গিরীশ ব'ললে, বড়ো অদ্ভুত লাগচে! তোমার নিজের গরজ ব'লে কোনো পদার্থ আছে ব'লে তো কখনো শুনিনি! ব্যাপার কী?

—পরে ব'লবো।

—তথাস্তু। আমি তাহলে চলি।

হরিশের টেবিলে তখন চাপা দেওয়া রয়েছে ফোর্ট উইলিয়মের কিছু ঠিকাদারের পাওনা-গণ্ডার হিসেব সমেত বিল আর রসিদ। অডিটের জন্যে সেগুলো এসেছে। সেই কাগজপত্রগুলোর ভেতর থেকে বিশেষ একখানি কাগজ বের ক'রে চোখের সামনে খুলে ধরলে হরিশ।

গঙ্গাধর ব্যানার্জি এণ্ড কোম্পানি
গ্রীজ অ্যাণ্ড ট্যালো সাপ্লায়ার্স
ক্যালকাটা

ফোর্ট উইলিয়মের গুলি বারুদ তৈরির কারখানায় জান্তব চর্বি সরবরাহের ঠিকাদার বিরাট বাঙালী প্রতিষ্ঠান। চর্বি সরবরাহের চুক্তি সম্পন্ন হ'য়েছে আঠারোশো ছাপান্ন সালের পনেরোই আগস্ট। অর্থাৎ এখন থেকে আটমাস আগে!

এই ক'মাসে প্রায় পাঁচশো মণ পশু-চর্বি ফোর্ট উইলিয়মে জোগান দিয়েছে গঙ্গাধর ব্যানার্জি এণ্ড কোম্পানি। কিন্তু কোন্ পশুর চর্বি?

হিসেবের কাগজে কোথাও তা লেখা নেই। লেখা আছে শুধু, জান্তব চর্বি।

কিছুদিন আগে লণ্ডন টাইমসের পৃষ্ঠায় সেই ছোট্ট সংবাদ আর সমালোচনার পংক্তিগুলো হরিশের চোখের সামনে ভেসে উঠ্‌লোঃ—

"সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া গেল, ব্যয় সংক্ষেপের অজুহাতে সামরিক বিভাগে নতুন ধরনের কার্তুজের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত দামী ছাগল-ভেড়ার চর্বির পরিবর্তে শস্তা এবং সহজপ্রাপ্য গোরু-শুকরের চর্বি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। ব্যয়-সংক্ষেপের নামে এই পরিবর্তন কতখানি সমীচীন, তা আর একবার বিবেচনা ক'রে দেখবার জন্যে আমরা সামরিক কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ ক'রছি।"

কোন্ দেশের সামরিক কর্তৃপক্ষকে এ-অনুরোধ ক'রেছে টাইম্‌স্? ব্রিটেনের না বৃটিশ-ভারতের? তা স্পষ্ট নয়। হয়তো দু'টি ক্ষেত্রেই!

টাইম্‌সের সংবাদ.........ফোর্ট উইলিয়মে মণকে-মণ চর্বি সরবরাহের নথিপত্র—টুক্‌রো টুক্‌রো সন্দেহগুলো মনে যেন আরো দানা বাঁধছে! ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্টের বিদ্রোহী সেপাইদের বিশ্বাস কি তাহ'লে সত্যিই অমূলক নয়?

—জানালার দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে কী ভাবচো?

পাশ থেকে হঠাৎ আবার গিরীশের গলা শুনে অন্যমনস্ক হরিশ ফিরে তাকালে। —তুমি যাওনি?

—না হে, গত হইনি। রাস্তায় নেমে আবার ফিরে আসতে হ'ল। ওতোরপাড়ার বাবু জয়কেষ্ট মুকুজ্যে 'বুু ফ্রেন্ড্‌স্' শিরোনামায় আমাদের গোরা মহাপ্রভুদের উদ্দেশ্যে একখানি ইস্তাহার ছেড়েচেন, সেটা তুমি প'ড়েচো?

হ্যাঁ, প'ড়েচি।

—মহাপ্রভুদের কেউ তো এখনো তার কোনো জবাব দেননি। এদিকে আবার 'ক্যাপিটাল' 'ক্যাপিটাল' ব'লে তাঁদের চিৎকারের ঠেলায় তো আর কান পাতা যাচ্ছে না। তাঁরা নাকি এ-দেশের নুলো অর্থনীতিকে চাঙ্গা করবার জন্যেই হাতে মূলধনের ঝাঁপি নিয়ে দয়া ক'রে এদেশে অবতীর্ণ হ'য়েচেন! তাই ভেবেচিলুম, এর ওপর ছোটো একটা চুট্‌কি ছেড়ে দিই। লেখাটা গতকাল রাতেই হ'য়ে গেচে, পকেটে ক'রে সঙ্গেও এনেচি কিন্তু তোমাকে দেওয়ার কথাটা ভুলেই গিয়েছিলুম। রাস্তায় নেমে বেচারা 'ক্যাপিটাল' নিবন্ধটার কথা মনে প'ড়লো ব'লেই আবার ফিরে আসতে হ'ল।

পকেট থেকে পাণ্ডুলিপি বের ক'রে হরিশের টেবিলে রাখলে গিরীশ। হরিশ কেবল শিরোনামটি দেখে নিলে,—ক্যাপিটাল অ্যান্ড এন্টারপ্রাইজ। তারপর সেটা পকেটে রেখে ব'ললে, চলো একসঙ্গেই বেরোই।

কয়েকমিনিটের ভেতর কাগজপত্র গুছিয়ে রেখে দেরাজ বন্ধ ক'রে গিরীশের সঙ্গে বেরিয়ে প'ড়লে হরিশ। ট্যাঙ্কস্কোয়ার থেকে কসাইটোলার পথে তারা পূবমুখো হাঁটতে লাগলো।

একটু ইতস্তত ক'রে গিরীশ ব'ললে, তোমার মতলব কী হে? আমাকে আজও কি পাঞ্চ-হাউসে নিয়ে তুলবে নাকি?

হরিশ হেসে ব'ললে, ধ'রে ফেলেচো? দ্যাখো বাপু, চলি ব'লে গত না হ'য়েও যখন ফিরে এলে তখন আজকের দিনটাও আমাকে নয় সুরাপানে একটু সঙ্গ দিলে? অবশ্য, তারপর যেখানে যাবো সেখানে তোমাকে সঙ্গ দিতে অনুরোধ ক'রবো না।

কোথায় যাবে, অ্যাসোসিয়েশন?

—না হে, খালাসিটোলা। ফুলকি নামে একটা স্ত্রীলোকের কাছে আমি মাঝে মাঝে যাই। ক'দিন আগে তাকে বেশ অসুস্থ দেখে এয়েচি। অসুখ-বিসুখ হ'লে ওরা বড়ো অসহায় হ'য়ে পড়ে। তাই ভাবচি মেয়েটাকে আজ একবার দেখে আসবো।

কোনো কথা না ব'লে চুপ ক'রে রইলো গিরীশ। হরিশ হাসতে হাসতে ব'ললে, তোমার পিউরিটান রুচিতে আঘাত দিলুম নাকি?

বিব্রতভাবে গিরীশ ব'ললে, না, না, তা ভাবচো কেন? আমার ও-সম্বন্ধে কোনো অভিজ্ঞতা নেই ব'লেই আমি—

তার কথা সম্পূর্ণ ক'রতে না দিয়েই হরিশ ব'ললে, ঈশ্বর করুন, এ-সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা তোমার কোনোদিনই যেন না হয়! জানো গিরীশ, তোমাকে আর কিশোরীকে আমার মাঝে মাঝে বড়ো হিংসে হয়! কি পবিত্র দাম্পত্য জীবন তোমাদের! আর মধুর তো কথাই নেই! সত্যিই, অঘোরেয়েতের মতো একজন নারী ওর জীবনে না এলে ও-বেচারাকে তো ছাগলে মুড়ে খেতো! যেমন আমাকে খাচ্ছে!

কথাটা ব'লেই হো হো করে খানিকটা হেসে করুণ-গম্ভীর ভাবটাকে মুছে দিলে হরিশ।

পাণ্ড হাউসে ঢুকে হুইস্কির নির্দেশ দিয়ে গিরীশের দিকে একটু গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে হরিশ ব'ললে, আচ্ছা গিরীশ, সামনে কোনো ঝড়ের সঙ্কেত পাচ্ছ?

—ঝড়ের সঙ্কেত?—ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে গিরীশ ব'ললে, কোথায়?

—মিউটিনি! —শান্ত গম্ভীরস্বরে হরিশ ব'ললে, আগামী পরশুদিন দু'তারিখের প্রেট্রিয়টে একটা নিবন্ধ বেরোচ্চে—দ্য মিউটিনিজ। এটা আগেই বেরোতো, কিন্তু লেখার সময় একটু বাধা প'ড়েচিল।

বিস্মিতভাবে গিরীশ ব'ললে, তা নয় হ'ল, কিন্তু কোথায় মিউটিনি? তুমি কি ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্টের পরশুদিনের ঘটনাটা লক্ষ্য ক'রে ব'লচো?

সে-কথার উত্তর না দিয়ে হরিশ ব'ললে, তোমার কি মনে আছে, নেটিব সেপাইমহলে অসন্তোষকে নিয়ে গত জানুয়ারি মাসে একটা নিবন্ধ আমি লিখেচিলুম?

—মনে থাকবে না কেন? কিন্তু সে তো নিছক একটা গুজবের ওপর নির্ভর ক'রে আছে ব'লে শুনেচি। সেটাকে তুমি দেখচি খুব-ই গুরুত্ব দিয়েচ!

—আমার দৃঢ় বিশ্বাস, গুরুত্ব দেওয়ার সঙ্গত কারণ আছে। মনে হচ্চে, একটা ঝড় আসন্ন!

—তোমার বিশ্বাস অমূলক। কয়েকজন নেটিব সেপাই হঠাৎ কোনো কারণে ক্ষেপে গিয়ে ব্রিটিশ কম্যান্ডারদের ওপর গুলি ছুঁড়েচে কিম্বা কয়েকটা কুঠিতে আগুন ধরিয়ে দিয়েচে—এই সামান্য ব্যাপারটাকে এতখানি গুরুত্ব দেবার কারণ বোধহয় নেই হরিশ! শুনেচি, যে-সেপাইরা হঠাৎ অমন একটা কাণ্ড বাধিয়েচিল তাদের পালের গোদাকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হ'য়েচে।

—লোকটার নাম মঙ্গল পাণ্ডে।

—মঙ্গলই হোক আর অমঙ্গলই হোক, নিছক একটা গুজবে কান দিয়ে বৃটিশ মিলিটারির বিরুদ্ধে এইভাবে রুখে দাঁড়াতে গিয়ে লোকটা আর যাই হোক, বাস্তববুদ্ধির পরিচয় দেয়নি।

হরিশ একটু গম্ভীরস্বরে ব'ললে, আবেগ জিনিসটা সব সময় বাস্তববুদ্ধির ওপর নির্ভর করে না গিরীশ! তবে এ-কথাও আমি তোমাকে ব'লচি, চর্বির ব্যাপারটা হয়তো নিছক ভিত্তিহীন গুজব নয়।

—তুমি কি এ-সম্বন্ধে কোনো তথ্য পেয়েচ?

—হ্যাঁ, পেয়েচি। তথ্য তোমার কাছেও আছে গিরীশ! শুধু দু'য়ের ভেতর যোগসূত্রটাকে বুঝে নেওয়ার অপেক্ষা মাত্র!

—তার অর্থ?

—অর্থ এককথায় বোঝানো যাবে না। কার্তুজে চর্বির ব্যাপারটা হয়তো বর্তমানের একটা ইন্ধনমাত্র। নেটিব সেপাইমহলে বিক্ষোভ আজই নতুন নয়, তার সূত্রপাত অনেক আগে। তুমি কি জানো, আজ থেকে একান্ন বছর আগে লর্ড বার্লোর সময়ে ভেলোরে নেটিব সেপাইদের একটা বিদ্রোহ হ'য়েচিল?

—বিদ্রোহ!

—হ্যাঁ, সীমাবদ্ধ জায়গায় হ'লেও তাকে সরাসরি বিদ্রোহ-ই বলা যেতে পারে। হিন্দু সেপাইদের তিলক-ফোঁটা কাটা আর মুসলমান সেপাইদের বড়ো বড়ো দাড়ি রাখার ওপর নিষেধ জানিয়ে একটা সরকারি আদেশ জারি হ'ল। তারপরই বিদ্রোহ।

—এ তো নিছক একটা ধর্মীয় কুসংস্কার মাত্র! এ নিষেধে অন্যায় কী এমন হ'য়েচে?

একটু উষ্মার সঙ্গে হরিশ ব'ললে, তুমি আমাকে আলাদা ক'রে বুঝিয়ে দিতে পারো, কোন্‌টা ধর্মীয় সুসংস্কার আর কোন্‌টা কুসংস্কার? যে-কোন ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গেই অজস্র সংস্কার মিশে আছে। কোনো ক্রীশ্চানকে তুমি বিশ্বাস করাতে পারবে যে, গঙ্গার জল জর্ডনের জলের চেয়েও অনেক বেশি পবিত্র? এই যে আমরা ব্রাহ্মরা হিন্দু পৌত্তলিকতার সংস্কার থেকে মুক্ত হওয়ার উৎসাহে সমাজগৃহে গিয়ে চোখ বুজে ওঁ তৎসৎ ব'লে স্তবস্তোত্র আউড়ে চ'লেচি, এ-ও তো ক্রিশ্চিয়ান

সংস্কারের পুরোপুরি নকল! হিঁদুয়ানির রীতিনীতি থেকে আলাদা একটা কিছু করবার উল্টো সংস্কারের নেশায় আমরা পুরোপুরি টুকে নিয়েচি ওদের কায়দাকানুন। তুমি জোড়াসাঁকোর দেবেন ঠাকুরকে গিয়ে দুর্গোৎসব ক'রতে বলো—বেচারা আঁৎকে উঠবে!

হরিশের বলবার ভঙ্গি দেখে গিরীশ হেসে ফেললে। হাসির দমক একটু সামলে নিয়ে তারপর ব'ললে, তোমার এ-সব উক্তি শুনলে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মেরা তোমাকে যে সমাজ থেকে তাড়িয়ে ছাড়বেন হে!

—না হে, সে ভয় নেই। 'এক্সট্রিমিস্ট' খেতাব দিয়ে গোঁড়া ব্রাহ্ম গোঁড়া হিঁদু সবাই হরিশ মুখুজ্যেকে খরচের খাতায় লিখে রেখেচে। তারা সবাই জানে, ব্রাহ্ম হরিশের বাড়িতে দুর্গোৎসব হয়।

—সে তো তোমার মাতৃদেবীর আগ্রহে।

—হ্যাঁ, সে-কথা অবশ্য ঠিক। মা বাড়িতে দুর্গোৎসব ক'রতে চান ব'লেই আমি দুর্গোৎসবের অনুষ্ঠান করি। অন্যথায় হয়তো ক'রতুম না। তবে এ-কথা বলচি, দুর্গোৎসব ক'রে পৌত্তলিকতার পাপে আমার ব্রহ্মলোক ফস্‌কে গেল, এমন চিন্তা আমার মাথায় কখনো আসে না।

ওয়েটার এসে পানীয় আর পানপাত্র রেখে গেল।

—হ্যাঁ, যে-কথা বলচিলুম।—পানপাত্রে চুমুক দিয়ে হরিশ ব'ললে, লর্ড বার্লোকে যদি নির্দেশ দেওয়া হ'ত, তিনি ক্রুশ দেখলে সমীহ জানাতে পারবেন না, তাহ'লে তিনিও কি সেটাকে তাঁর ধর্মীয় আচরণের ওপর হস্তক্ষেপ ভেবে ক্ষুণ্ণ হ'তেন না?

তিলক-ফোঁটা কাটা কিম্বা লম্বা লম্বা দাড়ি রাখা যেমন ধর্ম নয়, ক্রুশের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানানোও তেমনি ধর্ম নয়—ধর্মের পালনীয় একটা আচার মাত্র। আর ক্রুশের সংগে তো একমাত্র যেশাসের কাহিনীই জড়িত নয়, সে-আমলের রেওয়াজ অনুসারে যাকে অপরাধী সাব্যস্ত করা হ'য়েছে তাকেই প্রায় ক্রুশে গেঁথে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হ'য়েছে। স্পার্টাকাসের মতো অসমসাহসী ক্রীতদাসের নেতৃত্বে রোমে যখন দাস-বিদ্রোহ হয়েচিল, তখন কত হাজারে হাজারে দাসকে ক্রুশে বিঁধে রোমের রাজপথের পাশে হত্যা করা হ'য়েচিল, তার হিসেব আছে? সেই পটভূমিতে ওই হত্যা-যন্ত্রটাকে কে মনে রেখেচে? যেশাস ক্রাইস্টের জীবন-কাহিনীর সংগে ওইভাবে জিনিসটার সংযোগ হওয়ায় ক্রীশ্চান-জগতে সেটা একটা এতবড়ো ধর্মীয় প্রতীক হ'য়ে দাঁড়িয়েচে, তাই নয় কি?

—তা অবশ্য ঠিক।

—ধর্মীয় সংস্কার জিনিসটাই বড়ো স্পর্শকাতর গিরীশ। লর্ড আমহার্স্টের আমলেও নেটিব সেপাইদের একটা দল বিদ্রোহ ক'রেচিল। সেটার-ও উপলক্ষ্য একটা ধর্মীয় সংস্কার। হিন্দু সেপাইরা ব'ললে, কালাপানি পার হওয়া তাদের ধর্মে নিষেধ। তাই জাহাজে চ'ড়ে তারা বার্মায় যুদ্ধ ক'রতে যাবে না। অথচ তারা জানেও না, সমুদ্রযাত্রায় শাস্ত্রে কোনো নিষেধ-ই নেই। হিন্দুরা এককালে বহু সমুদ্র যাত্রা ক'রেছে, বিদেশে গিয়ে বাণিজ্য ক'রেচে। কিন্তু কয়েকপুরুষ ধ'রে সেপাইরা যে লোকাচারের কথা শুনে এয়েচে, সেইটাকেই তারা ধর্ম ব'লে আঁকড়ে রইলো। তার ফলাফল আগের বারের মতোই হ'ল। ফাঁসির দড়িতে প্রাণ দিতে হ'ল বেশ কিছু সেপাইকে।

—ব্যারাকপুরেও কি তাই হবে?

—তা না হ'লেই অবাক হবো। সামরিক বাহিনীর শৃংখলার ওপর ব্রিটিশদের অচলা ভক্তি। সে শৃংখলার মানে হ'ল নির্বাক আনুগত্য।

কাচের ঝাড়লন্ঠনগুলো জ্ব'লে উঠেচে। আস্তে আস্তে একটু একটু ক'রে ভীড় বাড়ছে পানশালায়। গিরীশ মৃদুস্বরে ব'ললে, এর পরেই তো নরক-গুলজার শুরু হবে। একটু তাড়াতাড়ি উঠে প'ড়লে ভালো হ'ত না?

—হ্যাঁ, তাই উঠবো। ফুলকির ঘর ঘুরে বাড়ি গিয়ে আমাকে আবার মিউটিনির ওপর পরের হপ্তার নিবন্ধটা তৈরি ক'রতে হবে।

গিরীশ ব'ললে, রাম না জন্মাতেই রামায়ণ? মিউটিনির দেখা নেই, তার আগেই তুমি মিউটিনি নিয়ে প্রতি হপ্তায় লিখে চ'লবে নাকি?

—আমার বিশ্বাসের কথা আমি তো আগেই ব'লেচি গিরীশ। দাবানল জ্ব'লে ওঠার আগে দু'চারটে আগুনের ফুলকি দেখা যায়। দোসরা তারিখের পেট্রিয়টে আমি যা লিখেচি তার একটুখানি শোনাই—সিমটম্স্ হুইচ হ্যাভ অলরেডি অ্যাপিয়ার্ড টু ওয়র্ন আস্, এগেন্স্ট দি এক্সিস্টেন্স অব্ এ পাউডার মাইন ইন দ্য র‍্যাঙ্কস্ অব্ দ্য নেটিব সোলজারি দ্যাট ওয়ান্ট্স্ বাট দ্য স্লাইটেস্ট স্পার্ক টু সেট ইন মোশন জাইগান্টিক এলিমেন্ট্স্ অব্ ডেস্ট্রাক্শন।

পানপাত্রে শেষ চুমুক দিয়ে হরিশ ব'ললে, তোমার বোধহয় অনেক দেরি হ'য়ে গেল, বৌমা চিন্তা ক'রবেন।

একটু অপ্রতিভ হাসি হেসে গিরীশ ব'ললে, সেটা অবশ্য মিথ্যে বলোনি। অকারণে দুশ্চিন্তা ক'রবার বাতিক তাঁর একটু আছে।

একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ম্লান হেসে হরিশ ব'ললে, তুমি কত ভাগ্যবান! আমার ওই একটা মস্ত সুবিধে। মা আর বিধবা ভাইঝিটা ছাড়া বাড়িতে আমার জন্যে দুশ্চিন্তা করবার কেউ নেই!

॥ সাতাশ ॥

কোর্ট মার্শাল!

এপ্রিল মাসের ছ'তারিখ সোমবার।

ব্যারাকপুর পল্টন ছাউনির প্রায় সমস্ত এলাকা জুড়ে একটা গভীর থমথমে ভাব। ব্যতিক্রম শুধু গোরা সেপাইদের ব্যারাক আর অফিসারদের কুঠিগুলো। সেখানে উল্লাস যেন ফেটে প'ড়ছে। কোর্ট মার্শালের রায় কী হবে, কী হও।া উচিত—তা সবাই জানে। তবু বিচারের রায় না বেরোনো পর্যন্ত ধৈর্য ধ'রতেই হবে! উল্লাসের অভিব্যক্তিকে চেপে রেখে গম্ভীর হ'য়ে থাকতেই হবে যতক্ষণ বিচার চলে।

কয়েক মিনিটের ভেতরেই বিচারপর্ব শেষ। সামরিক আদালতের রায় ঘোষিত হ'ল। আইন-ভঙ্গকারী বিদ্রোহী নেটিব সেপাইদের নেতা মঙ্গল পাণ্ডের প্রাণদণ্ড। ফাঁসির মঞ্চে কার্যকর করা হবে দণ্ডাদেশ। জমাদার ঈশ্বরী পাণ্ডের প্রতিও সামরিক আদালতের সেই একই দণ্ড বিধান। তবে দু'জন অপরাধীরই দণ্ডদান একদিনে নয়।

মঙ্গল পাণ্ডের অপরাধের গুরুত্ব অনেক বেশি।

তার বেঁচে থাকার মেয়াদ তাই মাঝে একটা মা দিন। বুধবার আট তারিখে প্রকাশ্য স্থানে সমবেত সেপাইদের চোখের সামনে তাকে গলায় প'রে নিতে হবে ফাঁসির দড়ি। সমস্ত নেটিব সেপাই যেন বুঝতে পারে, বৃটিশ সামরিক বাহিনীর আইন-শৃঙ্খলা কত কঠোর! শৃঙ্খলাভঙ্গকারীর ক্ষেত্রে সেখানে ক্ষমা নেই!

আর ঈশ্বরী পাণ্ডে?

তার অপরাধের গুরুত্ব মঙ্গল পাণ্ডের চেয়ে একটু কম ব'লে তাকে বাঁচতে দেওয়া হবে আরো কয়েকটা দিন। দু'সপ্তাহ পরে বাইশ তারিখে মঙ্গলের সঙ্গে একই পথের পথিক হ'তে হবে তাকে।

রায়ের হিন্দী বয়ান প'ড়ে শোনানো হ'ল মঙ্গলকে।

অকম্পিত, অচঞ্চল যুবক। স্থির দৃষ্টিতে হিন্দী অনুবাদকের দিকে তাকিয়ে সংক্ষিপ্ত

কথাগুলি সে শুনলে। উদ্দেশ্য ব্যর্থ হ'লে এ-পরিণাম যে অবধারিত, তা জেনেই তো সেদিন সে হাতিয়ার হাতে ব্যারাক থেকে বেরিয়ে প'ড়েছিল।

পরোয়ানা প'ড়ে শোনানো হ'ল ঈশ্বরী পাণ্ডেকে।

থর্ থর্ ক'রে কাঁপতে কাঁপতে হঠাৎ বুকফাটা কান্নায় ভেঙে প'ড়ে হাতে-বাঁধা শেকল দিয়ে সে নিজের মাথায় ঘা মারতে লাগলো।

বিচারকের সঙ্গে করমর্দন ক'রলেন জেনারেল হিয়ার্সে। মুচকি হেসে করমর্দনের উষ্ণ উত্তাপটুকু নিয়ে নিরপেক্ষ বিচারকের ভঙ্গিতে গম্ভীর মুখে আদালতকক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন সামরিক বিচারক।

অন্যান্য দিনের মতোই সূর্য যথাসময়ে অস্ত গেল, নেমে এলো অন্ধকার। নেটিব সেপাইদের রসুইখানায় কাঠের উনুনে তৈরি হ'ল সব্জি আর চাপাটি। অফিসারদের কুঠিতে কুঠিতে ছুটলো ফেনিল মদের ফোয়ারা। পল্টন ছাউনির কয়েদখানার দু'টো আলাদা কুঠুরিতে অন্ধকারে ব'সে রইলো দুই দণ্ডিত আসামী। কুঠুরির লোহার গরাদের সামনে চক্‌চকে সঙ্গীন-লাগানো কার্তুজ-ভরা রাইফেল হাতে চারজন ক'রে আটজন গোরা সান্ত্রী। রাত্রির প্রতি প্রহরে কেবল শোনা যেতে লাগলো তাদের বুটের শব্দ—খট্ খট্—খট্ খট্—

মাঝে একটা মাত্র দিন।

আট তারিখে দিনের আলোয় সমস্ত সেপাইদের চোখের সামনে ফাঁসি হ'ল মঙ্গল পাণ্ডের। ভয়ে বিবর্ণ নেটিব সেপাইরা তাদের গোরা কম্যাণ্ডারদের সামনে ধর্মের নামে প্রতিজ্ঞা ক'রলে, তারা কোনদিন এইরকম দুর্বুদ্ধির দাস হবে না; রুটি-রুজি দেনেওয়ালা কোম্পানিরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার স্বপ্নও তারা দেখবে না। জান্ যায় যাক, তবু তারা অনুগত থাকবে—কোম্পানির অনুগত গোলাম।

আত্মপ্রসাদে উল্লসিত জেনারেল হিয়ার্সে।

তীক্ষ্ণ, হিসেবী বাস্তববুদ্ধির মানুষ তিনি। এ যাবৎ নিজের মাইনের টাকাগুলো প্রায় সবটুকুই জমার ঘরে রেখে ক্যান্টনমেন্টের রসদখানা আর হিসেবের খাতার ভেতর থেকেই তাঁর কুঠির দৈনন্দিন খরচ, এমন কি তাঁর মেমসাহেবের বিলাস-ব্যসনের খরচটাও তিনি নিয়মিতভাবেই তুলে নিয়েছেন। তার ওপর নেটিব দালাল আর ঠিকাদারদের কাছে প্রাপ্য দস্তুরি তো আছেই।

সেই হিয়ার্সে সাহেব নিজের খরচে একটা পার্টি দিয়ে ব'সলেন!

উল্লাসের ঢেউ লাগলো ক'লকাতাতেও। হোটেল, ট্যাভর্ন আর পাঞ্চ হাউসে ভীড় উপ্‌চে প'ড়ছে!

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো বড়োবাজার, চীনেবাজার, টিরেটাবাজারের ব্যবসায়ীরা। সেপাইদের উট্‌কো বেয়াদপির ফলে সত্যিই যদি একটা হৈ হৈ কাণ্ড বেধে যেতো, তাহ'লে কি সর্বনাশই না হ'ত কারবারের! বেয়াদপ সেপাইদের ফাঁসিতে তখনকার মতো অন্তত নিশ্চিন্ত হ'ল বৃটিশ ভারতের মেট্রোপলিস ক'লকাতা মহানগরী।

কেবল নিশ্চিন্ত হ'তে পারেনি ফোর্ট উইলিয়ম।

উনিশ নম্বর আর চৌত্রিশ নম্বর নেটিব রেজিমেন্ট—এই দু'টোই বড়ো উদ্ধত আর অপয়া। অযোধ্যা দখলের সময় এই দু'টো রেজিমেন্টকেই নিয়ে যাওয়া হ'য়েছিল। নির্দেশ তারা মেনেছিল বটে, তবে খুব একটা আন্তরিকভাবে নয়। দানাপুরে চল্লিশ নম্বর নেটিব ইন্‌ফ্যান্ট্রিতেও কয়েকদিন আগে বেশ কড়া রকমের সাজার ব্যবস্থা ক'রতে হ'য়েছে। কয়েকজন সেপাই খুন ক'রেছিল তাদের ওপরওয়ালা শ্বেতাঙ্গ অফিসারকে। খুনী সেপাইগুলোকে সনাক্ত করা গেছে। তাদের প্রাপ্য দণ্ডও দেওয়া হ'য়েছে। কিন্তু এইভাবে যদি এখানে-ওখানে যখন তখন নেটিব সেপাইগুলোর বেয়াদপি চ'লতে থাকে, তাহ'লে সামরিক বাহিনীতে শৃঙ্খলা রক্ষা করাই তো

কঠিন হ'য়ে প'ড়বে! এখন পর্যন্ত অবস্থা যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে তাতে শুধুমাত্র দু'একটা নেটিব সেপাইকে চরম দণ্ড দিলেও সমস্যা মিটবে না। আরো অনেক বেশি কঠোর হওয়া দরকার!

ফোর্ট উইলিয়মের সর্বাধিনায়ক ঘন ঘন কয়েকদিন যাতায়াত ক'রলেন গবর্নমেন্ট হাউসে। গবর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং যথেষ্ট বিচক্ষণ ব্যক্তি। পরিস্থিতি বুঝিয়ে ব'ললে তিনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন। তাঁকে নিয়ে তত সমস্যা নয়, সমস্যা হ'ল তাঁর পরামর্শদাতা সুপ্রীম কৌন্সিলের চারজন সদস্যের ভেতর দু'জনকে নিয়ে। মিস্টার জন পিটার গ্র্যান্ট আর জাস্টিস বার্নেস পীকক বৃটিশ হ'য়েও কেন যে কথায় কথায় সামরিক বিভাগের বেশির ভাগ সিদ্ধান্তের এত কঠোর সমালোচনা করেন, তা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারেন না জেনারেল লো। মিস্টার গ্র্যান্ট সব সময় এমন ভাব দেখান যেন, তাঁকে সিবিলিয়ান ক'রে এদেশে পাঠানোর সময় কোম্পানির কোর্ট অব্ ডাইরেক্টর্স্ তাঁর কোটের এক পকেটে বাইবেল আর অন্য পকেটে ঈশপের নীতি-গল্পের বই গুঁজে দিয়েছে! আর জাস্টিস পীকক? সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি ব'লে দেমাকে তাঁর যেন মাটিতে পা পড়ে না! কথায় কথায় আইনের কচ্‌কচি! আরে বাপু, আইন জিনিসটা কি বেথেলহেম থেকে আমদানি হ'য়েছে নাকি? নিজেদের শাসন নির্বিঘ্নে চালানোর জন্যে দরকারমতো যে নিয়মকানুনগুলো তৈরি ক'রে নিতে হয়, তারই নাম আইন—এ-কথা তো দুনিয়ার মানুষ জানে! ব্যতিক্রম বোধহয় একমাত্র জাস্টিস পীকক! এই তো, গত জানুয়ারি মাসে আবার একটা অশান্তির চারাগাছ পুঁতেছে লোকটা! সেই বেথুনের ব্ল্যাক আক্‌টের ধাঁচে কৌন্সিলে একটা বিল এনেছে। ফৌজদারি আদালতের এক্তিয়ার বাড়িয়ে নেটিবগুলোর সঙ্গে শ্বেতাঙ্গদেরও একই আইনের আওতায় না আনলে নাকি বিচারব্যবস্থার নিরপেক্ষতা থাকবে না! এই আহাম্মুকি আব্দার কোনো সুস্থমস্তিষ্ক শ্বেতাঙ্গ মেনে নিতে পারে?

পীকক আর গ্র্যান্ট—এই দু'টো লোককে দু'চোখে দেখতে পারেন না জেনারেল লো। কিন্তু উপায় নেই। গবর্নর জেনারেল নিজে তাঁদের বক্তব্যগুলো সব সময়েই ধৈর্য ধ'রে শোনেন। সুতরাং কৌন্সিলের মিটিঙে ব'সে মনে মনে যত বিরক্তিই থাক, মুখ বুজে ওই বেয়াড়া লোকদু'টোর প্রলাপ শুনতেই হয়!

কৌন্সিলের চতুর্থ সদস্য মিস্টার ডোরিন এ-সব দিক থেকে খাঁটি ভদ্রলোক। একটু পাগলাটে বটে, তবে নমনীয়। একটু পাগলাটে হ'লেও মিস্টার ডোরিন অন্তত পীকক আর গ্র্যান্টের মতো বিরক্তিকর হামবড়া সিবিলিয়ান ন'ন। তাঁকে কবল একবার বুঝিয়ে দিতে হবে যে ব্রিটিশ-স্বার্থ বিপন্ন! বাস্, সঙ্গে সঙ্গে তিনি ব্রিটিশ-স্বার্থের খাতিরে যে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণে সম্মত। তাঁর তুলনায় অন্য দু'জন? ন্যায়, নীতি, নিরপেক্ষতা কত সব চটকদার বুলি!

এইজন্যেই ভেতরে ভেতরে রাগে ফেটে পড়েন জেনারেল লো। তিনিও কৌন্সিলের একজন সদস্য। তাছাড়া সামরিক বিভাগের অধিনায়ক হিসেবে তাঁর অভিজ্ঞতাও অনেক বেশি। তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট। ন্যায়-নীতির কচ্‌কচি ক'রতে হয় বাপু, দেশে গিয়ে ক'রো! এখানে কেন? হাতের মুঠোয় এতবড়ো একটা সাম্রাজ্যের দৌলতে অবস্থা ফিরে গেছে গ্রেট ব্রিটেনের। এখনই সম্পদ উপ্‌চে পড়বার উপক্রম হ'য়েছে। আর কিছুদিনের ভেতরেই প্রতিপক্ষ ফরাসী, পর্তুগীজ, ডাচ, দিনেমার, স্প্যানিশ—সবাইকে বহু পিছনে ফেলে সম্পদ প্রাচুর্যের স্বপ্নরাজ্যে পেঁছে যাবে বৃটিশজাতি। এই সময়ে বিন্দুমাত্র নরম হ'লে চলে?

এবারে দৃঢ়সঙ্কল্প জেনারেল লো। যেমন ক'রেই হোক, সামরিক পরিকল্পনার সমর্থনে গবর্নর জেনারেলের সম্মতি আদায় ক'রতেই হবে!

সম্মতি অবশ্য পাওয়া গেল কিন্তু আংশিকভাবে। তাঁর দাবি ছিল আরো কয়েকজন নেটিব সেপাইয়ের ফাঁসি। সেটা মঞ্জুর হ'ল না। তার বদলে সিদ্ধান্ত হ'ল উনিশ আর চৌত্রিশ নম্বর ইন্‌ফ্যান্ট্রি একেবারে ভেঙে দেওয়া হবে।

অগত্যা কৌন্সিলের সেই সিদ্ধান্তই মেনে নিলেন জেনারেল লো।

স্বয়ং গবর্নর জেনারেল যখন এই মুহূর্তেই আর ফাঁসির পক্ষপাতী ন'ন, তখন সে-প্রস্তাব নিয়ে জোর-জবরদস্তি না করা-ই ভালো। ওই বদমাশ রেজিমেন্ট দু'টোকে যে একেবারে ভেঙে দেওয়া হবে, সেইটুকুই যা শান্তি!

বেঙ্গল আর্মির ভেতর ওই উনিশ আর চৌত্রিশ নম্বর রেজিমেন্ট দু'টো কেবল যে বেয়াদপ তাই নয়, মারাত্মকরকম অপয়াও বটে। কেন সামরিক বাহিনীতে এ-ধারণা হ'য়েছে, তা-ও সবিস্তারে বর্ণনা ক'রলেন জেনারেল। ওদের নিয়ে এ পর্যন্ত অনেক টুক্‌রো টুক্‌রো অশান্তি হ'য়েছে। একেবারে হালফিল যে ঘটনা, তা তো 'দ্য মোস্ট নোব্‌ল্‌ গবর্নর জেনারেল' এবং সুপ্রীম কৌন্সিলের মাননীয় সদস্যাবৃন্দ সবই জানেন। মঙ্গল পাণ্ডে নামে যে নেটিব সেপাইটা ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্টের ঘটনার নেতা, সে ওই চৌত্রিশ নম্বরেই একজন সেপাই ছিল। ওই মারাত্মক অপয়া রেজিমেন্ট দু'টো টি'কে থাকলে ভবিষ্যতে আরো নানারকম অশান্তি দেখা দেওয়া মোটেই বিচিত্র নয়!

সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত হ'ল।

ঠিক হ'ল, উনিশ নম্বরকে আগে ভেঙে দিয়ে সেপাইগুলোকে পল্টন ছাউনি থেকে বিদায় দেওয়ার পর কিছুদিন তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা হবে। নেটিব সেপাই মহলে যদি কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা না যায় তাহ'লে তার কিছুদিন পরেই চৌত্রিশ নম্বরকে ভেঙে সেপাইগুলোকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে।

বার্নেস পীকক একবার প্রশ্ন তুললেন, নেটিব সেপাইদের বিক্ষোভের কারণগুলো যদি কিছুটাও অন্তত দূর না করা যায় তাহ'লে কেবল দু'টো রেজিমেন্ট ভেঙে দিলেই কি সব সমস্যার সমাধান হ'য়ে যাবে?

রাগে ভেতরটা জ্ব'লে যাচ্ছিল জেনারেল লো'র। তবু অনেক চেষ্টায় সে-রাগ চেপে রেখে সংযত স্বরে তিনি ব'ললেন, মাননীয় সদস্য কি মনে করেন, কোনোরকম শৃংখলাগত ব্যবস্থা না ক'রে এখনো আমাদের নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত?

উত্তেজিত স্বরে মিস্টার ডোরিন ব'ললেন, হ্যাঁ, ঠিক কথা ব'লেছেন জেনারেল লো। নিতান্ত ভিত্তিহীন একটা গুজবকে নিয়ে অশিক্ষিত, বর্বর নেটিব সেপাইগুলো ধর্মের দোহাই দিয়ে যেখানে যখন খুশি একটা অনর্থ বাধিয়ে ব'সবে আর আমরা সেটা মুখ বুজে সহ্য ক'রে যাবো? তাদের যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধে দেওয়া হয়, তার পরেও আবার ক্ষোভের কী কারণ থ'কতে পারে? কোথায় কৃতজ্ঞ থাকার কথা, তার বদলে উল্‌টে বেইমানি? এত আস্কারা দেওয়া হয় ব'লেই তো কালা আদমিগুলো মাথায় ওঠার সাহস পায়!

ডোরিনের শেষ কথাটার লক্ষ্য যে বার্নেস পীকক, সেটা প্রচ্ছন্ন রাখবার কোনো চেষ্টাই ক'রলেন না তিনি। বরঞ্চ, কথাটা বলবার সময় পীককের দিকে বেশ আড়চোখে তাকিয়ে আরো স্পষ্ট ক'রে সেটা বুঝিয়ে দিলেন। ঢাক ঢাক গুড়্‌ গুড়্‌ তাঁর নেই।

উত্তেজিত ডোরিন এবং উৎসাহিত জেনারেল লো'র দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে নিয়ে মৃদু হেসে পীকক ব'ললেন, মাননীয় সদস্য খুবই উত্তেজিত হ'য়ে প'ড়েছেন তা বুঝতে পারছি। মহামান্য গবর্নর জেনারেল বর্তমান পরিস্থিতিতে কী সিদ্ধান্ত নেবেন, জানি না। তবে কৌন্সিলের একজন দায়িত্বশীল সদস্য হিসেবে নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক অনুসারে তাঁকে সুপরামর্শ দেওয়াই আমার কর্তব্য ব'লে আমি মনে করি। সরকারের বিচার-বিভাগের সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে এই ক'বছরে আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা হ'য়েছে, তারই ভিত্তিতে আমি ব'লচি, নেটিবদের এমন বেশ কিছু ক্ষোভের কারণ আছে যেগুলো কাল্পনিক নয়—রূঢ় বাস্তব! বিশেষত, বিচারের ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল ধ'রে শ্বেতাঙ্গ আর নেটিবদের মধ্যে যে পার্থক্য ক'রে রাখা হ'য়েচে, তার ফলে বিচার ব্যবস্থায় আর যাই হোক, নিরপেক্ষতা থাকতে পারে না। আশা করি, এই রুদ্ধদ্বার বৈঠকে ব'সে মাননীয় সদস্য সেটুকু অন্তত স্বীকার করতে কার্পণ্য ক'রবেন না?

সঙ্গে সঙ্গে ডোরিন ব'ললেন, বিচার বিভাগের সঙ্গে সামরিক বিভাগের কী সম্বন্ধ?

এতক্ষণে কথা ব'ললেন পিটার গ্র্যান্ট। ডোরিনের দিকে তাকিয়ে খুব শান্ত অথচ গম্ভীরস্বরে তিনি ব'ললেন, আপনি বোধহয় ভুলে যাচ্চেন মিস্টার ডোরিন যে, সমস্ত বিভাগগুলো একই সরকারের অধীন? সেটা যদি বাস্তব হয় তাহ'লে প্রত্যেক বিভাগের সঙ্গেই প্রত্যেক বিভাগের সম্বন্ধ অবশ্যই আছে। তাই—

জেনারেল লো একটু উত্তেজিতভাবে কী যেন ব'লতে যাচ্ছিলেন। মৃদু হেসে তাঁকে বাধা দিয়ে ক্যানিং ব'ললেন, একটু ধৈর্য ধরুন জেনারেল! মাননীয় সদস্য মিস্টার গ্র্যান্টের কথা এখনো সম্পূর্ণ হয়নি।

জেনারেল লো নিরুপায়ভাবে মুখ বন্ধ ক'রলেন।

পিটার গ্র্যান্ট ব'লতে লাগলেন, তাই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সব দিকগুলোই খুব সতর্কভাবে বিবেচনা করা দরকার, আমি সেই কথাই ব'লতে চাই। সামরিক বিভাগে বিদ্রোহ কিম্বা বিশৃঙ্খলাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না, সে-সম্বন্ধে আমার-ও দ্বিমত নেই। আমি শুধু এইটুকুই ব'লতে চাই যে, হাতে ক্ষমতা আছে ব'লেই উত্তেজনার মাথায় এমন কোনো কঠোর ব্যবস্থা যেন না নেওয়া হয় যার ফলে নেটিব সেপাইদের মন থেকে বিদ্বেষের আগুন নিবে যাওয়ার বদলে ভেতরে ভেতরে আরো বেশি ক'রে জ্ব'লে ওঠে। এখন যা অবস্থা তাতে চার-পাঁচজন কেন, ইচ্ছে ক'রলে রেজিমেন্টের সব ক'জন সেপাইকেই হয়তো ফাঁসির দড়িতে ঝোলানো যায়। কিন্তু তার দ্বারা সামরিক বাহিনীতে নেটিব সেপাইদের বেয়াদপি চিরদিনের মতো বন্ধ হ'য়ে যাবে, এ প্রতিশ্রুতি কি দিতে পারেন জেনারেল লো?

একটু বিব্রতভাবে জেনারেল ব'ললেন, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এ-ধরনের নিশ্চিন্ত প্রতিশ্রুতি দেওয়া কেমন ক'রে সম্ভব?

ক্যানিং ব'ললেন, মিস্টার গ্র্যান্ট সুবিবেচনার কথা-ই ব'লেচেন।

—ইয়োর এক্সেলেন্সি!—বিনীতভাবে গ্র্যান্ট ব'ললেন, আমি মাননীয় সদস্য জাস্টিস পীককের বক্তব্যকে সমর্থন ক'রেছি মাত্র। এই বক্তব্য আপনার কাছে যদি সুবিবেচনার ব'লেই মনে হয় তাহ'লে তার কৃতিত্ব জাস্টিস পীককেরই প্রাপ্য।

—ধন্যবাদ মিস্টার গ্র্যান্ট! —ব'ললেন ক্যানিং।

সিদ্ধান্ত গৃহীত হ'ল—দু'টো রেজিমেন্টকে ভেঙে দেওয়া হবে। সরকারি হুকুমনামায় স্বাক্ষর ক'রলেন গবর্নর জেনারেল ভাইকাউন্ট ক্যানিং।

মনের ক্ষোভ চেপে মুখে বিগলিত হাসি ফুটিয়েই গবর্নর জেনারেলের হুকুমনামা হাতে নিলেন জেনারেল লো। তাঁর অভিপ্রায় পূর্ণ না হ'লেও এই সিদ্ধান্ত-ই তাঁকে নিতে হ'ল। ব্যারাকপুরের জেনারেল হিয়ারসে হয়তো এই মৃদু দণ্ডব্যবস্থায় খুশি হবেন না। কিন্তু উপায় কী? স্বয়ং গবর্নর জেনারেল যখন খুব বেশি কঠোর ব্যবস্থার পক্ষপাতী ন'ন তখন আর তো কিছু বলা চলে না। তবে গবর্নর জেনারেল যে একটা মারাত্মক ভুল ক'রলেন, এ-বিষয়ে জেনারেল লো নিঃসন্দেহ। মনে মনে তিনি ব'ললেন, গবর্নর জেনারেল সবে বছরখানেক হ'ল এদেশে এসেছেন। এদেশি বদমাশগুলোকে এখনো তো চিনে উঠতে পারেননি? যেদিন চিনতে পারবেন, সেদিন বুঝবেন, এরা কত হাড় বজ্জাত! ব্লাডি নেটিবগুলোকে টিট্ ক'রতে হ'লে কত শক্ত হাতে যে তা করা দরকার, সেদিন সেটা হাড়ে হাড়ে টের পাবেন তিনি! জেনারেলের যে পরামর্শটাকে বড়ো বেশি কঠোর ব'লে আজ তিনি পাশ কাটিয়ে গেলেন, তার চেয়ে অনেক বেশি কঠোর ব্যবস্থার পথে তাঁকে যেতে হবে একদিন! সেদিন কপাল চাপড়েও কূল পাবেন না গবর্নর জেনারেল অব্ ইণ্ডিয়া!

তা যদি না হয়তো নিজের নামে কুকুর পুষবেন জেনারেল লো। হাতের তরোয়াল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ফিরে যাবেন স্বদেশে। সৈন্যচালনার বদলে তিনি ভেড়া চরাবেন বাকি জীবন!

কৌন্সিলের আলোচনাসভা আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হ'ল। সামরিক অভিবাদন জানিয়ে সবচেয়ে

আগে প্রস্থান ক'রলেন জেনারেল লো। তারপর একসঙ্গে বিদায় নিলেন জাস্টিস পীকক এবং মিস্টার ডোরিন। ক্যানিংয়ের ইঙ্গিতে ব'সে রইলেন একমাত্র পিটার গ্রান্ট।

সবাই বেরিয়ে যাওয়ার পর মৃদুস্বরে ক্যানিং ব'ললেন, মিস্টার গ্রান্ট, আপনি কি জানেন, হিন্দু পেট্রিয়ট নামে নেটিব-পরিচালিত একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হয়?

—জানি ইয়োর এক্সেলেন্সি। আমার বন্ধু মিস্টার সীটন কার হিন্দু পেট্রিয়ট রাখেন। তাঁর বাড়িতে কোনো কোনো সংখ্যা প'ড়েছি।

—বেশ চিন্তাশীল সম্পাদক! ফেব্রুয়ারি মাসে একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হ'য়েছে যার ভেতর বেশ জোর দিয়ে একথা বলা হ'য়েছে যে, এদেশের নেটিব সেপাই মহলে পুঞ্জীভূত অসন্তোষ বর্তমানে বিশাল এক বারুদের স্তূপের মতো হ'য়ে আছে। যে কোনো মুহূর্তে সামান্য একটা স্ফুলিঙ্গ থেকে সেই বারুদের স্তূপ সারা দেশে দাউ দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠতে পারে।

—নিবন্ধটা আমি প'ড়েছি।

—আমারও তাই ধারণা। অথচ দেখুন, আমাদের সামরিক বিভাগের কর্তৃপক্ষ হয়তো তা জেনেও গ্রাহ্য ক'রতে চান না। একটু আগে জেনারেল লো খুব অসন্তুষ্ট মনেই বিদায় নিলেন। তাঁর হয়তো ইচ্ছে ছিল, ব্যারাকপুরে ক্যান্টনমেন্টের সব নেটিব সেপাইকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে দেওয়া হোক।

—কি জানি!—ব'ললেন পিটার গ্রান্ট।—আমারও মনে হয়, এ-সময় আমাদের খুবই সতর্কভাবে পদক্ষেপ প্রয়োজন।

—আমি সেই চেষ্টাই ক'রছি মিস্টার গ্রান্ট। এ-ব্যাপারে আপনি আজ আমার সঙ্গে যথেষ্ট সহযোগিত ক'রেছেন ব'লে পৃথকভাবে আপনাকে ধন্যবাদ জানানোর জন্য একটু ব'সতে ব'ললাম। আশা করি, আপনার বেশি সময় নষ্ট করিনি?

—একটুও না ইয়োর এক্সেলেন্সি! বরঞ্চ আমিই কৃতার্থ বোধ ক'রছি।

উনিশ নম্বর নেটিব ইন্‌ফ্যান্‌ট্রির পালা প্রথম। তারপর চৌত্রিশ নম্বর। সেইরকমই নির্দেশ আছে গবর্নর জেনারেলের। একটা বাহিনীর প্রতিক্রিয়া দেখে তারপর অন্যটায় হাত। গবর্নর জেনারেলের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন ক'রলেন জেনারেল হিয়ার্‌সে।

যেদিন উনিশ নম্বর রেজিমেন্টকে ভেঙে সেপাইদের ক্যান্টনমেন্ট থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হ'ল সেদিন ভেউ ভেউ ক'রে কয়েকজনের সে কি কান্না! খেতি নেই, জমি নেই, এই নোকরিই ছিল সম্বল। দেহাতে গিয়ে তারা খাবে কী?

সবাই কিন্তু কাঁদেনি। যারা কেঁদেছে তাদের সংখ্যা খুবই কম। তবুও হো হো ক'রে হাসছিলেন জেনারেল। যারা রাইফেলে গুলি ভ'রে সঙ্গীন উঁচিয়ে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, সেই সব শ্বেতাঙ্গ সেনাপতি আর সেপাইরাও প্রাণ ভ'রে হাসছিল। এই সব ভীরু নেটিবগুলো কিনা বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রতে গিয়েছিল!

মঙ্গল পাণ্ডের সামরিক বিচার ক'রে ফাঁসির হুকুম দেওয়া হ'য়েছিল এপ্রিল মাসের ছ'তারিখে। ঠিক একমাস পরে মে মাসের ছ'তারিখে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বেঙ্গল আর্মির খাতা থেকে মুছে গেল চৌত্রিশ নম্বর নেটিব ইন্‌ফ্যান্‌ট্রির নাম। হাতিয়ার তো সেই ঊনত্রিশে মার্চ তারিখেই কেড়ে নেওয়া হ'য়েছিল। এবার কেড়ে নেওয়া হ'ল সামরিক উর্দি। অসামরিক নেটিব দেহাতি পোশাক প'রে একজন একজন ক'রে প্রাক্তন সেপাই পল্টন ছাউনির সীমানা ছেড়ে বেরিয়ে যেতে লাগলো। কেউ কাঁদছে না। সবায়েরই মুখ থম্‌থমে।

এদিনও চূড়ান্ত সাফল্যের আনন্দে হো হো ক'রে হাসলেন জেনারেল হিয়ার্‌সে। এতদিনে সব উৎপাত বিদায় হ'তে চ'লেছে। একটু দূরেই দাঁড়িয়ে আছে ক্যান্টনমেন্টে রসদ জোগানোর সবচেয়ে

বড়ো ঠিকাদার কৃষ্ণকান্ত মল্লিক। জেনারেল সাহেবের জন্যে আজ বিশেষ ফুর্তির আয়োজন করবার গুরু দায়িত্ব রয়েছে তার ওপর।

মাই ডিয়ার কিষেণকান্ট্!

হুজুর!—হাত জোড় ক'রে একগাল হেসে কাছে এসে দাঁড়ালো কৃষ্ণকান্ত।

লুক অ্যাট দেম! ব্লাডি ইণ্ডিয়ান বাস্টার্ড্স্! অল কাওয়ার্ড্স্!

ইয়েস স্যার!

টোমার অ্যারেঞ্জমেন্ট ঠিক হ্যায়?

আলবাৎ স্যার! দু'জন নাচওয়ালী—টু নাচওয়ালী ইন স্টক স্যার! মোস্ট বিউটিফুল গার্ল্স্ স্যার! এর্ · নাইনটিন ইয়ার আওরৎ। পাতলা ফিন্‌ফিনে মলমলের ঘাঘরা-ওড়না প'রে নাচবে স্যার! ইউ ক্যান সী দেয়ার বিউটিফুল ইয়ং বডি! ইয়োর চয়েস্ সুটিং! রাত কাটাতেও পারবেন!

থ্যাঙ্ক ইউ! হাঃ হাঃ হাঃ দোজ ব্লাডি নেটিব্স্ টুক আর্মস এগেনস্ট ব্রিটিশ পাওয়ার? হাঃ হাঃ হাঃ—

একটু পরেই হিয়ার্সেকে নিয়ে কৃষ্ণকান্তের পেনেটির বাগানবাড়ির দিকে রওনা হ'য়ে গেল জুড়িগাড়ি। দামী মদের ফোয়ারা, প্রায় স্বচ্ছবাস সুন্দরী যুবতী নর্তকীর দেহভঙ্গিমা, বিলোল কটাক্ষ আর উষ্ণ সঙ্গসুখ—এতবড়ো সাফল্যের পর এটুকু তো আজ ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্টের সর্বেসর্বা জেনারেলের অবশ্য প্রাপ্য! কিন্তু তিনি জানতেও পারলেন না, ব্যারাকপুরের বহ্নি থেকে, স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে প'ড়েছে সারা উত্তরভারতে। শুধু মিলিটারি জেনারেল কেন, স্বয়ং গবর্নর জেনারেল, এমন কি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী কুইন ভিক্টোরিয়াও সেদিন কল্পনা ক'রতে পারেননি, আর মাত্র চারদিন পরে সারা উত্তরভারতে দাউ দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠতে চ'লেছে মরণপণ মহাবিদ্রোহের দাবানল!

[প্রথম খণ্ড সমাপ্ত]

দ্বিতীয় খণ্ড

চতুর্থ পর্ব

বহ্নিবলয়

॥ এক ॥

উত্তর ভারতে রুদ্র বৈশাখের কাল।

অন্যান্য বছরের মতো এবারও বৈশাখ তার অসহ্য উত্তাপের আগুন ঝরিয়ে নেমে এসেছে উত্তরভারতের জনপদে, নগরে, প্রান্তরে। বিহার থেকে শুরু ক'রে পাঞ্জাব, পেশোয়ার পর্যন্ত খরতাপের সেই রুদ্র তাণ্ডব।

বড়ো ভয়ঙ্কর, বড়ো নির্মম সেই উত্তপ্ত দুরন্ত হাওয়ার হল্‌কা—যার নাম 'লু'। আগ্রা, মীরাট, লখ্‌নৌ, দিল্লী, আম্বালা, জলন্ধর বৈশাখের অগ্নিঝলকে জ্ব'লছে।

প্রকৃতির রূপ যত ভয়ঙ্করই হোক, সামরিক নিয়ম-শৃঙ্খলা স্তব্ধ হ'য়ে থাকতে পারে না। কুচ্‌কাওয়াজ প্রতিদিনই ক'রতে হবে। নেটিব সেপাইদের জানতে না দেওয়া হ'লেও একটু উচ্চপদস্থ শ্বেতাঙ্গ অফিসার সবাই জানে, ক্রিমিয়ার যুদ্ধে বৃটিশ সেনাবাহিনীর বিস্তর ক্ষয়ক্ষতি হ'য়েছে। ব'লতে গেলে, তাদের মুখে চুনকালি প'ড়েছে ক্রিমিয়ায়। চিন্তিত হ'য়ে পড়েছেন বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী কুইন ভিক্টোরিয়া। বিমর্ষ হ'য়ে গেছে সামরিক বাহিনীর বড়ো বড়ো সেনানায়কদের মুখ। হৃত সম্মান উদ্ধারের একমাত্র ভরসা ভারতের বৃটিশ বাহিনী। কেবল তাই নয়, চীনদেশ জয়ের উদ্দেশ্যেও বিরাট সেনাবাহিনী পাঠানোর গোপন প্রস্তুতি চ'লছে। এই অবস্থায় বিশ্রাম কিম্বা আরাম-আয়েসের কোনো অবকাশই নেই।

তাছাড়াও আর একটা ব্যাপার আছে। অতি প্রচ্ছন্ন সূক্ষ্ম একটা রেষারেষি। যারা খোদ বৃটিশ সামরিক বাহিনী থেকে এদেশে এসেছে তারা একটু তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সামরিক বিভাগকে। হীনমন্যতায় ভোগে কোম্পানির বেতনভুক শ্বেতাঙ্গ সেনাপতি থেকে সেপাই পর্যন্ত সবাই।

প্রথম পক্ষ কুলীন, অন্যপক্ষ অকুলীন।

এতদিন পর্যন্ত এইভাবেই চ'লে আসছিল। কিন্তু ক্রিমিয়ার যুদ্ধের খবরগুলো বেশ কিছুটা দমিয়ে দিয়েছে প্রথম পক্ষকে। তাদের আভিজাত্যের দেমাকে রীতিমতো আঘাত প'ড়েছে।

ম্রিয়মান দ্বিতীয় পক্ষও। হাজার হোক, বৃটিশ জাতের সম্ভ্রম নিয়ে প্রশ্ন সেখানে। তা সত্ত্বেও অতি সংগোপনে তাদের মনের ভেতর কোথায় যেন একটু চাপা খুশির ঝলক। সেই সঙ্গে কৌলিন্যে ওঠার জন্যে নিঃশব্দ একটা প্রতিযোগিতার আগ্রহ। এইবার দেখা যাক, কৃতিত্ব কাদের বেশি। হার ম্যাজেস্টিস আর্মি ব'লে দেমাকে যাদের মাটিতে পা প'ড়ে না তাদের, না কি এই দূর বিদেশে এসে নিজেদের যোগ্যতা দিয়ে যারা বৃটিশ জাতের জন্যে এতবড়ো একটা সোনা-ফলানো উপনিবেশ অর্জন ক'রেছে, তাদের?

তাই ব্যস্ততার বিরাম নেই ক্যান্টনমেণ্টে।

এই প্রচণ্ড গরমে সকাল ন'টার পর কুচকাওয়াজ অসম্ভব। তার আগে থেকেই রোদের তেজে সব জ্ব'লতে থাকে। কুচকাওয়াজের সময় তাই সকাল পাঁচটা থেকে। গরমকালের বেলা, কোনো অসুবিধে নেই। পাঁচটার আগে বেশ আলো ফুটে যায়।

ক'দিন হ'ল রমজান মাস প'ড়েছে। রোজা রাখে মুসলমান সেপাইরা। শেষ রাতে ঘুম থেকে উঠে নাশ্‌তা তারপর সময়মতো ফজরের নমাজ সেরে নেয়। সকাল পাঁচটার আগেই কুচ্‌কাওয়াজের ময়দানে হিন্দু মুসলমান সব সেপাই হাজির।

ওপরে সূর্যের অসহ্য উত্তাপ, নীচে রুক্ষ মাটির উত্তাপ বিকীরণ। প্রকৃতির সেই প্রতিকূল রোষকে নয় এড়ানো গেল। কিন্তু এই দু'য়ের মাঝামাঝি জায়গায় সেপাইদের কলিজায় যে উত্তাপ সঞ্চিত হচ্ছিল, তার খবর বৃটিশ সেনাপতিরা রাখেনি।

ব্যারাকপুরের খবর বিশদভাবেই পেঁছে গেছে উত্তরভারতে। পেঁছে গেছে দানাপুর থেকে শুরু ক'রে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে পেশোয়ার পর্যন্ত প্রতিটি পল্টন ছাউনিতে। সন্দেহ আরো বেড়েছে, অবিশ্বাস হ'য়েছে আরো বদ্ধমূল, বিক্ষোভ হ'য়েছে আরো পুঞ্জীভূত।

ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্টের মাটিতে দাঁড়িয়ে জেনারেল হিয়ার্‌সে যেদিন চৌত্রিশ নম্বর নেটিব ইন্‌ফ্যানট্রিকে হিসেবের খাতা থেকে লাল কালিতে কেটে দিলেন, তার দিন তিনেক আগে থেকেই বেশ একটু থম্‌থমে ভাব নেমে এসেছে উত্তরভারতের কয়েকটি ক্যান্টনমেন্টে। উদ্দাম ঝড়ের আগে গাছপালার নিথর হ'য়ে যাওয়ার মতো!

কী এক সঙ্কেত নিয়ে হাতে হাতে চাপাটি আসছে, আবার হাতে হাতেই অন্য কোথাও অদৃশ্য হ'য়ে যাচ্ছে, তার খবর সবটুকু রাখতে পারেনি কর্তৃপক্ষ। তাঁদের বিশ্বস্ত দু'জন নেটিব অনেক খেটে খবর জোগাড়ের চেষ্টা ক'রেছে, তা-ও সফল হয়নি।

লখ্‌নৌ ক্যান্টনমেন্টের মেজর ম্যাথুজ হঠাৎ একদিন তাঁর অধীনস্থ নেটিব সেপাইদের একখানা সম্মিলিত আবেদনপত্র পেলেন। ভুরু কুঁচকে গেল মেজরের। এত বছরের ভেতর এ-ধরনের ব্যাপারতো কখনো ঘটেনি! নামেই আবেদন পত্র কিন্তু আসলে ব্যাপারটা একটা আব্‌দারের মতো।

অবেদনপত্রে সেপাইরা জানিয়েছে, সমস্ত ব্রিগেডের ভেতর সুবাদার, জমাদার ইত্যাদি যে-ক'জন নেটিব অফিসার আছে, তারা সবাই ভালো। ব্যতিক্রম শুধু দু'জন। তাদের মুখ দেখতে শুয়োরের মতো। তাদের একজন হ'ল সত্তর নম্বর রেজিমেন্টের সুবাদার মেজর। সে একজন দেশি কেরেস্তান। অন্যজন হ'ল তেতাল্লিশ নম্বর লাইট ইন্‌ফ্যান্ট্রির জমাদার ঠাকুর মিশির। সেপাইদের আর্জি, ব্রিগেড থেকে এই দু'জন অফিসারকে সরিয়ে দেওয়া হোক!

আবেদনপত্রখানি প'ড়ে হতবাক্‌ হ'য়ে কিছুক্ষণ ব'সে রইলেন মেজর ম্যাথুজ। রাগে, উত্তেজনায় তাঁর চোখমুখ লাল হ'য়ে উঠ্‌লো। নেটিব সেপাইদের স্পর্ধা কেমন ক'রে এতখানি বেড়ে গেল? এ-ধরনের কাজ তো সামরিকবাহিনীর নিয়মশৃঙ্খলার ওপর সরাসরি আঘাত! সেই সঙ্গে চরম বিস্ময়ের-ও! যে-দু'জনের নাম উল্লেখ করা হ'য়েছে ঠিক তারাই ম্যাথুজের নিতান্ত অনুগত সেই নেটিব গুপ্তচর। চাপাটি-রহস্য জানার জন্যে তারাই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে!

কিন্তু তার হদিশ নেটিব সেপাইরা কেমন ক'রে পেলো? আবেদনপত্রে সে-প্রসঙ্গের কোনো উল্লেখ অবশ্য নেই। কিন্তু 'শুয়োরের মতো মুখ' ব'লে যে ঘৃণা প্রকাশ করা হয়েছে তাতে ইঙ্গিতটা আর অস্পষ্ট নেই।

চিন্তিতমুখে সেপাইদের আবেদন পত্রখানি লেফাফায় সিলমোহর ক'রে রেসিডেন্ট চিফ কমিশনার হেনরি লরেন্সের কাছে পাঠিয়ে দিলেন মেজর ম্যাথুজ। হেনরি লরেন্স তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে কাগজখানাকে বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিলেন।

—ইডিয়ট মেজর! এরা সবাই রজ্জুতে সর্পভ্রম ক'রে আঁতকে উঠতে শুরু ক'রেছে! এ-রকম ভীরু-কাপুরুষ লোকগুলোকে কেন যে সামরিক বাহিনীর উঁচুপদে ব'সতে দেওয়া হয়?

হেনরি লরেন্স নিজে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত। দিন পনেরো আগে লখ্‌নৌতে এসেছিলেন বিঠুরের ধুন্ধু পন্থ। আসল নামের বদলে নানা সাহেব নামেই লোকে তাঁকে বেশি চেনে। পরলোকগত পেশোয়া বাজীরাওয়ের দত্তকপুত্র নানাসাহেব। যদিও দত্তকপুত্র হিসেবে সম্পত্তির-উত্তরাধিকারে তাঁর দাবিকে আইনত কোম্পানি মেনে নিতে পারেনি, তা সত্ত্বেও বৃটিশের তিনি পরম মিত্র।

রাজত্বের দাবি তিনি হাসিমুখেই ত্যাগ ক'রেছেন। কোম্পানির মাসোহারা নিয়ে সানন্দে তিনি কানপুরের কাছাকাছি বিঠুরে থাকেন।

হেনরি লরেন্সের মনেও একসময় দুশ্চিন্তা ছিল। লর্ড ডালহৌসি দ্রুতভাবে অল্প কয়েক বছরের ভেতরেই যেভাবে অনেকগুলো সামন্তরাজ্যকে কোম্পানির দখলে এনে রেখে গেছেন তাতে সব সামন্ত রাজারাই ক্ষুব্ধ। তারা সবাই একজোট হ'য়ে হঠাৎ যদি কিছু একটা ক'রে বসে তখন অবস্থা সামলাবে কে?

কিন্তু নানাসাহেব আশ্বস্ত ক'রে গেছেন স্যার হেনরি লরেন্সকে।

কানপুরে, লখ্নৌয়ে একাধিকবার জমজমাট পার্টি দিয়েছেন নানাসাহেব। অনেক বৃটিশ সিবিলিয়ানই আমন্ত্রিত হ'য়েছিলেন। আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন উঁচুদরের বেশ কয়েকজন সামরিক অফিসার-ও। আর হেনরি লরেন্সের তো খাতিরই আলাদা। তিনি একে চীফ কমিশনার, তাতে আবার 'স্যার' খেতাবের অধিকারী।

পার্টিতে ইংলিশ আর ইণ্ডিয়ান ডিশ দুই-ই ছিল। তার সঙ্গে পানীয়ের স্রোত বইয়ে দিয়েছিলেন নানা সাহেব। স্কচ্ হুইস্কি, ওল্ড জ্যামাইকা রাম, খাঁটি ফরাসী কনিয়াক, শ্যাম্পেন, ওল্ড টম জিন—কোন্‌টা ছিল না? আর সেই সঙ্গে মস্‌লিনের অঙ্গবাসে আবৃত রূপসী নেটিব নর্তকীদের মাতাল-করা নাচ! তাদের প্রায়-স্বচ্ছ আবরণের আড়ালে যৌবনের সে কি হিল্লোল! তাদের কটাক্ষের কথা মনে প'ড়লে এখনো যে ছ'লকে ওঠে বুকের রক্তস্রোত। সবচেয়ে সেরা নাচ-গার্লটাকে সারা রাতের জন্যে বুকের ভেতর পেয়েছিলেন স্যার লরেন্স। অনুষ্ঠানে কোনো ত্রুটি রাখেননি নানাসাহেব। নিজের রাজভক্তি সম্বন্ধে কোনো সংশয়েরই অবকাশ রাখেননি তিনি। পার্টি দেওয়া তো একটা ছল মাত্র! সেই পার্টির ফাঁকেই একসময় তিনি গোপনে জানিয়ে দিয়েছেন, হিন্দু সামন্তরাজাদের দিক থেকে কোম্পানির কোনো ভয় নেই। কয়েকশো বছর ধ'রে মুসলমান-শাসনে তারা ক্লান্ত, বিরক্ত। সেদিক থেকে বৃটিশের এদেশে আগমন তাঁদের কাছে আশীর্বাদস্বরূপ। নানাসাহেব নিজে মারাঠা। মোগল শক্তি তাঁর চির শত্রু। তিনি বর্তমান পরিস্থিতিতে বৃটিশকে এদেশের সবচেয়ে বড়ো উপকারী বন্ধু ব'লে মনে করেন। এই প্রতিশ্রুতিও তিনি দিয়ে গেছেন যে, কোনোরকম বিপদে প'ড়লে ব্রিটিশ-শক্তিকে সবরকমে সাহায্য ক'রতে তিনি প্রস্তুত।

স্যার হেনরি লরেন্স আপনমনেই একটু হাসলেন।

যেদিক থেকে সবচেয়ে বড়ো বিপদের সম্ভাবনা ছিল, সেই দিক সম্বন্ধেই যখন এতখানি নিশ্চিন্ত হওয়া গেছে তখন সামান্য পিঁপড়ের মতো দু'চারটে নেটিব সেপাইকে নিয়ে খামোকা দুশ্চিন্তা ক'রতে হবে?

সেদিন বুধবার। ইংরিজি মে মাসের ছ'তারিখ।

মীরাটের পল্টন ছাউনিতে নিয়মমাফিক কুচ্‌কাওয়াজের পর্ব প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। পদাতিক দলগুলোর বেশির ভাগেরই প্যারেড শেষ হ'য়েছে, দু'একটি দলের সামান্য বাকি। বিরাট পল্টন ময়দানের একটা দিক থেকে তিন নম্বর নেটিব ক্যাভালরির সেপাইরা ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে বিরামস্থানের দিকে। সেখানে এসে পৌঁছনোর পর কুচ্‌কাওয়াজ শেষ, আজকের মতো ছুটি।

পদাতিক সেপাইরা সবে ব্যারাকে ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ ক'রছে, এমন সময় খবর এলো, কেউ যেন ময়দান ছেড়ে চ'লে না যায়। লেপ্টেন্যান্ট গবর্নর কল্‌ভিন সাহেব আসছেন। তিনি বিদায় নেওয়ার পর ছুটি হবে সেপাইদের।

কল্‌ভিন সাহেব এলেন ঘোড়া ছুটিয়ে।

স্যালুট ক'রে পদমর্যাদা অনুসারে যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে প'ড়লো শ্বেতাঙ্গ অফিসারের দল। সেলাম জানালে নেটিব সেপাইরাও। সারবন্দী হ'য়ে দাঁড়ালো পদাতিক, অশ্বারোহী আর গোলন্দাজ বাহিনী।

কল্‌ভিন যথেষ্ট গম্ভীরমুখে চারিদিক তাকিয়ে একবার দেখে নিলেন। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে বিড়্‌বিড়্‌ ক'রে ব'ললেন, সন্‌স্‌ অব্‌ ইন্‌ফার্নাল বীচেস!

তিনি এসে ঘোড়া থামানোর মিনিট দু'য়েকের ভেতরেই তাঁর পেছনে একটু দূরে এনে দাঁড় করানো হ'ল দু'খানা রসদের গাড়ি। এ গাড়িগুলোকে ভালভাবেই চেনে সেপাইরা। এতে ব'য়ে আনা হয় তাদের জন্যে বরাদ্দ আটা, ঘি, ডাল, তেল আর মশলাপাতি। কিন্তু ব্যারাকের চত্বর ছেড়ে রসদের গাড়ি কুচ্‌কাওয়াজের ময়দানে কেন? চকিতে থম্‌থমে হ'য়ে উঠলো সেপাইদের মুখ। অস্বস্তি, উদ্বেগ আর আশঙ্কায় তারা যেন একটু বিচলিত।

কয়েক হপ্তা ধ'রেই, রসদখানায় গাড়ি থেকে আটা নেওয়া বন্ধ ক'রেছে সেপাইরা। শহরের বাজার থেকে যে যার আটা কিনে আনে। যে আটায় জানোয়ারের হাড়ের গুঁড়ো মেশানো আছে সে-আটা খাবে না, এই তাদের পণ।

কল্‌ভিন সাহেব গম্ভীরভাবে আর একবার চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে নিলেন।

ক্যান্টনমেন্টের একজন মেজরের বাজখাঁই গলার জন্যে খ্যাতি আছে। তিনি কাছেই ছিলেন। কল্‌ভিনের চোখের ইশারা পেয়েই বাজখাঁই গলাকে আরো উঁচু গ্রামে তুলে তিনি ব'ললেন, মাননীয় লেপ্টেন্যান্ট গবর্নর এখন নেটিব সেপাইদের উদ্দেশে কিছু ব'লবেন!

কয়েকবার গলা খাঁকারি দিয়ে নিজেকে একটু তৈরি ক'রে নিয়ে কল্‌ভিন ব'ললেন, সামরিক বাহিনীর নেটিব সেপাইবৃন্দ, সরকারের প্রতি তোমাদের আনুগত্য এবং বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই ব'লেই আমি মনে করি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ কিছুদিন যাবৎ লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কতগুলো ভিত্তিহীন গুজবে কান দিয়ে তোমরা সামরিক বাহিনীর নিয়মশৃঙ্খলায় কিছু বিঘ্ন সৃষ্টি ক'রছো। আমি প্রথমেই তোমাদের জানিয়ে রাখতে চাই যে, এর পরিণাম ভালো নয়। কোনো শক্তিশালী নিয়মতান্ত্রিক সরকারই এই জাতীয় অবাধ্যতা বরদাস্ত ক'রতে পারে না।

কল্‌ভিন একটু থামলেন।

দম নিয়ে তিনি আবার ব'লতে আরম্ভ ক'রলেন, তোমাদের অসভ্য, বর্বর, অন্ধকারে আচ্ছন্ন এই হিন্দুস্তানে এসে আমরা এ দেশের উন্নতি ক'রেছি, সুশাসনের জন্যে যে সরকার পরিচালনা ক'রছি, সারা দুনিয়ায় তার তুলনা নেই। আমরা জানি, কিছু ফন্দিবাজ লোক মিথ্যে গুজব রটিয়ে তোমাদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি ক'রে বৃটিশ সরকারকে অপদস্থ করবার জন্যে চক্রান্ত ক'রছে। তারা রটিয়েচে, আটায় নিষিদ্ধ পশুর হাড়ের গুঁড়ো মিশিয়ে তোমাদের ধর্মনাশের ব্যবস্থা করা হ'য়েচে; এনফিল্ড রাইফেলের কার্তুজে তোমাদের হিন্দু-মুসলমানের পক্ষে নিষিদ্ধ পশুর চর্বি মাখিয়ে তোমাদের জাতি ধর্ম পাকাপাকি ভাবে নষ্ট করবার চেষ্টা চ'লচে। শুধু তাই নয়, এমন কথাও রটনা করা হ'য়েচে যে, ধর্ম নষ্ট হওয়ার পর তোমাদের যখন আর কোনো উপায় থাকবে না তখন তোমরা নাকি ক্রীশ্চান ধর্মের আশ্রয় নিতে বাধ্য হবে! কোম্পানির তাই উদ্দেশ্য। কিন্তু এখানে উপস্থিত হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমস্ত নেটিব সেপাইকেই আমি ব'লতে চাই যে, ক্রীশ্চান ধর্ম নিজের মাহাত্ম্যে এত বড়ো যে সে ধর্ম আপনিই পাপী-তাপীকে আকর্ষণ করে। তার জন্যে কোনো জোর-জবরদস্তি কিম্বা কৌশলের দরকার হয় না। তোমরা জেনে রাখো, বর্বরতার অন্ধকার থেকে ক্রীশ্চান ধর্মের আলোকে আসতে পারা পৃথিবীর যে কোনো মানুষের পক্ষেই সবচেয়ে বড়ো সৌভাগ্য! সে যাই হোক, ধর্ম আমার বক্তব্যের বিষয় নয়। আর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিও এদেশে ধর্মপ্রচার ক'রতে আসেনি। আমাদের ওপর হিন্দুস্তানে রাজ্য সুশাসনের যে দায়িত্ব রয়েছে তারই ভিত্তিতে লেপ্টেন্যান্ট গবর্নর হিসেবে আমি ব'লচি, এই ধরনের একটা মিথ্যে গুজবকে গুরুত্ব দিয়ে সরকার এবং সামরিক বাহিনীর নিয়মশৃঙ্খলার বিচ্যুতি আমি সহ্য ক'রবো না! আমি স্পষ্ট জানিয়ে দিতে চাই যে, সরকার তোমাদের জন্যে যে আটা সরবরাহ ক'রেচেন, তা নিতে তোমরা বাধ্য! তোমরা এগিয়ে এসে যে যার বরাদ্দ আটা নিয়ে যাও!

—নেহি সাব্‌!—সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল একটু অস্ফুট গুঞ্জন।

রোদের তেজ বাড়ছে। কল্‌ভিন সাহেবের লাল মুখ আরো লাল হ'য়ে উঠলো। চিৎকার ক'রে উঠলেন তিনি, শাট্‌ আপ বাস্টার্ড্‌স্‌! আটা তোমাদের নিতেই হবে! তাছাড়াও নিতে হবে নতুন কার্তুজ। লাখ লাখ টাকা জলে ফেলে দেওয়ার জন্যে খরচ ক'রে কার্তুজ তৈরি করেনি সরকার। আমি নিজের চোখে দেখতে চাই যে বাধ্য সেপাইয়ের মতো তোমরা প্রত্যেকে এগিয়ে এসে আমার আদেশ পালন ক'রছো।

স্তব্ধ, নির্বাক, নিশ্চল সেপাইয়ের দল।

উত্তেজনায়, অপমানে কয়েকমুহূর্তের জন্যে কথা বল্‌বার শক্তি হারিয়ে ফেললেন লেপ্টেন্যান্ট গবর্নর কল্‌ভিন। তাঁর সেই অবস্থা দেখে বাঁজখাই গলার সেই মেজর প্রচণ্ড উত্তেজনায় অঙ্গভঙ্গি ক'রে চিৎকার ক'রে উঠলেন, ইনসোলেন্ট ব্লাডি বাস্টার্ড্‌স্‌! এতবড়ো স্পর্ধা যে মাননীয় লেপ্টেন্যান্ট গবর্নরের আদেশ তোমরা অগ্রাহ্য করবার সাহস পাও? এক মিনিট সময় দেওয়া হচ্চে। এর ভেতর আদেশ পালনে যদি তোমরা সম্মতি না জানাও তাহ'লে পরিণাম হবে ভয়ঙ্কর!

তবু সেপাইরা নিরুত্তর।

এবারে দিশেহারা উত্তেজনায় ফেটে প'ড়লেন কল্‌ভিন, ইউ ব্লাডি সোয়াইন্‌স্‌, জেনে রাখো, বেয়াড়া ঘোড়াকে কেমন ক'রে চাবকে শায়েস্তা ক'রতে হয়, বৃটিশ তা জানে!

অচঞ্চল সেপাইদের দিক থেকে কোনো সাড়া নেই।

নিষ্ফল উত্তেজনায় থর্‌থর্‌ ক'রে কাঁপতে কাঁপতে প্রায় ভাঙা গলায় আর একবার চেঁচিয়ে উঠলেন সেই মেজর, এখনো সাবধান হও! আর মাত্র তিরিশ সেকেণ্ড আছে—

আর মাত্র তিরিশ সেকেণ্ড!

ভয়ে বিবর্ণ দু'জন মাত্র সেপাই কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে এলো পদাতিকদের সারি থেকে। তাদের একজন হিন্দু ব্রাহ্মণ, অন্যজন মুসলমান।

অধীর আনন্দে কল্‌ভিন চিৎকার ক'রে উঠলেন, তোমরা নেবে?

শুক্‌নো কাঁপা গলায় কোনোমতে তারা ব'ললে, জী হুজুর—

দিশেহারা পাগলের মতো ছুটে গিয়ে রসদের গাড়ি থেকে একটা কাঠের বাক্স বের ক'রে নিয়ে এলেন বাজখাঁই গলার মেজর। তার ভেতরে থরে থরে সাজানো রয়েছে নতুন কার্তুজ।

—কাম অন! —সেপাই দু'জনকে ডাকলেন মেজর।

কোনোদিকে না তাকিয়ে মুখ নীচু ক'রে তারা এগিয়ে এলো। তাদের হাতে একটা ক'রে কার্তুজ তুলে দিলেন কল্‌ভিন। সোল্লাসে চিৎকার ক'রে মেজরের উদ্দেশে ব'ললেন, দে মাস্ট বী রিওয়ার্ডেড!

চূড়ান্ত অপমানের হাত থেকে দু'জন নেটিব অন্তত বাঁচিয়েছে লেপ্টেন্যান্ট গবর্নরকে। সুতরাং পুরস্কার তাদের অবশ্যই প্রাপ্য।

—আর কেউ? —চারদিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস ক'রলেন মেজর।

না, আর কেউ এগিয়ে এলো না। সেই দু'জন বাদে বাকি কয়েকশো সেপাই যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলো কাঠের পুতুলের মতো। তাদের চোখের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন একটু থম্‌কে গেলেন কল্‌ভিন। কিন্তু পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে চিৎকার ক'রে ব'ললেন, এই অবাধ্যতার দণ্ড তোমাদের পেতেই হবে! অন্যায়কারীকে বৃটিশ সরকার ক্ষমা করে না! —মেজর!

—ইয়োর এক্সেলেন্সি!

—যাকেই আপনার সন্দেহ হবে তাকেই গ্রেপ্তার করুন! প্রত্যেকটা জানোয়ারের কোর্টমার্শাল হবে। আর, ক্যান্টনমেন্টের যে-সমস্ত কুঁয়ো থেকে এরা পানীয় জল নিয়ে থাকে, তার প্রত্যেকটিতে ওই আটার দু'টো একটা ক'রে ব্যাগ ফেলে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন!

দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে চ'লে গেলেন কল্‌ভিন। পরিস্থিতি যে রীতিমতো থম্‌থমে, তাঁর মতো অভিজ্ঞ সিবিলিয়ানের কাছে তা আর তখন অস্পষ্ট নয়!

সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার হ'ল প'য়ষট্টিজন সেপাই। গোপন তালিকা মেজরের কাছেই ছিল। যারা গ্রেপ্তার হ'ল তাদের ভেতর রিশলদার অর্থাৎ ঘোড়সওয়ার বাহিনীর সেপাইয়ের সংখ্যাই বেশি। সব ক'জনই তিন নম্বর নেটিব ক্যাভালরির। বাদবাকি কয়েকজন গোলন্দাজ আর পদাতিক।

একটু পরে ফাঁকা হ'য়ে গেল কুচ্‌কাওয়াজের ময়দান। বন্দী সেপাইরা চ'লে গেল কয়েদখানায়, অন্যান্য সেপাইরা ব্যারাকে।

এর ঠিক চারদিন পরের কথা।

সেদিন ইংরিজি মে মাসের দশ তারিখ।

প্রতিদিনের মতোই অসহ্য রোদের তাপে ঝ'লসে গেল বৈশাখী দ্বিপ্রহরের প্রতিটি মুহূর্ত; আগুনের হল্‌কা বুকে নিয়ে ব'য়ে গেল নিষ্করুণ 'লু'। দিনের শেষে পশ্চিম দিগন্তের আকাশকে লালে লাল ক'রে দিয়ে যথানিয়মেই অস্ত গেল সূর্য। কিন্তু ক্যান্টনমেন্টের রুক্ষ কঠিন মাটি তখনো বিকীরণ ক'রে চ'লেছে সারাদিনের সঞ্চিত উত্তাপকে। শুক্লপক্ষের আকাশে জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ আলোর ভেতরেও সে-উত্তাপ যেন নিজের বিলীয়মান অস্তিত্বকে সঞ্চারিত ক'রে দিতে চাইছে।

ছাউনিতে ছাউনিতে কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক ব্যস্ততা। সূর্যাস্তের পর নমাজ প'ড়ে নিয়ে মুসলমান সেপাইরা অন্যদিনের তুলনায় অনেক আগেই রাতের প্রথম কিস্তির নাশ্‌তা ক'রে নিয়েছে। হিন্দু সেপাইরাও রাত আটটার ভেতরেই মোটামুটি কিছু খেয়ে নিয়েছে। সবাই যেন কিসের জন্যে প্রস্তুত।

রাত ন'টা।

হঠাৎ যেন বাঁধভাঙা বন্যার উন্মত্ত গর্জনের মতো সম্মিলিত কন্ঠের ধ্বনি উচ্চকিত ক'রে তুললো মীরাট ক্যান্টনমেন্টের আকাশ-বাতাস। ব্যারাক থেকে বেরিয়ে এসেছে থার্ড নেটিব ক্যাভালরির প্রত্যেকটি সেপাই। তাদের হতে মশাল, বন্দুক আর তরোয়াল।

বিদ্রোহ! আর কোম্পানি সরকারের হুকুম তামিল নয়! —হো রিশলদার! আগে বঢ়ো—

উত্তাল হয়ে উঠ্‌লো পল্টন ছাউনি। অশ্বারোহীর পরেই পদাতিক, তারই সঙ্গে বেরিয়ে এসেছে গোলন্দাজবাহিনী। সবাই তৈরি ছিল, কেবল একটা সংকেতের অপেক্ষা! সে সংকেত এসে গেছে! সঙ্গে সঙ্গে ব্যারাক ছেড়ে বেরিয়ে প'ড়েছে জান্‌-কবুল মরীয়া নেটিব সেপাইয়ের দল। সম্মিলিত কন্ঠের গর্জনে কেঁপে উঠলো বৈশাখী রাতের বাতাস।

—অনেক বুটের লাথি সহ্য ক'রেচি, আর সহ্য ক'রবো না। মাথা নোয়াতে নোয়াতে শিরদাঁড়া বেঁকে যেতে ব'সেছে। আর সেলাম ঠুক্‌বো না!

মশালের আলোয় রক্তিম হ'য়ে উঠেছে পল্টন ছাউনি। বন্দুকের গুলির শব্দে মুহুর্মুহু কাঁপছে বাতাস। কামানের গর্জনে কানে তালা লেগে যাচ্ছে। মুক্ত হ'ল বন্দী সেপাইরা, সবাই মিলে ভেঙে ফেললে অর্ডন্যান্স ডিপোর কঠিন কপাট। গুলি গোলা, বন্দুক, তরোয়াল—যার যা চাই নিয়ে নাও। লড়তে হবে জান্‌ দিয়ে, লড়তে হবে অনির্দিষ্টকাল। ব্যারাকপুরের সেপাইরা যে-ভুল ক'রেছিল, মীরাটের সেপাইরা সে-ভুল ক'রবে না! লড়াইয়ের রসদ যে যা পারো নিয়ে নাও!

—আজাদ হিন্দুস্তান! পরদেশি বেনিয়া সরকারের হুকুম আর মানি না। চাই আজাদ হিন্দুস্তান।

সম্মিলিত গর্জন—আজাদ হিন্দুস্তান! ভয় নেই ভাইসব, তৈরি হ'য়েচে সব ছাউনির হিন্দুস্তানী সেপাই। এগিয়ে চলো! লাগাও আগুন ফিরিঙ্গি সাহেবদের কুঠিতে—গুলি ছুঁড়ে এফোঁড়-ওফোঁড় ক'রে দাও ওদের সব ক'টার কলিজা! যারা মানুষকে মানুষ ব'লে গণ্য করে না, তাদের ওপর দয়া দেখানোর আর কোনো প্রশ্ন ওঠে না। লাগাও আগুন!

দাউ দাউ ক'রে আগুন জ্ব'লে উঠ্‌লো মীরাট ক্যান্টনমেন্টে। তারপর প্রলয়ঙ্কর বহ্নিবলয়ে

বেষ্টিত হ'য়ে গেল কানপুর, বেরিলি, আগ্রা, লখ্নৌ আর দিল্লী। বেপরোয়া বিদ্রোহের বার্তা-সঙ্কেত আগেই পৌঁছে গিয়েছিল। অশান্ত সেপাইরা উন্মুখ হ'য়েই ছিল প্রার্থিত লগ্নের প্রতীক্ষায়।

উত্তাল হ'ল উত্তর ভারত। মুখে মুখে সেই গোপন বেনামি উর্দু ইস্তাহারের বয়ান।

"পরদেশি ব্রিটিশ বেনিয়াদের শাসনে হিন্দুস্তান তার স্বাধীনতা হারিয়েছে, জনসাধারণ সর্বস্বান্ত। খাদ্য নেই, বস্ত্র নেই, অসম্ভব করভারে দেশের মানুষ জর্জরিত, নারীর সম্মান বিপন্ন। হিন্দুস্তানের মানুষ আর কতদিন মুখ বুজে এই অপমানজনক দাসত্ব সহ্য ক'রবে?"

একশো বছর আগে পরদেশি ফিরিঙ্গিদের হাতে আজাদী হারিয়েছিল হিন্দুস্তান। ঠিক একশো বছর পরে তার প্রতিশোধ নেওয়ার পালা!

হিন্দুস্তানী হিন্দু-মুসলমান সব সেপাই এবার জান্-কবুল। বেনিয়া ফিরিঙ্গি সরকার তো একটু একটু ক'রে সবই কেড়ে নিয়েছে। জান্‌টা ছাড়া হারানোর মতো এখন আর আছেই বা কী?

বিদ্রোহ—চারিদিকে বিদ্রোহ!

পল্টন ছাউনির সেপাইদের সঙ্গে দলে দলে এসে যোগ দিচ্ছে দেহাতের চাষী, মজুর, কামার, কুমোর, তাঁতী আর হরেক পেশার মানুষ। সবাই ভুক্তভোগী। সবাই নিঃস্ব হ'য়ে গেছে ফিরিঙ্গিদের চতুরালিতে। ফিরিঙ্গিরা তো শুধু রাজ্য দখল-ই করেনি, সেই সঙ্গে কেড়ে নিয়েছে গরীবের মুখের গ্রাস।

দলে-দলে, পিল্ পিল্ ক'রে অজস্র, অসংখ্য গরীব মানুষ আসছে তো আসছেই। ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে সেপাইদের এই লড়াইতে তারাও হ'তে চায় অংশীদার।

আজাদ হিন্দুস্তান!

আর মানি না ফিরিঙ্গিকে, আর মানি না তাদের সরকার। মানবো না তাদের আইন, কানুন আর ফরমান! কিন্তু দেশ শাসন ক'রবে কে?

—দিল্লীর বাদশা!

এখনো জীবিত রয়েছেন মোগল বংশধর জাঁহাপনা বাহাদুর শা। দিল্লীর মোগল তখ্‌ৎ-এ যদিও অনেকদিনের ধুলো জ'মেছে, কিন্তু সে ধুলো সাফ্ ক'রে নিতে কতটুকু সময়? বাদশা বাহাদুর শা হীনবল, সশঙ্কিত, ব্যক্তিত্ববিহীন বৃদ্ধ। মোগল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী আজ ফিরিঙ্গির মুখাপেক্ষী!

তবু অন্য কোনো উপায় নেই।

এতকাল ধ'রে দিল্লী থেকেই শাসিত হ'য়েছে হিন্দুস্তান। দিল্লীর সেই শান্‌দার জমানাকে ফিরিয়ে আনার এই হ'ল উপযুক্ত সময়। আবার সিংহাসনে বসাতে হবে মোগল বংশধর বাহাদুর শাকে। কলকাতার ফিরিঙ্গি লাটসাহেবের দস্তখৎ করা ফরমান নয়—হিন্দুস্তানের বাদশা বাহাদুর শা'র দস্তক নিয়ে এখন থেকে চ'লতে থাকবে নয়া হিন্দুস্তানের আইন-কানুন, বিধি-নিষেধ, ফৌজ, ফরমান!

ভাইসব, দিল্লীর পথ ধরো! হাতে বাগিয়ে ধরো হাতিয়ার—আজাদ ওয়াতনের নামে কসমের আগুনে জ্বালিয়ে নাও কলিজা! ওদেরই দেওয়া হাতিয়ারে হটাও ওই শয়তান ফিরিঙ্গির দলকে। দিনে প্রচণ্ড সূর্যের চোখ-ঝল্‌সানো রোদ ঠিক্‌রে পড়ুক তোমাদের খোলা তরোয়ালের ফলায় ফলায়, ঝলকে ঝলকে আগুন বেরিয়ে আসুক তোমাদের হাতের বন্দুক থেকে, কামানের গোলায় ছিন্নভিন্ন ক'রে দাও ফিরিঙ্গি বেনিয়ার বেইমান কলিজা—ধুলোয় মিশিয়ে দাও লুঠের মোহরে জমিয়ে তোলা তাদের সাধের দৌলৎখানা। কিন্তু হাত দিও না জেনানার গায়ে, হাতিয়ার চালিও না বাল-বাচ্চার ওপর! ওরা তা ক'রেছে ব'লে হিন্দুস্তানী মরদ তা ক'রতে পারে না! কিন্তু

মাফ্ ক'রবে না একটা মরদকেও। দুশ্মনকে আর দয়া করা যাবে না। মুক্ত করো বাধা—তৈরি করো পথ—এগিয়ে চলো জোর কদমে—

দিল্লী—দিল্লী—দিল্লী—

একবার যখন ভয় ভেঙে আমরা বেরিয়ে প'ড়েছি, তখন আর পেছন ফিরে তাকানোর উপায় নেই। দিল্লীর পথে আমাদের এগিয়ে যেতেই হবে!

ইম্তিহান!

সামনে আমাদের বিরাট পরীক্ষা। সে-পরীক্ষা বীরত্বের, বুদ্ধির, নিষ্ঠার। বেইমান পরদেশি দুশ্মনকে হিন্দুস্তানের মাটি থেকে উপ্ড়ে না ফেলা পর্যন্ত বিশ্রাম নেই! এগিয়ে চলো! চলো এগিয়ে দিল্লীর পথে।

—চলো—চলো—চলো—

॥ দুই ॥

উদ্বিগ্নভাবে বৈঠকখানায় পায়চারি ক'রছে কিশোরীচাঁদ।

আজ বিকেলে হরিশের আসার কথা। কিন্তু বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হ'য়ে গেল তবু তার দেখা নেই! কথার খেলাপ করে না হরিশ। জবান একবার যখন দিয়েছে তখন সে আসবেই। কিন্তু এত দেরি হচ্ছে কেন?

হরিশের সঙ্গে কথা হ'য়েছিল দিন পনেরো আগে। তারপর এই ক'দিনের ভেতর তার সঙ্গে আর দেখা হয়নি। আজ দমদমে আসার কথা সে ভুলে যায়নি তো? অথবা মদের ঝোঁকে বেহুঁশ হ'য়ে কোনো পতিতা-পল্লীতে ঢুকে প'ড়েছে?

আজকের মজলিশে দু'জনই মাত্র আমন্ত্রিত—মধু আর হরিশ। আদালত-ফেরতা পথে মধুকে তার লোয়ার চিৎপুর রোডের বাড়িতে ঢুকতেই দেয়নি কিশোরীচাঁদ। নিজের গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে সোজা একেবারে দমদমে এনে হাজির ক'রেছে।

কৈলাসবাসিনীর তো জানাই ছিল, আজ মধুদাদা আসবেন। সে আসার একটু পরেই ডাক প'ড়েছে অন্দরমহলে। দু'দিন আগেই নারকেল নাড়ু আর চন্দ্রপুলি তৈরি ক'রে রেখেছিল কৈলাসবাসিনী। মধুদাদা খুব ভালোবাসে। সদর দেউড়ি দিয়ে জুড়ি গাড়ি ঢুকতেই জানালা দিয়ে সে ঠিক দেখতে পেয়েছে। তার কাছে মধুদাদার কেরেস্তানি খাটে না। দিব্যি আসন পিঁড়ি হ'য়ে বসে খেয়ে যান। মোচা, লাউঘন্ট, সোনামুগের ডাল—সবই মধুদাদার প্রিয় খাদ্য। মাদ্রাজ থেকে ক'লকাতায় ফিরে এসে মধুদাদা যখন বেশ কিছুদিন এ-বাড়িতে ছিলেন, তখন তাঁর আচার-আচরণ সবই বেশ ভালোভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার অবকাশ পেয়েছিল কৈলাসবাসিনী। সাহেবি পোশাক আর ইংরিজি বুকনির কথা ছেড়ে দিলে ভেতরে ভেতরে মধুদাদা তো পুরোপুরি বাঙালীই র'য়ে গেছেন! কেন যে এমন মানুষটার কেরেস্তান হওয়ার ঝোঁক চেপেছিল! আর কেরেস্তান হ'লেই কি পিপে পিপে মদ গিলতে হবে? এই একটা বিষয়েই কৈলাসবাসিনীর মনটা খুঁৎ খুঁৎ করে। এই দোষটা না থাকলেই যেন ভালো হ'তো!

মধুকে নিয়ে বাড়িতে পৌঁছানোর পরেই মধুর ডাক প'ড়েছে অন্দরমহলে। গরম গরম লুচি, বেগুন ভাজা, আলুর দম দিয়ে সাজানো রেকাবি একেবারে তৈরি। নিজে সামনে ব'সে মধুদাদাকে জলখাবার খাইয়ে তবে সে বৈঠকখানায় যেতে দেবে। আজও সেই একই ব্যাপার।

কিশোরীচাঁদ নিজে একটু আগে বৈঠকখানায় এসে গেছে। তার ধড়া-চুড়ো ছাড়তে জলখাবার খেতে খুব একটা বেশি সময় লাগে না। পাছে হরিশ এসে তাকে দেখতে না পায়, সেইজন্যে, আজ আরো একটু তাড়াহুড়ো ক'রে ও-সব পাট চুকিয়েছে। কিন্তু হরিশের পাত্তা নেই!

কোন্ উদ্দেশ্যে কিশোরীচাঁদের আজকের মজলিশের আয়োজন, তার কোনো ইঙ্গিত-ই পায়নি

হরিশ। অবশ্য তা নিয়ে মাথাও ঘামায়নি সে। বাড়িতে প্রায়ই একটা না একটা মজলিশ বসানো কিশোরীচাঁদের একটা নেশা, হরিশ তা ভালো ক'রেই জানে। ভালো মাইনে পায় তার সঙ্গে মেজাজ-ও দিলদরিয়া। তাই খরচের হাতটা কিশোরীর বেশ খোলা। অতবড়ো বাড়িটাকে সুন্দর ক'রে সাজিয়ে রাখার রুচি-ও তার আছে। সুন্দর মন-মাতানো ফুলের বাগান আর টলটলে জলের পুকুরটাকে দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়! ইণ্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট স্কুলের প্রফেসর রিগোর নিজের হাতে তৈরি ভেনাস আর হার্কিউলিসের অপূর্ব সুন্দর মর্মর মূর্তিদুটো কিশোরীচাঁদের বাড়ির শোভাকে অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। বৈঠকখানা ঘরের সুন্দর প্লাস্টারের শিল্পকর্মগুলো ক'রেছে রিগো সাহেবের কয়েকজন বাছাই করা ছাত্র। ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের ঠিক পাশেই পাঁচিলঘেরা এই বাড়িটার চত্বরে ঢুকলে কিছুক্ষণের জন্যে অন্তত টাউন ক'লকাতার অসুন্দর উদ্দামতাকে ভুলে থাকা যায়। তাই কিশোরীচাঁদ কখনো আমন্ত্রণ জানালে সেটাকে পারতপক্ষে উপেক্ষা করে না হরিশ। সেদিনও কিশোরীচাঁদের অমন্ত্রণে সাগ্রহেই সে রাজি হ'য়েছে। কিন্তু সেইসঙ্গে অভ্যেসমতো খোঁটা দিতেও ছাড়েনি।

—কী হে ইয়োর অনার, এত ঘন ঘন নেমন্তন্ন কেন? তুমি কি এখনো আশা রাখ্‌চো যে তোমার ওইসব পতিতোদ্ধারিণী কিম্বা বিপত্তারিণী সভার মতো চোদ্দ গণ্ডা বক্‌বকম্‌ সভার কোনো একটায় ঢুকিয়ে নিয়ে আমাকে দিয়ে সমাজ-সংস্কার না করিয়েই ছাড়বে না?

হরিশের খোঁচায় কিশোরীচাঁদ অভ্যস্ত। সে-ও হেসে জবাব দিলে, ঈশ্বর আমাকে রক্ষে করুন! তোমার মতো ক্ষ্যাপা ষাঁড়কে দিয়ে সমাজ-সংস্কার করাতে গেলে শিং-এর গুঁতোয় যেটুকু বা আছে সেটুকুও থাকবে না! তার চেয়ে হিন্দু সমাজ অসংস্কৃত-ই থাকুক বাবা!

সজোরে হেসে উঠ্‌লো হরিশ।—তা যা ব'লেচ! আরে বাবা, আমি হলুম তন্ত্রসাধক ভৈরব। তোমাদের ওই রাবড়ি-মালপো খাওয়া বোষ্টুমী-কেত্তন কি আমাকে মানায়?

কিশোরীচাঁদ ব'ললে, ভয় নেই, তোমাকে বিপত্তারিণীতে ভেড়াবো না। মজলিশটা একেবারেই ঘরোয়া—তুমি, মধু আর আমি। সন্ধ্যেবেলাটা রাজনীতি আর সমাজনীতি নিয়ে কোনো কুট-কচালি না ক'রে মধুর মুখে হোমর, ভার্জিল, মিলটন, শেক্‌সপীয়র শুনে নির্ভেজাল আনন্দে কিছুক্ষণ কাটানো যাবে, এই আমার উদ্দেশ্য।

কথাটা শুনে আগের চেয়ে আরো অনেক বেশি উৎসাহে হরিশ ব'ললে, চমৎকার প্রস্তাব! এমন সুযোগ আমি নিশ্চয়ই ছাড়বো না! মধু সত্যিই একটা জিনিয়াস! ওকে যত দেখচি ততই ভালোবেসে ফেলচি! একটাই মাত্র ভয় ওকে। আবেগের মাত্রা বেশি হ'য়ে গেলে যখন জড়িয়ে ধ'রে এলোপাথাড়ি চুমু খেতে শুরু ক'রে, তখনই হয় প্রাণান্তকর অবস্থা! সে যাকগে, তোমাকে কাছে ভিড়িয়ে দিয়ে আমি একটু দূরে থাকবো। কিন্তু ইয়োর অনার, সেদিন ডাকচো তো দুই ডাকসাইটে সোমরসের রসিককে। ক'পেটি মজুত রাখবে ভাবচো? সামাল দিতে পারবে তো?

—দেখা যাক! —ব'ললে কিশোরীচাঁদ।

এ-সব কথাবার্তা হ'য়েছিল পনেরো দিন আগে। তখন কলকাতার অবস্থা স্বাভাবিক। উত্তর ভারতে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়নি।

কিন্তু হঠাৎ এই ক'দিনের ভেতর কলকাতার চেহারা একেবারে পাল্‌টে গেছে। মিউটিনির নানা গুজবে ক'লকাতা থম্‌থমে। চারদিক থেকে রোজই নানারকম খবর আসছে।

উত্তরভারত জুড়ে আরম্ভ হ'য়ে গেছে এক ভয়ঙ্কর তাণ্ডব। দাউ দাউ ক'রে আগুন জ্ব'লছে চারদিকে। শ্বেতাঙ্গ সেনাপতি থেকে সেপাই এমন কি সিবিলিয়ান পর্যন্ত কারো পরিত্রাণ নেই। শ্বেতাঙ্গের রক্তে ভিজে উঠেছে উত্তর ভারতের মাটি, প্রাণের দায়ে তারা যে যেদিকে পারে ছুটছে। নেটিব সেপাইরা ধ্বংসের নেশায় যেন পাগল হ'য়ে উঠেছে। শ্বেতাঙ্গদের কুঠি আর দোকানপাট তো বটেই—সেপাইদের রোষের আগুন থেকে সরকারি আপিস-আদালত, থানা-কাছারি, তহ্‌শিলখানা, তোষাখানা কোনো কিছুই রেহাই পাচ্ছে না। হয় ধূলিসাৎ নয়তো পুড়ে ছাই। কোথাও কোথাও

নাকি টেলিগ্রাফের তার-ও কেটে দিয়েছে বিদ্রোহী সেপাইরা। মীরাটে প্রথম বিদ্রোহের খবর মীরাট থেকে পাওয়া যায়নি। ক'লকাতায় খবর এসেছিল আগ্রা থেকে। তাও মিউটিনি আরম্ভ হ'য়ে যাওয়ার দিন তিনেক পরে।

বৃটিশ সরকারকে অস্বীকার ক'রেছে বিদ্রোহীরা। যেদিন রাতে মীরাট ক্যান্টনমেন্টের সেপাইরা প্রকাশ্য বিদ্রোহে ঝাঁপিয়ে প'ড়েছিল, তার ঠিক পাঁচদিন পরে হাজার হাজার সেপাই জড়ো হ'য়েছে দিল্লীতে। মোগল সম্রাটের বংশধর বৃদ্ধ বাহাদুর শা-কে তারা মসনদে বসিয়েছে। সমস্ত উত্তর ভারত জুড়ে বৃটিশ রাজশক্তির নাকি চিহ্নমাত্র নেই!

ক'লকাতায় নেমে এসেছে এক সন্ত্রাস।

বিশেষত, ব্রিটিশ আর ইয়োরেশিয়ান মহলে আতঙ্কের ছাপ খুব স্পষ্ট। মুখে মুখে তাদের একটা কথা ছড়িয়ে গেছে। একশো বছর আগে তেইশে জুন তারিখে পলাশির যুদ্ধে এ-দেশের রাজত্ব পেয়েছিল কোম্পানি। সামনের তেইশে জুন তার শেষ দিন!

ক'লকাতার টাঁকশালে বসানো হ'য়েছে গোরা সান্ত্রীদের ব্যাটেলিয়ন। আলিপুর আর মেটিয়াবুরুজে শিবির গেড়েছে গোরা সান্ত্রী। অযোধ্যার রাজ্যচ্যুত নবাব ওয়াজিদ আলী নজরবন্দী রয়েছেন মেটিয়াবুরুজে। সেখান থেকে কোনো চক্রান্ত ছড়িয়ে প'ড়ে হঠাৎ রাজধানী ক'লকাতাকে বিপন্ন করা বিচিত্র নয়! ফোর্ট উইলিয়ম, দমদম আর ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্টের সমস্ত নেটিব সেপাইকে নিরস্ত্র করা হ'য়েছে। পঁচিশ নম্বর নেটিব ইন্‌ফ্যানট্রি সদ্য ব্রহ্মদেশ থেকে যুদ্ধের ক্লান্তি নিয়ে ফিরেচে। নিরস্ত্র হ'য়েছে তারাও।

শ্বেতাঙ্গ-মহলে দাবি উঠেছে, অস্ত্র চাই!

কয়েকদিন আগে বৌবাজার এলাকায় কোনো এক বিয়েবাড়িতে নাকি কিছু পট্‌কা ফাটানো হ'য়েছিল। সেই শব্দে হতবিহ্বল, দিশেহারা হ'য়ে প'ড়েছিল, জানবাজার, কসাইটোলা, চৌরিঙ্গির ফিরিঙ্গিরা। এখন নাকি তাদের রাতের ঘুম নেই ব'ললেই চলে। শ্বেতাঙ্গদের বদ্ধমূল ধারণা হ'য়ে গেছে, ক'লকাতাতেও আগুন জ্বলবে। তখন যাতে আত্মরক্ষা করা যায়, তার জন্যে এখন থেকেই চাই হাতিয়ার। বন্দুক, পিস্তল তো চাই-ই, তার সঙ্গে চাই মিলিশিয়া—শ্বেতাঙ্গদের আধা-সামরিক বাহিনী।

উত্তরভারত থেকে যত বেশি খবর আসছে, ততই বেশি সন্ত্রস্ত হ'য়ে পড়ছে ক'লকাতার শ্বেতাঙ্গ-মহল। সন্ত্রাস ঢাকতে উত্তেজনার মাত্রা বাড়ছে। অনেক বৃটিশ চৌরিঙ্গিপাড়ায় সন্ধ্যের পর এখন বন্দুক পিস্তল হাতেই ঘুরে বেড়ায়। এ-দেশি কাউকে কোনোরকম সন্দেহ হ'লে হয়তো দুম ক'রে গুলি ছুঁড়ে ব'সবে। রাত আটটার পর তো ফোর্ট উইলিয়মের কাছাকাছি পথ দিয়ে কালা আদমির হাঁটার-ই উপায় নেই!

সাড়ে ছ'টা বেজে গেছে।

হরিশের এখনো সাক্ষাৎ নেই দেখে নিজের ভুলের জন্যে আপসোস ক'রছিল কিশোরীচাঁদ। দু'একদিন আগে হরিশের সঙ্গে কথা ব'লে একটা ছুটির দিন দুপুরে সময় ঠিক ক'রে নিলেই হ'ত!

দমদম থেকে ভবানীপুর।

গভীর রাতে সেই কসাইটোলা আর চৌরিঙ্গির ওপর দিয়েই বাড়ি ফিরতে হবে হরিশকে! অত রাতে অবশ্য রাস্তা প্রায় ফাঁকা হ'য়েই যাবে। তাহ'লেও দু'একটা বেপরোয়া মাতাল ফিরিঙ্গির সঙ্গে দেখা হ'য়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। তাদের কোমরে আজকাল সবসময়েই অন্তত একটা পিস্তল গোঁজা থাকে। গভীর রাতে সে-রকম কোনো বেয়াড়া ফিরিঙ্গির সামনে প'ড়ে গেলে মারাত্মক বিপদও হ'তে পারে। হরিশকে নিয়ে ভয় আরো বেশি। কারণ, সেও তো ঠিক প্রকৃতিস্থ থাকবে না তখন।

আপনমনেই সাতপাঁচ চিন্তা ক'রছিল কিশোরীচাঁদ।

কেবল কাব্য নিয়ে অলস সন্ধ্যা-যাপনই নয়, হরিশকে আজ বিশেষভাবে ডাকার পেছনে তার

একটা গোপন অভিসন্ধি আছে। আদালত থেকে বাড়ি ফেরার পথে উদ্দেশ্যটা মধুর কাছে সে প্রকাশ ক'রেছে।

কিশোরীচাঁদের বিশেষ ইচ্ছে, যেমন ক'রেই হোক একবার অন্তত রিনেক কোম্পানির দোকানে যাওয়ার জন্যে রাজি করাতেই হবে হরিশকে। সে নিজে এর আগে কয়েকবার চেষ্টা ক'রে বিফল হ'য়েছে। সেইজন্যেই মধুকে আজ ডেকেছে সে। মধু হয়তো জোরজুলুম ক'রে কথা আদায় ক'রতে পারবে।

কলকাতার সেরা ফটোগ্রাফার ব'লতে গেলে রিনেক কোম্পানি। কিশোরীচাঁদ নিজে, তার বন্ধুবান্ধব সবাই সেখানে ফোটোগ্রাফ তুলেছে। রিনেক কোম্পানি থেকে লোক আনিয়ে ফোটো তুলিয়ে নিয়েছে মেয়ে কুমুদিনীর। অয়েল পেন্টিং-এর বৈশিষ্ট্য এক রকম, ফোটোগ্রাফের অন্য রকম। বিদ্যাসাগর, রামগোপাল, প্যারীচাঁদ, দিগম্বর, রাজেন্দ্রলাল, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন—কোন্ নামজাদা লোকের ফোটোগ্রাফ তোলেনি রিনেক কোম্পানি? একমাত্র ব্যতিক্রম-ই বোধ হয় হরিশ। শুধু ব্যতিক্রম ব'ললেও বোধ হয় কম বলা হয়। হরিশ একেবারে সৃষ্টিছাড়া! আজ পর্যন্ত নিজের একখানা ফোটোগ্রাফ তোলেনি হরিশ। কয়েকবার তাকে ব'লেছে কিশোরীচাঁদ। একদিন রীতিমতো জেদও ধ'রেছিল। কিন্তু তাতে ফল হয়নি। একরোখা গোঁয়ার ব'ললে মানুষের ধারণায় চূড়ান্ত যে রূপটি আসে, হরিশ তার জীবন্ত প্রতিমূর্তি।

জেদ ক'রে কিশোরীচাঁদ একদিন ব'লেছিল, তোমাকে দিয়ে আমি ফোটোগ্রাফ না তুলিয়ে ছাড়বো না!

হেসে হরিশ ব'ললে, ওহে ইয়োর অনার, এটা কি তোমার পুলিশ কোর্ট পেয়েচ যে রায় দিয়ে দিলেই হ'ল?

—জোর জুলুম বন্ধুর কাছেই চলে হে হরিশ, পুলিশকোর্টে নয়! সেখানে আইন অনুসারে বিচার। সে যাই হোক, আমি তোমাকে আগেও দু'একদিন ব'লেচি, তুমি দিব্যি এড়িয়ে গেচো! আজ স্পষ্ট ক'রে বলতো, ফোটোগ্রাফে তোমার আপত্তিটা কী?

হরিশ হাসতে হাসতেই ব'ললে, জানোই তো বাপু, আমি নিরাকারের উপাসক?

—সে তো ঈশ্বরচিন্তার ব্যাপার। কিন্তু এই যে দেহটা নিয়ে চ'লে-ফিরে বেড়াচ্চ, এটা তো আর যাই হোক, নিরাকার নয়?

—নিরাকার তো নয়ই, বরঞ্চ ..ড়া বেশি সজীব সাকার। খিদে পেলে কিছু খেয়ে এর চাহিদা মেটাতে হয়, তেষ্টা পেলে জল। মিছেমিছি আর জল বলি কেন, এখন তো সোমরস দিয়েই এ-বেচারার তেষ্টা মেটাই! আবার কামপ্রবৃত্তির তাড়না ছুটিয়ে নিয়ে যায় বারবণিতার ঘরে!

কিশোরীচাঁদ অপ্রতিভভাবে ব'ললে, ও-সব প্রসঙ্গ তো আমি তুলিনি হরিশ!

—তুমি না তুললেও কথাটা যে নির্ভেজাল সত্য, সে তো কেউ অস্বীকার ক'রতে পারবে না? তুমি সুখী মানুষ, ঘরে তোমার পতিব্রতা সহধর্মিণী। আর আমি? লোকে বলে, হরিশ মুখুজ্যের কলমের ডগায় আগুন ছোটে! সেই হরিশ মুখুজ্যেই বাড়ি ফেরার নামে সিঁটিয়ে যায় হে কিশোরীচাঁদ! কিন্তু এই সাকার দেহটা যখন অস্থির ক'রে তোলে তখন তাকে শান্ত করবার জন্যে ও-মুখো ছুটতেই হয়।

কিশোরীচাঁদ ব'ললে, ও-সব কথা থাক। একটা দিন ঠিক করো, রিনেক কোম্পানির দোকানে যেতে হবে।

—না।

—আবার আপত্তি কেন?

—কারণ তো আমি আগেই ব'লেচি।

—ব্রাহ্ম ধর্মে তোমার নিষ্ঠা সম্বন্ধে আমি কোনো প্রশ্ন তুলচিনে হরিশ। কিন্তু কিছু যদি মনে না করো তো একটা কথা বলি। দেওয়ানজী —মানে, রাজা রামমোহনই তো ব্রাহ্ম ধর্মের প্রবর্তক? তিনি কিন্তু অয়েল পেন্টিং-এ নিজের বেশ কিছু প্রতিকৃতি রেখে গেচেন। তোমাদের

ব্রাহ্ম ধর্মের আসল প্রচারক জোড়াসাঁকোর দেবেন ঠাকুর কিছু ছবি আঁকিয়েচেন আবার বেশ কিছু ফোটোগ্রাফ-ও তুলিয়েচেন। ছবি তুলে তাঁদের ধর্ম যদি নষ্ট না হ'য়ে থাকে তো একা তোমারই নষ্ট হবে?

হরিশ একগাল হেসে ব'ললে, দ্যাখো বাপু, ধম্মো-টম্মো নিয়ে আমি অত মাথা ঘামাইনে। ভবানীপুরের সমাজ মন্দিরে দু'চারবার লেক্‌চার দিয়েচি ব'লেই আমি ধার্মিক হ'য়ে গেলুম? যাঁদের কথা ব'ললে তাঁদের সঙ্গে আমার তুলনা না করা-ই ভালো। রাজা রামমোহন ছিলেন রাজা লোক, আর দেবেন ঠাকুর হ'ল প্রিন্স দ্বারকানাথের ছেলে। তাঁদের যা মানায়, আমার মতো চুনোপুঁটিকে তা কি মানায় হে? দেবেন ঠাকুরের বিরাট জমিদারি আছে। ধরো, বাকি খাজনার দায়ে সে যদি দু'টো প্রজাকে ধ'রে জুতোপেটা করে, তাকে মানাতে পারে। কিন্তু আমি যদি কাউকে জুতোপেটা ক'রতে যাই, লোকে তা কি সহ্য ক'রবে? ব'লবে, বেটা ভণ্ড তপস্বী। পেট্রিয়টে বড়ো বড়ো কথা বলে আর এদিকে লোক ঠেঙিয়ে বেড়ায়।

কিশোরীচাঁদ ব'ললে, তোমাকে তো আর লোক ঠেঙাতে ব'লচি নে, বলচি ছবি তুলতে। আশা করি, হিন্দু পেট্রিয়টের হরিশ মুখুজ্যে হিসেবে সেটা এমন কিছু বেমানান কিম্বা গর্হিত অপরাধ হবে না?

কেমন যেন একটু অবসন্ন উদাসীন স্বরে হরিশ ব'ললে, ঢাক ঢোল পিটিয়ে নানা পোজ দিয়ে নিজের চেহারাটাকে জাহির ক'রতে আমার একেবারেই ভালো লাগে না কিশোরী!

সেদিনও হরিশকে রাজি করাতে পারেনি কিশোরীচাঁদ। ক'দিন পরে এই নতুন ফন্দিটা মাথায় খেলেছে। জবরদস্তি ছাড়া হবে না। আর, সেটা একমাত্র মধুকে দিয়েই সম্ভব।

অন্দর মহল থেকে বেরিয়ে এলো মধুসূদন।

তার আগমন মানেই একটা উচ্ছকিত ঘোষণা। চুপচাপ আসা বা যাওয়া তার কুষ্টিতে নেই। ঘরে ঢুকতে ঢুকতেই সে চেঁচিয়ে ব'ললে, হ্যালো কিশোরী, ভবানীপুরের কুলীন বামুন এখনো আসেনি?

মধুসূদনের কথা শেষ হ'তে না হ'তেই দরজার কাছে হরিশকে দেখা গেল। আরো জোরে চেঁচিয়ে উঠলে মধুসূদন, অ্যান্ড লো! হিয়ার কাম্‌স্ দ্য ডেভিল—আওয়ার নটোরিয়াস পেট্রিয়ট!

হরিশের মুখে ফুটে উঠলো একটু ম্লান, বিষণ্ণ হাসি। ব'ললে, অনিবার্য কারণে একটু দেরি হ'য়ে গেল। তোমরা কিছু মনে ক'রো না!

কিশোরীচাঁদ হাঁপ ছেড়ে বাঁচলে। ব'ললে দেরি হয় হোক, তুমি যে নির্বিঘ্নে এসে পৌঁছেচ তাতেই আমি নিশ্চিন্ত।

মধুসূদনের উদ্দেশে হরিশ ব'ললে, থ্যাঙ্ক য়ু ফর্ ইয়োর কম্‌প্লিমেন্ট 'নটোরিয়াস'।

এতক্ষণে নিরুদ্বিগ্ন হ'য়েছে ব'লেই কিশোরীচাঁদ ব'ললে, তোমার কখনো সময়ের ব্যতিক্রম হয় না ব'লেই দেরি দেখে আমি নানারকম দুশ্চিন্তা ক'রচিলুম। আফিসে আট্‌কে গিয়েচিলে নাকি?

—না হে, একবার খালাসিটোলায় যেতে হ'য়েচিল। ওখানে একটি স্ত্রীলোকের কাছে আমি মাঝে মাঝে যেতুম। গুটিবসন্ত হ'য়েচিল তার। আজ কিছুক্ষণ আগে মারা গেছে। ও-পাড়া থেকে লোকজন ডেকে তার মৃতদেহের সৎকারের ব্যবস্থা ক'রে এলুম। সেইজন্যেই এত দেরি।

মধুসূদন সবিস্ময়ে ব'ললে, বাই জোভ! তুমি কি একটি নির্দিষ্ট স্ত্রীলোকের কাছেই এতকাল যাতায়াত ক'রেচ? ওহ্ জলি চ্যাপ, দেন য়ু হ্যাভ হ্যাড সাম লভ ফর দ্যাট আনফরচুনেট ক্রিচার! ইজ্‌ন্‌ট্ ইট?

আরো বিষণ্ণ একটু হাসি হেসে হরিশ ব'ললে, লভ? নো মধু, নেভার। তবে হ্যাঁ, একটু মায়া প'ড়ে গিয়েচিল। হোয়াট অ্যান আইরণি মধু, কবে সেই আঠারো-উনিশ বছর বয়সে আমার প্রথমা স্ত্রী মোক্ষদাকে চিতেয় তুলে দিয়ে এয়েচিলুম! আমার প্রথম এবং শেষ প্রেমের সে-ই ছিল একমাত্র

নায়িকা! এতবছর পরে তারই নামের এক পতিতা স্ত্রীলোকের সৎকারের ব্যবস্থাও আজ আমাকে ক'রে আসতে হ'ল।

হরিশের চোখ দু'টো ছলছল ক'রে উঠেছে।

তার হাত ধ'রে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে মধুসূদন ব'ললে, নেভার মাইণ্ড হরিশ! লেট আস্ ড্রিঙ্ক অ্যাণ্ড প্রে ফর্ হার পুয়োর সোল!

পুকুরের পাড়ে গিয়ে ব'সলে তিনজন।

ঝির্‌ঝিরে হাওয়া বইছে। খোলা আকাশের নীচে কিছুটা সময় কেটে গেল। দু'জন আর্দালি তৈরিই ছিল। বেশ কয়েকটা মদের বোতল আর আনুষঙ্গিক যথাসময়েই তারা রেখে গেছে।

হরিশ ব'ললে, যাওয়ার সময় কয়েকটা টাকা ধার দিও তো কিশোরী। পকেটে যা ছিল তা ওখানেই ফতুর হ'য়ে গেল। বসন্ত রোগের মৃতদেহ, কেউ নিয়ে যেতেই চায় না! বেশ কিছু টাকা কবুল ক'রে রাজি করাতে হ'ল! বাড়ি ফেরবার সময় একটা ছক্কোরগাড়ি ভাড়া ক'রেই যাবো ভাবচি। অত রাতে আর হাঁটতে পারবো না।

—তুমি হাঁটতে চাইলেও তোমাকে হেঁটে যেতে আমি দিতুম না। গাড়ি ক'রেই যাবে, যাওয়ার পথে মধুকে নামিয়ে দিয়ে যাবে।

কেল্লায় রাত ন'টার তোপ প'ড়লো।

এত দূর হ'লেও রাতে সে-শব্দ শুনতে কোনো অসুবিধে হয় না। হাওয়ায় কাঁপুনি তুলে তোপের শব্দ বেশ স্পষ্টভাবেই ভেসে আসে।

—আই বিলীভ, মিউটিনার্স আর নট গোয়িং টু অ্যাটাক ফোর্ট উইলিয়ম নাউ?—হেসে ব'ললে মধুসূদন।

কিশোরীচাঁদ হেসে ব'ললে, ফোর্ট উইলিয়ম আক্রমণ করুক আর না করুক, তোমার কিন্তু একটু সাবধান থাকা উচিত হে মধু! শোনা যাচ্ছে, ক্রীশ্চানদের ওপরেই নাকি সেপাইদের সবচেয়ে বেশি রাগ।

বেশ কিছুটা শ্যাম্পেন গলায় ঢেলে দিয়ে মধুসূদন ব'ললে, আমার কোনো ভাবনা নেই হে ব্রাদার! বাই গড্‌স্ গ্রেস, গায়ের চামড়ার যে-রঙ নিয়ে ধরাধামে অবতীর্ণ হ'য়েচি, তাতে আমাকে ক্রীশ্চান ব'লে ওরা বিশ্বাস-ই ক'রবে না! সাহেবরাও তো বিশ্বাস ক'রতে চায় না। নেহাৎ নামের গোড়ায় 'মাইকেল' শব্দটা দেখে বিশ্বাস করে আর ঢোঁক গেলে।

হাঃ হাঃ ক'রে সজোরে হেসে উঠলো মধুসূদন। তারপর হরিশের দিকে তাকিয়ে ব'ললে, ওহে নটোরিয়াস পেট্রিয়ট, তুমি তো সেই কবে থেকে মিউটিনি মিউটিনি ব'লে শোরগোল তুলেচ তোমার পেট্রিয়টে। একটু বুঝিয়ে বলো দিথি, ওরা কী চায়?

কিশোরীচাঁদ দেখলে, যে উদ্দেশ্যে হরিশকে আজ বিশেষভাবে সে ডেকেছে, সে উদ্দেশ্য একেবারে বিফল হবে। একবার এইসব প্রসঙ্গে আলোচনা আরম্ভ হ'লে রিনেক কোম্পানি শিকেয় উঠ্‌বে। সে তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে ব'ললে, ও-সব কথা এখন থাক্ না মধু! তার চেয়ে বরঞ্চ—

তাকে কথা সম্পূর্ণ ক'রতে দিলে না মধুসূদন। ব'ললে, দাঁড়াও না বাপু, ভবানীপুরের কুলীন বামুনের টীকাভাষ্যটা একবার শোনা যাক। আচ্ছা হরিশ, সেপাইরা কি ভাবচে, একটা মিউটিনি ঘটিয়ে এলোমেলো ক'রে দিয়ে বৃটিশ রাজত্বকে এ-দেশ থেকে ওরা উচ্ছেদ ক'রে দিতে পারবে?

—ইট্‌জ্ নো লংগার আ মিউটিনি, বাট আ রেবেলিয়ন!

হঠাৎ গম্ভীরস্বরে কথাটা ব'লে দু'জনের মুখের দিকেই একবার তাকিয়ে নিলে হরিশ। তারপর ব'ললে, সৈন্যবাহিনীর বিদ্রোহকে বলে মিউটিনি। কিন্তু আজ এই ক'দিনের ভেতর বিদ্রোহ এখন আর শুধু সেপাইদের ভেতরেই সীমাবদ্ধ নেই মধু! যতটুকু খপর পেয়েচি, তাতে বোঝা যাচ্ছে, এ-বিদ্রোহ চারদিকে ছড়িয়ে প'ড়েচে, হাজার হাজার সাধারণ মানুষ ঝাঁপিয়ে প'ড়েচে বিদ্রোহে। সেই কারণেই এটা এখন আর মিউটিনি মাত্র নয়। তার চেয়েও অনেক বড়ো, অনেক ব্যাপক।

—অসম্ভব!—কিশোরীচাঁদ বিরক্তস্বরে ব'ললে, যে কোনো ব্যাপারকেই একটা বড়ো রকমের রাজনৈতিক ব্যাখ্যা দেওয়া তোমার মুদ্রাদোষে দাঁড়িয়ে গিয়েচে দেখচি!

হরিশ হেসে ব'ললে, রাজনীতির নাম শুনলেই উত্তেজিত হ'য়ে ওঠা তোমারও যে একটা মুদ্রাদোষে দাঁড়িয়ে গেচে, সেটা বোধহয় খেয়াল ক'রতে পারো না ইয়োর অনার? পাছে আরো ক্ষেপে যাও সেইজন্যে আগেই ব'লে রাখচি, সামনের বেস্পতিবার একুশ তারিখের পেট্রিয়টে 'দ্য কান্ট্রি অ্যান্ড দ্য গভর্নমেন্ট' নামে যে নিবন্ধটা বেরোবে তাতে এক জায়গায় বেশ স্পষ্টভাবেই লিখেচি, "আজ ভারতবর্ষের এমন একজনও অধিবাসী নেই, যে কিনা এদেশে বৃটিশ শাসনজনিত নিষ্পেষণের গুরুভারকে অনুভব করে না এবং বৈদেশিক শাসকের কাছে অধীনতা স্বীকারের গ্লানির সংগে সেই গুরুভারের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য।"

—কী বলচো তুমি!—বিমূঢ়ের মতো বেশ কয়েক মুহূর্ত হরিশের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো কিশোরীচাঁদ। তারপর ব'ললে, তোমার কথা আমি যে কিছুই বুঝতে পারচিনে! এ তো অতি ভয়ঙ্কর কথা!

—ভয়ঙ্কর হ'তে পারে, কিন্তু বাস্তব সত্য।

—না, বাস্তব সত্য নয়। এ তোমার মনগড়া ব্যাখ্যা।

—আমি যা বুঝেচি, তাই-ই লিখেচি।

—তুমি কি ব'লতে চাও, বর্তমান অবস্থায় ভারতবাসী রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের যোগ্য?

—যোগ্যতা-অযোগ্যতার বিচার ক'রতে আমি বসিনি, কিশোরী। জানুয়ারী মাস থেকে আজ পর্যন্ত যেসব ঘটনা ঘ'টেচে, সেগুলোর গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য ক'রেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেচি আমি। গত মাসে ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্টে যে ঘটনা ঘ'টেচিল, তার বিচার-বিশ্লেষণ না করা পর্যন্ত আমি মিউটিনি শব্দটিই ব্যবহার ক'রেচিলুম। আমি তখনো সতর্ক ক'রে দিয়ে ব'লেচি, আমরা ব'সে আছি একটা বারুদের স্তূপের ওপর। সামান্য একটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যে কোনো মুহূর্তে সেই বারুদের স্তূপে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে। আমার অনুমান যে সঠিক তা আশা করি এখন বুঝতে পারচো? ব্যারাকপুরে যে স্ফুলিঙ্গটাকে দ্রুত হাতে নিবিয়ে দিতে পেরে বৃটিশ গবর্নমেন্ট নিশ্চিন্ত হ'য়েচিল, সেইরকম আরো অনেক স্ফুলিঙ্গ যে অন্যদিকে ঠিক্‌রে প'ড়তে শুরু ক'রেচে, সেটা বোধ করি বুঝতে পারে নি, অথবা বুঝতে পারলেও গ্রাহ্য করেনি। মীরাট ক্যান্টনমেন্টে সেদিন স্ফুলিঙ্গটা ঠিক্‌রে গিয়ে ঠিক বারুদের স্তূপের ওপরেই প'ড়েচে।

উত্তেজিতভাবে কিশোরীচাঁদ ব'ললে, তা পড়ুক। কিন্তু তার দ্বারা কি এই বোঝায় যে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাওয়ার জন্যে সমস্ত ভারতবাসী মরীয়া হ'য়ে উঠেচে? অসম্ভব হরিশ, অসম্ভব! তুমি বড়ো বেশি এগিয়ে চিন্তা ক'রতে ভালোবাসো! ওটাও তোমার একটা নেশার মতো।

হরিশ উত্তেজিত হ'ল না। শান্ত স্বরেই ব'ললে, কি জানি! কিন্তু উত্তরভারতের ঘটনাগুলো লক্ষ্য ক'রেচ? চারদিক থেকে বিদ্রোহী সেপাইরা পৌঁছেচে ভারতবর্ষের পুরনো রাজধানী দিল্লীতে। অথর্ব, অপদার্থ বাহাদুর শাকে সিংহাসনে বসিয়ে তাকেই ভারতসম্রাট ব'লে ঘোষণা ক'রেচে তারা —অস্বীকার ক'রেচে বৃটিশ সরকারের কর্তৃত্বকে। শুধু সেপাইয়ের দল-ই নয়, তাদের সংগে হাত মিলিয়েচে হাজার হাজার সাধারণ মানুষ। সুতরাং তাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তারপরেও কি সন্দেহ থাকতে পারে? আমার অন্তত নেই।

কিশোরীচাঁদ কোনো উত্তর দিতে পারলে না।

মধুসূদন হঠাৎ দু'হাতে হরিশকে জাপ্‌টে ধ'রে তার গালে এলোমেলো কয়েকটা চুমু খেয়ে সোচ্ছ্বাসে ব'ললে, ওহ মাই বিলাভেড হরিশ, রাইট য়ু আর! য়ু আর রিয়েলি নটোরিয়াস! স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়? আরে বাবা, বছর তিনেক আগে আমাদের খিদিরপুরের রঙ্গলাল বাড়ুজ্যে তো এ-কথা ব'লে রেখেচেন। ওহ্‌! পদ্মিনী উপাখ্যান

—রিয়েলি ওয়াণ্ডারফ্ল আ ক্রিয়েশন! ফর্ হেভেন্স্ সেক, ডোন্ট আর্গ্ কিশোরী! লেট আস্ এন্জয় দ্য স্ইট নেক্টর নাউ! নেক্টর ফ্রম দ্য হেভেন অব্ ফ্রান্স!

একটি ফরাসী কনিয়াকের বোতল উঁচুতে তুলে ধ'রলে মধুসূদন। কিশোরীচাঁদের মদ্যপান পরিমিত। সে আর নিলে না। হরিশ আর মধুসূদন দেখতে দেখতে বোতলটা নিঃশেষ ক'রে দিলে।

আড়চোখে একবার কিশোরীচাঁদের গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে হরিশ ব'ললে, পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এই অভাগার ওপর বিলক্ষণ ক্রুদ্ধ হ'য়েচে হে মধু! কোথায় অনন্তকাল ধ'রে ব্রিটিশ শাসনের ছায়ায় থেকে সমাজ সংস্কার করবো, তার বদলে গোঁয়ার সেপাই আর চাষাভুষোগুলো কিনা ব্রিটিশ সরকারকে বেপাত্তা ক'রে দেওয়ার জন্যে উঠে-প'ড়ে লেগেচে?

কিশোরীচাঁদ ক্ষুব্ধস্বরে ব'ললে, এটা তোমার ভুল ধারণা হরিশ! কেউ বলে নি যে, অনন্তকাল ধ'রে আমরা ব্রিটিশ শাসনের ছায়ায় থাকতে চাই।

—তবে কী চাও?

—অপরের কথা ব'লতে পারবো না। কিন্তু আমি নিজে যেটা অনুভব করি, তা স্পষ্টভাবে ব'লতে আমার দ্বিধা নেই। ভারতবর্ষের গত কয়েকশো বছরের ইতিহাস কী বলে? কেবল সংঘর্ষ আর আত্মকলহ! মোগল-পাঠান, মোগল-মারাঠা, রাজপুত-মোগল, রাজপুত-মারাঠা—কেবল যুদ্ধ, বিভেদ আর রক্তক্ষয়। ধর্মের নামে গোঁড়ামি, সমাজের নামে অন্ধ কুসংস্কার, শিক্ষার নামে অশিক্ষা এই কয়েকশো বছরে এ-দেশটাকে কোথায় টেনে নামিয়েছিল, তার হিসেব ক'রে দেখেচো? ব্রিটিশ যদি ঘটনাচক্রে এদেশে না আসতো তাহ'লে আজও আমাদের সেই অন্ধকার নরকের পাঁকে হাবুডুবু খেতে হ'ত! ওরা এসে আমাদের চোখ খুলে দিয়েচে। পশ্চিমের শিল্প-সংস্কৃতি, দর্শন, বিজ্ঞান দিয়ে যথার্থ জ্ঞানের আলো এনেচে এ-দেশে। সে-আলো যত ছড়িয়ে পড়ে, ততই আমাদের লাভ। তাই আমাদের স্বার্থেই আরো বহুদিন ওদের এ-দেশে থাকা প্রয়োজন ব'লে আমি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি।

উত্তেজিতভাবে প্রায় এক নিঃশ্বাসেই কথাগুলো ব'ললে কিশোরীচাঁদ।

হরিশের চোখে-মুখে কেনো উত্তেজনা নেই। মদের নেশায় সে বেহুঁশ হয় না। কখনো কখনো হয়তো একটু ঝিম্ মেরে ব'সে থাকে। তখন অনেকটা সেইরকম অবস্থা। মধুসূদনের হাত থেকে কনিয়াকের বোতলটা নিয়ে বাকি মদটুকু নিজের গেলাসে ঢেলে নিলে। কিশোরীচাঁদের নীরবতার ফাঁকে গেলাসে কয়েকটা চুমুক দিয়ে ব'ললে, তুমি বড়ো পতিব্রতা সতী হে!

মধুসূদন ঈষৎ জড়িতস্বরে ব'ললে, ওহ্ মাই বিলাভেড বার্কিং ডগ্স্, ফর্ হেভেন্স্ সেক, ডোন্ট স্পয়েল মাই স্ইট মৌতাত!

সে-কথায় কান না দিয়ে কিশোরীর উদ্দেশে হরিশ ব'ললে, তোমার কথাগুলো শুনে বহুদিন আগেকার একটা প্রসঙ্গ মনে প'ড়চে কিশোরী। তার আগে অন্য একটা কথা জিজ্ঞেস ক'রে নিই। নেটিব আর শ্বেতাঙ্গদের ক্ষেত্রে ফৌজদারি আইনের বৈষম্য নিয়ে গত মাসের ছ'তারিখে টৌন হলে তোমরা রীতিমতো একটা উত্তেজক সভা ক'রেচিলে না?

—উত্তেজক ব'লে ঠাট্টা ক'রো না হরিশ। —একটু ক্ষুব্ধস্বরে ব'ললে কিশোরীচাঁদ। —আইন সকলের পক্ষেই সমানভাবে প্রযোজ্য হওয়া উচিত। অথচ মফস্বলের ফৌজদারি আদালতে শ্বেতাঙ্গ আসামীর বিচার হবে না, এমন কি তাদের নামে নালিশ পর্যন্ত করা যাবে না—এ ধরনের পক্ষপাত নিতান্ত অবাঞ্ছিত। রামগোপালদাদার সেই তেজী প্রতিবাদের পর এই ক'বছরে এ-সম্বন্ধে এজুকেটেড নেটিবদের পক্ষ থেকে তেমন কোনো জোরালো প্রতিবাদ হয়নি। এতদিনে জাস্টিস বার্নেস পীকক বেথুন সাহেবের মতো সেই একই উদ্দেশ্যে আবার নতুন বিল আনার ফলে তাকে সমর্থন জানিয়ে আন্দোলন করবার একটা সুন্দর সুযোগ এয়েচে। সেই উদ্দেশ্যেই আমরা সভার

আয়োজন ক'রেছিলুম। শুধু আমরা বাঙালীরা নই, রেভারেণ্ড লঙ্, জর্জ টম্‌সন—এ'রাও এয়েছিলেন। তোমাকে কিছু বলবার জন্যে অনুরোধ ক'রেছিলুম, তুমি তো গেলেই না!

মধুসূদন মদের গেলাস সমেত একখানা হাত ওপরে তুলে ব'ললে, ওয়েল ডান্! হরিশ না গিয়ে ভালোই ক'রেচে বাবা! তোমাদের মিটিঙের পর ইংলিশম্যানের এডিটর কব্ হ্যারি লিখেছিলেন, ফোর মিত্রস্ হ্যাভ ওয়ন দ্য ডে। প্যারীচাঁদ, রাজেন্দ্রলাল, দিগম্বর আর কিশোরীচাঁদ—এই চার মিত্তিরেই তো সেদিন টৌন হল ফাটিয়েচে বাপু! এত গুলো ডাকসাইটে মিত্রের ভেতর শত্রুপক্ষ হরিশ কি কোনো পাত্তা পেতো হে?

হেসে উঠলে কিশোরীচাঁদ। হরিশও হাসলে। তারপর ব'ললে, ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্টে ঠিক সেইদিনই মিউটিনার মঙ্গল পাণ্ডের কোর্ট মার্শাল হয়। তার ফাঁসির হুকুম হয়েচে শুনে আপিস থেকে সোজা পেট্রিয়ট আফিসেই চ'লে গিয়েছিলুম কিশোরী! মিউটিনি নামে দ্বিতীয় নিবন্ধটা তখনই ব'সে লিখতে হ'য়েচে, তাই তোমাদের মিটিঙে আর যাওয়া হ'য়ে ওঠেনি। কিন্তু তাই ব'লে তোমাদের মিটিঙের কথা আমি ভুলে যাইনি। সভার সমস্ত বিবরণ এবং সে-সম্বন্ধে মন্তব্য নিশ্চয়ই পেট্রিয়টে তুমি দেখেচ?

—হ্যাঁ, তা অবশ্য দেখেচি। টৌন হলে মিটিঙের ওপর পর পর তোমার দু'টো নিবন্ধ অনেক শ্বেতাঙ্গেরই গাত্রদাহ সৃষ্টি ক'রেচে, তাও জানি। যাকগে, সে তো কবেকার কথা। তার চেয়েও কী পুরনো প্রসঙ্গ তুমি ব'লতে যাচ্ছিলে, তাই বলো।

হরিশ ব'ললে, সেটা তো বলবোই হে। কিন্তু আমার প্রশ্ন যে এখনো শেষ হয়নি! তোমরা সেদিন যে টৌন হল ফাটিয়ে অত গরম গরম লেক্‌চর দিলে তার ফলে ফৌজদারি আইনের কোনো সংশোধন হ'য়েচে কি?

—তুমি কি পাগল? এত তাড়াতাড়ি সংশোধন হ'য়ে যাবে?

—কবে নাগাদ হবে ব'লে মনে হয়?

—সেটা কেমন ক'রে ব'লবো? কিন্তু আমাদেরও তো চুপ ক'রে থাকলে চ'লবে না! নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের ভেতর দিয়ে আমাদের অভাব-অভিযোগ জানিয়ে যেতে হবে।

—নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন! আপনমনেই বিড়্‌বিড়্ ক'রে শব্দ দু'টো উচ্চারণ ক'রলে হরিশ। তারপর ব'ললে, যে টৌন হলে তোমরা সেদিন নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন ক'রে এলে, সেখানেই প্রায় আটাশ বছর আগে বৃটিশদের বেশ বড়ো রকমের একটা সভা হ'য়েছিল। বেশ হৈচৈ প'ড়ে গিয়েছিল তখন। তোমার আমার বয়েস তখন হয়তো বছর চার-পাঁচেক হবে। সে-সভার বিবরণ তুমি প'ড়েচ?

—হয়তো প'ড়েচি, কিন্তু এখন ঠিক স্মরণ ক'রতে পারচি নে। কোন্ উপলক্ষ্যে সভাটা হ'য়েছিল, বলোতো?

—ফ্রি ট্রেড অ্যাণ্ড কলোনাইজেশন।

—হ্যাঁ, মনে পড়েচে। সভার বিবরণ আমি প'ড়েচি। কিন্তু কোথায় যে প'ড়েচি তা এখন মনে ক'রতে পারচি নে।

—রয়্যাল এশিয়াটিক জার্নালে আঠারোশো তিরিশ স্নালের দু'নম্বর ভল্যুমে আছে।

—আশ্চর্য, ভল্যুম নম্বর পর্যন্ত মনে রেখে ব'সে আচো? উঃ, স্মৃতিশক্তি বটে তোমার হরিশ!

একটু ম্লান হেসে হরিশ ব'ললে, বেশি স্মৃতিশক্তি একটা অভিশাপও বটে কিশোরী! জীবনে দুঃখের স্মৃতিগুলোকে সে যে কোনদিনই ভুলতে দেয় না!

হরিশের পিঠ চাপড়ে দিয়ে মধুসূদন ব'ললে, ওহ্ নটি ডেভিল, য়ু টক লাইক আ সেইন্ট! ইয়েস ইট্‌স্ আ কার্স ইনডিড!

হরিশের বেদনার্ত ছোট্ট কথাটা মধুকেও যেন বেশ গভীরভাবে স্পর্শ ক'রেছে। তার দৃষ্টিকে ক'রে তুলেছে উন্মনা।

স্মৃতিশক্তি মধুসূদনেরও অসাধারণ। সংস্কৃত, গ্রীক, লাতিন আর ইংরিজি কাব্য থেকে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা, সর্গের পর সর্গ সে অনর্গল আবৃত্তি ক'রে যায়। হোমর, ভার্জিল, দান্তে, তাসো, মিলটন, শেক্সপীয়র সব সময় তার জিভের ডগায়। একদিকে প্রখর স্মৃতিশক্তি, অন্যদিকে তার স্বভাবে বড়ো বেশি মাত্রায় আবেগপ্রবণতা। হয়তো সেইজন্যেই হরিশের কথাটা এত গভীরভাবে ছুঁয়েছে তার মনকে।

কিশোরীচাঁদ চোখ তুলে তাকালে হরিশের দিকে।

কয়েকমুহূর্ত আগেকার চকিত অবেগটুকু ঝেড়ে ফেলে হরিশ ব'ললে, যে-সভার কথা ব'লছিলুম তাই বলি। নিষ্কর বাণিজ্য ছাড়াও আর যে কায়েমি অধিকারটাকে আদায় ক'রে নেবার জন্যে শ্বেতাঙ্গেরা সেদিন জোট বেঁধেছিলো, সেটা হ'ল—এ-দেশের গ্রামে-গঞ্জে-শহরে নিরঙ্কুশ জমিদারির কর্তৃত্ব। আর, সে-জমিদারির অর্থ হ'ল নীলকুঠি বসিয়ে রাতারাতি বড়োলোক হ'য়ে যাওয়ার সবচেয়ে নিশ্চিত পথ।

একটু দম নিয়ে হরিশ আবার বলতে লাগলো, সেই উদ্দেশ্যকে সফল করবার জন্যে আটাশ বছর আগে আঠারোশো উনত্রিশ সালের পনেরোই ডিসেম্বর ওই টৌন হলেই তো হ'য়েছিল সেই বিরাট সভা। আমার একটু আশ্চর্য লাগে, সেই সভায় তাদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন রাজা রামমোহন, প্রিন্স দ্বারকানাথ আর প্রসন্নকুমার ঠাকুর!

—গ্রেট ব্যারন্ অব্ বেঙ্গল!—মধুসূদন ব'ললে, এতে তোমার আশ্চর্য হওয়ার কী আছে?

একটু হেসে হরিশ ব'ললে, কারণ না থাকলে আর খামোকা আশ্চর্য হ'তে যাবো কেন বলো? রয়্যাল এশিয়াটিক জার্নালের বিবরণ প'ড়ে মনে হ'য়েছে, প্রিন্সের নিজের ইণ্ডিগো কনসার্ন ছিল ব'লে নীলের ব্যবসা আরো ছড়াক, এ-রকম একটা স্বার্থবুদ্ধি হয়তো তাঁর সমর্থনের পেছনে কাজ ক'রেছে। কিন্তু—

বাধা দিয়ে কিশোরীচাঁদ ব'ললে, সেই সঙ্গে এটাও ভুললে চ'লবে না হরিশ, জর্জ টম্সনের মতো তেজস্বী মানুষটিকে ওই প্রিন্স-ই এদেশে এনেছিলেন!

—সেটা আরো অনেক পরের কথা কিশোরী! বৃটিশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিরাট বাণিজ্য গ'ড়ে তোলার হিম্মৎ ব'লতে গেলে একমাত্র প্রিন্সই দেখিয়ে যেতে পেরেছেন, তাও জানি। আবার এ-ও তো নির্মম সত্যি যে, প্রিন্সের মতো এদেশের কোনো একজনও তাদের সঙ্গে ও-ভাবে পাল্লা দিক, সেটা তারা চায়নি? শেষ পর্যন্ত মোহভঙ্গ হ'য়েছিল প্রিন্স দ্বারকানাথের। তিনি আক্ষেপ ক'রে ব'লে গেছেন, ইংরেজ এদেশবাসীর ভেতর থেকে তাদের সমকক্ষ কোনো বাণিজ্য-শিল্পপতি গ'ড়ে উঠতে দেবে না!—সে কথা থাক, আমার খট্কা রাজা রামমোহনকে নিয়ে। পনেরোই ডিসেম্বরের বক্তৃতায় তিনি যা ব'লেছিলেন, তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, ইংরেজরা এদেশের আনাচে-কানাচে যত বেশি ছড়িয়ে প'ড়বে, তাদের সংস্পর্শে এসে আমাদের দেশের মানুষ ততই বেশি উপকৃত হবে।

—তোমার কি এ-বিষয়ে সন্দেহ আছে?—প্রশ্ন ক'রলে কিশোরীচাঁদ।

মৃদু হেসে হরিশ ব'ললে, সন্দেহ করবার মতো দুঃসাহস আমার নেই। কিন্তু একটা প্রশ্ন কাঁটার মতো বিঁধে আছে, তা আমি অস্বীকার ক'রবো না। মনে হয়, কোথায় যেন একটা অসঙ্গতি র'য়ে গেছে।

—কিসের অসঙ্গতি?

—রাজা রামমোহনের সঙ্গে তখনকার বাস্তব ঘটনার। যে-সময়ে সেই সভা হ'য়েছিল, তারও অন্তত পঁচিশ বছর আগে থেকেই বাঙলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বৃটিশ নীলকরদের দাপটে হাজার হাজার চাষী-রায়তের জীবন অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠতে শুরু ক'রেছে। জমির ওপর জবর-দখল, উৎখাত, কয়েদ, খুন-জখম, মেয়েদের ওপর অত্যাচার—কোনো কিছুই বাদ ছিল না। কোম্পানির সরকারকেও বুড়ো আঙুল দেখাতো ওইসব নীলকর। কোর্ট কাছারি, ম্যাজিস্ট্রেট—কাউকেই তারা পরোয়া করতো না।

অবস্থা এমন একটা জায়গায় পোঁচেছিল যে, ইংল্যাণ্ডে খোদ বৃটিশ সরকার সিদ্ধান্তই নিয়ে ব'সলে—ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সনদের মেয়াদ ফুরোলে নতুন ক'রে কোম্পানিকে আর সনদ দেওয়া হবে না, ভারত শাসনের দায়িত্ব সরাসরি বৃটিশ সরকারই হাতে তুলে নেবে। সনদের মেয়াদ ফুরোতে তখন আর বছর চারেক মাত্র বাকি। সেই সময়েই জোট বেঁধে ওই সভার আয়োজন ক'রলে এদেশের শ্বেতাঙ্গেরা। তারা সফলও হ'ল। আবার নতুন করে তেত্রিশ সালে সনদ পেলে কোম্পানি। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলে বড়ো বড়ো হৌসের মালিক আর নীলকরের দল। তাদের স্বার্থে তারা হৈ চৈ দাবিকে এত জোর গলায় সমর্থন করলেন, সেইটেই আমার মাথায় ঢোকে না। তাঁর বক্তব্যে দেখচি, শ্বেতাঙ্গেরা বাঙলার যে গ্রামাঞ্চলে গিয়ে বসবাস করচে, সেই অঞ্চলের নাকি অনেক উন্নতি হ'য়েচে। অথচ তাঁর বক্তৃতার তিন বছর পরে পার্লামেন্টারি কমিটির ডাকে সাক্ষী দিতে গিয়ে ডেভিড হিল এবং আরো কয়েকজন সৎ প্রকৃতির বৃটিশ সিভিলিয়ান কলোনাইজেশনের নামে বাঙলার গ্রামে গ্রামে নীলকরদের ছড়িয়ে পড়ার বিরুদ্ধে বেশ জোর গলাতেই আপত্তি জানিয়েচেন। গ্রামাঞ্চলের উন্নতির কথা তাঁরা স্বীকার করেননি, বরঞ্চ গরীব রায়তদের অবস্থার আরো অবনতির কথাই ব'লেচেন। তা হলে রাজার বক্তব্যের ভিত্তি কোথায়?

কিশোরীচাঁদ ব'ললে, যে পার্লামেন্টারি কমিটির কথা তুমি বলচো, তার বিবরণ আমি পড়িনি। তবে হ্যাঁ, কলকাতায় বদলি হ'য়ে আসার আগে আট বছর মফস্বলের বিভিন্ন জায়গায় কাজ ক'রতে গিয়ে, প্ল্যানটারদের দৌরাত্ম্যের চেহারা আমি বেশ কিছু দেখেচি। কিন্তু আমার কী মনে হয় জানো হরিশ? প্ল্যান্টার মানেই তো বৃটিশ জাতের প্রতিনিধি নয়? এদেশে ডেভিড হেয়ার, বেথুনের মতো লোকও তো এয়েচেন! আমার মনে হয়, রাজা হয়তো প্ল্যান্টারদের একটা সাময়িক ব্যাপারকে অত গুরুত্ব দিতে চাননি। দেশের আরো দূর ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে কলোনাইজেশনকে তিনি সমর্থন ক'রেচিলেন।

মৃদু হাসি ফুটে উঠলো হরিশের মুখে। —কি জানি, হয়তো তাই! তবে সেটা যে সাময়িক ব্যাপার নয়, নীলকরেরা এখনো প্রতিদিন তা বেশ ভালোভাবেই মালুম করিয়ে দিচ্চে। তারা হ'য়ে উঠেচে আরো লোভী, আরো বেপরোয়া, আরো নৃশংস।

—হ্যাঁ, তোমার এ বক্তব্য আমি সমর্থন করি। —ব'ললে কিশোরীচাঁদ।

হরিশ এবারে হেসে ব'ললে, মধু, তুমি সাক্ষী রইলে কিন্তু! এতদিন বাদে একটা বিষয়ে অন্তত কিশোরী আমার সঙ্গে একমত হয়েচে!

কিশোরীচাঁদ ব'ললে, আমি তোমার মতো গোঁয়ার তো নই? যেটাকে সত্য ব'লে মনে করি, সেটাকে স্বীকার ক'রতে আমি পেছপা হইনে।

—আরে, আমিও তো তাই, বাবা! মেহাৎ তোমার অনুভবের সত্যি আর আমার সত্যিটার ভেতর কখনোই মিল হয় না, এই যা গোলমাল! এই যে ফৌজদারি আইনের পক্ষপাতিত্ব নিয়ে তোমরা একদিন মারাত্মক আন্দোলন ক'রে পিটিশন দিলে— ব্যস্, হ'য়ে গেল। ও রকম আন্দোলন দিয়ে কোনো সংস্কারই হবে না কিশোরী! বিদ্যেসাগরের মতো মন-প্রাণ ঢেলে আন্দোলন ক'রলে তবেই তা হয়তো সফল হ'তে পারে; পোশাকি আন্দোলনে কোনো কাজই হবে না। বিশেষ ক'রে সরকারি আইনের রদবদল ঘটাতে গেলে টৌন হল কিম্বা শোভাবাজারের রাজবাড়িতে মিটিঙ ক'রে তা হয় না। ইংরেজের অহমিকা আর লুটে-পুটে এদেশ থেকে ধনী হ'য়ে ওঠার গরজেই ওই আইনের জন্ম। অমন নিশ্চিন্ত হাতিয়ারটা হাতছাড়া হ'য়ে গেলে ক্ষেপে গিয়ে ওরা প্রলয়কাণ্ড বাধিয়ে তুলবে না? কতখানি ক্ষেপে যেতে পারে, সেটা তো ওরা ব্ল্যাক অ্যাক্ট মুভমেন্টের সময় দেখিয়ে দিয়েচে!

—ওহ্ দ্য হেল অব্ ব্ল্যাক অ্যাক্ট্ মুভমেন্ট! —হাত পা ছুঁড়ে বিরক্তির সঙ্গে ব'ললে মধুসূদন, য়ু ডেভিল হরিশ, এতখানি অমৃত পান ক'রেও তোমার একটু মৌতাত হয় না? সেই তখন থেকে ঠাণ্ডা মগজে দিব্যি পলিটিক্স্ নিয়ে বক্‌বক্ ক'রে চ'লেচো? তোমার মতো পাষণ্ডের

হাতে সুরার অপমান! মে দ্য গডেস অব্ ওয়াইন ফর্‌গিভ য়ু! ওহ্ গড! হ্যাভ মার্সি অন আওয়ার নটোরিয়াস পেট্রিয়ট!

॥ তিন ॥

দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে উত্তরভারত।

আগ্রা, কানপুর, মীরাট, বেরিলি, লখ্‌নৌ, দিল্লী, আম্বালা, জলন্ধর —সমস্ত শহর বিদ্রোহীদের অধিকারে। তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছে কোম্পানি-সরকারের সাধের ইমারৎ। লর্ড ডালহৌসির কূট কৌশলে অযোধ্যার নবাব-প্রাসাদের চূড়ায় সগর্বে উড়েছিল ইউনিয়ন জ্যাক, সেই অযোধ্যায় মাত্র দর্শদিনেব ভেতর নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল বৃটিশ-শাসনের সামান্যতম নিদর্শন। অযোধ্যা, রোহিলখণ্ড, সাগর, নর্মদা—সমস্ত অঞ্চল উত্তাল! প্রমত্ত ঘূর্ণিঝড়ে পাটনা থেকে দিল্লী পর্যন্ত গঙ্গা-যমুনার অববাহিকায় লেগেছে প্রলয়-মাতন।

গবর্নর জেনারেল একখানা ঘোষণাপত্র জারি করেছিলেন। দেশীয় সৈন্যদের কোনো কোনো রেজিমেন্টের সেপাইরা মিথ্যে রটনার সাহায্যে লোকের মনে এই ধরনের সন্দেহ সৃষ্টি করেছে যে, সরকার তাদের ধর্ম আর জাতিগত পরিচয় নষ্ট করবার পরিকল্পনা করেছেন। এ রটনা অলীক এবং সর্বাংশে মিথ্যা। যে কোনো ধরনেরই প্রজার জাতি-বর্ণ-ধর্ম এবং স্বাধীন ধর্মাচরণে হস্তক্ষেপ করবার কোনো অভিসন্ধি সরকারের নেই। সেইজন্যেই প্রজাগণের উদ্দেশে গবর্নর জেনারেলের আহ্বান, তারা যেন বিদ্রোহসূচক মিথ্যা রটনাকে প্রত্যাখ্যান করে!

কিন্তু কে ক'রবে প্রত্যাখ্যান?

প্রচণ্ড ঘূর্ণি হাওয়ায় শুকনো ঝরাপাতার মতো কোথায় উড়ে গেল গবর্নর জেনারেল ক্যানিং-এর ঘোষণাপত্র। বরঞ্চ ঘোষণাপত্রের আশ্বাসকেই লোকে ক'রলে প্রত্যাখ্যান।

নিত্য নতুন খবর আসছে।

প্রতিদিন, প্রতি ঘণ্টায় গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে আগত বিদ্রোহী কৃষকদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। সেপাইদের সংখ্যা হিসেব করবার তবু উপায় আছে। কিন্তু কৃষকদের সংখ্যা হিসেব করবে কোন্ দপ্তর? বন্যার জলের মতো ঢেউয়ের পর ঢেউ এসে যেন আছড়ে পড়ছে। সবাই তারা লড়াই করবে ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে। মুহূর্তের ভেতর তারা ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কোম্পানি-সরকারের যে কোনো চিহ্ন। তারা অগ্রাহ্য করেছে সমস্ত সরকারি পরোয়ানা। কেবল গোরা-ফিরিঙ্গি নয়, ফিরিঙ্গির গোলাম আর তাঁবেদারদের বিরুদ্ধেও তাদের বিদ্রোহ।

জমিদার, তালুকদার—কারো রেহাই নেই। ফিরিঙ্গি বেনিয়াদের সঙ্গে যোগসাজসে গরীবের সঙ্গে চাতুরি করে যারা ধনী হ'য়েছে, তারাও রেহাই পাচ্ছে না। দেশি বেনিয়া লালাজী আর মারোয়াড়িরা হ'ল সেই জাতের শয়তান। হোক না তারা এদেশেরই মানুষ, কিন্তু টাকার লোভে দোস্তি তাদের সেই পরদেশি শয়তানদের সঙ্গে। দুশ্‌মনের দোস্তও দুশ্‌মন!

সেপাইদের হাতে তবু কিছু হাতিয়ার আছে কিন্তু দেহাতি চাষীদের হাতিয়ার কোথায়? কী দিয়ে লড়বে তারা?

আর কিছু না থাক, ঘরে ঘরে তরোয়ালতো আছে? আছে ফসল কাটার হাঁসুয়া, জানোয়ার তাড়ানোর বল্লম। লোহাবাধাঁনো লাঠির ডগায় কশাইয়ের ছুরি বেঁধে তৈরি হয়ে গেল নতুন হাতিয়ার। হাতে হাতে জোগাড় হচ্ছে কিছু ম্যাচ্‌লক বন্দুক। ফিরিঙ্গিদের পল্টন ছাউনি থেকেই ছিনিয়ে এনে দিয়েছে সেপাই ভাইয়েরা। একটু নাকি পুরনো আর সেকেলে বন্দুক। তা হোক, তবু বন্দুক তো? ফিরিঙ্গি দুশ্‌মনেরা তাদের বন্দুকের নলে আগুন ছোটাবে আর হিন্দুস্তানী মরদ কিছু করবে না? গোলন্দাজ সেপাইরা বহু কামান আর গোলাবারুদ দখল করেছে। তাদের গোলার মুখে উড়ে যাবে দুশ্‌মনের পল্টন। যে ক'টা দুশ্‌মন বাকি থাকবে, তাদের খতম করবার

জন্যে তরোয়াল, বল্লম আর এই সেকেলে বন্দুকই যথেষ্ট। যারা একদিন ফৌজে ছিল সেই সব ঘর-ফেরা বুড়োরা চালাবে বন্দুক। তারাই তালিম দিতে লেগে গেছে দেহাতী নওজোয়ান মরদগুলোকে।

গ্রাম-গ্রামান্তরেও বিদ্রোহের ঢেউ উত্তাল।

আগুনের হল্‌কায় উত্তপ্ত হ'য়ে উঠেছে নদী, পাহাড়, জঙ্গল আর জনপদ। বঞ্চনা আর দারিদ্র্যের জ্বালা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে যেন একটা যজ্ঞ আরম্ভ হয়েছে!

—উচ্ছেদ করো!—চারিদিকে একই প্রমত্ত গর্জন।

কোম্পানির দেওয়া তালুকদারির দেমাকে হিন্দুস্তানেরই মানুষ এতদিন যারা গরীবের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছে, উৎখাত করেছে জমি থেকে, খরা-অজন্মাতেও খাজনা আদায় করেছে চাবুক মেরে—এবার তাদেরও পালা। বাল-বাচ্চা-জরুর মুখে একখানা রুটি তুলে দিতে না পারলেও তালুকদারের খাজনা না-মকুফ। চোখের জলে ভিজিয়ে তালুকদারের পাওনা-গণ্ডা তুলে দিয়ে আসতে হ'য়েছে তহ্‌শিলদারের কর্কশ হাতে। তবু নানা অছিলায় উৎখাত করেছে ক্ষেতি-জমির অধিকার থেকে। দানা-পানির পথ বন্ধ। তাতে কী এসে যায় হুজুর-মালিকের? সরকারি আইন যে মানতেই হবে!

কিন্তু এখন?

যে-সরকারের জোরে দিশি জোঁকগুলোর এত দাপট, সেই কোম্পানি সরকারই যে শ্মশানের পথে রওনা হয়েছে! তাদের কামানের জবাব কামান দেগেই দিয়েছে লড়নেওয়ালা বাহাদুর সেপাইভাইয়েরা। বন্দুকের জবাব বন্দুক! কানপুর, আগ্রা, মীরাট, বেরিলি আর লখ্‌নৌ থেকে এখন তাড়া-খাওয়া নেংটি ইঁদুরের পালের মতো যেদিকে পারে পালাচ্ছে ফিরিঙ্গির দল।

দিল্লীর বাদশা আবার হিন্দুস্তানের বাদশা হ'য়েছেন!

একশো বছর ধ'রে হিন্দুস্তানের মানুষের কাছ থেকে ওই পরদেশি ফিরিঙ্গিরা যে-কুর্নিশ আদায় ক'রে এসেছে, সুদে-আসলে সেই কুর্নিশ-ই এবার তাদের ফিরিয়ে দিতে হবে দিল্লীর বাদশাকে!

ভয়ে বিবর্ণ তালুকদার, জমিদার আর দিশি বেনিয়ার দল।

রইলো পড়ে তালুক-মুলুক, রইলো পড়ে কুঠিবাড়ি, বালাখানা আর নাচঘর। টাকা-কড়ি, মোহর-পাথর সঙ্গে যেটুকু নেওয়া যায়, তাই নিয়েই পালাচ্ছে তারা। কিন্তু পালিয়ে যাবে কোথায়? শহর-ও যে তাদের কাছে নিরাপদ নয়। সেখানে রয়েছে হাজার হাজার বিদ্রোহী সেপাই।

কলকাতার লাটপ্রাসাদে গবর্নর জেনারেলের চোখে ঘুম নেই।

উত্তরভারত থেকে একটার পর একটা দুঃসংবাদ আসছে। কেবল পরাজয় আর পরাজয়। বৃটিশ শাসন ব্যবস্থাই বিধ্বস্ত হ'য়ে গেছে। বৃটিশ সৈন্যের সংখ্যা এদেশে এখন নিতান্তই কম। এত কম যে, বিদ্রোহী নেটিব সেপাইরা যদি খালি হাতেও দলে দলে এগিয়ে আসে, তাদের পায়ের চাপে গুঁড়ো হ'য়ে যাবে গোরা পল্টন।

সামরিক বাহিনীতে ভরসা এখন গুর্খা আর শিখ রেজিমেন্টগুলো। তারা হাত মেলায়নি বিদ্রোহীদের সঙ্গে। গুর্খারা বরাবরই অনুগত। সামরিক শৃঙ্খলার প্রতি তাদের আনুগত্যের তুলনা নেই। কম্যাণ্ডিং অফিসারের হুকুমই তাদের কাছে সবচেয়ে বড়ো। অফিসারের জাত-ধর্ম নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না। আশার কথা, সব ক'টি গুর্খা রেজিমেন্টই এখন বৃটিশ সেনাপতিদের অধীনে।

কিন্তু শিখ সেপাইদের ব্যাপার একটু স্বতন্ত্র। হয়তো তারাও বিদ্রোহে যোগ দিত। কিন্তু বিদ্রোহী সেপাইরা মোগল-বংশধর বাহাদুর শাকে হিন্দুস্তানের সম্রাট ব'লে মস্‌নদে বসানোর ফলে বেঁকে ব'সেছে শিখেরা। শিখ জাতের পরম শত্রু ছিল মোগল শক্তি। মোগলের রক্তপাগল

তরোয়ালকে অনেক রক্ত দিয়েছে তারা। সহ্য ক'রেছে অনেক লাঞ্ছনা, অনেক অত্যাচার। কিন্তু গোটা শিখজাতের মাথাকে নোয়াতে পারেনি দিল্লীর বলদপী মোগলশক্তি।

সেই পরম শত্রু মোগল নতুন ক'রে হবে ভারত সম্রাট? মাথা নুইয়ে কুর্নিশ ক'রতে হবে মোগল রক্তের অধিকারী একটা মানুষকে? শিখের পক্ষে তা অসম্ভব! যতক্ষণ শিখ রক্ত দেহে আছে, ততক্ষণ মোগল বাদশাকে কুর্নিশ তারা ক'রবে না! তার চেয়ে ফিরিঙ্গি সরকার থাক্!

নেটিব গুপ্তচরদের মারফৎ সমস্ত খবরই এসে গেছে ফোর্ট উইলিয়মে। সেখান থেকে লাটপ্রাসাদে। চারিদিকের নৈরাশ্যের ভেতর তবু গুর্খা আর শিখ সেপাইদের আনুগত্যে একটু আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন লর্ড ক্যানিং।

আনুগত্য আছে আরো অনেক নেটিবের।

পশ্চিমভারতের মারাঠা সামন্তরাজারাও চিরশত্রু মোগলকে আবার নতুন ক'রে হিন্দুস্তানের বাদশা ব'লে মেনে নিতে রাজী নয়। তারা বৃটিশ সরকারেরই অনুগত থাকতে চায়। প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে, তারা অর্থ, রসদ আর সৈন্য দিয়ে সবরকমে সাহায্য ক'রবে বৃটিশ সরকারকে। উত্তরভারতের বেশ কিছু জমিদার তো মিউটিনি আরম্ভের পর থেকে গোপনে রসদ জুগিয়ে চলেছে বৃটিশ বাহিনীকে। তাদের সেই গোপন সাহায্য না পেলে হয়তো এরই ভেতর উত্তরভারত থেকে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যেতো সব ইংরেজ।

মধ্যভারতে সামন্তরাজ্য ঝাঁসীর রাজা গঙ্গা রাওয়ের মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা যুবতী রানী লক্ষ্মীবাই এখন রাজ্যের অধিকারিণী। গঙ্গারাও নিঃসন্তান। সুতরাং ডক্‌ট্রিন অব্ ল্যাপ্‌স্-এর আওতায় প'ড়ে ঝাঁসীও কোম্পানি সরকারের অধিকারে চ'লে আসার কথা। কিন্তু সে-উদ্যোগ নেওয়ার আগেই আরম্ভ হ'য়ে গেছে মিউটিনি। বিধবা যুবতী রানী হয়তো আশা ক'রছেন, বিপদের সময়ে ইংরেজকে সাহায্য ক'রলে ঝাঁসীর দশা সাতারা, নাগপুর বা সম্বলপুরের মতো হবে না। সেই আশায় কিনা কে জানে, তিনিও রসদ জুগিয়ে চ'লেছেন বৃটিশ সেনা বাহিনীকে। তাছাড়া, আহত শ্বেতাঙ্গ সৈন্যদের চিকিৎসার ব্যবস্থাও তিনি যথাসাধ্য ক'রছেন।

ভারতের পার্শি সম্প্রদায় বৃটিশ সরকারের আর একটা বড়ো ভরসাস্থল। তারা স্পষ্টই জানিয়েছে, আজ তারা যে বিপুল ধন-সম্পদের অধিকারী, তা এদেশের হিন্দু বা মুসলমান কারো জন্যেই হয়নি। বরঞ্চ, অন্যান্য ভারতীয় রাজাদের শাসনে তারা যে উৎপীড়ন সহ্য ক'রেছে, সেই উৎপীড়ন থেকে বৃটিশ শাসনই তাদের উদ্ধার করেছে। সুতরাং হিন্দু-মুসলমানের এই বিদ্রোহকে চূরমার ক'রে দেওয়ার জন্যে তারা কৃতজ্ঞহৃদয়ে ব্রিটিশ সরকারকে অকাতরে অর্থ আর রসদ সরবরাহ ক'রে যাবে। তারা সত্যিই তা ক'রছে।

প্রথমদিকে খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন ক্যানিং। তারপর অবশ্য কয়েকদিনের ভেতর সেই বিচলিত ভাবটা কাটিয়ে উঠেছেন। সেনাপতি এলগিনের অধীনে যে বিরাট সেনাবাহিনী চীনদেশের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল, তাদের ফিরিয়ে আনা হয়েছে। প্রায় একই সঙ্গে পেগু থেকে চলে এসেছে বেশ বড়ো একটা ব্রিটিশ রেজিমেন্ট। মাদ্রাজ আর সিংহল থেকে আরো কয়েকটা রেজিমেন্ট আসছে।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ শেষ হ'য়েছে। সেখান থেকে ভারতবর্ষের দিকে রওনা হ'য়েছে বৃটিশ বাহিনী। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দুর্ধর্ষ জাত আফগানদের সঙ্গে একটা সন্ধি করা সম্ভব হয়েছে। এই দুঃসময়ে সেই সন্ধি যে কত মূল্যবান! আফগান-সীমান্ত থেকে দলে দলে বৃটিশ সৈন্যকে আনা সম্ভব হচ্ছে বিদ্রোহের কেন্দ্রগুলোতে। যেমন ক'রেই হোক, এ বিদ্রোহকে দমন করতেই হবে!

অর্থবলের চিন্তা নেই, চিন্তা শুধু কৌশল নিয়ে।

অর্থের জন্যে আছে পার্শী সম্প্রদায়, গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া, হায়দরাবাদের নিজাম। তাছাড়া, বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যা, অযোধ্যা, রোহিলখণ্ড আর বুন্দেলখণ্ডের ছোটো-বড়ো সামন্ত রাজা আর জমিদারেরা তো আছেই!

বিদ্রোহ দমনে নেমেছেন স্যার হিউ রোজ, আউটরাম, ক্যাম্বেল, হ্যাভলক, হ্ইলার, ফস্টার, উইণ্ডহাম আর ব্রিগেডিয়ার নীলের মতো দক্ষ সেনাপতির দল। তব্ নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন না লর্ড ক্যানিং। গভীর রাতেও আলো জ্বলে লাটপ্রাসাদে। অস্থিরভাবে পদচারণা করেন গবর্নর জেনারেল অব ইণ্ডিয়া।

দিল্লী এখন সম্পূর্ণভাবে বিদ্রোহীদের অধিকারে।

অথর্ব বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ্‌কে মস্‌নদে বসিয়েই তারা নিশ্চিন্ত হয়নি, সেই সঙ্গে গড়ে তুলেছে এক রাষ্ট্রীয় পরিষদ। অশ্বারোহী, গোলন্দাজ আর পদাতিক বাহিনীর দুজন করে নির্বাচিত প্রতিনিধি ছাড়াও চারজন অসামরিক সদস্য নিয়ে তাদের সেই পরিষদ। নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব বাদ্‌শার নয়, পরিষদের। বাদ্‌শার জ্যেষ্ঠপুত্রকে বিদ্রোহী বাহিনীর প্রধান সেনাপতি হিসেবে ঘোষণা করা হ'য়েছে। বাদ্‌শা বাহাদুর শাহ্‌র উজীর-এ-আজম হাকিম আসানুল্লা, প্রধানা বেগম জিনৎ মহল—সবাই আনন্দে দিশেহারা। আবার ফিরে এলো মোগল গৌরবের দিন! এতদিন পরে আবার দিল্লীর মস্‌নদ থেকে চালিত হবে হুকুমৎ-ই-হিন্দুস্তান!

দিল্লী না হয় ভারতীয় রাজাদের দীর্ঘকালের রাজধানী, কিন্তু কানপুর? কানপুরের খবরই সবচেয়ে বেশি বিচলিত ক'রে তুলেছে ক্যানিংকে। সেখানে বিদ্রোহীদের নেতৃত্বে এগিয়ে এসেছে শেষ মারাঠা পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের দত্তকপুত্র নানাসাহেব। লোকটা কতবড় বিশ্বাসঘাতক শয়তান! লখ্‌নৌয়ের রেসিডেন্ট চীফ কমিশনার স্যার হেনরি লরেন্সের কাছে মাস তিনেক আগে সে নাকি কথা দিয়েছিল, যে কোনো বিপদে পড়লে ব্রিটিশ শক্তিকে সব রকম সাহায্য করবার জন্যে সে সব সময়ে প্রস্তুত!

সেই প্রতিশ্রুতির এই পরিণাম? নেটিব সামন্তরাজারা তাহ'লে মনে-মুখে এক নয়? ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈও বিদ্রোহে যোগ দিয়েছেন।

নানা সাহেব লোকটা কি জানতে পেরেছিল, বিদ্রোহ আসন্ন? সেইজন্যেই কি সে তার ইংল্যাণ্ড ঘুরে-আসা সহচর ধুরন্ধর শয়তান আজিমুল্লা খানকে সঙ্গে নিয়ে এপ্রিল মাসে আগ্রা, কানপুর, লখ্‌নৌ ঘুরে ক্ষেত্র প্রস্তুত ক'রে রেখে গেছে? পার্টি দিয়ে অন্তরঙ্গতা ক'রে ভুলিয়ে রেখে গেছে দায়িত্বশীল বৃটিশ শাসক আর সামরিক অফিসারদের? আশ্চর্য, স্যার হেনরি লরেন্সের মতো অভিজ্ঞ, বিচক্ষণ সিবিলিয়ানের চোখেও সে অনায়াসে ধুলো দিয়ে গেল?

কানপুরের শেষ খবর স্তম্ভিত ক'রে দিয়েছে লর্ড ক্যানিংকে। আগ্রা থেকে টেলিগ্রাফে সংবাদ এসেছে ক'লকাতায়। একমাস ধ'রে যুদ্ধের পর হুইলারের মতো অসাধারণ সেনাপতি নিরুপায়ভাবে তাঁর বাহিনী নিয়ে নানাসাহেবের কাছে আত্মসমর্পণে বাধ্য হ'য়েছেন!

কানপুরও এখন বিদ্রোহীদের দখলে।

শুধু অধিকার সাব্যস্ত ক'রেই ক্ষান্ত হয়নি তারা। প্রতিষ্ঠা ক'রেছে স্বাধীন সরকার। আর সেই বিদ্রোহী স্বাধীন সরকারের পরিচালক ওই ধূর্ত নানাসাহেব।

অস্থির উত্তেজনার প্রকাশ ক্যানিংয়ের স্বভাবে নেই। ভেতরে যতই অস্থিরতা থাকুক না কেন, বাইরে তিনি শান্ত, অচঞ্চল। কানপুরের সংবাদে বিচলিত হ'লেও ফোর্ট উইলিয়মের বড়ো বড়ো সেনাপতি কিম্বা কৌন্সিলের সদস্যদের সামনে উদ্বেগের চিহ্নমাত্র তিনি প্রকাশ করেননি। বরঞ্চ, উদ্বিগ্ন সেনাপতি আর কৌন্সিল সদস্যদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, বৃটিশ তার বুদ্ধি আর শক্তি দিয়েই পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তে আজ প্রভুত্ব করছে। বৃটিশ হয়ে এই সামান্য একটা ঘটনায় বিভ্রান্ত হয়ে পড়া আমাদের অন্তত উচিত নয়!

সেনাপতি হুইলার যদিও অবস্থার চাপে নানাসাহেবের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন, কিন্তু তার আগে একটা কাজের মতো কাজ ক'রে গেছেন। বিদ্রোহী সেপাইদের ভেতর বেশ কিছু নেটিব গুপ্তচরকে ঢুকিয়ে দিতে পেরেছিলেন তিনি। তারা বিদ্রোহীদের গতিবিধির খবর তো আনছেই, তার ওপর পুরস্কারের ফাঁদ পেতে সেখানেও অনেক নতুন নতুন গুপ্তচর তৈরি ক'রেছে। এমনকি,

খোদ দিল্লীতেও ছড়িয়ে প'ড়েছে বৃটিশের অনুগত এবং বিশ্বস্ত গুপ্তচরের দল। এ-যুদ্ধে গোলন্দাজ বাহিনীর গুরুত্বই সবচেয়ে বেশি। সেই গোলন্দাজ-বাহিনীর কয়েকজন বড়ো বড়ো সেনাপতি হাতে এসে গেছে। মোগল সেনাপতি মহম্মদ আলি খাঁ সেপাই মহলে 'নুনে-নবাব' নামে পরিচিত। নুনে নবাব এখন গোপনে গোপনে বৃটিশের পক্ষে। গোলন্দাজ বাহিনীর আর একজন বড়ো সেনাপতি কুলি খাঁ-ও তাই। বিদ্রোহীদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। তাই হয়তো অভিজাত মোগল আমীর-ওমরাহ্ আর সেনাপতিরা তাদের ওপর আস্থা রাখতে পারছেন না। আস্থা রাখতে পারছেন না বেগম জিনৎমহল আর উজির-এ-আজম হাকিম আসানুল্লা। এমনকি, বিদ্রোহীদের প্রধান সেনাপতি হ'য়েও শাহ্‌জাদা মির্জা মোগল পর্যন্ত সংশয়ের দোলায় দুলছেন। ফিরিঙ্গিদের কাছে আনুগত্য প্রমাণের জন্যে তিনি গোপনে গোপনে ব্যস্ত হ'য়ে প'ড়েছেন। তাতে হয়তো জীবনটা রক্ষা পাবে, পাওয়া যাবে একটা মোটা অঙ্কের মাসোহারা ইনাম। কিন্তু বিদ্রোহীদের সঙ্গে থেকে ভবিষ্যৎ কী? পরাজিত হ'লে ফিরিঙ্গিদের হাতে কোতল অনিবার্য!

নিজের ভবিষ্যৎ চিন্তা কে না করে?

দিল্লীর মোগল হারেমের বেগম থেকে শুরু ক'রে সদরের শাহজাদা, আমীর-ওমরাহ্, সিপাহসালার, রিশলদার—সবাই সুযোগ খুঁজছে। কেউ কেউ এরই ভেতর গোপনে ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে খুব গোপনে সাঙ্কেতিক যোগাযোগও ক'রে ফেলেছে। বেগম জিনৎ মহল তাদেরই একজন।

উভয় সঙ্কটে অসহায় সম্রাট বাহাদুর শাহ্-র! একদিকে তাঁর রূপসী বেগম, শাহ্‌জাদা, আমীর-ওমরাহ্ আর খানদানী সেনাপতির দল—অন্যদিকে হাজার হাজার বিদ্রোহী সেপাই!

শাহান শা আলমগীরের এন্তেকালের পর ব'লতে গেলে ধুলো জ'মছিল দিল্লীর শাহী মস্‌নদে। মাকড়সার জালে ছেয়ে গিয়েছিল দুর্গ-প্রাসাদ। আংরাখা দিয়ে ধুলো ঝেড়ে সেই শানদার শাহী মস্‌নদে সেপাইরা বসিয়েছে বাহাদুর শাহ্‌কে। দুর্গ-প্রাসাদের অজস্র অলিন্দ, প্রকোষ্ঠ আর বাতায়ন থেকে তারাই ভেঙে দিয়েছে মাকড়সাব জাল। তারা না এলে কোথায় থাকতো এই বাদশাহী? কে ডেকে কথা ব'লতো মোগল বংশধর বাহাদুর শা'র সঙ্গে?

সেপাইদেরও গুপ্তচর আছে। সময়মতোই তাদের কানেও পৌঁছে গেছে কিছু কিছু খবর। আর দ্বিধা নয়, বিলম্ব-ও বিপজ্জনক।

বিদ্রোহীদের রাষ্ট্রীয় পরিষদ জারি ক'রলে নতুন পরোয়ানা। সম্রাটের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হ'ল সমস্ত কর্তৃত্বের অধিকার—বাহাদুর শাহ্ শুধু নামে সম্রাট। বিদ্রোহী সরকারের সমস্ত দলিল আর ফরমানে দরকার বাদ্‌শার দস্তক আর দস্তখৎ। কেবল সেই অধিকারটুকুই রইলো তাঁর। সম্রাট হ'লেন নজরবন্দী।

কিন্তু তার ওপরেও জামিন চাই!

কম্পিত বৃদ্ধ বাদশার কাছে বজ্রগম্ভীর স্বরে দাবি জানালেন হুকুমৎ-ই-হিন্দুস্তানের সদর-এ-জলসা,—জামিন স্বরূপ বন্দিনী থাকবেন বেগম জিনৎ মহল। আমরা খবর পেয়েছি, দুশ্‌মন ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে সহযোগিতার জন্যে প্রাসাদেরই একটা বিরাট চক্র গোপনে কূট চক্রান্ত ক'রে চ'লেছে। আপনার বেগম তাদের নেত্রী।

মুখ নীচু ক'রে ব'সে রইলেন, হিন্দুস্তানের বাদ্‌শা।

সদর-এ-জলসা অর্থাৎ সভাপতি আবার ব'ললেন, জাঁহাপনা, আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, অকারণ রক্তপাত এড়ানোর জন্যে হাতের মুঠোয় পেয়েও দিল্লীর ফিরিঙ্গি কর্মচারী কিম্বা তাদের পরিবারবর্গের কারো গায়ে হাত দিইনি আমরা? তারা কিন্তু আমাদের এই অনুকম্পার কোনো মর্যাদাই দেয়নি! আপনার হারেম কিম্বা খানদানী আমীর-ওমরাহ্‌দের দৌলতখানা থেকে বিশ্বাসঘাতকতার যে চক্রান্ত চ'লছে, তার যোগসূত্র ওই ফিরিঙ্গি কর্মচারীর দল। জাঁহাপনা কি মনে করেন, এর পরেও ওদের প্রতি সদয় ব্যবহার করা আমাদের উচিত?

অসহায় কম্পিত স্বরে বাদশাহ্ ব'ললেন, না।

একখানা কাগজ এগিয়ে দিলেন সদর-এ-জলসা। অকম্পিত গম্ভীরস্বরে ব'ললেন, এই পরোয়ানায় দস্তখৎ করুন জাঁহাপনা!

পেছনে নির্বাক, নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে রাষ্ট্রীয় সভার আরো কয়েকজন সদস্য। সকলেরই মুখ গম্ভীর।

সকলের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে একটু কাঁপা হাতে পরোয়ানা সই ক'রে দিলেন বাহাদুর শাহ্। সই-করা ফর্মানে বাদশার দস্তক্ ছাপ মেরে ধীর পায়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন সদর-এ-জলসা। তাঁর পেছনে আর সবাই।

দিল্লীর শ্বেতাঙ্গ মহলকে আর ক্ষমা ক'রলে না বিদ্রোহীরা।

নারী আর শিশু অবধ্য। তাই তাদের ওপর উদ্যত অস্ত্র নাম্লো না। কিন্তু অস্ত্রের আঘাতে লুটিয়ে প'ড়লো প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের দেহ। আত্মরক্ষার অন্য কোনো উপায় না পেয়ে একজন ক্যাপ্টেন আর একজন মেজর গিয়ে নারী-শিশুদের ভীড়ের ভেতর আত্মগোপন ক'রেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রাণ বাঁচাতে পারলে না তাদের কেউ। কেমন ক'রে যেন খবরটা জানতে পেরেছিল সেপাইরা। জেনানার ইজ্জৎ তারা নষ্ট করেনি। মাস্কেট উঁচিয়ে ভয় দেখিয়ে তারা সরিয়ে দিয়েছে জেনানাদের। তারপর ভীড়ের ভেতর থেকে এক ফালি ফাঁকা পথের ওপর দিয়ে টেনে বের ক'রে এনেছে সেই ক্যাপ্টেন আর মেজরকে। দু'জনের জন্যে দু'টা গুলিই যথেষ্ট! লুটিয়ে প'ড়েছে তাদের দেহ।

সেইদিনই অত কাছাকাছি থেকে সেপাইরা বুঝতে পারলে, ফিরিঙ্গি মেমসাহেবদের প্রাণের ভয় হিন্দুস্তানী আওরতের চেয়ে অনেক বেশি। প্রাণের ভয়ে তারা হিন্দুস্তানী আওরতের চেয়ে অনেক বেশি জোরে কাঁদে!

টেলিগ্রাফের পর টেলিগ্রাফ! খবরের পর খবর!

দম ফেলার অবকাশ পাচ্ছেন না ক্যানিং। প্রতিমুহূর্তে নতুন নতুন সমস্যা, প্রতি মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নেওয়া আর নির্দেশ দেওয়ার ব্যস্ততা।

এর ভেতর তিনি আর একটা ঘোষণাপত্র জারি ক'রেছেন।

নতুন ঘোষণাপত্রে চরম প্রতিহিংসা নেওয়ার কোনো হুমকি নেই দেখে ক'লকাতার বৃটিশ-সমাজ রাগে, উত্তেজনায় দিশেহারা। ব্লাডি নেটিব সেপাইগুলো এত শ্বেতাঙ্গের রক্ত ঝরিয়েছে তবু গবর্নর জেনারেল এতখানি শান্ত? তাঁর দেহে কি বৃটিশ রক্ত নেই? দয়ার অবতার ব'লে নাম কেনার জন্যেই কি তিনি এদেশের দায়িত্ব নিয়ে এসেছেন?

ক্লেমেন্সিয়া!

নম্রতা? দয়া? ক্ষমতাশীলতা?

হ্যাঁ, নাম কেনার বাতিকেই পেয়ে বসেছে লোকটাকে! দেখতে যেমন মেয়েদের মতো, চালচলনও তেমনি মেয়েলি। দয়াময়তো নয়, দয়াময়ী!

ক্লেমেন্সি ক্যানিং! দয়াময়ী ক্যানিং!

যে দোর্দণ্ড প্রতাপে এদেশ শাসন ক'রে গেছেন লর্ড ডালহৌসি, সে প্রতাপ তো দূরের কথা, বৃটিশজনোচিত সাহসের রেশ মাত্র নেই এই অপদার্থ লোকটার ভেতর। কী দেখে কোম্পানির কোর্ট অব ডিরেক্টর্স্ এমন একটা মেয়েলি পুরুষকে এদেশের গবর্নর জেনারেল ক'রে পাঠিয়েছে? গ্রেট ব্রিটেনে কি খাঁটি পুরুষ মানুষের আকাল প'ড়ে গেল?

ক্ষোভে, রাগে শ্বেতাঙ্গ সমাজ যেন ফেটে প'ড়ছে। তারা হাতিয়ার চায় কিন্তু ক্লেমেন্সি ক্যানিংয়ের সরকার তা দিতে নারাজ। তারা চায় ক'লকাতা আর আশপাশের সমস্ত নেটিবকে কোতল করা হোক, ক্যানিং তাতে রাজি নয়। উত্তরভারতে ব্রিটিশের যতটুকু রক্ত ঝরেছে, তার দ্বিগুণ কিম্বা চারগুণ নেটিবের রক্ত এখানে ঝরাতে পারলে তবু যাহোক একটু সান্ত্বনা পাওয়া

যেতো। কিন্তু তার উপায় নেই! আঘাত খেয়ে বৃটিশ কি কেবল চুপ ক'রেই থাকবে? প্রতিশোধ নেবে না? চরিতার্থ ক'রবে না প্রতিহিংসা?

শুধু বাধা, বাধা আর বাধা!

যেন মুখ বুজে নেটিবদের সব অনাচার অত্যাচার সহ্য করবার জন্যেই বৃটিশ এদেশে এসেছে! অসহ্য ক্যানিং! অসহ্য তার চালচলন!

কাগজে কাগজে বিদ্রূপ, মুখে মুখে শ্লেষ-ব্যঙ্গ, তবু কোনো প্রতিক্রিয়া নেই ক্লেমেন্সি ক্যানিংয়ের। লোকটা কি মানুষ না আর কিছু? শেষ পর্যন্ত কাগজের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ উঠলো প্ররোচনার পর্যায়ে। শ্বেতাঙ্গদের আরো বেশি উত্তেজিত ক'রে তোলার জন্যে যেটুকু করা দরকার তার কিছুই বাকি রাখলে না শ্বেতাঙ্গ পরিচালিত ইংরিজি পত্রিকাগুলো। আর অন্যদিকে কালীপ্রসন্নর টাকায় চালু উর্দু পত্রিকা দূরবীন কড়া ভাষায় উত্তরভারতে শ্বেতাঙ্গ সেনাবাহিনীর বর্বর জিঘাংসার সমালোচনা ক'রে চ'লেছে।

হঠাৎ জারি হ'ল 'প্রেস ল'—সংবাদপত্র আইন।

নতুন আইনে সতর্ক করা হ'ল হরকরা, ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া আর ঢাকা নিউজকে। একমাত্র ঢাকা নিউজ নিজেকে সামলে নিলে, কিন্তু হরকরা আর ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বেপরোয়া। শেষ পর্যন্ত হরকরার প্রকাশ বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'ল, বাতিল ক'রে দেওয়া হ'ল ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার লাইসেন্স। বন্ধ হ'য়ে গেল দূরবীন আর উত্তর ভারতের কয়েকটি উর্দু পত্রিকা। স্পষ্ট ঘোষণা ক'রে দেওয়া হ'ল, শ্বেতাঙ্গ আর নেটিবদের পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ কিম্বা প্ররোচনামূলক রচনা প্রকাশ ক'রলেই বন্ধ ক'রে দেওয়া হবে পত্রিকা।

কেমন যেন একটু হকচকিয়ে গেল গোরাসাহেবেরা। গবর্নর জেনারেল ক্যানিংয়ের সমস্ত আচরণই তাদের কাছে দুর্বোধ্য ঠেকতে লাগলো। ব্রিটিশের স্বার্থরক্ষাই যার প্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত, সে কিনা এই মিউটিনির আগুনের ভেতর দাঁড়িয়ে নিজের জাতকেই আঘাত ক'রছে?

কোম্পানির নির্বাচনে ভুল হ'য়েছে। ক্যানিংয়ের মতো একটা লোককে গবর্নর জেনারেল হিসেবে এদেশে পাঠিয়ে মারাত্মক সর্বনাশের সম্ভাবনা ডেকে এনেছে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি। এই গবর্নর জেনারেল যদি কয়েকটা বছর এদেশে থাকে তাহ'লে পাততাড়ি গুটিয়ে এদেশ থেকে বিদায় নিতে হবে সব শ্বেতাঙ্গকে। বিদ্রোহী বর্বর সপাইরা জবরদখল ক'রে নেবে বৃটিশের এত কষ্টে গ'ড়ে তোলা এতবড়ো সাম্রাজ্যটাকে, কেড়ে নেবে বৃটিশের মুখের গ্রাস, চোখের ঘুম! ওয়েস্ট ইণ্ডিজে আগেকার অবস্থা আর নেই। সবচেয়ে বড়ো ভরসা এই সোনার খনির মতো উপনিবেশ—ইণ্ডিয়া। এ উপনিবেশও যদি হাতছাড়া হ'য়ে যায় তাহ'লে অভাবের হাহাকারে ভারী হ'য়ে উঠবে গ্রেট ব্রিটেনের আকাশ-বাতাস।

কোম্পানি যে একটা প্রচণ্ড ভুল ক'রেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে সে-ভুল সংশোধনের সময় এখনো পেরিয়ে যায়নি। এদেশের সমস্ত শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে দরখাস্ত পাঠাতে হবে ইংল্যাণ্ডে। ক্যানিংয়ের ভয়াবহ কার্যকলাপের ছবি তুলে ধ'রতে হবে কোম্পানির কর্তৃপক্ষের সামনে। তাঁদের বুঝিয়ে দিতে হবে, ক্যানিংয়ের মতো একটা মেয়েলি গবর্নর জেনারেলের হাত দিয়ে গ্রেট ব্রিটেনের কতবড়ো সর্বনাশ ঘনিয়ে আসছে! সেটা বুঝতে পারলে প্রতিকারের একটা কিছু উপায় তাঁরা নিশ্চয়ই ক'রবেন। অন্তত এই অপদার্থ লোকটাকে সরিয়ে ফোর্ট উইলিয়মের কোনো জবরদস্ত জেনারেলের হাতেও যদি দায়িত্ব তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায় তাহ'লে এভাবে বৃটিশ জাতির ভরাডুবি হবে না!

সক্রিয় হ'য়ে উঠলো ক'লকাতার শ্বেতাঙ্গ সমাজ।

গোয়েন্দা গুপ্তচরেরা সব খবরই পৌঁছে দিলে লাটপ্রাসাদে। কিন্তু ক্যানিং নির্বিকার। মিউটিনির গতি-প্রকৃতি নিয়েই ব্যস্ত তিনি।

উত্তরপ্রদেশ আর মধ্যপ্রদেশে বিদ্রোহ নতুন মোড় নিয়েছে। বিদ্রোহীরা ক্রমেই ছড়িয়ে প'ড়ছে

চতুর্দিকে। বিদ্রোহীদের নেতৃত্বে এগিয়ে এসেছেন ফৈজাবাদের এক প্রভাবশালী মৌলানা। এগিয়ে এসেছেন তাঁতিয়া তোপি নামে এক রণকৌশলী মারাঠী ব্রাহ্মণ। তিনি হাত মিলিয়েছেন নানাসাহেবের সঙ্গে।

বিদ্রোহী সেপাইরা লুটপাট ক'রে যে-সব অস্ত্র জোগাড় ক'রেছে তাই দিয়েই তারা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। ক্যানিং ভালোভাবেই জানেন, তাদের হাতে মজুত গুলিগোলা একদিন ফুরিয়ে যাবে, কিন্তু বৃটিশ বাহিনীর রসদের জোগান বন্ধ হবে না। তাছাড়া, যে সব মাস্কেট জাতীয় বন্দুক সেপাইদের হাতে গেছে, এনফিল্ড রাইফেলের সঙ্গে এ'টে ওঠা সে-সব বন্দুকের পক্ষে দুঃসাধ্য। বিদ্রোহী নেটিব গোলন্দাজ বাহিনীতেও এখন বৃটিশ পক্ষ সমর্থকের সংখ্যা যথেষ্ট। সুযোগের মুহূর্ত আসার সঙ্গে সঙ্গেই তারা কামানের মুখ ঘুরিয়ে বিদ্রোহী সেপাইদের ওপরেই গোলাবর্ষণ ক'রবে, তাও একরকম নিশ্চিন্ত। এরই ফাঁকে ব্রিটিশ সেনাপতিদের এগিয়ে গিয়ে বিদ্রোহীদের দু'একটা বড়ো ঘাঁটি অন্তত দখল করা দরকার। তাদের মনোবল ভেঙে না যাওয়া পর্যন্ত চারদিক থেকে আক্রমণ চালিয়ে যেতেই হবে।

কিন্তু বিদ্রোহী সেপাইদের কার্যকলাপের একটা বৈশিষ্ট্য বারবার বিস্মিত ক'রছে ক্যানিংকে। তারা অস্ত্রাগার লুঠ ক'রছে, শ্বেতাঙ্গ পুরুষদের বুক তাক্ ক'রে নির্দয় হাতে গুলি ছুঁড়ছে—কিন্তু নারী আর শিশুদের গায়ে এখন পর্যন্ত হাত দেয়নি! বিদ্রোহ ক'রলেও যুদ্ধের নীতিকে লঙ্ঘন করেনি তারা।

কিন্তু ক্যানিংয়ের স্বজাতি বৃটিশ সেনাপতিরা?

তারা কিন্তু যোদ্ধার এই শালীনতাটুকু বজায় রাখেনি। বেনারস থেকে বিদ্রোহ দমনের জন্যে বিরাট বাহিনী নিয়ে রওনা হ'য়েছেন ব্রিগেডিয়র নীল। তাঁর অভিযান সম্বন্ধে যেটুকু খবর এসেছে তাতেই বোঝা যায়, পথের দু-ধারে গ্রাম-জনপদকে শ্মশান ক'রে দিয়ে চ'লেছেন তিনি। নারী, শিশু, বৃদ্ধ—কেউ বাঁচেনি।

কলভিন, হ্যাভলক, ক্যাম্পবেল, ফস্টার, হুইলার—কোনো সেনাপতিই এই উগ্রতা থেকে মুক্ত ন'ন। বিদ্রোহীদের ধ'রতে না পেরে তাঁরা গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দিচ্ছেন, কামান দেগে তৈরি ক'রছেন অসংখ্য নিরীহের মৃতদেহের স্তূপ।

লর্ড ডালহৌসি!

আপনমনেই মাঝে মাঝে বিড়বিড় ক'রে পূর্বসূরীর নামটা উচ্চারণ করেন ক্যানিং। বড়ো দ্রুত তিনি সব কিছু করায়ত্ব ক'রতে চেয়েছিলেন! তারই অনিবার্য বিষময় ফল এখন ফলছে! লর্ড ডালহৌসির কৃতকর্মের ফল ভোগ ক'রতে হচ্ছে ক্যানিংকে। শুধু সেপাইরাই যে বিদ্রোহী, তা তো নয়? বিদ্রোহে ঝাঁপিয়ে প'ড়েছে গরীব চাষী মজুরের দল-ও। বড়ো সর্বনাশা ইঙ্গিত!

কলকাতার অধৈর্য শ্বেতাঙ্গ সমাজ বুঝতে পারছে না, এ বিদ্রোহ দমন ক'রতে কতখানি স্থির বুদ্ধি আর বিবেচনার দরকার! উত্তর ভারতে এখন যা ঘটছে, তার প্রভাব ভারতের অন্য কোন প্রান্তে প'ড়বে না, এ-কথাও জোর দিয়ে বলা কঠিন। ভারতের এই পূর্বপ্রান্তে ব্যারাকপুরেই প্রথম আগুন জ্ব'লেছিল!

নিজের কাছেই নিজে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে চলেন ক্যানিং।

শ্বেতাঙ্গ মহলে একটা জনরব উঠেছিল, তেইশে জুন অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধের তারিখে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধ'রে বিদ্রোহী নেটিব সেপাইরা এগিয়ে আসবে—দখল নেবে ক'লকাতার। ভয়ে নীল হ'য়ে গিয়েছিল শ্বেতাঙ্গদের মুখ। অনেকেই গঙ্গার ওপর স্টীমারে আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু কিছুই হ'ল না।

সে-তারিখ চ'লে গেছে, সে-ত্রাস-ও দূর হ'য়েছে। এ-প্রান্তের সমস্ত নেটিব রেজিমেন্টকে নিরস্ত্র করা হয়েছে। বাকি আছে ত্রিপুরা আর চট্টগ্রাম। অবশ্য, সেখান থেকে কোনো আশঙ্কা নেই ব'লেই ক্যানিংয়ের বিশ্বাস। কিছু সেপাই অবশ্য শ্রীহট্ট আর উত্তর বাঙলা হ'য়ে দিল্লীর

দিকে চ'লে গেছে। একে সেখানে তাদের সংখ্যা এখন কম, তার ওপর অন্য ক্যান্টনমেন্টগুলোর সঙ্গে তাদের যোগাযোগের পথও বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'য়েছে। ত্রিপুরার রাজা সে-ব্যাপারে সব রকম সাহায্য দিয়েছেন সরকারকে।

নিতান্ত মূর্খের মতো গলা ফাটিয়ে ম'রছে ক'লকাতার শ্বেতাঙ্গরা। তারা বুঝতে পারছে না, শিক্ষিত নেটিবদের কাছ থেকে বৃটিশ সরকারের সমান্যতম বিপদের সম্ভাবনাও নেই। তারা অনুগত আছে এবং থাকবে। নেটিব পত্র-পত্রিকায় এই ক'মাসে বিদ্রোহী সেপাইদের উদ্দেশ্যে যে সব রূঢ় মন্তব্য প্রকাশিত হ'য়েছে, তা প'ড়েও কিছু বুঝতে পারছে না এই সব উত্তেজিত শ্বেতাঙ্গ?

আংশিক ব্যতিক্রম একমাত্র হিন্দু পেট্রিয়ট।

পত্রিকার সম্পাদক বাবু হরিশচন্দ্র মুখার্জি যদিও মিউটিনির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেননি, তবু একমাত্র তিনিই এ মিউটিনির পটভূমিকে যথার্থ বুঝতে পেরেছেন।

উত্তাল জন-বিদ্রোহ!

যদিও ক্যান্টনমেন্টের সেপাইরাই বিদ্রোহ আরম্ভ ক'রেছিল কিন্তু সে-বিদ্রোহ আজ আর কেবলমাত্র সেপাইদের ভেতর সীমাবদ্ধ নেই—তার উত্তপ্ত অগ্নিশিখা দিকে দিকে ছড়িয়ে গেছে!

ইট্‌স্ নো লঙ্গার আ মিউটিনি—বাট আ রেবেলিয়ন।

হিন্দু প্রেট্রিয়টের প্রবন্ধটা প'ড়েই প্রথম নতুনভাবে চিন্তা ক'রতে আরম্ভ ক'রেছিলেন ক্যানিং। তারপর থেকে প্রতি সপ্তাহে হিন্দু পেট্রিয়ট পড়া তাঁর অবশ্য কর্তব্যের তালিকায় এসে গেছে।

সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ হিন্দু পেট্রিয়টের।

এ-দেশের মানুষ যে পরাধীনতার জ্বালায় বিক্ষুব্ধ, সে-কথা লিখতেও দ্বিধা করেননি নেটিব সম্পাদক।

কিন্তু তারা কোন্ মানুষ? শিক্ষিত নেটিবরা নয়। উত্তর ভারতে গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে ছুটে এসে যারা দলে দলে বিদ্রোহী সেপাইদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে, সেই সাধারণ মানুষ, সেই চাষাভুষো গরীব নেটিব।

বাঙলাদেশেও র'য়েছে লক্ষ লক্ষ কৃষক। জমিদার আর নীলকরের অত্যাচারে তারা ধুঁকছে। তারা মরীয়া হ'য়ে উঠলে এই বাঙলাদেশেও যদি উত্তর ভারতের মতো কোনো বিপর্যয় ঘনিয়ে আসে, সেটা আসবে গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের কাছ থেকে—কলকাতার শিক্ষিত নেটিবদের কাছ থেকে নয়। গ্রামাঞ্চলে সামান্য একটা আগুনের ফুলকিও এ-সময় চরম বিপদ ডেকে আনতে পারে।

বড়ো সতর্কভাবে পদক্ষেপ ক'রতে হবে এখন।

॥ চার ॥

এবছর অঘ্রানের প্রথম থেকেই যেন একটু শীতের আমেজ দেখা দিয়েছে।

শীতের বেলা ক্রমেই ছোটো হ'য়ে আসছে, তার ওপর সন্ধ্যে হ'তে না হ'তেই নির্জন থম্‌থমে হ'য়ে যায় ক'লকাতার পথ-ঘাট। অন্ধকার নেমে আসতে না আসতেই দোকানপাট বন্ধ। কোথায় হিল্লি-দিল্লী শহরে অনামুখো সেপাইরা নাকি কী সব কাণ্ড বাধিয়ে ব'সে আছে, তার জের ক'লকাতায় কেন বাপু? এই ক'লকাতার মানুষতো কিছু ক'রেনি। তবে তাদের এইভাবে হেনস্তা ক'রে গোরাসাহেবদের লাভ কী?

হারাণের মুখেই অনামুখো সেপাইদের কাণ্ড-কারবারের কথা কিছু কিছু শুনেছেন রুক্মিণী। হরিশের তো দেখা পাওয়াই ভার। বাড়ি ফেরে সেই রাত দুপুরে। তারপরই কোনো মতে নাকে-মুখে দু'টো গুঁজে অমনি ব'সে যায় তার কাগজ-পত্তর নিয়ে। কোনো কোনো দিন তো খায়-ই না। বলে, বন্ধুর বাড়িতে খেয়ে এয়েচি। মদের ঘোরে চোখ দু'টো তো সব সময়েই প্রায় জবাফুলের মতো টকটকে লাল। ভয়ে বুক কাঁপে রুক্মিণীর। এইভাবে দিনরাত মদ গিললে ক'দিন বাঁচবে

ছেলেটা? ওর বন্ধুবান্ধব সবাই নাকি মদ খায়। তারা সব বড়ো ঘরের ছেলে। মদ আর মাগী না হ'লে তাদের চলে না। কিন্তু তারা কেউতো হরিশের মতো এমন পুরোপুরি রাশছাড়া হয়নি?

কত দুঃখে, কত ব্যথায় যে ছেলেটা নিজেকে মদের ভেতর ডুবিয়ে দিয়েছে, তা আর কেউ না বুঝুক রুক্মিণী তো বোঝেন! তিনি হরিশের মা। দশমাস পেটে ধরে নিজের নাড়ি কেটে যে ছেলের তিনি জন্ম দিয়েছেন, তার মনের কষ্ট তিনি বুঝবেন না তো কি পাড়াপড়শী এসে বুঝবে? কি কুক্ষণেই যে তিনি ছেলেটাকে দ্বিতীয় পক্ষ করিয়েছিলেন!

হারাণ কিন্তু নিজের বুঝ্ বোঝে।

কাগজের আপিসে তাকে রোজই যেতে হয়। দেখা-শোনা, বিলিব্যবস্থা সবই করতে হয় তাকে। কাজ মিটিয়ে ঠিক সন্ধ্যের পরেই সে বাড়ি ফিরে আসে। এখন নাকি সন্ধ্যের পর টাউন কলকাতার পথে হাঁটাই বিপদ। রুক্মিণী পই পই করে কতবার হরিশকে বলেছেন, কিন্তু কে শোনে কার কথা? রাত দুপুর না হলে তার বাড়ি ফেরার সময়ই হয় না। রোজই সন্ধ্যের পর থেকে বুক ঢিপঢিপ করতে থাকে রুক্মিণীর। সন্ধ্যাহ্নিকে বসেও জপতপে মন বসে না। কান খাড়া হয়ে থাকে সদর দরজার দিকে।

—অ বড়ো বৌমা, হরিশ কি এয়েচে?

—না, মা।

সন্ধ্যের পর থেকে রোজই মাঝে মাঝে সেই একই প্রশ্ন, সেই একই উত্তর। অবশ্য কোনো কোনোদিন হারাণ ফিরে এসে জানায়, কাগজের আপিসে এসে গেছে হরিশ। সেখানে বসেই লেখালেখি করছে অথবা প্রুফ দেখছে। তা শুনে তবু একটু আশ্বস্ত হন রুক্মিণী। যা হোক, গোরাসায়েবদের এলাকা তো পেরিয়ে এসেছে। এখান থেকে বাড়ি পর্যন্ত এটুকু পথ আসতে একটু রাত হলেও তেমন চিন্তার কিছু নেই।

কিন্তু যেদিন হারাণ এসে জানায়, হরিশ তখনো কাগজের আপিসে এসে পেঁছিয়নি, সেদিন মালা-জপে কিছুতেই আর মন বসে না রুক্মিণীর। মাধুরীলতাও এ ব্যাপারে তার ঠাকুরমার দোসর। রাত দশটা হোক, এগারোটা হোক, কাকাবাবু না ফেরা পর্যন্ত সে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

আর ছোটোবৌ?

তার মনেও যে কোনো উৎকণ্ঠা জাগতে পারে, এ-কথা কেউ বিশ্বাস করবে না বলেই হয়তো এ-বাড়ির কারো কাছেই সে কিছু প্রকাশ করে না। রাত বাড়তে থাকে, রাস্তা হয়ে যায় জনশূন্য, নিশাচর পাখির খামখেয়ালি ডাকে হঠাৎ হঠাৎ নিস্তব্ধ রাত সচকিত হয়ে ওঠে—ছোটো বৌ আলো নিবিয়ে বসে থাকে। উৎকর্ণ হয়ে থাকে, কখন সদর দরজায় পাওয়া যাবে সেই মানুষটার পায়ের শব্দ।

রুক্মিণীর সঙ্গে ছোটোবৌয়ের কথাবার্তা প্রায় বন্ধ। যদি কখনো কথাবার্তা হয় তাহলে সেটা ঝগড়া উপলক্ষ্যে। তাদের দুজনের কুৎসিত ঝগড়া বাড়ির লোকের যেমন গা-সওয়া হয়ে গেছে, তেমনি হয়েছে পাড়াপড়শীরও। অতবড়ো নামজাদা মানুষ হরিশ মুখুজ্জের বাড়ির অন্দরমহলে বৌ-শাশুড়ির চুলোচুলি, গালিগালাজ আর শাপশাপান্ত এখন পাড়ার লোকের হাসির খোরাক হয়ে উঠেছে।

কিন্তু বড় বৌ তো পাড়াপড়শী নয়! তাকে এই বাড়িতেই থাকতে হয়। সোয়ামি পুত্তুর নিয়ে ঘর করতে হচ্ছে এই বাড়িতেই! মাঝে মাঝে বড়ো হেনস্থায় পড়তে হয় তাকে। কিন্তু কাকে সে কী বলবে?

আরো দুটো মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। খুব ঘন ঘন না হলেও জামাই দুজন মাঝে মাঝে আসে। সেজো বেয়াই ঈশান বাড়ুজ্যে আবার ঠাকুরপোর একজন গুণমুগ্ধ। তিনিও মাঝে মাঝে

এসে হাজির হন। এ'দের কারো থাকার সময় বাড়িতে শাশুড়ি-বৌয়ের চিল-চিৎকার আরম্ভ হয়ে গেলে লজ্জায় মাথা কাটা যায় বড়ো বৌয়ের। সেরকম বেশ কয়েকবার হয়েছে। কিন্তু উপায় কী?

কত বছর ধরে সংসারটা সেই একইভাবে চলছে!

অবশ্য অভাব-অনটনের সেই বিভীষিকা আজ আর নেই। বরঞ্চ অতীতের সেই দিনগুলোকে এখন যেন মনে হয় দুঃস্বপ্নের মতো। তার তুলনায় এখন তো রাজার হাল! এ সংসারের কেউ কি কোনোদিন ভাবতে পেরেছিল যে অন্তত এইটুকু নিশ্চিন্তেও দিনগুলো কাটবে? বাড়িতে দুর্গোৎসব হচ্ছে, পালপার্বণে মেয়ে জামাইদের তত্ত্ব—কোনো কিছুরই কামাই নেই। তার চেয়েও বড়ো কথা হল, নিশ্চিন্ত মনে দুবেলা দুটো মাছ ভাত আর দুধ ভাতের সংস্থান।

সবই হয়েছে কিন্তু সংসারে শান্তি কোথায়?

এক কলসী দুধে এক ফোঁটা চোনা বলতে যা বোঝায়, এ সংসারে ঠিক তাই হয়েছে। যমের অরুচি এই ছোটো বৌটা আসা ইস্তক নড়ো জেলে এ সংসারে আগুন দিয়েছে। একটা দিনের তরেও ঠাকুরপোকে একটু শান্তি দেওয়া তো দূরের কথা, বরঞ্চ মানুষটাকে একেবারে বা'র মুখো করে দিয়েছে। যে মানুষটাকে নিয়ে দেশের রাজা-মহারাজা, লাট-বেলাট পর্যন্ত মাথা ঘামায়, মান্যি করে চলে—তুই মুখ্যু আবাগী তাকে কিনা এইভাবে হেনস্তা করেই চললি? আর জন্মে পুণ্যি কিছু করেচিলি তাই এ জন্মে কপালে এমন সোয়ামি জুটেচে। কিন্তু তার মান রাখতে পারলি নি! আবাগী আর কাকে বলে? নিজের ভাতারকেও সুখ দিলিনি, নিজেও সুখের মুখ দেখলি নি!

আরো দু'চারটে বাঁজা মেয়ের খবর রাখে বড়ো বৌ।·· লোকের চোখে তারা যত অপয়া, যত অলুক্ষুণেই হোক, নিজের ভাতারকে কিন্তু ঠিকই বশে রেখেছে। এক বিছানা ছেড়ে আর কোনো মাগীর বিছানায় গতর ঢালার সাধ্যি আছে সেই সব মিন্সের?

এতখানি বয়েস হল, তিন-তিনটে মেয়ে পার হয়ে গেছে তবু এখনো সোয়ামির পাশে না শুলে ঘুমই হয় না বড়ো বৌয়ের। হারাণেরও সেই একই অবস্থা। তা বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পারে বড়ো বৌ। আট-দশ বছর বয়েস থেকে এতখানি বয়েস পর্যন্ত যে-মানুষটার সঙ্গে সে ঘর করে আসছে, তার ধরন-ধারণ, রকম-সকম বুঝতে এতদিনেও কিছু কি আর বাকি থাকে? পাড়ার লোকে আড়ালে হারাণকে বলে, মাগমুখো কা[illegible]খ্যর ভেড়া। মাগীগুলোই বলে বেশি। তারাই মুখ টিপে হাসাহাসি করে। সবই কানে আসে বড়ো বৌয়ের। মনে মনে রাগও হয় আবার দেমাকও হয়। ভাতারকে বশে না রাখতে পারলে মেয়েছেলে কি [illegible]? তোরা তা পারিস নি বলেই তো হিংসেয় তোদের গতর জ্বলে। আমার ভাতারের সাধ-আহ্লাদ আমি মেটাবো না তো কি তোরা এসে মিটিয়ে যাবি? ওলো শতেকখোয়ারি মাগীরা, মিন্সেকে পীরিত্ দিতে জানা চাই! পাশে শুলেই অমনি ভাতার বশ হয় না!

কত কথাই তো কানে আসে। সব কথা বাছতে গেলে কি আর ঘরসংসার করা চলে? সংসার ছেড়ে দিয়ে তাহলে তো বনে গিয়ে বাস করতে হয়।

লোকে আর যা খুশি বলে বলুক, গায়ে মাখে না বড়োবৌ। কিন্তু একটা খোঁটায় তার বুকে যেন শেল বিঁধে আছে। কিছুদিন আগেই কথাটা কানে এসেছে। তাও এলো কিনা ওই বাঁজা মাগী ছোটোবৌয়ের মুখ দিয়ে।

আজকাল ঝগড়ার তো কোনো কারণ লাগে না! একটা কোনো উপলক্ষ্য হলেই হল। সেইরকম কী একটা তুচ্ছ উপলক্ষ্য নিয়ে সেদিন ঝগড়া বেধেছিল। তারই ভেতর দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ছোটোবৌ বললে, ওলো বুড়ি ধুমসি, তিনকাল গিয়ে তো এককালে ঠেকেচে, তউ রসের নাগরি এখনো শুকোলো নি? পাড়ার লোকে কি বলে জানিস? বলে, চোখের সামনে দিনরাত সোমত্ত বেধবা মেয়েটার শুকনো মুখ দেখেও তার মা-মাগী কোন পরাণে এই বড়ো বয়সেও ভাতারের কোলে শুয়ে সোয়াগে ভিরমি খায় গা? এখনো কি বচ্চর বচ্চর বিইয়ে যাবে?

ছোটোবৌয়ের সে-কথা শুধু বড়বৌ নয়, মাধুরীও শুনেছে। সে তখন দালানের এককোণে

ছোটো ভাই দু'টোকে পড়াতে বসিয়েছিল। তার কোলে আটমাস বয়সের সবচেয়ে ছোটো বোনটা তখন সবে ঘুমিয়েছে।

মেয়ের সঙ্গে অবশ্য চোখাচোখি হয়নি বড়ো বৌয়ের। কিন্তু সেই মুহূর্তে তার মনে হচ্ছিল, এর চেয়ে ছোটোবৌ যদি তাকে দু'ঘা মারতো, তাও বোধ হয় অনেক ভালো ছিল।

মুখ নীচু করে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল বড়োবৌ। সে রাতটা সে ঘুমোতে পারে নি। সারারাত তার দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমেছে।

সে কি মা নয়? মেয়ের ব্যথা সে বোঝে না? তার চেয়ে বেশি বোঝে ওই দজ্জাল মাগী?

অদেষ্টকে ঠেকাবে কে? মাধুর অদেষ্টে যা ছিল, তাই হয়েছে। হয়তো আগের জন্মের কোনো মহাপাতকের ফলে এ-জন্মে এই দশা মেয়েটার। অদেষ্টের সে লেখন কেমন করে খণ্ডাবে তার এই জন্মের মা? তার যতটুকু সাধ্যি, তা তো সে করেই চলেছে। মটরের ডাল, হরতুকি আর বেলপাতা নাকি ভরা বয়েসের গতরে গরম ভাবটা কমিয়ে দেয়। যত সোমত্ত বয়েসই হোক, রোজ নিয়ম মতো হরতুকি আর কয়েকটা বেলপাতা চিবিয়ে খেলে নাকি খুব উবগার। সেই সঙ্গে মাঝে মাঝে মটর ডাল। তাতে নাকি গতরে আর আহিংখের সাড় থাকে না। সাড়-ই যদি না রইলো তাহলে আর কষ্টটা কিসের?

কবে থেকে মাধুরীর জন্যে সেদিকে নজর রেখে এসেছে বড়বৌ। মেয়েটার গতর একটু ভর-ভরন্ত হয়ে ওঠার লক্ষণ দেখা দিতে না দিতেই তাকে হরতুকি আর বেলপাতা খাওয়াতে শুরু করেছে।

শাশুড়ি হরতুকি দিয়ে মুখশুদ্ধি করেন। ঘরে তাই হরতুকি সব সময়েই মজুত থাকে। তাছাড়াও মাধুরীর জন্যে হরতুকি আলাদাভাবে রেখে দেয় বড়বৌ। ঠাকুরমার কাছে শিবপুজো শিখেছে মাধুরী। পুজোর জন্যে রোজই ফুল বেলপাতা আসে।

আজ দু'তিন বছর হল, মেয়েকে রোজ দু'তিনটে করে বেলপাতা চিবিয়ে খেতে শিখিয়েছে বড়োবৌ। একেবারে প্রথম দিকে মাঝে মাঝে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে মাধুরী জিজ্ঞেস করতো, বেলপাতা খেলে কি হয় মা?

বড়োবৌ বলতো, বাবা মহেশ্বর তুষ্ট হন। তাছাড়া শরীলও ভালো থাকে।

একটু বোঝবার বয়স হওয়ার পর এক সইয়ের মুখে ব্যাপারটা জানতে পেরেছে মাধুরী। মায়ের আসল উদ্দেশ্য বুঝতেও তখন আর তার অসুবিধে হয়নি। এই গতরটার আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়েই যত মরণ! আপনমনেই করুণ হেসে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বেলপাতা খাওয়ার অভ্যেসটাকে সে নিজেই আরো বেশি করে আঁকড়ে ধরেছে। সত্যিই তো, বিধবা মেয়ের দেহে কামনা-বাসনা থাকবে কেন? কিন্তু মন না চাইলেও প্রকৃতির নিয়ম যে বাধা মানে না। দেহের সরা-ঢাকা হাঁড়ির ভেতর নবযৌবনের বন্দিনী নাগিনী ফোঁস ফোঁস করতে করতে অসহায় ভাবে মাথা ঠুকতে থাকে। সমাজ, ধর্ম, কুল, শীল, সুনাম, দুর্ণাম, বাবা, মা, ভাই, বোন, কাকাবাবু—তাদের সম্মান, বংশের সম্ভ্রম! উঃ, দপ্‌দপ্‌ করতে থাকে মাথার ভেতর। বুকের ভেতরে কি এক আগুনের আঁচে সংযমের জমাট পিণ্ডটা ঘিয়ের মতো গলে গলে সেই আগুনের ওপরেই টুপ্‌ টুপ্‌ করে ফোঁটায় ফোঁটায় পড়তে থাকে। আরো লক্‌ লক্‌ করে যেন জ্বলে ওঠে সেই অদৃশ্য ভয়ঙ্কর আগুনের শিখাগুলো।

এমন হয় কেন? ওগো, এমন হয় কেন?

কে উত্তর দেবে তাকে? কার কাছে জিজ্ঞেস করবে সে? ছি ছি ছি, এ কথা কি কাউকে জিজ্ঞেস করা যায়?

মাধুরীর 'শিউলিফুল' মিত্তিরবাড়ির প্রসন্নময়ীর বিয়ে হয়েছে কাশীপুরের বিরাট এক বড়োলোকের ঘরে। প্রথম ছেলে হওয়ার সময়ে সে বাপের বাড়িতেই ছিল। মাধুরী কিন্তু তার শিউলিফুলের সঙ্গে দেখা করে নি। ছেলে-কোলে শ্বশুরবাড়ি চলে যাওয়ার আগে না হোক

দু'তিনদিন খবর পাঠিয়েছিল প্রসন্নময়ী। মাধুরী যায় নি। এই বেশে কেমন করে সে তার শিউলিফুলের সামনে গিয়ে দাঁড়াবে? যদি অকল্যাণ হয় তার সইয়ের? যদি অকল্যাণ হয় তার দুধের বাছার?

সবাই বলে, বিধবা মেয়ে অলুক্ষুণে। তারা ঠিকই বলে।

কী বীভৎস একটা পাপ চিন্তায় মাঝে মাঝে আথালি-পাথালি করতে থাকে মাধুরীর মন!

একটা ছেলে! কোল জুড়ে রক্ত মাংসের একটা মাত্র জীবন্ত পুতুল!

সে আর কিছু চায় না। স্বামী নয়, সংসার নয়, ধনদৌলত কিছুই নয়—কেবল একটা সন্তান! একান্ত নিজের এমন একটা সন্তান যে তাকে মা বলে ডাকবে।

চিন্তাটা মনে দেখা দিতেই সঙ্গে সঙ্গে নিজেই সে আবার শিউরে ওঠে। কেঁপে ওঠে সর্বাঙ্গ। ছি ছি ছি! সে না বিধবা? এমন পাপ-কথা কি তাকে ভাবতে আছে?

ভাবতে নেই, তবু মন মানে না। সকাল নেই, দুপুর নেই, রাত্তির নেই, যখন তখন এই পাপ-চিন্তাটা উঁকি দেয় মনে। শিউলিফুলের কোলে একটা ফুটফুটে ছেলে আসার পর থেকে চিন্তাটা তাকে যেন আরো পেয়ে বসেছে। রাতের বেশিরভাগ সময়টাই কেটে যায়—ঘুম আসে না। চেষ্টা করলেও দু'চোখের পাতা কিছুতেই এক হতে চায় না। সবচেয়ে ছোটো বোনটা রাতে তার কাছেই থাকে। এমনিতেই তার কাঁথা পালটানোর জন্যে মাঝে মাঝে উঠতে হয়। তার ওপর নিজের ঘুমটুকুও চলে গেছে!

না, সমাজের ওপর তার কোনো রাগ নেই। তার কপালে যা ছিল, তাই হয়েছে। তার একার জন্যে কি সমাজের নিয়ম পালটে যাবে? অবশ্য, কিছু তো পালটে গেছে। বিদ্যেসাগর মশাইয়ের চেষ্টায় বিধবার বিয়ে চালু হয়েছে। সমাজপতিরা তাঁকে যতই শাপশাপান্ত করুক, অনেক লোকই কিন্তু তাঁর ওপর খুশি হয়েছে। শান্তিপুরের তাঁতীরা বিদ্যেসাগরের নামে ভক্তির ছড়া কেটে শাড়ির পাড়ে নক্শা বুনেছে! লোকের মুখে মুখে ছড়া ঘুরছে—

বেঁচে থাক বিদ্যেসাগর চিরজীবী হয়ে।
সদরে করেচে রিপোর্ট, বিধবার হবে বিয়ে॥

না, মাধুরীর বিয়ের দরকার নেই, সারাজীবনের জন্যে স্বামী নামে একটা পুরুষ মানুষেরও দরকার নেই, তার চাই শুধু একটা সন্তান। সেই সন্তান পাওয়ার জন্যে মাত্র একটা রাতের জন্যেও কোনো পুরুষ তাকে বিয়ে করতে রাজি হয়, তাতেই সে কৃতজ্ঞ থাকবে। গর্ভে একটি সন্তানের ভ্রূণ ধারণ করে নিয়ে হাসিমুখে সে অন্য সব দাবি ত্যাগ করবে।

বিয়েও চাই না তার।

কুমারী কুন্তীকে তো কর্ণের মতো বীরপুত্র দিয়েছিলেন সূর্যদেব! জেলের মেয়ে সত্যবতীকে বেদব্যাসের মতো সন্তান দিয়েছিলেন ঋষি পরাশর। স্বামীহীনা জবালার কোল আলো করে এসেছিল সত্যকাম। স্বামীর অভাবে বেদব্যাসের দয়ায় ধৃতরাষ্ট্র আর পাণ্ডুকে কোলে পেয়েছিলেন অম্বিকা আর অম্বালিকা। স্বামী অভিশপ্ত তাই দেবতাদের দয়ায় যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুনকে পেয়েছিলেন কুন্তী, নকুল আর সহদেবকে পেয়েছিলেন মাদ্রী।

আরো কত কাহিনী ছড়িয়ে আছে কাশীদাসী মহাভারতের পাতায়। কই, সেদিনকার সমাজ তো সে সব মাকে পতিত করেনি? এখনো তো সেই হিন্দু সমাজ। কিন্তু সেই একই সমাজ এত নিষ্ঠুর হয়ে গেল কেন?

রাতের অন্ধকারে দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা নামে মাধুরীর। চোখের জলে বালিশ ভিজিয়ে শেষরাতের দিকে কখন ঘুমিয়ে পড়ে। আবার ভোরবেলা উঠেই তো সংসারের কত কাজ!

কিছুদিন ধরে একটা ব্যাপার নজরে পড়েছে মাধুরীর। যে খুড়িমার সঙ্গে সংসারে কারো বনিবনা নেই, সেই খুড়িমা তার ওপর কেন যেন ততখানি নিষ্ঠুর নন। ঠাকুমা আর মা-র সঙ্গে

তো তার কথা বলা মানেই ঝগড়া। কিন্তু মাধুরীর সঙ্গে বেশ স্বাভাবিক ভাবে কথা বলেন খুড়িমা। তার ওপর খুড়িমার এই কোমলতার কোনো কারণই খুঁজে পায়নি মাধুরী।

মাধুরী ঠিকই লক্ষ্য করেছে। ছোটোবৌ যখন মাধুরীর সঙ্গে কথা বলে তখন কে বলবে, এই মানুষটার চিৎকারে বাড়িতে কাক-চিল বসতে পারে না। কিছুদিন আগে একবার বাপের বাড়ি গিয়েছিল ছোটবৌ। ফিরে আসার পরের দিন বিকেলে সে মাধুরীকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠালে।

মাধুরী যতক্ষণ ছোটোবৌয়ের ঘরে ছিল ততক্ষণ উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিল বড়বৌ। ঠাকুরপো যে ছেলেবেলা থেকেই মাধুরীকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে, তা এ বাড়ির কারো অজানা নেই। কিন্তু তাই বলে ওই দজ্জাল ডাইনি মাগীও তাই করবে, একথা বিশ্বাস করতে হবে? ওর নিশ্চয়ই অন্য কোনো মতলব আছে। অমন কপাল পোড়া সোমত্ত মেয়েটাকে হাত করে এবার হয়তো নিজের পাল্লা ভারী করবার মতলবে আছে। কিম্বা হয়তো তার চেয়েও সব্বনেশে কিছু একটা ব্যাপার ঘটানোর জন্যে মনে মনে ফন্দি আঁটছে। ওই মেয়েকে দিয়ে এ বাড়ির সবায়ের মুখে চুণকালি মাখিয়ে প্রতিশোধ নেবে ডাইনি মাগী। , বড়ো বৌ অবশ্য সবসময়েই নজরে নজরে রাখে মেয়েকে। ভরা বয়সের চাপ এসে গেছে গতরে। মেয়ে এখন সবই বুঝতে শিখেছে। এই সুযোগে কান ভাঙানি দিতে কতক্ষণ? ঠাকুরপো তো এক সময় বলেই ফেলেছিল, তার মেয়ে হলে মাধুর সে আবার বিয়ে দিয়ে দিত! দাদা-বৌঠানের অমতে সে চেষ্টা সে করেনি, করবেও না। কিন্তু ছোটবৌ সব পারে। ওর এক খুড়তুতো ভাই নাকি অলপ্পেয়ে মিন্‌সে বিদ্যেসাগরের সংস্কৃত কলেজে পড়ে। বিদ্যেসাগরের কাছে যাতায়াত আছে। ছোটবৌ যদি মেয়েটাকে ফুসলে কোনো ফিকিরে একবার বিদ্যেসাগরের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারে, তাহলেই তো সব্বোনাশ। কুলে কালি পড়বেই!

ভয়ে, আতঙ্কে, ঘেন্নায় বুক কাঁপে বড়োবৌয়ের—রী রী করে গা। হিন্দু ঘরের মেয়ে যদি দুজন মিন্‌সের কোলে শোয় তাহলে বাজারের রাঁড় মাগীদের সঙ্গে তার তফাৎটা রইল কোথায়? তার চেয়েও বড়ো কথা, পরকালে যে পুন্নাম নরকে পচে মরতে হবে! মেয়েটা কি সে কথা একবারও ভাবে না?

মাধুরী যখন ছোটো বৌয়ের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো, তখন তার হাতে একখানা বই—কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

মেয়েকে দেখেই নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে গেল বড়বৌ। ফিস্‌ফিস্‌ করে জিজ্ঞেস করলে, তোর খুড়ি তোকে কেন ডেকেছিল লা?

হাতের বইখানা দেখিয়ে মাধুরী বললে, খুড়িমা আমার জন্যে এই বইখানা এনেচে।

—কি বই? বিদ্যেসাগরের নেকা নাকি?

—না মা, কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

—কেন, তোর বাপ তো তোকে গীতা, চণ্ডী সবই কিনে দিয়েচে। আবার ঘটা করে একখানা চণ্ডী দেওয়ার আদিখ্যেতা কেন?

—এ চণ্ডী সে চণ্ডী নয় মা।

—চণ্ডী চণ্ডীই। তার আবার এ-চণ্ডী সেচণ্ডী কী লা? আমি মুখ্যু বলে আমাকে বোকা বোঝাতে এয়েচিস?

বিব্রতভাবে মাধুরী বললে, ছি ছি, সে কথা ভাবচো কেন মা? এ চণ্ডী সত্যিই আলাদা। এ হলো কবিকঙ্কণের লেখা চণ্ডীমঙ্গল—কালকেতু-ফুল্লরা আর ধনপতি সওদাগরের গপ্পো কাহিনী।

বড়োবৌ ঝাঁঝালো স্বরেই বললে, কি জানি বাপু, তোদের কালে আবার কত রকমের চণ্ডী বেরিয়েচে! আমরা মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, চণ্ডী বলতে আমরা সেই এক চণ্ডীই জানি। আর জানি মা মঙ্গলচণ্ডীর বেত্তোকথা। সে যাই হোক, খুড়ির সঙ্গে তোর অত মাখামাখি চলবে না মাধু,

তা আমি পষ্ট করেই বলে রাখচি। ডাকলেই অমনি নেড়ি কুকুরের মতো ল্যাজ নাড়তে নাড়তে যাওয়া চাই।

মুখখানা কালো হয়ে গেল মাধুরীর। মৃদুস্বরে সে বললে, খুড়িমা ডেকে পাঠালেও যাবো না?

না!—চাপা গর্জন করে বললে বড়োবৌ, এত অসৈরণ কিসের লা? খুড়িমা—খুড়িমা আর খুড়িমা। যেন খুড়িমাই তোকে পেটে ধরেচিল! আর মা-মাগী সংসারের একটা দাসী বাঁদী, কেমন? ওলো আবাগি, মা হওয়ার কপাল করে তো আর দুনিয়ায় আসিসনি যে, মায়ের মন বুঝবি? এই আমি তোকে পষ্ট করে বলে রাখচি মাধু, ও মাগী তোর সব্বোনাশ করে ছাড়বে। তোর সব্বোনাশ তো করবেই, এ বাড়ির মুখেও চুণকালি না লেপে ও ডানমাগী ছাড়বে না। তারপর পিতিশোধ নেওয়া হয়ে গেলে ডাকিনী যুগিনীর মতো ধেই ধেই করে নাফাবে। তাই বলচি, খুড়ির সঙ্গে অমন ঢলাঢলি তোর চলবে না।

দুমদাম করে পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল বড়োবৌ। সদ্য নতুন কবিকঙ্কণ চণ্ডীর দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো মাধুরী।

সেই রাতেই হারাণের কানে কথাটা তুললে বড়োবৌ।

নির্বিকারভাবে তামাক টানতে টানতে হারাণ বললে, তুমি আবার বড়ো বেশি আগ বাড়িয়ে চিন্তা করো দেখচি। বেচারা মেয়েটাকে হরিশ একটু বেশি ভালোবাসে, তাছাড়া মাধুকে ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসচেন বৌমা। সেই সুবাদে ওর ওপর তাঁর যদি একটু বেশি টান পড়েই থাকে, তাতে দোষের কী হয়েচে?

ভেংচি কেটে ঠোঁট উলটে বড়োবৌ বললে, আহা, কি আমার সুবাদ গো! সুবাদের ঠেলায় নিজের ভাতারকে তো ঘরছাড়া করেচে। তারপরেও এ-কথা আমাকে পেত্যয় যেতে হবে? হরিশ ভালোবাসে বলে হরিশনীর দরদ একেবারে উথলে উঠেচে, কেমন? তোমার ও সব ঢঙের কথা রাখো দিকি! তুমি মাটির মানুষ তাই সংসারে খারাপ কিছুই তোমার নজরে আসে না। মেয়েছেলে শয়তান হলে সে যে কী করতে পারে আর না পারে, তার তুমি কী জানো?

একগাল ধোঁয়া ছেড়ে হারাণ বললে, হুঁ।

উত্তরটা এত বেশি সংক্ষিপ্ত এবং নির্লিপ্ত যে বড়োবৌয়ের উত্তেজনার মাত্রা আরো উঁচুতে উঠলো।—ও, আমার কথাটা গেরাহ্যি হল না? কাঙালের কথা বাসি হলে তখন মিষ্টি নাগবে। না, না, মিষ্টি কেন হতে যাবে? তেতো-বিষতেতো! ওই সব্বোনাশী ডানের ফাঁদে পা দিয়ে মেয়ে যেদিন কুলে কালি দেবে, সেদিন বুঝবে আমি মাগী এত চিন্তে করে মচ্চি কেন!

হারাণ একটু থতোমতো খেয়ে বললে, আমি আর কতটুকু সময় ঘরে থাকি? তুমি ঘরে থাকো, তুমি মেয়েকে সামলাবে।

এতক্ষণে একটু সমর্থন পেয়ে খুশি হয়ে বড়োবৌ বললে, সামলাবো বলেই তো কথাটা তোমাকে জানিয়ে রাখলুম। তোমাকে না জানিয়ে সংসারে কোন্ কাজটা আমি করি বলো দিকিনি?

হারাণ মৃদুস্বরে বললে, হুঁ, তা বটে।

এরপর বেশ কয়েকটা দিন কেটে গেছে।

একদিন রাতে হারাণ বললে, একটা সুখবর আছে বড়োবৌ। হরিশের পদোন্নতি হয়েচে।

—কী হয়েচে।

—পদোন্নতি—মানে প্রমোশন গো! এই সামনের মাস থেকে হরিশ হবে অ্যাসিস্টেন অডিটর জেনারেল, বুঝলে? ওদের আপিসে সবচেয়ে বড়ো সায়েব হল অডিটর জেনারেল, তাঁর ঠিক নিচে ডেপুটি অডিটর জেনারেল আর তার পরেই হরিশ। মাইনে কত শুনবে? মাসে কড়কড়ে চারশো টাকা।

—চা-র-শো!—ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে বড়োবৌ বললে, তাতে ক'কুড়ি হয় গো?

—পাঁচ কুড়িতে হয় একশো। তাহলে তোমার হিসেবে হল গে' বিশ কুড়ি টাকা। কতবার

বলেচি শ'য়ের হিসেবটা একটু শিখে নাও, তা কিছুতেই সে কথা গেরাহ্যি নেই। এখনো সেই কুড়ির হিসেব ছাড়তে পারলে না!

হারাণের বিরক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে কিশোরী মেয়ের ভঙ্গিতে ফিক্ করে একটু হেসে বড়োবৌ বললে, বেশ তো তুমি নয় গুরুমশাই হয়ে আমাকে শট্‌কে শিখিয়ে দিও, কেমন?

- হারাণ বললে, তবেই হয়েচে!

পদোন্নতির কথা হরিশ নিজে অবশ্য কিছু বলেনি। পেট্রিয়ট আপিসে বসে হরিশের বন্ধু গিরীশের মুখেই খবরটা শুনেছে হারাণ। শুনেছে আরো কিছু আড়ালের খবর। কিন্তু সে-সব কথা বড়োবৌকে বলে কোনো লাভ নেই, তাছাড়া অত শত সে বুঝবেও না।

কর্নেল চ্যাম্পনিজ নিজে শাদা চামড়ার মানুষ হয়েও নাকি হরিশকে বেশ শ্রদ্ধা করেন। যখন ডালহৌসি আর হ্যালিডে সাহেব মোটা মাইনের টোপ দিয়ে হরিশকে ইংলিশম্যান পত্রিকায় গেঁথে নিজেদের দলে ভেড়ানোর চেষ্টা করেছিল, হরিশ সে টোপ গেলেনি। নির্লোভ আর নির্ভীক হরিশকে তখন থেকেই আরো ভালোবাসতে শুরু করেছিলেন কর্ণেল চ্যাম্পনিজ আর কর্ণেল গোল্ডী। কেবল তার ব্যক্তিত্বের জন্যেই নয়, কাজে নিষ্ঠাও আর একটা বড়ো কারণ। তাছাড়া হরিশ মুখার্জির মতো এতবড়ো নামজাদা লোক নিজের আপিসে কাজ করে, এই গর্বে কর্ণেল গোল্ডী তো আত্মহারা। হরিশের চাকরিতে আরো একটু উন্নতি করিয়ে দেওয়ার জন্যে এই দুই সাহেবই উৎসুক ছিলেন। এতদিনে সে সুযোগ মিলেছে। অ্যাসিস্ট্যাণ্ট অডিটর জেনারেল অবসর নেওয়াতে সেই পদেই উন্নীত করা হয়েছে হরিশকে। আপিসের রেজিস্ট্রার হলিংবেরি সাহেব কালা আদমিকে দু'চোখে দেখতে পারেন না। যে পদে শাদা আদমি ছাড়া আর কারো বসবার আইন নেই, সেই পদে এনে বসানো হচ্ছে একটা অতি পাজী কালা আদমিকে! যে লোকটা কিনা মহামান্য গবর্ণর জেনারেলকে পর্যন্ত দু'কথা বলতে ছাড়ে না? এই হলিংবেরির সঙ্গে সামান্য একটা বচসার পরেই উদ্ধত নেটিব নিগারটা একবার চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছিল। তখন সেটা মেনে নিলেই সব ঝামেলা চুকে যেতো। তার বদলে তাকে সাধাসাধি করে ধরে রেখে দিল ওই বদমাশ চ্যাম্প্‌নিজটা। সেই লোকটাই তো ওই নেটিব নিগারের মুরুব্বি। চ্যাম্প্‌নিজ যে আগের জন্মে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ কিম্বা ইণ্ডিয়ায় জন্মেছিল, এ সম্বন্ধে হলিংবেরির আর কোনো সন্দেহ নেই। নইলে আপিসে এত শ্বেতাঙ্গ থাকতে ওই নচ্ছার নেটিবটাকে কিনা প্রমোশন দিয়ে বসানো হচ্ছে আপিসের তিন নম্বর অফিসারের চেয়ারে? হরিশের পদোন্নতি বানচাল করবার জন্যে অনেক চেষ্টা করেছিলেন হলিংবেরি, কিন্তু পারেননি।

হরিশকে নিয়ে মনে মনে কত গর্বই না হারাণের! এমন সোদর ভাই পাওয়ার ভাগ্য ক'জনের হয়? কলকাতার হেন নামী-দামী লোক নেই, যিনি অন্তত একবার না একবার হরিশের কাছে এসেছেন। অতবড়ো নামজাদা মানুষ রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্তির, দিগম্বর মিত্তির, জগদানন্দ মুখুজ্যে, রাজেন মিত্তির—সবায়েরই পায়ের ধুলো পড়েছে পেট্রিয়ট আপিসে। পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট কিশোরীচাঁদ তো প্রায়ই আসে। মাঝে মাঝে আসে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট গৌরদাস বসাক। সদর আদালতের শম্ভুনাথ পণ্ডিত তো বাড়ির কাছেই থাকে। মাঝে মাঝে তার সঙ্গে আসে রাজা রামমোহনের ছেলে সদর আদালতের উকিল রমাপ্রসাদ। বিদ্যেসাগর মশাইও দু'চার দিন পায়ের ধুলো দিয়ে গেছেন। ঠাকুরপুকুরের পাদরি লঙ সাহেব তো বেশ কয়েকবারই এসেছেন, কত কি বিষয় নিয়ে হরিশের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছেন।

জোড়াসাঁকোর সাতু সিংঘির ছেলেটা মাঝে মাঝে আসে। রাজপুত্তুর তো রাজপুত্তুরই বটে! যেমন চোখ-জুড়ানো রূপ, তেমনি আদব কায়দা। কালীপ্রসন্ন ছেলেটার কথাবার্তা আর সহবৎ দেখেশুনে বুঝতেই পারা যায় না যে অত বড়ো জমিদার বাড়ির ছেলে, অত বিশাল সম্পত্তির মালিক। হরিশকে সে ছেলেটা যে যথার্থই শ্রদ্ধা করে, তা বুঝতে কোনো অসুবিধে হয় না।

এসেই আগে পায়ের ধুলো নেয় তারপর অন্য কথা। বয়েস আর কত হবে? বড়োজোর ষোল-সতেরো বছর। এরই ভেতর কত কিছু করে রীতিমতো সাড়া জাগিয়ে তুলেছে। হালে কালিদাসের সংস্কৃত বিক্রমোর্বশী নাটক বাঙলা তর্জমা করে থিয়েটার করেছে। হরিশ দেখতে গিয়েছিল, পেট্রিয়টে তার সমালোচনাও করেছিল। সে নাকি ভারী সুন্দর! আবার কখনো ছেলেটার নাটক হলে হারাণ একবার গিয়ে দেখে আসবে। এই বয়সের ওইটুকু ছেলে এতও পারে?

আর একটি ছেলে ইদানীং হরিশের কাছে খুব যাতায়াত আরম্ভ করেছে। ছেলেটার নাম শম্ভুচন্দ্র মুখুজ্যে। সে অবশ্য অত বড়োলোক জমিদার ঘরের সন্তান নয়। তবে মোটামুটি সম্পন্ন ঘরের ছেলে। রাধাবাজারে তার বাপের একটা দোকান আছে। কিন্তু সে ছেলে যে দোকানদারি করবে না, এই ক'দিনের ভেতরেই তা বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছে হারাণ।

শম্ভুচাঁদ ছেলেটার বয়সও নাকি আঠারো বছর। কিন্তু এরই ভেতর মিউটিনির ওপর সে একখানা বই লিখে ফেলেছে। তাতে নাকি কোম্পানির বিরুদ্ধে বেশ কিছু কড়া কথা আছে। পাছে এদেশে ছাপলে বই বাজেয়াপ্ত হয়ে যায় সেইজন্য ছাপতে দেওয়া হয়েছে বিলেতে। এতদিনে হয়তো ছাপা হয়েও গেছে। শিগ্‌গিরিই সে বই এদেশে এসে যাবে।

এই ছোটো শম্ভুকে বড়ো ভালো লাগে হারাণের।

হরিশকে সে যে কী চোখে দেখেছে, তা সেই জানে। গুরুর মতো মান্য করে হরিশকে। হরিশও তাকে একেবারে কাছে টেনে নিয়েছে। হয়তো মতের মিল আছে বলেই এত অল্প সময়ের ভেতর ছেলেটা হরিশের একেবারে আপনজন হয়ে উঠছে। কত সময় কত বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় তাদের ভেতর। হরিশের কথাগুলো যেন হাঁ করে গিলতে থাকে ছেলেটা। হরিশ যেচে তাকে পেট্রিয়টে লিখতে বলেছে। এই ক'মাসের ভেতর তার কয়েকটা লেখা ছাপাও হয়ে গেছে।

কড়া কড়া লেখা। হরিশের খাঁটি চেলা বটে!

হারাণ ইংরিজি জানে না। অন্যেরা যা বলে তাই শুনেই সে বুঝে নিয়েছে। এত জ্ঞানী-গুণী লোকের ভেতর হারাণ বড়ো সংকুচিত হয়েই থাকে। কিন্তু এই ছোটো শম্ভুর হাত থেকে তার রেহাই নেই। হারাণকে সে বড়দা বলে ডাকে। যেদিনই পেট্রিয়ট আপিসে আসে সেদিনই কোনো এক ফাঁকে বড়দার কাছে এসে একটু গল্প-সল্প না করে সে যাবে না। মজার মজার কথাও বেশ বলতে পারে ছোকরা। কিন্তু তাই বলে বয়সের সীমানা আর দাদার প্রাপ্য সম্মানের কথাটাকে কখনো সে ভোলে না।

আজকাল মনের সংগোপনে একটা আক্ষেপ মাঝে মাঝে চঞ্চল করে তোলে হারাণকে। ছেলেবেলায় সত্যিই বড়ো ভুল করেছে সে। ফাঁকি না দিয়ে যা হোক একটু ইংরিজি যদি শিখে নিত তখন!

নিজেই আবার আক্ষেপের বোঝাটাকে ঝেড়ে ফেলে দেয় হারাণ। সে না শিখুক, তার সোদর ভাই তো শিখেছে। শুধু শেখা নয়, গোরাদের পর্যন্ত কাঁপিয়ে ছাড়ছে!

হারাণ নিজের না হয় পাঠশালার গণ্ডীর পর আর এগোয়নি। কিন্তু তার ভাইকে যে দেশের লোকে এক ডাকে চেনে, সেই গর্বই কি কিছু কম?

॥ পাঁচ ॥

—উত্তর দাও! —একটু যেন কর্কশ লাগলো হরিশের কন্ঠস্বর।

কিশোরীচাঁদের মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালে গিরীশ। অর্থাৎ এমনিই তো কড়া ধাত, তার ওপর আবার হঠাৎ এতখানি বেশি কড়া কেন?

কিশোরীচাঁদের মুখে তখনো আধখানা লুচি, তার সঙ্গে আবার একটুকরো মাংস। সুতরাং তার কথা বলবার উপায় নেই। তাড়াতাড়ি লুচি আর মাংস প্রায় গিলে ফেলে নিয়েই সে বললে, মাঝে মাঝে তুমি এমন বেরসিকের মতো আচরণ করো হরিশ! আরে বাবা, উত্তর তো আর পালিয়ে

যাচ্ছে না? তুমিই বলো, গিরীশের বাড়িতে লুচির নেমন্তন্ন মানে একটা ফেস্টিভ্যাল। সেই ফেস্টিভ্যালে সমাগত হয়ে কোন্নগর-কন্যার হাতের তৈরি এই উপাদেয় লুচি-মাংসের মোচ্ছবে বসে 'উত্তর দাও' বলে অমন একখানা কড়া ধমক দেওয়া কি তোমার উচিত কর্তব্য হল?

হরিশ হেসে ফেললে। বললে, দ্যাখো বাপু, আসল কর্তব্যে বামুনের ছেলে কোনো ত্রুটি করেনি। রেকাবির দিকে তাকালে সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে। সে যাই হোক, তুমি তো এযাবৎ কাল খাওয়াতেই ভালোবাসো বলে জেনে এয়েচি, খেতেও যে তোমার ব্রাহ্মণোচিত আগ্রহ, সে খবর তো জানা ছিল না?

কিশোরীচাঁদ বললে, সঙ্গদোষে কত কিছুই তো হয় হে!

গিরীশ বললে, তোমার রেকাবি তো একেবারে ধোয়া পোছা রেকাবির মতোই দেখাচ্ছে হরিশ! আর কয়েকখানা আনতে বলি?

—না হে, আবার আর একদিন হবে। আজ এর পর আর গাদন ভরলে আমার কারণবারি সেবনের জায়গা থাকবে না।

গিরীশের বলে পাঠানোর আগেই নতুন করে আবার লুচি মাংস এসে গেল। রেখেই চলে গেল বামুন ঠাকুর। হরিশ কিছু বলবারই অবসর পেলে না। কৈলাসকামিনী যথানিয়মে দাঁড়িয়েই ছিল জানালার খড়খড়ির আড়ালে। হরিশের রেকাবি ফুরিয়ে আসতে আসতে সে নতুন করে আবার খাবার সাজিয়ে ফেলেছে।

দিব্যি খোশমেজাজেই মজলিশ আরম্ভ হয়েছিল।

কৈলাসকামিনীর হাতের রান্না অপূর্ব! একই ময়দা, একই ঘি—অথচ তার হাতের গুণে লুচির স্বাদই যেন পালটে যায়। তার ওপর মোগলাই ধাঁচে মাংস রান্নার বেশ কয়েক রকম কায়দা-কানুনও তার রপ্ত। সেই কত বছর আগে একদিন ডফ্ সাহেবের বক্তৃতা শুনতে যাওয়ার পথে হরিশকে বাড়িতে এনে সেই যে জলযোগ করিয়েছিল, সেইদিনই হরিশ বলেছিল, বৌমার হাতের রান্নার তুলনা হয় না গিরীশ।

তারপর থেকেই মাঝে মাঝে লুচি-মাংসের নিমন্ত্রণ পেয়ে আসছে হরিশ। পেট্রিয়ট যখন পুরোদমে চলতে শুরু করেছে, তখন একদিন হাসতে হাসতে হরিশ বললে, তাই তো ভাবি গিরীশ, তোমার লেখায় মাঝে মাঝে হঠাৎ এমন তেজ আসে কেন! অমন বিরিয়ানি, কোপ্তা, কাবাব পেটে পড়লে কলমের ডগায় তেজ না এসে পারে?

কথাটা সাধারণ নিয়মেই কৈলাসকামিনীর কানে পেঁছেছে। স্বামীর মুখে হরিশের সরস মন্তব্য শুনে তার মুখে খুশি আর ধরে না। চোখ পাকিয়ে মুখ টিপে হেসে বললে, ভারী তো বড়াই করো, কত ভালো লেখো। আসলে ভালো লেখা কেন বেরোয়, এবারে তা বুঝতে পারলে তো?

গিরীশ হেসে বলেছিল, এ আর নতুন কথা কী? আমাদের তন্ত্রশাস্ত্রে বলেচে প্রকৃতি হল হ্লাদিনী শক্তি। স্বয়ং দেবাদিদেব মহেশ্বরও যখন অন্নপূর্ণার কাছে কেঁচো, সেখানে সিমলের তুচ্ছ এক গিরীশ ঘোষের কথা তো ওঠেই না।

তারপর থেকেই মাঝে মাঝে ছুটিছাটার দিনে গিরীশের বাড়িতে নেমন্তন্ন একটা স্থায়ী বরাদ্দ হয়ে গেছে হরিশের। লুচি হরিশের বড়ো প্রিয়। লুচি আর মাংসের কোনো না কোনো একটা রান্না তো থাকবেই, তার সঙ্গে প্রত্যেকবারই আরো দু'এক রকম নতুন নতুন খাবার তৈরি করে খাওয়ায় কৈলাসকামিনী। অতোবড়ো নামজাদা মানুষকে নিজের হাতে পরিবেশন করে খাওয়াতে পারলে আরো কত তৃপ্ত হত। কিন্তু একে লোকাচারের বাধা, তার ওপর হরিশবাবু তাকে ভাদ্রবৌয়ের মতো দেখেন। ভাসুর স্থানীয়ের সামনে যাওয়া যায় না বলেই বামুনঠাকুরের হাতে খাবার পাঠিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে একটা জানালার খড়খড়ি সামান্য তুলে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে, হরিশবাবু সত্যিই তৃপ্ত করে খাচ্ছেন কিনা।

একটা ব্যাপারে প্রথম দিকে ভারী আশ্চর্য লাগতো গিরীশের। সদাব্যস্ত হরিশ তার হাজারো

কাজের ফাঁকে এই নেমন্তনের দিনটাকে কখনো ভোলেনি। কিছুদিন পরে অবশ্য গিরীশের সে বিস্ময় কেটেছে। ক্ষুরধার লেখনীর অধিকারী যে মানুষটি তার লেখনীর লক্ষ্যভেদী আঘাতে প্রবল পরাক্রান্ত গবর্ণর জেনারেলকে পর্যন্ত বিপর্যস্ত করে দেবার ক্ষমতা রাখে, একটা জায়গায় সে বড়ো দুর্বল। তার ভেতরে রয়েছে স্নেহকাঙাল একটা অতৃপ্ত হৃদয়। একটু মায়া-মমতার স্পর্শ পেলে সে যেন অভিভূত হয়ে পড়ে। সেই স্পর্শটুকুর আকর্ষণেই সে ছুটে আসে। খাবারটা হয়তো উপলক্ষ্য মাত্র। হরিশের পারিবারিক জীবনের কাহিনী জানবার পর থেকে গিরীশ প্রতিমাসে অন্তত দুটো দিন এরকম আয়োজন করে।

আজও সেই রকম একটা লুচিমাংসের দিন।

পার্থক্যের ভেতর, আজকের সন্ধ্যায় অতিরিক্ত অতিথি কিশোরীচাঁদ। তার পেছনেও একটা উদ্দেশ্য আছে। শুধু ধনীরা নয়, সাধারণ গেরস্ত বাঙালীও যাতে মাঝে মাঝে নাটকের অভিনয় দেখার সুযোগ পেতে পারে, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে একটা সাধারণ রঙ্গালয় করা সম্ভব কিনা, তাই নিয়ে একটু আলোচনা করতে চায় গিরীশ। অবশ্য, পরিকল্পনাটা হরিশের মনেই প্রথমে এসেছে। সেটা বেশ ভালো লেগেছে গিরীশের।

নভেম্বর মাসে জোড়াসাঁকোর বিদ্যোৎসাহিনী সভার উদ্যোগে বিক্রমোর্বশী নাটক হয়েছিল। সেদিন দেখা গেল সাতু সিংঘির ছেলেটা রীতিমতো সাফল্যের সঙ্গেই আর একধাপ এগিয়েছে। বিদ্যোৎসাহিনী সভার প্রথমবারের নাটক বাঙলায় অনুবাদ করেছিলেন নাটুকে রামনারায়ণ। এবারে কালীপ্রসন্ন নিজে কলম হাতে নিয়েছে। মহাকবি কালিদাসের রচনাকে ঠিকমতো রূপ দেওয়া বড়ো সোজা কথা নয়। কিন্তু রীতিমতো মুন্সিয়ানার সঙ্গে ছেলেটা সে কাজ করতে পেরেছে। নাটক লিখেছে এবং নিজেই পুরূরবার ভূমিকায় অভিনয় করেছে। দুদিক থেকেই সে মুগ্ধ করেছে সবাইকে। সেই অভিনয় অনুষ্ঠানের সমালোচনা হরিশ নিজেই লিখেছিল। পেট্রিয়টের পৃষ্ঠায় সেই উচ্ছ্বসিত সমালোচনার উপসংহারে সাধারণ মানুষের জন্যে একটা জাতীয় নাট্যশালার প্রয়োজনের কথা সে আলোচনা করেছে। বড়ো বড়ো জমিদার আর রাজা-মহারাজাদের বাড়ির নিজস্ব শখের রঙ্গালয় তাদেরই অতিথি-অভ্যাগতের জন্যে। কিছু ইংরিজিনবীশ নেটিব জেন্টু, কিছু ধনী ব্যক্তি আর কিছু পদস্থ শ্বেতাঙ্গ—এই নিয়েই তো সে সব থিয়েটারের দর্শক সমাজ। সাধারণ মানুষের স্থান সেখানে কোথায়? সেইজন্যেই দরকার একটা জাতীয় রঙ্গালয়ের—যেখানে সাধারণ মানুষ নাটক দেখার সুযোগ পেতে পারে।

হরিশের এই প্রস্তাবটি গিরীশের মনকে বেশ নাড়া দিয়েছিল। কিন্তু পাঁচ কাজের চাপ আর মিউটিনির ডামাডোলে বিষয়টা নিয়ে ধীরে সুস্থে বসে আলোচনা করবার অবকাশ হয়নি। এইরকম একটা বৈঠকী মজলিশেই প্রসঙ্গটা তুলবে বলে কিশোরীচাঁদকেও আজ ডেকেছে গিরীশ। সভাসমিতি গড়ার কাজে কিশোরীচাঁদ রীতিমতো দক্ষ। তার মনে কথাটা একবার ধরে গেলে সামনের সপ্তাহেই হয়তো এক নম্বর দমদম রোডের বাড়িতে নাট্যোন্নতি বিধায়িনী সমিতি স্থাপনের জন্যে একটা বৈঠকের আয়োজন হবে। এরকম একটা প্রচেষ্টা যে হিন্দু সমাজ সংস্কারের ব্যাপারে অনেকখানি সাহায্য করতে পারে—এই কথাটা তার মাথায় একবার ঢুকিয়ে দিতে পারলেই হল।

কিন্তু তার আগেই ঘটলো বিপত্তি।

কথায় কথায় উঠেছিল গুপ্তকবির প্রসঙ্গ। সেই সূত্র ধরেই আলোচনার বিষয়বস্তু গেল পালটে। নাট্যশালার পথ ছেড়ে আলোচনা মোড় নিল মিউটিনির দিকে।

বিদ্রোহ আরম্ভ হওয়ার পর থেকে সেপাইদের উদ্দেশ্যে অনেক গালিগালাজ করেছেন গুপ্তকবি। শুধু তাই করেই তিনি ক্ষান্ত হননি। নানা সাহেব, তাঁতিয়া তোপি—কেউ তাঁর ব্যঙ্গ থেকে রেহাই পায়নি। এমন কি, ঝাঁসীর অষ্টাদশী বিধবা রাণী লক্ষ্মীবাঈকেও বেশ একহাত নিয়েছেন তিনি। লক্ষ্মীবাঈ তো প্রথম দিকে ব্রিটিশকে সাহায্যই করেছিলেন।

কী কারণে পরে তিনিও বিদ্রোহে যোগ দিলেন, সেটা এখনো স্পষ্ট নয়। হয়তো হাজার সাহায্য করেও দত্তকপুত্র দামোদর রাওকে ঝাঁসির রাজা ব'লে কোম্পানির ব্রিটিশের থাবা থেকে ঝাঁসীকে শেষ পর্যন্ত রক্ষা করা যাবে না বুঝতে পেরেই তিনি হাত মিলিয়েছেন বিদ্রোহীদের সঙ্গে।

নানাসাহেব আর লক্ষ্মীবাঈকে নিয়ে প্রভাকরের পৃষ্ঠায় অনেক ছড়া কেটেছেন গুপ্ত কবি। শুধু ছড়া কাটলেও বা কথা ছিল। কিন্তু রুচির কোনো ধারই ধারেননি তিনি। নানাসাহেব আর বিধবা রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের মধ্যে অবৈধ সংসর্গ পর্যন্ত কল্পনা করতেও তাঁর বাধেনি। একটা ছড়ায় লিখেছেন—

পিঁপীড়া ধরেছে ডানা মরিবার তরে।
হ্যাদে কি শুনি বাণী?
হ্যাদে কি শুনি বাণী ঝান্সীর রাণী
ঠোঁটকাটা কাকী।।
মেয়ে হ'য়ে সেনা নিয়ে সাজিয়াছে নাকি?
নানা তার ঘরের ঢেঁকি
নানা তার ঘরের ঢেঁকি মাগী খেঁকী
শেয়ালের দলে।
এতদিনে ধনে জনে যাবে রসাতলে।

এইখানেই হরিশের প্রবল আপত্তি।

গিরীশও অবশ্য গুপ্ত কবির রুচি বিগর্হিত অশালীন রচনাকে সমর্থন করেনি। কিন্তু নানাসাহেবের অমানুষিক নিষ্ঠুরতায় সে প্রচণ্ডভাবে ক্ষুব্ধ। তাই সে বললে, দ্যাখো, গুপ্ত কবির কবিত্ব শক্তি যথেষ্ট থাকলেও তাঁর সংকীর্ণ রুচি সম্বন্ধে তুমিও জানো, আমিও জানি। গুপ্ত কবিকে আমি আদপেই সমর্থন করচি নে। কিন্তু কানপুর হাতছাড়া হওয়ার আগে সে লোকটা যে অমানুষিক নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়েচে, তা ভাবলে তাকে ঘেন্না করা ছাড়া আর তো কোনো উপায় থাকে না, হরিশ!

হরিশ বললে, সে বিবরণ পড়ে আমিও শিউড়ে উঠেচি। কিন্তু রাণী লক্ষ্মীবাঈ শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশের বিপক্ষে গেচেন বলে সেই রাগে আমরা রাজভক্ত বাঙালীরা তাঁর মতো এক বিধবা যুবতীর চরিত্রে এতবড়ো একটা মিথ্যে কুৎসা রটনা করে ব্রিটিশের মন জোগাতে এতখানি নীচে নেমে যাবো, এটা আমি অন্তত বরদাস্ত করতে পারচিনে।

কিশোরীচাঁদ বললে, এ ব্যাপারে আমিও তোমার সঙ্গে একমত। যদিও মিউটিনিকে আমি গোড়া থেকেই অশিক্ষিত, গোঁয়ার সেপাইগুলোর চরম নির্বুদ্ধিতা বলেই সিদ্ধান্ত করেচি এবং সে সিদ্ধান্তে আমি এখনো অবিচল, তা সত্ত্বেও গুপ্তকবির এই কুরুচি আমাকেও বিশেষ পীড়া দিয়েচে। রসালো কবিতা লেখায় ভদ্রলোকের যতই হাত থাকুক, রুচি খুবই নিম্নমানের। বিধবা বিবাহ আন্দোলনের বিরুদ্ধে কিরকম উঠে পড়ে লেগেচিলেন, মনে আছে?

গিরীশ বললে, যাদৃশীর্ভাবনা যস্য। কী আর করা যাবে, বলো? সে যাই হোক, হরিশ কিন্ত মিউটিনিকে ইদানীং আর মিউটিনি বলচে না—বলে, গ্রেট ইণ্ডিয়ান রিভোল্ট! একটু সাবধানে কথা বলো হে কিশোরী। নইলে মিউটিনি না রিভোল্ট, তাই নিয়ে ন্যায়শাস্ত্রের কচ্‌কচিতে পড়ে যাবে, তা বলে রাখচি।

হরিশ মৃদু হেসে ফর্‌সীর নল থেকে একটু ধোঁয়া ছাড়লে।

কিশোরীচাঁদ বললে, কানপুরে যা ঘটেচে, তার পরেও এই অমানুষিক খুন-খারাপিকে আর কি তুমি গ্রেট রিভোল্ট বলে অহেতুক গৌরব দিতে পারো হরিশ?

কয়েকমুহূর্ত চুপ করে রইলো হরিশ। তারপর গম্ভীর স্বরে বললে, কানপুরের ঘটনা যদি

সত্যি হয় তাহলে আমাদের ভারতীয়দের জাতীয় চরিত্রে একটা বিরাট কলঙ্কের ছাপ পড়েচে, একথা আমি স্বীকার করি।

—যদি সত্যি হয়! তার মানে? তুমি কি বিশ্বাস করো না, নানাসাহেব এটা করেচে?

—আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাস দিয়ে কিছুই এসে যায় না কিশোরী। যে বিবরণ আমরা পেয়েচি, তার সত্যাসত্য যাচাই করা দরকার। গত হপ্তার জাহাজের ডাকে টাইমস্ পত্রিকা নিশ্চয়ই পেয়েচো?

—হ্যাঁ, পেঁয়েচি। কিন্তু কয়েকটা মামলার নথিপত্তর নিয়ে, এ কদিন এত ব্যস্ত ছিলুম বলে কাগজ উলটে দেখা হয়নি। কেন, কী খবর আছে?

—খবর নয়, একখানা চিঠির কথা বলচি। জুডেক্স্ ছদ্মনামে এক ভদ্রলোক বিদ্রোহ আরম্ভের সময় থেকে উত্তর ভারতে ছিলেন। আগ্রা, এলাহাবাদ, কানপুর, মীরাট, দিল্লী, আম্বালা—বিদ্রোহের সব ক'টা বড়ো বড়ো ঘাঁটিতে তিনি গেছেন এবং নিজের চোখেই সব দেখেচেন।

—কী লিখেচেন তিনি?—সাগ্রহে প্রশ্ন করলে কিশোরীচাঁদ।

মুচকি হেসে হরিশ বললে, তোমরা যারা অশিক্ষিত, বর্বর সেপাইদের এই বিদ্রোহকে মহাপাতক বলে রায় দিয়ে বসে আছো, জুডেক্স্ সাহেব তাদের বড়ো হতাশ করেচেন। তিনি তাঁর চিঠিতে লিখেচেন, বিভিন্ন জায়গায় শ্বেতাঙ্গদের ওপর নেটিব সেপাইদের বর্বর, অমানুষিক অত্যাচারের যে সব খবর শ্বেতাঙ্গ মহল থেকে রটানো হয়েচে, তার বেশির ভাগই হয় অতিরঞ্জিত অথবা ভিত্তিহীন।

—কী বলচো? সবিস্ময়ে বললে কিশোরীচাঁদ।

ইয়োর অনার, লণ্ডন টাইম্সের পৃষ্ঠায় যা ছাপা হয়েচে, তাই বলচি। জুডেক্স্ সাহেব তাঁর চিঠিতে রীতিমতো জোর দিয়েই বলেচেন যে, বিদ্রোহের সমস্ত ঘাঁটিগুলোই তিনি ঘুরেচেন। সম্পূর্ণ মুক্ত, স্বাধীন, নিরপেক্ষ মন নিয়ে নিজে তদন্ত করে তিনি বুঝতে পেরেচেন, সেপাইদের নৃশংস অত্যাচার সম্বন্ধে বাজার-চলতি অধিকাংশ কাহিনীই অতিরঞ্জিত। সেইজন্যেই বলচিলুম, কানপুরের ঘটনা যদি সত্যি হয়—বুঝেচ?

কানপুরের ঘটনা যদি সত্যি হয় তাহলে নিঃসন্দেহে তা বীভৎস।

বিদ্রোহ আরম্ভ হওয়ার পর প্রথম কয়েকমাস উত্তর ভারতে ব্রিটিশ সরকারের অস্তিত্ব প্রায় ছিলই না। কিন্তু তারপর হাওয়ার গতি দ্রুত পালটে গেল। বিভিন্ন দিক থেকে গোরা পল্টন এসে ব্রিটিশ বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করতে লাগলো। নেটিব সেপাইদের ভেতর গুর্খা আর শিখেরা তো প্রথম থেকেই অনুগত ছিল। বিদ্রোহী সেপাইদের বিরুদ্ধে তারা প্রাণপণে লড়াই করে চলেছে। বিদ্রোহ দমনে তাদের আনুগত্য ব্রিটিশের কাছে অনেকখানি। তাছাড়াও অঢেল রসদ আর টাকা জোগানের জন্যে অকৃপণ হত বাড়িয়ে দিয়েছেন নিজাম, সিন্ধিয়া ছাড়াও বহু দেশীয় সামন্তরাজা। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ধনী পার্শী সম্প্রদায়। আর তার ওপর সবচেয়ে বড়ো সুবিধে—যোগাযোগের জন্যে রয়েছে রেলওয়ে আর টেলিগ্রাফ। হাতে রয়েছে পৃথিবীর সেরা আগ্নেয়াস্ত্র—এনফিল্ড রাইফেল।

আর বিদ্রোহীদের অবস্থা?

হাতিয়ারের সংখ্যা দ্রুত কমে আসছে, কমে আসছে গোলাগুলি। বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্ত দলগুলোর ভেতর যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন। সুযোগ্য সেনাপতির অভাবে পরবর্তী যুদ্ধকৌশল নির্ধারণে তারা ব্যর্থ। তার ওপর ফিরিঙ্গি সরকারের নিযুক্ত অসংখ্য গুপ্তচরে ছেয়ে গেছে তাদের সমস্ত ঘাঁটি। বেইমানি করেছে মোগল বাদশার উজীর-এ-আজম হাকিম আশানুল্লা, এমন কি, যে মোগল শাহজাদাকে তারা প্রধান সেনাপতির মর্যাদা দিয়েছিল, সেই মির্জা মোগল পর্যন্ত বেইমানি করেছে।

একদিকে সংগঠিত ব্রিটিশবাহিনী, অন্যদিকে বিক্ষিপ্ত, হতাশাগ্রস্ত বিদ্রোহীদল। একদিকে দৃষ্টি যখন ক্রমেই জয়ের লক্ষ্যে নিবদ্ধ হচ্ছে, অন্যদিকে তখন দেখা দিতে শুরু করেছে আত্মরক্ষার দিশেহারা তাগিদ।

যে নানাসাহেব কানপুরে বিদ্রোহী স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তিনিও তখন বিচলিত। সঙ্গী সেনাপতি তাঁতিয়া তোপীকে নিয়ে কিছুদিন আগে তিনি দুর্ধর্ষ ইংরেজ সেনাপতি উইণ্ডহামকে পরাজিত করেছিলেন। ডিসেম্বরের গোড়ায় সেই নানাসাহেবেরই শোচনীয় পরাজয় ঘটলো ইংরেজ সেনাপতি কলিন ক্যাম্পবেলের হাতে। নানাসাহেব পলাতক।-

বিপদ-সঙ্কেত সুস্পষ্ট!

তাঁতিয়া তোপীও ক্যাম্পবেলের কাছে ধরা দেননি। পালিয়ে গিয়ে তিনি যোগ দিয়েছেন বিদ্রোহিনী রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের সঙ্গে। সেনাপতি হিউ রোজ অনুসরণ করেছেন তাঁকে। সেনাপতি হ্যাভলক তাঁর বিরাট বাহিনী নিয়ে এগিয়ে চলেছেন কানপুরের দিকে। হয়তো পালিয়ে যাওয়ার আগে একটা পৈশাচিক প্রতিহিংসা নিয়েই পরাজয়ের গ্লানিকে ভুলতে চেয়েছিলেন নানাসাহেব।

তাঁরই আদেশে নাকি কানপুরের সমস্ত ইংরেজকে একটা বাড়িতে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল সেপাইরা। তাদের অভয় দিয়ে একদিন বের করে আনা হল। অন্য কোনো নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠানোর আশ্বাস দিয়ে তাদের সবাইকে তোলা হল নৌকোয়। তারপর ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি।

কানপুরের পতন আসন্ন বুঝতে পেরে ইংরেজদের ওপর মরণ-কামড় দিলেন নানাসাহেব। নারী আর শিশুরাও রেহাই পায় নি। একজনকেও তিনি নাকি জীবিত রাখেননি। নিহত প্রত্যেকটি শ্বেতাঙ্গের প্রাণহীন দেহগুলো ফেলে দেওয়া হয়েছিল একটা কুঁয়োর ভেতর। শুধু তাই নয়, আরো নারী-শিশুর প্রাণ নিয়েছেন তিনি। ইংরেজদের একটা দল নৌকোয় করে পালিয়ে যাচ্ছিল ফতেগড় থেকে। তাদের দলে বেশির ভাগই নারী আর শিশু। তাদের সবাইকে নৌকো থেকে নামিয়ে গুলি করে মেরে ফেলা হয়!

কয়েক মুহূর্তের জন্যে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল হরিশ।

কিশোরীচাঁদ হেসে বললে, কী হল হে, আর কথা বলচো না যে?

মুখ ফিরিয়ে মৃদুস্বরে হরিশ বললে, কানপুরের কথাই ভাবচিলুম কিশোরী। হ্যাঁ, যে বিবরণ কাগজে বেরিয়েচে তা যদি সত্যি হয় তাহলে নানাসাহেব অবশ্যই ক্ষমার অযোগ্য। কিন্তু আগ্রা, কানপুর, মীরাট, বেরিলি কিম্বা লখ্‌নৌতে আবার ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার পর ক্যাম্পবেল, হ্যাভলক, হুইলার আর নীলের মতো ব্রিটিশ সেনাপতিরা নিরীহ সাধারণ মানুষের ওপর পর্যন্ত যে অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েচে, সেটাও কি ক্ষমার যোগ্য? এই তো কাছেই মেদিনীপুর। সেখানে সেপাইরা বিদ্রোহও করে নি। কিন্তু সন্দেহের বশে কর্নেল ফস্টার মেদিনীপুর ক্যান্টনমেন্টে যে নৃশংসতার নমুনা দেখিয়েচে তাতে বনের হিংস্র পশুরাও হয়তো লজ্জা পাবে। তাই ভাবছিলুম, একা নানাসাহেবকেই দোষী সাব্যস্ত করে লাভ কী?

—নিশ্চয়ই নয়! —কিশোরীচাঁদ বললে, বৃটিশ সেনাপতিরাও সমানভাবেই অপরাধী। তুমি তো জানো হরিশ, যেটা যথার্থ অন্যায়, তাকে অন্যায় বলে প্রকাশ্য ধিক্কার দিতে আমার কুণ্ঠা নেই? নিজের বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে যে কাজকে আমি ন্যায়সঙ্গত বলে অনুভব করি, তাকে আমি অকুণ্ঠভাবেই সমর্থন জানিয়ে থাকি।

—তা আমি জানি। তোমার সেই সততাটুকু সম্বন্ধে আমার পরিপূর্ণ বিশ্বাস আছে বলেই হয়তো মৌলিক মতবিরোধ সত্ত্বেও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের অত সব হোমরা চোমরা মেম্বরদের ভেতর থেকে তোমাকেই টেনে নিয়ে হরিশ মুখুজ্যের কুসঙ্গে ফেলেচি!

কিশোরীচাঁদ হেসে বললে, আমিও দেখলুম, চরিত্তির যখন নষ্টই হ'ল তখন আর সঙ্গ পরিত্যাগ করে লাভ কি? এখন বরঞ্চ বাকি জীবন ধরে চেষ্টা করে দেখা যাক, তোমার মগজ থেকে ওই রাজনীতির পোকাটাকে বের করে দিতে পারি কিনা!

হরিশও হেসে বললে, বৃথা চেষ্টা ইয়োর অনার। ওটা হ'ল বাস্তু পোকা। বের করলেও

যাবে ভেবেচো? ঘুরে-ফিরে ঠিক এসে আবার হরিশ মুখুজ্যের মগজের এই বাস্তুভিটের বাসা বাঁধবে।

সেটা তো হাড়ে হাড়ে টের পাচ্চি বাবা! তোমার কথা যখনই চিন্তা করি, তখনই আমার কী মনে হয় জানো? তোমার এত জোরদার কলমটা নিয়ে তুমি যদি পুরোপুরিভাবে আমাদের পাশে এসে দাঁড়াতে, তাহলে সমাজ-সংস্কারের কাজে এরই ভেতর আমরা অনেক বেশি এগিয়ে যেতে পারতুম! আমি আগেও বলেচি, এখনো বলচি, গোঁয়ার্তুমি করে তুমি ভুল পথে চলেচো!

হাল্‌কা হাসিতে মুখ ভরে উঠলো হরিশের। বললে, বুদ্ধি বটে মিত্তির কায়েতের! এই বুদ্ধি নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটগিরি করো? ওহে বাপু, আমি যদি সমাজ-সংস্কারে নামতুম তাহলে তোমাদের সংস্কার শিকেয় উঠতো, বুঝেচ? আরে, আমারই চরিত্তির কে সংস্কার করে তার ঠিক নেই, আমি করতে যাবো সমাজ-সংস্কার?

—এটা তো তোমার পাশ কাটিয়ে যাওয়ার অজুহাত!

—ওই তো তোমার দোষ, কিশোরী! তুমি কেমন ম্যাজিস্ট্রেট হে? সাক্ষীর কথা পছন্দসই না হলেই ধরে নেবে, সাক্ষী মিছে কথা বলচে? তরফ কলকাতার লোকে জানে, হরিশ মুখুজ্যে মদ খেয়ে খানায় পড়ে থাকে, অস্থানে-কুস্থানে যায়। তারপরেও সে লোকটা এগিয়ে গিয়ে 'সমাজ গেল, সমাজ গেল, বলে দাপাদাপি করলে তোমাদের শোভাবাজারের দল এসে লাঠি-সড়কি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে না?'

—ও সব বাজে কথা রাখো দিকি! কথা যখন উঠেইচে তখন তোমাব মুখ থেকে আমি সোজাসুজি জানতে চাই, মিউটিনিকে তুমি গ্রেট ইণ্ডিয়ান রিভোল্ট বলে এতখানি গুরুত্ব দিতে শুরু করেচো কেন?

মুচকি হেসে হরিশ বললে, কি জানি, হয়তো মদের ঘোরে দিয়ে ফেলেচি।

কিশোরীচাঁদ এবার অসহিষ্ণু স্বরে বললে, দ্যাখো বাপু, মদের ঘোরে লেখার পাত্তর তুমি নও! মদ খেয়ে তোমার অন্তত ঘোর লাগে না। বরঞ্চ মদের প্রাণ থাকলে তোমাকে খেলেই তার ঘোর লাগতে পারতো।

হাঃ হাঃ করে হেসে হরিশ বললে, থ্যাঙ্ক য়ু ফর দ্য কম্‌প্লিমেন্ট, ইয়োর অনার!

কিশোরীচাঁদ বললে, হেসে এড়িয়ে গেলে চলবে না হরিশ। আমি উত্তর চাই। গিরীশ, পেট্রিয়টের ফাইল নিয়ে এসো তো!

হরিশ তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে খপ্‌ করে গিরীশের হাত ধরে বললে, না, না, দলিল-দস্তাবেজ আনতে হবে না। হুজুরের কাছে আমি কসুর কবুল করচি।

—কেন বারবার মশ্‌করা করচো? তোমার যুক্তিটা জানাতে আপত্তি আছে?

এবারে হরিশ গম্ভীর হ'ল। বললে, তোমার সঙ্গে এখন তর্কে প্রবৃত্ত হওয়ার ইচ্ছে ছিল না কিশোরী। নেহাৎ তুমি যখন ছাড়বেই না, তখন বলচি, আমি সজ্ঞানে এবং নিশ্চিত বিশ্বাসেই এই বিদ্রোহকে তার প্রাপ্য গৌরব দিয়েচি। তোমার কি মনে আছে, বিদ্রোহ যখন সবে আরম্ভ হয়েচে, সেই সময় তোমারই বাড়ির উদ্যানে দীঘির পাড়ে বসে এক রাতে বিদ্রোহ সম্বন্ধে, আমাদের অনেক তর্ক বিতর্ক হয়েচিল? মধুও সেদিন উপস্থিত ছিল। মনে পড়চে?

—হ্যাঁ, মনে পড়চে বটে! তবে আমরা কে কী বলেচিলুম তা ঠিক স্মরণ করতে পারচি নে।

—আমাদের দুজনের কাছেই বিদ্রোহের চেহারাটা তখন ছিল ঝাপ্‌সা তা সত্ত্বেও তুমি সেদিন যে কথাগুলো বলেচিলে, সেই কথাগুলোই আরো অনেক বেশি জোরের সঙ্গে তুমি তোমার 'দ্য মিউটিনি দ্য গভর্নমেন্ট অ্যান্ড দ্য পীপ্‌ল্‌' বইখানিতে বলেচো। আর আমি যা বলেচিলুম, তা এই একবছরে হিন্দু পেট্রিয়টে লেখা বিভিন্ন নিবন্ধে আমি বলেচি। বরঞ্চ বলা যেতে পারে, এই সময়ের ভেতর আমার সে বিশ্বাসের ভিত্তি আরো যে পরিমাণে শক্ত হয়েচে সে অনুপাতে লিখতে পারিনি।

একটু থামলে হরিশ। কিশোরীচাঁদ কিছু বলবার আগেই সে বললে, এ বিদ্রোহ শুধুমাত্র

সেপাইদের বিদ্রোহের ভেতরেই সীমাবদ্ধ থাকেনি কিশোরী, সারা দেশের মানুষের বিদ্রোহী মনোভাবের প্রতিফলন এর ভেতরে ফুটে উঠেচে। তাই আমি একে মিউটিনি না বলে গ্রেট ইণ্ডিয়ান রিভোল্ট বলা-ই সঙ্গত মনে করেচি।

কিশোরীচাঁদ ঈষৎ উত্তেজিত ভাবেই বললে, কিন্তু আমি এখনো মনে করি, এটা নিছকই সেপাইদের অসন্তোষ জনিত বিদ্রোহ মাত্র—জনসাধারণের সঙ্গে এর বিন্দুমাত্র যোগ নেই। তবে হ্যাঁ, ব্রিটিশের ওপর অসন্তুষ্ট সামন্তরাজারা এদের সঙ্গে যোগ দিয়ে আগুনটাকে আরো বেশি উস্‌কে দিয়েচে। সুতরাং কতগুলো অশিক্ষিত, ধর্মান্ধ, গোঁয়ার সেপাইদের অপরাধের সঙ্গে সাধারণ মানুষকেও জড়িয়ে ফেলা বাস্তব ঘটনা নয়।

—তোমার এ কথাগুলো সবই তোমার লেখা বইখানিতে পড়েচি।

—পঁচিশে ফেব্রুয়ারি তারিখের পেট্রিয়টে তার দীর্ঘ সমালোচনাও বেরিয়েচে। সেখানে বলা হয়েচে, মিউটিনি সংক্রান্ত বিভিন্ন গ্রন্থের ভেতর এটি যে অতি চিন্তাশীল এবং যুক্তিপূর্ণ রচনা, তাতে সন্দেহ নেই।—বল হয়নি এ কথা?

—হ্যাঁ, হয়েচে।

—তাহলে আমার মতের সঙ্গে যখন এতখানি পার্থক্য, তখন আমার বইয়ের এত প্রশংসা তুমি করলে কেন? কেন তোমার যুক্তি দিয়ে আমার যুক্তিকে তুমি খণ্ডন করো নি? শুধু বন্ধুত্বের মর্যাদা দেওয়ার জন্যেই যদি তুমি তা করে থাকো, তাহলে আমি বলবো, তোমার মতো স্পষ্টবাদী ব্যক্তির পক্ষে এ কাজ ন্যায়সঙ্গত হয়নি। এ ক্ষেত্রে তাহলে তুমি তোমার বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করেচো!

হরিশ কোনো উত্তর দেওয়ার আগে গিরীশ বললে, রিভ্যুটা হরিশ করেনি কিশোরী, ওটা লিখেচি আমি।

হরিশ সঙ্গে সঙ্গে বললে, তা হোক। লেখা গিরীশের হতে পারে কিন্তু পেট্রিয়টের সম্পাদক হিসেবে সে মতামতের সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমি গ্রহণ করচি।

—তাহলে তুমি স্বীকার করো যে, বন্ধুকৃত্য করতে গিয়ে অন্তত এক্ষেত্রে তুমি নিজের যুক্তি আর বিশ্বাসের অমর্যাদা করেচো?

—কি জানি, হয়তো করেচি।

—ভালো করো নি।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলো হরিশ। তারপর আস্তে আস্তে বললে, আমি কোনো ওজর দিতে চাইনে কিশোরী। কলকাতার গোরা-মহল যে ভাবে গবর্নর জেনারেল ক্যানিং সাহেবের পেছনে লেগেচে, তাতে আরো বিপদের আশঙ্কা অনুমান করে ক্যানিংয়ের হাতে একটু শক্তি জোগানোর জন্যেও তোমার বক্তব্যকে সমর্থন করবার আপাত-প্রয়োজন আমি অনুভব করেচি। তুমি লিখেচ, সাধারণ প্রজারা এখনো রাজভক্তই আছেন। স্পষ্ট বলচি, তোমার এই বক্তব্যকে আমি বিশ্বাস করিনে। তা সত্ত্বেও, কিছুটা বা স্ট্র্যাটেজি হিসেবেও তোমার বইয়ের প্রশংসা করতে হয়েচে, কারণ, ইংল্যাণ্ডে ক্যানিংকে সরিয়ে দেওয়ার জন্যে যে আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেচে, তার বিরুদ্ধে আর একদলও পার্লামেণ্টে লড়াই শুরু করেছে। ক্যানিং-এর পক্ষ সমর্থকদের কাছে আমার এই তুচ্ছ পেট্রিয়ট নাকি এখন প্রধান হাতিয়ার বলে শুনেচি।

—তা জানি। সেটা আমাদের পরম গর্ব!

—গর্ব কিনা তা এখনো বুঝে উঠতে পারিনি। মাঝে মাঝে নিজেই বিভ্রান্ত হয়ে যাই। শুধু তোমার গ্রন্থের সমালোচনার ক্ষেত্রেই নয়, এই একবছরের ভেতর বিভিন্ন সময়ে এমন কিছু কিছু নিবন্ধও লিখেচি, যার ভেতর নিজেই নিজের বিশ্বাসের বিরুদ্ধাচরণ করে বসে আছি! কেন করেচি, নিজেই বুঝতে পারিনে। হয়তো ইংরিজিনবীশ নেটিব বাবু বলে মার্কা পড়ে যাওয়ার ফলেই এই বিপত্তি ঘটেচে!

—স্পষ্ট জবাব দাও তো হরিশ, তুমি কি মনে মনে এই মিউটিনিকে সমর্থন করো?

—সমর্থন করি এ কথাও যেমন জোর দিয়ে বলতে পারিনে, তেমনি এত বড়ো একটা রাজনৈতিক ঘটনার তাৎপর্যকেও আবার কিছুতেই অস্বীকার করতে পারচি নে। তোমরা তবু রাজভক্তি নিয়ে একটা নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছে শান্তিতে আছো, কিন্তু আমারই হয়েচে মুশকিল! আমি আছি দোটানায়।

এবার গিরীশ বললে, বিনয়ের মাত্রাটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না হে হরিশ? তুমি যে দোটানায় পড়ে নেই, সে কথা আমি অন্তত হাড়ে হাড়ে জানি। ভরাতবাসীর রাজনৈতিক পরাধীনতার ক্ষোভের সঙ্গে এই মিউটিনির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য—এ কথা তুমি একবছর আগে মিউটিনি আরম্ভ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বেশ জোর দিয়ে লিখেচিলে!

—হ্যাঁ, লিখেচিলুম। আবার সেই পেট্রিয়টেরই পৃষ্ঠায় এ দেশে এখনো বৃটিশ শাসনের অপরিহার্যতা স্বীকার করেও তো কত লেখা ছাপা হয়েচে।

—তার প্রায় সবগুলোই হয় আমি, নয় শম্ভুনাথ, নয় রমাপ্রসাদ, নয়তো গৌরদাসের লেখা। আমি তো জানি, তোমার কলম থেকে এই বছরখানেকের ভেতর সে রকম কোনো লেখা বেরোয়নি।

গিরীশের কথাটা শুনে সামান্য একটু হাসলে হরিশ। বললে, কিন্তু সম্পাদক হিসেবে সে-লেখাগুলোর দায়িত্ব আমি তো এড়িয়ে যেতে পারিনে গিরীশ! লোকে জানে, সেগুলো পেট্রিয়টেরই অভিমত।

গিরীশ বললে, যুক্তি দিয়ে আমরা যা বুঝেচি, তাই লিখেচি। তোমার রাজনৈতিক চিন্তাকে আঘাত করা আমাদের উচিত নয়। অন্যের কথা বলতে পারিনে, তবে নিজের কথা বলতে পারি, আজ থেকেই পেট্রিয়টে লেখা বন্ধ করতে আমি প্রস্তুত।

হরিশ স্নিগ্ধ হেসে বললে, সেটা অসম্ভব। তুমিই বলতে গেলে পেট্রিয়টের প্রতিষ্ঠাতা। তুমি লেখা বন্ধ করবে কেন? তুমি বিশ্বাস করো, আমিও মাঝে মাঝে সত্যিই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি। বৃটিশের উলঙ্গ চরিত্র দেখেও বৃটিশ শাসনের মোহ পুরোপুরি ত্যাগ করতে পারচিনে, আবার যত দিন যাচ্ছে ততই আমার মনে হচ্চে, জাত হিসেবে আমরা বাঙালীরা যেন ক্রমেই ক্লীব হয়ে যাচ্ছি! বৃটিশের ওপর এইভাবে পুরোপুরি নির্ভর ক'রে দেশের বিন্দুমাত্র উন্নতি কি আমরা কোনোদিন করতে পারবো?

উত্তেজিত স্বরে কিশোরীচাঁদ বললে, তবে কি গোঁয়ার সেপাইদের মতো রাজদ্রোহ ঘোষণা করলেই দেশের উন্নতির পরাকাষ্ঠা হবে?

উত্তেজনার চিহ্ন হরিশের কন্ঠস্বরেও ফুটে উঠলো।—একজন ম্যাজিস্ট্রেট বিচারক হিসেবে তোমাকে আমি যথেষ্ট বিচক্ষণ বলেই মনে করি কিশোরী! আশা করি, এই সাধারণ সত্যটা তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে যে, অতি তুচ্ছ একটা ঘটনাও কার্য-কারণ সম্বন্ধ ছাড়া ঘটে না? আর এ তো একটা বিরাট ঘটনা! পেট্রিয়টের সব কপিই তোমার বাড়িতে আছে। অবসর মতো একবার পৃষ্ঠা উলটে দেখো, গত জুন মাসে 'দ্য কজেস্ অব্ দ্য মিউটিনি' নামে নিবন্ধে 'দ্য গ্রেট রেভলুশন ইন ইন্ডিয়া' কথাটি আমি ব্যবহার করেচি। সারা দেশ জুড়ে এ আগুন কেবলমাত্র কয়েকহাজার গোঁয়ার সেপাইয়ের জন্যেই জ্বলেনি, এ আগুন বৃটিশদের রাশছাড়া উপনিবেশ-শোষণ আর চূড়ান্ত অপরিণামদর্শিতার ফল। ওয়েস্ট ইন্ডিজেও তো তারা কতদিন ধরে রয়েচে, কিন্তু রক্ত চুষে ওয়েস্ট ইন্ডিজের দেহটা ফ্যাকাশে করে দেওয়া ছাড়া আর কোন্ মহৎ কাজটা তারা করেচে? আমাদের দেশে তারা সবে একশো বছর হ'ল এয়েচে। আমরা মেট্রোপলিস কলকাতার মানুষেরা নানাভাবে নানারকম সুযোগ-সুবিধে পেয়ে রাজভক্তিতে গদগদ হয়ে উঠেচি। দেশের গরীব সাধারণ মানুষ কিন্তু এর আগে অনেকবার কোম্পানি রাজের বিরুদ্ধে সরাসরি রাজদ্রোহে নেমেচে। জিততে পারেনি সে অন্য কথা, কিন্তু বিদ্রোহ তারা করেচে। ইদানীংকালে ডালহৌসি সাহেবের ডক্‌ট্রিন

অব্ ল্যাপ্স্ বিশেষ করে অযোধ্যা দখলের পর থেকেই বিদ্রোহের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। সেপাইদের বেশির ভাগই তো গরীব চাষীঘরের সন্তান। নবাব-বাদশা, রাজা-মহারাজার রাজত্ব যে কোম্পানি রাতারাতি কেড়ে নিতে পারে, গরীব চাষীর সামান্য সম্বল জমিজমাটুকু খাস করে নিতে তাদের কতক্ষণ? চিরকালের জন্যে ভূমিহীন হয়ে যাওয়ার আতঙ্কে তারা দিশেহারা হয়ে পড়েচিলো। এনফিল্ড রাইফেলের কার্তুজ তো একটা উপলক্ষ্য মাত্র! নইলে বিদ্রোহ আরম্ভ হওয়ার পর তারা অর্ডন্যান্স স্টোর লুঠ করবার সময় আর যে কোনো অস্ত্র-ই নিক, এনফিল্ড রাইফেল অন্তত নিতো না কিম্বা ব্যবহারও করতো না।

—কী বলচো!—সবিস্ময়ে বললে কিশোরীচাঁদ। —যে রাইফেলের কার্তুজ নিয়ে হাঙ্গামার সূত্রপাত, সেই রাইফেল এবং সেই কার্তুজ তারা ব্যবহার করেচে? তার মানে, কার্তুজ দাঁতে কেটে?

—হ্যাঁ, ব্যবহার যখন করেচে, তখন কার্তুজ দাঁতে কেটেই তা করেচে ধরে নেওয়া যেতে পারে। তবে কিনা, খুব বেশি এনফিল্ড তারা লুঠ করতে পারে নি। সামান্য যে কটা পেয়েচে তা ব্যবহারই করেচে। ধর্মনাশের ভয়ে ফেলে রাখেনি।

কিশোরীচাঁদের বিস্মিত চোখের দিকে তাকিয়ে হরিশ বলতে লাগলো, একদিকে লক্ষ লক্ষ গরীব চাষীর আতঙ্ক, অন্যদিকে সামন্তরাজাদের চাপা বিক্ষোভ। সেই সময়েই এনফিল্ড রাইফেলের উপলক্ষ্যটা হাতের কাছে এসে গেল। সামান্য একটা কার্তুজকে উপলক্ষ্য করে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো। তবে এ-ও আমি বলচি কিশোরী, গোরু আর শুয়োরের চর্বির প্রসঙ্গটা যে একেবারে ভিত্তিহীন গুজবমাত্র নয় তার বাস্তব ভিত্তি আছে। মিলিটারি অডিট আপিসেই তার নথিপত্র আমি দেখেচি। ব্যারাকপুরে যেদিন আগুন জ্ব'লে উঠেছিল সে-তারিখটা ছিল উনতিরিশে মার্চ। তার আটমাস আগে ছাপ্পান্ন সালের পনেরোই আগস্ট তারিখে শস্তাদামের চর্বি সাপ্লাইয়ের জন্যে চর্বির বড়ো কারবারী গঙ্গাধর ব্যানার্জি কোম্পানির সঙ্গে ফোর্ট উইলিয়মের চুক্তি হয়েছিল। সে যাই হোক, বিদ্রোহ আরম্ভ হওয়ার পর এতদিনে কোম্পানি রাজের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানানোর একটা পথ পেয়ে বিদ্রোহে ঝাঁপিয়ে পড়লে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ চাষী। আর, বিদ্রোহের আগুন বেশ ভালোভাবে জ্বলে ওঠার পর নানাসাহেবের মতো বিক্ষুব্ধ সামন্তরাজারা এগিয়ে এসে নেতৃত্ব তুলে নিলে নিজেদের হাতে! জেনে রাখো, মীরাটে বিদ্রোহ আরম্ভ হওয়ার আগে ব্যারাকপুরে মঙ্গল পাণ্ডের বিদ্রোহ যদি সফল হ'ত, তাহলে এই বাঙলাদেশেরই লক্ষ লক্ষ গাঁয়ের মানুষ বিশেষত নীলচাষীরা ঝাঁপিয়ে পড়তো বিদ্রোহে। সুতরাং, আমি যখন বুঝতে পারচি, এ বিদ্রোহ কেবলমাত্র সেনাবাহিনীর ভেতরেই সীমাবন্ধ নয়, তখন একে নিছক মিউটিনি বলে উড়িয়ে দিতে পারিনি। প্রথমে বলেচিলুম, রেবেলিয়ন, তারপর আরো সংশোধন করে একে আমি গ্রেট ইণ্ডিয়ান রিভোল্ট বলেই অভিহিত করেচি। কিন্তু এখন এ-ও বুঝতে পারচি, বিদ্রোহ ব্যর্থ হতে চলেচে! ব্যর্থ হলেও একে আমি ভারতের মহাবিদ্রোহ-ই বলবো কিশোরী, মিউটিনি নয়।

এতক্ষণ কোনো কথা বলেনি গিরীশ। এই একই প্রসঙ্গে হরিশের সঙ্গে তারও বেশ কয়েকবার তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। কিন্তু কোনো মীমাংসা হয়নি। যে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। অথচ পেট্রিয়টের পৃষ্ঠায় হরিশের সঙ্গে সে-ও সমান তালে লিখে চলেছে। ব্যঙ্গ-বিদ্রুপে সে সিদ্ধহস্ত। কলকাতার শ্বেতাঙ্গ সমাজের প্রতিহিংসাবৃত্তি আর ভীরুতার বিচিত্র সব হাস্যকর আচরণ নিয়ে চূড়ান্ত বিদ্রূপ করে অনেকগুলো নিবন্ধ-ই সে লিখেছে। কিন্তু মিউটিনিকে সে-ও কখনো গ্রেট ইণ্ডিয়ান রিভোল্ট বলে মেনে নিতে পারেনি। তার মতে, বৃটিশ জাতের যত দোষ-ই থাক, দেশ থেকে বৃটিশ উচ্ছেদের কথা চিন্তা করাও এখন বাতুলতা। ব্রিটিশ চলে গেলে ভারতবর্ষ আবার ফিরে যাবে তার সেই মধ্যযুগের অন্ধকারে। তা ভাবতেও গা শিউরে ওঠে।

পরিস্থিতি যেন একটু বেশি গম্ভীর হয়ে উঠেছে। তাকে একটু হালকা করবার চেষ্টায় গিরীশ বললে, ওর মাথায় সেই যে বিদ্রোহী চাষীর ভূত ঢুকেচে, তাকে তুমি হাজার তর্কের সর্ষে

দিয়েও ছাড়াতে পারবে না কিশোরী! তার চেয়ে আপাতত যুদ্ধে ক্ষান্তি দেওয়াই ভালো। বিশেষ, আমাদের শাস্ত্রে যখন বলেচে, সূর্যাস্তের পর যুদ্ধ নিষিদ্ধ!

হরিশ হেসে বললে, তবু শাস্ত্রের নিষেধ লঙ্ঘন করে জয়দ্রথকে কিন্তু রাতের অন্ধকারেই বধ করা হয়েছিল হে! সে যাই হোক, তোমাদের ওই ভেজাল সর্ষে দিয়ে এই জ্যান্ত ভূতকে বোধ হয় তোমরা তাড়াতে পারবে না!

এর ভেতর বামুন ঠাকুর কখন অবার খাবার ভর্তি আর এক প্রস্থ রেকাবি আর বাটি রেখে গেছে।

গিরীশ বললে, নাও, এবার এদের সদ্‌গতি করো। যতদূর জানি, সমরশাস্ত্রে লুচি-মাংস সম্বন্ধে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই।

কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল।

কিছুটা খেয়ে হঠাৎ গিরীশের উদ্দেশে হরিশ বললে, উত্তর ভারতের কথা ছেড়েই দাও। এখানে কিছুই হয়নি তবু এই বাঙলাদেশেও গবর্নমেন্টকে ইমপ্রেসমেন্ট অ্যাক্ট পাশ করিয়ে চালু করতে হ'ল কেন?

—কেন চালু করতে হ'ল তা ক্যানিং আর হ্যালিডে সাহেবই জানেন।

—তাঁরা তো জানেনই; তোমরাও যদি সামান্য একটু মাথা ঘামানোর কষ্ট স্বীকার করতে গিরীশ, তাহলে সহজেই বুঝতে পারতে যে ও অ্যাক্ট রাজা মহারাজা জমিদার কিম্বা এডুকেটেড নেটিবদের জন্যে পাশ করাতে হয়নি—অ্যাক্টের দরকার হয়েচে গাঁয়ের ওই গরীব চাষীগুলোকে বাগে আনার জন্যে। বর্ধমানের রাজা থেকে শুরু করে বড়, মেজ, সেজো সব জমিদারেরাই তো যথাসর্বস্ব দিয়ে বৃটিশ সরকারকে সাহায্য করে কৃতার্থ হচ্চে, গাঁয়ের চাষীরা কিন্তু কোনোরকম সাহায্যই করতে চায়নি। এমন কি, এখান থেকে পাওয়া যুদ্ধের রসদ বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে একখানা নৌকো কি গোরুর গাড়ি পর্যন্ত তারা দিতে চায়নি। তাদের বাধ্য করবার জন্যেই গবর্নমেন্টকে শেষ পর্যন্ত এই জুলুমবাজ ইমপ্রেস্‌মেন্ট অ্যাক্ট চালু করতে হয়েছে।

—তার দ্বারা কী প্রমাণ হয়? প্রশ্ন করলে কিশোরীচাঁদ।

—আদালতে বসে রোজ সাক্ষী-প্রমাণ দেখে কত মামলার নিষ্পত্তি করচো, তারপরেও তোমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে, এর দ্বারা কী প্রমাণ হয়।

কিশোরীকে চুপচাপ থাকতে দেখে আরো একটু অসহিষ্ণু স্বরে হরিশ বললে, চুপ করে রইলে কেন? উত্তর দাও!

অবস্থাকে আর ঘোরালো হতে না দেওয়ার জন্যে কিশোরীচাঁদ হেসে বললে, আমি স্বেচ্ছায় ফেল করচি ভাই। তোমার উত্তর তুমিই দিয়ে দাও।

হরিশও না হেসে পারলে না। বললে; তোমাদের মতো ধুরন্ধর এজুকেটেড নেটিবরা এর উত্তর এযাবৎকাল এড়িয়েই চলেচে হে ইয়োর অনার! একমাত্র রামগোপাল ঘোষ আর প্যারীচাঁদ মিত্তির যা বুঝেচেন কিছু লিখেচেন। এখন শোনো, এই বেয়াড়া এক্সট্রিমিস্ট হরিশ মুখুজ্যের মতে, এর দ্বারা এইটেই প্রমাণ হয় যে, গাঁয়ের চাষীরায়তদের সমস্ত সহানুভূতিই বিদ্রোহীদের পক্ষে। তাই একখানা গোরুর গাড়ি জোগাড়ের জন্যে বাঙলার লেপ্টেন্যান্ট গবর্নরকে অতদূর পর্যন্ত যেতে হয়েচে।

হরিশের আপত্তি সত্ত্বেও গরম গরম লুচি ভর্তি আর একটা রেকাবি তার সামনে পৌঁছে গেল। হরিশ বিপন্ন দৃষ্টিতে গিরীশের দিকে তাকাতেই সে বললে, আমার কিছু করবার নেই ভাই। এটা একেবারে ঘরোয়া ইমপ্রেসমেন্ট অ্যাক্টের এক্তিয়ারে।

স্নিগ্ধ হেসে রেকাবি টেনে নিয়ে হরিশ বললে, আমাদের ঘরে ঘরে মা-বোনেদের এই অ্যাক্ট

চিরস্থায়ী হোক! তবে কিনা, বৌমাকে বলে এসো, আজ অন্তত এর পরেও তিনি যেন আমার ওপর আর এই অ্যাক্ট প্রয়োগ না করেন!

সবাই হেসে উঠলো। খড়খড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল কৈলাসকামিনী। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে সে হাসির বেগ সামলে নিলে।

কয়েক মিনিট কেটে গেল।

তারপর কিশোরচাঁদই প্রসঙ্গ তুলে বললে, আবার যদি রুক্ষ হয়ে না ওঠো তো একটা কথা জিজ্ঞেস করি হরিশ! মিউটিনি সম্বন্ধে তোমার যে ধারণার কথা তুমি বললে তার ভিত্তিতে এ কথা কি তোমাকে জিজ্ঞেস করতে পারি যে, সারা বছর ধরে পেট্রিয়টের পৃষ্ঠায় লর্ড ক্যানিংকে সমর্থন জানিয়ে এলে কেন?

—এর সংক্ষিপ্ত উত্তর আগেই একবার পেয়েচো। তবুও বল্চি, দেশের এই অশান্ত অবস্থায় ক্যানিংয়ের জায়গায় যদি এলেনবরা কিম্বা ডালহৌসির মতো একটা দৈত্য এসে হাজির হয় তাহলে অবস্থাটা কী হবে? রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে সারা দেশে। সেটা ঠেকানোর জন্যেও অন্তত ক্যানিংকে সমর্থন না জানিয়ে উপায় নেই বলেই মনে করেচি।

গিরীশ বললে, পেট্রিয়ট যে ক্যানিংয়ের সমর্থকদের বৃটিশ পার্লামেন্টে জোরদার লড়াইয়ের রসদ জুগিয়ে যাচ্চে, সেটা একটা বাস্তব সত্য কিশোরী!

হরিশ হেসে বললে, বাস্তব সত্য হলেও তা নিয়ে উল্লসিত হওয়ার কিছু নেই গিরীশচন্দোর! মনে রেখো, এটা ওদের উপনিবেশ। রক্ত ওরা শুষে নেবেই! সেই দায়িত্বটা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করবার জন্যেই গবর্নর জেনারেলদের পাঠানো হয়। তাদের ভেতর কেউ বা আসে নেকড়ের মতো। শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েই ঘাড় মটকে চোঁ চোঁ করে রক্ত খেয়ে হাড় মাংস চিবিয়ে তবে নিশ্চিন্দি। আর কেউ বা আসে ভ্যাম্পায়ার বাদুড়ের মতো। সুড়সুড়ি দিতে দিতে কখন সবটুকু রক্ত চুষে টেনে নেবে, টের-ও পাওয়া যাবে না। তফাৎ বলতে এইটুকু!

কিশোরীচাঁদ বললে, ক্যানিং যে নেকড়ে-প্রকৃতি নয়, সেটা দেখা গেচে। তাহলে তাঁকে কি তুমি ভ্যাম্পায়ারের দলে ফেলচো?

হরিশ হেসে বললে, আগেকার অনেক গবর্নর জেনারেলের চেয়ে বৃটিশের জাতীয় স্বার্থ তিনি অনেক বেশি বোঝেন বলেই আমার বিশ্বাস। আর সেই কারণেই এখানকার গোরার দল তাঁর বিরুদ্ধে যতই চেঁচিয়ে মরুক, তিনি সংযম হারাননি। দেশের বর্তমান অবস্থায় তাঁর এই সংযমটুকু আমাদের পক্ষে অন্তত শুভ হয়েচে।

কিশোরীচাঁদ বললে, বৃটিশদের ভেতর ওই নেকড়ে আর ভ্যাম্পায়ারের বাইরে কি কোনো ব্যতিক্রম নেই?

—আছে বৈকি! ফাদার পিফার্ড, ডেভিড হেয়ার, বেথুন, জর্জ টমসন, রেভারেন্ড লঙ—এঁদের মতো হৃদয়ের অধিকারীরাই ব্যতিক্রম।

হরিশের গলা ধরে এলো। মুহূর্তের মধ্যে হঠাৎ যেন উন্মনা হয়ে গেল সে। কতদিন পরে ফাদার পিফার্ডের কথা তার মনে পড়েচে! সেই স্নেহময় বিদেশী পাদরি হরিশের একেবারে কৈশোরে তার জন্যে যেটুকু করেছিলেন, তার ভেতর স্বার্থের এতটুকু স্পর্শ ছিল না। তাঁর নিঃস্বার্থ স্নেহের উত্তাপটুকু এখনো যেন গায়ে লেগে আছে!

চোখ দুটো ছল ছল করে উঠলো হরিশের।

গিরীশ মৃদুস্বরে প্রশ্ন করলে, হঠাৎ কী হ'ল হরিশ? মনে হচ্চে যেন কিঞ্চিৎ বিচলিত হয়ে পড়েচো?

হরিশ নিজেকে সামলে নিলে, বললে, হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছো। কতদিন পরে ফাদার পিফার্ডের কথা মনে পড়েচে! তাঁর কথাই ভাবচিলুম। আশ্চর্য দ্যাখো গিরীশ, তিনি তো কৃশ্চান মিশনারি হয়েই এদেশে এয়েচিলেন? তিনি কিন্তু কোনোদিনই জোর করে কাউকে সুসমাচারের বাণী

শোনাননি; দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়েও কাউকে ক্রীশ্চান করেননি। বেশির ভাগ মিশনারি যা করেন, তা করলে আমার সেই অবুঝ বয়েসেই সে সুযোগ তিনি নিতে পারতেন। আর বর্তমানে চোখের সামনে দ্যাখো ফাদার লঙকে। উনি যদিও বৃটিশ নন, আইরিশ—কিন্তু সাদা চামড়া তো? এদেশের মানুষের সুখ-দুঃখ, ব্যথা বেদনার সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিয়েচেন তিনি।

গিরীশ বললে, সত্যিই মহৎ হৃদয় ফাদার লঙের! তাছাড়া দ্যাখো, সব বৃটিশ সিবিলিয়ানই যে নেকড়ে নয়, তার প্রমাণ রেখেচেন সিসিল বীডন সাহেব। অত দূরে যেতে হবে কেন, আমাদের কর্নেল চ্যাম্পনিজ অন্তত প্রমাণ করেচেন, এদেশে যে সব বৃটিশ আসে, তাদের ভেতর দু'একজন ভদ্রলোক অন্তত থাকে!

হরিশ বললে, হুঁ। সত্যি কথা বলতে কি, এদেশের বৃটিশদের রক্তচক্ষুর সামনে আমি যে পেট্রিয়ট চালিয়ে যেতে পারচি, তার জন্যে ও'দের কাছে আমি ঋণী। ও'রা একজনও যদি হলিংবেরি মার্কা বৃটিশ হতেন তাহলে পেট্রিয়টের স্বার্থে এ আপিসের চাকরি আমাকে কবেই ছাড়তে হ'ত!

কিশোরীচাঁদ বললে, ক্যানিংকেও তুমি এইরকম একজন যথার্থ ভদ্রলোক বলে মনে করতে পারচো না কেন?

হরিশ হেসে বললে, এদেশে তিনি বৃটিশ ঔপনিবেশিক স্বার্থরক্ষার একনম্বর প্রতিনিধি কিশোরী। সেটা জেনেও বলচি, তিনি অন্যান্য অনেক গবর্নর জেনারেলের চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান আর রুচিশীল বলেই এদেশের শাদা চামড়া নুবাবের দল তাঁর ওপর হাড়ে হাড়ে চটে গেছে। কিন্তু কোম্পানির কোর্ট অব ডাইরেক্টরস্ এদেশে যে স্বার্থ দেখবার জন্যে তাঁকে পাঠিয়েচেন, সে স্বার্থ তাঁকে দেখতেই হবে! এখানেই ডেভিড হেয়ার, জর্জ টমসন কিম্বা রেভারেণ্ড লঙের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য!

বেশ রাত হয়েছে।

কিশোরীচাঁদ বললে, তোমাকে সেই ভবানীপুর যেতে হবে, আর রাত করা ঠিক হবে না হরিশ। তবে দোহাই তোমার, এর পরে যেদিন লুচি ফেস্টিভ্যাল হবে সেদিন যেন দয়া করে তার ভেতর মিউটিনিকে আর টেনে এনো না!

—আমাকে টেনে আনতে হবে না, সে নিজেই উড়ে এসে হাজির হবে দেখো!

—মিউটিনির ডানা আছে নাকি হে?

প্রেতাত্মাদের সর্বত্র অবাধ গতি, তাদের ডানার দরকার হয় না। দেখতেই তো পাচ্চ মিউটিনির অপঘাত মৃত্যু ঘটতে চলেচে? এখনো একটু একটু ধুঁকচে বটে, তবে অন্তিম দশার আর দেরি নেই। মনে হচ্চে, আর দু' এক মাসের ভেতরেই চোখ বুজবে! অপঘাত মৃত্যু মানেই প্রেতাত্মা। সে তো সুযোগ পেলেই ঘাড়ে এসে চাপবে হে!

—প্রেতাত্মা হওয়ার আগেই যে তোমার ঘাড়ে বেশ ভালোভবেই জাঁকিয়ে বসেচে, সে তো বিলক্ষণ বুঝতে পারচি!

—বন্ধুকৃত্য করবার জন্যে তোমরাও তো তার পিণ্ড দানের ব্যবস্থা করচো বাবা! চেষ্টা করে দ্যাখো, বই লিখে, ঝাড়ফুঁক করে মিউটিনির ভূতটাকে তাড়িয়ে যদি নিশ্চিন্দি হওয়া যায়! ওদিকে তো নতুন দুই ছোকরা দুখানা কেতাব লিখে বসে আছে! শম্ভুচাঁদের 'মিউটিনি' বিলেত থেকেই ছাপা হয়ে আসছে। সে ছোঁড়া আবার আমার দলেই ভিড়েচে দেখচি। আর ওদিকে তোমাদের দিগম্বর মিত্তিরের পেয়ারের ছোকরা কেষ্টদাস পাল বেনামে 'নেটিব ফাইডেলিটি' লিখে আমাদের রাজভক্তির এমন অকাট্য প্রমাণ হাজির করেচে যে আমার মনে হয়, ছোকরাকে বৃটিশ সরকারের এখুনি নাইটহুড দিয়ে দেওয়া উচিত!

কিশোরীচাঁদ বললে, তা যা বলেচো। কেষ্টদাস বড়ো বেশি বাড়াবাড়ি করেচে।

—বাড়াবাড়ি কী হে? বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের বড়ো কত্তারা তো ছোকরার ওপর

বেজায় খুশি! আমি ভাবচি একটা প্রস্তাব দেবো যে, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে গয়ায় গিয়ে মিউটিনির একটা পিণ্ডদানের ব্যবস্থা হোক!

কিশোরীচাঁদ একটু গম্ভীরভাবে বললে, কেষ্টদাসের বাড়াবাড়িকেও আমি সমর্থন করিনে হরিশ। কিন্তু আমিও যথেষ্ট জোরের সঙ্গেই বলচি, মিউটিনি সম্বন্ধে একটা বিরাট ভুল সিদ্ধান্তকে তুমি আঁকড়ে ধরে বসে আছো!

অচঞ্চল, শান্তস্বরে হরিশ বললে, বিচার করে চূড়ান্ত রায় দেওয়ার সময় বোধহয় এখনো আসেনি কিশোরী! তোমার বিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করতে আমি চাইনে। কিন্তু আমিও আমার দৃঢ় বিশ্বাস নিয়েই বলচি, আমরা সমসাময়িক লোকেরা আজ এই বিদ্রোহকে যে দৃষ্টিতে দেখচি, ইতিহাস সম্ভবত ভবিষ্যতে একে সম্পূর্ণ অন্য দৃষ্টিতে দেখবে এবং ভিন্ন রায় দেবে! এটা মিউটিনি না গ্রেট ইণ্ডিয়ান রিভোল্ট, সেটা সেইদিনই হয়তো স্পষ্ট হবে!

॥ ছয় ॥

অম্বুবাচী আরম্ভ হওয়ার ঠিক আগের দিনের কথা।

ক'দিন জ্বরের পরে সেইদিনই সবে অন্নপথ্য করেছে ছোটোবৌ। শরীর বেশ দুর্বল। একনাগাড়ে কিছুক্ষণ বসে থাকলেও মাথা ঝিমঝিম করছে। খাটের বাজুতে গোটা কয়েক বালিশ সাজিয়ে গদীর মতো করে দিয়েছ মাধুরী। তাতে ঠেস দিয়ে বসে জানালার দিকে উদাস বিষণ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ছোটোবৌ।

অম্বুবাচী আরম্ভ হবে কাল, চলবে পাঁচদিন।

আজ তবু আকাশ একটু পরিষ্কার। ভাঙা ভাঙা মেঘের ফাঁক দিয়ে পড়ন্ত রোদের এক চিলতে আলো দেখা যাচ্ছে। কাল থেকে বৃষ্টি যে হবেই, এ তো অবধারিত। অম্বুবাচীতে বৃষ্টি না হওয়াটাই আশ্চর্য।

কত কথা শাস্ত্র-পুরাণে লিখেছে।

এই সময়েই নাকি মা বসুমতী ঋতুমতী হন। তাঁর অঙ্গে ব্যথা লাগবে বলে অম্বুবাচীর এ কদিন মাটিতে লাঙল দিতে নেই, মাটির বুকে আগুন জ্বালতে নেই। আরো কত রকমের নিয়ম নিষেধ আছে। লোকে কি সব মানে? মুনি ঋষিদের তৈরি করা নিয়ম সবই যদি লোকে মানতো তবে আর ভাবনা কী ছিল?

জানালার সোজাসুজি কদম গাছটায় ফুল এসেছে!

দুপুরে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। জলে ধুয়ে গিয়ে ডাগর ডাগর কদমফুলের বাসন্তী আর সাদা কেশরগুলো এই পড়ন্ত আলোতেও কি ঝক্‌ঝক্ করছে! দুটো মৌটুসি পাখি সেই কখন থেকে ফুলের মধু খেয়ে চলেছে। এক-একটা ফুলের বোঁটার ওপর উড়ে এসে বসছে আর সরু ছুঁচলো বাঁকা ঠোঁট ঢুকিয়ে দিচ্ছে ফুলের ভেতর। কতটুকুই বা দেখতে পাখিগুলো, কিন্তু ভারী সুন্দর। তার ভেতর একটা আবার অনেক বেশি সুন্দর। মাথার ওপর লালচে আভা মাখানো ময়ূরকন্ঠী নীল রঙে, ডানা লাল অথচ কোমরের কাছটা লালচে বেগুনি। ওইটেই নাকি মদ্দা পাখি। তার তুলনায় মাদীটা দেখতে তেমন কিছুই নয়। জীব-জানোয়ার, পাখ-পাখালির দুনিয়ায় পুরুষগুলোই নাকি দেখতে বেশি সুন্দর হয়। কে জানে, ভগবান কেন এরকম নিয়ম করেছেন!

মৌটুসি পাখি দুটোর বাসা কাছেই কোথাও আছে, কারণ, রোজই এই বাগানে ওদের দেখা যায়। বাসায় হয়তো ডিম পেড়েছে মাদী পাখিটা। কিম্বা হয়তো এরই ভেতর ডিম ফুটে ছানাও হয়ে গেছে। বাসায় বসে চিঁ চিঁ করে ডেকে ছোট্ট ছোট্ট ছানাগুলো আহার চাইছে। একটু পরেই বাঁকা ঠোঁটে মধু ভরে নিয়ে তাদের খাওয়াবে ওরা।

বসুমতী মানে তো মাটি। তারও কোলে সন্তান হয়ে আসে কত ফসল আর গাছগাছালি। অতটুকু ছোট্ট একটা মৌটুসি পাখি—বিধাতাপুরুষ তাকেও মা হওয়ার সুযোগ দিয়েছে। কিন্তু একজনের বেলায় সেই একই বিধাতা পুরুষ এত নিষ্ঠুর কেন?

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বালিশে মাথা এলিয়ে দিলে ছোটোবৌ। ফুলে ভরা কদম গাছটাকেও তার অসহ্য লাগছে। তার সঙ্গে নিষ্ঠুর পরিহাস করবার জন্যেই গাছটা যেন তার ডাগর ডাগর ফুলে-ভরা ডালগুলোকে জানালার দিকে বেশি করে এগিয়ে দিয়েছে।

—তোমার শরীল কি খারাপ নাগচে খুড়িমা?

মাধুরীর গলার সাড়া পেয়ে তাড়াতাড়ি আঁচলের খুঁটে চোখের জল মুছে নিয়ে উঠে বসলে ছোটো বৌ। ম্লান নির্জীব হাসির একটা রেখা ফুটে উঠলো তার মুখে। বললে, না রে মা, অনেকখন বসে ছিলুম তো? তাই মাথাটা একটু কাৎ করেচি।

মাধুরীর হাতে একটা পাথরের বাটি। সেটা এগিয়ে ধরে বললে, এখন ঢক্ঢক্ করে এই সাগুর জলটুকু খেয়ে নাও দিকিনি!

কোনো প্রতিবাদ না করে বাটিটা হাতে নিলে ছোটবৌ।

মাধুরী বললে, কাল থেকে আমি তো আবার এ সব আগুন তাতের জিনিসপত্তর ছোঁয়াছুঁয়ি করতে পারবো না? সাবিকে বলে রেখেচি, সে-ই তোমার পত্তি দিয়ে যাবে।

ছোটবৌ বললে, তার দরকার হবে না রে মা। কাল আমি নিজেই দেখেশুনে নিতে পারবো।

সাবি অর্থাৎ সাবিত্রী হল হারাণের চতুর্থ কন্যা। সবে আট বছরে পা দিয়েছে। পরের দিন খুড়িমার দেখা-শোনার মতো একটা গুরু দায়িত্ব নিতে হবে বলেই সম্ভবত ব্যাপারটা একটু বুঝে নেওয়ার জন্যে সে দিদির পেছন পেছনেই এসেছে। ছোটোবৌয়ের কথাটা কানে যেতেই দরজার কাছ থকে সে বললে, তা কেমন করে হবে খুড়িমা? তোমার শরীল এখন যা দুব্লা, তাতে তুমি নিজে নিজে সব সাম্লাতে গেলে চারচিত্তির কাণ্ড একখানা হবে আর কি।

ছোটোবৌ হেসে ফেললে।

সাবিত্রী ততক্ষণে কাছে এগিয়ে এসেছে, বললে, না, না, হাসির কথা নয়। হাসো আর যাই করো, আমি বাপু দিদির চেয়ে অনেক কড়া মেয়ে, হ্যাঁ। ও-সব আদিখ্যেতা রাখো দিকি। কাল সক্কালে উঠে আগে তোমাকে শিউলি পাতার রস খাইয়ে তারপর আমার অন্য সব কাজ। তেতো বলে নাক সিঁটকে ভিরকুটি করতে পারবে না, সে কথা আমি আগেই বলে রাখচি বাপু।

মুখ টিপে হেসে মাধুরী বললে, তোকে আর ঠানদিদিপনা করতে হবে না। কালকের কথা কালকে হবে। এখন তার কী?

বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না সাবিত্রী। ঠোঁট উল্টে বললে, একটা রাত পোয়ালেই তো কালকের সকাল এসে যাবে বাপু। আমি পষ্ট কথার মুনিষ্যি। যা করবো তা আগে বলে রাখাই ভালো।

সস্নেহে সাবিত্রীকে কাছে টেনে নিয়ে ছোটবৌ বললে, কোনো চিতা নেই মা। কালকের সকাল থেকে তোর সব হুকুম আমি মেনে চলবো, হল তো?

বিজয়গর্বে দিদির দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে গম্ভীর ভাবেই সাবিত্রী বললে, সে তো মানতেই হবে। নইলে কি ব্যামো সারে? যাক্, এবার অমি নিশ্চিন্দি! যাই—

ছোট বৌ বললে, আহা থাক না একটু আমার কাছে।

—তবে থাক্। বাটিটা ওর হাতেই দিয়ে দিও।

কথাটা বলেই প্রস্থানোদ্যত হল মাধুরী। কয়েক পা গিয়েই হঠাৎ সে থেমে গেল।—ওই যাঃ, মরণদশা আমার! অমন খবরটাই তোমাকে বলতে ভুলে গেছি খুড়িমা। সেই যে রাণী নক্কিবাঈ গাছকোমর বেঁধে গোরপল্টনের সঙ্গে যুদ্ধ করেচিল, সে নাকি হেরে গেছে।

সাবিত্রী ফস্ করে বললে, আপদ চুকেচে।

প্রচণ্ড রেগে গেল মাধুরী।—তার মানে? তুই কী বুঝিস না? কে নক্‌কিবাঈ তা তুই জানিস?

সাবিত্রী ঠোঁট উলটে বললে, এর আবার না জানার কী আচে? বাবার কাছে আমি সব শুনেচি। মা গো মা, মেয়েছেলে তো নয়, যেন রণচণ্ডী। ছি ছি ছি, ঘেন্নায় মরে যাই! বেহায়া ধিঙ্গি মেয়েছেলে না হলে নাজনজ্জার মাথা খেয়ে কেউ কিনা বেটাছেলেদের সঙ্গে যুদ্ধু করতে যায়?

—যায়—একশোবার যাবে। তার কথা তুই কতটুকু জানিস যে অমন অসৈরণ পাকা পাকা কথা বলচিস? ফের যদি ফোড়ন কেটেচিস তো ঠাস্ করে এক চড় মারবো। যা এখান থেকে—যা বলচি।

হঠাৎ একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল স্যাবিত্রী। কোথাকার কে এক মন্দা-মাগীর জন্যে দিদির এত দরদ কেন, তা সে বুঝে উঠতে পারলে না। সাবিত্রী কিছু জানে না? সবই জানে সে। পশ্চিমে যেখানে ষণ্ডামার্কা সেপাইগুলো গোরাসাহেবদের সঙ্গে লড়াই করছে, সেখানে নক্‌কিবাঈ নামে কে একটা রাণীও নাকি তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। কে কবে শুনেছে যে, মেয়েছেলেরা ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে যুদ্ধু করে? মেয়েছেলে হয়ে জন্মেছিস, মেয়েছেলের মতো থাক! এই ধিঙ্গিপনা কেন বাপু? দেশের হাল যে কী হল!

প্রথমে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেও পরক্ষণেই তার মুখখানা থম্‌থমে হয়ে উঠলো। অভিমানে চোখ দুটো ছলছল করতে লাগলো। যে দিদি তাকে এতখানি ভালোবাসে, সেই দিদিই কিনা কোথাকার কোন্ একটা ধিঙ্গি মাগীর পক্ষ নিয়ে নিজের সোদর বোনকে এত হেনস্তা করলে? আজ যদি সাবিত্রীর বিয়ে হয়ে যেতো, তার একটা সোয়ামি থাকতো, তবে কি দিদি তাকে এইভাবে বলতে পারতো যে, ঠাস্ করে এক চড় মারবো?—এরপরেও তার মনে দুঃখু হয় না?

ডুরে শাড়ির আঁচল মুখে চেপে কোনোমতে কান্নার বেগ সামলে দুম্ দুম্ করে পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সাবিত্রী।

—আহা, অমন করে বক্‌লি বাছা?—একটু বিব্রতভাবে ছোটোবৌ বললে, প্রায় কেঁদেই ফেলেচে না!

—কাঁদুক। —মাধুরী সেই বিরক্তির ঝাঁজ নিয়েই বললে, সব কথাব ভেতর ফোড়ন কাটা চাই!

ছোটবোনের ওপর বিরক্তির ভাবটা কাটিয়ে নিতে সামান্য কয়েক মুহূর্ত সময় লাগলো মাধুরীর। পরক্ষণেই তার চোখে-মুখে কেমন যেন একটা রোমাঞ্চের পুলক উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। গলার স্বরেও একটা মুগ্ধ আবেশ।

—কী কাণ্ড, ভেবে দ্যাখো দিকি খুড়িমা। কী জেদ আব কী বুকের পাটা। যুদ্ধু করবে তো বেটাছেলের মতোই করেচে। বেটাছেলেব পোশাক পরে ঘোড়ায় চেপে ঝাঁপিয়ে গে পড়েচে যুদ্ধুর মধ্যিখানে। শেষ পজ্জন্ত হেরে গেল বটে, কিন্তু মেয়েছেলেব তেজ কাকে বলে তা বুঝিয়ে দিয়ে গেচে।

—রাণীটা বেঁচে আচে?

—পাগল! মা দুগ্গার মতো অমন যার তেজ, সে কি হেবে গিয়ে জেবন আব রাখে? সতী নক্কির মতো স্বগ্গে চলে গেচে নক্‌কিবাঈ।

বলতে বলতে আবেগে, উত্তেজনায় চোখ দুটো চক্‌চক করে উঠলো মাধুরীর। আবার বললে, রাণী নক্‌কিবাঈয়ের বয়েস কত জানো খুড়িমা? বললে না পেত্যয় যাবে, আমারই বইসি গো।

—কী বলচিস?

—হ্যাঁ গো, কাকাবাবুই আমাকে বলেচে। —একটু থেমে তারপর কেমন যেন আবিষ্ট স্বরে মাধুরী বললে, এমন মরণেও সুখ আচে, তাই না খুড়িমা?

চোখের কোণে জল এসে গেছে মাধুরীর। তারই বয়সী, তারই মতো বিধবা একটী মেয়ে কি

সাহসই না দেখিয়ে গেল। সে নিজে যদি লক্ষ্মীবাঈ হত তাহলে সেও হয়তো এইরকম তেজ দেখিয়ে সবাইকে অবাক করে দিতে পারতো।

হঠাৎ জানালা দিয়ে রাস্তার দিকে নজর পড়তেই আবেশের ঘোর কেটে গেল মাধুরীর। ওমা, এ কি কাণ্ড। কাকাবাবু এই অসময়ে বাড়ি ফিরে এলো যে। সঙ্গে আবার একজন লোক দেখচি। অসুখ-বিসুখ হল না তো?

ব্যস্তভাবে দ্রুতপায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মাধুরী। ছোটোবৌ-ও একেবারে নির্লিপ্ত থাকতে পারলে না। খাট থেকে নেমে দুর্বলপায়ে জানালার কছে এগিয়ে গেল।

বাড়ির দোরগোড়ায় এসে থেমেছে একখানা ভাড়াটে ছ্যাকরা গাড়ি। হরিশের সঙ্গে গাড়ি থেকে নেমেছে অচেনা একটা লোক। তাকে লোক না বলে ছোকরাবাবু বললেই বোধ হয় ঠিক মানায়। দেখে তো মনে হচ্ছে, বয়সের হিসাবে এক কুড়িতেও পেঁছয়নি। না, হরিশের শরীরও অসুস্থ মনে হচ্ছে না। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আবার খাটে ফিরে এসে বালিশে মাথা এলিয়ে দিলে ছোটোবৌ।

বৈঠকখানায় ঢুকে হরিশ বললে, নাও, একটু বসো শম্ভু, আমি মাকে খপর দিচ্চি।

শম্ভুচাঁদ স্মিত হেসে বললে, আমার কোনো তাড়া নেই দাদা, আপনিও ধড়া-চুড়ো ছেড়ে আসুন।

হরিশ হেসে বললে, অনভ্যেসের ফোঁটায় কপাল চড়চড় করবে হে। এখনো বিকেলের আলো রয়েচে, এ সময় ধরাচুড়ো ছাড়লে হরিশ মুখুজ্যের সর্দি লেগে যেতে পারে। নেহাৎ তোমার অমন পেড়াপীড়িতে কতকাল পরে আজ সন্ধ্যের আগে বাড়ি ফিরলুম।

একটা ফলের টুকরি আর একটা মেঠাইয়ের চ্যাঙাড়ি রয়েছে শম্ভুচাঁদের সঙ্গে। সে দুটোকে সযত্নে টেবিলের ওপর রেখে সে বললে, মাকে প্রণাম করে তারপর বৌঠানকেও আজ প্রণাম করে যাবো দাদা। গুরুগৃহে এসে গুরুমাকে প্রণাম করে না গেলে আমার অপরাধ হবে।

হরিশের চোখে-মুখে অস্বস্তির চিহ্ন ফুটে উঠলো। আম্‌তা আম্‌তা করে সে বললে, ইয়ে. মানে, তোমার বৌঠান আজ ক'দিন হল জ্বরে শয্যাশায়ী।

—তাই নাকি? —শম্ভুচাঁদ উদ্বেগের সঙ্গে বললে, জ্বর নাবে নি?

—বোধ হয় না।

দরজার কপাটের আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছিল সাবিত্রী। বাড়িতে নতুন লোক, বিশেষত মেঠাইয়ের চ্যাঙাড়ি তাকে প্রথম থেকেই কৌতূহলী করে তুলেছে। জ্বর নিয়ে কথা হচ্ছে শুনেই সে বুঝে নিয়েছে, প্রসঙ্গটা খুড়িমাকে নিয়ে। তাই তাড়াতাড়ি কাকাবাবুর ভুল শুধরে দেওয়ার জন্যে কপাটের আড়াল থেকে মুখ একটু বের করে সে বললে, না গো কাকাবাবু, খুড়িমার জ্বর তো কালকেই ছেড়ে গেচে, আজ অন্নপত্তি করেচে, ভালো আচে।

—তাহলে ভালোই তো! —আরো আম্‌তা আম্‌তা করে হরিশ বললে, তুমি বসো, আমি আসচি।

হরিশ ভেতরবাড়িতে চলে গেল।

শম্ভুচাঁদ অপ্রস্তুতভাবে চুপ করে বসে রইলো। যাঁকে সে সমস্ত হৃদয় দিয়ে গুরুর আসনে বসিয়েছে, তাঁর দাম্পত্য জীবন যে সুখের নয়, তার আভাস অন্য দু' একজনের মুখে সে পেয়েছিল। তাই বৌঠানের প্রসঙ্গটা তোলা উচিত হয়নি ভেবে নিজেকেই সে অপরাধী সাব্যস্ত করে বড়ো বেশি অপ্রতিভ হয়ে গেল।

একটু পরেই ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো হরিশ। বললে, চলো, মা তোমাকে ডাকচেন।

ছেলেটা যদিও নাতির বয়সী তাহলে এর আগে তাকে সামনাসামনি দেখেননি বলে মাথার ঘোমটা একটু বেশি করেই টেনে দিয়েছেন রুক্মিণী। শম্ভুনাথ ঘরে ঢুকে জিনিসগুলো তাঁর পায়ের কাছে রেখে পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বললে, আমাকে আপনার আর এক ছেলে বলেই জানবেন মা।

—অক্ষয় পেরমাই হোক বাবা! —সস্নেহে বিগলিত স্বরে রুক্মিণী বললেন. হারাণের মুখে

তোমার কথা আমি মাঝে মাঝেই শ্‌নি। কিন্তু এ তুমি কি করেচো বাবা? অতগ্‌লো মেঠাই, ফলফলারি বয়ে আনতে গেলে কেন? আর আগ্‌নের আঁচের মেঠাই তো এখন চলবে না!

—অম্ব্‌বাচীর সময় আমার এক পিসিমার জন্যেও যা হোক কিছ্‌ ফলফলারি আমাকে দিয়ে আসতে হয় মা। আমি যৎসামান্যই এনেচি। অম্ব্‌বাচীতে মেঠাই চলবে না, তা আমি জানি। দাদাকে আমি গ্‌র্‌জ্ঞান করি। মেঠাই এনেচি আমার গ্‌র্‌মাকে প্রণাম করবো বলে।

সঙ্গে সঙ্গে ম্‌খ গম্ভীর হয়ে গেল র্‌ক্মিণীর। কিন্তু বিতৃষ্ণা আর বিরক্তিকে দ্র্‌ত গোপন করে একট্‌ চেষ্টাকৃত হাসি হেসে তিনি বললেন, সে তো খ্‌ব ভালো কথা বাবা। সে যাই হোক, ওই এককাঁড়ি ফলকে বলচো যৎসামান্য। হরিশ যা এনে রেখেচে তাই তো পাঁচদিনে ফ্‌রোবে না।

আপনি ফিরিয়ে দিলে আমি বড়ো কষ্ট পাবো মা!

—বালাই ষাট। ফিরিয়ে দেবো কেন? মা বলে ডেকেচ, মায়ের জন্যে কষ্ট করে বয়ে এনেচো, মা হয়ে তা কি আমি ফিরিয়ে দিতে পারি বাবা?

—ব্যস, মিটে গেল শম্ভু। —হাসতে হাসতে হরিশ বললে, এখন বরানগরের ছেলে ভবানীপ্‌রের মায়ের কাছ থেকে কী ফলার করে যেতে পারো, তাই নিয়ে চিন্তা শ্‌র্‌ করা যেতে পারে, কি বলো?

—ফলার করবে বৈকি, নিশ্চয়ই করে যাবে বাছা। নতুন ছেলে পেল্‌ম আমি। ওকে কি পেথ্‌থম দিনই খালি ম্‌কে চলে যেতে দিতে পারি? তা বাবা, তুমি সংসার করেচো?

—হ্যাঁ মা, গতবছরই বিবাহ হয়েচে।

—সংসারে যেন স্‌খ-শান্তি পাও, ভগমানের কাছে এই পেরাথ্‌থনাই করি বাছা। তব্‌ একটা কথা বলি। নেকা-পড়া করো আর বক্তিমে দিয়ে বেড়াও—যা ইচ্ছে করো, কিন্তু ঘর-সংসার বলে যে পদাথ্‌থ আছে, সেটা যেন একেবারে ভুলে যেয়ো না বাবা।

হো হো করে হেসে উঠল হরিশ। শম্ভুচাঁদের দিকে তাকিয়ে বললে, ব্‌ঝতে পারচো তো, আসল লক্ষ্যটা কে? না, না, তোমার ভয় নেই মা, ও তোমার এই বেয়াড়া ছেলের মতো হবে না। তবে কিনা, এই লেখার নেশায় যখন পেয়ে বসেচে তখন সংসারের আর সবায়ের কপালে একট্‌ না একট্‌ ভোগান্তি যে আচে, তা আমি হলপ করে বলতে পারি।

র্‌ক্মিণী সঙ্গে সঙ্গেই ঈষৎ ঝাঁজের সঙ্গে বললেন, তোকে আর হলপ করে বলতে হবে না বাছা। বাবা শম্ভু, হরিশ তো ল্‌চি পেলে একেবারে অজ্ঞান। তুমি কি ফলার ভালোবাসো, বলো।

—আপনি যা দেবেন, তাই অমৃত বলে খাবো মা।

—আহা! মনটা আমার জ্‌ড়িয়ে দিলে বাবা।

র্‌ক্মিণী খ্‌শিতে দিশেহারা। কি চমৎকার ছেলে। এক লহমায় নিষ্পরকে কেমন আপন করে নিতে পারে। এইট্‌কু সময়ের তো পরিচয়, কিন্তু মনে হচ্ছে হারাণ-হরিশের মতো শম্ভুও যেন তাঁর নিজের পেটের ছেলে।

—বেঁচে থাকো বাবা, স্‌খে থাকো! —আবার নতুন উচ্ছ্ব্‌সিত আবেগে আশীর্বাদ জানালেন র্‌ক্মিণী। —সময় স্‌যোগ মতো মাঝে মাঝে এসো বাবা, আমি তিপ্তি পাবো। তোমরা গপ্পোগাছা করো, আমি একট্‌ ওদিকটা দেখিগে।

র্‌ক্মিণী চলে গেলেন। হরিশ হাসতে হাসতে বললে, আমার পাওনায় দিব্যি ভাগ বসালে, এটা কি উচিত কাজ হল হে? যাই হোক, তুমি মাঝে মাঝে এসে দ্‌' একবার দেখা করে গেলে মা সত্যিই তৃপ্তি পাবেন। আমাকে তো সকালের দিকে ঘণ্টাখানেক ছাড়া সারা দিনে রাতে চোখেও দেখতে পান না। যা হোক, এবার তোমার বৌঠানের পালাটা সেরে এসো, তারপর আলোচনায় বসা যাবে।

একট্‌ ম্‌দ্‌ বিস্ময়ে হরিশের ম্‌খের দিকে তাকালে শম্ভুচাঁদ। সে নিজেই দোটানার ভেতর ছিল, বৌঠানের প্রসঙ্গটা এরপর আর তুলবে কি না।

সাবিত্রীকে ডেকে হরিশ বললে, তোর খুড়িমাকে গিয়ে বল, আমার এক ছোটো ভাই এয়েচেন, তিনি দেখা করবেন।

একটু পরেই ফিরে এলো সাবিত্রী। তার সঙ্গে দোতলার সিঁড়ির দিকে রওনা হল শম্ভুচাঁদ। হরিশ চুপচাপ দাঁড়িয়েই ছিল। হঠাৎ কি যেন ভেবে সে এগিয়ে গেল।

খাট থেকে নেমে ছত্রি ধরে দাঁড়িয়ে ছিল ছোটোবৌ। দরজার কাছে এসে হরিশ বললে, শম্ভুচাঁদ আমার ছোটোভাইয়ের মতো। ও তোমার সঙ্গে দেখা করতে এয়েচে।

শম্ভুচাঁদ মেঠাইয়ের চ্যাঙাড়িটা পাশের ছোটো একটা টুলের ওপর রেখে ছোটোবৌকে প্রণাম করে বললে, দাদা আমাকে স্নেহভরে কাছে টেনে নিয়েছেন বৌঠান, সেই সঙ্গে আপনার স্নেহটুকুও আমার চাই।

মাথায় বড়ো করে টানা ঘোমটা। তাই তার ছলছল করে ওঠা চোখ দুটো হরিশ বা শম্ভু কেউই দেখতে পেলে না। বুক ঠেলে একটা উদগত কান্নার ঢেউ যেন বাইরে এসে আছড়ে পড়তে চাইছে। একমাত্র মাধুরী ছাড়া আজ পর্যন্ত আর একজনও এইভাবে সম্মান দিয়ে, শ্রদ্ধা করে তাঁর সঙ্গে কথা বলেনি। একেই শরীর দুর্বল, তার ওপর একটা হতচকিত বিস্ময়ের বেগ। সমস্ত দেহটা থরথর করে কাঁপতে লাগলো ছোটোবৌয়ের। পা দুখানা যেন দেহের ভর রাখতে পারছে না। কথা বলা? কী কথা বলবে সে? কী বলবার আছে তার?

বৌঠানের কাছে বিদায় নিয়ে শম্ভুচাঁদ পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলে, একা সাবিত্রী মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে, হরিশ নেই।

সাবিত্রী বললে, কাকাবাবু বৈঠকখানায় গিয়ে বসেচেন চলুন—

বৈঠকখানায় আরাম কেদারায় বসে হরিশ তখন সবে গড়গড়ার সট্‌কায় টান দিয়েচে, এরই ভেতর এসে গেল শম্ভুচাঁদ।

সট্‌কায় কয়েকটা টান দিয়ে একগাল ধোঁয়া ছেড়ে হরিশ বললে, কলমে গরম হলেও বিনয়ের বেলায় তুমি যে নবদ্বীপের বোষ্টুমদেরও টেক্কা দিতে পারো, সেটা আজ প্রত্যক্ষ করলুম। সে যাকগে, নতুন কী লিখবে বলে ঠিক করেচো?

—এখনো কিছুই ঠিক করিনি। —বললে শম্ভুচাঁদ।

—ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের ব্যাপারটায় বড়ো ঘা খেয়েচো, তাই না?

থতোমতো খেয়ে শম্ভুচাঁদ বললে, আজ্ঞে, তা যে একটু খেয়েচি, সে কথা অস্বীকার করবো না। কিন্তু আপনি কেমন করে জানলেন? আমি তো আপনাকে কিছু বলিনি।

—ওহে ছোকরা, হরিশ মুখুজ্যেকে পেট্রিয়ট চালাতে হয়। অতএব লাটবাহাদুরের খাস কামরা থেকে শুরু করে রাণী মুদির গলি পর্যন্ত সব মহলের খবরই আমাকে রাখতে হয় হে। অ্যাসোসিয়েশনের সহকারী সম্পাদক হওয়ার ইচ্ছে হয়েচিলো তো সে-কথা তোমার প্রাণের বন্ধু কেষ্টদাস পালকে বলতে গেলে কেন?

অপ্রতিভ দৃষ্টিতে তাকিয়ে মৃদুস্বরে শম্ভুচাঁদ বললে, আমি ভেবেছিলুম, কেষ্টদাস এ ব্যাপারে হয়তো আমাকে আন্তরিকভাবে সাহায্য করবে।

খুবই আন্তরিকভাবে সাহায্য করেচে, সেটা তো এখন বুঝতে পারচো? যোগ্যতায় নিজেকে তোমার চেয়ে অনেক কম জেনেই গোপনে মুরুব্বিদের কাছে নিজের জন্যে জোর তদ্বির করে সেটা নিজেই বাগিয়ে নিলে! এরই ভেতর রাজা-জমিদার মুরুব্বিদের কাছে তেল-তোষামোদের যে নমুনা সে-ছোকরা দেখাতে শুরু করেচে, তাতে মনে হচ্চে, এই জমানায় নিজের আখের বেশ ভালোভাবেই গুছিয়ে নিতে পারবে। বাহাদুর ছেলে বটে। শুনেচি, কেষ্টদাস নাকি তোমার সহপাঠী?

আজ্ঞে হ্যাঁ ছেলেবেলা থেকেই ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে আমরা একসঙ্গে পড়েচি।

—তারপর রাজেন্দ্র দত্ত মশাইয়ের হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজেও একসঙ্গে পড়েচো, কি বলো? এই সেদিন দু'বন্ধু মিলে ক্যালকাটা মান্থলি ম্যাগাজিন বের করলে কিন্তু চালাতে পারলে না।

ওহে ছোকরা, এই তো সবে জীবনের শুরু। নিজের অন্তর ছোটো করো না, কিন্তু চোখ কান খোলা রেখে শত্রু-মিত্র চিনতে শেখো, বুঝেচ?

শম্ভুচাঁদ চুপ করে রইলো।

হরিশ আবার বলতে লাগলো, ওরে বাবা, উঠন্তি মুলো পত্তনেই চেনা যায়। যেহেতু তোমার ভেতর বেশ কিছু গুণ লক্ষ্য করে ভালোবেসে তোমাকে কাছে টেনে নিয়েচি, সেইজন্যেই তোমাকে সাবধান করে দেওয়া আমার কর্তব্য বলে আমি মনে করচি। এই কিছুদিন যাবৎ অ্যাসোসিয়েশনে কেষ্টদাসের চাল-চলন দেখে আমি অন্তত যেটুকু বুঝেচি, সে ছোকরা যথেষ্ট ধূর্ত এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী। তোমার মতো এমন সাদাসিধে নয়।

নিজের আবাল্য বন্ধু সম্বন্ধে হরিশের সোজাসুজি মন্তব্যে খুবই অস্বস্তি বোধ করছিল শম্ভুচাঁদ। কয়েকমুহূর্ত নীরব থাকার পর মৃদুস্বরে সে বললে, আপনার জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার তুলনায় আমি নিতান্তই শিশু। তবু একটা কথা জিজ্ঞেস করচি দাদা, অপরাধ নেবেন না। একটা মাত্র কাজ দিয়ে কাউকে পুরোপুরি বিচার করা কি ঠিক হবে?

—একটা কাজই একশো কাজের নমুনা হয়ে কখনো কখনো দাঁড়াতে পারে শম্ভু। বয়েস যত বেশি হয়, মানুষের স্বার্থবুদ্ধি তত বাড়তে থাকে—এইটেই সংসারে চলতি নিয়ম। সামান্য এই সতেরো-আঠারো বছর বয়েসেই জেনেশুনে নিজের বাল্যবন্ধুকে পেছন থেকে ল্যাঙ মারার যে দৃষ্টান্ত সে স্থাপন করেচে, তারপর আর দৃষ্টান্তের দরকার বোধ হয় হবে না। সে যাই হোক, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সহকারী সম্পাদক হতে না পারার এই ঘটনাটা হয়তো একদিক থেকে তোমার পক্ষে শাপে বর হয়েচে। তোমার 'কজেস অব মিউটিনি' বইখানা খুব মনোযোগ দিয়েই পড়েছিলুম। তাতে তোমার চিন্তা ভাবনার যে পরিচয় পেয়েছি, তারই ভিত্তিতে বলচি; তোমার পক্ষে বেশিদিন ও-কাজ করা সম্ভব হত না। ওখানে ছক-বাঁধা ফর্মার বাইরে স্বাধীন চিন্তা নিয়ে কাজ করবার অসুবিধে আছে। যদি বলো, আমি কেন ওখানে আছি, তার উত্তর—আমাকে নিয়ে ওঁদের এখন সাপের ছুঁচো গেলার অবস্থা। না পারচে গিলতে, না পারচে ওগ্‌রাতে। আর আমিও শেষ পর্যন্ত মনস্থ করেচি, আমাকে না তাড়ানো পর্যন্ত আমিও নড়চি নে। এ-ফাঁকে ও-ফাঁকে যদি সামান্য কিছু কাজের কাজ করতে পারি তো সেই চেষ্টাই করে দেখি। আমার কথা যাক, তোমাকে আমি যাচাই করেই নিয়েচি হে। যেখানে তুমি স্বাধীন চিন্তা নিয়ে কাজ করতে পারবে, সেখানেই তোমাকে এনে বসিয়ে দিলুম আমি। পেট্রিয়টে মন খুলে কাজ করো, মন খুলে লিখে যাও—

কয়েকমুহূর্ত বিহ্বল অভিভূতের মতো বসে রইলো শম্ভুচাঁদ। তারপর আবেগ-উচ্ছ্বসিত ধরা গলায় বললে, হিন্দু পেট্রিয়টের সহকারী সম্পাদক হিসেবে কাজ করবার দুর্লভ সুযোগ পাবো, তা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি দাদা।

তার পিঠে সস্নেহে একটা চাপড় মেরে হরিশ বললে, ওহে গর্দভ, ব্যাপারটা তো আর স্বপ্নের নয় যে স্বপ্নে ভাববে? বাস্তবে যা ঘটেচে সেটা বাস্তববুদ্ধি দিয়ে মেনে নাও। তোমার ওপর সম্পূর্ণ আস্থা রাখতে পারি বুঝেই তো পেট্রিয়টের এত লেখকদের ভেতর থেকে তোমাকেই ছেঁকে নিয়েচি।

শম্ভুচাঁদ আরো অভিভূত হয়ে পড়লো।

তার দিকে আড়চোখে একবার তাকিয়ে নিয়ে ইচ্ছে করেই একটু হেসে হরিশ বললে, আসলে ব্যাপারটা কী জানো? এই সময় তোমার কপালে একটা সহকারী সম্পাদকের পদ নাচছিল। সেটা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে না হয়ে পেট্রিয়টে হল।

আগের মতোই আবেগবিহ্বল স্বরে শম্ভুচাঁদ বললে, আমি প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশি পেয়েচি! এ আমার পক্ষে সত্যিই শাপে বর। আপনি আমাকে যে কঠিন দায়িত্ব দিলেন, আশীর্বাদ করুন, তা যেন আমি সাধ্যিমতো পালন করতে পারি।

পারবে, পারবে, তুমি নিশ্চয়ই পারবে। নাও, এখন ওঠো দিকি। আমার স্টাডিতে চলো। কারণবারির ইচ্ছেটাও এখন প্রবল হয়েচে, তাছাড়া ফলারটাও এখানে বসে ঠিক জমবে না।

দোতলায় নিজের ঘরে গিয়ে বসলে হরিশ। শম্ভুচাঁদকে বললে, বাইরে আমার কথা বলতে গিয়ে 'গুরুজী' 'গুরুজী' বলো শুনেচি। ও সব গুরুবাদে আমার কোনো আগ্রহ নেই শম্ভু। তবে দাদা বলে যখন ডেকেচো তখন একটা উপদেশ দিয়ে রাখি, গুরুজীর এই বিদ্যেটা যদি পরিহার করে চলতে পারো তাহলে তোমারও মঙ্গল, তোমার সংসারেরও মঙ্গল।

কথাটা বলেই দেওয়াল আলমারি থেকে একটা মদের বোতল বের করে দেখালে হরিশ। তারপর গেলাসে ঢেলে মদে কয়েকটা চুমুক দিয়ে হাসতে হাসতে বললে, আজ প্রথম দিন এসেই আমার মাতৃদেবীর মন যেরকম গলিয়ে দিয়েচো বাবা, তাতে তো বিলক্ষণ ভয় পাচ্ছি।

—কেন দাদা?

—বুঝলে না? আরে বাবা, তোমার প্রাণের বন্ধু কেষ্টদাস যেমন জজসাহেব হরচন্দর বাবু আর দিগম্বর মিত্তিরদের দলকে তোয়াজে গলিয়ে সহকারী সম্পাদকের পদটি দখল করে বসেচে, তেমনি আমার মাতৃদেবীর মন গলিয়ে তুমি হয়তো একদিন এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করে ফেললে যে মাতৃদেবী হয়তো আমাকে আদেশ করে বসলেন, পেট্রিয়টের এডিটরশিপটা তুই শম্ভুকেই দিয়ে দে হরিশ।

কথাটা নিমেষে শম্ভুচাঁদকে এত বেশি হতবাক্ করে দিলে যে তার মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সে যে কী বলবে বুঝতে পারলে না। গুরুজী কি সত্যিই তাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখচেন?

নিজেকে সামলে নিতে বেশ কয়েকমুহূর্ত সময় লাগলো তার। বিবর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে অস্ফুট স্বরে সে বললে, এ আপনি কী বলচেন দাদা!

শম্ভুচাঁদের ছলছল চোখের দিকে তাকিয়ে সস্নেহ আবেগে তার একখানা হাত চেপে ধরে হরিশ বললে, কেঁদে ফেললে নাকি হে? নাঃ, এমন মেয়েলি অ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়ে তো পেট্রিয়ট চলবে না হে! ঠাট্টাও বোঝো না?

আর কয়েক চুমুক মদ গলায় ঢেলে দিয়ে হরিশ এবার হঠাৎ গম্ভীর স্বরে বললে, কি জানি শম্ভু, ঠাট্টার ছলে নিজের মনের গোপন কথাটাই হয়তো বলে ফেলেচি। জানো তো, আমার কোনো সন্তান নেই? পেট্রিয়টই আমার সন্তান। মাঝে মাঝে ভাবি, আমি যদি অশক্ত হয়ে পড়ি, তাহলে আমার এই একমাত্র সন্তানের দায়িত্ব আমি কার হাতে তুলে দেবো? তোমাকে কাছে পাওয়ার পর মনে হচ্ছে, বোধহয় যোগ্য লোক আমি পেয়েছি।

বিস্ময়বিমূঢ়ভাবে তাকিয়ে রইলো শম্ভুচাঁদ। তার মুখ দিয়ে কোনো কথা সরছে না। শুধু বুকের ভেতর তীব্র শিহরণের উদ্দাম তরঙ্গ।

হরিশ বললে, আমার পেট্রিয়ট বড়ো অভিমানী হে। কোনো ভুল যদি করে তবে সে ভুলের দায়িত্ব সে অকপটেই স্বীকার করবে। কিন্তু জেনে শুনে বুঝে শুধু পিঠ বাঁচানোর জন্যে আপোস-রফার পথটা তার একেবারেই ধাতে সয় না। এই তো, এই একবছর ধরে আমাদের এজুকেটেড নেটিবরা আনন্দে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে নৃত্য করচেন আর চেঁচাচ্ছেন, বাঙালী যে রাজভক্ত ছিল এবং থাকবে, সেটা প্রমাণ করে পেট্রিয়ট একটা মহৎ কর্ম করেচে। লজ্জায়, দুঃখে আমার মাথা কাটা যায় শম্ভু। সমস্ত বাঙালী রাজভক্ত, এ কথা আমি কখনোই বলিনি এবং বলবো না। হ্যাঁ, এজুকেটেড নেটিব, বেনিয়ান, দালাল গোমস্তারা তা থাকবে, কারণ তাতেই তাদের স্বার্থসিদ্ধি। মিউটিনির এই আগুনের ভেতর আরো ক্ষয়ক্ষতি আরো বিপর্যয় এড়ানোর জন্যে আমি ঠান্ডা মাথার মানুষ ক্যানিং সাহেবকে সমর্থন জানিয়ে গেচি। কিন্তু এটা যে কেবলমাত্র মিউটিনি নয়, এর তাৎপর্য আরো অনেক গভীর, সে কথা বারবার লেখা হয়েচে পেট্রিয়টের পৃষ্ঠায়। কিন্তু সেপাইদের ওপর খড়্গহস্ত এজুকেটেড নেটিব বন্ধুদের তা নজরে পড়েনি, অথবা পড়লেও হরিশের প্রলাপ বলে

তাঁরা উড়িয়ে দিয়েচেন। তাঁরা যে যা ভাবেন ভাবুন, আমি যা বিশ্বাস করি, পেট্রিয়ট সেই পথেই চলবে। তাইতো ভয় হয়, আমি কখনো অক্ষম হয়ে পড়লে কী হবে? পেট্রিয়টকে তার নিজের পথে চলতে না দিলেই সে যে শুকিয়ে মারা যাবে।

বলতে বলতে হরিশের গলা ধরে এলো। একটু পরেই নিজেকে সামলে নিয়ে জোর করে খানিকটা হেসে বললে, আমি কিন্তু এখন প্রলাপ বকচি নে শম্ভু।

—তা জানি। কিন্তু পেট্রিয়টের ভবিষ্যৎ নিয়ে এখনই এ-সব কথা আসচে কেন দাদা?

—উইল তো লোকে বেঁচে থাকতেই করে হে ছোকরা। চিতেয় ওঠার পর কেউ কখনো উইল করে বলে শুনেচো? এক-এক সময় ভাবি, এই বেচারা দেহটার ওপর যে পরিমাণে অত্যাচার করে চলেচি তাতে অতিষ্ঠ হয়ে কবে সে আমার আত্মাটাকে তালাক দিয়ে বসবে, তার ঠিক নেই। আবার উলটে এ কথাও ভাবি, শরীরের নাম মহাশয়, যা সওয়াবে তাই সয়। এর ভেতরে একটা সত্যি না থাকলে চলতি প্রবাদটা এমনিই মান্ধাতার আমল থেকে চলে আসচে? তুমি কী বলো?

বিব্রতস্বরে কোনোমতে শম্ভুচাঁদ বললে, আজ্ঞে, সে তো বটেই।

রুক্মিণী ঘর ঢুকলেন। তার পেছনে কাঁসার রেকাবিতে লুচি, কচুরি, তরকারি নিয়ে সাবিত্রী। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে সাবিত্রীর হাতে সব কিছু এগিয়ে দিচ্ছে বড়োবৌ আর মাধুরী! রুক্মিণী নিজে দাঁড়িয়ে তদারক করলেন। পরিতৃপ্তি উপচে পড়ছিল তার চোখে-মুখে। নতুন পাওয়া ছেলে শম্ভুচাঁদের দৌলতে আজ কতকাল পরে সামনে দাঁড়িয়ে হরিশকে খাওয়ানোর সুযোগ পেলেন তিনি। আহা, বেঁচে-বর্তে থাক শম্ভু ছেলেটা। ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক।

জলযোগের পর পেট্রিয়টের পরবর্তী সংখ্যা নিয়ে আলোচনা আরম্ভ হল। কথায় কথায় সন্ধ্যে কখন উৎরে গেছে কারো খেয়াল নেই। আলোচনা চলছে।

পাশাপাশি ঘর। মাঝখানে একটা দরজা। সে-দরজার কপাট আজ কবছর হয়ে গেল বন্ধ হয়ে আছে। লোহার খিলের ওপর মাকড়সার জাল ছড়িয়ে গেছে। ও পাশের ঘরে থাকে ছোটোবৌ। হরিশের ঘর থেকে আলাপ-আলোচনার অনেক কথাই ভেসে আসছিল ছোটোবৌয়ের কানে। সে চুপ করে শুয়ে আছে বিছানায়। বাইরে টিপটিপ করে বৃষ্টি নেমেছে।

সেপাইদের যুদ্ধ নিয়েই কথাবার্তা হচ্ছে ও ঘরে। তার বেশির ভাগই বুঝতে পারছে না ছোটোবৌ। শুধু এইটুকু বুঝতে পারছে, দেশের মানুষের ওপর কত দরদ তার স্বামীর। শুধু এক অভাগিনীর কপালে সে দরদের ছিটে-ফোঁটা জুটলো না।

হরিশ বলছিল ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈয়ের কথা।

সার হিউ রোজের মতো বুদ্ধিমান সেনাপতি আগে তাঁতিয়া তোপীকে পরাস্ত করেছেন। তারপর চূড়ান্ত আঘাত হেনেছেন ঝাঁসির ওপর। সে আঘাত প্রতিহত করবার মতো সামরিক সামর্থ্য ছিল না লক্ষ্মীবাঈয়ের। কিন্তু শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যুদ্ধ করে সেই যুবতী রানী বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন, ভারতের বীরাঙ্গনাদের সার্থক উত্তরসাধিকা তিনি। স্যার হিউ রোজ নাকি শিরস্ত্রাণ খুলে মৃতা রানীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন।

নানাসাহেব পলাতক, তাঁতিয়া তোপী পরাস্ত, বিহারের বিদ্রোহী নেতা কুনোয়ার সিং, কাশীর বিদ্রোহী নেতা গুমান সিং—দুজনেই নিহত। লক্ষ্মীবাঈও যুদ্ধ করে প্রাণ দিলেন। নেতৃত্বের অভাবে জীবিত বিদ্রোহী সেপাইরা এখন বিভ্রান্ত, দিশেহারা। আগ্রা, কানপুর, মীরাট, বেরিলি, এলাহাবাদ, আরা, দানাপুর, কাশী—সর্বত্র আবার কায়েম হয়েছে বৃটিশ প্রভুত্ব।

এখন বাকি শুধু দিল্লী।

শম্ভুচাঁদ বললে, আমার তো মনে হয়, দিল্লীর দখল ফিরে পেতে রীতিমতো ধকল পোয়াতে হবে কোম্পানিকে।

হরিশ বললে, যত ধকলই পোয়াতে হোক, দিল্লীর দখল না নিয়ে এখন আর ওদের উপায় নেই।

কোম্পানির সরকার না বাহাদুর শা-র সরকার—এরকম কোনো প্রশ্নের অবকাশ থাকতে দেওয়া যে ওদের পক্ষে কতখানি বিপজ্জনক, তা ওরা ভালোভাবেই জানে। আশ্চর্য ব্যাপার শম্ভু, এখানকার ইংরেজরা ক্ষমাশীলতার অপরাধে ক্যানিং সাহেবের শ্রাদ্ধ করচে, তিলকে তাল করে রিপোর্ট পাঠাচ্চে ইংল্যাণ্ডে, অথচ তাদের নিজের জাতের নৃশংসতা যে অভিধানের সমস্ত বিশেষণকে ছাপিয়ে গেচে, তার কোনো জবাবদিহি নেই! আমাদের এদেশের মানুষ চূড়ান্ত নৃশংস আচরণে অভ্যস্ত নয়, এ কথা পৃথিবীর ইতিহাসে স্বীকৃত। এদেশে যুদ্ধের সময়েও কতগুলো নীতির বিধান আছে। হ্যাঁ, আমি স্বীকার করি, কানপুরের ঘটনা আমাদের মুখে চুনকালি লেপে দিয়েচে, বেপরোয়া উচ্ছৃংখল সেপাইদের আরো কিছু কিছু আচরণে ভারতবাসীর সেই সুনাম প্রচণ্ডভাবে কলঙ্কিত হয়েচে। কিন্তু সে রকম ঘটনার সংখ্যা কত? তার তুলনায় সাদা চামড়ার বর্বরতা পর্বতপ্রমাণ। সাদা-চামড়ার সভ্যতা-সংস্কৃতি নিয়ে উন্নাসিকতায় ওদের মাটিতে পা পড়ে না অথচ মধ্যযুগের ইতিহাসে দ্যাখো, নির্মম নৃশংস্যতায় ওরা জঙ্গলের জানোয়ারদেরও হার মানিয়েচে। রোমান ক্যাথলিক আর প্রোটেস্ট্যান্টদের বিরোধে নিজেদের ভেতরেই ওরা রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়েচিল। পর্তুগীজ আর স্প্যানিয়ার্ড জলদস্যুরা সারা দুনিয়াময় যা করে বেড়িয়েচে সেটা কোন্ সভ্যতা-সংস্কারের নমুনা? তাদের কথা ছেড়েই দাও, স্পেন আক্রমণের সময় কী করেচিল সেনাপতি মারমণ্ট? সক্ষম পুরুষদের একজনকেও বেঁচে থাকতে দেওয়া হয়নি। বারো থেকে তিরিশ বছর বয়েস পর্যন্ত স্ত্রীলোককে সৈন্যশিবিরে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করা হয়েচে। কিশোরী মেয়েরা পর্যন্ত রেহাই পায়নি। কী ঘটেচিলো প্রথম ফরাসী বিপ্লবে? শরণার্থীদের আশ্বাস দিয়ে তারপর নির্মমভাবে একে একে তাদের প্রত্যেককে হত্যা করা হয়েছে। গত কয়েকশো বছরে য়ুরোপের ইতিহাস থেকে অজস্র নিদর্শন তুলে ওদের দেখানো যেতে পারে যে বর্বরতা আর নৃশংসতায় কালা আদমিরা এখনো পর্যন্ত সাদা আদমিদের অসাধারণ কৃতিত্বকে অতিক্রম করে যেতে পারেনি। আমাদের এদেশি সেপাইদের নিষ্ঠুর আচরণগুলোকে আমি সমর্থন করচি নে, কিন্তু সেই একই অপরাধে হাজারগুণ বেশী অপরাধী হয়েও সাদা চামড়ার দল যখন নিতান্ত নির্লজ্জভাবে কালা আদমির বিরুদ্ধে প্রচারের ঢাক বাজিয়ে কানে তালা লাগিয়ে দিচ্চে তখন আর চুপ করে থাকা অসম্ভব। আরো জোরে চেঁচিয়ে ওদের কাছে জানতে ইচ্ছে করে, আমেরিকায় কী করেচিলো সুসভ্য শ্বেতাঙ্গ ব্রিটিশ? কী করেচে তারা আফ্রিকায়, ওয়েস্ট ইণ্ডিজে? একজন শ্বেতাঙ্গিনী হয়েও কেন মিসেস হ্যারিয়েট বীচার স্টো চোখের জলে লিখলেন আংকল টম্‌স কেবিন?

একটু থামলে হরিশ। উত্তেজনায় তখন সে হাঁপাচ্ছে।

মৃদুস্বরে শম্ভুচাঁদ জিজ্ঞেস করল, এ-প্রসঙ্গে আপনি কি কিছু লিখচেন?

—নিশ্চয়ই। সামনের হপ্তার পেট্রিয়টে জায়গা নেই, কিন্তু জুলাইয়ের প্রথম হপ্তার সংখ্যায় ওদের এই ফাঁপা ঢাকের বাদ্যির জবাব আমাকে দিতেই হবে। একটু একটু করে অধিকার ফিরে পাওয়ার পর উত্তরভারতে এখন সাদা চামড়ার তাণ্ডব শুরু হয়েচে। প্রতিহিংসার নিষ্ঠুরতা যে ভয়ংকরের চেয়েও কত ভয়ংকর হতে পারে, সেটা বুঝিয়ে দেওয়ার অনুষ্ঠানে তারা কোনো ত্রুটিই রাখচে না। কয়েক হপ্তা আগে যমুনা নদীর পাড়ে বিদ্রোহীদের ঘাঁটি সন্দেহ করে একটা জাঠ গ্রাম ঘিরে ফেলেচিলো ব্রিটিশ বাহিনী। তাদের সেনাপতি ক্যাপ্টেন পণ্ড। সে গ্রামের অধিবাসী প্রায় চারশো পুরুষ মানুষকেই বেয়নেটের খোঁচায় চিরকালের মতো চুপ করিয়ে দিয়েচে সেই হিংস্র ক্যাপ্টেন। অযথা বন্দুকের গুলি আর খরচ করেনি। তারপর গ্রামের মেয়েদের ওপর লেলিয়ে দিয়েচে সাদা চামড়া সেপাইদের। একটা মেয়েও ইজ্জৎ বাঁচাতে পারেনি। আট-দশ বছর বয়েসের মেয়েগুলোর পরনের পোশাক রক্তে ভিজে গেছে, নিষ্পাপ মেয়েগুলো অসহ্য যন্ত্রণায় নিজের দেহের রক্তের ওপরই শুয়ে শেষ নিশ্বাস ফেলেচে। ক্যাপ্টেন পণ্ড তো একটা ছোটোদরের সেনাপতি, কিন্তু স্যার হিউ রোজ? যিনি নাকি রানী লক্ষ্মীবাঈয়ের বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে মাথার টুপি খুলে বীরাঙ্গনার মৃতদেহের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানিয়েচিলেন, সেই রোজ সাহেবেরই নির্দেশে মেজর গল নামে আর

একজন সেনাপতি আর একটা গ্রাম আক্রমণ করেচিলেন। ক্যাপ্টেন পণ্ডের সঙ্গে তাঁর কোনো পার্থক্যই নেই, বরঞ্চ তিনি আর একটু বেশি কৃতিত্বই দেখিয়েচেন। হত্যা, ধর্ষণ সব মিটে যাওয়ার পর তিনি আগুন লাগিয়ে গ্রামটাকে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছেন। আর, এই বিরাট কৃতিত্বের জন্যে স্যার হিউ রোজকে অভিনন্দন জানাতে গিয়ে আহ্লাদে একেবারে বেসামাল হয়ে পড়েচে ইংলিশম্যান। এর পরেও যদি পেট্রিয়টের পৃষ্ঠায় ওদের ধিক্কার না দিতে পারি তাহলে হাতে কলম নিয়ে লাভ কী? সব কটা ঘটনার বিবরণই আমি দেবো শম্ভু। ক্যানিং সাহেব জানুন, তাঁর বীর সেনাপতিরা কতখানি বীরত্ব ফলাচ্চেন, ইংলিশম্যান আর হরকরার দল জানুক, পেট্রিয়ট লুপ্ত হয়ে যায়নি—হরিশ মুখুজ্যে এখনো বেঁচে আছে।

রুক্মিণী ঘরে ঢুকলেন।

—ওরে হরিশ, রাত কত হয়েচে, সে খেয়াল আচে? ছেলেটা সেই কোথায় কোন্ মুলুকে বাড়ি ফিরবে, ওকে এবার ছেড়ে দে বাবা।

পকেট ঘড়িটা বের করে দেখে একটু অপ্রতিভ স্বরে হরিশ বললে, তাই তো, রাত প্রায় সাড়ে ন'টা বাজে। না, না, তোমার আর দেরি করা ঠিক নয়। তুমি রওনা হয়ে যাও—

—আশ্চর্যি নোক বটে তুই। নিজের বাড়ি থেকে অমনধারা কেউ বলে যে, তুমি যাও?

হরিশ লজ্জিতভাবে বললে, তাই তো।

রুক্মিণী বললেন, বাইরে ঝম্‌ঝম্ করে জল পড়চে, তাও তো তোর হুঁশ নেই।

—তাই তো! —জানালার কাছে গিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখে তার পর অপ্রস্তুতভাবে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে হরিশ বললে এখন কী করা যায় মা?

রুক্মিণীর মুখে ফুটে উঠলো সস্নেহ' আত্মপ্রসাদের হাসি। তুমি যে কী করবে বাবা, তা আমার ভালোই জানা আচে। দেশের নোক নাকি তোকে মাথায় করে নাচ্‌চে, ইদিকে সংসারের একটা তুশ্চু সমিস্যে হলেও তুই কাহিল। সে যাই হোক, একটু আগে হারাণ বাড়ি ফিরতে সেই পায়েই তাকে আমি একখানা ছক্কর গাড়ি ধরে আনতে পাঠিয়েচিলুম। গাড়ি এসে গেচে।

হরিশ হেসে বললে, সব ব্যবস্থা যখন করেই ফেলেচো মা, তখন আমাকে আর মিছিমিছি বকুনি দিয়ে লাভ কী?

আত্মপ্রসাদের হাসিতে আরো উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো রুক্মিণীর মুখ। শুধু পুত্রগর্বে গর্বিতা বলেই নয়, দেশজোড়া নাম যে ছেলের, তাকে এখনো বকুনি দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন তিনি।

শম্ভুচাঁদের দিকে তাকিয়ে রুক্মিণী বললেন, দেখচো তো বাবা, তোমার কলম-চালানো গুরুর আক্কেলের নমুনা? নিজের বাড়ি থেকে 'যাও' একথা বলতে নেই, তবু রাত হয়ে যাচ্চে, তার ওপর আকাশের গতিক তেমন ভালো নয়, বেশি রাত হযে গেলে তোমার বাড়িতে সবাই চিন্তা করবেন। তুমি কিন্তু মাঝে মাঝে এসো বাবা। আর, হরিশকেও আজকের মতো এমনি জোর করেই নিয়ে এসো। নইলে কোনদিনই নিশুত রাতের আগে ও বাড়ি ফিরবে না।

রুক্মিণী বেরিয়ে গেলেন।

মা বেরিয়ে যাওয়ার পর হরিশ হেসে বললে, যাক, পেট্রিয়টে সহকারীর পদটা ছাড়াও মায়ের কাছে প্রথম দিনেই পাইকের চাকরি একটা পেয়ে গেলে।

—মা তো ঠিকই বলেচেন দাদা।

—তাঁর পক্ষে ঠিক, কিন্তু আমার পক্ষে মুশকিল হে। তিনি দেখচেন তাঁর স্নেহের স্বার্থ, আর আমাকে দেখতে হয় আমার সন্তানের স্বার্থ। আমি রোজ বিকেলবেলায় ঘরে এসে বসে থাকলে আমার সন্তানের খোরাক জোগাবে কে? যাকগে, তোমাকে আর দেরি করিয়ে দেবো না। তবে কিনা, মাতৃদেবীর ওই আদেশটি যেন আবার ঘন ঘন পালন করতে যেয়ো না, তাতে অসুবিধের পড়বে।

শম্ভুচাঁদকে ভাড়াটে ছ্যাকরা গাড়িতে তুলে দিয়ে হরিশ আবার তার ঘরে ফিরে এলো। জুলাই-এর

প্রথম সপ্তাহে উত্তর ভারতের বৃটিশদের অত্যাচার সম্বন্ধে যে প্রবন্ধটা ছাপা হবে বলে শম্ভুচাঁদকে সে বলছিল, সেটা লেখা আরম্ভ হয়েছে। তবে এখনো কিছুটা বাকি। যা সময় আছে, তাতে এখনো বেশ কিছুক্ষণ লেখাপড়া করা যাবে।

কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে মদের গেলাসে কয়েকটা চুমুক দিয়ে সবে হরিশ কলম হাতে বসেছে, এমন সময় পেছন থেকে ছোটবৌয়ের গলার সাড়া পেয়ে সে অবাক হয়ে গেল। ছোটবৌ তো এ ঘরে কখনো ঢোকে না।

—হ্যাঁ গা, তুমি কি নেকাপড়া নিয়ে বসচো?

কঠিন মুখে গম্ভীরস্বরে হরিশ বললে, হ্যাঁ।

ছোটবৌ আরো কিছুটা কাছে এগিয়ে এলো। বললে, একটুখানি জিরিয়ে নিলে হত না?

কণ্ঠস্বরটা হরিশের কাছে যেন একেবারেই অচেনা বলে মনে হল। আজ এতবছরের ভেতর ছোটবৌয়ের মুখে এই স্নিগ্ধ অনুনয়ের সুরে একটা কথাও তো সে কখনো শোনেনি। কবে সেই কোন অতীতে একজনই মাত্র এই সুরে কথা বলতো।

ছোটবৌ আরো কাছে এসে একটু ম্লান হেসে বললে, ঠাকুরপোর সঙ্গে তোমার কথাবার্তা কিছু কিছু শুনেচি। তুমি সারা দেশের কত মুনিষ্যির কথা চিন্তে করো। কিন্তু কই, বাড়ি ফিরে একবারও তো কাউকে শুধোলে না, আবাগী ছোটোবৌটার যে ব্যামো হয়েচিলো, সে আজ কেমন আচে? ছোটো ভাই বলে যেনাকে আজ পেথথম বাড়িতে নিয়ে এলে, তেনার সামনে তোমাকে নাকাল হতে হল।

হরিশ কিছুই বলতে পারছে না। তার এতদিনের অভ্যস্ত সব হিসেবের অঙ্কগুলো কেমন যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। এত স্নিগ্ধ স্বরে কথা বলতে পারে এই ছোটবৌ? স্বামীর অপ্রস্তুত অবস্থা তার মনে ব্যথা দিয়েচে।

ছোটবৌ বললে, আমি তোমাকে বাধা দিতে আসিনি গো। তুমি নেকো। আমি ভালোই আচি, আজ অন্নপত্যি করেচি।

প্রস্থানোদ্যতা হল ছোটোবৌ।

হরিশ কেমন যেন বিহ্বলভাবে ডাকলে, ছোটোবৌ।

নীরবে ফিরে দাঁড়ালে ছোটো.বৌ।

তুমে ঠিকই বলেচো। সত্যিই আমার অন্যায় হয়েচে।

এবার বিস্ময়ের পালা ছোটোবৌয়ের। [illegible]টরে বসা রুগ্ন চোখে সে ফ্যাল ফ্যাল করে হরিশের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

॥ সাত ॥

১

কোম্পানির কলকাতা এতদিনে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে।

দিল্লী আবার দখল করেছে কোম্পানীর ফৌজ। বাদশা বাহাদুর শা বন্দী। সেপাইগুলো রণে ভঙ্গ দিয়ে প্রাণ বাঁচাতে এখন যে যেদিকে পারে পালাচ্ছে। বিদ্রোহের আগুন নিবেছে।

কলকাতার শ্বেতাঙ্গ-সমাজ খুশিতে ডগমগ। যারা ক্লেমেন্সি ক্যানিংয়ের মেয়েলিপনায় ক্ষেপে গিয়ে তাঁকে সরিয়ে নেওয়ার জন্যে ইংল্যাণ্ডে পিটিশন পেশ করেছিল, তারা এখন নিশ্চিন্ত হলেও পুরোপুরি খুশি হতে পারেনি। তারা আরো কিছু চায়। বর্বর নেটিব সেপাইগুলো এই প্রায় পনেরো মাস ধরে যে বেয়াদপি করেছে, তার যোগ্য শাস্তি তো তাদের দেওয়াই হয়নি। এদেশের কোটি কোটি নেটিব নিগারকে ধরে ধরে একেবারে খতম করে দিতে পারলে তবু কিছুটা শান্তি পাওয়া যায়। শয়তানগুলো বুঝুক যে, দুনিয়া শাসন করবার জন্যেই বৃটিশ জাতির জন্ম—কোনো

কালা আদমির বেয়াদপি তারা বরদাস্ত করে না। কিন্তু প্রাণভরে তেমনিভাবে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার সুযোগ কোথায়? দয়াবতী ক্যানিং যে গবর্নর জেনারেল্। পাজি বদমাশ বিদ্রোহীদের তালুক-মুলুক বাজেয়াপ্ত করে নেওয়ার হুমকি জারি করেই লোকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে।

উত্তপ্ত আলোচনা চলছে কলকাতায়, চলছে লণ্ডনে। নতুন রূপকথার রাক্ষস-রাক্ষসীর চরিত্রে নতুন নাম—মঙ্গল পাণ্ডে, নানাসাহেব, তাঁতিয়া তোপী, আজিমুল্লা, কুনোয়ার সিং, লক্ষ্মীবাঈ।

নতুন বিল নিয়ে ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্টে উঠেছে বিপুল বাদ-প্রতিবাদের ঝড়। বৃটিশ-ভারতের শাসন ব্যবস্থা কি এখনো ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাতেই থাকবে, না কি তার একটা পরিবর্তন দরকার?

এই সময়েই একদিন সন্ধ্যেবেলার কথা।

জোড়াসাঁকোর সিংঘিবাড়িতে কালীপ্রসন্ন আর শম্ভুচন্দ্র বিশেষ একটা আলোচনায় ব্যস্ত। আলোচনার বিষয়বস্তু হল বিদ্যোৎসাহিনী সভার পরবর্তী নাটক। বিক্রমোর্বশী করবার পর যে সুনাম পাওয়া গেছে, তার বজায় রাখতে গেলে বেশ ভেবেচিন্তেই এগোতে হবে।

কালীপ্রসন্ন বললে, দ্যাখো বাপু, বেণীসংহারে বেচারা ভট্টনারাণকে সংহার করে নাটকের ঘট-স্থাপন করেচি। লোকের কাছে বাহবা পেয়ে মাথা ঘুরে গেল। সিংঘির বাচ্চা তো? ভাবলুম, এবার কেশর গজিয়ে গেচে। তাই তর্করত্ন মশাইকে না ডেকে নিজেই কলম ধরে কালিদাস-বধে উদ্যোগী হলুম। সেটাও নির্বিঘ্নে সমাধা করেচি। লোক আরো বেশি তারিফ করলে দেখে এখন একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেচি হে। এরপর কোন মহাকবির শ্রাদ্ধ করে রাতারাতি 'স্যার' খেতাবটা পেয়ে যাবো, তাই তো বুঝে উঠতে পারচি নে!

শম্ভুচাঁদ বললে, বিনয়ের একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্চে না হে? তোমার অনুবাদ আর অভিনয়—দুটোই তারিফ করবার মতো হয়েচিলো বলেই লোকে তা করেচে।

—আরে বাবা, দিশি-বিলিতি সব সাহেবদের আচ্ছা করে শেরি-শাম্পিন খাইয়েছি। তারপরেও তারিফ না করে চলে যেতে পারে? চক্ষু না থাকলেও চক্ষুলজ্জা বলে একটা কথা আছে তো?

শম্ভুচাঁদ সঙ্গে সঙ্গে বললে, আর যার সম্বন্ধেই ও কথা খাটুক, আমার গুরুজীর সম্বন্ধে আশা করি ও কথা তুমি বলবে না?

আয়ত চোখ দুটিকে বিনীত শ্রদ্ধায় ভরিয়ে কালীপ্রসন্ন বললে, না শম্ভু, তাঁর সম্বন্ধে ও রকম কোনো চিন্তে করাও মহাপাপ। হরিশ মুখুজ্যে কারো তোয়াজ করে কথা বলেন না তা কি আমি জানিনে? তাঁর মতো নমস্য ব্যক্তি যে মাঝে মাঝে বিদ্যোৎসাহিনী সভার আমন্ত্রণে আসেন, তাতে আমি অন্তত নিজেকে ধন্য মনে করি।

—তোমার বিক্রমোর্বশী নাটকের যে সমালোচনা পেট্রিয়টে বেরিয়েছিল, তাতে তিনি মুক্তকণ্ঠেই তোমার প্রয়াসকে সাধুবাদ দিয়েছেন।

—জানি। সেই সঙ্গে সর্বসাধারণের জন্যে একটা রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করা যায় কি না, সে সম্বন্ধেও সকলকে চিন্তে করতে অনুরোধ জানিয়েচেন। তাঁর এই প্রস্তাবটা আমার ভালো লেগেচে। তখন থেকেই ভেবে রেখেচি, কেউ যদি এ ব্যাপারে উদ্যোগী হন, তাঁর সঙ্গে আমি যথাসাধ্য সহযোগিতা করবো।

—সে তো পরের কথা। তুমি বিশ্বাস করো, গুরুজীর সঙ্গে আমার পরিচয়ের পরে বেশ কয়েকবার তোমার বিক্রমোর্বশীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা তাঁর মুখে আমি শুনেছি। এমনিতেও তোমার প্রশংসায় তিনি পঞ্চমুখ।

—আমার সৌভাগ্য।

—সত্যি কথা বলতে কি, একে তোমার এমন কন্দর্পকান্তি চেহারা, তার ওপর ঝলমলে সাজপোশাকে রাজা পুরুরবা সেজে তুমি যখন স্টেজে এলে, তখন কারো সাধ্যি ছিল না যে তোমাকে ছেড়ে আর কোনোদিকে চোখ ফেরায়।

মুচকি হেসে কালীপ্রসন্ন বললে, উর্বশীর দিকেও নয়? তাহলে বুঝতে হবে নিতান্তই অরসিক দর্শকের সমাবেশ হয়েচিলো। তুমি যে হোঁৎকা অরসিক, সে তো আমার জানাই আচে। সে যাই হোক, গোড়ার দিকে তুমি না হিন্দু ইনটেলিজেন্সার পত্রিকায় লিখে হাত মকশো করেচো? এখন হরিশ মুখুজ্যেকে গুরুজী বলে মানো, কেমন?

নিশ্চয়ই। কিন্তু তার সঙ্গে তোমার নাটকের কী সম্বন্ধ?

—সম্বন্ধ নাটকের নয় হে, চেহারার। —মুচকি হাসিটাকে আরো শাণ দিয়ে কালীপ্রসন্ন বললে, হিন্দু ইনটেলিজেন্সারের এডিটর কাশীপ্রসাদবাবুকে তুমি যে চোখে দ্যাখোনি তা তো নয় বাবা। তার ওপর, যে হরিশ মুখুজ্যে কারো তোয়াককা করে কথা বলেন না, সেই গুরুর কাছে নাড়া বেধে আমারই বাড়িতে বসে বলে দিলে, কালী সিংঘি কন্দর্পকান্তি? বেণেবাবুদের মোসায়েব হলে ওটা মানাতো।

এতক্ষণে রহস্যটা বুঝতে পেরে অপ্রতিভ হয়ে গেল শম্ভুচাঁদ। সেই সঙ্গে তার মুখও গম্ভীর হয়ে গেল। কালীপ্রসন্নর চেহারা যে অতীব সুন্দর, এ কথা সবাই বলে। সে তো মোসায়েবি করবার জন্যে বলেনি।

শম্ভুচাঁদের গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়েই গাম্ভীর্যের কারণটা ধরে ফেলেছে কালীপ্রসন্ন। সমস্ত পরিবেশটাকে নিতান্ত হালকা করে দেওয়ার জন্যে বললে, অমনি বঙ্গপঞ্চমুখশ্রী হয়ে গেল?

—তার মানে?

—বাঙলা পাঁচের মতো মুখ। কন্দর্পকান্তি যদি বলতে হয়, তাহলে বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ। এটা স্বীকার করো?

—হ্যাঁ, তা স্বীকার করি। এই বয়েসেও অত রূপ নজরে পড়ে না।

—পথে এসো বাবা! আরে, আমি তো রাজপোশাকের ময়ূর পুচ্ছ ধারণ করে পুরূরবার পেখম মেলেছিলুম। জোরজবরদস্তির কন্দর্পকান্তি আর কি। ওদিকে সেই আসল কন্দর্প যে বিনি মেকআপেই সামনের সারি আলো করে বসে নাটক দেখছিলেন, তা জানো? আমার অবস্থা তখন কতখানি সঙ্গীন তা আর কেমন করে বোঝাবো? যতবারই তাঁর দিকে চোখ পড়চে, ততবারই মনে হচ্চে, আমিই উর্বশী হয়ে তাঁর প্রেমে পড়ে যাই।

—উর্বশী-বিলাপ, কি বলো. হো হো করে হেসে উঠলে শম্ভুচাঁদ।

—বিলাপ নয় হে, প্রলাপ। যখনই তাঁর দিকে চোখ পড়চে তখনই মনে হচ্ছে এই বুঝি পাট গুলিয়ে গেল। পুরূরবা সেজে আমারই যদি এই অবস্থা হয় তাহলে উর্বশীর পার্ট যে করেচিলো তার অবস্থাটা একবার ভেবে দ্যাখো দিকি?

শম্ভুচন্দ্র বললে, সত্যিই আশ্চর্য লাগে, বয়েসের ছোঁয়া তো বেশ যা হোক লেগেচে কিন্তু চেহারায় তার যেন কোনো ছাপই পড়েনি!

—মনটাও তাজা আছে হে। মনের কথা খুলে বলা যাবে না দেখে গত বছর ক্যানিং সাহেবের প্রেস ল চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এতদিনের পত্রিকা নিজেই উনি বন্ধ করে দিলেন। যদিও আমাদের উর্দু দূরবীণ বন্ধ করতে হল, তবুও আমার মনে হয় লালমুখোদের ইংলিশম্যান, হরকরা, ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া আর ঢাকা নিউজ মিলে যে বিলিতি বাঁদরামি শুরু করেচিলো তাতে ওদের ভাষায় ওই 'গ্যাগিং অ্যাকট' চালু না করে ক্যানিং সাহেবের উপায় ছিল না। ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়ার-এডিটর সাহেবকে তো গোরা সেপাই দিয়ে আপিস থেকে জোর করে টেনে বের করে দিতে হয়েচিলো, তা জানো তো?

—হ্যাঁ, গুরুজীর কাছে শুনেচি। কিন্তু গ্যাগিং অ্যাকটকে এখন গ্যাগ করে রেখে নাটকে কী করবে, তাই বলো।

কালীপ্রসন্ন বললে, নাটুকে কামারের ভূমিকায় যখন অবতীর্ণ হয়েচি তখন মহাকবিদের

একজনকেই বারবার বলি না দিয়ে এক-একবার এক-একজনকে ধরে হাড়িকাঠে ফেললে কেমন হয়? এবার ভাবচি ভবভূতি নিধন হোক।

—উত্তম প্রস্তাব। সর্বজীবে সমদৃষ্টির মতো একটা ভালো দৃষ্টান্তও স্থাপন করা হবে। তাছাড়া, রাজায় রাজায় যুদ্ধ হওয়ার আশঙ্কাও রইলো না।

—অস্যার্থ?

—পাইকপাড়ার সিংঘি রাজারা তো বেলগেছিয়া ভিলায় তোড়জোড় করে রত্নাবলী নাটকের মহলা শুরু করে দিয়েছেন। সেখানেও অনুবাদক ওই নাটুকে রামনারায়ণ।

—শুধু এইটুকু খপরই জানো? আর কিছু শোনোনি?

—আর কী খপর?

—আছে হে, আছে। —আবার মুচকি হেসে কালীপ্রসন্ন বললে, এইখানেই জমিদারে প্রজায় তফাৎ বুঝলে? তুমি শম্ভু মুখুজ্যে প্রজার জাত, আর আমি আঠারো বছরের ছোঁড়া কালী সিংঘি হলুম জমিদার। জানো তো, ধেড়ে কেউটের চেয়ে ছানা কেউটের তেজ বেশি? চারভিতের খপরাখপর না রাখলে জমিদারের চলে? শোনো, পাকপাড়ার আর যেটুকু খপর জোড়াসাঁকোয় এয়েচে, তাতে জানা যাচ্ছে, বাঙলা রত্নাবলীর ইংরিজি অনুবাদের দায়িত্ব এমন একজনের উপর ন্যস্ত হয়েচে, যাঁর চেয়ে যোগ্য ব্যাক্তির কথা ভাবাই যায় না।

—কে সেই ব্যক্তি?

—মাইকেল মধুসূদন দত্ত। এই মাত্র অল্প কয়েকদিন আগেই ব্যাপারটা ঠিক হয়েচে। বাবু গৌরদাস বসাক, বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্তির—এঁদের পরামর্শেই পাকপাড়ার বড়ো রাজা দত্তজাকে এই কাজের ভার দিয়েচেন। জানতে এ খপর?

শম্ভুচাঁদ বললে, না। প্রজা-জাতীয় এই অকিঞ্চনের কানে এ খপর এর আগে পৌঁছয়নি, তা স্বীকার করচি।

কালীপ্রসন্ন বললে, যা হোক নিতান্ত বন্ধুজন বলে ক্ষমা করে দিলুম।

শম্ভুচাঁদ হেসে বললে, হুজুর বাহাদুরের অসীম দয়া। এখন খপরটা শুনে হুজুর বাহাদুরের কাছে আমার একটা নিবেদন আছে। আমার তো মনে হচ্ছে, নাটক অভিনয়ের আগে এইরকম ইংরিজি তর্জমা করিয়ে নেওয়া খুবই দরকারি। যাঁরা বাঙলা বোঝে না, তাঁদের পক্ষে রসগ্রহণে খুব সুবিধে হয়।

—সেই উদ্দেশ্যেই তো ওখানে তর্জমার কাজটা করানো হচ্ছে। লাটবাহাদুর, সুপ্রীম কোর্টের জজ থেকে শুরু করে নীচের তলার ইদ্রুস-পিদ্রুস কত লালমুখো দর্শকই আসবেন। তাঁদের হাতে আগেই একখানা করে ইংরিজি রত্নাবলী গুঁজে দেওয়া হবে।

—তুমিও পরবর্তী নাটকের সময় এরকম একটা ব্যবস্থা করো না হে।

—না শম্ভু, আমি সেটা করবো না।

—কেন, আপত্তি কিসের?

—বাঙলা নাটকের অভিনয় দেখতে যাঁরা আসবেন, তাঁরা বাঙলাভাষা বোঝবার আগ্রহ নিয়েই আসুন। তাতে যতটুকু বুঝতে পারেন বুঝবেন। বড়োজোর, কাহিনীর একটা সারাংশ ইংরিজিতে করে দিতে পারি। সে-রকম ব্যবস্থা আমি আগেও দু'বার করেচি, তা দেখেচো। কিন্তু গোটা নাটকের ইংরিজি তর্জমা? নৈব নৈব চ।

মুচকি হেসে শম্ভুচাঁদ বললে, কেন হে জমিদারবাবু, পাইকপাড়ার অনুকরণ হয়ে যাবে বলে জোড়াসাঁকোর ভয় নাকি?

—না শম্ভু, তা নয়। পাকপাড়ার বড়োরাজা, ছোটোরাজা দুজনেই আমার শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁদের কোনো সৎকাজের আদর্শকে অনুসরণ করতে হলে আমি কখনোই তা অসম্মানজনক মনে করবো না। তাঁদের দু'ভাইয়ের হাতে এই ক'বছরে বেশ কিছু সৎকাজ হয়েচে। রত্নাবলীর প্রসঙ্গে

এই কাজটাকেও আমি অসৎ বলচিনে। আমার আপত্তির কারণ অন্যত্র। বাঙলা আমাদের মাতৃভাষা। ঐশ্বর্য সম্পদে ইংরিজির তুলনায় আমাদের মাতৃভাষার দৈন্য থাকতে পারে, কিন্তু তাই বলে একেবারে দীনহীনাও তো নয়? আমাদের কৃত্তিবাস, কাশীরাম, কবিকঙ্কণ, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, কমলাকান্তও তো রয়েচে? তুলনায় দরিদ্র হলেও আমাদের মাতৃভাষার একটা নিজস্ব সম্মান আচে। সাহেব অতিথিদের খুশি করবার জন্যে বাঙলাভাষাকে অপমান করতে আমি পারবো না। বলতে পারো, এটা আমার একরকম জেদ।

শম্ভুচাঁদ অপলকদৃষ্টিতে কয়েকমুহূর্ত কালীপ্রসন্নের দিকে তাকিয়ে থেকে তারপর বললে, হিন্দু কলেজের একজন ছাত্রের মুখে কথাটা হঠাৎ কেমন যেন বেসুরো শোনাচ্চে।

মুহূর্তের ভেতরেই কালীপ্রসন্ন আবার তার স্বভাবসুলভ পরিহাস-রসিকতার জগতে ফিরে এলো। হাসতে হাসতেই সে বললে, হিন্দু কালেজের ও'চা পড়োদের নামের একটা লিস্টি আচে, তা জানো? সেটা দেখলেই সবচেয়ে ওপরে উজ্জ্বল অক্ষরে যে নামটা পাবে, তা হল কালীপ্রসন্ন সিংহ। তারপরেও এই বেসুরো দুর্মতি যদি আমার মাথায় না চাপে তাহলে ধরে নিতে হবে, স্বয়ং দুর্মতিদেবীরই ভীমরতি হয়েচে।

শম্ভুচাঁদ সে-রসিকতায় হেসে উঠলে বটে, কিন্তু কালীপ্রসন্নের এই বাঙালিয়ানার জেদটা তার একেবারে অজানা নয়। যে ইচ্ছে করলেই কলকাতার সবচেয়ে সেরা সাহেবদর্জির দোকানে হুকুম পাঠিয়ে বহুদামী হ্যাট, কোট কিম্বা চাপকান করিয়ে নিতে পারে, কিন্তু তার সারাক্ষণের পোশাক ধুতি, কামিজ, চাদর আর চটি। সহজ, সরল, অনাড়ম্বর।

কালীপ্রসন্নের এটাও হয়তো একটা জেদ।

তার পুরোপুরি দিশি পোশাক সম্বন্ধে কেউ কখনো জিজ্ঞেস করলে বলে, আরে বাবা, হিম্মতে তো বিদ্যেসাগরের নখের যুগ্যিও হতে পারবো না, তাই পোশাকে একটু নকল বিদ্যেসাগর হওয়ার চেষ্টা করচি আর কি।

—কি হে বিশুদ্ধ হিন্দু মেট্রোপলিটন, চুপ মেরে গেলে যে? ভয় নেই হে শম্ভু, ভয় নেই। ক্যাপ্টেন রিচার্ডসনের কাছে শেক্‌স্‌পীয়র পড়ে এয়েচ, তোমাদের মাথায় আমার মতো এ দুর্মতি ভর করতে সাহস পাবে না।

—খাসা বলেচো, বিশুদ্ধ হিন্দু মেট্রোপলিটন। হাসতে লাগলো শম্ভুচাঁদ, তাও যদি কালেজটা টিকে থাকতো।

শম্ভুচাঁদের কথার একটা পটভূমি আছে।

বছর পাঁচেক আগেকার কথা। একটি ছেলেকে হিন্দু কলেজে ভর্তি করবার প্রসঙ্গ নিয়ে হৈহৈ পড়ে গিছেছিল কলকাতায়। ছেলেটি আর কারো নয়-কলকাতার নামজাদা বাঈজী হীরা বুলবুলের। পরমা রূপসী হীরা বুলবুল টাউন কলকাতার বহু ধনী বাবুকেই গান শুনিয়েছে, দেহসঙ্গ দিয়েছে। তাঁদের অনেকেই হিন্দু সমাজের সমাজপতি। তাই ছেলেকে হিন্দু কলেজে ভর্তি করতে কোনো বাধা আসবে, তা কল্পনাই করতে পারেনি হীরা। কিন্তু বাধা তো নয়, একেবারে ঘূর্ণিঝড়। একদিকে এডুকেশন কাউন্সিল, অন্যদিকে হিন্দু কলেজের ম্যানেজিং কমিটি। তর্ক-বিতর্কের ঝড় বয়ে যেতে লাগলো। ওরই ভেতর এডুকেশন কাউন্সিলের অনুমোদনে ছেলেটি ভর্তি হয়ে গেল হিন্দু কলেজে। আগুনে ঘি পড়লো।

ডিঙ্গেভাঙ্গা অঞ্চলের রাজেন দত্ত বা রাজাবাবু ছিলেন বিরোধীপক্ষের প্রধান সেনাপতি। তাঁরও জেদ চেপে গেল পুরোমাত্রায়। এই ঘটনার কিছুদিন আগেই দুশ্চরিত্রতার অভিযোগে হিন্দু কলেজ থেকে চাকরি গিয়েছিল ইংরিজির বিখ্যাত অধ্যাপক ক্যাপ্টেন রিচার্ডসনের। তাঁকেই অধ্যক্ষ করে সিঁদুরেপটিতে গোপাল মল্লিকের বিরাট বাড়িতে নতুন একটা কলেজ বসিয়ে দিলেন রাজাবাবু। নাম দেওয়া হল হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজ। নতুন কলেজকে হিন্দু কলেজের চেয়ে কোনোদিক দিয়েই তিনি কমতি যেতে দেননি। ক্যাপ্টেন রিচার্ডসনের মতো ইংরিজি সাহিত্যের

পণ্ডিত ভারতবর্ষে তখন কেউ নেই। তার ওপর অধ্যাপক হিসেবে তিনি নিয়ে এলেন উইলিয়ম কার্কপ্যাট্রিক, ক্যাপ্টেন পামার এবং উইলিয়ম মাস্টার্সের মতো খ্যাতনামা পণ্ডিত কয়েকজনকে। বাঙলার অধ্যাপক হিসেবে এলেন পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন।

রমরমিয়ে চলছিল রাজাবাবুর কলেজ। বলতে গেলে, কলেজের আর্থিক দায়-দায়িত্ব প্রায় সবটাই তিনি বহন করছিলেন। কিন্তু বছর পাঁচেকের ভেতরেই নেমে এলো দুর্বিপাক। কারবারে বহু লোকসান দিয়ে বসলেন রাজাবাবু। টান পড়লো কলেজের তহবিলে। হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজ উঠে গেল। সে আজ মাত্র কয়েকমাস আগের কথা।

রাজাবাবুর সেই কলেজেই পড়েছে শম্ভুচাঁদ।

কালীপ্রসন্নের রসিকতায় সাড়া দিলেও কয়েকমুহূর্তের জন্যে তার মন উন্মনা হয়ে গিয়েছিল। ওই কলেজে পড়বার দৌলতেই সে রিচার্ডসনের মতো অধ্যাপকের কাছে শেক্‌পীয়র পড়বার দুর্লভ সৌভাগ্য পেয়েছে। রাজাবাবুর দুই ছোটোভাই রমেশ আর সুরেশ ছিল তার সহপাঠী। তাদেরই চেষ্টায় রাজাবাবুর বিরাট লাইব্রেরিতে কত বই পড়বার সুযোগ জুটেছে তার। সুরেশই তাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল কাশীপ্রসাদ ঘোষের সঙ্গে। তারপর থেকে হিন্দু ইন্টেলিজেন্‌সারে লেখার সুযোগ সে পেয়েছে।

কালীপ্রসন্ন বললে, কি হে, মনটা খারাপ হয়ে গেল নাকি?

একটু ম্লান হেসে শম্ভুচাঁদ বললে, মন খারাপ হলে বেচারা মনকে নিশ্চয়ই দোষ দেওয়া যায় না। কালেজটা উঠে গেল। সে যাই হোক, আমাকে বিশুদ্ধ হিন্দু মেট্রোপলিটন বলে ফোড়ন কাটলে বটে, কিন্তু আমাদের অধ্যাপক মিস্টার কার্কপ্যাট্রিকের কাছেই তুমি বাড়িতে বসে ইংরিজি সাহিত্যের পাঠ নিয়েচো, সেটা নিশ্চয়ই তোমাকে মনে করিয়ে দিতে পারি?

কালীপ্রসন্নের মুখ থেকে ঠাট্টা রসিকতার ভাবটুকু নিমেষে দূর হয়ে আয়ত চোখ দুটিতে ফুটে উঠলো সসম্ভ্রম শ্রদ্ধার দৃষ্টি। সে বললে, আমি যদি কিছুমাত্র ইংরিজি শিখে থাকি, তার জন্যে মিস্টার কার্কপ্যাট্রিকের কাছে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ।

শম্ভুচাঁদ বললে, তুমি শুধু ভালো ইংরিজিই শেখোনি, তার সঙ্গে সংস্কৃত আর বাঙলাও যে মন দিয়ে শিখেচো। ওই একটা জায়গায় আমরা তোমার কাছে হেরে বসে আছি। সত্যিই তো, মাতৃভূমিকে ভালোবাসবো অথচ মাতৃভাষাকে অবহেলা করবো—তা কি হওয়া উচিত? তুমি বিশ্বাস করো ভাই, আমাদের মাতৃভাষাকে অমি অশ্রদ্ধা করিনে, কিন্তু অভ্যেসের দোষ এমন একটা জায়গায় এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েচে যে, এক কলম বাঙলা লিখতে গেলেও হয়তো ভুল করে বসবো।

—তোমার আন্তরিকতায় আমরা সন্দেহ করচি নে। তা সত্ত্বেও বলবো, এটা কিন্তু জাঁক করে বলবার মতো নয়।

—তা আমি জানি ভাই। আমি জাঁক করে বলচি নে; খোলা মনে আমার ত্রুটি স্বীকার করচি। এই আক্ষেপ আমার গুরুজীর মুখেও অমি শুনেচি। বাঙলা ভাষা সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক, তা তিনিও চান। কিন্তু নিজের অক্ষমতা মেনে নিয়ে সে-পথে পা দিতে তিনি সাহস পান না।

—দেশের ওপর তাঁর দরদ খাঁটি বলেই সে-কথা তিনি চিন্তা করেন। কিন্তু আমার কী মনে হয় জানো শম্ভু? হরিশ মুখুজ্যের বাঙলা লেখার দরকার নেই, তিনি ইংরিজিতেই লিখুন। তাঁর ইংরিজি লেখাই এখন দেশের পক্ষে বেশি দরকার। লালমুখোদের থুৎনি ধরে ঝাঁকিয়ে দিতে গেলে তো আর প্রভাকর কিম্বা ভাস্কর দিয়ে তা হবে না? তার জন্যে পেট্রিয়টের ওই কড়া ইংরিজি হাতেরই দরকার। কিন্তু তুমি আমি—মানে, আমরা যারা পরের জমানার মানুষ, তাদের হাতে তো সাধ্যমতো একটু চেষ্টা হতে পারে? বিদ্যেসাগর, অক্ষয় দত্ত, রাজেন মিত্তির, প্যারীচাঁদ মিত্তির—এ'রা তো বাঙলা লেখার পথের হদিশ দিয়েচেন, তারপরেও আর ভয় করবার কী আছে? প্রথম দিকে না হয় একটু হোঁচটই খেলুম, তারপরেই দেখা যাবে, মোটমুটি চলতে শিখে গেচি।

—হেয়ার সাহেবের স্মৃতিসভায় গত বছর তুমি বাঙলায় লেখা একটা নিবন্ধ পাঠ করেচিলে, তাই না?

—হ্যাঁ, সেটার নাম দিয়েছিলুম, বাঙলাভাষার অনুশীলন। তবে কিনা ইংরিজিনবীশ হংসদলের ভেতর আমিই প্রথম বাঙলা-বক নই শম্ভু, তারও আগের বছর অক্ষয় দত্ত মশাই অতগুলো ইংরিজি ভাষণের পর একা দাঁড়িয়ে দিব্যি বাঙলায় ভাষণ দিয়ে গেলেন। সেই কথা স্মরণ করে সাহস পেয়েই তবে আমি গত বছর এগিয়েচিলুম।

—এ বছরও বাঙলায় লিখবে তো?

—নিশ্চয়ই।

—এবারও কি হেয়ার সাহেবের স্মৃতিসভা তোমার বাড়িতে হবে নাকি?

কিশোরীচাঁদবাবুও সেইরকমই বলেছিলেন। মহাত্মা ডেভিড হেয়ারের মতো ব্যক্তির স্মৃতিসভা যে মাটিতে দাঁড়িয়ে হয়, সে মাটি ধন্য হয়ে ওঠে শম্ভু! তাঁকে চোখে দেখার সৌভাগ্য হয়নি কিন্তু গোলদীঘিতে তাঁর সমাধির কাছে দাঁড়িয়ে কয়েকবার প্রণাম জানিয়ে এসেচি।

আবেগে গলা ধরে এলো কালীপ্রসন্নের।

শম্ভুচাঁদ বললে, আশ্চর্য ব্যাপার, আমাদের হিন্দুদের গোঁড়ামি নিয়ে কত খোঁটাই না দেয় খ্রীশ্চানেরা। অথচ তাদের সংকীর্ণতা যে কতখানি, হেয়ার সাহেবের কবরের কাছে কখনো গেলে সেই কথাটাই প্রথমে মনে আসে আমার। তিনি নাকি খ্রীশ্চান ধর্মকে মানতেন না, এই তাদের অভিযোগ। আমরা হিন্দুরা জাত-পাতের বিচার করি ঠিকই তবু এটা জানি যে মৃত্যুর পরে জাত থাকে না। আর খ্রীশ্চানেরা নাকি জাত-পাতের বিচার করে না, কিন্তু মৃত্যুর পরেও আক্রোশ ভুলতে তারা রাজী নয়। হেয়ার সাহেবের মৃতদেহ তারা খ্রীশ্চান গোরস্তানে দিতেই দিলে না। এই সংকীর্ণতার পরেও তাদের দাবি, আমাদের তারা অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে যাবে!

শান্ত, স্নিগ্ধ স্বরে কালীপ্রসন্ন বললে, খ্রীশ্চানদের এ সংকীর্ণতা হয়তো আমাদের পক্ষে ভালোই হয়েচে শম্ভু। রাজার জাত হয়েও যিনি এদেশে এসে এদেশের মানুষের সুখ দুঃখের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নিয়েছিলেন, শিক্ষা বিস্তারের জন্যে নিজের ব্যবসা অক্লেশে ছেড়ে দিয়ে শিক্ষার জগতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, যিনি স্কুলের সময় গামছা হাতে দাঁড়িয়ে থেকে ছোটো ছোটো ছেলের গায়ের ঘাম পুঁছে দিতেন তিনি খ্রীশ্চান পাড়ার গোরস্তানে মাটি না নিয়ে এদেশেরই ঘরের কাছে চিরবিশ্রামের শয্যে নিয়েচেন। জীবনে তিনি আমাদের আপনজন ছিলেন, মরণেও তিনি আমাদের আপনজন হয়ে রইলেন।

কয়েকমুহূর্ত কেটে গেল, দুজনেই নীরব।

তারপর নীরবতা ভেঙে কালীপ্রসন্ন বললে, পয়লা জুন তাঁর স্মৃতিসভা। সে দিনটা আসতে এখনো অবিশ্যি কিছু দেরি আছে। স্মৃতিসভার প্রধান উদ্যোক্তা তো বাবু কিশোরীচাঁদ। তিনি আবার সম্প্রতি একটা অশান্তির ভেতর জড়িয়ে পড়েচেন, তা কি শুনেচো?

—হ্যাঁ, শুনেচি।

—পুলিশ কমিশনার ওয়াকোপ সাহেব একটি চীজ। বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা আর পুলিশে ছুঁলে ছত্রিশ ঘা। তায় আবার পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট বনাম পুলিশ কমিশনার। এর জের খুব সহজে মিটবে বলে মনে হয় না। ওদিকে আবার শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার গর্ডন ইয়ং সাহেবের সঙ্গে বিদ্যেসাগর মশাইয়েব বিরোধ বেশ পাকিয়ে উঠেছে। ছোকরা সিবিলিয়ন তো? নামেও ইয়ং, কাজে আরো ইয়ং। বুঝতে পারেনি, কার সঙ্গে তকরারে নেবেছে। সে যাই হোক, আপাতত বাবু কিশোরীচাঁদের কাছে একটু খপর নিয়ে দেখা যাক, হেয়ার সাহেবের স্মৃতিসভা নির্দিষ্ট তারিখেই হবে কি না, কী বলো?

—হ্যাঁ, তা খপর নিতে পারো।

—ওয়াকোপের কোপে পড়েচেন তিনি। ওদিকে জবরদস্ত লালমুখো সিবিলিয়ান মহলে নেটিব

পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটের বিরুদ্ধে তোড়জোড় পুরোমাত্রায় শুরু হয়ে গেছে। তাই ভাবচি, ঝামেলা যদি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতেই থাকে তাহলে এতদিনকার বার্ষিক অনুষ্ঠানটা নির্দিষ্ট তারিখেই হবে কি না। আবার এও ভাবচি, মিত্তিরমশাই যে ধাতের মানুষ, তাতে অনুষ্ঠান তিনি কোনোমতেই বন্ধ করবেন না।

—তবু কথাবার্তা বলে রাখো। কিন্তু গোড়াতেই আমি যেটা জানতে চেয়েছিলুম, পাঁচ কথায় তার জবাব কোথায় হারিয়ে গেল। এবার কোন নাটক ধরবে, তা তো বললে না?

কালীপ্রসন্ন হেসে বললে, ভবভূতি বলি দেবো, সে কথা তো আগেই বলেচি বাবা। বেলগেছেয় হবে শ্রীহর্ষনিধন আর জোড়াসাঁকোয় হবে ভবভূতি নিধন। দুই সিংঘির বিক্রমে দুই কবি নির্বিঘ্নে অক্কা পাবেন।

বিরক্ত সুরে শম্ভুচাঁদ বললে, তা নয় পেলেন, কিন্তু কোন নাটক, সেটা বলবে তো?
মুচকি হেসে কালীপ্রসন্ন বললে, মালতীমাধব।

॥ আট ॥

কৈফিয়ৎ দিতে হবে।

যে নেটিব ম্যাজিস্ট্রেট বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্রকে সততা, নিষ্ঠা আর ন্যায়পরায়ণতার জন্যে ‘জাস্টিস অব দি পীস’ সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে, তাঁরই কাছে চাওয়া হয়েছে কৈফিয়ৎ। অবশ্য চিঠির বয়ানে কোথাও যদিও কৈফিয়ৎ শব্দটার উল্লেখ নেই, তবু যে ভাষায় অভিযুক্ত জুনিয়র পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আত্মপক্ষ সমর্থনের উপযুক্ত সুচিন্তিত অভিমত জানানোর জন্যে অনুরোধ জানানো হয়েছে, তা কৈফিয়ৎ চাওয়ারই নামান্তর। কিম্বা হয়তো তার চেয়েও কিছু বেশি।

চিঠি লিখেছেন বাঙলা সরকারের সেক্রেটারি মিস্টার এ. আর. ইয়ং। নিজের চিঠির সঙ্গে পুলিশ কমিশনার ওয়াকোপ সাহেবের অভিযোগপত্রের একখানি অনুলিপিও তিনি গেঁথে দিয়েছেন।

দুটি মামলার রায় সম্বন্ধে পুলিশ কমিশনারের অভিযোগ।

প্রথম মামলার বাদীর নাম শম্ভুনাথ ধর, আসামী শেখ দেদার বক্স্। দু'পয়সা দামের এক আঁটি কাঠ চুরির দায়ে আসামী অভিযুক্ত হয়েছিল। ওয়াকোপের অভিযোগ, পুলিশের পক্ষ থেকে হাজির করা একজন চৌকিদারের সাক্ষ্যকে ম্যাজিস্ট্রেট মিথ্যা এবং বিদ্বেষপ্রসূত বলে অগ্রাহ্য করেছেন এবং অভিযুক্ত আসামীকে বেকসুর খালাস করে রায় দিয়েছেন। সেখানেই ব্যাপারটা মিটে যায়নি। উপরন্তু, বিবাদীর প্রতি বিদ্বেষ বা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার উদ্দেশ্যে তার নামে মিথ্যে ফৌজদারী মামলা দায়ের করবার দণ্ড হিসেবে বাদী শম্ভুনাথ ধরকেই তিনি দশটাকা জরিমানা করেছেন।

দ্বিতীয় মামলার বাদী মহারানী নিযুক্ত কোম্পানি সরকার, বিবাদী আবদুল রহিম নামে একটি বালক ভৃত্য। আবদুল রহিম তার মনিব লেপ্টেন্যান্ট মিলিগানের ঘর থেকে পাঁচটা টাকা চুরি করেছে—এই ছিল অভিযোগ। সাক্ষীদের জবানবন্দী অনুসারে বালকটির অপরাধ সম্পূর্ণ প্রমাণিত হয়েছে বলেই পুলিশ কমিশনার মনে করেন। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট বাবু কিশোরীচাঁদ তাকেও অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। আসামী বালকটিকে তিনি ভর্ৎসনা করেছিলেন। কিন্তু মামলার রায়ে তিনি লিখেছেন ‘ওয়র্নড্ অ্যাণ্ড অ্যাকুইটেড’। তা কেমন করে হয়? অ্যাকুইটেড মানে তো বেকসুর খালাস। যাকে ভর্ৎসনা করা হল সে বেকসুর খালাস হয় কী করে? আর, তাকে যদি নির্দোষ বলেই ম্যাজিস্ট্রেটের মনে হয়ে থাকে, তাহলে ভর্ৎসনা করা হল কেন? মামলা খারিজ করবার ক্ষেত্রে এযাবৎকাল বিজ্ঞ বিচারকেরা ‘ওয়র্নড অ্যাণ্ড ডিস্চার্জড’—এই নির্দিষ্ট আইনসম্মত ভাষা-ই ব্যবহার করে আসছেন। কিন্তু এই ম্যাজিস্ট্রেট তা করেননি। হয়তো

বাদীপক্ষ সরকারকে অপদস্থ করবার জন্যেই ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর রায়ে সুচতুর ভাবে এই স্ববিরোধী ভাষা ব্যবহার করেছেন।

অভিযুক্ত আসামী ভর্ৎসিত কিন্তু খালাস।

অপরাধ প্রমাণিত না হলে আসামীকে ভর্ৎসনার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। অথচ এই ম্যাজিস্ট্রেট তাকে ভর্ৎসনাও করেছেন এবং বেকসুর খালাস বলেও রায় দিয়েছেন।

পুলিশ কমিশনারের পক্ষে সন্দেহ করবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, এই ম্যাজিস্ট্রেট নিরপেক্ষ নন। যেমন করেই হোক, ম্যাজিস্ট্রেটের কেসবুকের পৃষ্ঠা উলটে দেখার সুযোগ তাঁর হয়েছে। তাতে তাঁর এই ধারণাই হয়েছে যে, অন্তত এই দুটি পুলিশকেসের ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট বাবু কিশোরীচাঁদ মিটার বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়েই সন্দেহজনক দ্রুততা, নোংরামি আর বিচারকের পক্ষে অনুপযুক্ত মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি চান, যথার্থ সত্যের উদ্ঘাটন হোক। সুতরাং, এই মামলা সংক্রান্ত সমস্ত নথী-পত্র সরকারের গোচরে আনার জন্যে তিনি হিজ এক্‌সেলেন্সি লেপ্টেন্যান্ট গবর্ণর স্যার ফ্রেডরিক হ্যালিডের দপ্তরে পাঠানো তাঁর কর্তব্য বলে তিনি মনে করেছেন।

ওয়াকোপের চিঠির অনুলিপি সঙ্গে নিয়েই সেক্রেটারি ইয়ং সাহেবের চিঠি এসেছে কিশোরীচাঁদের হাতে। সুতরাং, ওয়াকোপের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তার মনে কোনো অস্পষ্টতা নেই। তাছাড়া, কিছুদিন আগে থেকেই ইংলিশম্যান পত্রিকায় বিশেষ দুজন ম্যাজিস্ট্রেট সম্বন্ধে মাঝে মাঝে বিরূপ চিঠিপত্র লেখালিখি চলছে। দুজন ম্যাজিস্ট্রেটের একজন কিশোরীচাঁদ, অন্যজন কিন্তু শ্বেতাঙ্গ—কিশোরীচাঁদেরই বিশিষ্ট বন্ধু মিস্টার হিউম।

একজন নেটিব, অন্যজন বৃটিশ। দুজনেরই বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ। শ্বেতাঙ্গ বিচারপ্রার্থীরা এই দুজন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে সুবিচার পায় না, তাঁদের পক্ষপাত নেটিবদের ওপরেই বেশি। পুলিশ কেস হলে তো কথাই নেই। পুলিশের পক্ষ থেকে যে মামলাই পেশ করা হোক না কেন, এঁরা দুজন গোড়া থেকেই পুলিশের ওপর অবিশ্বাস নিয়ে সে মামলার তথাকথিত বিচার আরম্ভ করেন। পুলিশের বড়ো বড়ো অফিসারেরা যে সরকারের দায়িত্বশীল সিবিলিয়ান, এই বাস্তব সত্যটাকে তাঁরা সম্ভবত তোয়াককাই করেন না। উপরন্তু সুযোগ পেলেই মামলার রায়ে পুলিশের শ্বেতাঙ্গ সিবিলিয়ানদের ওপর কটাক্ষ করেন। একই সরকারের অধীনস্থ ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে সেই সরকারেরই আর একটা দায়িত্বশীল বিভাগের মর্যাদা সম্পন্ন অফিসারদের বিরুদ্ধে যখন তখন এই জাতীয় কটাক্ষ কি প্রচণ্ডভাবেই সরকারের সম্ভ্রমহানি ঘটায় না? সুতরাং এই দুই ম্যাজিস্ট্রেটকে অন্য কোনো পদে সরিয়ে সরকারের বিচার বিভাগে অবিলম্বে ন্যায়, সততা এবং নিরপেক্ষতা ফিরিয়ে আনা হোক।

মে মাসের গোড়ার দিকে একমাত্র সন্তান কুমুদিনীর বিয়ে দিয়েছে কিশোরীচাঁদ। সেদিন অতিথি অভ্যাগতদের ভেতর মিস্টার হিউমও ছিলেন। সামান্য একটু অবসরে একবার ইংলিশম্যানের সেই সব চিঠিপত্রের কথা উঠেছিল।

হিউম হাসতে হাসতে বললেন, আমাদের এত সুখ্যাতি কে করাচ্চে, বুঝতে পারচো কিশোরী?

কিশোরীচাঁদ বললে, সম্ভবত মিস্টার ওয়াকোপ।

—শুধু ওয়াকোপই নয় হে, পুরুনি, ইউনানের মতো বাঘা বাঘা ঘুষখোর ফন্দিবাজ সিবিলিয়ানগুলোও দলে আছে। তবে ওই চূড়ান্ত অসচ্চরিত্র ওয়াকোপই পালের গোদা। এই চেষ্টা ওদের চলতেই থাকবে। আমাদের দুজনকে আদালত থেকে না সরানো পর্যন্ত বেচারাদের শান্তি নেই। দেখা যাক, পেটোয়া লোক দিয়ে কত চিঠিই লেখায় আর ইংলিশম্যানই বা কত চিঠি ছাপে।

হিউমের সঙ্গে এ কথাবার্তা এমন কিছু বেশিদিন আগেকার নয়। হাসতে হাসতেই কথা

হয়েছিল তারপর কখন সে কথা ভুলেও গেছে কিশোরীচাঁদ। কিন্তু ওয়াকোপ যে তার ব্রত ভোলেনি, তার প্রমাণ তো এখন হাতের ভেতর।

কয়েকটা রাত ঘুমোতে পারেনি কিশোরীচাঁদ।

আর কোনো উপায়েই অপদস্থ করতে না পেরে হিংস্র পুলিশ কমিশনার কিনা শেষ পর্যন্ত এইভাবে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো?

ম্যাজিস্ট্রেট বিচারক। তাকে থাকতে হবে নিরপেক্ষ। সাক্ষী-প্রমাণের ভিত্তিতেই নিজের বিচার-বুদ্ধির প্রয়োগে তাকে দিতে হবে রায়। আজ এই প্রায় চৌদ্দ বছর ধরে মুক্ত বিবেকে নিরপেক্ষভাবে নিজের দায়িত্ব পালন করে এসেছে কিশোরীচাঁদ। জ্ঞানতঃ কোনো অন্যায় বিচার আজ পর্যন্ত সে করেনি। যে দুটো মামলার রায় নিয়ে ওয়াকোপ তার বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছে, তার বিচারের জন্যে একজন আইনজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটেরও দরকার হয় না। যে কোনো সাধারণ বুদ্ধিমান মানুষের দ্বারাই সে বিচার হতে পারতো। কারণ, দুটো মামলাতেই সাজানো সাক্ষীর ব্যাপারটা এত বেশি স্পষ্ট ছিল যে, আইনের দিক থেকেও অভিযোগ একেবারে টেঁকেনি।

প্রথম মামলায় সামান্য কিছু জেরার পরেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে, প্রতিবেশি নিতান্ত গরীব শেখ দেদার বক্‌সের ওপর যে কোনো কারণেই হোক বাদী শম্ভুনাথ ধরের প্রচণ্ড আক্রোশ আছে। তাকে হয়রানি করবার জন্যেই দু' পয়সা দামের এক আঁটি কাঠচুরির দায় চাপিয়ে লোকটাকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে শম্ভুনাথ। বিবাদীর ওপর বাদীর প্রতিহিংসা মেটানোর উদ্দেশ্যটা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠলো, যখন পাড়ার চৌকিদার এসে দাঁড়ালো সাক্ষীর কাঠগড়ায়। তাকেও দু' এক টাকা খাওয়ানো হয়েছে, সে ব্যাপারেও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু টাকা খেয়েও লোকটা মিথ্যে কথাগুলো গুছিয়ে বলতে পারলে না। জেরার মুখে পড়ে চৌকিদার সবই গোলমাল করে ফেললে। তার এলোমেলো মিথ্যে কথাগুলো শেষ পর্যন্ত বাদীর বিপক্ষেই গেল। এক্ষেত্রে নিরপরাধ গরীব লোকটাকে বেকসুর খালাস না দিলে ন্যায় বিচারেরই অমর্যাদা হত। আর বাদীর জরিমানা? টাকার জোরে এই জাতীয় হিংস্র লোকগুলো যা খুশি করে বেড়ায়। দশটা টাকা জরিমানায় লোকটার অন্তত একটু হুঁশ হোক যাতে নিরপরাধ লোকের নামে মিথ্যে ফৌজদারি মামলা করাতেও যে উলটে বিপত্তি হতে পারে, এ যাত্রায় সেটুকু যেন বুঝতে পারে শম্ভুনাথ ধর।

দ্বিতীয় মামলায় অভিযুক্ত আবদুল রহিম নামে বছর বারো বয়সের ছেলেটি লেপ্টেন্যান্ট মিলিগ্যান নামে এক সামরিক অফিসারের কুঠিতে গৃহভৃত্য। তার বিরুদ্ধে মনিবের দেরাজ থেকে পাঁচটা টাকা চুরির অভিযোগ।

পুলিশ কমিশনার অবশ্য কয়েকজন সাক্ষীসাবুদ হাজির করেছিলেন। তাদের পরস্পরবিরোধী সাক্ষী থেকে নিতান্তই অনিশ্চিতভাবে একটা সম্ভাবনার আভাস পাওয়া যায়—হয়তো ছেলেটা চুরি করলেও করতে পারে। কিন্তু এমন কোনো নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়নি যে একবাক্যে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা যেতে পারে। তার ওপর সবচেয়ে বড়ো কথা, যাঁর টাকা চুরি হয়েছে বলে অভিযোগ, সেই লেপ্টেন্যান্ট মিলিগ্যান কিন্তু ছেলেটির বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে আসেননি। সেক্ষেত্রে বিচারকের কর্তব্য কী?

কেবলমাত্র একটা অস্পষ্ট অনুমানের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে দণ্ডদান? না তা হতে পারে না। অভিযোগ যেখানে নির্দিষ্টভাবে প্রমাণিত নয়, সেখানে অভিযুক্তকে দণ্ডদান কোনো বিচারকেরই বিবেকসম্মত হতে পারে না। বেনিফিট অব ডাউট। যেখানে সন্দেহের অবকাশ আছে, সেখানে আসামীকে সে সুযোগ দিতেই হবে। তার ওপর, অভিযুক্ত আসামী নিতান্ত এক বালক মাত্র।

শত অপরাধী মুক্তি পাক, কিন্তু একজনও নিরপরাধ যেন দণ্ডিত না হয়।

বিচারের এই মানবিক নীতিকে সজ্ঞানে কোনোদিনই লঙ্ঘন করেনি কিশোরীচাঁদ। তাই বারোই জুন তারিখেও এজলাসে বসে তা সে করতে পারেনি। অপরাধের একটা ক্ষীণ আভাস ছিল বলে অভিযুক্ত আবদুল রহিমকে সামান্য ভর্ৎসনার পর মামলা সে খারিজ করে দিয়েছে।

প্রতিদিন বহু মামলার নিষ্পত্তি করতে হয়। তাই হয়তো রায় লেখার সময় অন্যমনস্কতায় 'ডিসচার্জড'-এর জায়গায় লিখেছে 'অ্যাকুইটেড'। এটা যদিও রীতিসম্মত নয়, কিন্তু এতই কি গুরুতর ত্রুটি যে, বাঙলা সরকারের সেক্রেটারি তার কাছে কৈফিয়ৎ তলব করতে পারেন? তারও ভিত্তি কিনা পুলিশ কমিশনারের অভিযোগ?

ম্যাজিস্ট্রেট বিচারক। তাঁর দেওয়া রায়ে পুলিশ কমিশনারের মনস্তুষ্টি না হতে পারে, কিন্তু সরকারিভাবে সে রায়ের বিরুদ্ধে সমালোচনা করবার অধিকার পুলিশ কমিশনারের নেই। আইন তাকে কোনোভাবেই সে অধিকার দেয়নি। সে ঔদ্ধত্য দেখানোর সাহস কোথায় পেলেন মিস্টার ওয়াকোপ? শুধু তাই নয়, ম্যাজিস্ট্রেটের কেস-বুক হল আদালতের সম্পূর্ণ গোপনীয় নথী। অভিযোগপত্রে মিস্টার ওয়াকোপ দাবি করেছেন, কেস-বুক দেখার সুযোগ তাঁর হয়েছে। তাহলে কি ধরে নিতে হবে, ভয় দেখিয়ে অথবা ঘুষ দিয়ে আদালতের কোনো মহাফেজকে তিনি হাত করেছিলেন? মহাফেজখানার কোনো কর্মচারী তাহলে নিঃসন্দেহে বিশ্বাসভঙ্গ করেছে।

সব মিলিয়ে এই কদর্য কুৎসিত ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে এখন তাহলে কী করবে কিশোরীচাঁদ। উত্তর তো দিতেই হবে। চিঠি লিখেছেন যদিও সেক্রেটারি ইয়ং সাহেব, কিন্তু লেপ্টেন্যান্ট গবর্নর হ্যালিডের সম্মতি ছাড়া এ চিঠি তিনি নিশ্চয়ই লেখেননি।

অভিমানে, ক্ষোভে অস্থির হয়ে উঠেছিল কিশোরীচাঁদের মন। হ্যালিডে সাহেবের সঙ্গে তাঁর যে পরিচয় নেই, এমন নয়। পুলিশ কমিশনারের চিঠি পাওয়ার পর তিনি অনায়াসেই কিশোরীচাঁদকে বেলভেডিয়ারে ডেকে একবার আলোচনা করতে পারতেন। তিনি তা করেননি। পুরোপুরি আইনমোতাবেক এগিয়েছেন। সুতরাং আত্মসম্ভ্রম বজায় রাখতে কিশোরীচাঁদকেও আইনমোতাবেকই এগোতে হবে।

দীর্ঘ চিঠি লিখলেন কিশোরীচাঁদ।

সে চিঠিতে শুধু সমস্ত ব্যাপারের বিবরণই নয়, সেই সঙ্গে পুলিশ কমিশনারের আইনগত অধিকার নিয়েও প্রশ্ন তোলা হল।

কিশোরীচাঁদেব চিঠির অনুলিপি সঙ্গে নিয়ে এবার ওয়াকোপের কাছে নতুন চিঠি গেল সেক্রেটারীর দপ্তর থেকে। তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন খাস অ্যাংলো-স্যাক্সন রক্তের অধিকারী বৃটিশ সিবিলিয়ন ওয়াকোপ। একটা নেটিব ম্যাজিস্ট্রেটের এত বড়ো স্পর্ধা যে, একজন খাঁটি বৃটিশ সিবিলিয়ানের অধিকার নিয়ে সে প্রশ্ন তোলে? শুধু প্রশ্ন তোলাই নয়, সেই সঙ্গে তাঁর অভিযোগের ভিতটাকে যুক্তির হাতুড়ি দিয়ে একেবারে ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে। সম্ভবত লেপ্টেন্যান্ট গবর্ণর সেই বদমাশ ম্যাজিস্ট্রেটের যুক্তিগুলোকে মেনে নিয়েছেন। নইলে তার চিঠির এই কপি পাঠিয়ে আবার নতুন করে ওয়াকোপের বক্তব্য জানতে চাওয়া হয়েছে কেন?

পরিণাম যাই হোক, মুখোমুখি লড়াইয়ে একবার যখন নেমে পড়া গেছে, তখন এত সহজে পিছিয়ে যাওয়া চলবে না। ব্রিটিশ শাসনের এক্তিয়ারে থেকেও একটা নেটিব কর্মচারীর কাছে হেরে যাবে একজন ব্রিটিশ সিবিলিয়ান?

এবার নতুন অভিযোগ।

সিরিয়াস চার্জ অব অলটারেশন অ্যান্ড ইন্টারপোলেশন।

জুনিয়র পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র তাঁর জবাবী চিঠিতে যথেষ্ট কূট-কৌশলের সঙ্গেই সাফাই গেয়েছেন কিন্তু একটা গুরুতর তথ্য তিনি ইচ্ছাকৃতভাবেই গোপন রেখেছেন। আলোচ্য মামলার রায় বেরিয়ে যাওয়ার পর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সম্ভবনা বুঝতে পেরে তিনি নিজের ত্রুটি গোপন করবার জন্যে তাঁর কেস-বুকে কয়েকটি শব্দের পরিবর্তন ও নতুন শব্দ সন্নিবেশ করেছেন। চতুর ব্যক্তি হিসেবে তিনি এ কাজ করেছেন। কিন্তু তাঁর লেখা চিঠির ভেতর কোথাও সে কথা বলা হয়নি। অলটারেশন অ্যান্ড ইন্টারপোলেশন।

ক'দিন পরেই হ্যালিডে সাহেবের কাছ থেকে ব্যক্তিগতভাবে গোপনে ডাক এলো কিশোরীচাঁদের।

স্বাভাবিক হাসিমুখেই তাকে অভ্যর্থনা জানালেন হ্যালিডে। তারপরে পুলিশ কমিশনারের নতুন সেই চিঠিখানা তার হাতে দিয়ে বললেন, আগে পড়ে দেখুন, তারপরে আলোচনা করবো।

চিঠিখানা পড়তে পড়তে ঘৃণার উত্তেজনায় রী রী করে উঠছিল কিশোরীচাঁদের সর্বাঙ্গ। চোখ-কান-নাক দিয়ে যেন গরম হলকা বেরোচ্ছিল। পড়া শেষ করে হ্যালিডের হাতে দিয়ে বলল, অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যে। নথী পালটানো মানেই তো জালিয়াতি। কেস-বুক আদালতেই আছে, ইচ্ছে হলে আপনি আনিয়ে দেখতে পারেন।

হ্যালিডে বললেন, না, না, তার কোনো দরকার নেই। আপনার মতো সৎ কর্মদক্ষ ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষে এরকম হীন কাজ সম্ভব নয় বলেই তো আলোচনার জন্যে আপনাকে আলাদাভাবে ডেকে পাঠিয়েচি। এখন বলুন, কী করা যেতে পারে?

কী করবেন সেটা আপনারই বিবেচ্য। স্তব্ধ গম্ভীরস্বরে কিশোরীচাঁদ বললে, অভিযোগ যখন আমারই বিরুদ্ধে তখন আমি তো আপনাকে কোনো পরামর্শ দিতে পারিনে।

আপনার উত্তেজিত হওয়ার সঙ্গত কারণ আছে, তা আমি বুঝতে পারছি। আপনার মতো একজন সৎ, বিবেকবান, দক্ষ অফিসার যে কোনো সরকারের পক্ষেই গৌরবের। আমি স্পষ্টই বুঝতে পারচি, কোনো কারণে আপনার প্রতি বিরাগবশত মিস্টার ওয়াকোপ এই সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে এত চিঠি চাপাটি করচেন। তিনি বিচার চাইচেন। কিন্তু আমি চাই না যে, এই বিরোধকে প্রকাশ্য বিচারের আওতায় নিয়ে গিয়ে জল আরো ঘোলা করা হোক।

কিন্তু তিনি তো প্রকাশ্য বিচারই প্রার্থনা করেচেন।

আপনি?

আমার বিরুদ্ধে যেমন তাঁর অভিযোগ, তেমনি তাঁর বিরুদ্ধেও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হীন মিথ্যাচারের অভিযোগ আমিও পেশ করচি।

তাতে তো জটিলতা আরো বেড়ে যাবে মিস্টার মিটার। আমি বলচিলুম কি, প্রকাশ্য বিচারের ঝামেলায় না গিয়ে ব্যাপারটা যদি আপোসে মিটিয়ে নেওয়া যায়, তাহলে সব দিক দিয়ে শোভন হয় না কি?

অপোস। বিড় বিড় করে আপনমনেই কথাটা একবার উচ্চারণ করলে কিশোরীচাঁদ।

আরো উৎসাহিত হয়ে হ্যালিডে বললেন, আমার মনে হয়, এই অবস্থায় সেইটেই সবচেয়ে ভালো উপায়।

প্যারীচাঁদ আর রামগোপাল অবশ্য কিশোরীচাঁদকে বলে রেখেছিলেন, আপোসের প্রস্তাব এলে সে যেন তা গ্রহণ করে। কিন্তু কিশোরীচাঁদ সেই মুহূর্তেই তা পারলে না। বললে, আমাকে দুটো দিন ভেবে দেখার সময় দিন।

নিশ্চয়ই। —সানন্দে সম্মতি দিলেন হ্যালিডে।

আপোস? ওয়াকোপের মতো একটা নোংরা লোকের সঙ্গে আপোস করতে হবে? কেমন যেন আচ্ছন্নের মতো কথাটা ভাবতে ভাবতে সেদিন বেলভেডিয়ার থেকে বাড়ি ফিরে এলো কিশোরীচাঁদ।

পরের দিন সন্ধ্যেবেলা।

মধুসূদনের লোয়ার চিৎপুর রোডের বাড়িতে মধুসূদন, হরিশ আর কিশোরীচাঁদ। হ্যালিডের সঙ্গে কী কথাবার্তা হয়েছে, সবই শুনলে মধুসূদন আর হরিশ।

উত্তেজিত স্বরে চেঁচিয়ে উঠলে হরিশ, আপোস? আর সেই প্রস্তাব শুনে তুমি আবার দুদিনের সময় নিয়ে এলে কিশোরী?

কিশোরীচাঁদকে জড়িয়ে ধরে মধুসূদন বললে, না, আমি নিজে তো মানুষ হতেই পারিনি, তোমাকেও মানুষ করতে পারলুম না দেখচি। ওহ্ লর্ড। হ্যাভ পিটি অন দিস্ বেস্ট ডগ ইন ক্রিয়েশন।

হরিশ বললে, আপোস করতে রাজি হওয়া মানেই এক্ষেত্রে নিজেকে অপরাধী বলে স্বীকার করে নেওয়া। তুমি কি তাতে সম্মত?

—কিছুতেই না।

—তাহলে তোমাকেও পালটা বিচার চাইতে হবে কিশোরী! দু'জনেরই যখন দুজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তখন বিচার করবে কে? তুমি কমিশন চাও, কিশোরী।

—দি আইডিয়া। লেট দেয়ার বী অ্যানাদার জাজমেণ্ট অব সলোমন। —চেঁচিয়ে উঠলে মধুসূদন, কমিশন বসুক, দু'তরফের সওয়াল জবাব হোক, তারপর ওয়াকোপের ঝুলির ভেতর থেকে বেড়াল ঠিক বেরিয়ে আসতে বাধ্য হবে।

মধুসূদনের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে হরিশ বললে, তুমি যত সোজা ভাবছো মধু, অত সোজা বোধ হয় নয়। ব্রিটিশ ব্যুরোক্রেসির বেড়াল অনেক বেশি সেয়ানা হে। সে অত চট্ করে বেরোয় না।

—তাহলে এখন আমার কর্তব্য কী?

—আত্মসম্মান বজায় রাখা। —বললে হরিশ, কর্তব্য একটাই—কমিশন। তুমি দরখাস্ত পেশ করো।

—হ্যাঁ, তাই-ই করবো আমি। তুমি আমাকে বাঁচালে হরিশ।

—ডোণ্ট ফরগেট দিস যশুরে বাঙাল। আবার কিশোরীচাঁদকে জড়িয়ে ধরে মধুসূদন বললে, হরিশ এখানে ছিল বলে ও নাম কিনে বেরিয়ে যাবে? আমার কাছে জিজ্ঞেস করলেও আমি তোমাকে এই পরামর্শই দিতুম হে। মাই ডিয়ার কেনাই, বীরের মতো লড়ে যাও। গো অন ফাইটিং লাইক হেক্টর, গো অ্যাণ্ডে লাইক কিং পোরাস।

—একটা বিশ্রী দোটানা থেকে তোমরা আমাকে বাঁচালে। —বললে কিশোরীচাঁদ।

হরিশ বললে, বাঁচা-মরা কিছুই এখনো নির্দিষ্ট হয়ে যায়নি কিশোরী। কমিশন বসলেও তুমি যে নেটিব, সেটা মনে রেখেই তোমাকে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।

—দেয়ার য়ু আর।—আবার চেঁচিয়ে উঠল মধুসূদন, ওহ্ মাই বিলাভেড নটোরিয়াস পেট্রিয়ট, য়ু টক লাইক ড্যানিয়েল। তোমার এই কথাটা অন্তত ফ্রেণ্ড কনিয়কের চেয়েও দামী হে কুলীনাচার্য। এই যে আমি কতকাল আগে ক্রীশ্চান হয়েচি, কিন্তু আমি যে নেটিব ক্রীশ্চান, সে কথা ওরা কখনোই ভোলে না। অফকোর্স, সুইটেস্ট এক্সেপ্শন ইজ দেয়ার—মাই হেভেনলি অঁরিয়েত!

সশ্রদ্ধ স্বরে হরিশ বললে, আঁরিয়েত সত্যিই নারীরত্ন। তোমার মতো বাঁদরের গলায় ও মুক্তোর হার কেমন করে উঠলো, তাই ভাবি।

হো হো করে হেসে উঠলে মধুসূদন, মুক্তোর মালাটা প্রায় অপহরণ করেই আনতে হয়েচে হে। থ্যাংক য়ু ফর বোথ দ্য কমপ্লিমেণ্টস। শী ইজ রিয়েলি দি ইন্স্পিরেশন অব দিস জিনিয়াস মর্কট।

মদ্যপানের আয়োজনে কিছু সময় কেটে গেল। তারপর কিশোরীচাঁদ বললে, সত্যিই আমি একটু দোটানার ভেতর ছিলুম হরিশ। রামগোপাল দাদার উপদেশ ছিল, আপোসের প্রস্তাব এলে আমি যেন সেটা মেনে নিই। বড়দাদারও তাই অভিমত।

হরিশ কিছু বলবার আগেই মধুসূদন বললে, তোমার বড়দাদা—য়ু মীন টেকচাঁদ? হোয়াট অ্যান আইরণি। বাঙলা ভাষাকে একেবারে গেঁয়ো আটপৌরে পোশাকেই সভার মাঝখানে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে যিনি একটা রেভল্যুশন করেচেন বলে মনে করচেন, তিনি কিনা তোমাকে আপোসের পরামর্শ দিয়েচেন?

কিশোরীচাঁদ বললে, দুটো ভিন্ন ব্যাপার মধু। সে যাই হোক, অত গলাবাজি করে সেদিন তো বড়দাদার সংগে অত তর্ক করে এলে, কিন্তু রাজসভায় আসার মতো পোশাকি বাঙলার নমুনা কোথায়?

—হোয়াই, দেয়ার ইজ স্টিল দ্য টুলো পণ্ডিত ভিড্। তাছাড়াও শুনে রাখো বোনাই, এই মধু যেদিন বাঙলা লিখতে শুরু করবে, সেদিন লোকের মুখে শুধু শুনবে মধু, মধু আর মধু। টেকচাঁদ—আই মীন, প্যারীদাদা সেদিন হয়তো আমার ওপর একটু ক্ষুন্ন হয়েছেন, বাট আই অ্যাম আনডান। স্টিল আই ইনসিস্ট, আলালীভাষা ইজ দ্য ল্যাঙ্গোয়েজ অব ফিশারমেন, আনলেস য়ু ইমপোর্ট লার্জলি ফ্রম স্যানস্ক্রিট।

হরিশ হেসে বললে, মধু আমার যতদূর মনে হয়, আমাদের কথা হচ্চিল কিশোরীর কমিশন চাওয়া নিয়ে—আলালী ভাষা নিয়ে নয়।

—আর আলোচনা না করলেও চলবে হরিশ। আমি মনস্থির করে ফেলেচি।

কিশোরীচাঁদের দু কাঁধে চাপ দিয়ে আবেগদৃপ্তস্বরে মধুসূদন আবৃত্তি করে উঠলে—

Like to a lion chain'd,
That tho' faint—bleeding stands in pride—
With eyes where unsubdued
Yet flashed the fire-looks that defied—
King Porus boldly went
He couched not as a slave—
He stooped not—bent not there his knee—
But stood—as stands an oak,
Unbent—in native majesty !

আবেগে আনন্দে চক্‌চক্ করে উঠলো হরিশের মুখ। বিমুগ্ধ স্বরে সে বললে, অপূর্ব ! কোন কবির লেখা ?

দি এভার অ্যাম্‌বিশাস জিনিয়াস মাইকেল এম-এস-ডাট। ফ্রম ফিফ্‌থ্ স্ট্যাঞ্জা অব মাই পোয়েম-'কিং পোরাস'-বলেই কিশোরীচাঁদের কাঁধে সজোরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে মধুসূদন বললে, নো কম্‌প্রোমাইজ কিশোরী। গো অ্যাহেড অ্যান্ড স্ট্যান্ড আনবেন্ট।

কিশোরীচাঁদের চিঠি পেয়ে হ্যালিডে বুঝলেন, আপোসের নামে মাথা নোয়াবে না এই নেটিব ম্যাজিস্ট্রেট। কমিশন বসানোর আদেশ দিলেন তিনি।

তিন সদস্যের কমিশন।

তার ভেতর একজন মাত্র বাঙালী-ছোট আদালতের জজ বাবু হরচন্দ্র ঘোষ। অন্য দুজন শ্বেতাঙ্গ। একজন চব্বিশ পরগনার ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার ফাগুর্সন, অন্যজন ব্যারিস্টার মিস্টার হাইন্ড।

কোথায় কী কৌশলে যেন চাকা ঘুরে গেল। নামে কমিশন হলেও ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়ালো আদালতের মতো। ওয়াকোপ যেহেতু তালিকাভুক্ত ব্রিটিশ সিবিলিয়ান, তাই সরকারপক্ষই এ-মামলায় বাদীর ভূমিকায়। ওয়াকোপের পক্ষে দাঁড়ালেন সরকারি সলিসিটর। কিশোরীচাঁদ ম্যাজিস্ট্রেট হতে পারে কিন্তু চিহ্নিত সিবিলিয়ান বলতে যা বোঝায়, সে তো তা নয়। তাই নিজের পক্ষে কৌঁসুলি নিয়োগের দায়িত্ব তাকেই নিতে হল।

হরিশ বললে, ব্যারিস্টার নিউমার্চকেই তুমি নাও কিশোরী। ব্রিটিশ হলেও পেশাগত সততা ও'র সম্পূর্ণ আছে। তাঁর ওপর এ বিশ্বাস আমরা রাখতে পারি যে, তিনি প্রাণপণে লড়বেন। জেরায় জেরায় উনি জেরবার করে দিতে পারবেন ওয়াকোপের মতো ঝানু সিবিলিয়ানকেও। তারপরেও কমিশন কী রায় দেয়, সেইটেই হবে আমাদের দেখবার বিষয়।

কমিশনের তোড়জোড় চলতে লাগলো।

ওয়াকোপের পক্ষে সরকারি ব্যারিস্টার মিস্টার গ্রেহাম, কিশোরীচাঁদের পক্ষে মিস্টার নিউমার্চ।

হরিশ আর মধুসূদনের পরামর্শে কিশোরীচাঁদ যে কমিশন দাবি করেছে সে কথা রামগোপালের কানে গেছে। প্যারীচাঁদের কাছে ক্ষোভের সঙ্গে তিনি বললেন, কুড হি টেক নো বেটার অ্যাডভাইস দ্যান ফ্রম টু ইয়ং ফ্লেমিং স্পিরিটস?

প্যারীচাঁদও ক্ষুব্ধ। বললেন, এর পরিণাম যে শুভ হবে না, সে আশঙ্কা তো আমিও করচি। কিশোরী নিজে তো হরিশের মতো উগ্র নয়। নিজের ভালো মন্দ বিচার করবার মতো যথেষ্ট বুদ্ধি ওর আছে বলে আমার ধারণা ছিল। কিন্তু এখন আর কি করবো বলো? আমাদের পরামর্শতো ও নিলে না।

রামগোপাল ম্লান হাসি হেসে বললেন, আমরা যে মডারেট হয়ে গেচি।

কিছুদিন পরেই কমিশনের শুনানি আরম্ভ হল।

হরিশ ঠিক কথাই বলেছিল। ব্যারিস্টার মিস্টার নিউমার্চ একেবারে প্রথমেই এই মামলায় একজন সিবিলিয়ানের আইনগত এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তুললেন। তাঁর প্রথম কথা, কোনো ম্যাজিস্ট্রেটের রায় নিয়ে অভিযোগ করবার এক্তিয়ার কোনো পুলিশ কমিশনারের আছে কি না? দ্বিতীয় কথা, তাঁর মক্কেল বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র কেবল পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটই নন, উপরন্তু তিনি জাস্টিস অব দ্য পীস। আইন অনুসারে একজন জাস্টিস অব পীস-এর বিরুদ্ধে পুলিশ কমিশনারের মতো সিবিলিয়ান তো দূরের কথা, খোদ সরকারেরই কোনো অভিযোগ দায়ের করবার এক্তিয়ার নেই। সুতরাং বিবাদীর বিরুদ্ধে দায়ের করা প্রথম এবং তৃতীয় অভিযোগ কমিশনের বিচারযোগ্য বিষয়ের আওতার ভেতরেই আসে না। বাকি রইলো দ্বিতীয় ও চুতুর্থ অভিযোগ। দু'টি মামলার ক্ষেত্রেই বিচারের রায় বেরিয়ে যাওয়ার পরে কেস-বুকে কিছু নতুন শব্দ সংযোজন করা হয়েছে বলে দাবি করেছেন বাদীপক্ষ। উভয় অভিযোগেরই প্রকৃতি এক ধরনের। সুতরাং প্রথমটি যদি মিথ্যে বলে প্রতিপন্ন হয় তাহলে দ্বিতীয় অভিযোগটিও স্বাভাবিকভাবেই মিথ্যে বলে প্রমাণিত হবে।

জোর কদমে চলতে লাগলো শুনানি।

সরকার পক্ষের সাক্ষী ওয়াকোপ তো আছেনই, তাছাড়াও আছেন পুলিশের ডেপুটি সুপার মিস্টার রবার্টস, ইন্‌সপেকটর মিস্টার পুরনি এবং আরো কয়েকজন সিবিলিয়ান্‌। সরকারি আওতার বাইরে স্বাধীন সাক্ষী মাত্র একজন।

কিশোরীচাঁদ কমিশনের আদালতে উপস্থিত থাকার ব্যাপারে অব্যাহতি চেয়ে আবেদন করেছিল। তার সে আবেদন কমিশন মঞ্জুর করেছে।

বিদ্যোৎসাহিনী সভার ব্যাপারে একটা জরুরী আলোচনা প্রসঙ্গে কালীপ্রসন্ন একদিন এসে উপস্থিত। কিশোরীচাঁদ বললে, আমার সঙ্গে আলোচনায় তোমার সভার কাজে যদি কিছুমাত্র উপকার হয়, তাতে আমি সর্বদাই প্রস্তুত। কিন্তু সভার অনুষ্ঠান যখন তোমারই বাড়িতে, তখন সভায় উপস্থিত হওয়াটা আমার পক্ষে সঙ্গত হবে কি না ভাবচি।

—কেন? বিমর্ষমুখে বললে কালীপ্রসন্ন, হেয়ার সায়েবের স্মৃতিসভা তো আমার বাড়িতেই করলেন।

—তারপরে অবস্থার পরিবর্তন হয়েচে। আমার বিরুদ্ধে যে কমিশন বসেচে, তার একজন সদস্য হরচন্দ্র ঘোষ। তোমার নাবালক অবস্থা থেকে এখন পর্যন্ত তিনি তোমার এস্টেটের অছি এবং আন্তরিক ভাবেই তত্ত্বাবধান করে আসচেন। তোমার বাড়িতে বলতে গেলে তাঁর প্রায় নিত্য যাতায়াত। পাছে কেউ মনে করে বিদ্যোৎসাহিনী সভাকে উপলক্ষ্য করে বাবু হরচন্দ্রকে আমি প্রভাবিত করবার চেষ্টা করচি, সেইটেই আমার পক্ষে অস্বস্তিকর হবে। কমিশন মিটে যাক, তারপর আমি সানন্দে তোমাদের সভায় যাবো।

কালীপ্রসন্ন আর অনুরোধ করলে না। কয়েকটা বিষয়ে আলোচনা করে কিশোরীচাঁদের পরামর্শ নিয়ে চলে গেল।

ক'দিন পরে আদালত-ফেরতা পথে দমদমে না গিয়ে ভবানীপুরের পথ ধরলে কিশোরীচাঁদ। সোজা হিন্দু পেট্রিয়ট আপিসের সামনে গিয়ে তার গাড়ি থামলো।

হরিশ তখন সবে আপিস থেকে ফিরে পেট্রিয়টের প্রুফগুলো নিয়ে বসেছে। বললে কী ব্যাপার, অসময়ে যে?

—দরকার আছে। —উৎফুল্লভাবে বললে কিশোরীচাঁদ। —ও ঘরে চলো।

কমিশনের সওয়াল জবাবের সর্বশেষ খবর, একমাত্র বেসরকারি সাক্ষী যিনি রয়েছেন, তাঁকে জেরা করবার কাজ সেইদিনই আরম্ভ হয়েছে। প্রথম দিনেই জেরার জবাবে তিনি যা যা বলেছেন, তার সবটুকুই প্রায় সরকারের বিপক্ষে গেছে। মিস্টার নিউমার্চ আশাবাদী। ওয়াকোপ, রবার্টস বা পুরনির মতো সিবিলিয়নদের তিনি অনায়াসেই ধরাশায়ী করে দিতে পারবেন, এ বিশ্বাস তাঁর আছে। প্রতিহিংসা মেটানোর জন্যে পুরোপুরি মিথ্যের ওপর যে অভিযোগ দাঁড় করানো হয়েছে, তার নড়বড়ে ভিতটাকে ভেঙে দিতে খুব বেশি কষ্ট করতে হবে বলে তিনি মনে করেন না। কোনো লিখিত নথীপত্র ছাড়াই শুধু নিজের স্মৃতিশক্তির ওপর নির্ভর করে নালিশ দায়ের করেছেন মিস্টার ওয়াকোপ। সবচেয়ে বড়ো কথা যে মামলা দুটো নিয়ে তাঁর অভিযোগ, কেস-বুকে সে মামলার বিবরণ পড়েছেন মিস্টার নিউমার্চ। তার ভেতর কোথাও শব্দ পরিবর্তন কিম্বা নিবেশিত লেখনের চিহ্নমাত্র নেই। ওয়াকোপ যে কত বড়ো মিথ্যেবাদী সেটা প্রমাণ করবার জন্যে দরকার হলে সেই কেস-বুক কমিশনের সামনে পেশ করা হবে।

কিশোরীচাঁদের অ্যাটর্নি আপিস থেকে প্রায় প্রতিদিনই শুনানির বিবরণ আসছে। নিউমার্চের জেরার ধরন দেখে বেশ খানিকটা মুষড়ে পড়েছেন ওয়াকোপ সাহেব। বেলা শেষে প্রতিদিন তিনি নাকি শুকনো মুখে কমিশনের এজলাস থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন। এই যদি অবস্থা হয়, তাহলে কিশোরীচাঁদ যে এই মিথ্যে অভিযোগ থেকে সসম্মানে মুক্তি পাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

সব শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো হরিশ। তারপর বললে, গাঁয়ের মানুষের মুখে 'তালগাছের আড়াই হাত' বলে একটা কথা শোনা যায়। কথাটা কখনো শুনেচো?

—না তো? তার মানে কী?

—নারকোল কিংবা সুপুরি গাছে তরতর করে বেয়ে ওঠা যায়। কিন্তু তালগাছে একটু ফ্যাসাদ আছে। নীচের দিক থেকে অনেকদূর পর্যন্তই ওঠা যেতে পারে কিন্তু একেবারে ডগার দিকে যে আড়াই হাত মতো জায়গায় শক্ত কাঁটাওয়ালা ডাঁটি আর শুকনো পাতার ঝোপ থাকে, সেই জায়গাটাই গোলমেলে। মানে বুঝতে পারচো?

কিশোরীচাঁদ বিমর্ষভাবে বললে, তুমি কি সন্দেহ করচো, এত সত্ত্বেও আমার জেতার আশা নেই?

—তা আমি বলচিনে, তবু কমিশনের রায় না বেরোনো পর্যন্ত কোনো কিছুই জোর করে বলা যায় না। মিস্টার নিউমার্চ জেতার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন, তা আমি জানি। তবু আমাদের মনে রাখতে হবে, চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে কমিশনকে আদালতের ছাঁদে ফেলে সরকার বাহাদুরই এ মামলায় বাদীপক্ষ সেজে কোমর বেঁধে নেমে পড়েচেন। অথচ, সরকারের উচিত ছিল এক্ষেত্রে নিরপেক্ষ থাকা। হ্যালিডে সাহেবের সরকার কিন্তু তা করেননি। তুমি তো নিতান্ত একজন জুনিয়র পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট, তোমার কথা ছেড়েই দিলুম। যে বিদ্যেসাগরের পালকি বেলভেডিয়ারে গেলে আর সবাইকে বসিয়ে রেখে তাঁরই আগে ডাক পড়তো, কোথায় গেল সেই বিদ্যেসাগরের সম্মান? গর্ডন ইয়ং-এর মতো একটা ছোকরা সিবিলিয়ান গাঁয়ে গাঁয়ে বিদ্যেসাগরের বসানো স্কুলগুলোর টাকা আটকে দিয়ে তাঁকে একটা প্রচণ্ড অসম্মানজনক অবস্থার ভেতর ফেলেচে। কই, এখন তো হ্যালিডে সাহেবের পাত্তা নেই? অথচ তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে সরকারি গ্র্যান্ট পাওয়া যাবে এই আশ্বাস পেয়েই জেলায় জেলায়, গাঁয়ে গাঁয়ে এই স্কুলগুলো খোলার কাজে হাত দিয়েচিলেন বিদ্যেসাগর। তোমার ক্ষেত্রেও সাদা চামড়ার কুৎসিত অভিপ্রায়টা

বেশ স্পষ্টভাবেই ফুটে উঠেচে। ওয়াকোপের হয়ে সরকার এখন বাদীপক্ষ, আর কালা আদমি বলে তোমাকে দাঁড় করানো হল আসামীর কাঠগড়ায়।

কিশোরীচাঁদ বললে, কিন্তু কমিশনের তো নিরপেক্ষ থাকা উচিত?

—উচিত তো দুনিয়ায় অনেক কিছুই। কিন্তু কোম্পানির রাজ্যশাসনের ইতিহাস কি সব উচিত মেনেচে? আদালতে আসা-যাওয়ার পথে রাইটার্স বিল্ডিংয়ের পাশে সেন্ট অ্যান্ড্রুজ গির্জাটাকে রোজই তো দেখচো। গির্জে হওয়ার আগে ও জায়গাটায় কী ছিল, নিশ্চয়ই জানো?

—হ্যাঁ, ওল্ড মেয়রস কোর্ট! হঠাৎ সে-প্রসঙ্গ কেন?

—সুপ্রীম কোর্টের বর্তমান বাড়িটা তৈরি হওয়ার আগে প্রথম দিকে কয়েকবছর সেই ওল্ড মেয়রস কোর্টেই বসতো সুপ্রীম কোর্ট। বিচারকের নিরপেক্ষতার কি চমৎকার নিদর্শন সেই কোর্টের ইতিহাসে লেখা হয়ে আছে।

—তুমি কি মহারাজা নন্দকুমারের মামলার কথা বলচো?

—হ্যাঁ। ওয়ারেন হেস্টিংসের পরম শত্রু মহারাজা নন্দকুমারকে পৃথিবী থেকে একেবারে সরিয়ে দেওয়ার জন্যে বিচারকের আসনে বসে স্যার এলিজা ইম্পে সেদিন কী করেচিলেন? সেটা বিচার না খুন? প্রাণের বন্ধু হেস্টিংসের সমস্ত অসৎ কাজের পথ নিষ্কণ্টক করবার জন্যে জালিয়াতির মিথ্যে অভিযোগে নন্দকুমারের ফাঁসির হুকুম দিয়ে তিনি কি বিচারকের আসন কলঙ্কিত করেননি?

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো কিশোরীচাঁদ। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললে, দেখা যাক, ভবিতব্যে কী আছে। তবে মিস্টার নিউমার্চের মতো ব্যারিস্টার যে স্বজাত বলে ও-পক্ষকে রেয়াৎ করবেন না, এই জোরের ভিত্তিতেই জয়ের আশা আমাকে রেখে যেতে হবে। আমি যদ্দুর খপর পেলুম, তাতে বোঝা যাচ্চে, তলে তলে বেশির ভাগ বৃটিশ সিবিলিয়ানই ওয়াকোপের পেছনে আছে। আমার বন্ধু অ্যাশলি ইডেন হালে বারাসতের ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে বদলি হয়ে এয়েচে। কদিন আগে সে আমার সঙ্গে দেখা করতে এয়েচিলো। ইডেনকেও বলতে পারো, তোমাদের আপিসের কর্নেল চ্যাম্পনিজের ধাতের মানুষ। সিবিলিয়ান ব্যুরোক্রাসি ওর ধাতে একেবারে সয় না। ইডেন বলচিলো, গত বছর আমিই উদ্যোগ নিয়ে টৌন হলে আইন ব্যবস্থার বৈষম্য নিয়ে সেই যে মিটিং করেচিলুম, তারপর থেকেই ওরা আমার ওপর আরো বেশি খাপ্পা হয়ে উঠেচে।

—সেটা খুবই স্বাভাবিক। —হরিশ বললে, এখন কি বুঝতে পারচো বাবু কিশোরীচন্দর, কোনটা আমাদের আগে দরকার—সমাজ সংস্কার না রাজনৈতিক অধিকার?

কিশোরীচাঁদ হেসে বললে, তুমিও কি বৃটিশ সিবিলিয়ানদের মতো জাঁতাকলে ফেলে আমাকে দিয়ে কবুল করিয়ে নেবে নাকি? না হরিশ, আমার বিশ্বাসে আমি এখনো অটল আছি। ওয়াকোপের মতো কিম্বা তার চেয়েও শয়তান লোক কি আমাদের এ দেশে নেই? বৃটিশের অনেক কিছুই আমাদের পীড়ার কারণ হয়েচে, ত আমি অস্বীকার করিনে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলবো, পুরনো বস্তাপচা সংস্কারগুলোকে ঝেড়ে ফেলে আমাদের জাত যতক্ষণ মানুষ না হয়ে উঠচে ততক্ষণ বৃটিশ শাসন ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় নেই।

হরিশ হেসে বললে, তোমার ভক্তি অচলা হোক। দোসরা আগস্ট তারিখে পার্লামেন্টে বিল পাশ হয়ে গেচে। জগদ্ধাত্রী মহারাণী ভিকটোরিয়া হয়তো দু'এক মাসের ভেতরেই আমাদের প্রতিপালন করবার দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিচ্চেন। অতএব, আমরা নিশ্চিন্ত মনে, এখন থেকে অনন্তকাল ধরে সমাজ সংস্কার করে যেতে পারবো, কী বলো?

—এত ঠাট্টা করো না হরিশ। আমার বিশ্বাস, আমাদের মতে তোমাকেও একদিন সায় দিতে হবে।

হরিশ হাসতে হাসতেই বললে, সায় দিলুম বলেইতো বলচি।

দুর্গোৎসব মিটে গেল।

কয়েকদিনের জন্যে লাস্যময়ী তরুণীর মতো উচ্ছল হয়ে উঠে আবার নিজের স্বাভাবিক চেহারায় ফিরে এলো টাউন কলকাতা। আগের বছর মিউটিনির ডামাডোলে এ সময়টা কেমন যেন একটু সন্ত্রাসের ভেতর দিয়ে কেটেছিল। হৈ-হুল্লোড় তেমন জমেনি। এ-বছর একেবারে নিশ্চিন্ত। গত বছরের কমতির হিসেবটা এবার দ্বিগুণ ভাবে উশুল করে নিয়েছে গ্র্যান্ড হিন্দু ফেস্টিভ্যাল।

কমিশনের শুনানি সমাপ্ত।

রায় যদিও এখনো বেরোয়নি, কিন্তু কানাঘুষোয় শোনা যাচ্ছে, তিনজন সদস্যের ভেতর বাবু হরচন্দ্র ঘোষ আর মিস্টার হাইন্ড নাকি কিশোরীচাঁদের পক্ষে রায় দিয়েছেন। তৃতীয় সদস্য মিস্টার ফার্গুসন বিপক্ষে।

মোটামুটি একটা মানসিক শান্তিতেই আছে কিশোরীচাঁদ। কৈলসবাসিনী মাঝে মাঝেই জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁ গা তোমারই জিৎ হবে তো?

কিশোরীচাঁদ বলিষ্ঠ স্বরেই বলে, নিশ্চয়ই।

দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে ইষ্টদেবতা রাধামাধবের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানায় কৈলাসবাসিনী। কথায় বলে, ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে। নড়বে বৈ কি, নিশ্চয়ই নড়বে।

এই ঝামেলাটা আরম্ভ হওয়ার পর এই ক'মাসে বেশ কয়েকবার এসেছে কুমুদিনী আর জামাই নীলমণি। সত্যিই মনের মতো জামাই পেয়েছে কিশোরীচাঁদ। তার যে পুত্রসন্তান নেই সে অভাবটা পূরণের জন্যে কত চেষ্টা নীলমণির। প্রতি সপ্তাহে এসে দেখা করে খবরাখবর নিয়ে যায়। তখন মনে হয়, সত্যিই যেন বাপের বিপদে ছেলে এসে পাশে দাঁড়িয়েছে।

কয়েকদিন পরের কথা।

আদালত থেকে ফিরে ধড়া-চুড়ো পালটে বিশ্রামের পর কিশোরীচাঁদ সবে বৈঠকখানায় এসে বসেছে, সেই সময় সেদিনকার ডাকের চিঠিগুলো এনে তার সামনে রেখে গেল আর্দালি।

বাঙলা সরকারের সেক্রেটারির দপ্তর থেকে একখানা চিঠি এসেছে।

সাগ্রহে তাড়াতাড়ি লেফাফা খুলে চিঠিখানা বের করলে কিশোরীচাঁদ। পড়বার পর চিঠিখানা তার হাতেই ধরা রইলো। স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো সে।

কমিশনের বিচারে বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্রের অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় বাঙলা সরকার দুঃখের সঙ্গে তাকে কলকাতার জুনিয়ার পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটের পদ তথা সরকারি চাকুরি থেকে বরখাস্ত করতে বাধ্য হলেন।

স্তব্ধ হয়ে কিশোরীচাঁদ কতক্ষণ বসে ছিল, তা সে নিজেই জানে না। যখন সম্বিত ফিরে এলো তখন কেবলমাত্র একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে উঠে দাঁড়ালে। নিজের পড়ার টেবিলের দেরাজ থেকে বের করলে তাঁর ডায়েরি। প্রতিদিনই রোজনামচা লেখা তার অভ্যেস। ডায়েরিতে সেদিনকার তারিখের পৃষ্ঠা বের করলে।

আটাশে অকটোবর, বৃহস্পতিবার, আঠারো শো আটান্ন সাল।

স্থির, শান্ত হাতে কলম ধরে কিশোরীচাঁদ লিখলে, ডিসমিস্‌ড্ ফ্রম মাই অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট অব ম্যাজিস্ট্রেট অব ক্যালকাটা। গডস ইউল বী ডান!

পঞ্চম পর্ব

নীলবিষে নীলকণ্ঠ

কত কথা! কত স্মৃতি!

সাড়ে চৌত্রিশ বছর বয়সের এই জীবনটা এরই ভেতর কত খাতেই না ব'য়ে গেল! কোথায় চ'লে গেছে সেই ছোটোবৌ যে হরিশকে ছেড়ে পৃথিবী থেকে চ'লে যাওয়ার কথা ভাবতেই পারতো না! কোথায় সেই ছোট্ট ছেলেটা? তাদের কথা আজ হঠাৎ বড়ো বেশি ক'রে মনে প'ড়ছে!

হরিশের তন্ময়তা যখন ভাঙলো তখন রাত নটা বাজে।

উত্তরদিকে টাউন কলকাতার আকাশ আরো বেশি মেতে উঠেছে। বাজি আর বাজি। আজ পয়লা নভেম্বর সারারাতেও বোধহয় এই আনন্দ-উল্লাসের শেষ হবে না! আর কোম্পানি নয়, এবার মহারানী ভিক্টোরিয়ার রাজত্ব!

জানালার কাছে আর একটু ক্ষণ দাঁড়িয়ে তারপর আস্তে আস্তে নিজের চেয়ারে এসে বসলে হরিশ। অনেকদিন পরে আজ মদের নেশায় যেন একটু ঝিম্ ধরেছে। অথবা ঝিম্ ধরেছে ভেবেই যেন একটু আমেজ পাওয়া যাচ্ছে! তাই বা মন্দ কী? মদ খেতে খেতে নেশার মৌতাতই প্রায় ভুলে গেছে সে। এখন মদ খায় শুধু অভ্যেসের টানে। সে অভ্যেসটাও চলে গেছে তার নিজের নিয়ন্ত্রণের বাইরে।

রামগোপাল বেশ কয়েকবার বলেছেন, তোমার জীবনটা দেশের কাছে বড়ো মূল্যবান হরিশ! এভাবে অপরিমিত মদ্যপান করে শরীরটাকে অকালে নষ্ট করো না। সতর্ক করেছেন বিদ্যাসাগর। ওই এক আশ্চর্য লোক বটে! দয়া মায়ার তো কোনো কূলকিনারাই নেই তাঁর! অথচ, যে কাজে গোঁ ধরবেন সেটা না করা পর্যন্ত বিশ্রাম নেই। কে কোথায় একটু ভালো কিছু করতে চাইছে, সব খবর লোকটার নখদর্পণে! হরিশের ওপর তাঁর স্নেহের টানের আর একটা বিশেষ কারণ আছে। বিদ্যাসাগরের এক ছোটভাইয়ের নাম ছিল হরিশ। সে নাকি দাদাকে বলে রেখেছিল, তার বিয়ের সময় খুব ধুমধাম আর বাজনাবাদ্যি করতে হবে। সে-ভাই সাত বছর বয়সেই মারা যায়। হয়তো সেই কারণেও হরিশ নামটার ওপর বিদ্যাসাগরের একটু বিশেষ দুর্বলতা আছে।

হরিশের সব খবরই রাখেন বিদ্যাসাগর। একদিন তিনি বলেছিলেন, তান্ত্রিকদের ভেতর বীরাচারী বলে একরকমের সাধক আছে জানো তো? তোমার কথা ভাবলেই আমার মনে হয়, তুমি বোধ হয় তাই! কারণবারি, সাধনসঙ্গিনী ভৈরবী—সবই তাদের সাধনার অঙ্গ, কিন্তু তার একটা মাত্রা মাপা থাকে বলে শুনেচি। তুমি যে মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্চ, সেইটাই আমার ভয়! তোমাকে যে অনেকদিন বাঁচতে হবে ভাই!

হরিশও হেসে বলেছিল, কিছু ভাববেন না দাদা, আমার জান্ বড়ো শক্ত জান্। যমরাজ চট্ করে এগোতে পারবে না। পেট্রিয়টকে লর্ড ডালহৌসিও যখন ভয় পেয়েচেন তখন যমরাজও পাবে। হাজার হোক, সে তো কালা আদমি?

হো হো করে হেসে উঠেছিলেন বিদ্যাসাগর। বললেন, এ একটা কথা বলেচ বটে! ডালহৌসি সাহেব নাকি ইংলিশম্যান কাগজে তোমাকে একটা মোটা মাইনের চাকরির টোপ দিয়ে তোমার মুখ বন্ধ করতে চেয়েছিলেন শুনেচি।

—আপনি কোথায় শুনলেন?

—আরে বাবা, এই উড়ে মালী ম্লেচ্ছ লোকটাকে তো হ্যালিডে সাহেবের সঙ্গে বলতে গেলে নিত্যই যোগাযোগ রাখতে হয়, সেটা ভুলে যাচ্চ কেন?

এ সব বেশ কিছুদিন আগের কথা।

হ্যালিডে সাহেবের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সে অন্তরঙ্গতার সূত্র এখন ছিন্ন। সরকারি চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছেন বিদ্যাসাগর। একই সঙ্গে তিনি ছিলেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ আর ইন্‌স্‌পেক্‌টর অব্‌ স্কুলস্‌। একই সঙ্গে দুটোতেই ইস্তফা। শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্‌টর সদ্য তরুণ সিবিলিয়ান গর্ডন ইয়ং সাহেবের সঙ্গে বিরোধ দানা বাঁধতে বাঁধতে এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছেছিল যে, আত্মসম্মান বজায় রাখার জন্যে আর কোনো উপায় ছিল না বিদ্যাসাগরের। মাথা নোয়ানোর মানুষ তিনি নন, সেটা বোধহয় বুঝতে পারেননি তরতাজা টগবগে সিবিলিয়ান ইয়ং সাহেব।

কিশোরীচাঁদের বাড়িতে অনেকেই জড়ো হয়েছিল কাল সন্ধ্যেবেলায়। মধু, গৌরদাস, গিরীশ, শম্ভুনাথ, হরিশ। অক্‌টোবর মাসের আটাশ তারিখে সরকারি চাকরি থেকে বরখাস্তের চিঠি পেয়েছে কিশোরীচাঁদ, আর কাল ছিল একত্রিশ তারিখ। লেপ্টেন্যান্ট গবর্নর হ্যালিডে সাহেবেরই সই করা চিঠি। স্বভাবতই বিদ্যাসাগরের ইস্তফার ব্যাপারটাও আলোচনায় উঠেছিল। যে হ্যালিডে জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে মডেল স্কুল চালু করবার জন্যে সমস্ত রকম সরকারি সাহায্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—গর্ডন ইয়ংয়ের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের মতবিরোধ প্রবল হয়ে উঠতেই তিনি কিন্তু নিজেকে গুটিয়ে নিলেন! কিশোরীচাঁদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আরো মজাদার! ওয়াকোপের সঙ্গে আপোসে বিরোধ মিটিয়ে নেওয়ার পরামর্শ তিনিই দিয়েছিলেন। তার বদলে কিশোরী যখন কমিশনের জন্যেই চাপ দিলে, তখন দেখা গেল, কমিশন হয়েছে বটে, কিন্তু সেখানে ওয়াকোপের পক্ষ নিয়ে সরকার নিজেই হয়ে দাঁড়ালেন বাদী আর কিশোরীচাঁদকে দাঁড় করানো হল আসামীর কাঠগড়ায়।

শম্ভুনাথ বললে, আর, জি, জি আর প্যারীদাদা দুজনেই এই কমিশনের জন্যে চাপ দেওয়ার ব্যাপারে বেশ অসন্তুষ্ট হয়েছেন, তা নিশ্চয়ই শুনেচ? তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস, হ্যালিডে সাহেবের সঙ্গে কথা বলে একটা যা হোক সম্মানজনক আপোসের ব্যবস্থা তাঁরা করতে পারতেন। তাহলে হয়তো পদচ্যুতির এই অপমানটা মাথায় তুলে নিতে হত না কিশোরীকে।

হরিশ বললে, তাঁদের সে অভিমত আগেই শুনেচি শম্ভু। তাঁদের দুজনকেই আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা করি। তা সত্ত্বেও এ কথা না বলে পারচি নে যে, আপোস জিনিসটা কখনো সম্মানজনক হয় না। সাপ কখনো ব্যাঙের সঙ্গে আপোস করে না।

মধুসূদন তখন সবে একটা পেগ হাতে তুলে নিয়েছে। হাঃ হাঃ করে হেসে উঠে সে বললে, ইণ্ডিয়ান ডিমস্থিনিসের সেই সখেদ উক্তির কথা বলচো শম্ভু? কুড হি টেক নো বেটার অ্যাডভাইস দ্যান ফ্রম টু ইয়ং ফ্লেমিং স্পিরিট্‌স্‌?

—হ্যাঁ, হরিশ আর তোমার কথাই বলেচেন।

—ওহ্‌ শম্ভু, হোয়াট আ ডিজার্ভিং কম্‌প্লিমেন্ট!—টু ইয়ং ফ্লেমিং স্পিরিট্‌স্‌! বাঙলায় কী বলা যাবে গিরীশ? দুটি জ্বলন্ত যৌবন শিখা? হোয়াট ইট মে বী, বাট আই মাস্ট কিস্‌ দ্যাট ওল্ড মডারেট ফর দ্য কম্‌প্লিমেন্ট!

হরিশ হেসে বললে, তোমার চুমু খাওয়ার ঠেলায় বেচারা আর, জি, জি-র প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে এই আর কি! হ্যাঁ, যা বলচিলুম শম্ভু, কমিশন না বসলেও পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটের চেয়ারে বসে সসম্মানে আর কাজ করা ওর পক্ষে সম্ভব হত না। যেমন করেই হোক ওকে অপদস্থ করে প্রতিশোধ নিতই ওয়াকোপের দল। তার চেয়ে এটা অনেক ভালো হল বলেই আমার বিশ্বাস। ব্যারিস্টার মিস্টার নিউমার্চের জেরার মুখে ওদের সাজানো নালিশের সবটুকুই ফাঁস হয়ে গেচে, তা তো দেখেচ? এমন কি, ইংলিশম্যান পর্যন্ত এই বিচার-প্রহসন দেখে কিঞ্চিৎ লজ্জা পেয়েচে। বিদ্যেসাগর নিজের দাপটে ইস্তফা দিয়েচেন আর কিশোরীর ক্ষেত্রে কমিশন বসিয়ে ওদের অবিচারের মুখোশটা খুলে গেল, নেটিব হিসেবে আপাতত সেইটুকুই আমাদের লাভ!

গৌরদাস বললে, এ কথাটা তুমি ঠিকই বলেচ। হ্যালিডে সাহেবের সঙ্গে কিশোরীর হৃদ্যতাও কিছু কম ছিল না। অথচ কমিশনের দুজন মেম্বরের রায় ওর পক্ষে থাকা সত্ত্বেও তিনি তো ওকে রেহাই দিলেন না?

—ওঃ, ইউ আর দ্য মোস্ট সুইট ইডিয়ট গৌর। আরে বাবা, পারসী আর ইমামে ঝগড়া বাধলে কাজীর বিচারে ইমাম-ই যে জিতবে, এ তো জানা কথা! কি বুদ্ধি নিয়েই যে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটগিরি করচো! হরিশ, এরপর থেকে তোমার পেট্রিয়টে গৌর যে সব লেখা পাঠাবে, সেগুলো একটু ভালো করে দেখে তবে ছেপো।

গৌরদাস হাসতে হাসতে বললে, ভয় নেই হে মধু! আমি তো আর মাইকেল, এম. এস, ডাটের মতো বাঙলা নাটক লিখতে যাচ্চিনে যে, লাইনে লাইনে কলম চালাতে হবে?

মধুসূদন হঠাৎ গৌরদাসের একখানা হাত চেপে ধরে বলতে আরম্ভ করলে, আমি প্রতাপশালী দৈত্যরাজের আদেশানুসারে এই পর্বত প্রদেশে অনেকদিন অবধি বাস কচ্চি; দিবারাত্রের মধ্যে ক্ষণকালও স্বচ্ছন্দে থাকি না; কারণ ঐ দূরবর্তী নগরে দেবতারা যে কখন কি করে, কখনই বা সেখান হতে রণসজ্জায় নির্গত হয়, তার সংবাদ অসুরপতির নিকট তৎক্ষণাৎ লয়ে যেতে হয়। আর এ উপত্যকাভূমি যে নিতান্ত অরমণীয় তাও নয়;—স্থানে স্থানে তরুশাখায় নানা বিহঙ্গমগণ মধুর স্বরে গান কচ্চে; চতুর্দিকে বিবিধ বনকুসুম বিকশিত, ওই দূরস্থিত নগর হতে পারিজাত পুষ্পের সুগন্ধ সহকারে মৃদুমন্দ পবন সঞ্চার হচ্চে; আর কখন কখন মধুরকণ্ঠে অপ্সরীগণের তানলয় বিশুদ্ধ সঙ্গীতও কর্ণকুহর শীতল করে; কোথাও ভীষণ সিংহের নাদ, কোথাও ব্যাঘ্র মহিষাদির ভয়ংকর শব্দ, আবার কোথাও বা পর্বতনিঃসৃতা বেগবতী নদীর কুলকুল ধ্বনি হচ্চে। কি আশ্চর্য!

ব্যাপারটা কেউ বুঝতে পারেনি কিন্তু সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনছিল। মধুসূদন হঠাৎ থেমে যেতেই শম্ভুনাথ বললে, সত্যিই কি আশ্চর্য! কোথ্‌থেকে আবৃত্তি করলে মধু?

—মাইকেল এম. এস. ডাটের বাঙলা নাটক শর্মিষ্ঠার প্রথম অংক, প্রথম গর্ভাংকের একেবারে আরম্ভ থেকে।

—এত সুন্দর বাঙলা লিখেচ তুমি!—বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো হরিশ।

মধুসূদন এবারে গৌরদাসের হাতে রীতিমতো জোরে বেশ কয়েকটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, কি হে গৌরদাস বসাক, কিছু কলম চালিয়ে দেবে নাকি?

সে ঠাট্টা গায়ে না মেখে মধুসূদনকে জড়িয়ে ধরে গৌরদাস বললে, সত্যিই তাহলে তুমি লেখা শুরু করেচ মধু! নাটক কদ্দুর এগিয়েচে বলো!

—প্রথম অংক শেষ করে দ্বিতীয় অংকে হাত দিয়েচি। নাউ মাই বিলাভেড গৌর, উড ইউ অ্যাডমিট ইয়োর মধু টু বী আ জিনিয়াস?

নিশ্চয়ই!—আরো আবেগে মধুসূদনকে জড়িয়ে ধরলেন গৌরদাস।

মধুসূদন বললে, দ্যাখো বাবা, যশোর নগর ধাম প্রতাপ আদিত্য নাম মহারাজা বঙ্গজ কায়স্থ—রায়গুণাকরের কথা মনে আচে তো? সেই যশোরের কায়েত আমি। বেলগাছিয়া ভিলায় রাজাদের সামনে যেদিন বলে এয়েচি, আমি ভালো নাটক লিখে দেবো, সেদিন থেকেই মাথায় বাঙালের গোঁ চেপে গেচে। শর্মিষ্ঠা ইজ ওয়ান অব্ মাই ফেভারিট লেডিস ইন মহাভারত। আই হ্যাভ স্টার্টেড মাই ফার্স্ট স্টেজ প্লে উইথ দ্যাট পুয়োর সোল!

—এইটুকু শুনেই মুগ্ধ হয়ে গেচি মধু! আমি কিন্তু সত্যিই ভাবতে পারিনি এত ভালো বাঙলা তুমি লিখতে পারবে!

—আরে বাবা, আমিও কি জানতুম নাকি? কিন্তু প্রতিজ্ঞা যখন করে ফেলেচি তখন পিছিয়ে আসার পাত্তর আমি নই, তা তুমি জানো। এশিয়াটিক সোসাইটি রয়েচে আর রয়েচে বিদ্যেসাগর। ভয়টা কী? বাঙলা পড়তে গিয়ে দেখলুম তালতলার চটি-পরা ওই টুলো পণ্ডিত ঝোপজঙ্গল

কেটে সাফ করে বাঙলা ভাষার রাস্তাটিকে ঝকঝকে করে দিয়েচে। হি ইজ রিয়েলি আ জায়েন্ট। হাত খুলে গেছে গৌর! আমার শর্মিষ্ঠা যখন বেলগেছিয়ায় মঞ্চস্থ হবে তখন দেখবে, ইট্‌স্‌ রিয়েলি মধুময় ফ্রম দ্য পেন অব্‌ মধুসূদন।

কেল্লায় রাত নটার তোপ পড়লো।

পকেট থেকে চেনঘড়িটা বের করে সময় মিলিয়ে দেখে কাগজ কলম টেনে নিয়ে বসলে হরিশ। পরের সংখ্যায় পেট্রিয়টের জন্যে আর একটা লেখাও এগিয়ে রাখা যাক।

আকাশে বাজির রোশনাই এখন অত ঘন ঘন না হলেও একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি। হয়তো টাউন কলকাতায় এখনই সবে ভালো ভালো বাজির খেলা শুরু হয়েছে, চলবে সারারাত। সেখানে টাকা ওড়ানোর লোক আছে, টাকা উড়ছে। দক্ষিণের এই ডিহি বিরজি আর ভবানীপুরে টাকা কোথায়?

আলমারি খুলে আরেকটা হুইস্কির বোতল বের করে আর একটুখানি মদে গলা-বুক ভিজিয়ে নিলে হরিশ। বোতলটা তুলে রেখে তৈরি হয়ে বসলে।

আজকাল মাঝে মাঝে বুকের ভেতরটায় কেমন যেন হাঁপ ধরে। মাঝে মাঝে কেমন যেন একটা চাপা ব্যথায় কন্‌কন্‌ করে বুক। আবার শীত আসছে, আবার হয়তো মাথা চাড়া দেবে হাঁপানি।

চন্দরা গয়লানিকে দিয়ে সেই ছোটোবেলায় কোন্‌ সাধুবাবার কাছ থেকে মা যে মাদুলিটা আনিয়ে গলায় পরিয়ে দিয়েছিলেন, সেটার দ্বারা আজ পর্যন্ত কোনো উপকার বোঝেনি হরিশ। তবু মাদুলিটা সে খুলে রাখেনি। মা মনে কষ্ট পাবেন। মাদুলির সুতো, এর ভেতর যতবার পচে ছিঁড়ে গেছে, ততবার-ই নতুন সুতো কিনে সেটাকে আবার গলায় ঝুলিয়ে রেখেচে সে। তার নিজের বিশ্বাস না থাক, মায়ের বিশ্বাসকে অযথা আঘাত দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়।

কিছুটা লিখেই কলম নামিয়ে রাখল হরিশ।

আজ তার লেখার অভ্যস্ত গতিটা যেন কিছুতেই আসছে না। আপনমনেই সে হাসলে। তবে কি রাণী ভিক্‌টোরিয়ার ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই সেই হরিশ মুখুজ্যে ফুরিয়ে গেল?

আসলে আজ কেমন যেন একটা স্বেচ্ছা-অবসাদে পেয়ে বসেছে। ছুটি পেয়ে গোবিন্দ, হরিগোপাল আর নন্দরাম সেই কখন বাড়ি চলে গেছে। তাদের কেউ থাকলেও হয়তো কিছু কাজ সে করতো। কিন্তু এই নিঃসঙ্গ অবসরে আজ কোনো কাজ করতে ইচ্ছে করছে না। এ যেন একনাগাড়ে অনেকটা পথ পেরিয়ে আসার পর একটা পুকুরপাড়ে অশ্বত্থগাছের ছায়ায় বসে একটু জিরিয়ে নেওয়ার মতো সাধ। কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে আঁজলা ভরে পুকুরের ঠাণ্ডা জল খেয়ে আবার হয়তো কড়া রোদ মাথায় নিয়ে সামনের পথে পা চালাতে হবে। মাথার ওপর জ্বলন্ত সূর্য, পায়ের নীচে উত্তপ্ত ধুলোর বিকীর্ণ উত্তাপ।

আজ যতই বাজি পুড়ুক, মহারাণীর দীর্ঘজীবন যত আন্তরিকভাবেই কামনা করা হোক, হরিশের সংশয় দূর হচ্ছে না। তার কেবল-ই মনে হচ্ছে, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ আর আমেরিকার উপনিবেশে অর্জন করা অভিজ্ঞতাকে এবার হয়তো আরো সূক্ষ্ম কৌশলে কাজে লাগানো হবে সোনার খনি ভারত সাম্রাজ্যে। আজকের ঘোষণা-পত্র হয়তো তারই পূর্বাভাস!

বিদ্রোহের সময় হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পূর্ণ শক্তি দিয়ে লর্ড ক্যানিংকে সমর্থন জানিয়ে যাওয়ায় সবাই খুশি। হ্যাঁ, বাঙালির মুখ রেখেছে বটে হরিশ মুখুজ্যে! পত্রিকার গ্রাহকের সংখ্যা দু বছর আগেই বাড়তে আরম্ভ করেছিল। সে সংখ্যা বাড়তে বাড়তে এখন হিন্দু পেট্রিয়টকে লাভের মুখ দেখিয়েছে। লোকসান টানতে টানতে একেবারে হতাশ হয়ে যে পত্রিকাকে একসময় বন্ধ করে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মধুবাবু—আজ সে পত্রিকায় খরচ-খরচার পরেও মাসে মাসে কিছু টাকা উদ্বৃত্ত হয়। এখনো যেন সে-কথা বিশ্বাস করতে অবাক্‌ লাগে হরিশের। লোকের

হাতে হাতে ঘুরছে পেট্রিয়ট, গ্রাহক সংখ্যা বাড়ছে আর বাড়ছে। বিদ্রোহের আগুন নিবেছে। ব্রিটিশ শাসনের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে থাকতে পারার আনন্দে কলকাতার বাঙালি আশ্বস্ত।

দুর্গোৎসবের কয়েকদিন পরে বিদ্যোৎসাহিনী সভার একটা অনুষ্ঠানে গিয়েছিল হরিশ। কালীপ্রসন্ন ছেলেটা সেদিন মজা করে একটা কথা বলেছিল, দাদা, হুড়ো জিনিসটা কাকে বলে, এই দেড়বছরে ইংরেজের সেটা যেমন মালুম হয়েছে, তেমনি একটা বিরাট তত্ত্বজ্ঞানও হয়েচে। রাজ্য রক্ষের সঙ্গে সেই তত্ত্বজ্ঞান ওদের নীট লাভ। ধরুন, রোগ, শোক, বিপদে নচ্ছার স্বামী যেমন সতীসাধ্বী স্ত্রীর মূল্য বুঝতে পারে, এই মিউটিনির কল্যাণে ইংরেজও তেমনি অ্যাদ্দিনে বাঙালীর দাম বুঝতে পেরেচে।

হো হো করে হেসে উঠেছিল হরিশ।

কালীপ্রসন্ন মজা করেই বলেছিল বটে, কিন্তু কথাটা যে ষোলো আনা খাঁটি তাতে হরিশেরও সন্দেহ নেই। পাছে বাঙালীর রাজভক্তি নিয়ে ইংরেজের মনে কোনো সন্দেহ জাগে তাই ধনী আর শিক্ষিত বাঙালীরা গোপাল মল্লিকের বাড়িতে বিরাট সভা ডেকে বিদ্রোহী সেপাইদের মুণ্ডুপাত করে নিজেদের রাজভক্তি সম্বন্ধে ইংরেজকে আশ্বস্ত করেছেন। হরিশ সে সভায় যায়নি।

মিউটিনি না গ্রেট ইণ্ডিয়ান রেভোল্যুশন?

আবার ঘুরে ফিরে সেই প্রশ্নটাই মনে আসছে। রামগোপালের মতো ব্যক্তি থেকে আরম্ভ করে গিরীশ, কিশোরী পর্যন্ত সবাই একবাক্যে একে মিউটিনি বলেই মার্কা দিয়ে নিশ্চিত। শম্ভুচাঁদ ছেলেটা কিন্তু তা করেনি। তার চোখে এই বিদ্রোহের আড়ালে অন্য একটা তাৎপর্য ধরা পড়েছে। হয়তো সেই কারণেই তাকে কাছের মানুষ বলে মনে হয়েছে হরিশের। ছেলেটাকে ডেকে নিয়ে তাই হয়তো নিজের সহকারী করে নিয়েছে সে।

কালী সিংঘি ছেলেটা বিরাট একটা কাজে হাত দিয়েছে।

সংস্কৃত মহাভারতকে বাঙলা গদ্যে অনুবাদ করবে, এই তার সংকল্প। অনুপ্রেরণা দিয়েছেন বিদ্যাসাগর। তিনি নিজেই মহাভারতের গদ্য অনুবাদে হাত দিয়েছিলেন। তার বেশ কিছুটা ছাপাও হয়েছিল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়। তারপর কেন যে হঠাৎ এত বড়ো একটা দায়িত্ব কালীপ্রসন্নর ওপর ছেড়ে দিলেন, সেটা আশ্চর্য! সম্ভবত একবছর ধরে সরকারি শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে মতান্তর-মনান্তরের ফলে তিনি ক্লান্ত বলেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। শুধু দায়িত্ব দেওয়াই নয়, অনুবাদের জন্যে কয়েকজন বিচক্ষণ নির্ভরযোগ্য পণ্ডিতও তিনি দিয়েছেন কালীপ্রসন্নকে। নিঃসন্দেহে বিরাট ব্যয় এবং শ্রমসাধ্য কাজ। বরানগরের বিরাট বাগানবাড়িকে 'সারস্বতাশ্রম' নাম দিয়ে সেখানেই কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে কালীপ্রসন্ন। লোক চেনার ক্ষমতা বিদ্যাসাগরের আছে। নইলে ওইটুকু ছেলের ওপর এতবড়ো একটা গুরুদায়িত্ব দিয়ে তিনি নিশ্চিত হবেন কেন? হরিশেরও বিশ্বাস এ দায়িত্ব কালীপ্রসন্ন পালন করতে পারবে।

'গড সেভ দ্য কুইন' প্রার্থনা নিয়ে আবার একটা রঙীন হাউই আকাশে উঠলো। আলোর আলো হয়ে উঠলো কাছের আকাশ।

ধনী বাঙালী সত্যিই তাহলে মনে প্রাণে রাণী ভিক্টোরিয়ার দীর্ঘায়ু কামনা করে? আর সেই সঙ্গে এটাও কি কামনা করছে না যে, ইংরেজ শাসনের ছত্রছায়ায় তার দেওয়ানি আর দালালির সৌভাগ্য অক্ষয় হোক?

নানাসাহেবের কানপুর আবার যখন হ্যাভলক সাহেবের দখলে এলো, তখন সেখানকার কমিসারিয়েটের চাকুরে বাঙালীরা সবচেয়ে আগে সাহেবের কাছে ছুটে গিয়ে জানিয়েছিল, মহামান্য হুজুরের এ কথা নিশ্চয়ই অবিদিত নয় যে, আমরা বাঙালীরা ভীরু জাত? আমরা বরাবর রাজভক্ত ছিলুম, আছি এবং থাকবো।

উত্তর ভারত জুড়ে বাঙালী একটা বিশ্বাসঘাতকের জাত হিসেবে চিহ্নিত হয়ে গেছে। বাঙালীকে

ইংরেজের ডান হাত হিসেবেই দেখেছে বিদ্রোহীরা। তাদের সে ধারণা হয়তো ভুল নয়। অথচ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অজস্র অর্থ আর রসদ দিয়ে অকৃপণ হাতে ইংরেজকে সাহায্য করেছে হায়দরাবাদের নিজাম, গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া, পশ্চিমভারতের ধনী পার্শী সম্প্রদায়। যার যেটুকু সামর্থ্য তাই দিয়েই অসংখ্য জমিদার-তালুকদার সাহায্য করেছে কোম্পানিকে। তার ভেতর বর্ধমানের মহারাজা থেকে আরম্ভ করে বিহার-অযোধ্যা-রোহিলাখণ্ডের অনেকেই আছে। আর অনুগত নেটিব সেপাইয়ের দল? শিখ আর গুর্খা রেজিমেণ্টের সেপাইরা তাদের ইংরেজ সেনাপতির হুকুমে অবিচলিত হাতে বন্দুকের ট্রিগার টিপেছে বিদ্রোহীদের বুক লক্ষ্য করে! তবু বাঙালী এমন আলাদাভাবে চিহ্নিত হল কেন? কলকাতায় কোম্পানি সরকারের রাজধানী—এইটেই কি তার কারণ?

না, আর একটা বড়ো কারণ আছে। আজকের কলকাতায় এই মাত্রাহীন উচ্ছ্বাস সে কারণটাকে বেশ প্রকট করে তুলেছে।

এদেশে লুট করতে এসেছে পরদেশি বেনিয়া। তাদের লুঠের ভাগ পায় বাঙালীবাবুরা। সেই জন্যেই পরদেশি ফিরিঙ্গির ওপর বাঙালীর এত দরদ!

একটু চঞ্চল হয়ে উঠলে হরিশ।

বাঙালী মানে কি শুধু কলকাতার শিক্ষিত আর ধনী বাঙালী? এই গোটা বাঙলাদেশের গ্রাম-গ্রামান্তরে বুকের কান্না গলায় চেপে রেখে শুধু দারিদ্র্য আর অত্যাচারের বোঝা বয়ে চলেছে যে লক্ষ লক্ষ মানুষ, তারা তবে কে? তারা কি বাঙালী নয়?

বীরভূম জেলায় চাষীদের বিদ্রোহে প্ররোচনা দেওয়ার অপরাধে করিম খাঁ নামে এক চাষী সর্দারের ফাঁসি হয়েছে। একই ধরনের অভিযোগে মেদিনীপুর জেলায় ফাঁসি হয়েছে বৃন্দাবন তেওয়ারি নামে এক গরীব ব্রাহ্মণের। বিদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত করে দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে মীর জাগ্গু আর শেখ জামিরুদ্দিন নামে দুই চাষী সর্দারকে। ফরিদপুরের ফরাজী নেতা দুদু মিঞাকে বাইরে রাখতে সাহস পায়নি কোম্পানি সরকার। তাকে রাজবন্দী করে রাখা হয়েছে আলিপুরের জেলখানায়।

কলকাতার বাবু-বাঙালীর চোখের আড়ালে সে জগৎ একেবারে আলাদা!

শ্রীহট্ট আর চট্টগ্রাম থেকে বিদ্রোহী সেপাইরা যখন দিল্লীর পথে রওনা হয়েছিল, তখন গ্রামের গরীব চাষীরাই জুগিয়েছিল তাদের খাবার। তারাই বিদ্রোহীদের রাতের আস্তানা করে দিয়েছিল নিজেদের গ্রামে, নিজেদের কুঁড়ে ঘরের আঙিনায়।

বিদ্রোহ আরম্ভ হয়ে যাওয়ার পর হাজার হাজার চাষী-রায়ত জমায়েত হয়েছিল মুর্শিদাবাদে। নবাব-বংশধর ফেরেদুন শার কাছ থেকে তারা চেয়েছিল হুকুম। তারা নবাবকে মানে, ফিরিঙ্গিকে মানবে না! নবাব শুধু একবার নিজের মুখে তাদের হুকুম দিন!

কোম্পানি মাসোহারায় অভ্যস্ত সন্ত্রস্ত দেরেদুন শা সে হুকুম দিতে পারেননি। তাঁর মুখ থেকে সেদিন যদি একটা কথাও বেরোতো, তবে হয়তো উত্তর ভারতের আগেই বাঙলার গ্রামে গ্রামেই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠতো বিদ্রোহের প্রথম আগুন!

নীলকর সাহেবদের নৃশংস অত্যাচারে ঘরে ঘরে উঠেচে কান্নার রোল। তাই সেপাইদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সেই অসহায় কান্নাকে তারা রুদ্ররোষের জ্বলন্ত আগুনে পরিণত করতে চেয়েছিল, কিন্তু তা হল না। বিদ্রোহী উত্তর-ভারতের চোখে কোম্পানির প্রসাদ-পুষ্ট বাবু-বাঙালিই কেবল তার রাজভক্ত চেহারা নিয়ে পরিচিত হয়ে রইলো, বিক্ষুব্ধ বাঙালী চাষী-রায়তকে তারা জানলে না।

মনের ভেতর উত্তেজনার উত্তাপ ক্রমেই বাড়ছে। আবার বোতল বের করে কিছুটা হুইস্কি গলায় ঢেলে দিয়ে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল হরিশ।

রামগোপালের সঙ্গে এই কথাবার্তা মনে পড়ছে।

আন্তরিকভাবেই রামগোপাল স্নেহ করেন হরিশকে। তিনি একদিন বলেছিলেন, আইন

শাস্ত্রের ওপর তোমার যে-রকম দখল এসে গেচে হরিশ, তাতে আমার মনে হয়, তুমি ওকালতির পেশা নিলে যেমন নাম করতে পারবে, তেমনি অনেক বেশি উপার্জনও করতে পারবে। মিলিটারি অডিট আপিসের ওই সামান্য মাইনের চাকরি দিয়ে হবে কী? ও চাকরি তুমি ছেড়ে দাও। তোমার ভেতর যে ক্ষমতা আছে, তাকে পুরোপুরি কাজে লাগাও।

হরিশ বললে, আপনি আমার আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের কথা চিন্তা করেই এ উপদেশ দিচ্ছেন তা জানি দাদা! কিন্তু সত্যিই যদি আমার ভেতর কোনো ক্ষমতা থাকে, তাহলে আশীর্বাদ করুন, উপার্জন বৃদ্ধির জন্যে চেষ্টার বদলে সে ক্ষমতাটুকু আমি যেন পেট্রিয়টের ভেতর দিয়েই দেশের কাজে লাগাতে পারি?

—উপার্জন বৃদ্ধি হলে তোমার দেশের সেবায় বাধাটা কোথায়?

—একটু বাধা আছে বৈকি দাদা! পাঁচটায় আপিস ছুটির পর আমি স্বাধীন। তখন থেকে যতক্ষণ খুশি আম পেট্রিয়টের পেছনে সময় দিতে পারি। কিন্তু ওকালতি পেশায় নেমে পড়লে মামলার ব্রীফ আর লাভ ক্ষতির হিসেব নিয়েই যে সময় কেটে যাবে।

—এ তোমার ভুল ধারণা। তাই যদি হয় তাহলে রমাপ্রসাদ, শম্ভুনাথ, জগৎ—এরা সবাই ওকালতি করেও দেশের কাজ করছে কিভাবে বলো?

রমাপ্রসাদ হল রাজা রামমোহনের ছেলে আর জগদানন্দ মুখুজ্যে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। সবায়ের সঙ্গেই হরিশের বিলক্ষণ পরিচয় আছে। শম্ভুনাথ তো বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু।

হরিশ মৃদু হেসে বললে, হয়তো আমার ধারণা ভুল।.. কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনার এ উপদেশ নিতে সত্যিই আমি সাহস পাচ্চিনে দাদা। আপনাদের আশীর্বাদে যা হোক ছোটোখাটো একটা বাড়ি করতে পেরেচি আর পেট্রিয়টকেও এখন আর লোকসান দিতে হচ্চে না—এই আমার যথেষ্ট। যা মাইনে পাই, তাতে সংসারের ব্যয় নির্বাহ হয়ে যায়। আর টাকার দরকার কী?

অবাক দৃষ্টিতে হরিশের মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন রামগোপাল। আর সবাইকে তিনি মোটামুটি বুঝতে পেরেছেন কিন্তু এই গরীব বামুনের ছেলেকে এখনো পর্যন্ত কিছুতেই যেন পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারেননি।

হরিশ বললে, আমার অপরাধ নেবেন না দাদা।

রামগোপাল বললেন, না, না, অপরাধ নেবার কোনো প্রশ্নই নেই হরিশ। ঠিক আছে, তোমার নিজের যেটা ভালো বিবেচনা হয়, তুমি সেই পথেই চলো।

জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আপনমনে সেদিনের সেই কথাগুলোই ভাবছে হরিশ। দেশের কাজ করতে চায় বলে রামগোপালের প্রস্তাবে সে রাজি হয়নি। কিন্তু এ পর্যন্ত কতটুকু কাজ করতে পেরেছে?

সে নিজেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে।

কোথায় যেন একটা ফাঁক রয়ে গেছে। সে যা চায়, তার কিছুই হয়তো এখনো করে উঠতে পারেনি। মনের ভেতরকার পুঞ্জীভূত বিক্ষোভের কিছুটা হয়তো মাঝে মাঝে পেট্রিয়টের পাতায় মুখর হয়ে ওঠে, কিন্তু তার পরেই আবার যেন স্তিমিত হয়ে যায়। কখনো কখনো বেসুরো। শ্বেতাঙ্গদের শোষণ-কৌশলের এত নিদর্শন দেখেও তো এদেশের পক্ষে ব্রিটিশ শাসনের অন্য কোনো বিকল্প সে চিন্তা করতে পারছে না। বিদ্রোহীরা জয়ী হলে হয়তো আবার ফিরে আসতো মোগল কিম্বা নবাবী শাসন। ভারতবর্ষ আবার ফিরে যেতো মধ্যযুগের অন্ধকারে। তারপর?

কেউ কেউ বলছে বিদ্রোহ সম্বন্ধে তার বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ ভুল; কিন্তু বিদ্রোহের সূচনা থেকে লর্ড ক্যানিংয়ের নীতিকে আগাগোড়া সমর্থন জানিয়ে সে দেশের পক্ষে একটা বিরাট কাজ করেছে। অথচ তারই পাশাপাশি কয়েক হাজার ধর্মান্ধ, গোঁয়ার, অশিক্ষিত সেপাইয়ের উচ্ছৃঙ্খল আচরণকে 'গ্রেট ইণ্ডিয়ান রিভোল্ট' আখ্যা দিয়ে সেপাইগুলোকে সে বড়ো বেশি গৌরবের ভাগী করেছে।

এটা তার চরমপন্থী চিন্তার-ই একটা আবেগময় প্রকাশ মাত্র। ভারতবর্ষের পক্ষে পশ্চিমের শিক্ষা-দীক্ষার নতুন আলো এখন অপরিহার্য। তারই জন্যে এদেশে বৃটিশ শাসনও সবচেয়ে বেশি দরকারি। সুতরাং দেশভক্ত হিসেবে হরিশের এমন কিছু করা উচিত হবে না, যাতে এ দেশের মানুষের মন ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিষিয়ে ওঠে!

পরাধীনতার জ্বালাকে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে বলেই দেড়বছর আগে বিদ্রোহের বহ্নিবলয় লেলিহান হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পেট্রিয়টের পৃষ্ঠায় সেই মর্মবেদনাকে সে প্রকাশ করেছিল। আঁৎকে উঠেছিল বন্ধুরা। এমন কি, যে গিরীশ লর্ড ডালহৌসির বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার দিতেও ইতস্তত করেনি, সে পর্যন্ত বলেছিল, এই মারাত্মক কথাটা কেন লিখতে গেলে হরিশ?

হরিশের এখনো মনে আছে, গিরীশের দিকে একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে মৃদু হেসে হরিশ বলেছিল, কোনো ভয় নেই গিরীশ, দেশের কটা মানুষে ইংরিজি বোঝে যে আমার ওই দুটো লাইন পড়ে তারা ফরাসি বিপ্লবের মতো বিপ্লব ঘটিয়ে বসবে? আর, ইংরেজও এত সহজে এদেশ ছেড়ে যাবে না কারণ তাহলে ওদের দু'বেলা খাওয়াই জুটবে না। দুশ্চিন্তার কারণ নেই, ওরাও বহাল তবিয়তে থাকবে, আমরাও আবেদন-নিবেদনের খসড়া করবার অঢেল সুযোগ পাবো।

—বাবু!

জানালার বাইরে থেকে অচেনা গলার ডাক শুনে হরিশ তাকালো। একেবারে জানালার কাছেই এসে দাঁড়িয়েছে লোকটি। বৃদ্ধ একটা গ্রাম্য লোক।

হরিশের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই হাত জোড় করে লোকটি বললে, ভারী বেঘোরে পড়িচি বাবু, আমার এট্টু উব্‌গার কত্তি পারো?

—ঘরে এসো।

বৃদ্ধ লোকটি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বললে, ঘরের মদ্দি ক্যামন করে যাবো বাবু? মুই যে বাগ্‌দি—

—তার জন্যে কিছু আটকাবে না। আমি তো বলচি, তুমি ঘরের ভেতরে এসো!

বুড়ো লোকটি সংকোচে জড়োসড়োভাবে ঘরে ঢুকে দরজার কাছে দাঁড়ালো। নিকষ কালো গায়ের রঙ, চুলগুলো সব শাদা হয়ে গেছে, কিন্তু চামড়ায় কোনো ভাঁজ পড়েনি। দেখলেই বোঝা যায়, যৌবনে রীতিমতো তাগড়াই জোয়ান চেহারা ছিল। কপালের ডানদিকে বেশ বড়ো একটা কাটা দাগ। পরনে ময়লা একখানা খাটো ধুতি, খালি গা, হাতে গামছায় বাঁধা ছোটো একটা পুঁটুলি আর মজবুত মোটা একখানা লাঠি।

—বাড়ি কোথায়!

—আজ্ঞে, নদে-যশোরে বাবু, গাঁ'র নাম পিঁপড়েগাছি।

পিঁপড়েগাছি নামটা যেন চেনা চেনা মনে হল হরিশের। কিন্তু কোথায় কার কাছে শুনেছে, সেটা কিছুতেই মনে পড়ছে না। সে চিন্তা ছেড়ে দিয়ে বললে, নাম কী? এখানে কোথায় এয়েচ? কী বিপদে পড়েচ?

—নাম আজ্ঞে করালীচরণ। কালীঘাটে তীত্থীদশ্যন কত্তি আয়েচি বাবশ। কিন্তু যেনার ভস্‌সায় আসা, তেনার বাড়িডে খুঁজে পাচ্চিনে।

—নাম কী?

—আজ্ঞে গিরিবালা। আমাগোর গাঁর বদ্দিনাথ ঘোষের নাতবৌ। এই ভমানিপুরিই কোতায় ঝ্যান্ তার বাপের বাড়ি। এই কদিন হল বাপের বাড়ি আয়েচে। মেয়েডা ঝ্যান্ আকারে নক্‌কি পিতিমে। সিনি হলেন গয়লা ঘোষের বাড়ির বৌ, আর আমি তো ছোটো জাত, কিন্তু আমারে ভারি মান্যি করে। বাপের বাড়ি আসার আগে দিদি আমারে পই পই করে বলেলো, তুমি তীত্থীদশ্যন কত্তি বেয়ো দাদা, তোমার কিচ্চু অসুবিধে হবে না। আমার বাপের বাড়িত্থে কালীঘাটের মা'র মন্দির তো আদ কোশ পথ। আমাগোর পাড়ায় পাঁচ-ছয় রশির লাগালেই তোমাদের জেতের কয়ঘর

নোক থাকে, সেখেনেই দুই একদিন তোমার থাকার ব্যবস্তা করে দেবানে। কিন্তু বাবু, সেই কোন্ বেলায় কলকেতায় এসি নামিচি— চাদ্দিকি খালি বাজি পটকা আর হৈচৈ। পথের নোকেরে জিগ্‌গেসা কত্তি কত্তি এই রাত্তিরি তউ ঝাক ভমানীপুর খুঁজে পালাম কিন্তু অ্যাকন কী করবো তা তো বুজে উটীত পারিতিচি না। দিদি তার বাপের নামডা আমারে কয়ে দিয়েলো কিন্তু নামডা আমারে মনে নাই বাবু!

—নামটা কী গোপীকান্ত?

অকূলে কূল পেয়ে হর্ষে, উত্তেজনায় একগাল হাসিতে ভরে উঠলো বুড়োর মুখ। এইবার নামটা তার মনে পড়েছে। হ্যাঁ, এই নামই তো বলেছিল বটে। হরিশের দিকে কৃতজ্ঞের দৃষ্টিতে তাকিয়ে করালী বললে, আজ্ঞে হাঁ গুপীকান্ত। তারে তুমি চেনো বাবু?

হ্যাঁ, ছেলেবেলা থেকেই চিনি।

—তয় তো মা কালী আমারে ঠিক জাগায় এনি দেচেন। তা বাবু, কোন্ দিক গেলি তার বাড়িডে পাবো, আমারে দয়া করে এট্টু কয়ে দেবা?

—এত রাতে অচেনা জায়গায় খুঁজে নিতে তোমার অসুবিধে হবে কত্তা। তাছাড়া, তারা হয়তো এতক্ষণে খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়েচে। তোমার কোনো চিন্তা নেই, কাল সকালে তোমাকে তাদের বাড়িতে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা আমি করবো।

করালী নিশ্চিন্ত হ'য়ে বললে, তোমার অগাদ দয়ার শরীল বাবু। মুই আজকের রাত্তিরডা তালি বাইরের ওই চাতালডার পর এট্টু পড়ে থাকি? কেউ কিচু কবে না তো?

—এখানে পড়ে থাকার দরকার নেই। যার ভরসায় তুমি তীর্থ করতে এয়েচ, সেই গিরিবালা আমার ছোটোবোনের মতো। তার মাকে ছেলেবেলা থেকে মাসি বলে ডাকি। গিরিবালার অতিথি হিসেবে তুমি আমারও অতিথি। আমার সঙ্গে চলো, আজ রাতে আমার বাড়িতেই থাকবে।

—হাঁ করে তাকিয়ে রইলো করালী। —বাবু, মুই যে বাগ্‌দি—

—সে তো আগেই শুনেচি।

—তাও আমারে বাড়ির মদ্দি নিয়ে যাবা? বাবু, তুমি কি কেরেস্তান?

হরিশ হেসে বললে, কেন, ক্রীশ্চান হলে তোমার অসুবিধে হবে?

করালী কয়েকমুহূর্ত চুপ করে থেকে তারপর বললে, না বাবু, তা না। ছোটো জাত বলে আমাগোরেই বড়ো জেতেরা ঘেন্না করে। মোরা আর কাউরি ঘেন্না করার আস্পদ্দা পাবো কনে? কেরেস্তান তো আরো বড়ো জাত—আজার জাত' ছোটোবেলাখে আজ এই তিন চার কুড়ি বচ্চোর বয়েস তাবাদি বড়ো জাত কেরেস্তানের কী চেয়ারাই দেকিচি বাবু! অ্যাকনো তো ভালো করেই দেখতিচি। আরো কদ্দিন দেকতি হবে, কেডা জানে।

—তুমি কি নীলকর সাহেবদের কথা বলচো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু। আমাগোর নদে-যশোরের গাঁগুলো তো নীলির গুঁতোয় নাল হয়ে গেল। তাই কেরেস্তান শুনলি বুকির মদ্দি অত্ত ঝ্যান্ ঝন্নাৎ করে ওটে।

—তুমি কি নীলের চাষ করো?

—নীলির চাষ! —কয়েকমুহূর্তের জন্যে বুড়োর চোখ দুটো যেন জ্বলে উঠলো। তারপর তার মুখে ফুটে উঠলো ম্লান বিষণ্ণ একটু হাসি। বললে, সে কতকাল আগের কতা বাবু। বয়েস তকন এককুড়িও হয় নাই। নীলির চাষ দুই সন করিচিলাম, তারপরে আর করি নাই। গাঁখে পাল্‌য়ে গ্যালাম।

হরিশ বললে, তোমার কোনো চিন্তা নেই কত্তা, আমি ক্রীশ্চান নই। তাহলে আমার বাড়ি যেতে তোমার আপত্তি হবে না তো? অনেক রাত হয়ে গেচে, এবার চলো—

হরিশ তালাচাবি হাতে নিতেই ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে তাকিয়ে করালী বললে, তালা দেচ্চো যে? এডা তালি তোমার বাড়ি না?

—না। বাড়ি এই একটুখানি পথ।

—তালি এডা তোমার কী বাবু, কাচারি?

—না কত্তা, আমি জমিদার নই, আমার কাছারি নেই। এটা হল ছাপাখানা।

এখেনে কী হয়?

—নানারকম খবর ছেপে কাগজ বের করা হয়। লোকে সেই কাগজ পড়ে খবরগুলো জানতে পারে।

করালী বাগদির চোখ দুটো চক্‌চক্ করে উঠলো। —তাজ্জব কারবার! সব খবর জানা যাতি পারে বাবু?

—হ্যাঁ, ছাপলেই লোকে জানতে পারবে।

—তুমিই খবর ন্যাকো বাবু? আমাগোর কুটেল সায়েবেন্দের অত্যেচার-অনাচারের খবর এট্টু ছেপয়ে দেবা বাবু? তেনারা যে নীলির দাদন চেপ্‌য়ে দে' আমাগোর গাঁগুলোরে ছারখার করে দেলে, সেই খবর কয়জন জানে?—করুণ অসহায় আর্তি ফুটে উঠ্‌লো করালীর চোখে।

হরিশ বললে, কিছু কিছু ছেপেচি।

—কট্টুকিনি ছেপেচো বাবু, তোমরা কলকেতার বাবুভেয়েরা কট্টুকুনি খবর আকো? ছাপো বাবু, আরো ছাপো! কত খবর তুমি চাও? আমার বয়েস এই তিনকুড়ি দশ বচ্চোর। কুটেলরা যে কী জিনিস তা মুই জম্মো তাবাদি দেকে আয়েচি। তোমারে মুই ঝ্যাতো খবর দিতি পারি তা তুমি নিখে শ্যাষ কত্তি পারবা না।

হরিশও উৎসাহিত হয়ে উঠেছে। বললে, তোমার তো যথেষ্ট বয়েস হয়েচে করালী, পুরনো দিনের সব কথা কি তোমার মনে আছে? গুছিয়ে বলতে পারবে?

—কী বলচো বাবু, গুছ্‌য়ে বলতি পারবো না? সব বেত্তান্ত আমি কতি পারবো। দিনকের দিন, বচ্চোরের পর বচ্চোর—সব কিছু যে আমার চোকির সুমুকে অ্যাকনো ভেস্‌তেচে।

—তাহলে চলো, আজ সারারাত ধরে তোমার কাছে শুনবো। একটু রাত জাগতে তোমার কষ্ট হবে না তো?

—রাত জাগতি কষ্ট? —একগাল হেসে করালী বললে, বনে-জঙ্গলে কত রাত জাগ্‌য়ে কাটাইচি বাবু, তার কি হিসেব লিকেশ আচে? তুমি শুনতি চাচ্চো দেকে কি আনন্দ-ই যে হতিচে বাবু। তার পেত্থমে আমার অ্যাট্টা কতা আচে। জানা নাই, চেনা নাই, এই যে আমারে তুমি তোমার বাড়ি নে যাতি চাচ্চো, তার আগে একবার তো যাচাই কর্যে দেক্‌লে না বাবু, আমি ক্যামন নোক? আমি তো চোর-ডাকাতও হতি পারি?

হরিশের চোখে-মুখে একটু বিস্ময় ফুটে উঠলো। তারপর হেসে বললে, তাতে আমার কোনো অসুবিধে নেই। আমার বাড়ি চড়াও হলে চোর-ডাকাতের মেহনৎই সার হবে। আর সময় নষ্ট না করে চলো—

—তোমারে এত ভালো নোক বল্যে নাগতেচে, তোমারে তো আমি ঠকাতি পারবো না বাবু! বয়েসকালে আমি ডাকাত ছেলাম।

হরিশ এবার সত্যিই একটু আশ্চর্য হয়ে করালীর দিকে তাকালে।

হ্যাঁ বাবু, ডাকাত। বিশে ডাকাতের নাম শুনিচো?

হ্যাঁ শুনেচি। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে তার তো ফাঁসি হয়েচিল।

চোখদুটো বাঘের মতো জ্বলে উঠলো করালীর। বেইমানের জাত কুটেলরা, আর বেইমানি কল্লে সন্দারেরই পুষ্যিপুত্তুর মানিক। আমি তোমারে সব কথা খুলে কবো বাবু। তার পরে তুমিই বিচার কর্যে বলো আমাগোর সন্দার কী ছেলো—ডাকাত না মোপুরুষ?

করালীর যে চোখ দুটো কয়েকমুহূর্ত আগে বাঘের মতো জ্ব'লে উঠেছিল, সেই চোখ দুটোই জলে ভ'রে এলো। কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছে নিয়ে সে বললে, কুটেলরা তেনারে ডাকাত বলিচে,

গোরা ফিরিঙ্গিগেথে আরম্ব করে তোমাগোর মতো বাবু ভেয়েরা সগলেই তারে কয় বিশে ডাকাত। আমি তেনার দলেই সাগরেদ ছেলাম বাবু। আমার কতা যদি বিশ্বেস করো তয় আমি এই বুক ঠুকে কচ্চি, অমন ডাকাত যদি আর দশটাও মাতা চাড়া দিয়ে উটতি পাত্তো তালি নদে-যশোর মুর্শিদাবাদ-পাবনাথে পলাতি পথ পেত্যে না শালা কুটেলের দল! দশজনও নাগতো না বাবু, আমাগোর সর্দার একাই ওই ধলা পিচেশগুলোরি ঝাড়ে-বংশে নিব্বংশ করে দিতি পারতো, কিন্তু ওই যে বেইমানি।

আর একবার চোখের জল মুছে নিয়ে দুহাত কপালে ঠেকিয়ে সর্দারের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালে করালী। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লে।

হরিশ বললে, নীলকর স্যামুয়েল ফেডির সঙ্গে বিশ্বনাথ সর্দারের বিরোধের কাহিনী—

তার কথা শেষ হতে না দিয়েই প্রচণ্ড উত্তেজনায় করালী বললে, তুমি শুনিচো বাবু? গোরাদের ন্যাকা কেতাবে পড়িচো? সব মিছে কতা বাবু, সব মিছে কতা। সেই শালা ফিটি সায়েবের নাম তালি তুমি জানো? কী কবো বাবু, সে শালা তো কবে কবরে গিয়েচে। তউ মনে হয়, কবরেথে তুলে তার শরীলডে ঝ্যান ছিঁড়ে খাই!

বীভৎস হয়ে উঠেছে করালীর মুখখানা। কপালের কাটা দাগটার জন্যে যেন আরো বীভৎস দেখাচ্ছে। সেই মুহূর্তে মানুষটা যেন তার বয়স, তার সামর্থ্য—সব কিছুর কথা ভুলে গেছে।

একটু পরেই করালীর চোখ-মুখের চেহারা আবার স্বাভাবিক হল। হঠাৎ এইভাবে উত্তেজনা প্রকাশ করে সে-ও যেন লজ্জিত। হরিশের দিকে তাকিয়ে অপ্রতিভভাবে বললে, হঠাৎ বড়ো মাতা গরম করে ফেলিচি বাবু। বাগদির অক্ত শরীলি বক্কে-যাচ্চে তো? আগ হয়ে গেলি আর মাথা ঠিক রাকতি পারি না। আমারে মাপ করে দিও বাবু! তোমার বাড়ি যাবো না।

হরিশ রীতিমতো বিস্মিত হয়ে বললে, কেন, কী হল?

—তোমরা ভদ্দরনোক। গোরা-সায়েবদেব সঙ্গি তোমাগোর ওটা-বসা থাকতি পারে। মুই বুড়ো নোক, মনের রোকে অ্যাতোগুলো কতা কয়ে ফেলিচি। তাও আবার শুনলে, আমি ডাকাত ছেলাম। তারপরেও আমার মতো নোকেরে ডেকি জাগা দিলি দুইচারদিন বাদে তোমারই কোনো ফ্যাসাদ হতি পারে বাবু। তার চে এখেনেই ওই চাতালে পড়ে থাকি। গামচায় চিড়ে আর পাটালিগুড় বান্দা আচে, দুগাল খায়্যে নেবানে। কালকে বিয়েনবেলায় আমার গিরিদিদির বাড়িডে আমারে এট্টু চিনয়ে দেওয়ার ব্যবস্তা করে দিলিই আমার উবগার হবেনে।

হরিশ এগিয়ে গিয়ে করালীর কাঁধে হাত রেখে বললে, তোমাকে আমার বাড়ি যেতেই হবে। তোমাকে আমার দরকার।

—ক্যান বাবু?

—তুমি একটা ভুলে যাওয়া কালের জীবন্ত সংবাদ।

কথাটার অর্থ বুঝতে পারলে না করালী। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে বললে, আমারে কী কচ্চো বাবু? মানে বুজতি পাল্লাম না তো?

—মানে তুমিই আমাকে বোঝাবে করালী। সাহেবদের লেখা বিশে ডাকাতের কাহিনী আমি পড়েছি। কিন্তু বিশে ডাকাত নয়, আমি তোমার মুখ থেকে বিশ্বনাথ সর্দারের কাহিনী জানতে চাই। এতবড়ো সুযোগ যখন পেয়েচি, তা আমি ছাড়বো না। চলো—

এ ধরনের বাবু করালী বাগদির জীবনে প্রথম। মুখ দিয়ে মদের গন্ধ বেরোচ্ছে অথচ কথাবার্তায়, ব্যবহারে কত নরম!

করালী আবার বললে, বাবু, আমি যে ছোটজাত—

—আর, আমার কোনো জাতই নেই।

—সে কি বাবু, জাত ছাড়া কোনো নোক হয় নাকিনি?

—কেউ কেউ হয়—যেমন আমি। আমার কথা ছেড়ে দাও, তুমি তো ধর্ম মানো?

—মানতি পেরিচি কিনা, তা তো জানি না বাবু, তউ সেই হিঁদু ধম্মোই তো এ'কড়ে পড়ে আচি। তা নালি কবে কেরেস্তান হয়ে যাতাম! পাদরি সায়েবরা কি কম নোব দেক্‌য়েচিলো? নোবে পড়ে মেলেপোতা, কাপাসডাঙা, চাপড়ার কত নোমো আর বাগদি কেরেস্তান হয়ে গেল। আশা ছেলো, কেরেস্তান হলি বুজি কুটেলের দাদন—ইস্‌কুলির ঝামেলাথে পার পাবে। পার পায় নাই কেউ। তা সে কেরেস্তানই হোক, হিঁদুই হোক আর মোচরমানই হোক। আমাগোর একদিকি পাদরি সায়েব, আর একদিকি কুটেল সায়েব। তাই তো চালু কতা আচে, জাত মাল্লে পাদরি ধরে, ভাত মাল্লে নীল বান্দরে। এ জম্মে ছোটোজাত হয়ে দুনিয়ায় আয়েচি, সেই ছোটোজাত থাক্যেই একদিন চিতেয় যাবো। কিন্তু গলা কাট্যে ফেললিও নীলকর কুটেলের ওই কেরেস্তান ধম্মো নিতি পারবো না। কিন্তু ধম্মো মানি কিনা, সে কতা জিগ্‌গেস কল্লে ক্যান বাবু?

হরিশ হেসে বললে, আজ রাতে তোমাকে আমার অতিথি বলে ডেকেচি, তুমিও তাতে রাজি হয়েচ। এখন যদি তুমি বলো, যাবো না—তাহলে আমাকে পাপের ভাগী করা হবে না?

করালী আস্তে আস্তে মাথা নাড়তে লাগলো—হুঁ, এডা অ্যাকটা কতা করেচ বটে বাবু! তোমারে তালি পাপের ভাগী করা হয়। না বাবু, সে অধম্মের কাজ আমি কত্তি পারবো না। কনে নে' যাবা, চলো—

ছাপাখানার দরজায় তালাবন্ধ করে করালীকে নিয়ে বাড়ির পথে রওনা হল হরিশ। আকাশে তখনো হাউই বাজির খেলা চলছে। আঠারোশ' আটান্ন সালের পয়লা নভেম্বরের উৎসবমুখর টাউন কলকাতা তখন মত্ত।

হাঁটিতে হাঁটিতে করালী জিজ্ঞেস করলে, আজ এত বাজি পটকা, আমোদ ফুত্তি কিসির জন্যি বাবু?

হরিশ একটু হেসে বললে, ইংরেজ সরকার আজ খোলস এড়ালো।

বাবুর এক-একটা কথার মানে কিছুতেই বুঝতে পারছে না করালী। আর কিছু জিজ্ঞেস না করে সে চুপচাপ হাঁটিতে লাগলো।

আদি গঙ্গার ওপারে আলিপুর জেলখানার পেটা ঘড়িতে ঢংঢং করে এগারোটা বাজলো।

॥ দুই ॥

করালী বক্তা, হরিশ শ্রোতা।

নিশুত রাতে চারদিক নিঝুম। মাঝে মাঝে দু' একটা নিশাচর পাখির ডাক। বৈঠকখানায় হরিশ একখানা কৌচে আধশোয়াভাবে বসে আছে। মেঝেয় বসে করালী। মোমবাতির শিখাটা মাঝে মাঝে অল্প হাওয়ায় কাঁপছে।

—আমাগোর সন্দার একটা কতা বলতো বাবু। বলতো, ওই যে নীলগাচের ফুল দেকিস বেগ্‌নিবন্ন, ওডার মানে কী তা জানিস? নাল আর নীল মিলে হয় বেগ্‌নি। তার নীলডা ওই কুটেলসায়েবগোর, আর নালবন্নটা আমাগোরই অক্ত—বুজেচিস?

একটু থেমে দম নিয়ে করালী আবার বলতে শুরু করলে, সন্দারের কতাডা ঝে কত বড়ো সত্যি তা আজও মালুম করতিচি বাবু। সন্দারের বাড়ি যে গাঁ, আমারও বাড়ি সেই গাঁয়েই ছেলো—ন'দে জেলার গাদড়া-ভাতছালা। সন্দারের ফাঁসির পর দলও ভেঙে গ্যালো, আমরাও ফেরার হয়েলাম। বহু বচ্চর এদিক ওদিক ঘুর্যে ঘুর্যে শ্যাষ তাবাদি এই পিঁপড়েগাছিতি এক কুটুমবাড়ির হাতায় একখান কুঁড়ে বেঁদি আচি। তারপরেথে আর ডাকাতি করি নাই। ঠিকে মাইন্দারি করি, জন-টিকিরি খাটি। কিন্তু বাবু, কুটির কাজ আজ তাবাদি করি নাই। নীলকুটির নামে মোর বুকির অক্ত অ্যাকনো ক্যান্ ঝলাৎ মেরি ওটে। কিন্তু ওই ঝে কতায় কয় না, অবাগা যায় বঙ্গে তো কপাল যায় সঙ্গে? যেখেনে বসত কত্তি নেগেচি, তর উত্তরদিকি কাটগড়ার বড়ো কুটি আর দখিনদিকি মোল্লাহাটির বড়ো কুটি। নীলির দাপটে মাটি তো কবেই নাল হয়েচে, এবার ইছেমতী,

বেত্তরবতী, কপোতাক্ষ কি, ভৈরব—সব নদীর জলও নাল হয়ে যাবে। আচ্ছা বাবু, ওনারা আজার জাত বলে ঝা খুশি তাই করেই যাবে, এর কোনো পিতিকার নাই? ওনারা ঝা করে তা কত্তি জংগলের জানোয়ার-ও লজ্জা পাবে। এই নীল-বিষ আমাগোর দ্যাশে কেডা এনেলো কতি পারো বাবু?

—পারি। কিন্তু তুমি তো তাকে চিনতে পারবে না করালী।

—না পাল্লাম, তউ নামডা তো জেনিয়া রাকি। মরার আগেও সেই সায়েবরে দুডো মুখখাবুরানি দিয়ে মত্তি পারবো। জানা থাকলি নামডা তুমি আমারে কয়ে দ্যাও বাবু।

—সে সাহেবের নাম লুই বম্নো।

—নুই বম্নো? নীল বম্নেরই কাচাকাচি।

—সে সাহেব কিন্তু ফরাসি সাহেব, ইংরেজ নয়। তুমি ফরাসডাঙার নাম শুনেচ?

—তা আর শুনি নাই?

—বম্নো সাহেব ফরাসডাঙার কাছে তালডাঙা আর গোন্দলপাড়ায় প্রথম দুটো নীলকুঠি খোলেন।

তোমার বয়েস তো বললে তিনকুড়ি দশ বছর? ধরো তোমারও জন্মের দশ এগারো বছর আগে নীলবিষ বাঙলাদেশে প্রথম এলো।

কিছুক্ষণ ঝিম মেরে বসে রইলো করালী। তারপর আপনমনেই কয়েকবার বিড়বিড় করলে, নুই বম্নো—নুই বম্নো—নুই বম্নো—

হরিশ মৃদুস্বরে বললে, তোমাদের সন্দারের কথা থেকে যে দূরে সরে এলে। করালী সম্বিত ফিরে পেয়ে বললে, না বাবু, এই যে কচ্চি।

করালী শুরু করলে তার সর্দারের কাহিনী—

দুর্ধর্ষ বিশে ডাকাতের নামে থরহরি কম্প পড়ে গেছে নদীয়া জেলায়। এত অল্প সময়ের ভেতর একটা গরীব বাগ্দি চাষীর ছেলে যে কেমন করে এতবড়ো একটা ডাকাত দল গড়ে তুলেছে, সেইটেই অবাক কান্ড। সে যে কখন কোথায় থাকে, তার হদিশ দলের লোকেরাও সব সময় জানতে পারে না। জানে শুধু তার এক নম্বর সাগ্রেদ মেঘা। বিশে কখনো বামনীতলার জঙ্গলে, কখনো চাপড়ায়, কখনো খোদ গোয়াড়ি—কেষ্টনগরে, কখনো বা উলো কিম্বা শান্তিপুর অঞ্চলের কোনো জংগলে। তার দলের সাগরেদরা ছাড়া আর যারা তাকে নিজের চোখে দেখেছে—কেউ কন্যাদায়গ্রস্ত গরীব, কেউ জমিহীন কৃষক, কেউ নীলকরের অত্যাচারে হৃতসর্বস্ব। যারা দেখেছে, তার বলে, কালো পাথরের কোঁদা মূর্তির মতো চেহারা, গায়ের শক্তি অসুরের মতো কিন্তু চোখের চাউনিতে দয়া, মায়া, মমতা যেন ঝরে পড়ছে। আবার সেই চোখ-ই যখন ক্রোধের আগুনে জ্বলে ওঠে, তখন তা বড়ো ভয়ঙ্কর। সে চাউনি শুধু তারাই দেখেছে, যারা অসহায় গরীবের ওপর নির্যাতন করে।

চাষীর ছেলে হঠাৎ এতবড়ো ডাকাত হয়ে উঠলো কেন?

অভাবে? অভাবতো পুরুষানুক্রমে চিরসঙ্গী। স্বভাবে? বিশ্বনাথ বাগ্দির ঊর্ধ্বতন চৌদ্দপুরুষে কেউ কোনোদিন ডাকাতি কেন, সামান্য চুরিও করেনি। জমি চাষ করেছে, জমিদারের প্রাপ্য মিটিয়ে বছরে ছ'মাস হয়তো আধপেটা খেয়ে কাটিয়েছে, খরা-আজন্মায় কপাল চাপড়ে কেঁদেছে। উপোস দিয়ে দিন কাটিয়েছে কিন্তু কারো একদানা ধানে হাত দেয়নি। সেই ঘরের ছেলে এতবড়ো ডাকাত হয়ে উঠলো যে তার ভয়ে সারা জেলা কাঁপছে?

সারা জেলা নয়, কাঁপছে অত্যাচারী জমিদার, কঞ্জুস-ধনী, কুঠিয়াল নীলকর আর কোম্পানি সরকার। কই, সাধারণ মানুষ তো বিশে ডাকাতের নামে কাঁপে না? বরঞ্চ আপদ-বিপদে তারা ছুটে যায় সেই ডাকাতের কাছে। সাহায্যের জন্যে হাত বাড়িয়ে বসে আছে বিশে ডাকাত। এমন কি, যে বড়লোক জমিদার প্রজার দুঃখ দেখে, তেমন অবস্থা দেখলে খাজনা মকুব করে—তারও

তো ভয় করতে হয় না বিশে ডাকাতকে? গরীবের ওপর অত্যাচার করো না, অন্যায় জুলুম করো না, চাষী গেরস্থের সর্বনাশ করো না, তাহলেই তুমি নিশ্চিত। বিশে ডাকাত কেন ডাকাত হয়েছে? গরীবের ওপর শক্তিমানের অত্যাচার দেখতে দেখতে তার মন ফুঁসে উঠেছিল বলেই লাঙল ছেড়ে সে হাতে নিয়েছে তরোয়াল। নিজের বাপকেই সে শক্তিমানের হাতে নির্দয় প্রহারে নিহত হতে দেখেছিল। সে স্মৃতি তাকে মরীয়া করে তুলেছে।

সর্দারের হুকুম তামিল করতে কমপক্ষে হাজার অনুচর লাঠি, বল্লম, কিম্বা বন্দুক হাতে সব সময় তৈরি হয়ে আছে। তারা সবাই একদিন চাষী ছিল। কেউ উৎখাত হয়েছে জমিদারের অত্যাচারে, কেউ বা কুঠিয়াল নীলকর সাহেবদের খাঁই মেটাতে মেটাতে সর্বস্বান্ত হয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে। এতকাল ধরে যারা অদৃষ্টকে দায়ী করে কেবল চোখের জল-ই ফেলে এসেছে, তারাই দলে দলে ছুটে এসেছে বিশ্বনাথ সর্দারের কাছে। হিন্দু, মুসলমান ভেদ নেই। চোখের জল মোছার উপায় বাৎলে দেবার মতো মরদ যখন রয়েছে তখন বছরের পর বছর শুধু পড়ে পড়ে মার খাওয়া কেন? বিশ্বনাথ সর্দারকে ওস্তাদ মেনে তারা লাঠি ধরেছে সর্দারের হুকুমে। পাঁচ থেকে পঞ্চাশ, পঞ্চাশ থেকে একশো, একশো থেকে পাঁচশো, পাঁচশো থেকে হাজার, হাজার থেকে তারপরেও আর কত? কেউ সঠিক বলতে পারে না, বিশে ডাকাতের সাগ্‌রেদের সংখ্যা কত। কোম্পানি সরকারের গোয়েন্দারা হার মেনেছে। বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন জেলার ম্যাজিস্ট্রেট স্বয়ং। জুতোর ঠোক্‌করে যারা নেড়ি কুকুরের মতো লেজ গুটিয়ে পালাতে অভ্যস্ত, সেই নেটিব রায়তের ঘরের একটা ছেলে সারা জেলাময় এত বড়ো একটা হুলুস্থুলু কান্ড বাধিয়ে তুলবে তা তো কল্পনারও অতীত ছিল! লোকটা নাকি ডাকাতির টাকা বিলিয়ে দেয় গরীবদের ভেতর! ঘটা করে দুর্গোৎসব করে প্রতিবছর। উৎসবের চারদিন অন্নসত্র বসে যায় তার আস্তানায়। বৃদ্ধ, শিশু, পঙ্গু, স্থবির, দরিদ্র নারী—সবাইকে নিজের হাতে করে বস্ত্র বিতরণ। দীনদুঃখী তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালে ভরা হাতে হাসিমুখে ফিরে আসে। সারা জেলায় শ'য়ে শ'য়ে অক্ষম বৃদ্ধ, ভূমিহীন কৃষক আর নিরাশ্রয় দরিদ্র বিধবার ভরণ-পোষণের সব দায়দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে লোকটা। বাগদির ছেলে বিশে এখন বিশ্বনাথবাবু। ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট আর পুলিশসাহেব কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছেন না, লোকটার উদ্দেশ্য কী? ডাকাতি করে কেউ যদি সব টাকাকড়ি বিলিয়েই দেয় তাহলে তার ডাকাত হওয়ার দরকার কী ছিল? টাকা যদি নিজের ভোগেই না লাগলো তাহলে এত ঝুঁকি নেওয়ার কোনো অর্থ হয়?

দিনের পর দিন দল ভারী হয়ে উঠ্‌ছে বিশ্বনাথের।

গরীবের একটি মাত্র পরিচয়, সে গরীব। তার আবার অন্য জাতপাতের বিচার কী? বিশ্বনাথের প্রধান অনুচর মেঘা তো মুসলমান। পরের সারিতে যারা আছে তাদের ভেতর বাগদির ছেলে করালীও যেমন একজন, কৈবর্তের ছেলে গোপালও তেমনি একজন। আর আছে শান্তিপুরের জোলার ছেলে তাজুদ্দীন।

সর্দারের হুকুম বড়ো কড়া হুকুম।

—ভাইসব, অত্যেচার অনাচারের পিতিকার কত্তি হবে বল্যেই আমরা এই পথে নেমিচি, অত্যেচার করাডা আমাদের ধম্মো না। ঝে বড়োনোক টাকার গরমে গরিবরে ভিটে ছাড়া করে, চোকের জল ঝরায়, তার ক্ষ্যামা নাই! কিন্তুন খেয়াল থাকে ভাইসব, ডাকাতি কত্তি গে, মায়ের জেতের গায় ঝ্যান অ্যাকটা কড়ে আঙুলির ছোঁয়াও না নাগে, ছোঁয়া ঝ্যান্ না নাগে ছোটো বাচ্চা-কাচ্চা আর গোমাতার গায়ে! আমরা পাপের পিতিশোদ নিতি নেমিচি, আমাদের হাতে ঝ্যান্ পাপের কালি না নাগে! হাত দেবা না গরীবির গায়, হাত দেবা না রাহী পথিকির গায়। সে ঝেদি নাখ টাকার মালিকও হয় তউ পথ চলতি কালে গায় হাত দেবা না। দরকার হলি তারে চিটি পেট্যে তার বাড়ি গে ডাকাতি করবো আমরা, কিন্তুন পথে ঘাটে কারো পর আচম্‌কা ঝেঁপিয়ে পড়বা না! তবে হ্যাঁ, ঝেঁপিয়ে পড়বা তখনই, ঝ্যাকন্ দ্যাকবা, পথে একা পেয়ে কোনো শয়তান কাউরি

নিগ্গহ কচ্চে, মায়ের জেতের ইজ্জতে হাত দেয়ার উয্যুগ কচ্চে। ত্যাখন দশজনাই থাকো আর একলাই থাকো, ঝেঁপিয়ে পড়ে নারীর সম্ভম ঝেদি রক্‌কে কত্তি না পারো তা'লি আর বামনীতলার জঙ্গলে ফিরে এসো না। তেমন সাক্‌রেদে বিশে ডাকাতের দরকার নাই। হে'দু ভেয়েরা, মা দুগ্গার নাম নে' পিতিজ্ঞে করো, মোচরমান ভেয়েরা আল্লার নামে কসম খাও! মনে রাক্‌বা, অত্যেচারীর যম হবো বল্যেই আমরা জোট বেঁদিচি, অত্যেচার কত্তি নামিনি।

চিঠি দিয়ে আগেভাগে জানিয়েই ধনীর ঘরে ডাকাতি করতে যেতো বিশ্বনাথ। চিঠিতে জানিয়ে দিতো, সেই রাতে সে অতিথি হবে। ধনী গৃহী যদি নির্বিবাদে তার চাহিদা মিটিয়ে দিত তাহলে সে-ও নির্বিবাদেই বিদায় নিত—কারো গায়ে হাত দিত না। অহেতুক রক্তপাত একেবারেই পছন্দ করতো না সর্দার।

শান্তিপুর থেকে একটার পর একটা অভিযোগ আসছে।

তাঁতীদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে কুঠিয়াল সাহেবরা। শুধু নীলের লোভেই তাদের মন খুশি নয়, আরো চাই। নজর পড়েছে তাঁতীদের ওপর। নাম মাত্র দাম ধরে দিয়ে তাঁতীদের বোনা কাপড় ঘর থেকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে তারা। শয়ে শয়ে হাজারে হাজারে কাপড়। কুঠিয়াল সাহেবদের আছে লেঠেল—পাইক। দশাসই চেহারার ভোজপুরী—হিন্দুস্তানী জোয়ান তারা। সাহেবদের নিতান্ত বিশ্বস্ত হুকুমবরদার। ধরে আনতে বললে বেঁধে আনে। এক ঘা লাঠির হুকুম থাকলে দশ ঘা মেরে মাথা ফাটিয়ে মাটিতে ফেলে রেখে আসে। তার ওপর সাহেবদের সঙ্গে সব সময়েই থাকে বন্দুক পিস্তল। তাদের ইচ্ছেয় বাধা দিলে সে বাধা মানছে কে? অঢেল লাভের এতবড়ো সুযোগ হাতের ভেতর থাকতেও যদি সে সুযোগ কাজে লাগানো না গেল তাহলে সেই সাত সমুদ্র পেরিয়ে ইণ্ডিয়ায় আসার দরকার কী ছিল?

হ্যাঁ, অঢেল লাভ। ম্যাঞ্চেস্টার তখনো এত জমজমাট হয়নি।

এদেশের তাঁতীদের বোনা কাপড় ইংল্যাণ্ডের বাজারে পাঠাতে পারলে চারগুণ, ছ'গুণ এমন কি আটগুণ টাকা লাভ! কোন্ মূর্খ এ সুযোগ ছেড়ে দেয়? নীল তো রইলোই, তার ওপর যদি কাপড় পাঠিয়েও লাভের কাঁড় গোনা যায় তবে তো দু'বছরে লাখোপতি!

হার্মাদের মতো তাঁতীদের ঘরে ঘরে ঝাঁপিয়ে পড়ছে কুঠিয়ালরা। কখনো দয়া করে দু'চার আনা দাম ধরে দেয়, কখনো তা-ও না। সাহেবদের হুকুমবরদার ভোজপুরী লেঠেলরা লাঠির ঘায়ে জখম করে বীরবিক্রমে ঢুকে যায় তাঁতীদের ঘরে। মেয়ে-পুরুষ, বৃদ্ধ-শিশু বাছবিচার নেই। কাপড়গুলো কেড়ে নিয়ে যায় তারা। একটু দূরে ঘোড়ার পিঠে বসে হো হো করে হেসে ওঠে কুঠিয়াল সাহেব।

শান্তিপুরে ঘরে ঘরে উঠেছে কান্নার রোল।

সেই কান্নাভেজা চোখেই শান্তিপুরের তাঁতীরা একদিন দেখলে, আগুন জ্বলছে নীলকুঠিতে। একটা কুঠি নয়, বহু কুঠি। একদিন নয়, পর পর কয়েকদিন। যে-সব কুঠিয়াল সাহেবরা জোর-জুলুমে বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল, তাদের কা'বা কুঠি রেহাই পায়নি। লাভের টাকা সব লুঠ হয়ে গেছে। লুঠ করে আনা হাজার হাজার কাপড়ও উধাও। শুধু তাই নয়, কুঠির বাঙালি দেওয়ান, আমিন, গোমস্তার দলকেও বন্দী করে নিয়ে গেছে বিশে ডাকাতের দল। নিজের দেশের গরীবদের ওপর অত্যাচারে সাহেবদের দোসর হিসেবে কাজ করবার জন্যে কঠোর শাস্তি তাদের প্রাপ্য। শোনা গেল, তাদের কঠিন শাস্তিই দিয়েছে বিশে ডাকাত। কুঠি থেকে কেড়ে আনা কাপড়গুলো বিলিয়ে দেওয়া হয়েছে দুঃস্থ গরীব হাজার হাজার লোকের ভেতর।

করালী এতক্ষণ পরে একবার থামলো।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিল হরিশ। গামছায় মুখ মুছে একটু দম নিয়ে করালী বলল, ক্যামন নাগতেছে বাবু?

—তুমি বলে যাও।

—কতি কতি চোকি জল এসি যায় বাবু। ঝেদি কন, অ্যাতো ঝে লুটপাট কল্লি তা তোরা পালি কী? তার জবাবে কই, নুটের ভাগ পাওয়ার নোবে তো মোরা সেই মোপুরুষির দলে ভিড়ি নাই? তেনার শিক্কেই ঝে আলাদা। ওই টাকায় কত গরীবদুক্কির উব্গার হবে, তাগোর মুকি হাসি ফুটে ওঠ্বে, সেইডেই আমাগোর নাব। নজ্জা নেবারণের একখানা বস্তর তাবাদি নাই, এমন কত অগুন্তি নোক গাঁয়ে গাঁয়ে আচে, তার সব খবরই যে থাকতো আমাগোর সন্দারের নকোদপ্পোনে। সব বস্তর বিলয়ে দেলে সন্দার। ঝান্দের তউ কানি পর্যো আসার উপায় আচে, তারা নিজের হাতে নে গ্যালো। আর ঝে সব বৌ ঝির আস্নারও উপায় নাই, তান্দের পেত্যেকের নামে দুইখেন করে কাপড় পিন্তিবাসির হাতে পেটয়ে দেলে সন্দার। নোকগুলো সেই ঝে একগাল হাসিতি মুখ ভরয়ে চল্যো গ্যালো আর মোন্দের সন্দার মুকি হাসি চোকি জল নে আমাগোর পিতি দিষ্টিপাত কল্যো, সেই আমাগোর ঝে সব পাওয়া হয়ে গ্যালো বাবু। কতকাল আগের কথা! তউ মনে হয় ঝ্যান সিদিন!

গামছা দিয়ে আবার চোখ মুছে নিলে করালী। ধরা গলায় বললে, এইবার এমানদারি আর বেইমানির কতা কই বাবু।

দুর্ধর্ষ এবং নৃশংস নীলকর স্যামুয়েল ফেডি।

নির্মমতায় সারা জেলার সমস্ত নীলকরকেই ছাড়িয়ে গেছে সে তখন! তার আরো বাড়তি সুবিধে জেলা সদরে খোদ ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোর পাশেই তার নীলকুঠি।

চরমে উঠেছে ফেডির অত্যাচার।

জমি হেজে যাক, মজে যাক, খরা অজন্মা, বান, ভূমিকম্প যাই হোক না কেন, তার পাওনা নীলগাছ তার চাই-ই। সে পাওনা তার হিসেব মতো, রায়তের হিসেবে নয়। কুঠিতে নীলগাছ পেঁছে না দিলে গুদাম ঘরে আটক, বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া, গোরুবাছুর কেড়ে নিয়ে যাওয়া—এ সব তার অতি সাধারণ শাস্তি। ধান হোক না হোক, খোরাক জুটুক না জুটুক, তার পাওনা মিটিয়ে দিতেই হবে।

একটু থেমে করালী বললে, বাবু, তোমরা হচ্চো কলকেতার নোক। নীলির গাচ তো চোকি দ্যাকো নাই। কালকেসুন্দির গাচ চেনো? বন-বাদাড়েও হয়, বাড়ির আনাচি-কানাচিও হয়। এই ধরো, মাথায় আড়াই কি তিন হাত, পাতাগুলো তেঁতুলির পাতার মতো ডাঁটার দুই ধারে সাজানো থাকে. কেমন ঝকঝকে হলুদ রঙা ফুল—

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝতে পেরেচি! —হরিশ বললে, আমাদের বাড়ির পেছনেই আছে।

—দেখতি ওইরকম ধারার-ই গাচ, তবে কালকেসুন্দির মতো অত্খানি ঝোপড়ালো হয় না। এটটু ফাঁকা ফাঁকা আর নম্বা কিসিম। মাথায়ও ওই আড়াই—তিনহাতই হয়, তার বেশি না। বচ্চোরে দুই দফায় চাষ। অ্যাকবার কাত্তিক—অগ্রাণে, অ্যাকবার ফাল্গুন চত্তির মাসে। তা কোনো চাষই কামাই দেয়া চলবে না ফিটি সায়েবের কুটির এলেকায়। আমরা কেউ কেউ কতাম ফিটি সায়েব, আর সন্দার সে গুয়ের বেটার নাম দিয়েলো শিমুল সায়েব।

হরিশ বললে, হয়তো স্যামুয়েল থেকেই শিমুল করে নিয়েচিলেন তোমাদের সর্দার। সাহেবের পুরো নাম ছিল স্যামুয়েল ফেডি।

—তাই হবে।—ঘাড় নেড়ে সায় জানালে করালী।

আবার আরম্ভ হল কাহিনী।

যতদিন এদেশি ধনী জমিদারদের ওপর দিয়ে বিশ্বনাথের ডাকাতির পালা চলেছে, ততদিন তাকে নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামায়নি কোম্পানি। কিন্তু শান্তিপুরে নীলকর সাহেবদের অতগুলো কুঠির ওপর আক্রমণ হওয়ার পর টনক নড়লো কোম্পানির, আতঙ্ক শুরু হল কুঠিতে কুঠিতে।

কিন্তু ফেডির ধাত আলাদা। তাছাড়া ম্যাজিস্ট্রেট তর বন্ধু, বংলোর পাশেই কুঠি। তার ভয় কী? তার অত্যাচার চলতেই লাগলো।

বিশ্বনাথ ক'দিন ধরেই ভাবছিল ফেডির কথা। মেঘা, তাজু আর করালীকে সে-কথা সে জানিয়েও রেখেছে। সবাই একবাক্যে রাজি। সাহেবের অত্যাচার মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে, তাকে শায়েস্তা না করলেই নয়।

একদিন গোপাল খুব উত্তেজিত ভাবে একটা খবর নিয়ে এলো। রাগে তখনো সে থর্‌থর্‌ করে কাঁপছে।

—কী হল্য রে গোপ্‌লে, অত হাঁপাতে নেগিচিস ক্যান?—জিজ্ঞেস করলে বিশ্বনাথ।

—হাঁপাচ্ছি না সন্দার কাঁপতিচি। ফিটি সায়েব আসাননগরে কাল কী করে আয়েচে শোনবা? ফকির মোল্লারে কুটিতি কদ করো্য তার গতরভারে তো আদ্দেক করো্য ছেড়ি দিয়েলো, কাল তার বাড়িতি চড়াও হয়্যে বিবিডা ত্যাকন কোলের বাচ্চাডারে মাই খাওয়াতি নেগেলো, তার কোলেত্থে বাচ্চাডারে মাটিতি ফেল্‌য়ে দিয়ে বিবির চুলের মুটি ধর্যে হিড়হিড়য়ে টেন্যে নে যেতে উয্যুগ করেলো।

বিশ্বনাথ বসে ছিল, চকিতে উঠে দাঁড়ালো। তার চোখ দুটো তখন বাঘের মতো জ্বলছে।

—মেঘা! আজ আমাবস্যের দেয়ালি, আজ মা কালীর পুজো!

বিশ্বনাথের ডাকটাও শোনালো যেন বাঘের গর্জনের মতো।

—মা সীতের গায় হাত দেচে! আজ রাত্তিরিই আবণ-বধ কত্তি হবে! কারে কারে নিবি হিসেব কর্যে অস্তরপাতি গুছ্‌য়ে নে।

—নিচ্চি। কিন্তুন তুমি নিজি কি যাবা সন্দার?

—তুই কী কচ্চিস মেঘা? মায়ের গায়ে হাত দেচে আর ব্যাটা তার পিতিশোধ নিতি না গে জঙ্গলের মদ্দি একা বস্যে থাকতি পারে?

গভীর রাত।

অতর্কিতে চারদিক থেকে বহু কণ্ঠের হৈ হৈ শব্দে কেঁপে উঠ্‌লো ফেডি সাহেবের কুঠি। সেই সঙ্গে অগুন্তি মশালের আলো।

বুক কেঁপে উঠলো ফেডির। ভয়ে কেঁদে ফেললে মেমসাহেব। সেদিন আবার ফেডির বন্ধু লিডিয়ার্ড নামে এক সাহেবও তার কুঠিতে অতিথি। বিবিকে কুঠির পেছনদিকে পালাতে বলে বন্দুক হাতে তুলে নিলে ফেডি। লেডিয়ার্ডের সঙ্গেও বন্দুক ছিল।

কুঠির ভেতর থেকে দু'টো বন্দুক গর্জন করে উঠলো।

কিন্তু বিপক্ষ দলে কয়েকশো মানুষ। তারা শুধু লাঠি-বল্লম সম্বল করেই আসেনি। আট-দশটা বন্দুক তাদের হাতে। একটার পর একটা গুলি চালালে টোটা ফুরোতে কতক্ষণ? হয়তো তেমন বেশি সংখ্যায় টোটাও ছিল না ফেডির কাছে। একটু পরেই কুঠির ভেতর থেকে বন্দুকের গর্জন ক্রমেই বিলম্বিত হতে লাগলো। তারপর একসময় দোর্দণ্ডপ্রতাপ নীলকরের বন্দুক একেবারেই নীরব। সব কার্তুজ ফুরিয়ে গেছে। স্যামুয়েল ফেডি তখন সম্পূর্ণ অসহায়।

কুঠির উত্তরদিকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ইলিয়ট সাহেবের বাঙলো।

সেদিক থেকে কোনো আক্রমণ এলে কী করা হবে তার ব্যবস্থাও আগে থেকেই করে রেখেছিল বিশ্বনাথ। জনা পঞ্চাশেক বাছাই তীরন্দাজ। আর চার-পাঁচ জন বন্দুকধারী অনুচরকে মোতায়েন করে দিয়েছে সেদিকে। কিন্তু ইলিয়ট সাহেব তখন গুলি চালাবে কি, থর্‌থর্‌ করে কাঁপতে কাঁপতে সে বোধহয় তখন ঈশাইয়ের নাম জপ করছিল।

বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে পড়েছে করালী। সে যেন ফিরে গেছে তার প্রথম যৌবনে। পঞ্চাশ বছর আগেকার সে-রাতের ঘটনা যেন এই মুহূর্তে এখানে তার চোখের সামনেই ঘটছে।

—সন্দারের পাছ পাছ সব্বাই তো কুটির মদ্দি সেঁদয়ে গ্যালো বাবু। মোর পর ভার পড়লো কুটির পেছনদিক পাহেরার। মোর দলবল নে মুই তো পাহেরা দিচ্চি, হটাৎ দেকি, পুকুরির পাড়ে মেমসায়েবের জুতো। লজর চালয়ে দেকি, জলের মদ্দি অ্যাকটা ভুট করা কেলে হাঁড়ি। আর কি বুজতি বাকি থাকে, কেলে হাঁড়ির তলায় কেডা? সামলাতি পাল্লাম না বাবু। গলায় ঝ্যাতো জোর আচে তাই দে চেঁচয়ে বললাম, তুমি ক্যানো পালয়েচো মেমসায়েব? আমরা কুটেলও না, কেরেস্তানও না। মেয়েজাতের গায় আমরা হাত দি না। তোমার পেরাণেও ভয় নাই, ইজ্জতও কেউ নষ্ট করবে না। তুমি উটে আসতি পারো। আমাগোর সন্দার মায়ের জাতকে মায়ের জাত বলেই সম্মান করে, তোমার ভাতারের মতো অবলা ইস্তিরিনোকের নাঞ্ছনা করে না! —তা বাবু মেমসায়েব ওটলে না। ভয়ে যে সিঁটিয়ে আচে! তা ঝা হোক, কুটি নষ্ট হল, ফিটি সায়েব আমাগোর বন্দী হল, সায়েবরে নিয়ে আমরা বাগদেবী খালের অ্যাক জঙ্গলে চল্যে আলাম। সায়েব তো ত্যাকন ভয়ে আদমরা হয়্যেই আচে। মেঘাদা বল্লে, সন্দার কী ডন্ড দেবা এরে? হাউমাউ কর্যে কান্দে ওটলে সায়েব। পা জড়য়ে ধল্লে সন্দারের। আমাগোর দিকি তাকয়ে সন্দার বল্লে, তোরা কী ডন্ড চাস? মিত্যুদন্ড! আমরা সব্বাই অ্যাকবাক্যিতে তাই কলাম। তাই শুন্যে সায়েব পাগলের মতো সন্দারের পা জড়য়ে ধরে কান্দতি নেগেলো, আমারে মের্যে ফেলোনা সন্দার, আমার বিবিডে তালি বেধবা হয়ে যাবে। শুনিচি তুমি ইস্তিরিনোকেরে ছেন্দা করো, তালি তার কতা অ্যাকবার ভাবো।

গোপলে চেঁচয়ে ওটলে, ফকির মোল্লার বিবির কোলেথে বাচ্চা ছুঁড়ে ফেলয়ে তেনার চুলের মুটি টানার সোমোয় এ কতা মনে ছেল না সায়েব?

মেঘাদা বল্লে, সন্দার, তুমি ঝা হুকুম দেবা, তাই তামিল হবে। তউ আমার অ্যাকটা কতা ঝেদি ন্যাও তো কই, এ সমিন্দিরে দেকে মনে হচ্ছে, চোপ ধল্লি চিঁচিঁ করে, ছেড়ি দিলি নাফ মারে। ওর কাছে হিসেব ন্যাও দিনি, কত চাষীরি ও ঘর ছাড়া করেলো, আর কত চাষীর বিবিরি বেধবা-বেওয়া কর্যে ছেড়য়েচে?

সন্দারের পা জড়য়ে ধর্যে কান্দতিই নাগলো সায়েব। বল্লে, এই দফা মোরে ছেড়ি দাও সন্দার, মুই জেবনে আর নীল করবো না, কারোর ক্ষেতি করবো না, মোর নীলির কারবার গুটয়ে নে' চল্যে যাবো।

সন্দার বল্লে, সাচা কতা দেচ্চ?

সায়েব বল্লে, আমাগোর যিশুকেষ্টোর নামে পিতিজ্ঞে কর্যে কচ্চি সন্দার।

তাজু চেঁচয়ে ওটলে, যিশুকেষ্টোরে ও ভারি মানে! ওর কতায় লরম হয়ো না সন্দার।

একটু দম নিয়ে করালী আবার বলতে লাগলো, মুইও ছেড়ি দিতি মানা করলাম বাবু। কিন্তুন দয়ার শরীল সন্দারের। সায়েবের সেই মেকি কান্দুনি শুনে তারে মাপ কর্যে দেলে। সায়েব কথা দে' গ্যালো, এ কতা সে কাউরি কবে না, এই জঙ্গলের গোপন আস্তানার কতা কারুর কাচে ফাঁস করবে না।

ছাড়ান পায়ে চলে গ্যালো সায়েব। মেঘাদা বড়ো বিযেদমনে বল্লে, দয়া ঝে নিতি জানে তারেই দয়া করা চলে সন্দার। ও সমিন্দিরে ছেড়ি দিয়ে কাজডা বোধায় তুমি ঠিক কল্যে না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে একটু থামলো করালী। তারপর আবার আরম্ভ হল তার কাহিনীর উপসংহার অংশ।

মেঘা এবং অন্যান্য অনুচরদের কথাই ছিল ঠিক।

ছাড়া পেয়েই আগের মূর্তি ধরলে ফেডি। কিম্বা আগের চেয়ে আরো ধূর্ত নৃশংস মূর্তি। প্রথমেই ম্যাজিস্ট্রেট ইলিয়টকে সে জানালে বিশ্বনাথের গোপন আস্তানার খবর। কয়েকদিনের ভেতরেই ধরা পড়লো বিশ্বনাথ, মেঘা আর জনাকয়েক সাগরেদ। ইলিয়ট সাহেব দেরি না করে তাদের

পাঠিয়ে দিলেন দূরে দিনাজপুর জেলখানায়। কিন্তু ক'দিন পরেই সব ক'জনকে নিয়েই জেল থেকে পালিয়ে এলো বিশ্বনাথ। এবার তার একমাত্র চিন্তা, উপযুক্ত প্রতিশোধ নিতে হবে ফেডির ওপর।

পর পর নীলকুঠি আক্রমণের খবরে আগেই কোম্পানি সরকারের টনক নড়েছিল। এবার একেবারে জেলা সদরে খোদ ম্যাজিস্ট্রেটের বাঙলোর পাশেই কুঠি আক্রমণ! আর দেরি করা চলে না।

কত শক্তি রাখে বিশে ডাকাত?

তার সঠিক অনুমানও করতে পারছে না ইংরেজ কর্তৃপক্ষ। এটুকু বোঝা যাচ্ছে যে তার দাপটে নদীয়ার সমস্ত শ্বেতাঙ্গ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে।

দক্ষ সেনাপতি ব্ল্যাকওয়্যার।

তার অধীনে একটা গোরাপল্টন আর চার-পাঁচটা নেটিব সেপাই পল্টন এসে ছাউনি ফেললে নদীয়ায়। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো গোয়েন্দা—কোথায় সেই ভয়ঙ্কর ডাকাতটার আস্তানা?

দলবল নিয়ে তার আগেই বামনীতলার জঙ্গল ছেড়ে গা ঢাকা দিয়েছে বিশ্বনাথ। নদীয়া জেলার ভেতরেই আছে অথচ এতগুলো গোয়েন্দা লোকটাকে খুঁজে বের করতে পারছে না?

বিরক্ত ইলিয়ট, বিব্রত ব্ল্যাকওয়্যার, আক্রোশে ক্ষিপ্ত স্যামুয়েল ফেডি।

নচ্ছার ডাকাত-সর্দারটাকে কোতল না করতে পারা পর্যন্ত ফেডির মনে শান্তি নেই। মাঝে মাঝে আবার আপনমনেই হাসে ফেডি। অতবড়ো একটা ডাকাত দল চালায় অথচ লোকটা কতবড়ো মূর্খ! শত্রুর প্রতিজ্ঞাকে সে বিশ্বাস করে।

হঠাৎ একদিন এক ধনীর বাড়িতে ডাকাতি।

কোন্ গোয়েন্দা মারফৎ আগেই খবর পেয়েছিল ব্ল্যাকওয়্যার। কিছু গোরা আর কিছু নেটিব সেপাই নিয়ে ওঁৎ পেতে বসে ছিল ইংরেজ সেনাপতি। ধরা পড়লো বিশ্বনাথের কয়েকজন অনুচর আর তার পালিত পুত্র মাণিক।

সব ক'জন ডাকাতকেই অনেক টাকা পুরস্কারের লোভ দেখিয়েছিল ব্ল্যাকওয়ার। কিন্তু কাউকে টলানো যায়নি। তারা ফাঁসিতে যাবে সেও স্বীকার কিন্তু তাদের সর্দারের গোপন আস্তানার খবর তারা দেবে না। ইংরেজ বেইমানি করতে জানে এবং পারে, ফেডি সাহেব তা করেও দেখিয়েছে। কিন্তু বিশে ডাকাতের সাগ্‌রেদরা বেইমানি করে না।

সাগরেদরা বেইমানি করেনি, বেইমানি করলে সর্দারের নিজেরই পোষ্যপুত্র। অনেক টাকা পুরস্কারের লোভ সে সামলাতে পারলে না। বিশ্বনাথের তখনকার গোপন আস্তানার হদিস ইংরেজ তারই কাছে পেলো।

মুহূর্তমাত্র দেরি করবার অবসর নেই। গোটা সেনাবাহিনী নিয়ে সেনাপতি ব্ল্যাকওয়্যার ছুটলো কুনিয়া গ্রামের কাছাকাছি এক জঙ্গলের দিকে। সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেট ইলিয়ট আর স্যামুয়েল ফেডি।

কুনিয়ার জঙ্গলকে চারদিক থেকে সেপাইরা ঘিরে ফেলেছে। তাদের হাতে উদ্যত বন্দুক। কোনোদিক দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার উপায় নেই।

গোরার দল খবর পেয়ে গেছে এবং তারা অতি দ্রুত এগিয়ে আসছে, এ খবর যখন বিশ্বনাথের কাছে এসে পেঁাছলো, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। কার মুখ থেকে তারা খবর পেয়েছে তাও জানতে পারলে সে।

দু'চোখে শুধু দু'ফোঁটা জল। আর কিছু নয়।

বলতে বলতে হঠাৎ ঝরঝর করে কেঁদে ফেললে করালী। সেই কান্নাভাঙা স্বরেই সে বলতে লাগলো, বাবু, সদ্দারের সঙ্গে সিদিন কুনোর জঙ্গলে মুইও ছেলাম। আমাগোর সব্বায়ের দিকি অ্যাকবার খালি চোক বুলয়ে নেলে সদ্দার। তারপর বল্লে, তোরা ঠিকই মালুম কর্য়োচিলি রে। জাতসাপেরে ছোড়্ দিতি নাই। ঝাক্, ঝে ভুল করিচি তার মাশুল আমারেই দিতি হবে। শোন, মোর পরেই তো ওদের ঝ্যাতো আগ, আমারে পালি হয়তো আর কারুর কতা অ্যাকন ওদ্দের মনে থাকবে না। আমি ধরা দিচ্চি, সেই ফাঁকে তোরা ঝে ঝিদিক পারিস পালয়ে যা—

মেঘাদা বল্লে, তা হবে না সন্দার। ধরা দিলি আমরা একসঙ্গেই দেবো।

মেঘাদার পিঠি হাত রাখ্যে সন্দার বল্লে, পাগলামি করিস না মেঘা। তাতে অনত্থক অ্যাতোগুলো পেরাণ-ই যাবে, নাভের নাভ কিছু হবে না। তার চে তোরা পেল্য়ে গে ঝেদি আবার দল কত্তি পারিস, তাই করিস।

আমার পিঠিও হাত রাখ্যে সন্দার অ্যাকটা কতা বলেলো বাবু! বলেলো, কুটেলরা নীল অন্তের সোয়াদ পেয়ে মানুষখেকো বাগের মতো ক্ষেপি উটেচে রে করালী, এ-দেশ ছেড়ি বড়ো সউজি ওরা যাবে না। পাল্য়ে যা—পারিস তো আবার পিতিকারে নামিস।

করালীর গলা কান্নায় এত ধরে এলো যে কিছুক্ষণ সে কোনো কথাই বলতে পারলে না। তারপর একটু সামলে নিয়ে বলতে আরম্ভ করলে, সন্দার নিজে এগ্য়ে গ্যালো। জঙ্গলের বাইরি ত্যাকন মেজেস্টর সায়েবের পাশে ফিটি সায়েবও দেঁড়য়ে আচে। তার দিকি তাক্য়ে সন্দার বল্লে, শিমুল সায়েব, আমি তোমারে হাতের মদ্দি পেয়েও ছেড়ি দিয়েলাম, সে কথা কি তোমার মনে আছে? আমার সাগ্রেদেরা সব্বাই তোমার মাতা নিতি চেয়েলো, তুমি আমার পা জড়য়ে ধর্যে পেরাণ ভিক্কে চেয়ে নেলে! তোমার যিশুকেষ্টোর নাম নে' পিতিজ্ঞে কল্লে, আর কোনোদিন গরীবির পর জুলুম করবা না, কারবার গুট্য়ে নে চল্যে যাবা, আরো কত কী! তোমার সব পিতিজ্ঞেই তুমি ভেঙিচো সায়েব। তোমার পাপের মাপ নাই। অ্যাকন বুজতি পেরিচি, ক্যালকেউটেরে ছেড়ি দিয়ে সিদিন আমি কী ভুলই না করেলাম। ভেবি দ্যাকো দিনি, নীলির নোবে হন্যে কুকুরির চেও অধম হয়ে তুমি কত গাঁ জ্বালয়ে দেচো, কত মান্ষির পতের ভিকিরি করেচো, কত গেরস্তর ঘরের বৌরি তুমি বেধবা করেচো? আর আমি অ্যাদ্দিন ঝা করে আয়েচি, তা আমার দেশের গরীবির জন্যিই কর্যেচি। বেঁচি থাকলি আমি তাই-ই কর্যে যাতাম। কিন্তু তোমরা ঝে আমারে বাঁচতি দেবা না, তা তো আমি বুজতিই পারতিচি। শোনো সায়েব, বিশে বাগ্দি মিত্যুরি ভয় করে না। আমি কিন্তুন তোমাদের পা জড়য়ে ধর্যে পেরাণ ভিক্কে কত্তি যাচ্ছি নে। এই আমি হাসিমুকি ধরা দেলাম, তোমাদের এংরাজ কেরেস্তানের আইন-বেচারে ঝা খুশি, তোমরা তাই কত্তি পারো।

—এই ছেলো মোদ্দের সন্দারের শ্যাষ কতা বাবু।

হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলো করালী। হরিশের চোখও তখন জলে ঝাপসা হয়ে এসেছে।

—সবই ঝ্যাকন কলাম, ত্যাকন শ্যাষের কতাটুকুও কয়ে বুকির মদ্দিডা এট্টু হাল্কা করি। একদিনির মদ্দি ফোজদুরি বেচার সেরি ফ্যালালে সায়েবরা। ফাঁসির হুকুম হয়ে গ্যালো। মা গঙ্গার কুলি নে' গে' সব্বাইর ঝ্যান্ দ্যাকোনোর জন্যিই সন্দারকে তেনারা খোলা জাগায় ফাঁসির দড়িতি ঝুলয়ে দেলে। অ্যাতখানি কর্যেও তেনাদের রোক্ মরে নাই বাবু! সন্দার তো ত্যাকন আর বেঁচি নাই, তউ তেনার শরীলডারে অ্যাকটা নোয়ার খাঁচায় পুর্যে কাছের অশত্থ গাচের ডালে ঝুল্য়ে রেকে দেলে! কী কবো বাবু, কতি গেলি বুক ফেটি যায়, সন্দারের গব্ভোধারিণী মা পাগলের মতো হয়ে সায়েবগোর কাচে ছেল্যের হাড় কয়খান খালি চেয়েলো, তেনারা সেটুকু দয়াও করে নাই।

স্তব্ধ হয়ে বসে অছে হরিশ। তার চোখের জলও যেন শুকিয়ে গেছে। আলিপুর জেলখানার পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে পাঁচটা বাজলো।

তখনো আলো ফোটেনি। রাতের রেশ রয়েছে।

॥ তিন ॥

করালীচরণের সঙ্গে পরিচয়টা নিতান্তই আকস্মিক।

অন্য কোনো সূত্রে লোকটা যদি গিরিবালার বাপের বাড়ির হদিস পেয়ে যেতো, তবে তার সঙ্গে কোনোদিনই পরিচয় ঘটতো না হরিশের। সে এত কাছে আসতো, গিরিবালার ঠিক করে রাখা

জায়গা দীনু বাগদির বাড়িতে একদিন কি দু'দিন থাকতো, কালীঘাটে তীর্থ করে আবার ফিরে যেতো নিজের গ্রামে। হরিশ জানতেই পারতো না, গল্প-গাথায় শোনা বিশে ডাকাতের কালের এক জীবন্ত সাক্ষী তার বাড়ির এত কাছে এসেছিল।

বুড়ো মানুষটা চলেও গেছে। কিন্তু দু'দিন পরে নয়, পনেরো দিন পরে। হরিশের অনুরোধে পনেরো দিন সে ছিল। তার দরুণ খরচ-খরচার টাকা চন্দরার মারফৎ দীনু বাগদিকে পাঠিয়ে দিয়েছিল হরিশ। বরঞ্চ কিছু বেশি টাকাই দিয়েছে। কারণ, দীনুর অবস্থাও ভালো নয়। তার মেয়ে কাজলীকে তাড়িয়ে দিয়েছে তার স্বামী। মেয়েটা এখন বাপের সংসারেই আছে। মুনিস খেটে আর চুনোমাছ ধরে দু'এক পয়সা যা পায় তাই দিয়ে সংসার চালায় দীনু। তার সংসারের অবস্থা চন্দরা-ই বলেছে হরিশকে!

এই পনেরো দিনের ভেতর অন্তত দশদিন করালীর কাছে বসে তাদের এলাকার অনেক কাহিনী শুনেছে হরিশ। কোনোদিন দীনুর বাড়িতেই বসতো, কোনোদিন চন্দরার বাড়ি।

প্রথম দু'একদিন গিরিবালা হেসে বলেছে, ছোট্দাদাঠাউরের কত রকম যে বাতিক! তোমাক তরফ কলকেতা মায় বেলাতের গোরা সায়েবরা পজ্জন্ত চেনে, আর সেই তুমি কিনা অজ পাড়াগাঁর গপ্পো শোনার তরে হুমড়ি খেয়ে পড়েচো?

হরিশ হেসে বলেছিল, তোকে আমরা যেখানে দিয়েচি, সেখানকার হালচালগুলো জেনে রাখতে হবে তো?

গিরিবালা বললে, হ্যাঁ, তাই তো বটে! এমন জায়গায় মেয়েকে তোমরা বে' দিয়েচো যে দিন রাত্তির সারা সময় খালি কুটেল সায়েব আর তেনাদের আম্লিন, গোমস্তা মিন্‌সেগুলোর ভয়ে সিঁটিয়ে থাকতে হয়! আমার তো মন সব্বোদা খালি পালাই পালাই করে।

ম্লান হেসে করালী বললে, দিদি আমার ঠিক কতাই কয়েচে বাবু। আমারও এই বয়েসে মনে হয়, যে দেশে নীলির নাম কেউ শোনে নাই, তেমন দেশ পালি সেখেনেই চ'লে যাই।

করালীর ওপর গিরিবালার মমতা সত্যিই আন্তরিক।

গিরিবালার বিয়ের কয়েকমাস পরেই তার স্বামী নবীনকে নিশ্চিত অপঘাত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিল করালী। সাপে কেটেছিল নবীনকে। যে সে সাপ নয়, একেবারে খরিশ গোখরো। ঘটনা বাড়ির কাছেই। বদ্যিনাথও তাড়াতাড়ি বিষ ওঠার আগে নাতির পায়ে তাগা বেঁধে দিতে পেরেছিল। গুণীন আসার আগেই সেই বিষ মুখ দিয়ে টেনে বের করে বদ্যিনাথের নাতির চেতন ফিরিয়ে আনলে করালী। বেঁচে গেল নবীন।

বদ্যিনাথ ঘোষের ছেলে বেঁচে নেই, ওই নাতিই চোখের মণি। তখন থেকে করালীকে সে দাদা বলে ডাকে। সে সুবাদে নাতবৌ গিরিবালারও সে দাদা হয়েছে। নিজেদের বাড়িতে কিম্বা ক্ষেত-খামারে সারা বছর যখন যা মাইন্দারির কাজ, সব করালীর বাঁধা। নিজের হাতে রেঁধে বুড়োকে খাওয়ায় গিরিবালা। কম তো নয়-ই, বরঞ্চ একটা তরকারি বেশিই রাঁধে। লাউ-চিংড়ি খেতে ভালোবাসে করালীদাদা। যেদিন তাকে খাওয়ায় সেদিন লাউ-চিংড়ি সে করবেই। হাতের কাছে কুচো চিংড়ি না পেলে নাতবৌয়ের তাগাদায় বেরিয়ে পড়তে হয় বদ্যিনাথকে। যেখান থেকে হোক কুচো চিংড়ি জোগাড় করে ফিরতে হয় তা[illegible] নিজে পরিবেশন করে গিরিবালা। সারাক্ষণ কাছে দাঁড়িয়ে থেকে দু'চোখ ভরে দেখে বুড়োর তৃপ্তি করে খাওয়া। বাগদি হল ছোটো জাত—জল-চল নয়। বাড়ির সীমানার বাইরে তার কলাপাতায় একবারেই ভাত-তরকারি ঢেলে দিয়ে এলেই তো মিটে যায়। তবু গয়লা বাড়ির বৌ হয়ে বদ্যিনাথ ঘোষের নাতবৌ ওই বাগদি বুড়োটাকে নিয়ে এত বাড়াবাড়ি করে কেন, তা নিয়ে কানাকানি করে পাড়াপড়শি। সে সব কথা গ্রাহ্যই করে না গিরিবালা। যে মানুষটা যমের হাত থেকে তার কপালের সিঁদুর আর হাতের শাঁখা-নোয়া ছিনিয়ে এনে তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে, তাকে সে একটু যত্ন করে খাওয়াবে না? পাড়াপড়শি সবাই জানে। তারপরেও যদি তাদের কানাকানি ক'রতে ভালো লাগে তো তারা করুক।

বাপের বাড়ি আসার সময়ও করালীকে আন্তরিকভাবেই কলকাতায় আসতে বলে এসেছিল গিরিবালা। এই বুড়োর কাছে চন্দরারও কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। একমাত্র বাড়িতে থাকতে দেওয়া ছাড়া, তার জন্যে আর সব রকম ব্যবস্থাই তারা মায়ে-ঝিয়ে করেছে। করালীকে তীর্থ করা উপলক্ষ্যে একখানা নতুন কাপড় কিনে দিয়েছে চন্দরা। নিজেরা সঙ্গে নিয়ে তাকে কালীঘাটের মন্দির দর্শন করিয়ে এনেছে।

সব মিলিয়ে করালীও অভিভূত হয়ে গিয়েছিল।

গিরিদিদি তাকে যথেষ্ট সমাদর করে তা ঠিকই; কিন্তু তার কথার ভরসায় তীর্থ করতে এসে তার কপালে যে এতখানি আদর-যত্ন জুটবে তা সে কল্পনাও করতে পারেনি। আরো তাজ্জবের কথা, এমন একজন বাবুর কাছেই গিয়ে সে পড়েছিল, যাঁকে নাকি গোরা সাহেবরাও সমীহ করে চলে। তাঁর লেখা পড়ে বিলেতের সাহেবরা নাকি এদেশের শয়তান গোরাগুলোর স্বভাব-চরিত্তির জেনে নতুন ব্যবস্থা করেছে।

গিরিবালা আর চন্দরার মুখে হরিশের পরিচয় শুনে প্রথমদিকে একেবারে সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিল করালী। তার মতো একটা গেঁয়ো মানুষকে বাবুর কেন এত দরকার, কেন তিনি তাকে কয়েকটা দিন থেকে যেতে বললেন, কিছুই তখন সে ঠাহর করতে পারেনি।

দীনুর মেয়ে কাজলী বলেছিল, থাকতে যখন বলেচেন তখন কটা দিন থেকেই যাও দাদা। আমাদিগের তো কোনো অসুবিদে হচ্চেনি, তোমার কিছু অসুবিদে না হলেই হল। ওই বাবু দেবতুল্যি মনিষ্যি। ওনার কলমের খোঁচায় নাকি নাটসায়েবও ভয় পায়। গরীবদুখীর দুখ্যু উনি সত্যি সত্যি বোঝেন। হয়তো তোমাদিগের নীলকুটির কুটেলগুলোর নামে কিছু লিকবেন মন করেই তোমার ঠেঞে নানা কিছু খপর-সংবাদ জেনে লিতে চাইচেন।

কাজলীর কথাটা মনে লেগেছে করালীর।

দীন-দুঃখীর দুঃখ বোঝার মতো অন্তঃকরণ না হলে সে রাতে বাবু অত যত্ন করে তাকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে গেলেন কেন? যে সে জাত নয়, একেবারে ব্রাহ্মণ। তাও বলেন কিনা, জাত মানিনে? নিজের বাড়ির বৈঠকখানায় মাদুর পেতে শুতে দিলেন, একটা মশারি পর্যন্ত দিলেন, যাতে মশা না কামড়ায়। অবিশ্যি, শোয়া আর হয়ে ওঠেনি। সর্দারের কথা বলতে বলতেই তো রাত পুইয়ে গেল। বাবু যে কত ভক্তিভরে শুনচিলেন, তা তো তাঁর চোখের চাউনি দেখেই মাঝে মাঝে বুঝতে পারছিল সে। শুনতে শুনতে চোখে জল এসে গিয়েছিল বাবুর। দীন-দুঃখীর ওপর মায়া-মমতা না থাকলে এমনিই কি আর চোখে জল আসে?

কাজলীর সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেছে করালীর। কাজলী বলেছে, এরপর গিরি যকন শউরবাড়ি যাবে, ওর সঙ্গে গে কটা দিন তোমার এই লাতনি তোমার বাড়ি কাটিয়ে আসবে দাদা। আপত্তি নেই তো?

আপত্তি? করালী তো আনন্দে ডগমগ। একগাল হেসে বললে, আপত্তির কতা কী কচ্চিস দিদি, এ তো আমার ভাগ্যি। নিজির ছাবাল-বিটি, লাতি-লাতনি কতি তো কেউ নাই, পরই আমার আপন। যাস দিদি, আপন দাদার ঘর ভাব্যেই যাস। খুদ কুড়ো যা দিয়ে পারি আমার সাদ্যিমতো যতন করবো। কতা দে, যাবি তো?

—বাঃ রে, আমি নিজেই তো তোমাকে বল্লু বাপু। তারপরে আবার কতা দেওয়ার কী আচে? তা হ্যাঁ গা দাদা, তুমি বে করোনি?

চোখ দুটো হঠাৎ কেমন যেন নিষ্প্রভ হয়ে গেল করালীর। বললে, না রে দিদি, সোমায় পাই নাই। বে'র কতা সব ঠিক হয়ে গিয়েলো, সেই সোমায় অ্যাকদিন আমার অবিয়েতো বুনডা নিখোঁজ হয়ে গ্যালো। কুটির দেয়ানজীর বাড়ীত ধান ভানার কাজ কত্তি যেতো। সিদিনও তাই গিয়েলো। রাত্তির হয়ে যায়, বুন আর ফেরে না। শ্যাষে আমিই গেলাম দেয়ানজীর বাড়ি। তিনি কয়, তোর বুন তো ব্যালা থাকতি বাড়ি চল্যে গেচে। ফিরে আলাম। অ্যাকদিন গ্যালো,

দুইদিন গ্যালো, তিনদিনির দিন কুটির পেচনে জলঙ্গীর জলে আমার বুনির লাশ ভেসি ওট্‌লো। সেই রাত্তিরিই ফেরার পথে দেয়ানজীরি ধরেলাম রে দিদি। চান্দি তাক করেই নাটি হে'কড়েচেলাম কিন্তুক কপাল মন্দ, সামিন্দিরি নিকেশ কত্তি পাল্লাম না। এই ঝে মোর কপালে দাগডা দেকতিচিস, এডাও নাটির ঘা। দেয়ানজীর নেটেলা মেরেলো। সেই রাত্তিরিই ফেরার। তারপর খুজতি খুজতি গে' সন্দারের দলে ভিড়ে গেলাম। তা বে' করার সোমায় আর কবে পালাম ক' দিনি?

বাড়ির পেছনে বাঁশঝাড়ের ওপাশে একপাল শেয়াল ডেকে উঠ্‌লো। এদিক ওদিক অন্ধকারে টিপ্‌টিপ্ করে জ্বলছে জোনাকির আলো। সেই কোন্ প্রথম যৌবনের কথা বলতে বলতে কতকাল আগের সেই ভাতছালা গাঁয়ের এক অন্ধকার রাতের রাস্তায় ফিরে গেছে করালীর মন।

কাজলী কী যেন একটা কথা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই হরিশের গলার সাড়া পাওয়া গেল।

—দীনু।

—ওই যে ছোট্‌ঠাউর এসে গিয়েচে দাদা। এইবার আবার তোমার গপ্পের ছালা খুলে দাও।

ভারী গলায় করালী বললে, গপ্পো না রে দিদি, এ হল ছাতিফাটা কান্নার বোল।

দীনু সাড়া দিয়ে এগিয়ে গেল।

বড়ো রাস্তা থেকে তার ঘরের আঙিনা পর্যন্ত পথটুকু সরু, দু'পাশে কাঁটাগাছ সমেত ঝোপজঙ্গল। বাবু এ সময় মদের নেশায় একটু বেসামাল থাকেন তা দীনু জানে। অবশ্য কথাটা বলতে গেলেই বেসামাল, নতুবা অত মদ খেলেও বাবুর পা-ও টলে না, কথাও জড়ায় না—সেটা এই ক'দিনে ভালোভাবেই লক্ষ্য করেছে সে। হয়তো দামী বিলিতি মদে এইরকমই হয়। সে নিজে তাড়ি খায়, ধেনোও খায়। মাত্রা একটু বেশি হয়ে গেলে তার তো এখনো পা টলে। আর কথা জড়িয়ে যাবে তো বটেই।

হরিশকে এগিয়ে আনতে এসে দীনু বললে, আপনি কেন কষ্ট করে আসেন কত্তাঠাউর? আপনার যা শোনার দরকার, খুড়ো গিয়েই তো রোজ শুনিয়ে আসতে পারে?

হরিশ বললে, আমার তো সময়ের ঠিক নেই দীনু, সেইজন্যেই এই ব্যবস্থা করেচি। করালী তো থাকচেই, আমি যখন সময় পাই, চলে এলুম।

এটা একটা কারণ বটে, কিন্তু এইটেই সবচেয়ে বড়ো কারণ নয়। চন্দরা আর গিরিবালার কাছে তার সম্বন্ধে নানা কথা শোনার পর বুড়ো মানুষটা এত সঙ্কুচিত হয়ে আছে যে, তাকে ডেকে নিয়ে বৈঠকখানায় বসালে আর হয়তো সে সহজ স্বচ্ছন্দভাবে কথা বলতে পারবে না। তার চেয়ে দীনু কিম্বা চন্দরার বাড়িতে তাকে অনেক স্বাভাবিক ভাবে পাওয়া যাবে। এই কারণেই হরিশ নিজে আসছে।

এতবড়ো নামী লোক তার বাড়িতে আসছে তাতে পাড়ায় ইজ্জৎও বেড়ে গেছে দীনুর। তার পাশাপাশি আবার একটা কানাকানিও শুরু হয়েছে। তবে সেটা বাগদি পাড়ায় নয়, চালপট্টির বামুন-কায়েত পাড়ায়। হরিশ মুখুজ্যে একটা চীজ বটে! এদিকে তো ইংরিজি কাগজ করে কত বড়ো বড়ো লেক্‌চর ঝাড়া হয়, ওদিকে নজর ছি ছি ভাগাড়ে। খান্‌কি পাড়ায় যাওয়া আসা তো আছেই, তার ওপর এবার নজর দিয়েছে দীনু বাগদির ভাতার খেদানো ডব্‌কা মেয়েটার ওপর। বেশ কিছু টাকাও নাকি আগাম ঠেকিয়ে রেখেছে। বেড়ে দিন কাটাচ্ছে হরিশ মুখুজ্যে!

জলচৌকির মতো বাঁশের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বোনা ছোটো একটা মাচি বামুন ঠাকুরের জন্যে ঝেড়ে পুছে পরিষ্কার করে রেখেছে কাজলী। হরিশ আসতেই ছুটে গিয়ে মাচিটা এনে সে পেতে দিলে।

হরিশ বললে, হ্যাঁ রে কাজলী, যে বুড়োকে বাড়িতে ঠাঁই দিয়েচিস, সে যে এককালে ডাকাত ছিল তা জেনেও কোনো ভয়-টয় করচে না?

—না গো ছোটোবাবু, আমাদিগের ছোটোজেতের ভয়-ডরটা অত কথায় কথায় আসে না। আমি তো দাদার বাড়ি গে' কিচুদিন কাটিয়ে আসব ভাবচি।

করালী হেসে বললে, এ আমি অ্যাক জব্বর লাতনি পেয়েচি বাবু। ওর খালি আমাগোর ন'দে-যশোরের ভাষায় ঝা আপত্তি, তা না'লি মনডা পুরোই আমারে দিয়ে বসে আচে!

ফিক্ করে একটু হেসে কাজলী বললে, ডাকাতে বুড়োর শখের বহর দেখেচো ছোটোবাবু? বলি, বয়েসকালে ছিলে কোথায় গো?

—মুই তো পিতিক্ষে করেই ছেলাম রে দিদি, কিন্তু জম্মো নিতি নিতি তোরই ঝে বেলা গড়ায়ে গ্যালো।

হো হো করে হেসে উঠ্লে হরিশ।

কাজলীও কম যায় না। বললে, তোমার পিতিক্ষের যা বহর দেক্চি, তাতে বোধ করি আমি আর এক জম্মো ঘুরে আসা তক্ও তুমি আমার তরে পিতিক্ষে করে বসে থাকবে?

—তা থাকতি পারি। ওই নীল-বিষির খ'য়ে গোখ্রো কুটেল সুমুন্দিরা কবরে না যাওয়া তাবাদি মুই এ-দুনিয়া ছেড়ি যাচ্চিনে। ওরা কবরে যাবে দেকে তারপরে মুই চিতেয় ওট্বো, এই তোরে কয়ে রাক্লাম।

হরিশ এবারে আর হাসলে না। গাঢ় স্বরে বললে, আমিও ঈশ্বরের কাছে তাই প্রার্থনা করি।

—তাই-ই হবে বাবু। সেই কতকাল আগে আমরা ঝ্যাকন ফিরিঙ্গি সায়েবের সঙ্গে নড়াই করিচি, ত্যাকনেথে দিনকাল, হালচাল কত পাল্টে গেচে। নাতি খা'য়ে ত্যাকন চাষী-রেয়েরা খালি কান্দতিই জানতো। কিন্তু আজ এই কয় বচ্চোরে ঝা দেকতিচি, তাতে আশায় বুক বান্দ্তি নেগেচি। তারা ক্ষেপে উট্তিচে বাবু। আরো কিনা গ্যালো বচ্চোরে সেপাইদের নড়াই হয়ে যাওয়ায় ছাতিতি খুব বল পায়েচে রেয়েরা। অনেক গাঁয়েই নীলির চাষ করবে না বলে তারা জোট বান্দ্তি নেগেচে।

—দিক, ঝামা ঘষে দিক অনামুকোগুলোর মুকে।—বললে কাজলী!

—সেই আশায় বুক বেঁধিই তো বসে আচিরে দিদি।

হঠাৎ হরিশের দিকে তাকিয়ে কাজলী বললে, একটা কথা শুধোবো ছোটোবাবু? এই যে দাদারে অ্যাদ্দিন আটকে রেখে এত কিছু তুমি শুনলে, এতে হবেটা কী? তোমার কাগজে ছাপ্বে নাকিনি?

উদ্গ্রীব আগ্রহে করালীও তাকালে হরিশের দিকে।

হরিশ বললে, ছাপতে তো হবেই রে কাজলী। নইলে বুড়ো মানুষটাকে আর এত কষ্ট দিচ্ছি কেন?

—আমার কোনো কষ্ট হচ্চে না বাবু, কোনো কষ্ট হচ্চে না। আমার এই লাতিন কত যতন কর্যে রেন্দি খাওয়াচ্চে, লাতবৌ গিরিদিদি একখান দু' খান করে তরকারি পেঠ্য়ে দেচ্চে, ভালো তামুক খাওয়াচ্চে দীনুবাপ—আমার অভাবটা কী? তুমি ঝা জানতি চাও, জেনি নাও। তোমার কাগজ নাকি হিল্লি দিল্লি বেলাতেও যায়—তেনারা জানুক, নীলবিষির খ'য়ে গোখরোরা আমাগোর কী হাল করে ছাড়েচে।

কাজলী বললে, তুমি সত্যিই নিক্বে তো ছোটোবাবু?

—কেন, তোর বিশ্বেস হচ্চে না?

—তোমাকে পেত্যয় না গেলে নরকেও আমার ঠাঁই হবেনি ছোটোবাবু। আমি কেন শুধোচ্চি, জানো? তুমি তো সবই এংরাজিতে নেকো। গোরাদিগের চোকে দাদার নামটা পড়লে এই বুড়ো বয়েসে তেনারা যদি দাদাকে নে টানাটানি করে?

হরিশ হেসে বলে, তাই বল। তোর এই ভয়? কোনো চিন্তা নেই রে কাজলী, করালীর নাম কেউ জানবে না।

—জানুক না ক্যান।—করালী বললে, ঝে মোপুরুষির সাগরোদ করেলাম, সিনি মিত্যুরি ভয় করেন নাই। কুন্যের জঙ্গলে সিনি সিদিন ধরা দে' ফাঁসিতি গ্যালেন আর মোরা চোরের মতো পালুয়ে গ্যালাম, সে নজ্জার জ্বালায় আজও কখন কখন বুকির মদ্দি হু হু করে ওটে রে দিদি।

হরিশ হাত রাখলে করালীর কাঁধের ওপর। বললে, লজ্জা কেন করালী? তোমাদের সর্দারের তাই তো হুকুম ছিল?

ধরা গলায় করালী বললে, হুকুম তো দুডোই ছেল বাবু। পেত্থমডা মানলাম, পরেরডা তো মানতি পাল্লাম না। আবার দল গড়ে কুটেলগোর পর পিতিশোদ নেয়ার হুকুমও তো দিয়েলো সদ্দার, কিন্তু কিচুই কত্তি পাল্লাম না। এত বচ্চোর ধরে খালি কুটেলগোর অত্যোচার মুক বুজে দেকেই আয়েলাম। কী করো বাবু, মোল্লাহাটি কুটির নালমোন সায়েব দিনকে দিন ঝা কীত্তি কারবার আরাম্ব করেচে তা আর চোকি সহ্যি হয় না। চামড়ার চাবুক বান্য়েচে, তার নাম দেলে শ্যামচান্দ। সে চাবুকির অ্যাট্‌টা বাড়ি খালি নোকে চেতন হারায়। শ্যামচান্দের বাড়ি খায়ে কত রেয়ে যে বিচানা নেচে তার হিসেব নাই। কও বাবু, এ কি সহ্যি করা যায়?

উত্তেজিত ভাবে কাজলী বললে, তোমাদিগের দেশের নোকেরা কী গো? সহ্যি করে কেন? সব্বাই মিলে সায়েবের পর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে না?

—অ্যাকন তাবাদি তেমন করে পারে নাই রে দিদি। ঝ্যাকন বাঁচার আর কোনো পথ থাকে না ত্যাকন শালিক পাকিও বাজ পাকির পর ঝাঁপয়ে পত্তি আর ভয় পায় না। সে দিন এস্‌তেচে।

দাওয়ার কোণে একটা টিমটিমে রেড়ির তেলের পিদিম জ্বলছে। তার সামান্য আলোয় করালীর মুখখানাও ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। তবু হরিশ বুঝতে পারছে, প্রথম দিনে তার বৈঠকখানায় বসে বিশে ডাকাতের কাহিনী বলতে বলতে মাঝে মাঝে করালীর চোখ দুটো যেমন জ্বলে উঠ্‌ছিল ঠিক তেমনি জ্বলে উঠেছে।

করালী আবার বললে, গরীবিরে দ্যাখার তো কেউ নাই। নড়ালির জমিদার অতনবাবুর মতো আর আট দশ জনা জমিদারবাবুও ঝেদি থাকতো তালি ঠান্ডা কত্তি পাত্তো এই জাতসাপগুলোরে।

অতনবাবু মানে নড়ালের জমিদার রামরতন রায়।

হঠাৎ হেসে ফেললে করালী। বললে, তয় বাবু তেনার অ্যাট্টা মজার ব্যাপার কই। তেনার জমিদারির মদ্দি এক সমিন্দি নীলকরও নীলচাষের জন্যি এক ছটাক জমি পায় নাই, সে কতা তো আগেই কয়েচি। অ্যাকবার কী হয়েলো, জানো? অ্যাক কুটেলা জবরদস্তি করে তেনার এলেকায় কয়েক কুড়ো জমিতি নীলির বীজ বুয়ে দিয়েলো। চারা বাড়তি নেগেচে, বাড়চে অ্যাক হাত মতো হয়েলো। হঠাৎ অ্যাকদিন সক্কাল ব্যালায় দ্যাকা গ্যালো, কোতায় নীলির খেত? সেকেনে রাতারাতি হয়ে গেচে নেরকোলের ক্ষেত। সারি সারি নেরকোলের চারায় ভরে আচে জমি। নীলির চারার নাম গন্দ নাই।

চোখ দুটো বড়ো বড়ো করে কাজলী বললে, এক রেতে?

—তয় আর কচ্চি কীরে দিদি? কুটেলার ঝেদি আচে পাঁচ কুড়ি নেটেলা, তেনার আচে বিশ কুড়ি। চাষী রেয়েরা তেনারে ছেন্দা করে। ঘশোর জেলার সবচে' বড়ো জমিদার তিনি, তেমনি বাপের ব্যাটা। কুটেলরা তারপরেত্থে তেনারে এড়য়ে চলে। ঝ্যামন কুকুর ত্যামন মুগুর নড়ালির অতনবাবু।

কাজলী খুব খুশি। বললে, আচ্ছা জব্দ। আর সব জমিদার বাবুরা কেন এমনধারা হয় না?

হরিশ হেসে বললে, তাহলে কাজটা অনেক সোজা হয়ে যেতো তাই না রে?

—তা তো হতোই বটে।

করালী বললে, তালি আর ভাবনা কী ছেলো রে দিদি? জমিদারবাবুরাও যে নীলির চাষে

মেতি ওটেচেন। গোরা কুটেলগোর সঙ্গে দোস্তি না রাকলি তেনাদের নীলির চাষ ঝে চিতেয় ওটবে। খুলনে ম'কুমার অ্যাকটা নোকচলীতি কবি আচে জানো বাবু?

গুলিগোলা সাদেক মোল্লা রেনির দপ্পো কল্লে চুর
বাজিল শিবনাথের ডংকা, ধন্য বাঙলা বাঙালি বাহাদুর।

হরিশ বললে, নীলকর রেনি সাহেবের সঙ্গে তালুকদার শিবনাথ ঘোষের লড়াই নিয়ে লেখা ছড়া তো?

হাঁ করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো করালী।—তয় তো তুমি অনেক খবরই রাকো বাবু। আমি আর কটুক কতি পাল্লাম?

হরিশ তাড়াতাড়ি বললে, না, না, অনেক কিছু জানলে তোমাকে আটকে রেখে এত সব খবর শুনলুম কেন? আমার এক বন্ধু আছেন, ওইদিকেই তাঁর বাড়ি। ছড়াটা তাঁরই মুখে শুনেচি। তোমার কাছে এই ক'দিন আমি যা জানতে পারলুম, তার দাম আমার কাছে অনেক।

কথাটা শুনে আশ্বস্ত হল করালী। তার দমে যাওয়া মনটা আবার চাঙ্গা হয়ে উঠলো।

হরিশ বললে, তোমাকে একটা অনুরোধ করে রাখছি করালী। গাঁয়ে গিয়ে আশেপাশে একটু লেখাপড়া জানা এমন কাউকে যদি পাও, যিনি নীলকরদের অত্যাচারের বিবরণ লিখে আমার কাছে পাঠাতে ভয় পাবেন না তাহলে তাঁকে আমার কথা বলো। জানিও, তাঁর নাম গোপন থাকবে। আর তাছাড়া কেউ যদি সাহস করে নাম দিয়েই লিখতে চান, তাহলে তা গোপন রাখার প্রশ্নই নেই। আমার কাগজ ইংরিজি, কিন্তু বাঙলায় লিখে পাঠালেও চলবে। আমি তার ইংরিজি করে নেবো।

উৎসাহে চকচক্ করে উঠলো করালীর চোখ। বললে, ভদ্দরনোক ছাড়া তো এ কাজ হবে না বাবু। আর আমি হলাম ছোটো জাত, আমার কতা ভদ্দরনোকেরা শোনবেই বা ক্যান?

—আমার কাগজের কয়েকখানা তোমাকে আমি দিয়ে দেবো। নামটা দেখলেই তাঁরা বুঝতে পারবেন। আশা করি, তখন তোমার কথায় তাঁরা আর অবিশ্বাস করবেন না। কাগজ তুমি নিয়ে যাবে তো?

আমি বুকি চেপি নে যাবো বাবু। আমাগোর দুক্কির কতা তুমি পাঁচজনেরে জানাবা আর আমি এইটুক্ কাজ কত্তি পারবো না?

গভীর আবেগে হরিশের পা ছুঁয়ে প্রণাম করলে করালী।

॥ চার ॥

হঠাৎ কী এমন হ'ল হরিশের?

কিশোরীচাঁদ, গৌরদাস, শম্ভুনাথ—সবাই অবাক! পয়লা নবেম্বর অত বড়ো একটা উৎসবের দিনে প্রসন্ন ঠাকুরের সুঁড়োর বাগানবাড়িতে পাঁচজন সেরা বাঈজী এনে মাইফেল বসানো হয়েছিল। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সভার প্রায় সব সদস্যই হাজির কিন্তু হরিশ নেই! শম্ভুনাথ ভবানীপুরে থাকে তাই সবাই একবার করে তাকেই জিজ্ঞেস করেছে, হরিশ এলো না কেন? কী উত্তর দেবে শম্ভুনাথ? সে তো নিজেই বুঝতে পারছিল না, হরিশের না আসার কারণ কী?

কিশোরীচাঁদ, গৌরদাস—কারো সঙ্গেই বেশ কিছুদিন দেখা-সাক্ষাৎ নেই হরিশের। এমন কি, যে গিরীশের সঙ্গে আপিসে রোজই দেখা হচ্ছে, সেই গিরীশ পর্যন্ত হরিশের আচরণে রীতিমতো অবাক। তার ক্ষেত্রে বিস্ময়ের সঙ্গে একটু অভিমানও মিশেছে। কারণ, কৈলাসকামিনীর কাছে সে রীতিমতো অপ্রস্তুত হয়ে গেছে। যে হরিশ তার বাড়িতে লুচি খাওয়ার নেমন্তন্ন পেলেই ফলারে বামুনের মতোই ব্যস্ত হয়ে ওঠে, সেই হরিশ কিনা সেদিন গররাজি হল! পরে আর একদিন হবে বলে কেমন যেন তাড়াহুড়ো করে নেমন্তন্নটা সেদিন এড়িয়ে গেল।

কৈলাসকামিনীর খুব ইচ্ছে, মহারাণীর ঘোষণার পর হরিশকে একদিন ভালো করে খাওয়ায়। সে নিজেই গিরীশকে বললে, হ্যাঁ গা, সামনের রোববার মুকুজ্যেমশাইকে নেমন্তন্ন করে এসো। আমি এবার মায়ের কাছে আরো দুটো নতুন রান্না শিখে এয়েচি।

সানন্দে হরিশকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিল গিরীশ। কিন্তু হরিশ বললে, আমি এখন বড়ো ব্যস্ত আছি গিরীশ। এরপর সময় সুযোগ বুঝে আর একদিন লুচির মোচ্ছব বসানো যাবে, কি বলো?

ক্ষুণ্ণ স্বরে গিরীশ বললে, বেশ, তাই হবে।

সে নিজে নেমন্তন্ন করে প্রত্যাখ্যাত হলে হয়তো অভিমান হত না গিরীশের। কিন্তু নেমন্তন্নের আগ্রহটা গৃহিণীর। সে যে মনঃক্ষুণ্ণ হল, সেইটেই গিরীশের অভিমানের কারণ হয়েছে।

কিন্তু নতুন কী কারণে হরিশ হঠাৎ এত বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়লে, তারই কোনো হদিস পাচ্ছে না গিরীশ। কালীচরণকে জিজ্ঞেস করেছিল, সেও কিছু জানে না। শুধু একটা খবর সে বলতে পারলে, পরপর দুটো রবিবার সে চন্দননগরের কাছে কোন গ্রামে নাকি গিয়েছিল।

হরিশের যা কিছু ব্যস্ততা সবই তো তার পেট্রিয়টকে ঘিরে। পেট্রিয়টও নিয়মিত বেরোচ্ছে, হরিশও নিয়মিত আপিসে আসছে। আজকাল শম্ভুচাঁদ ছেলেটাকে সহকারী পেয়ে তুলনায় একটু পরিশ্রম লাঘবও হয়েছে হরিশের। বিকেলের দিকে প্রায় রোজই ভবানীপুরে গিয়ে পেট্রিয়টের কাজকর্ম দেখে শম্ভু। সুতরাং রবিবার যদি ফরাসডাঙায় তার কোনো বিশেষ কাজও থাকে, সপ্তাহের অন্য কোনো দিনও সে গিরীশের বাড়ি আসতে পারতো? এর আগে তো কতদিন সেইভাবেই গেছে। অথচ কী এমন রহস্যময় ব্যস্ততা হঠাৎ তাকে পেয়ে বসেছে যে, একটা দিন দু'ঘণ্টার জন্যেও তার বাড়িতে খাওয়ার অবকাশ হরিশের হল না?

কিশোরীচাঁদের বিচার-প্রহসন নিয়ে একটা নিবন্ধ লিখেই দায় সারেনি হরিশ। কুইনস্ প্রোক্লেমেশনের পর ঠিক চারদিনের মাথায় চৌঠো নবেম্বর তারিখের পেট্রিয়টে তার 'নেটিব ম্যাজিস্ট্রেট' লেখাটা বেরিয়ে গেছে। তার জের হিসেবে পরের সপ্তাহে এগারো তারিখের কাগজেই আবার বেরিয়েছে 'নেটিব কর্মচারী'। এ লেখাটায় আরো তীব্রভাবে সমালোচনা করা হয়েছে হ্যালিডে সাহেবকে। লেখাটা পড়ে হরিশকে সাধুবাদ জানিয়েছিল গিরীশ। কিন্তু তার বাড়ি যাওয়ার প্রসঙ্গ নিয়ে ইচ্ছে করেই কোনো কথা তোলেনি। প্রচ্ছন্ন অভিমানটুকু মনেই পুষে রেখেছে।

কিন্তু হরিশের ওপর অভিমান করে সে বেশিদিন থাকতে পারে না, এই যা তার অসুবিধে। আর থাকতে না পেরে গিরীশ একদিন সরাসরি জিজ্ঞেস করলে, তোমার ব্যাপারটা কী, বলো দিকি? দক্ষিণেরঞ্জন মুখুজ্যের মতো নিজেকে ক্রমেই এত রহস্যময় করে তুলচো কেন?

মুচকি হেসে হরিশ বললে, শৈব সাধনা করচি।

—শৈব সাধনা! তুমি করচো!—কেন, ব্রহ্ম ধর্মে অরুচি ধরে গেল নাকি?

—না হে, সেটা তো হাতের পাঁচ রইলোই। তার পাশপাশি শৈব সাধনা একটু করে দেখি, কেমন লাগে। জানো তো, সমুদ্র মন্থনে ঐরাবৎ, উচ্চৈঃশ্রবা, উর্বশী, অমৃতভাণ্ড—যা কিছু দামী দামী জিনিস উঠলো সেগুলো সবই হাতিয়ে নলে গোরার দল আর খেটেখুটে হয়রান হয়ে নেটিবগুলোর ভাগে জুটলো অষ্টরম্ভা?

বড়ো বড়ো চোখ দুটো আরো বিস্ফারিত করে গিরীশ বললে, এ আবার কেমন ব্যাখ্যা রে বাবা!

—অতি সহজ এবং সরল ব্যাখ্যা। ধরে নাও, পুরাণের দেবতারা হল গোরা, আর অসুরেরা হল নেটিব। সমুদ্রকে মনে করো, দেবতাদের পড়ে-পাওয়া চৌদ্দ আনার মতো উপনিবেশ। মন্থন করলে অনেক রত্ন উঠবে সেটা জেনেই ব্যবস্থাটা তারা করেচিলো। কিন্তু মন্থনের সময় নিজেরা ধরলে বাসুকীর ল্যাজের দিকটা আর ফণার দিকটা দিলে অসুরদের হাতে ধরিয়ে। এটুকু ঠিক বলেচি তো?

—সে তো সবাই জানে। কিন্তু দেবতা আর অসুরকে সোজাসুজি গোরা আর নেটিব করে ছেড়ে দিলে?

—তা নইলে যে আমার থিয়োরির আঁকটা মিলচে না হে।

—বেশ, তা নয় মেলালে কিন্তু তার সঙ্গে শৈব-সাধনার সম্বন্ধ কী?

—কেমন হিন্দুয়ানি করো হে? বাসুকির মুখ থেকে বিষের ফেনা বেরিয়ে আকাশ-বাতাসকে যখন ছেয়ে ফেলতে চলেচে তখন ওই শিবঠাকুরটি এগিয়ে গিয়ে সমস্ত বিষ নিজে পান করে না নিলে অবস্থাটা কেমন দাঁড়াতো বলো দিকি?

গিরীশ বললে, সৃষ্টি রসাতলে যেতো, দেবতা, অসুর সবাই মারা পড়তো।

—দেবতারা মারা পড়তো না। নারায়ণকে মোহিনীবেশে পাঠিয়ে অসুরগুলোর মাথা তো আগেই ঘুরিয়ে দিয়েচে—অমৃতভাণ্ড তখন তাদের দখলে। মারা পড়তো সরল মনের অসুরগুলো। আরে বাবা, পুরাণের ব্যাখাকারই বলেচেন, দেবাসুর আসলে আর্য আর অনার্য। তাই যে শিবঠাকুরটি সে যাত্রায় অনার্যগুলোকে বাঁচিয়ে দিলেন, তাঁর সম্বন্ধে আমার একটু কৌতূহল জেগেচে। শৈব পুরাণ-টুরাণগুলো একটু পড়ে দেখবো ভাবচি।

গিরীশ হেসে বললে, সেটা ভালো কথা। তবে কিনা, ফরাসডাঙায় খাঁটি শৈব-পুরাণ পাওয়া যায়, এমন কথা তো শুনিনি। তাছাড়া, শৈব-সাধনায় ফরাসী দেশীয় কারণবারি অপরিহার্য, এমনও আমার জানা নেই।

হরিশ হেসে বললে, ফরাসডাঙায় যাওয়ার কথা শুনেচো? কালীচরণ বলেচে বুঝি?

—পরপর দুটো রোববার গেচো, ঠিক তো?

—হ্যাঁ, গেচি তা ঠিক, তবে দু'দিন নয়। চুঁচুড়োয় গঙ্গাচরণের বাড়িতে একদিন, আর একদিন ফরাসডাঙায়। তাও ফরাসডাঙা বলা ঠিক হবে না। আসলে গিয়েচিলুম তার কাছাকাছি দুটো গাঁ তালডাঙা আর গোন্দলপাড়ায়। তবে হ্যাঁ, ফরাসডাঙায় যখন যাওয়াই হল তখন ফরাসী কারণবারি কিছু নিয়ে এয়েচি।

—সেটা নিঃসন্দেহে তোমার উপযুক্ত কাজই করেচো। না করলেই বরঞ্চ অবাক হওয়ার কারণ ঘটতো। কিন্তু হঠাৎ ফরাসডাঙার গাঁয়ে কেন? আত্মীয়স্বজন কেউ আছে নাকি?

—না। একালের আর্যদের ভারত-মন্থনের পালায় বাঙলাদেশের মাটিতে ক্লান্ত বাসুকি প্রথম যেখানে বিষ উগ্‌রেচিলো, সেই জায়গাটা দেখতে গিয়েচিলুম।

—কী বলচো, আমি কিছুই বুঝতে পারচি নে।

—ইন্ডিগো টিংকটোরিয়া।

—নীল?

—হ্যাঁ, নীল। শুধু নীল নয়—নীলবিষ!

লুই বন্নোর নীলকুঠির ভগ্নাবশেষ নিজের চোখে দেখে এসেছে হরিশ। বাঙলাদেশে প্রথম নীলকর বেঁচে নেই কিন্তু তার স্মৃতিচিহ্ন হয়ে পড়ে আছে পরিত্যক্ত ভাঙা নীলকুঠি। সেখানে ইঁটের ফোকরে এখন সাপের বাসা, কুঠরিতে নিশ্চিন্ত আশ্রয় করে নিয়েছে চামচিকে আর কাঁকড়া বিছে। গাঁয়ের লোক কেউ নীলকুঠির ধারে-কাছে যায় না। গাঁয়ের সবচেয়ে বয়স্ক যারা বেঁচে আছে তারাও কেউ নীল চাষ দ্যাখেনি। তবে বাপ-দাদার কাছে শুনেছে। এখনো ঝোপে-ঝাড়ে, এখানে সেখানে দু'চারটে নীলগাছ দেখা যায়। তারা আগাছার মতো জন্মায় আবার আগাছার মতোই শুকিয়ে মরে যায়। গাঁয়ের কয়েকজন বয়স্ক চাষী কলকাতার বাবুকে নীলগাছ চিনিয়ে দিলে। এখন সবে চারাগাছ মাত্র। এই গাছই বড়ো হবে। তবে জমি চষে, মই দিয়ে ঠিক চাষের মতো চাষ করলে যত বড়ো হতো, ততবড়ো নাকি হয় না। তালডাঙা আর গোন্দলপাড়ার চাষীরা মোটামুটি খবর রাখে। নদীয়া, যশোর, মুর্শিদাবাদ, ফরিদপুর, পাবনায় নীল চাষে ঘরে ঘরে কান্নার রোল উঠেছে, সে খবর তারা শুনেছে। ন'দে—যশোরের নীল নাকি সবচেয়ে ভালো

আর সবচেয়ে বেশি দাম পাওয়া যায় সেই নীলে। ভাগ্যে তাই হয়েছিল বলে যত রাজ্যের নীলকর সেই পূর্বদেশে গিয়ে কুঠি খুলেছে। এখানকার মাটিতে অত ভালো নীল হলে এখানেই তো শুরু হয়ে যেতো নীলের তাণ্ডব! ভগবান তাদের রক্ষে করেছেন। তা নইলে নদে-যশোরের মতো রক্তে ভেসে যেতো হুগলি জেলা। সুখ-শান্তি তবু যেটুকু আছে, তাও থাকতো না।

কি অদ্ভুত করিৎকর্মা নীলকর লুই বন্নো!

কয়েকবছর পরে সে নাকি মালদা জেলার কোথায় আরো নতুন নীলকুঠির পত্তন করেছিল। সে যে এখানে চাষীদের ওপর কোনো অত্যাচার করেছে, এমন কিছু কখনো শোনেনি কেউ। কিন্তু মালদার কুঠি সম্বন্ধে মরা-সাহেবের ওপর এখনো তাদের রাগ আছে। বিশেষত মুসলমান চাষীদের।

নীল তৈরির ব্যাপারে চুনের কী নাকি দরকার হয়। সেদেশে নতুন কুঠির কাছাকাছি চুন অমিল। বন্নো সাহেব তাই বলে কারবার বন্ধ করেনি। মুসলমানদের কবরখানা বেছে বেছে মাটির তলা থেকে হাড় উঠিয়ে জড়ো করে তাই পুড়িয়ে তৈরি করে নিলে দরকারের চুন। কারো আপত্তি সে মানেনি। নানা জায়গায় নীলকুঠি করে টাকার কুমীর হয়ে উঠেছিল লুই বন্নো।

করালী বাগদি একটা গভীর ছাপ রেখে গেছে।

নীলকরের ওপর বাঙলার চাষী—রায়তের ঘৃণা যে কত তীব্র সেটুকু অন্তত সে বুঝিয়ে দিয়ে যেতে পেরেছে হরিশকে। এর আগে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা আর কালা কানুন আন্দোলনের সময় রামগোপালের লেখা থেকে মফস্বলে শ্বেতাঙ্গ নীলকরদের অত্যাচার সম্বন্ধে একটা ভাসা ভাসা ধারণা ছিল হরিশের। প্যারীদাদা তাঁর আলালের ঘরের দুলাল বইতেও নিষ্ঠুর নীলকরের একটা ছোটো ছবি দিয়েছেন। কিন্তু পঞ্চাশ বছর আগেকার বিশে ডাকাতের একজন অনুচর এসে হরিশকে প্রবলভাবে একটা নাড়া দিয়ে গেছে।

ইংরেজের চোখে শেরউড জঙ্গলের রবিন হুড এক আদর্শ প্রবাদ-পুরুষ, কিন্তু বামনীতলার জঙ্গলের বিশ্বনাথ সর্দার এক ঘৃণ্য ডাকাত।

ভেতরে ভেতরে ক্ষোভে জ্বলে উঠতে আরম্ভ করেছিল হরিশের মন। করালীর সঙ্গে পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন নথি-পত্র আর গেজিটিয়ার ঘাঁটাঘাঁটি করতে করতে মরীয়ার মতো হয়ে উঠেছে হরিশ। তালডাঙা থেকে দুটো নীলগাছের চারা নিয়ে এসেছিলো। শুকিয়ে যাওয়া চারা দুটোকে ফ্রেমে বাঁধিয়ে লেখার টেবিলের সামনে দেওয়ালে ঝুলিয়ে রেখেছে।

মাধুরী একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, ও কী গাছ কাকাবাবু? এমন যত্ন করে চোখের সামনে টাঙিয়ে রেখেচো যে?

হরিশ একটু হেসে বললে, ওটা রক্তচোষা গাছ মা!

—রক্তচোষা গাছ! তাও আবার হয় নাকি?

—হয় বলেই তো বারবার দেখবো বলে চোখের সামনে রেখেচি। ওটা নীলগাছ মধু-মা।

কত প্রাচীন, কত বিচিত্র ইতিহাস নীলের।

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের অধিকর্তা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর। স্থিতির অধিকর্তা বিষ্ণু। আকাশের বর্ণ থেকে পালনকর্তা বিষ্ণুর বর্ণ-কল্পনা করেছিলেন ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষিগণ। তাই সংহিতা-কার মনু তাঁর শাস্ত্রে কঠোর নির্দেশ দিয়েছিলেন, কোনো ব্রাহ্মণ নীলের বাণিজ্য করতে পারবে না। তখনকার পৃথিবীতে নীলের ব্যবহার অনেক দেশেই হত কিন্তু তা উৎপন্ন হত একমাত্র ভারতবর্ষে! এখান থেকেই নীল রপ্তানি করা হ'ত সারা দুনিয়ায়—মিশর, সিরিয়া, আরব, গ্রীস, রোম। সপ্তসিন্ধুর দেশ হিন্দু বা ইণ্ডিয়া থেকে পাওয়া যেতো বলেই হয়তো প্রাচীন গ্রীস আর রোমে নীলের নাম ছিল ইণ্ডিগো। এত উজ্জ্বল আর পাকা রঙ বলে তার কদর ছিল সব দেশে।

মাধুরীকে নীলের কাহিনী শোনাচ্ছিল হরিশ।

মাধুরী বললে, তাই যদি হয় তাহলে নীলের ব্যবসাটা পুরোপুরি গোরা সায়েবদের হাতে চলে গেল কেন?

হরিশ হেসে বললে, আমাদের দেশটাও তো আমাদেরই ছিল মধুমা, ইংরেজের হাতে চলে গেল কেন?

—সে তো যুদ্ধে আমাদের দেশের রাজা হেরে গেছে বলে।

—এটাও আর একরকমের যুদ্ধ। ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গে ছলে-বলে কৌশলে কে কত ধনী হতে পারে তার লড়াই। গোরা সাহেব বলতে শুধু এই ইংরেজরাই নয়, ফরাসী, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, স্প্যানিশ, দিনেমার কেউ বাদ নেই। কয়েকশো বছর আগে পৃথিবীর দিকে দিকে তারা ছড়িয়ে পড়েছে, ব্যবসা করেছে, গরীবকে ঠকিয়েছে, লুঠ করেছে আর সোনাদানায় নিজেদের ঝাঁপি ভর্তি করেছে। তারা আমেরিকায় নীলের চাষ করেছে, মেক্সিকোয় করেচে, করেচে ওয়েস্ট ইণ্ডিজে। তারপর আবার এসে ঝাঁপিয়ে পড়েচে নীলের আদিভূমি এই আমাদের দেশে।

নীল-বিষ! .

কি মর্মান্তিক সত্যি কথাটাই না বলে গেছে করালী বাগ্‌দি। সাপে-কাটা মানুষের দেহটা বিষের ক্রিয়ায় একসময় নীল হয়ে যায়। আর শ্বেতাঙ্গের পণ্য এই নীলের ক্রিয়ায় সমস্ত নীল এলাকা হয়ে গেছে রক্তলালে লাল!

বাঙলার মাটিতে প্রথম এই বিষ-চারা পুঁতেছিল ফরাসী নীলকর। তার পরের বছরেই তার পদাঙ্ক অনুসরণ করলে বৃটিশ নীলকর ক্যারেল ব্লুম।

ক্যারেল ব্লুম-ই বাঙলাদেশের মাটিতে প্রথম ইংরেজ নীলকর।

তার আটবছর পরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কোর্ট অফ ডিরেক্টরস্ এদেশে পাঠালেন রবার্ট হেভেনকে। প্রায় চৌদ্দ বছর ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কালা আদমি নিগারদের খাটিয়ে কাপাস, চিনি আর নীল চাষ করে লাভের অঙ্কে পাহাড় গড়ে তোলার অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছিলেন রবার্ট হেভেন।

উত্তরপ্রদেশ, বিহার, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, ত্রিবাঙ্কুর কোচিনে নীলের চাষ তো আগে থেকেই ছিল। সে তালিকায় নতুন নাম যুক্ত হল—বেঙ্গল।

যে পাদরি উইলিয়ম কেরি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন, যিনি হোলি বাইবেলের বাঙলা অনুবাদ করেছেন তিনিও ভারতবর্ষে এসে প্রথম দিকে কয়েকবছর বিহারে মদনাবতীর নীলকুঠিতে ম্যানেজারি করেছিলেন।

একের পর এক নীলকর ছড়িয়ে পড়ছে গ্রামাঞ্চলে। নেটিব কালা আদমিদের শস্তা মজুরিতে নীলের মতো এত দামী একটা রপ্তানি পণ্য যদি নামমাত্র দামে পাওয়া যায় তাহলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এই রাজত্ব হয়ে উঠবে সোনার খনি।

তাই-ই হল।

বাঙলাদেশের মাটিতে নীলচাষ শুরু হওযার পর মাত্র কুড়ি বছরের ভেতর বাঙলার নীল হয়ে উঠলো স্বর্ণভাণ্ডারের উৎস। সবচেয়ে ভালো জাতের নীল হচ্ছে বাঙলাদেশে। সবচেয়ে ভালো জাতের নীল ইণ্ডিগো ফেরা টিংকটোরিয়া। সারা পৃথিবীর বাজারে আর সব নীলকে প্রায় হটিয়ে দিলে বাঙলার নীল। লণ্ডনের বাজারে সে-নীল তখন বিকোয় পাঁচশ' থেকে সাতশ' গুণ বেশি দামে! সোনার চেয়ে দামী!

সার্থক হল ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অভিজ্ঞ প্ল্যাণ্টার রবার্ট হেভেনের শিক্ষা দান। সফল হল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রত্যাশা। বরঞ্চ প্রত্যাশারও অতীত।

টনক নড়লো মফস্বলে ছড়িয়ে থাকা কোম্পানির অন্যান্য এজেণ্টদের। সামান্য মাইনের বিনিময়ে কোম্পানির রেশম আর আফিঙের ব্যবসার তদারকি করে এতদিন তারা ভূতের বেগার খেটেছে ছাড়া আর কী? পাশাপাশি তালুকে নীলকুঠি খুলে তাদেরই স্বজাতের কত লোক দু'বছরের

ভেতর লাখোপতি হয়ে উঠলো আর তারা কিনা এখনো কোম্পানির ওই সামান্য পাঁচ-সাতশো টাকা মাইনেয় কাজ করে চলেছে।

দলে দলে চাকরি ছাড়তে লাগল এজেণ্টরা। একটা নীলকুঠি খুলতে কী আর এমন হাতি-ঘোড়া লাগে? পঞ্চাশ, একশো কি দু'শো বিঘে জমির পত্তনি নেওয়া কিম্বা বেনামিতে কিনে ফেলা, সেই সঙ্গে কিছু যন্ত্রপাতি, খোপওয়ালা ছাঁচের বাক্স আর কয়েকটা বড়ো বড়ো কড়া, গামলা কিনে নিয়ে একটা ফ্যাক্টরি বসিয়ে দিলেই হল। নেটিব কুলি-মজুর তো বুটের ঠোক্করেই পাওয়া যাবে। কারবার একবার ফেঁদে বসতে পারলে তখন আর পায় কে? যারাই নীলের কারবারে নেমেছে তাদের সকলেরই মত, কুঠির নিজ-আবাদের খরচ অনেক বেশি। তার চেয়ে নেটিব রায়তগুলোকে ধরে ধরে দু'এক টাকা দাদন দিয়ে তাদের দিয়ে তাদেরই জমিতে নীলচাষ করিয়ে নিতে পারলে খরচা বলতে কিছুই নয়, নীল বিক্রির সব টাকাটাই লাভ। সুতরাং সেই পথে যাওয়াই ভালো। নেটিব নিগারগুলো মুখ বুজে দাদন নেয় ভালো, না নিলে তার ব্যবস্থাও আছে। একটা খড়ের ঘর জ্বালিয়ে দিতে কী এমন সময় লাগে? তাতেও যদি মাথা না নোয়ায় তখন লেঠেল, পাইক পাঠিয়ে ধরে এনে কয়েদ করে রাখলেই হল। দু'দিন কয়েদ থাকলে বাপ বাপ বলে একরারনামায় টিপসই দেওয়ার পথ পাবে না। তারপরেও যদি বাড়াবাড়ি করে তখন বন্দুকের একটা গুলি। লাশটাকে নদীর জলে ফেলে দিলেই ঝামেলা চুকে গেল।

আশী বছরের ইতিহাস!

ক্যারেল ব্লুম থেকে আরম্ভ করে আজকের বেঙ্গল ইণ্ডিগো কোম্পানির লারমুর সাহেব পর্যন্ত সেই ইতিহাস অতি বিচিত্র ভয়ংকর। তার পাতায় পাতায় রক্তের দাগ, অক্ষরের কালিতে কত অজস্র চাষী-রায়তের চোখের জল, কত অভাগার দীর্ঘশ্বাসের অদৃশ্যে মোড়কে মোড়া তার মলাট!

শুনতে শুনতে চোখ দুটো কখন জলে ভরে উঠেছে মাধুরীর। হরিশ থেমে যাওয়ার পরেও বেশ কিছুক্ষণ সে বোবার মতো বসে রইলো।

হরিশ বললে, এইটুকু শুনেই কেঁদে ফেললি মা? মোল্লাহাটি কুঠির লারমুর সাহেবের নৃশংসতার যে কাহিনী ওই করালীচরণ আমাকে শুনিয়ে গেচে, তা শুনলে হয়তো সহ্য করতে পারবি নে।

—আমি শুনতে চাই নে।—কান্নাভেজা স্বরে বললে মাধুরী।—তুমি এদের কথা লিখবে তো কাকাবাবু?

—লিখবো বলেই তো তৈরি হচ্ছি মা!

—তোমার কোনো বিপদ হবে না তো?

—কেমন করে বলবো বলো?

—গোরা সায়েবরা এমনিতেই তো তোমার ওপরে রেগে আচে।

—দেখা যাক, আর কত রাগে!

—তুমি একটু রেখে ঢেকে লিখো বাপু। আমার যেন কেমন ভয় করচে।

ভাইঝির মুখের দিকে তাকিয়ে সামান্য একটু হাসলো হরিশ। অজ্ঞাত বিপদের আশঙ্কায় তার মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

তাকে হাল্কা করে দেবার জন্য আরো একটু হেসে হরিশ বললে, আমি লিখতে শুরু করবার আগেই যে তুই ভয়ে সিঁটিয়ে গেলি রে!

—কি জানি বাপু, তোমাকে বিশ্বেস নেই। আমি ইংরিজি জানলে তবু ছাপার আগে তোমার লেখাগুলো একবার দেখে দিতে পারতুম। সে ছাইও তো জানিনে।

হো হো করে হেসে উঠলো হরিশ।—কি সব্বোনাশ! তুই যে গভর্নমেণ্টের সিবিলিয়ানদের মতো কথা বলচিস রে মা। আমার ওপর তুই গ্যাগিং অ্যাক্ট্ চাপিয়ে দিতে চাস?

—সেটা আবার কী?

—গলা চেপে মুখ বন্ধ করে দেওয়া।

—ছি, ছি, কী যে বলো তুমি! হাসির কথা নয় কাকাবাবু, সেই বাগ্দি বুড়ো তোমাকে খুব তাতিয়ে দিয়ে গেচে, তা আমি বেশ বুঝতে পেরেচি।

হরিশ বললে সেটা মিছে নয় রে মা। বুড়োর মুখ থেকে না শুনলে শুধু পত্র-পত্রিকায় পড়ে পড়ে আমি বুঝতেই পারতুম না, নীলকরদের তাণ্ডবের আসল চেহারাটা কতখানি বীভৎস। বুড়োর কথা যদি সত্যি হয় তাহলে খুব শিগ্গিরই হয়তো সংঘর্ষ আরম্ভ হবে।

রুক্মিণী ডাকতেই মাধুরী উঠে গেল। যাওয়ার আগেও একবার বললে, সে যা-ই হোক, তুমি কিন্তু একটু বুঝে-শুনে কলম চালিও কাকাবাবু।

অনেক খবরই দিয়ে গেছে করালীচরণ।

এরই ভেতর এখানে-ওখানে টুকরো টুকরো বিরোধ সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেছে। বছরে দু'বার নীলের চাষ। এবারে কাত্তিক নীলের চাষ করবে না বলে তৈরি হয়েছে বেশকিছু খাতাই জমির রায়ত।

কুঠির দাদন নেবার সঙ্গে সঙ্গেই কুঠির খাতায় নাম উঠে যায় রায়তের। তার জমি তখন থেকে খাতাই জমি। চাষীরা যেমন মরীয়া, নীলকরেরাও তেমনি বেশকিছু ভোজপুরী লেঠেল আনিয়েছে। স্থানীয় বাঙালি লেঠেলদের ওপর পুরোপুরি বিশ্বাস তারা রাখতে পারছে না।

করালীর কথা সত্যি হলে নদীয়া-যশোরের নীল-এলাকায় এখন ঝড়ের আগেকার থম্থমে গুমোট ভাব। যে কোনো মুহূর্তে ঝড় উঠতে পারে।

নীল! ইন্ডিগো ফেরা টিংকটোরিয়া! সোনার চেয়েও অনেক দামী পণ্য! একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে দেওয়ালের শুকনো নীলচারা দুটোর দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো হরিশ।

॥ পাঁচ ॥

কিশোরীচাঁদের বন্ধু অ্যাশলি ইডেন বারাসতের ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে এসেছে। রাজশাহীতে থাকার সময় দু'জনের পরিচয়। ইডেন তখন সদ্য আমদানি সিবিলিয়ান। রাজশাহীতে সে ছিল শিক্ষানবিশ।

বারাসতে বদলি হয়ে এসেই কিশোরীচাঁদকে চিঠি লিখেছিল ইডেন। একদিন এসে দেখাও করে গেছে। কিশোরীচাঁদ এখন কী করবে, তা নিয়ে কিছু আলোচনাও হল। আসলে কিশোরীচাঁদ নিজেই কিছু ঠিক করতে পারেনি। বিলেতে গিয়ে ব্যারিস্টারি পাশ করে আসার কথা একবার উঠেছিল কিন্তু সে প্রস্তাব বাতিল হয়ে গেছে। রামগোপাল তাঁর নিজের ব্যবসায়ে কিশোরীচাঁদকে অংশী করে নিতে চেয়েছিলেন, সেটাও ঠিক মেনে নিতে পারেনি সে।

রাজা রামমোহনের ছেলে রমাপ্রসাদ। সদর দেওয়ানি আদালতে রমাপ্রসাদের রম্রমা পশার। তার পরামর্শ, কিশোরীচাঁদ ওকালতি পেশায় নেমে পড়ুক। তাকে যতরকমে সম্ভব সাহায্য করবে রমাপ্রসাদ। কিন্তু প্রসন্নকুমার ঠাকুর বললেন, ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কাজ করবার যত অভিজ্ঞতাই থাকুক, আইনের প্রাথমিক পরীক্ষা দিয়ে পাশ না করে নিলে সিবিলিয়ান জজেরা তাকে ওকালতি করতে দেবে না। কিন্তু পেশার জন্যে এই বয়সে পরীক্ষায় বসতে সে একেবারেই নারাজ।

কাজে কাজেই সে প্রস্তাবও বাতিল। নিজের টাকার জোর থাকলে হয়তো ব্যারিস্টারি পড়তে যাওয়ার কথাটা সে চিন্তা করে দেখতে পারতো, কিন্তু বন্ধুরা চাঁদা করে তার বিলেত যাওয়ার খরচ জোগাবে, এইটেই সে মন থেকে মানিয়ে নিতে পারেনি। তাছাড়া, আর একটা কারণও রয়েছে। মায়ের কাছে তার প্রতিজ্ঞা করা আছে, তাঁর আদেশ লঙ্ঘন করে সে কখনো কালাপানি পার হবে না, গোমাংস মুখে তুলবে না। সুতরাং সম্মানজনকভাবে টাকার সংস্থান হলেও বিলেত

যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। সম্ভব করতে গেলে জোর করেই মায়ের কাছে সম্মতি আদায় করতে হয়। তাতে সে নিতান্ত অনিচ্ছুক।

প্যারীচাঁদের বাণিজ্যে বেশ উন্নতিযোগ চলছে। ইচ্ছে করলে দাদার কারবারে অংশীদার হয়ে ব্যবসায়ে নামতেও তার কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু জীবিকার জন্যে ব্যবসায়েই যদি নামতে হয় তাহলে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে নিজে নতুন করে আরম্ভ করাই ভালো। সর্বদিক ভেবে চিন্তে সেই সিদ্ধান্তই নিয়েছে কিশোরীচাঁদ। তাই কী ধরনের ব্যবসায়ে নামা তার পক্ষে সুবিধেজনক হবে, সেটা একটু ভালো করে বুঝে নেবার জন্যেই সে কয়েকদিনের জন্যে কলকাতার কাছাকাছি কয়েকটা জেলা একটু ঘুরে দেখে আসতে চায়।

সব কথা শুনে ইডেন বললে, ওই কালাপানি আর গোমাংসের ট্যাবুটা না থাকলে ব্যারিস্টারি পড়ে আসাটাই তোমার পক্ষে সবচেয়ে ভালো হত কিশোরী। তোমার আইনজ্ঞান, তর্ক করবার শক্তি আর বক্তৃতার ধার যে রকম আছে তাতে পশার জমাতে তোমার বেশিদিন লাগতো না। কিন্তু মায়ের নিষেধ যখন আছে তখন সে প্রশ্ন আর উঠছে না। কিছু মনে করো না, আমি তোমাকে যতটুকু জানি, তাতে ব্যবসা তোমার ধাতে কতখানি পোষাবে সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সততা যদি পুরোপুরি বজায় রাখতে চাও, তাহলে ব্যবসা নামক পথে উন্নতির আশা কম, আর উন্নতি যদি করতে চাও তাহলে সততা জিনিসটাকে কুলুপ এঁটে রেখে দিতে হবে।

কিশোরীচাঁদ হেসে বললে, তার জন্যে আর চিন্তার কী আছে? হ্যালিডে সাহেবের কমিশন তো রায় দিয়েই দিয়েছে, কিশোরী মিত্তিরের ভেতর সততা নেই।

ইডেন একটু চুপ করে থেকে তারপর বললে, ওটাকে দুঃস্বপ্নের মতোই ভেবে নাও কিশোরী। মিস্টার হ্যালিডের ভেতর বিচিত্র সব স্ববিরোধ আছে। সেটা বোধহয় তুমিও জানো। সে যাই হোক, তাঁর কার্যকাল শেষ হয়ে এলো, নতুন লেপ্টেন্যান্ট গবর্নর হিসেবে খুব শিগ্‌গিরই বেলভেডিয়ারে যাচ্ছেন মিস্টার পিটার গ্রান্ট। আমি তো মনে করি, লর্ড ক্যানিংয়ের কৌন্সিলে যে ক'জন মেম্বর আছেন, তাঁদের ভেতর একমাত্র স্যার গ্র্যান্টকেই ঠান্ডা মাথার যুক্তিশীল ভদ্রলোক বলে বিশ্বাস করা যেতে পারে। জাস্টিস বার্নেস পীককের মতো ভদ্রলোকও মিউটিনির পর তোমাদের নেটিবদের ওপর হাড়ে হাড়ে চটে গেছেন, তা বোধহয় শুনেচো?

—হ্যাঁ, শুনেচি।

—তিনি আর এখন ফৌজদারি আইনের বৈষম্য নিয়ে কথা বলেন না। বরঞ্চ উলটোটাই বলতে আরম্ভ করেচেন। সে যাই হোক, স্যার গ্রান্টকে লেপ্টেন্যান্ট গবর্নর করে লর্ড ক্যানিং বিচক্ষণতার পরিচয় দিলেন বলেই আমি মনে করচি কিশোরী। মিউটিনির জের কেটেচে বটে, তবে বাঙলাদেশের অবস্থা এখন খুব ভালো বলে মনে হচ্ছে না।

—কেন?

—এক কথায় তার উত্তর হল—নীলকর। আমি তো এতদিন মফস্বলে নানা জায়গায় কাটিয়ে এলুম। আমারই স্বজাত নীলকরদের সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা মোটেই ভালো নয়, এইটুকুই বলতে পারি।

—তুমি কি আবার কোনো হাঙ্গামার আশঙ্কা করচো?

—আশঙ্কা তো সময়েই রয়েচে, তবে তার চেহারাটা কেমন দাঁড়াবে তা তো আগে থেকে অনুমান করা সম্ভব নয়। বারাসাতে এসেই বুঝতে পারচি, অবস্থা একেবারে স্বাভাবিক নয়। এখানে এসেই আমার প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে, নীল চাষের সম্বন্ধে পুরনো নথিপত্রগুলো ঘেঁটে দেখা। তার ওপর আবার তোমাদের হিন্দু ধর্মের একটা উল্লেখযোগ্য পুণ্যকর্ম আমাকে প্রায়ই করতে হচ্ছে।

—সেটা আবার কী?

—গোজাতি উদ্ধার। নীলকুঠিতে আটক করা চাষীদের গোরু বাছুর ছাড়িয়ে আনবার জন্যে

প্রায়ই আমাকে এদিকে-ওদিকে পুলিশ পাঠাতে হয়। এই তো সেদিন পুলিশ পাঠিয়ে একটা কুঠি থেকে গোটা পঞ্চাশেক গোরু ছাড়িয়ে আনতে হল।

—প—ঞ্চা—শ টা গোরু?

ইডেন হো হো করে হেসে বললে, পঞ্চাশটা শুনেই চোখ কপালে তুললে? আওরঙ্গাবাদ মহকুমায় কাজ করবার সময় কয়েকটা কুঠি থেকে একদিনে মোট তিনশো গোরুকে উদ্ধার করে আনতে হয়েছিল বুঝেচ?

কিশোরীচাঁদ ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইলো।

ইডেন হাসতে হাসতে বললে, এখানেই গল্পটা শেষ হয়নি হে। সেই তিনশো অবলা জীবকে তো আমার বাঙলোয় এনেই অতিথি হিসেবে রাখতে হল। খবর পাঠিয়ে দিলুম, চাষীরা এসে যে যার গোরু বাছুর নিয়ে যাক। কারো পাত্তা নেই। ওদিকে আদালত আমার মাথায় উঠলো। তিনশো চতুষ্পদ অতিথির জন্যে ঘাস বিচুলির ব্যবস্থা করতে আমি তো হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি। শুধু পুলিশেও কুলোচ্চে না, আর্দালি, বেয়ারা, এমন কি বাবুর্চিকে পর্যন্ত লাগিয়ে দিলুম, যাও, খড় বিচুলি জোগাড় করে আনো।

কিশোরীচাঁদ হেসে ফেললো।

ইডেন বললে, তুমি হাসচো? আমার অবস্থা যে তখন কী করুণ, সেটা ভেবে একটু সহানুভূতি অন্তত জানাও। একে অতিথিদের খাদ্য সমস্যা, তার ওপর দিনরাত বাঙলোর চারপাশ থেকে তিনশো অতিথির হাম্বারব। রাতের ঘুমও গেল। মিসেসকে তো জানো? অত ঠাণ্ডা মাথার মেয়ে হয় না। সে পর্যন্ত ক্ষেপে গেল। বললে, ফের যদি তুমি গোরু ধরেচো তাহলে তারপরের দিনই আমি হোমে রওনা হয়ে যাবো। —একবার চিন্তা করে দ্যাখো, তখন কী করুণ অবস্থা আমার। একদিকে অকস্, কাউ, কাফ্—অন্যদিকে বেটার হাফ। অবশ্য আট-দশ দিন পরে সুরাহা হল, সে যাত্রা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম।

—কিন্তু এ ক'দিনের ভেতর চাষীরা গোরু নিতে এলো না কেন?

—ভয়ে। তোমাদের শাস্ত্রে মৃত্যুর দেবতা তো যমরাজা? ওরা যমের চেয়েও নীলকরকে অনেক বেশি ভয় করে। পরে এসে যে যার গোরু বাছুর দেখে শুনে নিয়ে গেল। তারপর থেকে আমিও মিসেসের সঙ্গে একটা আপোস করে ফেলেচি। আমি তো বুঝেই নিয়েচি, বাঙলার মফস্বলে যতদিন চাকরি করতে হবে, ততদিন গোরু উদ্ধারের পুণ্যকর্ম থেকে আমার রেহাই নেই। কিন্তু বাঙলোর সীমানায় আর নয়। এখন থানার জিম্মাতেই দিয়ে দিই। গোরুর জন্যে গৃহবিচ্ছেদ হোক, এটা নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয় নয়?

কিশোরীচাঁদ বললে, মিসেস ইডেনের মতো শান্তস্বভাবের মহিলা যখন ধৈর্য হারিয়েছিলেন তখন অবস্থাটা যে কী দাঁড়িয়েছিল, তার কিছুটা আঁচ করতে পারচি। একদিন বারাসতে যেতে হবে।

ইডেন বললে, অবশ্যই যাবে কিশোরী। তোমার সম্বন্ধে মিসেসের খুবই শ্রদ্ধাবোধ আছে। তোমাকে দেখলে সে খুশি হবে। ভালো কথা, নীলকরেরা আমাকে একটা চমৎকার খেতাব দিয়েছে, জানো?

—কী খেতাব?

—কাউবয় ম্যাজিস্ট্রেট।

আবার সজোরে হেসে উঠলে কিশোরীচাঁদ।

ইডেনও সে হাসিতে যোগ দিলে। তারপর শ্যাম্পেনের পাত্রে একটু চুমুক দিয়ে বললে, এই ক'বছরের অভিজ্ঞতায় আমি যেটুকু বুঝেচি, তাতে কোনো দ্বিধা না করেই বলতে পারি, কোম্পানির রেগুলেশনের সুযোগ নিয়ে এরা এমন একটা জায়গায় পেঁাছে গেছে যেখান থেকে সরকারকেও এরা পারোয়া করে না। বুক ঠুকে বলে, সরকার? সে তো আমরা! আমাদের হুকুমই আইন!

—অবস্থা এত চরমে উঠেচে, যে তা ভাবতেই পারিনি।

—মফস্বলে থাকলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারতে। আমি তো স্পষ্ট বুঝতে পারচি, সরকারের কাছে কোনো প্রতিকার পাওয়ার আশাও চাষীরা ছেড়ে দিয়েচে। তুমি রাজশাহী থেকে বদলি হয়ে চলে আসার কিছুদিন পরের একটা ঘটনা বলচি। শ্যামপুর কুঠির নীলকর একজন রায়তকে কুঠির গুদামে কয়েদ করেচিলো। সম্ভবত লাঠিপেটা করে লোকটাকে মেরে ফেলা হয়। কুঠির চাকরেরা তার গলায় ইঁট বেঁধে মৃতদেহটা কাছেই একটা ঝিলের জলে ডুবিয়ে দেয়। জানাজানি হয়ে যাওয়ার পর জজের আদালতে মামলা ওঠে। বিচারে সেই চাকরগুলোর সামান্য কিছু শাস্তি হল। কিন্তু নিজামৎ আদালতে তারা খালাস পেয়ে গেল। খালাস করে দেওয়ার কারণ হিসেবে রায়ে বলা হল, যদিও কুঠির গুদামে কয়েদ থাকা অবস্থাতেই লোকটার মৃত্যু হয়েছিল কিন্তু তার মৃত্যুর নির্দিষ্ট কারণ যখন নির্ণয় করা যাচ্ছে না তখন শুধু মৃতদেহ লুকোনোর চেষ্টার অভিযোগে কয়েকজন লোককে শাস্তি দেওয়া যায় না।

কিশোরীচাঁদের মুখে ফুটে উঠলো শ্লেষ-মিশ্রিত করুণ হাসি। —কি চমৎকার কাজীর বিচার।

ইডেনের সঙ্গে সেই দেখা হওয়ার পর বেশ কয়েকদিন কেটে গেছে।

যাওয়ার আগে বারাসতে একদিন যাওয়ার জন্যে আন্তরিকভাবে অনুরোধ করে গেছে ইডেন। সেই সঙ্গে আর একটা অনুরোধও করে গেছে। ইণ্ডিয়ান ফীল্ড কাগজে কিশোরীচাঁদ যে মাঝে মাঝে বিভিন্ন বিষয়ে লেখা আরম্ভ করেছে, সেই লেখার অভ্যেসটা যেন সে না ছাড়ে।

এ সপ্তাহের পেট্রিয়ট, ভাস্কর—কোনোটাই ভালো করে পড়া হয়নি। তাছাড়া, সবে দু'সপ্তাহ হল সংস্কৃত কলেজের দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সোমপ্রকাশ নামে একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেছেন। প্রথম সংখ্যা পড়েই মার্জিত রুচির জন্যে কাগজখানা ভালো লেগে গেছে। দ্বিতীয় সংখ্যার কাগজ সবে এসেছে। গুপ্ত কবির প্রভাকর পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে পড়া বন্ধ করতে হয়। রুচির দৈন্য বড়ো পীড়া দেয়। তার তুলনায় বাঙলা ভাষায় এই নতুন পত্রিকাখানা অনেক পরিচ্ছন্ন সাহিত্যচর্চার সম্ভাবনা নিয়ে এসেছে। কাগজখানা টিঁকলেই মঙ্গল। অবশ্য এ পত্রিকার পেছনে স্বয়ং বিদ্যাসাগর রয়েছেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বিবিধার্থ সংগ্রহ, বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকার পর আর একখানা রুচিশীল বাঙলা পত্রিকা পাওয়া গেল। সম্বাদভাস্করও সমাজ সংস্কারের ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা। কিন্তু কি দুর্বুদ্ধিই যে পেয়ে বসেছিল গুড়গুড়ে ভট্চাজকে! যিনি এত বিখ্যাত পত্রিকার সম্পাদক, সমাজ সংস্কারের যে কোনো সৎপ্রচেষ্টা দেখলেই যিনি এ যাবৎ বরাবর ছুটে এসে ঝাঁপয়ে পড়েছেন, তিনি যে কেন গুপ্ত কবির সঙ্গে খেউড়ের পাল্লা দেবার জন্যে মেতে উঠলেন, তা বোঝা কঠিন। একদিকে ঈশ্বর গুপ্তের পাষণ্ড পীড়ন, অন্যদিকে গৌরীশংকর তর্কবাগীশ ওরফে গুড়গুড়ে ভট্চাজের রসরাজ। দু'ই কাগজের লড়াইয়ে অশ্লীলতা যে কোন্ পর্যায়ে চলে গিয়েছিল, তা ভাবতেও গা ঘিন্ ঘিন্ করে।

হরিশের মাথা থেকে রোখ্ এখনো নামেনি। আবার নতুন করে কমিশন বসানোর আবেদন জানিয়ে হ্যালিডেকে একখানা চিঠি লিখেছিল কিশোরীচাঁদ। যে লেপ্টেন্যান্ট মিলিগানের পাঁচটাকা চুরির মামলা নিয়ে কমিশন, বরখাস্ত ইত্যাদি এত ?: কাণ্ড হয়ে গেল, তাঁকেই কমিশনে সাক্ষী দিতে ডাকা হয়নি। কিশোরীচাঁদের আবেদনে অনুরোধ ছিল, নতুন কমিশন বসিয়ে তাঁকে সাক্ষী দিতে ডাকা হোক। কিন্তু সে আবেদন সরাসরি নাকচ করে দিয়েছেন হ্যালিডে সাহেব। সেই নাকচের ওপরেই ন'তারিখের পেট্রিয়টে তীব্র বিদ্রূপ করে হরিশ লিখেছে, দেখা গেল, কমিশনারগণের মতো লেপ্টেন্যাণ্ট গবর্নরেরও বিবেচনায় ভূতপূর্ব ডাকাতি বিভাগের কমিশনার এবং আধ ডজন পুলিসের লোকের সাক্ষ্যের তুলনায় সম্রাজ্ঞীর সামরিক বিভাগের একজন দায়িত্বশীল কর্মচারীর সাক্ষ্য নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।

আপনমনেই একটু হেসে আলমারি থেকে পানীয়, আর পানপাত্র বের করলে কিশোরীচাঁদ।

তার সুরাপানের মাত্রা পরিমিত। হরিশ কিম্বা মধুর সঙ্গে বসলেও নিজের মাত্রার বাইরে সে কখনো যায় না।

যা হওয়ার নয় তার জন্যে বৃথা চেষ্টা করে আর লাভ কী? হরিশকেও বলতে হবে, এ নিয়ে সে যেন আর লেখালেখি না করে।

ইডেনের পরামর্শটা মাঝে মাঝেই মনে পড়ে। ইণ্ডিয়ান ফীল্ড পত্রিকায় লেখার অভ্যেসটা রাখা তার দরকার। পত্রিকার সম্পাদক 'এবেল ইস্ট' আসলে কিশোরীচাঁদের ঘনিষ্ট বন্ধু জেমস্ হিউম। এই পত্রিকার মালিকানায় যদিও কিশোরীচাঁদের অংশ নেই, কিন্তু বলতে গেলে হিউম আর তার উদ্যোগেই পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পত্রিকার বয়স এখনো এক বছর হয়নি, কিন্তু এরই ভেতর বিপুলভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। শ্বেতাঙ্গ মহলের বিশেষত সামরিক বিভাগের অধিকাংশ কর্মচারীই ফীল্ডের গ্রাহক। এদেশীয় গ্রাহকের সংখ্যাও কম নয়। কিশোরীচাঁদ সৌজন্যের খাতিরে পেট্রিয়টের প্রচার সংখ্যা কখনো জিজ্ঞেস করে না। কিন্তু তার দৃঢ় বিশ্বাস ফীল্ডের প্রচার-সংখ্যা পেট্রিয়টের চেয়ে অনেক বেশি। তার কারণও খুবই স্পষ্ট। পেট্রিয়ট একেবারে চরমপন্থী রাজনীতি-সর্বস্ব পত্রিকা। আর ফীল্ডে থাকে খেলাধুলো, শিকার, সাহিত্য, শিল্প, সামাজিক সমস্যা সব কিছু। এবেল ইস্ট অর্থাৎ জেমস্ হিউম ছাড়াও বেশ কয়েকজন ইংরেজ নিয়মিত লিখে থাকেন ফীল্ডে। এদিকে দেশীয় সাহিত্য, রাজনীতি এইসব নিয়ে লেখেন প্যারীচাঁদ, রাজেন্দ্রলাল, কৈলাস বোস এ'রা সবাই। কিশোরীচাঁদ নিজে তো আছে। কেষ্টদাস পাল নামে উঠ্‌তি ছেলেটাও বেশ লিখছে। হরিশ ব্যক্তিগতভাবে যত বড়ো বন্ধুই হোক, তার লেখা ফীল্ডের পাতায় ছাপতে ভয় লাগে। হরিশের দুটো একটা লেখা বেরোলেই হয়তো শ্বেতাঙ্গ মহলে ফীল্ডের প্রচার সংখ্যা ঝপ্ করে পড়ে যাবে। হরিশ তো বটেই, তার নতুন চেলা শম্ভুচাঁদ নামে ছেলেটার লেখা ছাপতেও মনে মনে ভয় আছে কিশোরীচাঁদের। কেষ্টদাস আর শম্ভুচাঁদ একই বয়সী, প্রায় একই সঙ্গে দু'জনে লিখতে আরম্ভ করেছে। কেষ্টদাসকে ভয় নেই, সে মানিয়ে লিখতে জানে। কিন্তু শম্ভুচাঁদ ছেলেটা হরিশের কাছে নাড়া বেঁধে তারই পথ ধরেছে।

হরিশ যে উগ্র রাজনীতির গোঁ নিয়ে ভ্রান্ত পথে চলেছে, সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই কিশোরীচাঁদের। দেশের হিতকর কাজের জন্য দরকার মতো রাজশক্তির সঙ্গে কখনো কখনো একটু আপোস-রফাও করতে হয়, এটা সে কিছুতেই মানবে না। হরিশের পরামর্শে কমিশনের দাবি জানিয়ে শেষ পর্যন্ত পদচ্যুত হলেও ব্যক্তিগতভাবে হরিশের ওপর কিশোরীচাঁদের ক্ষোভ নেই। কিন্তু দেশের কল্যাণের প্রশ্ন যেখানে জড়িয়ে আছে সেখানে চরমপন্থী মনোভাব ক্ষতিই করে বলে তার দৃঢ় বিশ্বাস।

এই প্রসঙ্গে হরিশের সঙ্গে অনেকবার তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। কিন্তু হরিশের সেই একই উত্তর, ব্যক্তিগতভাবে যদি বলো তাহলে রেভারেণ্ড পিফার্ড, কর্নেল চ্যাম্প্‌নিজ, কর্নেল গোণ্ডী ইংরেজ হলেও তাঁদের কাছে আমি আমরণ কৃতজ্ঞ থাকবো। কিন্তু জাতিগত ভবে যদি বলতে হয়, তাহলে ওরা রাজা, আমরা প্রজা। ওরা শোষক, আমরা শোষিত। এটা ওদের কল-কারখানার কাঁচামাল জোগাড় আর বেপরোয়া লুঠের আদর্শ উপনিবেশ। তেমন বেকায়দায় পড়লে ওরাই ছুটে আসবে আপোস করতে; আর বেকায়দায় না পড়লে বুটের ঠোক্‌কর দিয়ে যেমন দাপটে চলছে তেমনিই চলবে। আমাদের প্রয়োজনে কোনো আপোসের কিছুমাত্র দাম ওদের কাছে আছে বলে আমি মনে করিনে। তোমরা করে দ্যাখো, দেশের কিছু মঙ্গল যদি হয়।

উত্তরে অনেক কিছুই বলা যায়, কিন্তু হরিশ তা মানবে না। সুতরাং তার সঙ্গে এ বিষয়ে তর্ক করা নিষ্ফল। তা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে তর্ক-বিতর্ক হয়। সমান্তরাল রেখার মতো দুই পক্ষই নিজের পথে সোজা চলতে থাকে। রেখা দুটো পরস্পরের দিকে বাঁক নিয়ে একটা বিন্দুতে এসে মিলিত হওয়ার সম্ভাবনা আজ পর্যন্ত দেখা দেয়নি।

অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল কিশোরীচাঁদ।

হঠাৎ গঙ্গার দিক থেকে ঘন ঘন স্টিমারের ভোঁ ভেসে আসতে লাগলো। গঙ্গায় বোধহয় বান আসছে, তারই সংকেত।

রাত বেশ গভীর হয়েছে।

প্রতিদিনের অভ্যেসমতো দেরাজ থেকে ডায়েরিখানা বের করে আজকের রোজনামচা লিখতে বসলে কিশোরীচাঁদ।

স্টিমারের ঘন ঘন ভোঁ তখনো বেজেই চলেছে।

॥ ছয় ॥

উত্তেজনায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন মিস্টার লারমুর।

বেঙ্গল ইন্ডিগো কোম্পানির দোর্দণ্ডপ্রতাপ ম্যানেজার লারমুরকে টেক্কা দিয়ে যাবে দু'টো নেটিব প্রজা? শুধু প্লান্টারই নয়, তিনি এখন অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটও।

মোল্লাহাটি সদর কুঠির একতলায় সুসজ্জিত বলরুমের পাশে একটা বিশেষ চোরা কামরায় মাঝে মাঝে তিনি মদের গেলাসে একটু করে চুমুক দিচ্ছেন, আবার তার একটু পরেই অস্থির চিতাবাঘের মতো দু'চারবার দ্রুত পায়চারি করছেন।

দরজা বন্ধ। সে ঘরে তখন লারমুর ছাড়া আর একজন মাত্র উপস্থিত। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়সের একটি যুবতী মেয়ে—নাম কামিনী।

বাঙলা দেশে সবচেয়ে বড়ো নীলের কারবারী বেঙ্গল ইন্ডিগো কোম্পানি। চার চারটে কনসার্ন তার অধীনে। মোল্লাহাটি, কাঠগড়া, খালবোয়ালিয়া আর রুদ্রপুর কনসার্ন। প্রত্যেকটি কনসার্নে রয়েছে কম বেশি আট-দশটা করে নীলকুঠি। তার ভেতর মোল্লাহাটি কনসার্নই সবচেয়ে বড়ো—মোট সতেরোটা কুঠি নিয়ে মোল্লাহাটি সদর কুঠির কারবার।

ইছামতীর তীরে এই সদর কুঠিটাই সবচেয়ে পছন্দ লারমুরের।

কুঠি না প্রাসাদ? সবচেয়ে বড়ো কনসার্নের সদর কুঠিকে উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়ার জন্যে খরচে কোনো কার্পণ্য করেনি বেঙ্গল ইন্ডিগো কোম্পানি। মাথা সমান উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা কয়েকশো বিঘে জমির মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে প্রাসাদের মতো বিরাট দোতলা বাড়িটা। আলিপুরের বেলভেডিয়ার হাউসের মতো অত বিরাট না হলেও গড়নের ধাঁচ অনেকটা তারই মতো। মাটি থেকে প্রশস্ত সিঁড়ির ধাপ উঠে গেছে বারান্দায়. সিঁড়ির দু'পাশে দু'টো ঝাউগাছও লাগানো হয়েছিল। তারা দিব্যি বাড়-বাড়ন্ত হয়ে কুঠির শোভা বাড়িয়েছে। কুঠির হাতার ভেতর ফুলের বাগান, ফলের বাগান, ছোটোখাটো চিড়িয়াখানা, আস্তাবল, এমন কি, স্কুল আর হাসপাতাল পর্যন্ত করে রেখেছে কোম্পানি। হাতার বাইরে বাওড়। তার ধারে একটা ঘেরা বাগানে চরে বেড়ায় একপাল হরিণ। কুঠির পরিবেশকে মনোরম করবার জন্যেই সে ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফুল, পাখি, হরিণ—সৌন্দর্য প্রিয়তার নিদর্শন হিসেবে কোনো অনুষ্ঠানেই ত্রুটি রাখা হয়নি।

কুঠির দেওয়ান, আমিন, পেশকার, গোমস্তা, আপিদ্গীর—সবাই কুঠির হাতার ভেতরেই থাকে। আর থাকে লেঠেলরা। একটা প্রান্তে তাদের জন্যেও রয়েছে ছোটো ছোটো বাড়ি।

লারমুর বলেন, মুলনাথ কোঠি। নীলকর মহলেও মোল্লাহাটির কুঠি সেই নামেই পরিচিত। বেঙ্গল ইন্ডিগো কোম্পানির প্রধান ম্যানেজার হিসেবে চারটে কনসার্নের প্রায় পঞ্চাশটা কুঠির ওপরেই লারমুরের কর্তৃত্ব। কিন্তু তিনি এই কুঠিতে বাস করেন বলে নেটিব রায়তগুলো তাঁকে মোল্লাহাটি কুঠির ম্যানেজার বলেই জানে। তাতে কিছু এসে যায় না লারমুরের। তাঁর চাই নীল।

নেটিবগুলো 'লারমুর' উচ্চারণ করতে পারে না; তারা বলে, লালমোন সাহেব।

লালমোন!

নামটা খুবই উপভোগ করেন লারমুর। লাল মানে রেড। নীলের জন্যে ইছামতী, কপোতাক্ষী, বেত্রবতী, চূর্ণী আর কলিঙ্গার জল দরকার হলে তিনি লাল করে দিয়েই ছাড়বেন।

কামিনী ভেতরে ভেতরে ভয়ে কাঁপছিল।

একটু আগে সেই এক কড়া ধমক খাওয়ার পর আর কোনো কথা বলবার সাহস তার হয়নি। তখন থেকেই সে চুপ করে দরজার পাশে সেই একই জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। কি কুক্ষণেই সাহেবকে সে যেচে খবরটা দিতে গিয়েছিল! কী দরকার ছিল তার?

ঘরের ওপাশে বিছানাটা পাতাই রয়েছে। সেদিকে পা বাড়ানোর সাহসই হচ্ছে না কামিনীর। আজ আবার সাহেব তাকে একটা নতুন কিসিমের বিলিতি মদ খাওয়াবে বলেছিল। বিলিতি মদ তো মাথায় উঠেছে, এখন সাহেবের কাছে তার পশারটা থাকলে হয়।

শ্যাম্পেনের গেলাসে আর একটা চুমুক দিয়ে পায়চারি করতে করতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো লারমুর। তাঁর চাউনি দেখেই আবার বুক কেঁপে উঠলো কামিনীর।

—তুমি শালী বহুৎ বদমাশ খান্‌কি মাগী আছো। তোমার যৌবন আমি পছন্দ করি বলিয়া মনে করিও না, তোমার ঝুটো বাৎ মাপ হইয়া যাবে। কল্য রাত্রিকালে যখন আসিলে, তখনই আমাকে এই খবর দেও নাই কেনো?

কামিনী করুণস্বরে বললে, মা কালীর কিরে, তুমি বিশ্বেস করো সায়েব, কালকে রাত্তির খবরডা আমি জানতি পারি নাই।

—দুই দিবস পরে যখন জানিতে পারিলে, তখন চিঁড়িয়া ভাগ গিয়া। কোন্‌ বাগুং আসিয়াছিল —বিষ্টোচার্ন না ডিগাম্বার?

—মুই ঝা শুনিচি, দিগোম্বর বিশ্বেসই আয়েলো। নিশুতি রেতে মিটিন্‌ করো আবার শ্যাষ রাত্তিরেই উদাও হয়ে গেচে।

—হু'। বাগুতেরা বড়ো বেশি বাড়িয়া গিয়াছে। কাটগড়া কান্‌সর্ন এলেকায় উহাদের বসত। সেখানে ঘোঁট পাকাইবার চেষ্টা করিতেছে, সে খবর আমি পূর্বেই পাইয়াছি। এখন আবার মুলনাথ এলেকায় আসিতে শুরু করিল। কোন্‌ খানকির বাচ্চার বাড়ি বসিয়া মিটিঙ করিয়াছে, সে খবর কিছু জানো?

—মুই তা জানতি পারি নাই সাহেব। শুনি, কারুর বাড়িতি বস্যে তেনারা মিটিন করে না। গাঁয়ের কেনারে ঝোপ-জঙ্গল, শ্মশান-মশানে মিটিন করে আবার সেখেনেথেই চলে যায়। রেয়েতরা ক্যামন করে তেনাদের আসার খবর পায় তা কেডা জানে। আজ শুনে আলাম, ঝারা অ্যাকন তাবাদি দাদন নেয় নাই, তারা তো নেবেই না, আর ঝারা দাদন নেচে, তারাও জমিতি লাঙল দেবে না।

—উহাদের বাপ লাঙল দিবে! শালা খানকির বাচ্চারা উহাদের লালমোন সাহেবকে কিছু কিছু চিনিয়াছে, পুরা এখনো চিনিতে পারে নাই!

কামিনী এক ফাঁকে বুকের একপাশের কাপড় একটু আলগা করে দিয়েছে। সাহেবের মনটাকে একটু ভিজিয়ে নিতে না পারলে তার নিজেরই হয়তো নিস্তার নেই। হয়তো নারাজ রায়তগুলোর মতো তাকেও চালান করে দেবে কুঠির গুদাম ঘরে। তারপর হয়তো কোনোদিনই কেউ তার খোঁজ পাবে না!

কামিনীর দিকে আবার তাকালেন লারমুর। তাঁর চাউনি দেখে সঙ্গে সঙ্গেই কামিনী বুঝতে পারলে, ওষুধ একটু ধরেছে।

লারমুর বললেন, দুই বাগুতের বাড়ি চৌগাছা ভিলেজ। লালমোন সাহেবের রাইয়ৎ ক্ষেপানোর ফল কেমন মিষ্ট হইতে পারে, দুই শালাকে তাহা আমি বুঝাইয়া ছাড়িব।

কামিনী বললে, তোমার তো নোকের অভাব নাই সায়েব? দুই চারজন গোইন্দা নেগুয়ে দ্যাও, কবে কম্‌নে মিটিন হচ্ছে তার হদিস পেয়ে যাবা।

ক্রুর হাসির রেখা ফুটে উঠলো লারমুরের মুখে। বললে, লারমুরের গোয়েন্দার দরকার হয় না কাম্‌নী। জরু-গরু আটক করে বাড়িতে লালঘোড়া ছুটাইয়া দিলে জমিতেও নীলঘোড়া টগ্‌বগ্‌ করিয়া ছুটিবে।

লালঘোড়া মানে আগুন।

গাঁয়ে গাঁয়ে কুঠিয়ালের লাল ঘোড়ার দাপট যে কি-রকম তা ভালো করেই জানে কামিনী। সারা গাঁ জুড়ে দাউ দাউ করে জ্বলে-ওঠা আগুন সে অনেকবারই দেখেছে।

বুকের ভেতরটা কয়েক মুহূর্তের জন্য একটু কেমন যেন করে উঠলো। কিন্তু সেটা নিতান্তই ক্ষীণ একটা অনুভূতি। পরমুহূর্তেই বর্তমান সত্তার ভেতরে ফিরে এলো সে। বললে, মুই শুনিচি, দুই বিশ্বেসেরই নাকি কোটাবাড়ি।

হাঃ হাঃ করে হেসে উঠে কামিনীর কাছে এগিয়ে এলেন লারমুর। এক হাতে তাকে বুকের ভেতর জাপটে ধরে আর এক হাতে তার গাল টিপে দিয়ে বললেন, তুমি এখনো বহুৎ বালিকা আছো কাম্‌নী। প্ল্যাণ্টারের লালঘোড়া কাঁচা-পাকা মানে না।

বুকের কাপড় ততক্ষণে পুরোটাই সরে গেছে কামিনীর। তাকে ছেড়ে দিয়ে লারমুর বললেন, দ্যাটস্‌ হোয়াই আই লাইক য়ু সো মাচ্‌। তোমার যৌবন অতি উত্তম আছে! তুমি বিস্তারায় যাইয়া বসো, আমি এখুনি আসিতেছি।

লারমুর ঘরে থেকে বেরিয়ে গেল। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো কামিনীর। যাহোক, এ যাত্রা রক্ষে পাওয়া গেছে। এরপর ভুলেও আর সে কখনো ওসব খবর সাহেবকে দিতে যাবে না। নিজের আখের আছে, তার ওপর আছে ভাই দুটোর জন্যে ভাবনা। লালমোন সাহেব যখন যা খুশি তাই করতে পারে। এই মুহূর্তেই যদি তার রামকান্ত চাবুক হাঁকড়ে বলতো, কোঠিসে নিকাল যাও, তাহলে কী করবার ক্ষমতা ছিল কামিনীর? তাকে কুঠির হাতায় থাকার জন্য ঘর দিয়েছে সাহেব, দুই ভাইকে চাকরি দিয়েছে। এক ভাই পেয়েছে ওজনদারের কাজ, আর এক ভাই তাইদগীর। হঠাৎ রাগের মাথায় সবশুদ্ধ তাড়িয়ে দিলে কোথায় যেতো কামিনী?

সাহেব বেরিয়ে যাওয়ার পর আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে বিছানায় বসলে কামিনী। এই শীতের রাতেও তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছিল। শাড়ির আঁচলে কপালের ঘাম মুছে নিয়ে কেমন অবসন্নের মতো সে বসে রইলো।

ভয়ে আজ সত্যিই বুক শুকিয়ে গিয়েছিলো তার। অন্তত আজকের মতো ফাঁড়া কেটেছে। এরপর বড়ো সাবধানে তাকে চলতে হবে।

কয়েকমাস আগে পর্যন্তও কুঠির পেশকার গোকুল মিত্তিরের বোন মানদা মেয়েটা ছিল সাহেবের সবচেয়ে বেশি পেয়ারের মাগী। সে তো উঁচু জাতের ঘরের মেয়ে, বয়েসেও কামিনীর চেয়ে একটু ছোটোই হবে। সেই মেয়েকে হটিয়ে দিয়ে তার জায়গা দখল করেছে কামিনী। গতরে যৌবনের কড়া তাত না থাকলে সেটা কি আর এমনিই হয়?

সাহেবের সঙ্গে রাত কাটানোর মেয়ের অবশ্যি অভাব নেই। কুঠির আমিন, গোমস্তাবাবুদের ঘরে যে কটা ডবকা ছুঁড়ি আছে, তাদের কেউ বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবে না যে লালমোন সাহেবের সঙ্গে অন্তত একটা রাতও কাটায়নি। তার ওপর আবার আছে জংলি বুনো কামিনদের কয়েকটা মাগী। হাতের তুড়ি দিলেই যে লালমুখো মিন্‌সে সঙ্গে সঙ্গে একটা না একটা ছুঁড়িকে এনে এই বিছানায় শোয়াতে পারে, কামিনী বলতে গেলে এখন তার পাটরাণী।

কুট্‌নী মাগী ভবি জেলেনী কপাল ফিরিয়ে দিয়েছে কামিনীর। ভবি নিজেই আগে সাহেবের সোহাগ কুড়োতো। এখন একটু বয়েস হয়ে যাওয়ায় তাকে আর বিছানায় তুলতে চায় না সাহেব। মনে যত দুঃখই হোক, পেটের দায়ে এখন তাঁকে কুটনীর পেশা ধরতে হয়েচে। সেই সাহেবের

জন্যেই তাকে এখন ছুঁড়ি জোগাড়ের ধান্ধায় ঘুরতে হয়। তেমন পছন্দসই ছুঁড়ি হলে সাহেব তাকে বক্‌শিশ বলে যা দেয়, তাতেই দু'তিন মাসের খাই-খরচা চলে যায়। সেইটুকুই তার যা সান্ত্বনা। ভবি নিজেই বলেছে, এ পর্যন্ত যে কটা মেয়ে এনে সাহেবের হাড়কাঠে সে দিয়েছে, তার ভিতর কামিনীর দরুণই সাহেবের কাছ থেকে তার বক্‌শিশ মিলেছে সবচেয়ে বেশি—নগদ পনেরোটা টাকা!

ভবির বয়েস এখন খুব বেশি হলে দেড় কুড়ি বছর। তাতেই সে বাতিল। হয়তো আর ক'বছর পরে কামিনীরও সেই দশা হবে। তখনকার কথা সে তখনই ভাবা যাবে। এখন ভেবে লাভ কী?

কত কথাই মনের ভেতর পাক খায়।

ভবি জেলেনী তাকে যখন লালমোন সায়েবের কাছে নিয়ে আসে তখন কে-ই বা জানতো থাকার জন্যে ঘর, দু'ভাইয়ের দুটো চাকরি—সবই তার কপালে জুটে যাবে? একটা ব্যাপারে ভবি বারবার করে তাকে সাবধান করে দিয়েছে।

—খবদ্দার, খবদ্দার, আগেকারের কেলেঙ্কারির কথা ঝ্যান ভুলেও কক্‌খনো সায়েবের সুমুকি ফাঁস করবিনি! তালি কিন্তু পাচায় নাতি মেয়ে ধুর্‌ করে দেবে। ওই শালা গুয়ো মিন্‌সের দয়া-ধম্মো বলে কিচু নাই। পচন্দ হলি মাতায় করে রাক্‌বে, বিগড়ে গেলি সব্বোনাশ। নীলির জন্যি রেয়েগুলোরে কী করে আর কী না করে, তাতো জানিস রে বুন। তুই এমন দশায় পড়েচিস বলে তোরে আমি নে যাচ্ছি। নালি ওই নরপিচেশের কাচে কোনো মেয়েরে কেউ নে যায়? কেলেঙ্কারিডা চেপে থাকবি, মন জোগাবি আর হুকুম তামিল করে যাবি।

আগেকার কেলেঙ্কারি বলতে নিতান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। তিনদিক জালে ঘেরা জঙ্গলের ভেতর তাড়া খাওয়া জানোয়ার ফাঁকা দিক দিয়ে পালাতে গিয়ে শিকারীর তীর খেয়ে যেমন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে, সেই রকমই একটা ঘটনা মাত্র।

কামিনীর বাবার দিন চলতো জন-টিকিরি আর মাইন্দারি করে। কামিনীর বিয়ে সময় মতোই দিয়েছিল হলধর দাস। তার বৌ যে বছর মরলো, তার পরের বছরেই বিধবা হয়ে কামিনী ফিরে এলো বাপের বাড়ি। তখন কামিনীর বয়েস আঠারো বছর। বিধবা মেয়ে আর দুই ছেলেকে নিয়ে কোনোমতে যাহোক দিন কাটিয়ে যাচ্ছিল হলধর। বছর দু'য়েক কাটতে না কাটতে সেও মারা গেল। তখন ছোট ভাই দুটোকে নিয়ে কামিনী পড়লো অথৈ জলে। মেটে ঘরটা ছাড়া সহায় সম্পদ বলতে তো আর কিছু নেই। এরই ভেতর গাঁয়ের গাঁতিদার রাজীবলোচন মুখুজ্যের লোক একদিন এসে জানিয়ে গেল, বাবুর কাছে তার বাবার প্রায় পঞ্চাশ টাকা দেনা বাকি পড়ে রয়েছে। ছোটোখাটো তেজারতি কারবার রাজীব মুখুজ্যের। কয়েক দফায় মোট দশ টাকা ধার করেছিল হলধর। আসল শোধ করা তো দূরের কথা, একটা পয়সা সুদও দেয়নি। সেই টাকা সুদে আসলে এখন পঞ্চাশ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

বাবুর সঙ্গে দেখা করলো কামিনী।

একটা পাই পয়সা যার সম্বল নেই, পঞ্চাশ টাকা সে কেমন করে শোধ দেবে?

অনেক কান্নাকাটি করেছিলো কামিনী। কিন্তু বাবু বললে, দ্যাক্‌ বাপু, এটা আমার হকের পাওনা। তের বাপ যে হঠাৎ পটল তুলবে তা তো আগে আমিও বুজতি পারিনি। তা এক কাজ কর, ভিটেডা ছেড়ি দে, ওখেনেই যা হোক কলাডা মুলোডা লাগ্‌য়ে ধীরি সুস্থে টাকাডা তুলে নেবো।

কামিনী নির্বাক।

ভিটে বলতে খুব বেশি হলে কাঠা তিনেক জমি। তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে মেটে ঘরটা। কতকাল যে চালে নতুন খড় দেওয়া হয়নি, তা সেও জানে না। কোনো কোনো জায়গায় পচা খড় ঝরে গিয়ে বাতা বেরিয়ে পড়েছে। বৃষ্টি হলে ঘরের ভেতর সব জায়গাতেই টুপ্‌ টুপ্‌ করে জল

পড়ে। তবু তো যাহোক্ মাথা গোঁজার একটা আস্তানা আছে। বাবু যদি সেটাও কেড়ে নেয় তাহলে ভাই দুটোকে নিয়ে সে গিয়ে দাঁড়াবে কোথায়?

রাজীব মুখুজ্যে বললেন, আসলে তোর তো কোনো দাবি-দখল নেই। দাবি তোর ভেয়েদের। সে দুটো তো আইনে নাবালক। তবু তোরে ডেকেলাম তার কারণ, হাজার হোক তুইতো অ্যাকন ওন্দের দ্যাকাশোনা করবি? তা তুই টাকাডা শোধ দিতি পারবি, না অন্য ব্যবস্থা দেক্‌তি হবে?

ধরা গলায় কামিনী বললে, টাকা আমি অ্যাকন ক্যামন করে শোদ দেবো বাবু?

চিবিয়ে চিবিয়ে রাজীব মুখুজ্যে বললেন, ইচ্চে করলি তুই কি আর পারিসনে? ওরে বাপু, এর নাম পিতৃঋণ। এ ঋণ শুধে না গেলে ওপারে গে নরকেও যে ঠাঁই হবে না রে! তাই বলি, তুই নিজেই কিস্তিতে কিস্তিতে শোধ করে দে—

আজ অবিশ্যি হাসি পায়। কিন্তু বাবুর সেই কথায় সেদিন তখন পর্যন্ত তার মাথায় ঢোকেনি যে, সে কেমন করে কিস্তিবন্দীতে টাকা শোধ করবে।

একটু পরেই অবিশ্যি বুঝতে পেরেছিল।

বাবুর চোখ তার বুকের দিকে, মুখে কেমন একটা মুচকি হাসি। গলার স্বর একটু নামিয়ে বাবু বললেন, সাদ-আহ্লাদের বয়েসডা আসতি না আসতিই তো ভাতার তোরে ফেলি রেকে চলে গ্যাল্যো রে আবাগী! তা আমি যখন আচি, তকন তার অ্যাকটা পিতিকার তো কত্তি পারি? তা তুই যদি রাজি থাকিস, তালি তোরও সাদ-আহ্লাদ মেটলো আর আমারও পাওনা গায় গায় খেই গ্যালো?

অন্য মেয়ে হলে কী করতো তা কামিনী জানে না। সে কয়েক মুহূর্ত মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলো। দুটো ভাইয়ের একটার বয়স চোদ্দ বছর, একটার বারো বছর। ভাই দুটোর মুখ ভেসে উঠ্‌লো চোখের সামনে। ভেসে উঠ্‌লো জীর্ণ ঘরখানা।

মুখ নীচু করেই কামিনী বললে, তালি আর ভিটে বাড়িডা কোরোক করবেন না তো?

বিগলিত হাসি রাজীব মুখুজ্যের মুখে। হাত বাড়িয়ে খপ্ করে কামিনীর একখানা হাত ধরে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, তা কি পারি রে পাগলি? আমার অ্যাক্‌টা ধম্মাধম্মো বিচার নাই?

কোনো আপত্তি করেনি কামিনী। নিজের হাতও ছাড়িয়ে নেয়নি বাবুর হাতের মুঠো থেকে।

রাজীব মুখুজ্যে তাকে আরো কাছে টানছেন। তারই ভেতর কামিনী বললে, একটা কতা দেন বাবু, বাবার টিপ ছাপ দেয়া কাগজখানা ছিঁড়ে ফ্যালবেন?

বাবুর গরম নিঃশ্বাস তখন কামিনীর গালে মুখে লাগছে। বাবু মদ খাননি তবু যেন মাতালের মতো জড়ানো গলায় বললেন, কাল পরশু যেদিন আসবি, সেইদিনই তোর চোকির সুমুকে ছিঁড়ে ফ্যালাবো। অ্যাকনেথে তুই হলি আমার রাইকিশোরী, তোর আবদার না রেকি পাবি?

—কাগজখান আপনার এই ঘরেই তো আচে?

তা আচে। —স্বীকার করলেন রাজীব মুখুজ্যে। সেই মুহূর্তে আর মিথ্যে বলবার মতো অবস্থা ছিল না তাঁর।

—কাগজখান হাতবস্‌কোথে বার করেন।

—আজই?

—ক্ষেতি কী বাবু? কাল ছিঁড়লিও ছেঁড়বেন, আজ ছিঁড়লিও ছেঁড়বেন। বাপের দেনা শোদ করার জন্যি অসতী ঝ্যাকন হতি যাচ্চি ত্যাকন আজই সেডা হয়ে যাক।

মেয়েটা যে এমন এক কথায় রাজী হয়ে যাবে তা ভাবতেই পারেননি রাজীব মুখুজ্যে। ছুঁড়ি বেঁকে বসলে তিনি কী প্যাঁচ কষবেন তার ছকও মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলেন তিনি। কিন্তু কোনোরকম বেগ না দিয়ে ছুঁড়িটা ধরা দেওয়ায় সফল শিকারের আনন্দে তখন তিনি দিশেহারা। তাই মদ না খেয়েও অবস্থা মাতালের মতো।

হাত বাক্‌সটা কাছেই ছিল। দু'দিন আগেই সেটা থেকে হলধরের হাতচিট্‌ তিনি দেখিয়েছেন কামিনীকে।

বাক্‌সটা খোলার আগে একটু দ্বিধাগ্রস্তভাবে রাজীব মুখুজ্যে বললেন, তোর কতা র‍্যাক্‌বো তারপরে বেইমানি করবিনি তো?

—বেইমানি করাই ইচ্চে থাকলি আপনার গতরে গতর ঠ্যাকাতাম? বুকি হাত দিতি দেতাম?

আর আপত্তি করলেন না রাজীব মুখুজ্যে। প্রৌঢ় দেহের অস্থির উত্তেজক কামনায় তাঁর শরীর তখন জ্বলছে। হাতবাক্‌স খুলে হলধরের হাতচিট্‌খানা বের করলেন তিনি। কামিনী পড়তে জানে না। কিন্তু কাগজখানা সে চিনতে পেরেছে। কাগজখানার ডানদিকে মাথার কাছে একটা কালির ছিটে আছে, সেটা সে দু'দিন আগে দেখে গেছে। বাবু এ ব্যাপারে অন্তত তাকে ঠকাচ্ছেন না।

কামিনী হঠাৎ খপ্‌ করে রাজীব মুখুজ্যের হাত থেকে কাগজখানা টেনে নিয়ে ঘরের কোণে বাতির ওপর ধরালো। কাগজখানা জ্বলে উঠলো।

—কচ্চিস কী? কচ্চিস কী?

ফরাস থেকে নেমে দ্রুতপায়ে কামিনীর কাছে এগিয়ে এলেন রাজীব মুখুজ্যে। এসব কী হেঁয়ালি করছে ছুঁড়িটা?

জ্বলে ওঠা কাগজের আগুনে ঘরটা হঠাৎ একটু বেশি আলোকিত হয়ে উঠেছে। সেই আলোয় কেমন যেন রহস্যময় দেখাচ্ছে কামিনীর মুখখানা। তার ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠলো এমন একটু হাসি, যার অর্থ বোঝার সাধ্য গাঁতিদার রাজীবলোচন মুখুজ্যের নেই।

সেই হাসির রেশ মুখে রেখেই কামিনী বললে, ঝার জন্যি সতীধম্মোয় আগুন দেলাম বাবু, সেডাও পুড়েই যাক।

দেখতে দেখতে কাগজখানা পুড়ে তার টুকরো টুকরো ছাই মেঝেয় ছড়িয়ে গেল। কাগজ পোড়া আগুনের আলো নিঃশেষ। আবার সেই বাতির ক্ষীণ আলো।

কয়েকমুহূর্ত ছাইয়ের টুকরোগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলো কামিনী। তারপর মুখ তুলে বললে, অ্যাকন মুই নিচ্চিন্দি।

একগাল হেসে প্রৌঢ় অজগর বেষ্টন করলে যুবতী হরিণীকে। অজগর নিজেই এক ফুঁয়ে বাতিটা নিবিয়ে দিলে।

তিনটে বছর নির্বিবাদেই কেটেছিল।

দেনা মকুবের বিনিময়ে রাজীব মুখুজ্যে যে দাম ধরে পেয়েছেন তার পরে তিনিও কোনো তঞ্চকতা করেননি। কামিনীর ভাই কেনারাম আর পরাণকে মাইন্দারির কাজ দিয়েছেন তিনি। মাঝে মাঝে বাবুর কছে হাত পেতে দু'এক টাকা নিতেও কোনো লজ্জা হয়নি কামিনীর। গাঁয়ের লোকে জেনেছে, ছোটো ভাইয়েরা বুঝতে শিখেছে-সব কিছু গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল তার। বিজলিয়া কুঠির আমিন তিনকড়ি পাল বেশ কিছুদিন ঘোরাঘুরি করেছিল কামিনীর কাছে। তার মনিব ওমান সাহেব তেমন রসে ভরা নাগরী পেলে নাকি তার কাছে একেবারে দেবতুল্য মানুষ। নাগরীকে আরাম আয়েসে রাখতে যত টাকা দরকার খরচ করে যাবেন তিনি। কামিনীর মতো এমন টইটম্বুর ছুঁড়ি পেলে তিনি মাথায় করে রাখবেন। সামান্য একটা দিশি গাঁতিদারের কাছে এমন ঢলঢলে যৌবনটা নষ্ট করে লাভ কি? তার চেয়ে কামিনী বিজলিয়া কুঠিতে চলুক। শাদা চামড়ার কাছে তার কদর হবে। রাণীর হালে থাকবে সে।

কামিনী তাকে প্রত্যেকবারই ফিরিয়ে দিয়েছে। গোরা কুঠেলের নাগরী হওয়ার কোনো সাধ তার নেই, সে বেশ আছে।

অল্প কিছুদিন পরেই বিপদটা ঘটলো।

সর্বদিক থেকে সাবধান থেকেও তিন বছরের মাথায় আর শেষরক্ষা করতে পারেনি কামিনী।

রাজীব মুখুজ্যে যেদিন কামিনীর মুখে শুনলেন যে তার পেটে একটা জীব এসে গেছে, সেদিন তাঁরও মাথায় হাত। সেজো মেয়ে পোয়াতি হয়ে বাপের বাড়ি আসছে। দু'চার দিনের ভেতরেই মেয়ে-জামাইয়ের আসার কথা। এদিকে আবার ছোটো ছেলেটার বিয়ে ঠিক হয়েছে। দু'মাস পরেই বিয়ে।

ভয়ে, ভাবনায়, লজ্জায় ক্ষেপে গিয়ে রাজীব মুখুজ্যে বললেন, হারামজাদি, মনে মনে তুই এই ফন্দি করি রেকেচিলি? আমারে তুই ডুবোবি?

কামিনীও তেজের সঙ্গে বললে, তোমারে ডুবোতি চালি তো আগেই পাত্তাম বাবু।

—বাজে কতা রেকি দে। ছেনাল মাগী, কস্‌বিগিরি করবি আর পেট ঠ্যাকানোর বুদ্ধি তোর নাই, এ কতা আমারে বিশ্বেস কত্তি হবে?

চোখ দুটো জ্বলে উঠলো কামিনীর—অ্যাকন আমি ছেনাল, আমি কস্‌বী, কেমন? আমারে অসতী করিচে কেডা?

কিছুক্ষণ চোটপাটের পর রাজীব মুখুজ্যেকে ঠাণ্ডা হতেই হল। ওটা তো ছোটোলোকের মেয়ে, ওর আর মান সম্মানের কী আছে? কিন্তু তাঁর? লোকে এমনিতে যা জানে জানুক। কিন্তু একটা জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ এসে হাজির হলে তার যে গাঁয়ে টেকাই দায় হবে। পেটে যেটা এসেছে সেটাকে বিইয়ে যদি মাগী একদিন এনে হাজির করে, তখন?

নিরুপায় নির্জীবস্বরে রাজীব মুখুজ্যে বললেন, কিছু টাকাকড়ি দিচ্চি, কস্‌বায় গে খালাশ হয়ে আয়। কী আর করবো?

কসবা মানে যশোর শহর।

তাতেই রাজী হল কামিনী। তাছাড়া আর তো কেনো উপায় ছিল না তখন।

কিন্তু টাকা দেওয়া আর হয়নি রাজীব মুখুজ্যের। এই কথাবার্তার তিনদিন পরেই কলেরায় মারা গেলেন তিনি।

নিরুপায় কামিনী নিজেই গিয়েছিল যশোর সদরে। একটা মরা মেয়ের জন্ম দেওয়ার পর সেখানে বছরখানেকের ওপর কাটাতে হয়েছে তাকে। আগে ছিল একটা পরপুরুষের মন জোগানোর কাজ। তখন বহু পরপুরুষ। সেখান থেকেই তাকে সরিয়ে এনেছে ভবি জেলেনী। সেই কারণেই আগেকার কেলেঙ্কারি সম্বন্ধে কামিনীকে সে পই পই করে সাবধান করেছে।

এই ক'বছরের ভেতর জীবনে কত কিছুই ঘটে গেল।

ভবি জেলেনী তাকে যে যশোর থেকে তুলে এনেছিল, সেটা কোনো দয়া-মায়ার ব্যাপার নয়। আসল কারণ, কামিনীর দেহে যৌবনের চোখ ধাঁধানো ঝলক। এই দেহটার ওপর দিয়ে যাহোক কিছু ঝড়ঝাপটা গেছে, কিন্তু তার আঁটোসাঁটো বাঁধুনি এতটুকু আলগা হয়নি।

ভবি তার কাছে মাঝে মাঝে আসে, দু'এক টাকা নিয়ে যায়। সেটা তার দস্তুরি। খুশি মনেই দেয় কামিনী। ভবির নজরে পড়েছিল বলেই তো হাল ফিরেছে তার। এখানে আসার পর খবর দিয়ে ভাই দুটোকে আনিয়েছে। তার বদারে দুটো ভাইকেই কুঠিতে চাকরি দিয়েছে লালমোন সাহেব। আর বেশি কী চাই? এখন সময় থাকতে থাকতে যেটুকু পারা যায় গুছিয়ে নিতে হবে।

ভবির কাছে কামিনী যেমন কৃতজ্ঞ, তেমনি তাকে দেখলে গা ছম্‌ছম্‌ও করে তার। কে জানে, কবে আবার নতুন আর একটা ছুঁড়িকে এনে হাজির করবে কুট্‌নীমাগী। সাহেবের খোরাক জোগানোর জন্যে সে তো সারা রাজ্যি চষে বেড়ায়। যার হাতে কপাল ফিরেছে, আবার তার হাতেই কপাল ভাঙবে।

দরজার কপাট খুলে গেল।

শিস্ দিতে দিতে ঘরে ঢুকলেন লারমুর। মেহগনি কাঠের ভারী কপাটদুটো নিজের হাতে ভেজিয়ে দিলেন। একটু আগেকার সেই ভয়ঙ্কর রাগের চিহ্নমাত্র চোখেমুখে নেই।

সাহেব ঘরে ঢুকতেই নিজেকে আবার তৈরি করে নিয়েছে কামিনী। চোখে এনেছে বিলোল কটাক্ষ। মুচকি হেসে বললে, তুমি কতখনে আসবা, তাই ভেবি আমি সারা হচ্ছি।

—এত পেয়ার, আঁ? —কামিনীর গাল টিপে দিয়ে লারমুর বললেন, লাল ঘোড়া ছুটাইবার বন্দবস্ত্ করে আসিলাম। পিপড়াগাছির রাইয়তেরা কল্য টের পাইবে, লালমোন কত লাল হইতে পারে।

মুহূর্তের ভেতর দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠা একটা গ্রামের ছবি কামিনীর চোখের সামনে ভেসে উঠলো। সেই সঙ্গে যেন কানে ভেসে এলো বহুকণ্ঠের করুণ মর্মভেদী আর্তনাদ।

লারমুর তাঁর পানপাত্রে আর একটু শ্যাম্পেন ঢেলে নিলেন।

—আমারে এটটু নতুন বেলাতি মদ খাওয়াবা বলে যে কতা দিইলে সায়েব?

—আলবাৎ! লেকিন্ বেলাইতি পানি খাইয়া বেহোঁশ হইবে না তো? তাহা হইলে আমার ফূর্তি নষ্ট হইবে।

—না, বেহুঁশ হবো না। তুমি দ্যাও—

॥ সাত ॥

কাগজের পর কাগজের স্তূপ, বইয়ের পর বই।

পত্র-পত্রিকা, জেলা গেজেটিয়ার, সরকারি নথি চিঠিপত্র—দিনের পর দিন জমা হতে হতে একটা পাহাড় হয়ে উঠেছে হরিশের টেবিলে। তাও তো বাড়িতে সব আনেনি। লিখতে লিখতে হঠাৎ যেগুলোর দরকার হতে পারে, সেগুলো রেখেছে পেট্রিয়ট আপিসে।

একটার পর একটা সূত্র ধরে ইতিহাসের ওপর দিয়ে ঝড়ের গতিতে এগিয়ে চলেছে হরিশ। লর্ড ডালহৌসির অযোধ্যা দখলের সময় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সুকৌশলী সাম্রাজ্য বিস্তারের কাহিনী জানতে রাতের পর রাত জেগে যেটুকু পরিশ্রম তাকে করতে হয়েছিল, এ পরিশ্রম তার দ্বিগুণ তো বটেই, হয়তো চতুর্গুণ।

কর্মস্থল থেকে ফিরে প্রথমেই একবার পেট্রিয়ট আপিসে যেতে হয়। শম্ভুচাঁদ ছেলেটা সহকারী হিসেবে যদিও যথাসাধ্য সাহায্য করছে, তাহলেও তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব তার ওপর চাপানো যায় না। পেট্রিয়ট আপিস থেকে কাজ সেরে বাড়ি ফিরতেই রাত ন'টা সাড়ে ন'টা বেজে যায়। চোগা-চাপকান ছেড়ে কোনোমতে দুটো নাকে মুখে গুঁজেই বসে যেতে হয় তাকে। চোখ থাকে ছাপার অক্ষরের ওপর আর হাতের কলম চলে সাদা কাগজের ওপর। কত তথ্য যে টুকে নিতে হচ্ছে, তার শেষ নেই। কিন্তু যে তথ্যগুলো অজানা থেকে যাবে, তার পরিমাণ হয়তো জানা তথ্যের শতগুণ!

রোজই টেবিলের কাগজপত্র একটু অগোছালো হয়ে থাকে, রোজই গুছিয়ে রাখে মাধুরী। তার ওপর আবার নতুন বই-পত্র এসে চাপে। শেষ পর্যন্ত বাবাকে বলে একটা মাঝারি গোছের বইয়ের র‍্যাক কিনিয়ে এনেছে মাধু।

কি বিচিত্র ইতিহাস!

শতাব্দী ঠিক পূর্ণ হওয়ার বছরে লর্ড ওয়েলেসলির জারি করা সপ্তম আইন। লোকমুখে যার পরিচিতি ছিল, হফ্তম্।

তখনো নীল বিষে বাঙলার দেহ জর্জরিত হতে শুরু করেনি। তখন হুজুর মালিক বলতে জমিদার। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নতুন জমানায় জমিদারের হাতে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা তুলে দিলে হফ্তম্।

বাকি খাজনার দায়ে প্রজাকে উচ্ছেদ করবার জন্যে জমিদারবাবুকে কষ্ট করে আদালতেও যেতে হবে না। তাঁর হুকুমই আইন। অবাধ্য প্রজাকে আটক করে রেখে খাজনা আদায় করবার ব্যবস্থা করলেও তা বেআইনি হবে না। কেবল বাকি খাজনার সমস্যা মিটলেই তো জমিদারের সব সমস্যা মেটে না। জমিদারি যখন চিরস্থায়ী তখন রায়তের ওপরেও স্থায়ী অধিকার থাকা দরকার। সে সমস্যারও সমাধান করা ছিল হফ্‌তম্ আইনে। এক জমিদারের প্রজা কোনো অবস্থাতেই পালিয়ে গিয়ে অন্য জমিদারের এলাকায় চাষ করতে পারবে না। সে ধরনের অবাধ্যতা করলে জমিদার কয়েদ করতে পারবেন সে প্রজাকে।

বারোবছর পরে জারি হল পঞ্জম্ অর্থাৎ পঞ্চম আইন।

হফ্‌তমে জমিদারকে সব ক্ষমতা দেওয়া হলেও প্রজার আদালতে যাওয়ার অধিকার সম্বন্ধে কিছু বলা হয়নি। এতবড়ো একটা ভুল নজর এড়িয়ে গেছে কোম্পানির কর্মকর্তাদের। পঞ্চম আইনে সেটা তাড়াতাড়ি শুধ্‌রে নেওয়া হল। কারণ, কিছু কিছু অশিষ্ট প্রজা জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ ঠোকাঠুকি আরম্ভ করেছিল।

সে-পথ একেবারে বন্ধ করে দিলে পঞ্চম আইন।

জমিদার কিম্বা তার নায়েব, গোমস্তার বিরুদ্ধে যে কোনো রকমের মামলা করাই প্রজার পক্ষে দণ্ডনীয় অপরাধ।

রায়ত এবার হল পুরোপুরি ভূমিদাস।

তার প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগেই লুই বন্নোর আনা নীল বিষ প্রথম ছোবল মেরেছিল বাঙলার মাটিতে। সে বিষের ক্রিয়া আরম্ভ হতে একটু সময় লেগেছিল।

লুই বন্নো আর ক্যারেল ব্লুমের পদাঙ্ক অনুসরণ করে একজন একজন করে ভাগ্যান্বেষী শ্বেতাংগ এসে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো বাঙলার গ্রাম-গ্রামান্তরে। তারপর আরো বেপরোয়া ভাগ্যান্বেষী এলো দলে দলে।

একটা স্যামুয়েল ফেডি নয়—অসংখ্য স্যামুয়েল ফেডিতে ছেয়ে গেল নদীয়া, যশোর, ফরিদপুর, ঢাকা, রাজশাহী, পাবনা।

যে বছর বিশ্বনাথ সর্দারের ফাঁসি হল তার দু'বছর পরেই গবর্নর জেনারেল লর্ড মিন্টোর আমলে চারজন নীলকরকে দেশে নীল ব্যবসায়ের অনুমতি প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়েছিল কোম্পানি সরকার। চাষী রায়তদের ওপর তাদের অত্যাচার নাকি মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

চারজন গেল, এলো চারশো জন।

অত্যাচারী নীলকরদের সম্বন্ধে রিপোর্ট পাঠানোর জন্যে ম্যাজিস্ট্রেটদের কাছে নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন লর্ড মিন্টো। কিন্তু নিষ্ফল হল সে নির্দেশ। নেটিবদের ওপর সামান্য একটু জোর-জবরদস্তির জন্যে কোন শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিস্ট্রেট তার একজন স্বজাতের বিরুদ্ধে নালিশ জানাবে? কী দায় তার?

আঠরোশো তিরিশ সাল।

নতুন আইন পাশ হল—রেগুলেশন ফাইভ অব্ এইটিন্ থার্টি।

আবার সেই পঞ্চম আইন!

আঠারো বছর আগেকার পঞ্চম রায়তকে পরিণত করেছিল দিশি জমিদারদের ভূমিদাসে; নতুন পঞ্চম তাদের দাসত্বের সৌভাগ্যকে আরো প্রসারিত করে দিলে। তারা হয়ে গেল নীলকর প্রভুর অক্রীত ক্রীতদাস। আমেরিকার আবাদী মালিকদের তবু টাকা খরচ করে নিগ্রো দাস কিনে আনতে হয় আফ্রিকা থেকে। বাঙলার নীলকরের সে বালাইও রইলো না। নীলচাষের জন্যে বিঘে প্রতি মাত্র দুটো টাকা রায়তের হাতে তুলে দিতে পারলেই নেটিবটা চিরকালের মতো কেনা গোলাম হয়ে গেল। দাদন যে একবার নেবে, নীলচাষ তাকে করতেই হবে। না করলে ফৌজদারিতে সোপর্দ, কারাদণ্ড অনিবার্য।

দাদন নেওয়া না নেওয়া তো রায়তের মর্জি মাফিক হলে চলে না? দাদন তাকে নিতেই হবে। বুদ্ধিমানের মতো দাদন নেয় তো ভালো, না নিলে তারও ব্যবস্থা আছে।

নীলকরের অত্যাচার নিয়ে আদালতে নালিশ? আইন নেই। মফস্বলের আদালতে শ্বেতাঙ্গের নামে মামলা ঠোকা যায় না। তাদের বিচার হতে পারে একমাত্র কলকাতার সুপ্রীম কোর্টে। নালিশ করবার মতো দুর্বুদ্ধি হলে সেখানে যাও। হোক বিচার—দেখা যাক্, কার ন্যায়, কার অন্যায়!

সেই ব্ল্যাক অ্যাক্ট্ মুভমেণ্ট।

বেথুন সাহেবের সৎ প্রচেষ্টা বানচাল করবার জন্যে ক্ষেপে উঠেছিল ইংরেজ-সমাজ। জয়ীও তারা হয়েছিল।

বছরের পর বছর চলে গেছে, কোনো প্রতিকার পায়নি হতভাগা নীলচাষী। কলকাতায় হিন্দু সমাজ সংস্কারের কত আন্দোলন হল, টৌন হলে কত জ্বালাময়ী বক্তৃতা হল, কিন্তু লক্ষ লক্ষ অসহায় নীলচাষীর চোখের জল কি তাতে শুকিয়েছে? সে কি ফিরে পেয়েছে তার বৌ-ঝির কেড়ে নেওয়া ইজ্জৎটুকু? পেয়েছে কি ওই ভয়ঙ্কর নীলদানবের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার এতটুকু আশ্বাস?

স্নায়ুতে স্নায়ুতে একটা তীব্র জ্বালা বোধ করে হরিশ। মাথার ভেতর শিরা-উপশিরাগুলোর ভেতর দিয়ে রক্তস্রোত যেন দ্বিগুণ বেগে বইতে থাকে।

উত্তরদিকের জানালা খুলে দেয় হরিশ।

হু হু করে মাঘ মাসের কন্‌কনে ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে আসে খোলা জানালা দিয়ে।

এই শীতের ভেতরেও তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। একটা প্রচণ্ড অস্থির উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপছে সারা শরীর। জানালা খুলে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তারপরেই আবার খানিকটা হুইস্কি, রাম্ কিম্বা কনিয়াক্ গলায় ঢেলে দিয়ে নতুন করে বসে যায়।

এটা একদিনের ব্যাপার নয়। রোজই এই একই ব্যাপার ঘটছে। প্রচণ্ড উত্তেজনার মুহূর্তে বারবার বুড়ো করালী বাগদির মুখখানা ভেসে ওঠে তার চোখের সামনে।

কিশোরীচাঁদ, গৌরদাস, শম্ভুনাথ—সবায়েরই অনুযোগ, সে রাজনীতিকে বড়ো বেশি প্রাধান্য দেয়। কিন্তু কতটুকু রাজনীতি সে করতে পেরেছে? দেশের এই মুহূর্তে যে রাজনীতির আসল দরকার, তার কিছুই সে করতে পারেনি। বরঞ্চ অনেকগুলো বড়ো বড়ো ভুলই সে করেছে!

লর্ড ডালহৌসির নগ্ন নীচতায় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল বলেই অযোধ্যা দখলের সময় সে তার সাধ্যমতো কঠোর ভাষায় লিখেছে। কিন্তু একজন সামন্ত রাজার বিরুদ্ধে অন্যায়ের প্রতিবাদ করে দেশের কতটুকু উপকার সে করতে পেরেছে? গত দেড়বছরে উত্তর ভারত জুড়ে দাবানলের ভেতর ইংরেজের চরিত্র দেখে তার মোহভঙ্গ সম্পূর্ণ হয়ছে। কিন্তু বিদ্রোহের প্রথম পর্বে সেও তো ভুল করেছিল। ভুলটা না ভাঙলে সেও হয়তো ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের রাজা জমিদারদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে এখনো সেপাইদের ভর্ৎসনা করে যেতো। হয়তো গুপ্তকবির মতো নানা সাহেব আর লক্ষ্মীবাঈয়ের অবৈধ সম্পর্কের কথা সেও বিশ্বাস করতো।

গুপ্ত কবি ক'দিন আগে মারা গেছেন। তাঁর রুচি সম্বন্ধে হরিশের শ্রদ্ধা নেই, তাঁর রক্ষণশীল সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিও বেশির ভাগ সময়েই বিরক্তিকর লেগেছে। তবু তাঁর ভেতর যে ক্ষমতা ছিল, তা অস্বীকার করা যায় না। তাঁর প্রভাকরের বহু সংখ্যাতেই সে প্রমাণ আছে। এরই ভেতর গুপ্ত কবিকে উপলক্ষ্য করে বাঙলা সাময়িকপত্রের একটা সমালোচনা সে লিখেছে। সামনের হপ্তায় পেট্রিয়টে লেখাটা বেরোবে।

গুড়গুড়ে ভট্চাজ শয্যাশায়ী। তাঁর অবস্থাও ভালো নয়। এই সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত অথচ রক্ষণশীলতার বিরোধী মানুষটিও চলে যাবেন কিনা, কে জানে!

আজ মনে হয় আরো আগেই আরো বেশি সচেতন হওয়ার দরকার ছিল।

রাজা রামমোহন, প্রিন্স দ্বারকানাথ, প্রসন্নকুমার অনেক কিছুই করেছেন, অনেক সংস্কারেই

হাত দিয়েছেন কিন্তু জমিদারির স্বার্থে যেখানে আঘাত পড়েছে সেখানে তাঁরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েছেন। বাঙলার গ্রামে গ্রামে যখন চাষীর ঘরে আগুন জ্বলছে, তার চোখের সামনে বৌ কিম্বা মেয়েকে বিবস্ত্রা করে চাবুক মারা হচ্ছে, কুঠিতে ধরে নিয়ে গিয়ে চূড়ান্ত সম্ভ্রমহানি করবার পর উল্লাসে নীলকর অট্টহাসি হাসছে তখনো রাজা আর প্রিন্স নীলকরদের কোনো ত্রুটি দেখতে পাননি।

হরিশের তখনো জন্ম হয়নি। তার অনেক আগে থেকেই কলকাতায় ক্রীতদাস ছিল। গোলাম কেনা-বেচার আড়ৎ ছিল সুতোনুটি গোবিন্দপুরে। আড়তে আড়তে শেকলে বেঁধে পুরুষ নারী সব রকম পণ্যই রাখা হত। কিনে নিতেন বড়ো বড়ো ইংরেজ রাজপুরুষেরা। দিশি ধনীরাও কিনতেন। কোনোটি বা ইংরেজ মনিবকে ভেট দেওয়ার জন্যে। দেওয়ানজী রামমোহন যখন কলকাতায় এসে বাস করছেন তখনো গো-হাটার মতো গোলাম-হাটা ছিল। কই, তার বিরুদ্ধে একটা কথাও তো তিনি বলেননি। বলেননি প্রিন্সও। সতীদাহের চেয়ে সেটা কি এতটুকু কম নিষ্ঠুর প্রথা ছিল?

এই নিষ্ঠুর প্রথার বিরুদ্ধে সেদিন একজনই মাত্র তীব্র বিক্ষোভে সোচ্চার হয়েছিলেন—হিন্দু কালেজের ডিরোজিও।

তাঁরই হাতে গড়া ছাত্র রামগোপাল, প্যারীচাঁদ, দক্ষিণারঞ্জন। তাঁরা কিন্তু বাঙলার গ্রামে গ্রামে জমিদার আর নীলকরের নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন। বেঙ্গল স্পেক্টেটার পত্রিকার সেই লেখাগুলো হরিশের টেবিলেই রয়েছে! হরিশ যখন টলা কোম্পানির চাকরিতে ঢুকেছে তখন এঁরা গ্রাম-বাঙলার গরীব রায়তদের দুর্দশা নিয়ে চিন্তা করেছেন। ব্ল্যাক অ্যাক্ট্ আন্দোলনের সময়েও আগুন ঝরেছিল রামগোপালের কলমে। এই সেদিন আলালের ঘরের দুলাল বইতেও নীলকরের বিবেকহীন চরিত্রের ছবি তুলে ধরেছেন প্যারীচাঁদ।

কিন্তু সবাই তাঁরা এত স্তিমিত হয়ে গেলেন কেন? সবাই মিলে নতুন করে নীলকরদের বিরুদ্ধে একটা প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলা যায় না?

আশায় বুক বাঁধে হরিশ। রামগোপাল মডারেট হতে পারেন, কিন্তু তিনি এখনো ফুরিয়ে যাননি। হয়তো প্যারীচাঁদও এগিয়ে আসবেন।

ক'দিন পরের কথা।

নথিপত্র ওলটাতে ওলটাতে আবদুল লতিফের কাহিনী সেদিন নজরে পড়লো হরিশের। নীলকরের ঔদ্ধত্য আর সরকারি পক্ষপাতিত্বের কি চমৎকার দৃষ্টান্ত।

আবদুল লতিফ তখন যশোরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট।

আদালত থেকে একটা পরোয়ানা পেয়ে উত্তেজনায়, রাগে ফেটে পড়লে পচাপোড়া কুঠির নীলকর ম্যাকেঞ্জি। একটা নেটিব ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের এত বড়ো দুঃসাহস যে, ভারত সরকারের একজন বৃটিশ প্রজাকে সে পরোয়ানা পাঠায়?

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের জারি করা পরোয়ানায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, রায়তদের ওপর তিনি যেন লাঠিয়াল লেলিয়ে না দেন। রায়তের নিজের জমিতে তার নিজের পছন্দমতো ফসলের চাষে বাধা দেবার আইনগত কোনো অধিকার ম্যাকেঞ্জির নেই। তাদের বিরুদ্ধে ম্যাকেঞ্জি সাহেবের যদি কোনো অভিযোগ থাকে তাহলে তিনি আদালতে নালিশ দায়ের করতে পারেন। নবীনচন্দ্র ঘোষ এবং আরো কয়েকজন রায়তের ওপর এরই ভেতর যে সব অত্যাচার করা হয়েছে তার সঙ্গে ম্যাকেঞ্জি সাহেবের দু'জন এদেশি কর্মচারি বিশেষভাবে জড়িত বলে অভিযোগ আছে। সুতরাং সেই অভিযোগের উত্তর দেবার নির্দিষ্ট দিনে উক্ত কর্মচারী দু'জন যেন আদালতে হাজির থাকেন।

ব্লাডি নেটিব নিগার ম্যাজিস্ট্রেট!

তার হুকুমে আদালতে যাবে ম্যাকেঞ্জির আমিন, গোমস্তা? অসম্ভব! তাছাড়া এই পরোয়ানার অপমান হজম করাও কাপুরুষের মতো কাজ হবে।

. পালটা অভিযোগ গেল ভারত সরকারের সেক্রেটারির দরবারে।

ম্যাকেঞ্জির অভিযোগ, যশোরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আবদুল লতিফ স্থানীয় সমস্ত সম্ভ্রান্ত নীলকরদের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করেন। তিনি নিজে এবং বেঙ্গল ইণ্ডিগো কোম্পানির সম্ভ্রান্ত ম্যানেজার মিস্টার লারমুর বিশেষভাবে ম্যাজিস্ট্রেটের বিদ্বেষের লক্ষ্যস্থল। তাই জারি করা পরোয়ানায় তিনি নীলকরদের বিরুদ্ধে রীতিমতো অপমানসূচক ভাষা ব্যবহার করেছেন। সদাশয় ভারত সরকার বিষয়টা তদন্ত করে দেখুন।

সঙ্গে সঙ্গে তদন্তের ব্যবস্থা হল।

আবদুল লতিফ বললেন, পচাপোড়া কুঠির ওপর জারি করা পরোয়ানায় আদালতের রীতিসম্মত ভাষাই তিনি ব্যবহার করেছেন, কোনো অপমানসূচক ভাষা ব্যবহারের প্রয়োজন তাঁর ছিল না এবং তা তিনি করেননি। তছাড়া, পরোয়ানার ভেতর দিয়ে যিনি নির্দেশ জারি করেছেন, তিনি কোনো ব্যক্তিবিশেষ নন—ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে ভারত সরকারের প্রতিনিধি তিনি। ভারত সরকারই আদালতের মাধ্যমে সরকারি পরোয়ানা জারি করেছেন। নীলকরেরা কি চান যে তাঁদেরও সরকারি পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির মতো সম্বোধন করা হোক? সেটা সম্পূর্ণ অসঙ্গত। তাঁরা ধনী হতে পারেন, কিন্তু আদালতের ভাষা ধনীদের জন্যে একরকম আর গরীবদের জন্যে আর একরকম হতে পারে না।

এই উত্তরের ফল কী হওয়া সম্ভব ছিল?

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আবদুল লতিফকে যশোর থেকে বদলি করা হল। শ্যাম্পেন পার্টি হল পচাপোড়া কুঠিতে, হল মোল্লাহাটি কুঠিতে। বিজয়ের আনন্দে মদের ফোয়ারা ছুটলো একদিকে। আর একদিকে টপ্ টপ্ করে চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো হাজার হাজার রায়তের গাল বেয়ে।

নিজের চোখ দুটোও কখন ঝাপসা হয়ে এসেছে হরিশের।

গড়গড়ার কল্‌কেটা কখন নিবে গেছে, খেয়াল নেই। ঝাপ্‌সা চোখে দেওয়ালে টাঙানো শুকনো নীলগাছ দুটোর দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্কের মতো সে বসে আছে। নতুন করে সেজে আনা কলকে থেকে আনারপুরী তামাকের মিষ্টি গন্ধটা নাকে এলো। পাশের দিকে না তাকিয়েই আপনমনে হরিশ বললে, পাঁচবছর আগেকার একটা ঘটনার বিবরণ পড়ে আজ বড়ো তৃপ্তি পাচ্ছি রে মধু-মা।

—মাধু নয়, আমি।

চমকে উঠে পাশ ফিরে তাকালে হরিশ। ছোটবৌ তখন গড়গড়ার নলচের ওপর কলকে বসিয়ে দিচ্ছে।

হতবাক্ হয়ে কয়েকমুহূর্ত তাকিয়ে রইলো হরিশ। কলকে বসিয়ে দিয়ে মুখ তুলে ছোটোবৌ বললে, মাধুর গায়ে ধুম জ্বর। দুপুর থেকেই সে ক্যাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে আচে।

আরো কয়েক মুহূর্ত বিমূঢ়ের মতো কেটে গেল হরিশের। তারপর ব্যস্ত হয়ে উঠলো তার মন।

—কেমন জ্বর? কোবরেজ ডাকা হয়েচিলো?

—না। খুব কাঁপিয়ে জ্বর এয়েচিলো, বট্‌ঠাকুর বলেচেন নাকি ম্যালোয়ারি জ্বর। তাই আর কোবরেজ ডাকা হয়নি।

—এখন কেমন আচে? আমি একবার দেখে আসি।

—মাধু ঘুমিয়ে পড়েচে। তোমার ভয়ের কিচু নেই, জ্বরের তাড়স্ কমে এয়েচে, হয়তো রেতেই জ্বর ছেড়ে যাবে।

ছোটোবৌ প্রস্থানোদ্যত হল।

—একটু দাঁড়াও।

দু'পা এগিয়েছিল ছোটোবৌ। সেখানেই দাঁড়িয়ে গেল।

—এর আগেও কি তুমিই তামাক সেজে দিয়ে গেচো?

—হ্যাঁ। —মুখ নীচু করেই উত্তর দিলে ছোটোবো।

চেয়ার থেকে উঠে আস্তে আস্তে ছোটোবৌয়ের সামনে এসে দাঁড়ালে হরিশ। এ যেন সম্পূর্ণ অপরিচিতা এক নারী!

—এখন রাত প্রায় দুটো বাজে। এত রাত পর্যন্ত আমার তামাকের জন্যে তুমি জেগে বসে আছো?

ছোটোবো একবার মুখ তুলেই আবার নামিয়ে নিলে।

হরিশও কয়েক মুহূর্ত নীরব। শুধু দেওয়াল ঘড়িটার টিক্ টিক্ শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই।

—আমার টেবিল, আমার বিছানা, সবই কি আজ তাহলে তুমিই গুছিয়ে রেখে গেছো?

ছোটোবো চুপ করে রইলো।

মোমবাতির শিখাটা কাঁপছে। সেই আলোয় দেওয়ালের গায়ে কাঁপছে ছোটোবৌয়ের ছায়া।

হরিশের ছায়া কাঁপছে না, কিন্তু কেমন একটা অপ্রতিরোধ্য আবেগে কাঁপছে তার নিজের শরীরটা। নির্বাক হয়ে সে ছোটোবৌয়ের দিকে তাকিয়ে রইলো।

তোমার ভেতর এই স্নিগ্ধতা যদি ছিলই ছোটোবো তাহলে আমার বুকে এত দাহ তুমি কেন সৃষ্টি করেছিলে? কেন মোক্ষদার স্মৃতির ওপর তুমি হয়ে উঠেছিলে দানবীর মতো নির্মম? কেন আমার জন্মদুঃখিনী মাকে এক মুহূর্তের শান্তি তুমি দাওনি এতদিন? কেন আমাকে ঠেলে দিলে বারাঙ্গনার শয্যায়? আমি ঘরের শান্তিটুকু হারিয়ে বোবা হাহাকারে গুমরে মরেছি, কামার্ত দেহটাকে শান্ত করবার জন্যে বারবার ছুটে গেছি দেহপসারিণীর দ্বারপ্রান্তে, দিন নেই, রাত নেই—তীব্র সুরার উত্তপ্ত স্রোতে হাল-ভাঙা নৌকোর মতো নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছি। এই নম্র কল্যাণী মূর্তি এতদিন একবারও দেখালে না কেন?

দেওয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং করে দুটো বাজলো।

দুটো পাশাপাশি ঘরের মাঝখানের দেওয়ালে ওই দরজার কপাট দুটো সেই কবে থেকে বন্ধ হয়ে আছে! নিজের হাতেই খিল তুলে দিয়েছিল হরিশ।

—আমি যাই।

মুখ নীচু করে কথাটা বলেই ছোটোবো দরজার দিকে পা বাড়ালে।

—একটু দাঁড়াও ছোটোবো।

হরিশ এগিয়ে গেল এতকালের বন্ধ দরজাটার দিকে। এক হাতে দরজার কপাটের ওপর জোরে চাপ দিয়ে আর এক হাতে এঁটে বসে থাকা খিলটা সে খুলে ফেললে। খিলের আড়ালে দরজার কপাটের ওপর একটা কুমরে পোকা বাসা বেঁধেছিল। তার হাতের চাপে মাটির বাসাটা ঝুর্ ঝুর্ করে ভেঙে পড়লো।

দরজার কপাট খুলে দিয়ে হরিশ বললে, এই দোর দিয়েই যাও ছোটোবো।

॥ আট ॥

কপোতাক্ষের শান্ত, স্বচ্ছ জলের ওপর সবে ভোরের আলো লুটিয়ে পড়েছে। সূর্য তখনো ওঠেনি। পূবের আকাশে লালের আভা ফুটছে।

ফাল্গুনের মাঝামাঝি।

আমের বোলের মৃদু মিষ্টি গন্ধে ম' ম' করছে ভোরের বাতাস। শীতের দাপট চলে গেছে কিন্তু বাতাসে এখনো একটু শিরশিরে ঠান্ডার আমেজ। পাতাঝরা বট, অশ্বত্থ আর নিম গাছের ডালে ডলে সবে কচিপাতা দেখা দিতে শুরু করেছে।

কয়েকদিন আগে বেশ ভালোমতো এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। আর দু'এক পশলা বৃষ্টি হলেই জমিতে জো এসে যাবে।

আজ অন্যদিনের চেয়েও বেশ কিছু আগে ঘুম ভেঙেছে লক্ষ্মীমণির। তখনো ভালোভাবে অন্ধকার কাটেনি। উদোম গায়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছিলো বলাই। তার গায়ের ওপর সযত্নে কাঁথাখানা টেনে দিয়ে সে বেরিয়ে এসেছে। আমবাগানের ওপাশে ইশাক্ মণ্ডলের বাড়ি থেকে তখন মোরগের ডাক ভেসে আসছে কোঁকর কোঁ—কোঁকর কোঁ—

লক্ষ্মীমণির আজ বাপের বাড়ি যাওয়ার কথা। তার বাপের বাড়ি চৌগাছা থেকে ক্রোশ তিনেক পথ—কাঠগড়া সদর কুঠির কাছে নারায়ণপুর।

উঠোনের পুবে সুপুরি গাছ ক'টার ফাঁক দিয়ে সকালের লালচে মিষ্টি রোদ সবে এসে দাওয়ার ওপর পড়েছে তখন। গোয়াল থেকে গোরু-বাছুর ক'টাকে বের করে দিয়ে বলাইকে ডেকে তুলবে লক্ষ্মী, ঠিক সেই সময়েই আমবাগানের ভেতর থেকে ইশাকের গলা ভেসে এলো, হ্যাদে বলাই উটিচিস?

ইশাক উঠোনে এসে দাঁড়ালে। তার হাতে একখানা কাগজ, মুখে একগাল হাসি। —কি রে কমলির মা, বলাই অ্যাকন তাবাদি ওটে নাই? তোল্, তোল্, ঝাঁকি মারো্য তুলে দে—ভারি জোর খবর আচে।

—তোমার হাতে ও কিসির কাগজ?

—কুটেল সাহিব্দিগোর মিত্যুবাণের কাগজ রে বুন। তুই বলাইরি ঝট্‌পট্ ডাক দিনি, অ্যাকবার পড়ুক, স্বকন্নে শুনি।

লক্ষ্মীমণি ঘরে ঢুকে বলাইয়ের গায়ে মৃদু ধাক্কা দিয়ে ডাকলে, হ্যাদে শোন্‌চো? ওটো, জলদি ওটো—

—নেটেলা পড়েচে?

ধড়মড় করে উঠে বসলে বলাই। —কয়জন নেটেলা?

—নেটেলা পড়ে নাই, জামালের বাপ ডাকতিচে, কি নাকি খবর আচে।

চোখ রগড়াতে রগড়াতে বেরিয়ে এলো বলাই। তাকে দেখেই সংগে সংগে হাতের কাগজখানা এগিয়ে দিয়ে ইশাক বললে, এতে কী ছাপা আছে পড় দিনি।

—আগে চোকিমুকি এট্‌টু জল দে' নি দাঁড়া—

—আরে, চোকি পানি তো সারা সনই আচে, তা আবার দিতি হবে? নে, আগে পড়, তারপরে চোকি পানি দিস। কালকে রাত্তিরি কাগজখান পায়েচি। বিশ্বেস মশায়রা তাড়া তাড়া কাগজ আন্‌য়ে বিলিবস্তা কত্তি লেগেচে। অ্যাকবার শুন্যে আয়েচি, তউ ফজরের ব্যালা স্বকন্নে আর অ্যাকবার শুনি, কলজেডা জুড়োক।

কাগজখানা হাতে নিয়ে কয়েকলাইন পড়েই লাফিয়ে উঠলে বলাই। —ভাই রে এশাক, এ যে অমোল্ল নিদি। কনে পালি?

—আশ্‌মানে। কলাম না, বিশ্বেস মশায়রা আন্‌য়েচে? তুইও তো নাফালি। তালি ঝা শুনিচি তা সাচা কতা? নীলির জন্যি কুটেলরা আর জবরদস্তি কত্তি পারবে না, কল্লি বেআইনি হবে?

—তাই তো ন্যাকেচে!

লক্ষ্মীমণি অধৈর্য হয়ে বললে, ত্যাকন তাবাদি নাপাচ্চো আর নাপাচ্চো। কী ন্যাকেচে তা পড়্তি পাচ্চো না?

—ক্যান পারবো না? এই শোন—রোবকারি পরওয়ানা। নীলচাষ বিষয়ে রাইয়ৎ প্রজাগণের অবগতির নিমিত্তে প্রচারিত হইল। প্রকাশ থাকে যে, নিজ জমিতে নীল চাষ করা বা না করা রাইয়ৎ প্রজাগণের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। সুতরাং নীলচাষের নিমিত্তে তাহারদিগের উপর দাদন

লওয়ার নিমিত্ত অথবা অন্য কোনো উপায়ে বলপ্রয়োগ করা যে কোনো ব্যক্তির পক্ষেই আইনবিরুদ্ধ কার্য বলিয়া গণ্য হইবেক। —স্বাক্ষর এশলি ইডেন।

—তিনি কেডা? উৎসাহে উত্তেজিত ভাবে জিজ্ঞেস করলে লক্ষ্মীমণি।

—বারাসতের হাকিম সায়েব।

—গোরা?

—নাম দেকে তাই তো মনে হচ্চে।

—কী নাম কলি সায়েবের? —জিজ্ঞেস করলে ইশাক।

নিজের সাক্ষরতা সম্বন্ধে সচেতন বলাই যুগী আরো স্পষ্ট এবং অবিকৃতভাবে বললে, এ-শ-লি ই-ডে-ন।

ইশাক চেঁচিয়ে উঠলে, মনে পড়্যে গেচে রে বলাই। এ সায়েব আলবাৎ সেই এডেন সায়েব। সেই যে লালমোন সুমুন্দির কোন্ কুটিত্তি তিনশো গোরু খালাশ করে নে গিয়েলো, মনে আচে? তাই নে কত হ্যাংনামা হয়েলো? আর তালি ডর্ কারে বলাই? খোদ গোরাসায়েব রোবকারি জারি করেচে। ইচ্ছেদিন মানে তো নিজির মর্জ্জ্যিতো? এই দফায় এবার আসুক শালা আমিন, গোমস্তারা।

বলাই বললে, এই পরোয়ানা না পালি কি ভয় কত্তি নাকিনি?

—সে কতা কচ্চিস ক্যান?

—সাদে কচ্চি? মোন্দের সব কতা তো পাকা হয়ে গেচে। মোরা কি এই পরোয়ানার পিতিক্ষেয় বসে আচি? এ সায়েবডা ভালো, গরীবির দুক্কু তউ কিচু বোজে তাই নিজির জেলায় রোবকারি জারি করেচে। লালমোন সায়েব এডার পরোয়া করবে মনে করিস?

—সেডা অ্যাট্টা কতা বটে।

—সেইডেই আসল কতা। এডা হাতে আসায় জোর এট্টু বাড়লো, এই ঝা। মোন্দের নানাসায়েব আর তান্তিয়া টুপি ওই বিশ্বেসবাবুরা। তেনাদের সুমুকি অ্যাতো গাঁয়ের নোকে মিলে যে পিতিজ্ঞে করিচি, সেইডেই মনে রাক ইশাক। জমিতি জো আসতি নেগেচে, দুইচার দিনির মদ্দিই কুটেল সায়েবের দেশি ইশ্কারি কুকুরির পাল জমিতি দাগ মাত্তি আসবে।

—তা আর জানি নে?

—ঘরে কয়খান সুড়কি মজুত করিচিস?

—পাঁচখান। তুই?

—একখান বেশি। সে আরো নাগে বিশ্বেসবাবুরা দেবে। আগে তো অ্যাকখান্ বোনি করে নি, পরের কতা পরে।

ঘরে যে দু'চারখানা লাঠি-সড়কি মজুত হয়েছে, লক্ষ্মীমণির তাতো অজানা নয়। তবু সে প্রসঙ্গ উঠতেই তার চোখে মুখে ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠলো। বললে, কুটেলার নোকগুলোর শরীলি তো দয়া-মায়া বলে কিচু নাই। তাদের সঙ্গি নড়াই করে তোমরা পারবা?

ইশাক বললে, নড়াই না করে তো অ্যাদ্দিন পালি কুটেল সায়েবের প্যারেক মারা জুতোর নাতি খায়েচি, কুটির গুদোমে কদ হইচি আর একরার নামায় টিপ দিচি। এবার নড়াই করেই দ্যাকা যাক, কী বস্তা হয়। খোদার কসম নিচি কমলির মা, কাটে ফ্যালায় ফ্যালাক, শালা নীল আর করবো না।

দুম্-দুম্-দুম্-দুম্-দুম্-

কান খাড়া করলে ইশাক আর বলাই।

দুম্ দুম্ করে ভেসে আসছে দামামার শব্দ। আর কোনো সন্দেহ নেই। তারা আসছে।

—নাগরা বাজতেচে ইশাক।

—হু, শুনতি পাচ্চি। আজই তালি বোদায় বৌনি কত্তি হবে রে বলাই। জলদি তৈয়ের হয়ে নে, মুইও তৈয়ের হয়ে আসি।

দৌড়ে নিজের বাড়ির দিকে চলে গেল ইশাক। এ সঙ্কেত শোনার সঙ্গে সঙ্গে যার হাতের কাছে যা আছে তাই নিয়েই দৌড়ে যেতে হবে। লাঠি, সড়কি থাকলে ভালো। না থাকলে কাস্তে, কাটারি যা পাও হাতে নিতে হবে। কিছু না থাকলে কারো বাঁশের বেড়া থেকে একটা মজবুত দেখে খুঁটি উপড়ে নিয়ে যাও—মালিক কিছু বলবে না। মোটের ওপর হাতিয়ার নিয়েই ছুটে গিয়ে বাধা দিতে হবে কুঠিয়ালের চাকরদের। কান্নাকাটি নয়, হাতে-পায়ে ধরা নয়, ভীরুর মতো দাঁড়িয়ে থাকা নয়।

এ ব্যবস্থা করেছেন বিষ্টুবাবু আর দিগম্বরবাবু।

প্রত্যেকটা গ্রামের প্রান্তে যে দিক দিয়ে নীলকুঠির আমিন, গোমস্তা আর লেঠেলের দলের আসার সম্ভাবনা থাকতে পারে সেই দিকেই কোনো উঁচু গাছ বেছে নিয়ে তার মগডালে বসানো হয়েছে একটা করে দামামা। যে-ই হোক, কুঠির লোক আসতে দেখলেই সে গাছে উঠে সেটা বাজাতে থাকবে। যদি কোনো স্ত্রীলোক প্রথম দেখতে পায়, সে কাছাকাছি যে পুরুষ মানুষকে পায় তাকে খবর দেবে। শুধু নিজের গ্রামের জন্যেই নয়, পাশের গ্রাম থেকে সঙ্কেত এলেও ছুটে যেতে হবে।

ইশাক চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বলাইও ঘরে ঢুকে একখানা লাঠি আর একখানা সড়কি হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলো। গামছাখানা মাথায় জড়াতে জড়াতে বললে, আজ আর নাইয়েরে যাওয়া তোর কপালে নাই রে কমলির মা।

লক্ষ্মীমণির মুখ কাঁদো কাঁদো হয়ে উঠেছে। বললে, বাসি মুকি যাবা?

—সবই তো জানিস। সোমায় নষ্ট করার উপায় নাই।

—চোকি এট্টু জল দিয়ে এক মুট্ মুড়ি অন্তক গালে দিয়ে যাও।

দাওয়ার কোণ থেকে ঘটিটা নিয়ে চোখে মুখে একটু জলের ঝাপ্টা দিয়ে নিলে বলাই। ছুটে ঘরে গিয়ে এক কুন্কে মুড়ি নিয়ে বেরিয়ে এলো লক্ষ্মীমণি। ভেবেছিলো বলাইয়ের কোঁচড়ে বেঁধে দেবে। তা আর হল না। এক মুঠো মুড়ি মুখে দিয়ে বলাই বললে, বাকিডা রা'খে দে, ফিরে আসে খাবানে।

এর ভেতর লাঠি সড়কি নিয়ে ইশাকও এসে গেছে। দু'জনেই দৌড়ে রওনা হয়ে গেল। কপালে দু'হাত ঠেকিয়ে অস্ফুট স্বরে লক্ষ্মীমণি বললে, দুগ্গা! দুগ্গা!

উঠোনের উত্তরদিকে রাংচিতের বেড়ার ওপর তখন প্রথম সকালের লাল্চে আলো এসে লুটিয়ে পড়েছে।

চারদিক থেকে হৈ হৈ শব্দ ভেসে আসছে। একেবারে অথর্ব বুড়ো মানুষ ছাড়া আর সবাই ছুটছে। বড়ো রাস্তার দিক থেকে ভেসে আসছে বহু কণ্ঠের হাঁকডাক। যাওয়ার পথে যে যাকে পারে হাঁক দিয়ে ডেকে যাচ্ছে।

বুক কাঁপছে লক্ষ্মীমণির। বাপের বাড়ি যাওয়া নয় না-ই হল। কিন্তু কম্লির বাপ যেন ভালোয় ভালোয় ফিরে আসে।

দেখতে দেখতে কয়েকশো লোক জমায়েত হয়ে গেল অশ্বত্থতলায়। আরো লোক আসছে।

আট-দশ জন মাত্র লেঠেল সঙ্গে নিয়ে প্রতিবছরের মতো দাদন ধরাতে আসছিল কুঠির আমিন বনমালী মল্লিক। যে রায়ত ঝামেলা না করে দাদন নেবে, তার ব্যাপার মিটে গেল। যে রায়তগুলো ঝামেলা করবে, তাদের বেঁধে সোজা কুঠিতে চালান। এই হল সোজা হিসেব, সোজা নিয়ম। দাদনও নিতে হবে, নীল চাষও করতে হবে, শুধু জেদ করতে গিয়ে কয়েক দিন কুঠির গুদাম ঘরে কয়েদ থাকা আর কষ্ট পাওয়া। সেই তো নীল করতেই হবে। তবু বোকা চাষাগুলো কেন যে গোঁ ধরে।

দূর থেকে অতগুলো লোককে জড়ো হতে দেখে বনমালীর মতো ঝানু আমিনও একটু হকচকিয়ে গেল। সর্দার লেঠেল খান মামুদকে বললে, গতিক তো খুব ভালো মনে হচ্চে না রে মামুদ। ওরা অ্যাক জাগায় থুপ্ হচ্চে ক্যান?

খান মামুদ বললে, মাতা ফাটায় কবরে যাতি হাউশ হইচে আর কি! আপনি চলেন দিনি, পেচনে আমি তো আচি।

হঠাৎ অশ্বত্থতলা থেকে একটার পর একটা ক্রুদ্ধ গর্জন ভেসে আসতে লাগলো।

—দাদন নেবো না।

—জমিতি দাগ দেবা না।

নীলির চাষ করবো না।

আরো একটু ঘাবড়ে গেল বনমালী। —ওরে মামুদ, জোট বেন্ধি চ্যাঁচাচ্চে যে।

—গোটা পাস্‌সাত চান্দি ফাটায় দিলিই জোট ভাঙে পলাতি পত পাবে না। নেন, চলেন—

এগিয়ে চললো বটে দলটা, কিন্তু বনমালী তো বটেই, বাকি লেঠেলদের মনেও তখন একটু খট্‌কা লেগেছে। এ রকমটি তো কখনো দেখা যায় না। দাদন নিতে সব ব্যাটাই গাঁইগুঁই করে, জমিতে নীলের জন্যে মার্কা দিলে কেঁদে বুক ভাসায়। কিন্তু এতগুলো লোকের একসঙ্গে মিলে রুখে দাঁড়ানো কখনো দেখেনি বনমালী মল্লিক।

কুঠিতে কুঠিতে সাড়া পড়ে গেল।

শুধু একটা গ্রাম নয়, আশে-পাশে চারদিক থেকে খারাপ খবর আসছে। খান মামুদের মতো দুর্ধর্ষ লেঠেলকে জখম হয়ে কুঠিতে ফিরতে হয়েছে। আমিন বনমালী মল্লিকও রায়তদের হাতে কয়েক ঘা লাঠির বাড়ি খেয়ে এসে বিছানা নিয়েছে।

নারায়ণপুর, বড়ো খানপুর, ইল্‌শেমারি, কাঁদবিলা, খালিসপুর—সমস্ত গ্রামগুলোর রায়ত চাষীর দল জোট বেঁধে দাঁড়িয়েছে। বাগ্‌দা থানার দারোগাবাবু কুঠেলের পা-চাটা লোক, তা সবাই জানে। কুঠেল সাহেবকে সে একটু সাহায্য করতে গিয়েছিল। তারপরেই দলে দলে লোক আক্রমণ করেছে বাগ্‌দা থানা। চারিদিকে এই একটাই রব, নীল তারা আর করবে না।

কাঠগড়া কনসার্নের এক্তিয়ারে মোট ছ'টা কুঠি। চৌগাছা কুঠি তার ভেতর একটা। সেই চৌগাছা থেকেই নেটিব নিগারগণের ঔদ্ধত্য হঠাৎ এমন একটা চেহারায় দেখা দিয়েছে কেন, তা বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হল না দোর্দণ্ডপ্রতাপ ম্যানেজার মিস্টার আর. টি লারমুরের।

বিষ্ণুচরণ আর দিগম্বর!

ওই দুই বদ্‌মাশই ক্ষেপিয়ে তুলেছে প্রজাদের। অনেক আগেই লোকদুটোকে শায়েস্তা করা উচিত ছিল। সেটা না করাই হয়েছে প্রচণ্ড ভুল। বৃহত্তম নীলের কারবারী বেঙ্গল ইন্ডিগো কোম্পানীর ম্যানেজার লারমুর বেঁচে থাকতে তাঁরই অধীনে এতগুলো রায়ত একটা অরাজকতা সৃষ্টি করবে আর তিনি তার নীরব সাক্ষী হয়ে থাকবেন?

কাঠগড়া, খালবোয়ালিয়া আর রুদ্রপুর—বাকি তিনটে কনসার্নের ম্যানেজারদের তলব হল মোল্লাহাটি কুঠিতে। কাঠগড়ায় রায়তদের আচরণে যে ঔদ্ধত্য দেখা দিয়েছে, তা যেন কোনোক্রমেই আর না ছড়াতে পারে।

ক'দিন ধরে অস্থির উত্তেজনার ভেতর দিয়েই কাটছে লারমুরের। তাঁর চেহারা দেখে মিসেস লারমুর পর্যন্ত ঘাবড়ে গেছেন। ক'দিন আগেই কথা হচ্ছিল, যশোর, নদীয়া দুই জেলারই ম্যাজিস্ট্রেটকে মোল্লাহাটি কুঠিতে এনে পার্টি দেওয়ার। দাদনের সময় আসছে। কিছু ঘরবাড়ি জ্বালানো, কিছু নেটিব মেয়েছেলেকে পাচার করা, কিছু লাঠালাঠি, কিছু গুম্ খুন তো অবধারিত। তখন যাতে কাজের অসুবিধে না হয় তার জন্য আগে থেকেই কুঠিতে মাঝে মাঝে পার্টি দিতে হয়। যশোরের ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার ম্যালোনি আর জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার স্কিনারকে

নিয়ে কোনো চিন্তা নেই। তাদের একবার ডাকলেই হল। কিন্তু নদীয়ার নতুন ম্যাজিস্ট্রেট লোকটাকে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। সে যেন প্ল্যান্টারদের একটু এড়িয়েই চলে।

কিন্তু এড়িয়ে থাকতে দিলেই তো চলবে না? যেমন করে হোক গেঁথে ফেলতেই হবে। মিসেস লারমুরও বেশ ভালোভাবেই জানেন, একটা জজ, ম্যাজিস্ট্রেট কিম্বা তাদেরও ওপরওয়ালা ডিভিশনাল কমিশনারকে ঠিকমতো গেঁথে ফেলার জন্যে তাঁর দায়িত্ব কতখানি।

নদীয়া ডিভিশনের কমিশনার মিস্টার গ্রোটকে নিপুণভাবে গেথেঁছিলেন মিসেস লারমুর। ডার্লিং যে সে জন্যে তাঁর কাছে রীতিমতো কৃতজ্ঞ, তাও তিনি ভালোভাবেই জানেন।

রাতের অতিথি মিস্টার গ্রোট।

তাঁর সম্মানে শ্যাম্পেন পার্টি, বলনাচ সবই হল। একটু রাত হতেই খবর এলো বাঘডাঙা কুঠির ম্যানেজার খুব অসুস্থ। তাঁকে হয়তো মুলনাথ কুঠির হাসপাতালে এনে ভর্তি করতে হবে।

অধীনস্থ কর্মচারী অসুস্থ হয়ে পড়েছে সুতরাং মানবতার খাতিরে লারমুরকে একবার সেখানে যেতেই হয়। ঘোড়া সাজাতে বলে পিস্তল কোমরে বেঁধে খুব দুঃখের সঙ্গে মাননীয় অতিথির কাছ থেকে বিদায় নিতে হল তাঁকে। মিসেস লারমুর রইলেন সুতরাং তাঁর কোনো অসুবিধে হবে না, এ কথাটা বারবার জানালেন লারমুর।

সবই সাজানো ব্যাপার।

দুজন ঘোড়সওয়ার দেহরক্ষী নিয়ে গভীর রাতে টগ্‌বগ্‌ করে ঘোড়া ছুটিয়ে বাঘডাঙা কুঠির উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলেন লারমুর।

বলনাচের সময় মিস্টার গ্রোটকে সম্মানিত করেছিলেন মিসেস লারমুর। মাঝে মাঝে উষ্ণ বক্ষস্পর্শ নিবিড়তর করে দিয়ে ডিভিশনাল কমিশনারকে সম্মোহিত করতেও তাঁকে কোনো বেগ পেতে হয়নি।

উৎসব শেষে সহকারী ম্যানেজার হাইড, ক্যাম্পবেল হাসপাতালের ডাক্তার কর্‌ভিন সকলেই গুডনাইট জানিয়ে সস্ত্রীক বিদায় নিলেন।

চাঁদনি রাত। মোল্লাহাটি কুঠির সযত্ন সজ্জিত বিরাট প্রাসাদ। সমস্ত স্নায়ুতে শ্যাম্পেনের বিবশ করা মাদকতা। মিসেস লারমুরের মতো সতেজ যৌবনা নারীর উষ্ণ স্পর্শ। সে নারীর স্খলিত বসনা দেহের জলে ঝাঁপ দিলেন নদীয়ার ডিভিশনাল কমিশনার।

কলকাতা হ্যামিল্টন কোম্পানি থেকে পাঁচ হাজার টাকা দামের একটা হীরের আংটি আনিয়ে সহধর্মিণীকে উপহার দিয়েছিলেন লারমুর। স্ত্রীর কাছে তাঁর কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

কুঠিতে যে ক'জন শ্বেতাঙ্গিনী আছে তার ভেতর হাইডের স্ত্রী প্যাট্রিসিয়া বয়েসে যেমন সবচেয়ে কম, রূপের জৌলুসও তার সবচেয়ে বেশি। যশোরের ম্যাজিস্ট্রেট ম্যালোনিকে গেঁথে তোলার দায়িত্ব তার ওপরে পড়েছিল। কিন্তু কমিশনারের ক্ষেত্রে মিসেস লারমুরকেই এগিয়ে আসতে হয়েছে। কারণ, পদমর্যাদা আর আভিজাত্যের প্রশ্ন আছে।

স্বামীকে মনে মনে প্রচণ্ড ভয় পান মিসেস লারমুর। কথায় কথায় যে শ্যামচাঁদের একটা বাড়িতে নেটিব পুরুষগুলোকে অজ্ঞান করে ফেলতে পারেন তিনি, সেই শ্যামচাঁদ কখনো তাঁর স্ত্রীর গায়ে এসে পড়াও বিচিত্র নয়। অবাধ্যতা নামক জিনিসটা একেবারেই সহ্য করতে পারেন না লারমুর। চামড়া দিয়ে মোড়া বেতের সেই চাবুকের নাম তিনি নিজেই দিয়েছিলেন। কখনো বলেন শ্যাম্‌চান্দ্‌, কখনো বলেন, রামকান্ত্‌!

ভয়, ঘৃণা আর মোহ মিলিয়ে স্বামী সম্বন্ধে একটা বিচিত্র অনুভূতি মিসেস লারমুরের মনে। লোকটার আসুরিক নৃশংসতার জন্যেই ভয়। নীলের উপার্জন বাড়ানোর জন্যে দরকার হলে নিজের স্ত্রীকেও লোকটা এক গুলিতে খতম করে ইছামতীর জলে ছুঁড়ে ফেলতে পারে। ঘৃণার উৎস অন্য। আকাঙ্ক্ষা কিছুতেই মেটে না লোকটার। বিছানায় স্বামীকে ক'টা দিন পান মিসেস লারমুর? শুধু নেটিব মেয়ে আর নেটিব মেয়ে! এক একদিন ইচ্ছে করে ওর ওই রামকান্ত দিয়ে

কয়েক ঘা মেরে লোকটাকে বেহুঁশ করে লাথি মেরে ঘর থেকে বের করে দেন। কিন্তু কথাটা ভাবতেই কাঁপুনি লাগে বুকের ভেতর। অত সাহস তাঁর বুকে নেই।

আর মোহ?

বিলাস-ব্যসনের অফুরন্ত সমারোহ মুলনাথ কুঠিতে। আলিপুরের বেলভিডিয়ারে লেপ্টেন্যান্ট গবর্নরের বিবিরও বোধহয় এত বিলাসের উপকরণ নেই। স্বামী তাঁকে কাজে লাগিয়ে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করে। মনে মনে তাতে খুশি মিসেস লারমুর। তবু তো মুখ বদলের একটু সুযোগ জোটে। কিছুটা বা চরিতার্থ হয় প্রতিশোধ স্পৃহা। নেটিব মেয়েগুলোকে এনে নিজের খেয়ালখুশি মতো ফূর্তি করবে স্বামী, আর তারই স্ত্রী একা বিছানায় রাত কাটাবে?

কৃষ্ণনগরের নতুন ম্যাজিস্ট্রেট লোকটা নাকি সেই অ্যাশলি ইডেনের মতো একটা বেয়াড়া। তাকে একবার কুঠিতে এনে দিক ডার্লিং, তারপর দেখা যাবে, কতক্ষণ সে বেয়াড়া থাকে।

এত সাফল্যের ভেতরেও একটা মাত্র ব্যর্থতার জ্বালা ভুলতে পারেননি লারমুর। সেটাও ভালোভাবেই জানেন মিসেস লারমুর।

ইডেনকে ফাঁদে ফেলার অনেক চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু ধূর্ত সিবিলিয়ানটা কোনোমতেই ফাঁদে পা দেয়নি। নিজে শ্বেতাঙ্গ হয়ে স্বজাতের পেছনে লেগে উজবুকটা কী আনন্দ যে পায়, তা সেই জানে! বারাসতে গিয়ে সেখানেও নীলকরদের বিরুদ্ধে নেটিব নিগারগুলোকে সে ক্ষেপিয়ে তুলেছে।

কয়েকজন নেটিব রায়ত নাকি তাঁর কাছে নালিশ জানিয়েছিল, নীলকরেরা জোর করে তাদের জমিতে নীলচাষ করবে বলে তোড়জোর করছে। জোর তো করতে হবেই। ঘাড়ে ধরে বাধ্য না করলে একটা নিগারও কি নীলচাষ করবে? দয়া উথলে উঠলো নেটিব-দরদী বুকে। সঙ্গে সঙ্গে জারী হল পরোয়ানা। পুলিস পাঠানো হল নেটিবদের জমি পাহারা দিতে। শুধু সেইটুকু করেই থামেনি লোকটা। পরোয়ানার বাঙলা তর্জমা করিয়ে সরকারি খরচে হাজার হাজার নকল ছেপে চারদিকে ছড়িয়ে দিয়েছে যাতে নেটিবগুলো বুঝতে পারে। আর রায়তগুলোও পেয়ে বসেছে। তাদের হাতে হাতে ঘুরছে সরকারি পরোয়ানার নকল। তবু ইডেনের ভাগ্য ভালো যে সে এখন নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট নয়। তা যদি হত তাহলে তার কপালে বিপদ ছিল! সোজা পথে ধরা না দিলে মিস্টার লারমুরকে হয়তো বাঁকা পথই নিতে হত। সে বাঁকা পথটা যে কতখানি বাঁকা হতে পারে তার কিছুটা অনুমান করতে পারেন বৈ কি মিসেস লরমুর।

মোল্লাহাটি কুঠিতে গোপন বৈঠক বসেছে।

সমস্ত কনসার্ন এবং কুঠির ম্যানেজারদেরঃ ডাকা হয়েছে। কাঠগড়ার ঘটনা একটা ইঙ্গিত। হয়তা পরিস্থিতি আরো ঘোরালো হয়ে উঠতে পারে। প্রত্যেক কুঠির ম্যানেজারের মুখে তার এলাকার অবস্থা জেনে নিয়ে পরবর্তী কর্মপন্থা ঠিক করবেন লারমুর।

প্রায় সব ক'জনের মুখ থেকেই জানা গেল, গত চাষের সময় থেকেই একটা চাপা গুঞ্জন চলছে। তারপর আবার মিউটিনি ঘটে যাওয়ায় নেটিব রায়তগুলো যেন আগের চেয়ে আর একটু বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। এই সময়েই একটা ব্যবস্থা না নিলে অবস্থা আয়ত্তে রাখা যাবে না।

—কঠোর নয়, কঠোরতম।

দাঁতে দাঁত চেপে বললেন লারমুর। তারপর দ্রুত পায়চারি।

উত্তেজিত মুহূর্তে দ্রুত পায়চারি করা তাঁর অভ্যেস। পায়চারি করতে করতে এক সময় তিনি থমকে দাঁড়ান। তার আগে কোনো কথার উত্তর দেওয়া অথবা কোনো কথা জিজ্ঞেস করা সমান অপরাধ। হাইড আর ক্যাম্পবেল তো বটেই, অন্যান্য কুঠির প্রত্যেক ম্যানেজারও ভালো করেই তা জানে। জেনারেল ম্যানেজারের উত্তেজিত পায়চারির মুহূর্তে কোনো কথা জিজ্ঞেস করতে গিয়ে প্রায় প্রত্যেককেই একবার না একবার কড়া ধমক খেতে হয়েছে।

উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম সমস্ত দিক থেকেই এমন সব সঙ্কেত পাওয়া যাচ্ছে, যা লারমুরের

মতো জবরদস্ত মানুষকেও ভেতরে ভেতরে বিচলিত করে তুলেছে। কেবল চৌগাছা নয়, গোটা নদীয়া ডিভিশন। গোটা বিজলিয়া ডিভিশন।

পায়চারি করতে করতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন লারমুর। সংগে সংগে সুযোগ পেয়েই ক্যাম্পবেল বললেন, আপনার প্রস্তাব আমি সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করি মিস্টার লারমুর। এখন মনে হচ্ছে বদ্‌মাশ রাইয়তগুলোর ওপর বেশি দয়া-দাক্ষিণ্য দেখানো আমাদের ভুল হয়েছে।

হাইড বললে, ওই স্কাউণ্ড্রেল বিস্টোচার্ন আর ডিগাম্বার দু'জনেই নাকি কুঠির দেওয়ান ছিল। চাকরি ছেড়ে দিয়ে এখন প্ল্যান্টারদের বিরুদ্ধে নেমকহারামি শুরু করেছে। ও দুটোকে গুম করে দিলেই তো ঝামেলা চুকে যায়।

—ইডিয়ট্! ও দুটো বদমাশকে এত সহজে ধরা যাবে ভেবেছো? আর, ওদের গুম্ করলেই সমস্যা মিটে যাবে? শুধু ওরা নয়, আরো ক'জন বদ্‌মাশ জমিদার আমাদের পেছনে লেগেছে। আমাদের বলতে শুধু বেঙ্গল ইণ্ডিগো কোম্পানিই নয়, সমস্ত য়ুরোপীয়ান প্ল্যান্টারদের কথাই আমি বলছি। এই বদমাশ নেটিব জমিদারগুলোর ভেতর নড়াইলের রামরতন রায় আর ঝাউদিয়ার করম আলি চৌধুরি সবচেয়ে বেশি শয়তান।

ক্যাম্পবেল বললে, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এই দুই শয়তানের জমিদারির ভেতর আমাদের কনসার্নগুলোর তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো কারবার নেই।

মেঝের ওপর প্রচণ্ড জোরে একটা লাথি মারলেন লারমুর। —থামো! এই বুদ্ধি নিয়ে প্লান্টারের চাকরি করতে এসেছ? পাশের বাড়িতে আগুন লাগলে তুমি কি নিশ্চিন্তে নিজের ঘরে বসে থাকবে? এটুকু খেয়াল নেই যে, সে আগুন তোমার বাড়িকেও পুড়িয়ে ছাই করে দিতে পারে।

একেবারে খোদ মোল্লাহাটি কুঠির সহকারী ম্যানেজার হয়েও অনান্য কুঠির ম্যানেজারদের সামনে ধমক খেয়ে হাইড আগেই চুপ্‌সে গিয়েছিল, ক্যাম্পবেলও চুপসে গেল।

তাঁদের অবস্থা বোধহয় কিছুটা বুঝতে পারলেন লারমুর। নিজের অস্থিরতা একটু সংযত করে উপস্থিত সবাইয়ের দিকে একবার চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলতে লাগলেন, আমাদের নিজেদের কনসার্নগুলোর স্বার্থ সবচেয়ে আগে দেখতে হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই; কিন্তু দরকার মতো ছোটো ছোটো কনসার্নের পাশে যদি আমরা না দাঁড়াই তাহলে য়ুরোপীয় স্বার্থকেই অবহেলা করা হবে। আশা করি, এ ব্যাপারে সবাই আমার সংগে একমত।

সমস্বরে সমর্থন জানালে সবাই।

লারমুর আবার বলতে লাগলেন, এখানে যারা উপস্থিত, তারা সবাই অভিজ্ঞ। তবু একটা ব্যাপারে আমি বিশেষভাবেই সবাইয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। খুব সহজ একটা হিসেব। কোন্ সুবিধের জন্যে আমরা নিজ-আবাদের চেয়ে রাইয়তী আবাদ বেশি পছন্দ করি, তা কারো অজানা নয়। কুঠির নিজ আবাদের জন্যে পুঁজি অনেক বেশি লাগে, ঝুঁকিও অনেক বেশি। ধরা যাক, দশ হাজার বিঘে জমিতে নীলচাষ করতে নিজ আবাদে আড়াই লাখ টাকা খরচ করতে হয়, সেখানে রায়তী জমিতে আবাদ করতে আমাদের খরচ মাত্র বিশ হাজার টাকা। বিঘে প্রতি দু'টাকা-দাদন—দশ হাজার বিঘেতে বিশ হাজার—ব্যস্। কোন ঝুঁকি নেই, মজুর খাটানোর হাংগামা নেই, সময় মতো হাজার হাজার গোছা নীলগাছ এসে যাবে কুঠির নীলখোলায়। এতবড়ো একটা সুবিধেকে কোনো শর্তেই আমরা হাতছাড়া করতে পারি না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, আমাদের শত্রুর সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। রাইয়তগুলোর জন্যে আমি চিন্তা করি না। ওরা কেন দাদন নিতে চায় না, তাও যেমন আমরা জানি, তেমনি আমাদের কেন দাদনী জমির ওপর দিয়েই কাজ হাসিল করতে হয়, তাও আমরা সবাই জানি। আলাদাভাবে ওই নেংটি পরা রাইয়তগুলো আমাদের কাছে কোনো ভয়েরই কারণ নয়, কিন্তু ওরা জোট বাঁধলেই ভয়ের কারণ আছে। সেইজন্যেই এখন থেকে আমাদের প্রধান লক্ষ্য হবে, ওরা যেন জোট বাঁধতে না পারে।

ইলশামারি কুঠির ফ্লেমিঙ্ বললে, আমিও বাস্তবে সেটা গভীরভাবে অনুভব করছি মিস্টার লারমুর। আমার অঞ্চলের রাইয়তেরা সেদিন যে দল বেঁধে বাগদা থানা আক্রমণ করেছিল, তার পেছনে ওই দুই বিশ্বাসের যথেষ্ট হাত আছে বলে আমি শুনেছি।

—আপনি ঠিকই শুনেছেন মিস্টার ফ্লেমিঙ্। ও দুটো জানোয়ারকে কেমন করে শায়েস্তা করতে হবে, সে দায়িত্ব আমার ওপরেই থাক। কিন্তু ওরা দুটো ছাড়া আর একটা উঠতি দুশমনের খবর আমার কাছে এসেছে। তার নাম শিশির কুমার ঘোষ।

—সে কে? কোন্ এলাকার?—প্রশ্ন করলে ফ্লেমিঙ।

—একটা ছোকরা। যশোরের একটা নেটিব উকিলের ছেলে।

—ছোকরা!

সবিস্ময়ে সবাই তাকালে লারমুরের দিকে। লারমুরের মতো দোর্দণ্ডপ্রতাপ মানুষ একটা ছোকরাকে নিজের মুখে দুশমন বলে উল্লেখ করছেন।

সবাইয়ের বিস্মিত দৃষ্টির ওপর দিয়ে একবার চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে লারমুর বললেন, এখনো আমার এলাকায় সম্ভবত পা দেয়নি ছোকরা, কিন্তু তার বাড়ির ধারে কাছে সমস্ত য়ুরোপীয় প্ল্যান্টারের বিরুদ্ধে যে রাইয়ত ক্ষ্যাপানোর কাজ শুরু করে দিয়েছে, সে খবর আমি পেয়েছি। তবে আপাতত তাকে নিয়ে আমি বিশেষ ভাবছি না। আগে ওই জোড়া শয়তান বিশ্বাস দুটোকে খতম করে নিই, তারপর দরকার হ'লে সামান্য একটা ছোকরাকে পিঁপড়ের মতো টিপে মারতে খুব বেশি সময় লাগবে না।

—আমি একটা কথা বলবো মিস্টার লারমুর?—বললে লোকনাথপুর কুঠির ডেভিস সাহেব।

—বলুন।

আমাদের ওদিকে মিশনারিরা অনেকেই আমাদের বিপক্ষে।

—জানি। তারা মনে করে, আমরা নাকি তাঁদের ক্রীশ্চানধর্ম প্রচারে বাধা হয়ে উঠেছি।

—ঠিক তাই। আমার বিশ্বাস, তাদেরও কেউ কেউ রাইয়তগুলোকে ক্ষ্যাপাচ্ছে।

—অসম্ভব কিছু নয়; তবে এইটুকু জেনে রাখুন মিস্টার ডেভিস, তারা ক্রীশ্চান রাইয়তগুলোর জন্যেই মাথা ঘামিয়ে থাকেন। কিন্তু আমাদের কাছে নেটিব রাইয়ত রাইয়তই। তাদের কে ক্রীশ্চান, কে মুসলমান আর কে হিন্দু, তা বিচার করবার ফুরসৎ আমাদের নেই এবং তার দরকারও নেই। আমাদের সোজা কথা, নীল আমাদের চাই-ই। তার জন্যে আমাদেরও যা করবার তা আমরা করবো। কুঠিতে কুঠিতে লাঠিয়ালের সংখ্যা আরো বাড়ানো দরকার। নীল আমাদের পেতেই হবে সুতরাং তার জন্যে যেটুকু করা দরকার, তাও আমাদের করতে হবে। আপনারা যে যার এলাকায় গিয়ে প্রথমেই এমন ব্যবস্থা নিন যাতে জোট বাঁধতেই রাইয়তগুলো ভয় পায়। অ্যাশলি ইডেনের মতো বেয়াড়া সিবিলিয়ান আর যদি কেউ থাকে, তারাও দেখুক, প্ল্যান্টারেরা তাদের মতো কয়েকটা নেংটি ইঁদুরকে পরোয়া করে না।

॥ নয় ॥

আগুন! আগুন!

গভীর রাতে চৌগাছা গ্রামের চারিদিক থেকে আর্ত কোলাহল উঠলো। সেই সঙ্গে বহু নারীকণ্ঠের আর্তনাদ, বাঁচাও! বাঁচাও! শিশুকণ্ঠের কান্না, বৃদ্ধের ভয়ার্ত চিৎকার মিলে মিশে একাকার হ'য়ে গেল। সেই আর্তনাদের সমস্ত শব্দকে ছাপিয়ে উঠ্‌লো হাজার লেঠেলের পৈশাচিক উল্লাসের ধ্বনি। কৃষ্ণা চতুর্দশী রাতের অন্ধকারকে ভেদ ক'রে আকাশের দিকে শত শত ফণা মেলছে আগুনের শিখা। দাউ দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠেছে গ্রামপ্রান্তের খ'ড়ো ঘরগুলো। আগুনের লাল আভায় ভ'রে উঠেছে গেচৌগাছা গ্রামের আকাশ। মানুষের ভয়ার্ত রবের সঙ্গে চারদিক থেকে শোনা যাচ্ছে গোরু-ছাগলের আর্ত রব। উচ্চকিত হ'য়ে উঠেছে আকাশ-বাতাস।

হাজার লেঠেল নিয়ে গ্রাম আক্রমণ ক'রেছে লারমুরের সেনাপতি হাইড আর ক্যাম্পবেল। তারা রয়েছে একটু দূরে ঘোড়ার পিঠে, হাতে বন্দুক, কোমরে পিস্তল। লেঠেলরা ঝাঁপিয়ে প'ড়েছে ঘুমন্ত গ্রামের ওপর। চারিদিক থেকে গ্রামটাকে ঘিরে ফেলেছে তারা। গ্রামপ্রান্তের খ'ড়ো ঘরগুলোয় আগে আগুন লাগাতে আরম্ভ ক'রেছে। তারপর ভেতরদিকে এগিয়ে আসছে। লক্ষ্য বিষ্ণুচরণ আর দিগম্বর বিশ্বাসের বাড়ি। লালমোন সাহেব ব'লেছেন, ওই দুই বিশ্বাসকে যারা জ্যান্ত ধ'রে আনতে পারবে তাদের প্রত্যেকে দশটাকা ক'রে ইনাম পাবে। যে যা লুঠ ক'রতে পারবে সব তার। সোনাদানা, কাপড়চোপড়, ঘটিবাটি—কোনো কিছুই কুঠিতে জমা দিতে হবে না। শুধুমাত্র রূপসী যুবতী পেলে তাদের জমা দিতে হবে কুঠিতে।

কাঠগড়া সদর কুঠির সর্দার লেঠেল খান মামুদের ওপর পুরো দায়িত্ব। সাহেবের হুকুম, একসঙ্গে হাজার লেঠেল নিয়ে চড়াও হ'তে হবে চৌগাছায়। কয়েকদিন ধ'রে তার প্রস্তুতি চলেছে। কুঠির লাঠিয়ালদের সবাইকে একসঙ্গে কুঠিছাড়া করা যেতে পারে না, কারণ সেই সুযোগে রায়তগুলো হয়তো কুঠি আক্রমণ ক'রে ব'সতে পারে। সেইজন্যেই ভাড়াটে লেঠেল জোগাড় ক'রতে হ'য়েছে। খান মামুদও একসময় জেল-খাটা দাগী আসামী ছিল। এত্তেলা পাঠিয়ে চারদিক থেকে জেলফেরত দাগী আসামী লেঠেল জোগাড় ক'রতে তাকে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। নীলকুঠির বাঙালি লেঠেলদের ভেতরে বেশির ভাগই দাগী। বাকি লেঠেলরা ভোজপুরী। সব কুঠিতেই কিছু কিছু লেঠেল মজুত রেখে তার ওপরেও হাজারখানেক লেঠেল জোগাড় ক'রতে হ'য়েছে। চৌগাছায় একটা প্রচণ্ড ভয়ঙ্কর সন্ত্রাস সৃষ্টি ক'রতে না পারলে রায়তী নীল চাষ হয়তো বন্ধই হ'য়ে যাবে। লারমুর সাহেব তাই খরচে কার্পণ্য করেননি। অবাধ্য রায়তগুলোকে বাধ্য ক'রতেই হবে!

আগুনের শিখা ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে।

খ'ড়ো চাল থেকে বাঁশঝাড়ে, গোয়াল ঘর থেকে ধানের গোলায়, বাড়ির পাশের ভাট আসশ্যাওড়ার জঙ্গল থেকে সজনে, শিমুল, কদম, কাঁটাল, বেল, সুপুরি—সব গাছই দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠেছে। মাঝে মাঝে ভেসে আসছে বাঁশ ফাটার শব্দ। খুঁটি আর চালের বাতার শুকনো বাঁশের গাঁটগুলো ফাটছে ফট্‌ফট্‌ ক'রে।

একদিকে আগুন অন্যদিকে লুঠ। ঘটি-বাটি, ঘড়া-গাড়ু, থালা-গেলাস সব। গোয়ালের কিছু গোরু আগুন দেখে মরীয়া হ'য়ে দড়ি ছিঁড়ে পালিয়েছে, কিছু গোরু তা পারেনি। মাথার ওপরে দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে গোয়াল ঘরের খ'ড়ো চাল। তার নীচে ছট্‌ফট্‌ ক'রতে ক'রতে করুণ হাম্বা রবে আর্তনাদ ক'রছে। ছাগলগুলো করুণভাবে ব্যা ব্যা ক'রছে। বন্ধ-দরজা খোঁয়াড়ের ভেতর প্রাণপণে চিৎকার করছে হাঁস আর মুরগিগুলো।

কোথাও জ্বলন্ত খড়ের চাল পুড়তে পুড়তে ভেঙে প'ড়ে গেল, কোথাও চালাঘরের আগুন তখন ছুঁয়েছে লাগোয়া গাছের পাতাগুলোকে। ভয়ার্ত কাক, শালিক, ছাতারে আর ভীমরাজের দল যেদিকে আগুন নেই, সেদিকে উড়ে পালাচ্ছে। তাদের বিপন্ন আর্তনাদে বাতাস বিপর্যস্ত।

যাকে সামনে পাচ্ছে তাকেই লাঠির ঘায়ে মাটিতে শুইয়ে দিচ্ছে লাঠিয়ালের দল। খান মামুদের হুকুম, এক সুমুন্দিরেও ছাড়বি না, তা সে মন্দাই হোক আর মাগীই হোক।

গাঁয়ের মাঝামাঝি জায়গায় একটা আটচালার পাশে বিরাট দুটো তেঁতুল গাছে একপাল হনুমানের বহুদিনের আস্তানা। চারিদিকে আগুন আর হৈহৈ দেখে শুনে তারাও হুপ হুপ ক'রে গাছ থেকে নেমে প'ড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে ছুটছিলো। গাছে গাছে পেরিয়ে যাওয়ার উপায় নেই, কারণ চারিদিকে গাছগুলোও জ্বলে উঠেছে। একটা মাদী হনুমান তার, আট-দশদিন বয়সের বাচ্চাটাকে বুকে জাপটে নিয়ে পালাচ্ছিল। বাচ্চাটা তার মায়ের বুক জাপটে ধ'রে ঝুলছে। সেই অবস্থাতেই তার পিঠের ওপর প'ড়লো এক লাঠির ঘা। ছিটকে প'ড়ে গেল বাচ্চা হনুমানটা। তার নরম হাতের পাতা দু'টো থেৎ'লে গেছে: সে হাতে মাকে সে আর জড়িয়ে ধ'রে থাকতে

পারেনি। আর এক লাঠির ঘা প'ড়লো, বাচ্চাটার ওপর। থর্ থর্ ক'রে একটু কে'পেই সেখানে মুখ থুবড়ে প'ড়ে রইলো সেটা। পিঠে প্রচণ্ড আঘাত নিয়ে তার মা একটু দূরে ব'সে মরা বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর কাছেই একটা জিয়ল গাছের ডালে উঠে ব'সলে। তার মৃত্যুভয় তখন ক'মে গেছে।

কাছেই ছিল হিন্দুস্তানী লেঠেল রামভজন। সে তখন এক বুড়ির কোমরে লাঠি মেরে তাকে মাটিতে শুইয়ে ফেলেছে। বুড়ি যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে। হনুমানের বাচ্চাকে মেরে ফেলতে দেখে সে চিৎকার ক'রে উঠলে, হায় রামজী, ক্যা কিয়া! হনুমানজীকো কাহে মারা? বহুৎ গুণা লাগেগা ভেইয়া, বহুৎ পাপ লাগেগা! শালা রাইয়ৎলোগোঁকো মারনেকা হুকুম হ্যায় তো ওহি করো!

হনুমানের বাচ্চাটাকে মেরেছে পিঁপড়েগাছি কুঠির রাসু লেঠেল। সংগে সংগে সে খে'কিয়ে উঠ্‌লে, ছুপ যা শালা ছাতু! মোর ঝারে মন চায় ঠ্যাঙাবো, তাতে তোর বাপের কী রে শালা? এ-গাঁয়ের পিপড়েডো তাবাদি মোদ্দের সায়েবের শত্তুর! শালারা দাদন নে' নীল করবে না?

ঠিক সেই সময়েই একটা সড়কি এসে বি'ধলো রাসুর পায়ের গোছায়। চিৎকার ক'রে উঠে সে মাটিতে ব'সে প'ড়লে। সড়কির ফলা এফোঁড়-ওফোঁড় হ'য়ে গেছে, গল্‌গল ক'রে রক্ত ঝরছে। সেই ফাঁকে ঝুপ ক'রে লাফ দিয়ে গাছ থেকে নেমে এসে মরা বাচ্চাকে বুকে তুলে নিয়ে নিমেষের ভেতর জঙ্গলের অন্ধকারে মিশে গেল মাদী হনুমানটা। রামভজন তার উদ্দেশে কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম জানিয়ে সভয়ে চারদিকে তাকাচ্ছে, এমন সময় আর একটা সড়কি এসে বি'ধলো তার পাঁজরে। হায় রামজী বলে বিকট আর্তনাদ ক'রে সে-ও মাটিতে প'ড়ে গেল। নিমেষের ভেতর জঙ্গলের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো পাঁচ ছ'টি লোক। তাদের প্রত্যেকের হাতে লাঠি, সড়কি। আহত লেঠেল দুজনকে তুলে নিয়ে তারাও নিমেষের ভেতর অন্ধকার ঝোপঝাড়ের আড়ালে মিলিয়ে গেল।

সময় মতোই নাগরা বেজেছিল।

কুঠির দিক থেকে যে পথটা এসে গাঁয়ে ঢুকেছে, সেই পথের একটু পুবে একটা উ'চু আমগাছের ওপরে বাঁধা রয়েছে নাগরা। রাত জেগে পাহারা দেবার জন্যে চওড়া একটা দোডালায় মাচাও বে'ধে রাখা হয়েছে। গাঁয়ের ওপর যে কোনো সময়েই কুঠির লেঠেলরা ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, তা আঁচ ক'রেই সব ব্যবস্থা ক'রে রেখেছে বিষ্ণুচরণ আর দিগম্বর। গাঁয়ের ভেতর রাত জেগে পাহারা দেয় জোয়ান ছোকরার দল আর নাগরার কাছে বসে কুঠির রাস্তা পাহারা দেবার দায়িত্ব পড়ে এক-একদিন এক-একজনের ওপর।

সেদিন নাগরার কাছে গাছের মাচায় ব'সে পাহারা দেবার ভার প'ড়েছে নমো-পাড়ার ছকু ঢালীর ওপর। মাথার ওপর দিগন্ত পর্যন্ত কালো আকাশে তারা ঝিক্‌মিক্ ক'রছে। অন্ধকারে নজর চলে না। ছকুর বৌ ভরা পোয়াতি। আজ কালের ভেতরেই হয়তো আঁতুড় ঘরে যেতে হবে, এমন অবস্থা। যদিও বুড়ি দাই, তিন্নি মাসিকে বলা আছে, তবুও দুর্গামণির কথা ভেবে মাঝে মাঝে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল ছকু।

যত অন্যমনস্কই হোক, নজর রাখতে কোনো গলতি করেনি ছকু। অন্ধকারে মিশে কতগুলো কালো কালো ছায়ার মতো একদল মানুষ কুঠির রাস্তা দিয়ে গাঁয়ের দিকে এগিয়ে আসছে দেখেই সে নাগরায় কাঠি দিয়েছে। অন্ধকার নিস্তব্ধ গ্রামের হাওয়ায় প্রতিধ্বনিত হ'য়ে মুহূর্তের ভেতর সেই গম্ভীর দুম্ দুম্ শব্দ পে'ছে গেছে চৌগাছার ঘরে ঘরে। যারা গাঁয়ের পাহারায় ছিল, তারা সংগে সংগে সতর্ক হ'য়ে গেছে। যারা ঘুমোচ্ছিল, তারাও জেগে উঠেছে। লাঠি, সড়কি, কাটারি হাতে নিয়ে বেরিয়ে প'ড়েছে পুরুষেরা। মেয়েরা ছুটেছে দুই বিশ্বাসবাবুর কোঠাবাড়ির দিকে। সেই রকম-ই ব্যবস্থা করা আছে। সেখানে মোতায়েন হ'য়ে যাবে জোয়ান ছোকরাদের একটা দল। ঘর-বাড়ি যায় যাক, কুঠির লেঠেলদের হাতে মেয়েদের ইজ্জৎ যেন না যায়!

সব ব্যবস্থাই করা আছে কিন্তু একটা জায়গায় ভুল হ'য়েছে বিশ্বাসদের। লারমুর সাহেব যে

একসঙ্গে হাজার লেঠেল পাঠিয়ে গ্রাম আক্রমণ করবার ফন্দি এ'টেছে, এইটেই তারা আগে বুঝতে পারেনি। শুধু তাই নয়, আক্রমণের ধাঁচটাও পাল্টে ফেলেছে লারমুর। কুঠির রাস্তা দিয়ে বড়োজোর শ'খানেক লেঠেল এসেছে। বাকি সবাই কয়েকটা দলে ভাগ হ'য়ে মাঠ-পাথার ভেঙে চারদিক থেকে এগিয়ে এসে ঘিরে ফেলেছে গ্রাম। মশাল জেবলেছে তারা একেবারে গ্রামের সীমানায় এসে। তাই পাহারাদার দলও আগে কিছু বুঝতে পারেনি।

চারিদিকে আগুন, বীভৎস পৈশাচিক উল্লাস আর মর্মান্তিক আর্তনাদ। হাতে লাঠি সড়কি থাকলেও পুরুষেরা বুঝতে পারছে না, কে কোথায় কোন্ দিকে গিয়ে নিজেদের গাঁয়ের লড়িয়েদের সঙ্গে মিশবে! মেয়েরা বুঝতে পারছে না, কোন্ পথে বিশ্বাসবাড়ির দিকে ছুটবে! যেদিকে নজর চলে সেদিকেই আগুন, যে পথে পালাতে যাবে সেই পথেই লেঠেলদের চিৎকার!

ভরা পোয়াতি দুর্গামণি ছুট্‌তে পারছিল না। প্রাণপণ শক্তিতে জোরে হাঁটার চেষ্টা ক'রছে কিন্তু দু'পা এগিয়েই হাঁপিয়ে প'ড়ছে। কিছুটা নিকষ কালো অন্ধকার, কিছুটা আবার ঘরপোড়া আগুনের আলো। জোরে হাঁটতে গিয়ে দম বন্ধ হ'য়ে আসছে। কোন্‌দিকে হাঁটছে তাও খেয়াল নেই তার। এ অবস্থায় বিশ্বাস-বাড়ি পর্যন্ত ঠিকমতো গিয়ে পেঁছিতে পারবে কিনা, তাও সে বুঝতে পারছে না। গল্ গল্ ক'রে ঘাম ঝরছে সারা দেহে। পেটের ভেতর যেটা আছে, সেটাও যেন বড়ো বেশি নড়াচড়া ক'রছে! আর কয়েক পা এগিয়ে যেতে পারলেই কাঞ্চন মোল্লার বাড়ির পেছনের কাঁটাঝোপ। কাঁটাগাছের কাছে নিশ্চয়ই কোনো লেঠেল এগোবে না। কানে ভেসে আসছে লেঠেলদের বীভৎস চিৎকার। আরো জোরে পা চালাতে চেষ্টা ক'রলে দুর্গামণি! কিন্তু পা আর চ'লছে না! সারা শরীর থর্ থর্ ক'রে কাঁপছে। ক'টা লেঠেলও এদিকে ছুটে আসছে। আর বোধহয় রক্ষে পাওয়া যাবে না।

আর একটু পথ! আর একটুখানি—

কয়েক পা এগিয়ে বাঁদিকের সুঁড়ি পথটা ধ'রলেই কাঞ্চন মোল্লার বাড়ির পেছনে লুকিয়ে পড়া যাবে!

রাস্তা দিয়ে একটা আগুনের হল্কা ছুটে আসছে। সেই সঙ্গে একটা কমলে বাছুরের কাঁচ গলায় করুণ আর্তনাদ—হাম্বা—হাম্বা—

দেখতে দেখতে বাছুরটা দুর্গামণির কাছে এসে পড়লো। তার পিঠে জ্বলন্ত চালের বাতার একটা ভেঙে-পড়া টুক্‌রো। কোণাচে টুকরোটা তার পিঠের ওপর সেঁটে ব'সেছে। জ্ব'লছে তার গলায় বাঁধা দাঁড়টা। সে যত দৌড়াচ্ছে, বাতাস পেয়ে আগুন ততই দাউ দাউ ক'রে জ্ব'লছে। বাছুরটা ছুটে চ'লে গেল। তার কাঁচ গলার মর্মভেদী হাম্বা হাম্বা ডাক যেন দুর্গামণির কানে বি'ধে রইলো। শিউরে উঠে কয়েক মুহূর্ত সে পা চালাতেও ভুলে গিয়েছিল। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে যখন সে এগোতে যাচ্ছে তখন সামনের পথ বন্ধ। মশাল আর লাঠি হাতে অন্তত দশজন লেঠেল তার সামনে এসে প'ড়েছে।

উৎকট চিৎকার ক'রে তাকে ঘিরে ধরলে লেঠেলের দল। একটা লেঠেল চেঁচিয়ে উঠ্‌লে, বহুৎ খুবসুরৎ বা! কোঠিমে লে চল হো, ইনাম মিল্ যায়ব!

গলা দিয়ে স্বর বেরোচ্ছে না। তবু মরীয়ার মতো প্রাণপণ চেষ্টায় ভাঙাগলায় দুর্গামণি মোরে মেরো নি গো, মুই পোয়াতি।

চেঁচিয়ে উঠ্‌লে আর একজন লেঠেল, প্যাট বে'ধয়ে ব'সে আচিস মাগী? শালী, তোন্দের মরদগুলো মাগের প্যাট কত্তিতো ভারী ওস্তাদ, খালি নীল করার কতা কলিই ঝ্যাতো হ্যাংনামা? এই নে তোর প্যাট—

সজোরে দুর্গামণির তলপেটে একটা লাথি মারলে লেঠেলটা। একটা মাত্র গোঙানির শব্দ বেরোলো দুর্গামণির গলা দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে সে ছিটকে পড়লো রাস্তার পাশে শিষআপাঙের ঝোপের ওপর।

সারা গ্রামই প্রায় দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে।

যারা লাঠি সড়কি নিয়ে লেঠেলদের মুখোমুখি হ'য়েছিল, তাদের বেশির ভাগই আহত হ'য়ে পিছু হ'টেছে। তাদের প্রস্তুতি পর্যাপ্ত ছিল না। রাতের অন্ধকারে এক হাজার লেঠেলের মহড়া নেওয়ার মতো শক্তি কোথায়?

উচ্চকিত কৃষ্ণা চতুর্দশীর রাতে হাইড আর ক্যাম্পবেলের মুখে হাসি আর ধরে না। দু'টো তেজি ওয়েলার ঘোড়ায় চেপে তারা গ্রাম-সীমানার বাইরে ছুটোছুটি ক'রছে। সব দিকই তদারক করা দরকার। অনেকদিন পরে তারা দুজনেই খুশি। মিস্টার লারমুর-ও নিশ্চয়ই খুশি হবেন! লক্‌লকে আগুনের শিখা তো সারা গ্রামকেই প্রায় গ্রাস ক'রেছে, কিন্তু আসল বদ্‌মাশ সেই বিশ্বাস দু'টোর বাড়িতে লেঠেলরা আগুন দিতে পেরেছে কিনা, সেইটেই কেবল বোঝা যাচ্ছে না।

দিনের বেলা হ'লে গ্রামের ভেতর ঢুকে পড়া যেতো। কিন্তু রাতের অন্ধকারে সে সাহস পাচ্ছে না তারা। এরই ভেতর শয়তান রায়তগুলোর সড়কিতে জখম হ'য়ে জনা দশেক লেঠেল গ্রাম থেকে বেরিয়ে এসেছে। আর ক'জন জখম হ'ল, তাও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। কিছু খুন-জখম হবেই, সে তো জানা কথা। লেঠেলগুলোও নেটিব। সুতরাং তাদের দশ-বিশ কি পঞ্চাশটা এখানে খুন হ'লে কিছু মারাত্মক ক্ষতি নেই। জেল ফেরতা দাগী আসামী অনেক পাওয়া যাবে। তারাও কুঠির চাকরি পাওয়ার জন্যে উন্মুখ হ'য়ে থাকে। মাইনের চেয়েও বেশি রোজগার লুঠের মালে। দশটা লেঠেল মরে তো বিশটা দাগী আসামীকে ডাকিয়ে এনে ক'টা দিন তালিম দিয়ে নিলেই হবে।

ওল্ড জ্যামাইকা রাম্ রয়েছে দু'জনেরই সঙ্গে। এ-সব অভিযানের সময় পানীয়টা একটু উত্তেজক থাকা দরকার। হাইডের বিবি প্যাট্রিসিয়া আর ক্যাম্পবেলের বিবি অ্যানি দুজনেই যে যার স্বামীকে ভার্জিন মেরীর নামে শপথ করিয়ে নিয়েছে যে, তারা গ্রামের ভেতরে ঢুকবে না। তারপর নিবিড় আলিঙ্গনে বেঁধে স্বামীকে চুম্বন দিয়ে রণযাত্রায় পাঠিয়েছে। এর আগে এতদিন ধ'রে অবাধ্য নেটিব নিগারগুলোকে শায়েস্তা করবার জন্যে যে অভ্যস্ত রীতি ছিল, এবারকার অভিযান তার চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। অ্যানি আর প্যাট্রিসিয়া দু'জনেরই বুক ঢিপ্ ঢিপ্ ক'রছে। কিন্তু উপায় নেই। মিস্টার লারমুর জল্লাদের চেয়েও বিপজ্জনক। তাঁর হুকুম না মানলে কোন্ দিক দিয়ে যে কোন্ বিপদ আসবে তা কেউ জানে না।

রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

বোতলের বাকি মদটুকু গলায় ঢেলে দিয়ে হাইড বললে, এতদিনে একটা কাজের কাজ হ'ল। আশা করি, এরপর একটা কুত্তীর বাচ্চা-ও আর বেয়াড়াপনা করবে না। কিন্তু ওই শয়তান দু'টোকে ধরতে পেরেছে কিনা, তা তো এখনো বুঝতে পারছি না। ধ'রতে না পারুক, তাদের বাড়ি জ্বালিয়ে দিতে পেরেছে জানলেও তবু খানিকটা শান্তি।

সেইটেই পারেনি লেঠেলরা। অতর্কিত আক্রমণে প্রথম একটু হক্‌চকিয়ে গেলেও মেয়েদের ইজ্জৎ বাঁচানোর জন্যে বিষ্ণুচরণ আর দিগম্বরের বাড়িকে দুর্গ বানিয়ে লড়াই করেছে চৌগাছার মানুষ। শেষ পর্যন্ত হঠতে হয়েছে লেঠেলদের।

অভিযান শেষ করে হাইড আর ক্যাম্পবেল তাদের বাহিনী নিয়ে বীরবিক্রমে যখন কুঠির দিকে রওনা হ'ল তখনও রাতের অন্ধকার মিলিয়ে যায়নি।

দিনের আলো ফুট্‌লো। কিন্তু অন্যদিনের মতো পাখির কাকলি নেই। শেখপাড়ার যে-কটা মোরগ আগুনের হাত থেকে বেঁচেছে, তারাও যেন ডাকতে ভুলে গেছে। শুধু দু'চারটে দুঃসাহসী দাঁড়কাক এদিক-ওদিক উড়ে বেড়াচ্ছে। হনুমানগুলো নিরুদ্দেশ।

লেঠেলদের অত্যাচারের অভিজ্ঞতা গ্রামের কারো কাছেই নতুন নয়। কিন্তু আগের রাতে যা ঘটে গেল, তেমন তান্ডব সারা গ্রাম জুড়ে আগে কখনো ঘটেনি।

কাঞ্চন মোল্লার বাড়ির কাছে রাস্তার পাশে শিষআপাঙের ঝোপের ওপর পড়ে থাকা দুর্গামণির নিথর দেহটা দেখলে ছকু। দুর্গামণির মরা-মুখে তখনো এমন একটা ভাব যেন, অসহ্য যন্ত্রণায়

সে কুঁকড়ে যাচ্ছে। গাজনতলার মাঠের পাশে পড়ে রয়েছে বছরদ্দি শেখের বড়ো ছেলে ইয়াকুব। লাঠির ঘায়ে মাথা এমনভাবে ফেটেছে যে তকে চেনা যাচ্ছে না। তার হাতের মুঠোয় সড়কিখানা তখনো ধরা রয়েছে। সড়কির ফলায় রক্তের দাগ। হয়তো লেঠেলকে সে জখম করেছে কিন্তু তারপরেই নিজের প্রাণটা তাকে দিতে হয়েছে। পাঁচু শেখের চৌদ্দ পনেরো বছর বয়সের মেয়ে আনোয়ারাকে যখন মণ্ডল পাড়ার একটা ডোবার ধারে একটা নিসিন্দে গাছের তলায় পাওয়া গেল, তখন তার জ্ঞান নেই। পরনের শাড়িখানারও কোনো হদিশ নেই। চাপ্ চাপ্ রক্ত জমে আছে তার উরু থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত। বুক চাপড়ে কাঁদছিল আনোয়ারার মা ফতেমা। দিগম্বর বিশ্বাসের বাড়ি থেকে একখানা শাড়ি এলো। তাই নিয়ে ডোবার ধারে এগিয়ে গেল তিন্নি দাই। মেয়েটার গায়ে শাড়ি জড়িয়ে দিয়ে সে ডাকতেই ছুটে গেল কয়েকজন মেয়ে। আনোয়ারাকে নিয়ে তারা বড়ো রাস্তার ওপর এলো।

দিগম্বর বললে, আমার বাড়ি নে' যাও।

ছকুর চোখের জল আগেই শুকিয়ে গেছে, এবার চোখ শুকোলো সোরাবের। তাহের আলি মণ্ডলের ছেলে সোরাব। তর্তাজা জোয়ান ছেলে। দু'একমাস বাদেই আনোয়ারার সংগে তার শাদির কথা পাকা ছিল।

ফটিক দাসের দশ বছর বয়সের ছেলেটাকে পাওয়া গেল গ্রামপ্রান্তে বুড়ো শিবের থানের কাছে একটা অশোক গাছের তলায়। একটা ছাগলছানা তার বড়ো আদরের ছিল। সেটাকে বুকে জাপটে নিয়েই দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ছুটেছিল ছেলেটা। তাকে বুকে নিয়েই সে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে মাটিতে। একটা বন্দুকের গুলিতে তারা দু'জনেই মরেছে। হয়তো ছেলেটা কোনো সাহেবের কাছাকাছি এসে পড়েছিল।

নিধু কামারের মেয়ে কুসুম, শামসুদ্দীন গাজীর মেয়ে আয়েষা আর পেল্লাদ ঘরামির মেয়ে বিনোদিনী নিখোঁজ।

—ও বিশ্বেসবাবুরা, এ আমার কী হ'ল? মুই ঘরামি, সাত জন্মেও নীলির চাষ করি নাই। তউ ওনারা আমার এই সব্বোনাশ ক'রে গ্যালো ক্যান?

কপাল চাপড়ে কাঁদছে পেল্লাদ ঘরামি। অদূরে রাখহরি মণ্ডলের ভিটের ওপর স্তূপীকৃত কালো ছাই থেকে তখনো ধোঁয়া উঠছে। সেই দিকে তাকিয়ে নির্বাক হ'য়ে আছে বিষ্টুচরণ আর দিগম্বর।

জ্বলন্ত আগুন গায়ে নিয়ে সে কমলে বাছুরটাকে ছুট্তে দেখেছিল দুর্গামণি, একটু দূরে একটা হিজল গাছের তলায় পড়ে আছে সেটা। এখনো তার প্রাণ বেরিয়ে যায়নি। মাঝে মাঝে চারটে পা নেড়ে ছট্ফট্ করছে।

—সোরাব!

বিষ্টুচরণের ডাক শুনে ফিরে তাকালে সোরাব।

—যশোর জেলায় যাতি পারবি?

—যশোর জেলা ক্যান, দরকার হলি দোজকেও যাতি পারবো। কি জন্যি যাতি হবে তাই কন।

—নেটেলা আনতি হবে।

—যাবো।

কাঞ্চন মোল্লা বললে, যশোর জেলায় তো নীলির চাষ নাই বাবু। সে জেলার নেটেলা এস্যে কি মোদ্দের হয়ে নড়াই কত্তে আজী হবে?

—তাদ্দের নড়াই কত্তি হবে না, তারা খালি নাঠির তালিম দিয়ে যাবে। যশোর জেলায় সব পাকা নেটেলা আচে। তারা অ্যাক্ অ্যাক্ জনা পনেরো বিশটে সড়্কিয়ালার মহড়া নিতি পারে।

বিষ্টুচরণের কথার রেশ টেনে দিগম্বর বললে, ট্যাকার জন্যি চিন্তে নাই। সোরাব ছাড়া আরো দুই একজন যাক। আর কেডা যাবি?

ছকু স্তব্ধ হয়ে একটা কাটা গাছের গ‍ুঁড়ির ওপর বসে ছিলো। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, ম‍ুই যাবো। বৌডারে প‍ুড়য়ে রেকে আসি, তারপরই রওনা দিতি পারবো বাব‍ু।

দিগম্বর বললে, বেশ, তুই-ও যা।

বেলা চড়তে লাগলো। তারপর দ‍ুপ‍ুরে ঘনিয়ে এলো আকাশ ভরা কালো মেঘ। ম‍ুষলধারে বৃষ্টির জলে চৌগাছার পোড়া ঘর বাড়ির শেষ আগ‍ুনট‍ুকু নিবে গেল। কিন্তু হাজার চোখে আর এক আগ‍ুন আবার নতুন করে জ্ব‍লে উঠলো।

॥ দশ ॥

কয়েকদিন কেটে গেল।

এবার শ‍ুর‍ু হ'ল লার‍্ম‍ুরের নতুন উদ্যম।

কুঠির খাতায় দাদনী-রায়তের নাম সাকিম সবই আছে। হাজার হাজার নাম। তাদের কেউ কেউ বাধ্য হয়ে দাদন নিয়েছিলো। বাকি অধিকাংশ রায়ত-ই দাদন নিতে চায়নি। কুঠির গ‍ুদামের একটা নির্দিষ্ট ক্ষমতা আছে। যেখানে একশো রায়তকে কয়েদ করা যায় সেখানে নয় ঠেসেঠ‍ুসে পাঁচশোটা বদমাশকেই কয়েদ করা হল। কিন্তু তারপরেও যে হাজার হাজার বদমাশ বাইরে থেকে যাবে, তাদের ব্যবস্থা কী হবে? সেইজন্যেই একটা বিভীষিকা স‍ৃষ্টি করবার জন্যে হাজার লেঠেল লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিলো চৌগাছায়। আশা ছিল, এরপর তারা স‍ুড়স‍ুড় করে কুঠিতে এসে একরারনামায় সই করে যাবে। কিন্তু ব্যাপারটা ঘটেছে একেবারে বিপরীত। আগে তব‍ু দ‍ু'চারজন রায়ত দাদন নিয়েছিলো। কিন্তু চৌগাছায় সে-রাতের ঘটনার পর কাঠগড়া কনসার্নের ছ'টা কুঠির ভেতর চৌগাছা তো বটেই, কাঠগড়া সদর কুঠি, খালিসপ‍ুর, গ‍ুয়াতলী, কাঁদবিলা, ইলশামারি—একটা কুঠিতেও কোনো রায়ত আসছে না। অথচ সময় চলে যাচ্ছে। এরপর আর নীল চাষ আরম্ভ করবারই সময় পাওয়া যাবে না।

উন্মত্ত ক্রোধে দিশেহারা হয়ে উঠেছেন লার‍্ম‍ুর।

হাজার হাজার স্ট্যাম্প আনানো হয়েছে যশোর আর কৃষ্ণনগর থেকে। দিনরাত কাজ চলছে কুঠিতে।

একরারনামায় বিঘে প্রতি দ‍ু'আনার স্ট্যাম্প লাগে। কার কত বিঘে জমিতে নীলের চাষ হয় তার সব হিসেব-ই তো আছে কুঠির খাতায়। শয়ে শয়ে জাল একরারনামা তৈরি হচ্ছে দেওয়ানের দপ্তরে। সই আর কটা চাষী করতে জানে? সবই তো প্রায় টিপসই। আমিন, গোমস্তা, পেশকারেরা দিন রাত খেটে দাদনের দলিল তৈরি করছে আর টিপ সই দেওয়ার জন্যে ডাক পড়ছে লেঠেল সড়কিওয়ালা থেকে শ‍ুর‍ু করে কুঠির ওজনদার, জমাদার, রঙ-মিস্তিরি এমনকি জংলি কুলি কামিন পর্যন্ত সবায়ের। বীরভূম, বাঁকুড়া, প‍ুর‍ুলিয়ার সরল সাঁওতাল কুলি কামিনরা এসব মারপ্যাঁচ বোঝে না। দেওয়ানজীর হ‍ুকুম তাই তারা দেওয়ানজীর ঘরে গিয়ে টিপছাপ দিয়ে আসছে।

এরপর শ‍ুর‍ু হ'ল মামলা।

হাজার হাজার রায়তের নামে চুক্তি অমান্যের নালিশ। কথার খেলাপ করেছে রায়তেরা। দাদন নিয়ে তারা নীলচাষ করেনি। স‍ুতরাং নির‍ুপায় নীলকর মহারানীর ফৌজদারি আদালতে স‍ুবিচারপ্রার্থী। আইনভঙ্গকারী রায়তদের আদালত যেন যথোচিত দণ্ডদান করেন।

আরম্ভ হয়ে গেল আইনভঙ্গকারী রায়তদের গ্রেপ্তার পর্ব।

প্রথমে দশজন—তারপরে বিশজন—বিশ থেকে পঞ্চাশ—পঞ্চাশ থেকে একশো—একশো থেকে পাঁচশো—পাঁচশো থেকে হাজার।

ক্লান্ত হয়ে পড়েছে থানার দারোগা, ক্লান্ত থানার সেপাইরা। কিন্তু গ্রেপ্তার না করে উপায় নেই। আদালতের পরোয়ানা আসছে তো আসছেই।

হাসিমুখে পুলিশের হাতে ধরা দিচ্ছে মানুষগুলো। নীল বোনার চেয়ে কয়েদ খাটা অনেক ভালো।

নীল তারা বুনবে না।

তাতে ফাঁসিতে যেতে হয় তাও রাজী কিন্তু নীলের জন্যে লাঙল ধরবে না।

জেলে গেলেও না খেয়ে শুকোবে না বাড়ির লোক। আছেন নানা সাহেব, আছেন ট্যাণ্টিয়া টুপি। যারা যারা জেলে যাচ্ছে তাদের সবায়ের বাড়ির লোকের খোরপোষের দায়দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন বিশ্বাসবাবুরা। গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তাঁরা, ঘুরে বেড়াচ্ছে তাঁদের অনুচরেরা। ছেলে কয়েদ খাটতে গেছে—তিন মাসের খোরাকির টাকা তুলে দিচ্ছেন মায়ের হাতে। স্বামীর ছ'মাসের মেয়াদ হয়েছে? ছ'মাসেরই খোরাকির টাকা পেঁ'ছে যাচ্ছে পরিবারের হাতে।

জমির পর জমি ধু ধু করছে।

নীল তো নেই-ই, আউশ ধানও নেই। কে চাষ করবে? প্রায় সবাই তো মেয়াদ খাটতে গেছে। যারা বাইরে আছে তারা তালিম নিচ্ছে লাঠি আর সড়্কির। পাকা পাকা ওস্তাদ এসে গেছে বরিশাল জেলা থেকে। শুধু কাঠগড়া নয়, মোল্লাহাটি, খালবোয়ালিয়া, সিন্দুরিয়া, বাবুখালি—সমস্ত কনসার্নের এলাকায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বরিশালের লেঠেলদের। তাদের খাওয়া-থাকা, মাইনেপত্র সব দায়িত্ব বিষ্ণুচরণ আর দিগম্বরের।

অন্যদিকে ঝিকরগাছা এলাকায় নীলকরদের বিরুদ্ধে সরাসরি নেমে পড়েছেন 'সিন্নিবাবু'। কলকাতার ইস্কুলে-পড়া বড়োলোক উকিলের ছেলে হয়েও সিন্নিবাবু এসে দাঁড়িয়েছেন গরীব চাষীদের পাশে। সিন্নিবাবু খেতাবটা তাকে মুসলমান চাষীরাই দিয়েছে। তিনি নাকি আল্লার পাঠানো পীর। পোলো-মাগরোর হরিনারায়ণ ঘোষ উকিলের ছেলে শিশির নামে সতেরো-আঠারো বছরের জোয়ানই হলেন সিন্নিবাবু। তাঁর নাম দিগম্বর আর বিষ্ণুচরণের কানে এসেও পেঁ'ছেছে।

দিগম্বর একদিন বললে, নেমে তো পড়লাম বিষ্টুদা, শেষরক্কে কত্তি পারবা তো?

বিষ্ণুচরণ বললে, পাত্তিই হবে! কয়বছর নীলকুঠীতি দেওয়ানির চাকরি করো্য দুইজনেই ঝে পাপ কর্রিচি, তার পেরাচিত্তির এইভাবেই কত্তি হবে রে ভাই! জেবন যায় যাক, তউ নড়ে যাবো। তারপর কপালে কী আচে দেখা যাক্।

॥ এগারো ॥

—কুটেল সুমুন্দির খাতায় কেডা তোলবা নাম? কেডা নেবা দাদন।

—কেউ না! কেউ না! নীলির দাদন আর না! শালা কুটেলের পা-চাটা লেঁড়ি কুকুর ওই নেটেলার দল মাতা ফাটায় ফাটাক, তউ শালা নীলির বেচোনে হাত দেবো না! দাগ মার্তি আসুক না আমিন-গোমস্তা, জমিতি হাত দিতি দেবো না! নাটি খালি কুটেলের নেটেলরাই ধত্তি জানে, আমরা জানি নে? আচে বিষ্টু বিশেবস আমাদের নানা সাহেব, দিগোম্বোর বিশেবস আমাদের টাম্‌টিয়া টুপি—তারপরের আর ভয় কিসির? মিত্যে ফোজদুরি মামলার দায়ে যারা কদ খাটতি গেচে, তান্দের পুষ্যিপরজনের সব দায়-দায়িক তেনারা কান্ধে নেচে; কুটেল সুমুন্দিরা যান্দের ঘর পুড়য়ে দেচে, তান্দের লতুন ঘর উটেচে বিশেবস বাবুদেরই টাকায়। বশ্যেল জেলাথ্‌য়ে দুই কুড়ি ওস্তাদ নেটেলা আন্‌য়েচে তেনারা। তালিম চ'লচে সারা মুলুক। তালিম চলবে রাতির আন্ধারে—ঝোপে-জঙ্গলে বিল-বাওড়ের ধারে ধারে। নাটির বদলে ক্যামন ক'রে নাটি চালাতি হয় শত্তুরির হাতের নাটি ক্যামন ক'রে ফেলে দিতি হয়, তারই তালিম দেচ্চে

বশ্যেলের ওস্তাদ নেটেলা ভেয়েরা। নাটি ধত্তি শেকো ভাইসব, নাটি ধরে! ঝে ঝ্যাত্খানি পারো, তালিম নিয়ে ন্যাও!

কাঠগড়া কন্সার্নের সমস্ত এলাকায় নীলচাষীদের চোখের চাউনিই যেন পালটে গেছে। পালটাচ্ছে আরো বিভিন্ন এলাকায়। কাঠগড়া তো বটেই—খালবোয়ালিয়া আর রুদ্রপুর কনসার্নের সদর কুঠি থেকেও উদ্বেগজনক খবর আসছে মোল্লাহাটির সদর কুঠিতে। দুঃসংবাদ শুধু বেঙ্গল ইণ্ডিগো কোম্পানির পক্ষেই নয়, ছোটোবড়ো সমস্ত কন্সার্নের পক্ষেই অদূর ভবিষ্যতের জন্যে পাওয়া যাচ্ছে যেন একটা অশুভ সংকেত। দামুরহুদা মহকুমায় দেখা দিয়েছে একটা অশান্ত ভাব। রায়তগুলোকে আরো বেশি ক'রে উস্কে দেওয়ার জন্যে সেখানে গোপনে হাত লাগিয়েছে একটা লোক। একসময় নাকি সে-লোকটা কোন্ একটা নীলকুঠিতে চাকরিও ক'রেছে! ছিল নীলকুঠির দেওয়ান, সে চাকরি ছেড়ে নায়েবের চাকরি নিয়ে চ'লে গেল নড়ালের জমিদার রামরতন রায়ের সদর কাছারিতে। শ্বেতাঙ্গ নীলকরদের দু'চোখের বিষ রতনবাবু নামে সেই নেটিব জমিদার কয়েকমাস আগে মারা যাওয়ায় হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিল নদীয়া-যশোরের নীলকরেরা। এখন দেখা যাচ্ছে, মারা গেলেও সে-লোকটা নীলকর-বিদ্বেষের সবটুকু বিষই উজাড় ক'রে দিয়ে গেছে তার নায়েবকে!

চারদিক থেকেই দুঃসংবাদ।

বিজলিয়া, মীরগঞ্জ, হাজিপুর, সিন্দুরিয়া, লোকনাথপুর, সুজনপুর কাঠিকাটা, শিকারপুর—আশপাশের সমস্ত কুঠি এলাকাতেই একটা থম্থমে ভাব। চৌগাছার রায়তগুলোকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার পরেও অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। অবস্থা বরঞ্চ আগের চেয়ে আরো বেশি ঘোরালো হ'য়ে উঠেছে। আওরঙ্গাবাদ মহকুমায় একদল রায়ত হঠাৎ মিস্টার অ্যাণ্ড্রুজের আঙ্কুরা কুঠি চড়াও হ'য়ে সব কিছু তছনছ ক'রে দিয়েছে। মালদা জেলাতেও তার একটা কুঠির ওপর রায়তদের একই ধরনের চড়াও হওয়ার খবর এসেছে। এখানে এখনো তেমন কিছু না হ'লেও যে কোনো মুহূর্তেই হ'তে পারে।

দাদন ধরানো কিম্বা জমিতে দাগ মারার জন্যে দু'তিনজন লেঠেল সঙ্গে নিয়েই আমিন গোমস্তারা এতদিন গাঁয়ে গাঁয়ে চ'লে গেছে। এখন দশ-পনেরো, এমন কি, পঁচিশ-তিরিশজন লেঠেল নিয়েও তারা গাঁয়ে যেতে সাহস পাচ্ছে না। যে এলাকাই হোক, কুঠির লোক দেখলেই রায়তগুলো নাকি দলে দলে লাঠি হাতে এসে রুখে দাঁড়াচ্ছে।

পাঁচকড়ি ঘোষ মোল্লাহাটি কুঠির একান্ত বিশ্বস্ত নায়েব। রায়তদের ধরন-ধারণ সম্বন্ধে খবর জোগাড় ক'রে আনার ব্যাপারে চেষ্টার ত্রুটি করেনি সে। তার লোকজন মারফৎ এ-পর্যন্ত যে-সব খবর এসেছে, তাতে জেনারেল ম্যানেজার লার্মুর বিচলিত না হ'লেও মোল্লাহাটি কনসার্নের ম্যানেজার ফর্লঙ কিন্তু ঈষৎ বিচলিত। মিস্টার লার্মুর এখানে বাস ক'রে সব কিছু নিজের চোখে দেখলেও ওপরওলা হিসেবে যদি মোল্লাহাটি কনসার্নের ব্যবসা সম্বন্ধে কোনো কৈফিয়ত তলব করেন, তখন কনসার্নের ম্যানেজার হিসেবে তাঁকেই তো কৈফিয়ত দিতে হবে? অবশ্য, বেঙ্গল ইণ্ডিগো কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার হ'লেও মিস্টার লার্মুর তাঁর সঙ্গে ওপরওলার মতো ব্যবহার করেন না। বরঞ্চ, তার উল্টো। অধস্তন কর্মচারী ফর্লঙের সঙ্গে তিনি বন্ধুর মতোই আচরণ করেন। তা সত্ত্বেও তাঁকে ঠিক সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যায় না। তাই নীলের চাষ নিয়ে একটু গোলমাল শুরু হ'তেই ছুটি বাতিল ক'রে কলকাতা থেকে কুঠিতে ফিরে এসেছেন ফর্লঙ। সামান্য কয়েকমাস আগে এই কনসার্নের দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হ'য়েছে। সব কিছু বুঝে নেওয়ার আগেই গোলযোগের সূত্রপাত!

নায়েব পাঁচকড়ির আনা একটা খবর খুবই ভাবিয়ে তুলেছে ফরলঙ্কে। মোল্লাহাটি কনসার্নের মোট সতেরোটা কুঠির ভেতর বারোটা কুঠি এলাকাতে দাদন ধরানোর কাজ অন্য বছরের তুলনায় সিকিভাগও হয়নি। পিপুলবেড়ে, বাঘডাঙা, পিঁপড়েগাছি, ভবানীপুর, বেনাপোল আর গাইঘাটা

কুঠির অবস্থা তার ভেতরেও বেশি খারাপ।

সেদিন যখন কথা হচ্ছিল তখন পাঁচকড়ি ব'ললে, আমি যদ্দুর বুঝতে পায়েচি হুজুর, ও শালাদের বেলায় সোজা আঙুলি এবার ঘি ওট্‌বে না। আমাদের নেটেলা দিয়েও যা কতখানি কাজ হবে, তাও বুজ্তি পচ্চি নে। অমার মনে হয়, কোম্পানির নিকে আপনারা কিছু গোরা পল্টন আনার বন্দো করেন!

পাঁচকড়ির সে-কথায় ফর্‌লঙ্‌ সেদিন অবশ্য হ্যাঁ, না কিছুই বলেননি কিন্তু কথাটা তাঁর মনে ধ'রেছে। ঘটনার গতি যেদিকে মোড় নিচ্ছে, তাতে সে-রকম একটা ব্যবস্থা বোধ হয় আগে থেকেই করা ভালো। এত বড়ো একটা মিউটিনিকে স্তব্ধ ক'রে দেওয়ার পরেও শাসকের জাত শ্বেতাঙ্গ প্ল্যান্টার'কে কিনা নেংটিপরা কয়েকটা নেটিব রায়তের চোখ রাঙানি সহ্য ক'রে যেতে হবে? না, তা করা যায় না!

কয়েকদিন আগে যশোরের ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার মলোনী আর জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার স্কিনার এসেছিলেন কুঠিতে। তাঁদের আমোদ ফূর্তির জন্যে কোনো অনুষ্ঠানেরই ত্রুটি রাখা হয়নি। কুঠিতে দু'দিন কাটিয়ে তাঁরা অভয় দিয়ে গেছেন; তাঁদের এলাকায় কনসার্নের যে-ক'টা কুঠি আছে, সেখানে অন্তত কোনো হাঙ্গামা হ'তে তাঁরা দেবেন না।

নদীয়া ডিভিশনের কমিশনার মিস্টার গ্রোট যথেষ্ট সহযোগিতা ক'রছেন। বারাসতের ম্যাজিস্ট্রেট সেই 'নেটিব দরদী' অ্যাশলি ইডেনের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বেশ ভালোভাবেই জ'মে উঠেছে। কমিশনার হিসেবে অধস্তন একজন ম্যাজিস্ট্রেটের ক্রিয়া-কলাপে বিরক্ত হ'য়ে মিস্টার গ্রোট বেশ লম্বা-চওড়া একটা রিপোর্ট পেশ ক'রেছেন। নতুন লেপ্টেন্যান্ট গবর্নর পিটার গ্র্যান্ট সে-রিপোর্টের ভিত্তিতে কতখানি কী ক'রবেন কে জানে, মানুষটাকে এখনো ঠিক স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে না। গবর্নর জেনারেল কৌন্সিলের সদস্য হিসেবে এযাবৎ বরাবরই তিনি নাকি বাঁকা বাঁকা কথা ব'লে এসেছেন। আর সেই রকম একটা মানুষকেই কিনা বেছে নিয়ে বেলভেডিয়ারে বসানো হ'ল! মিউটিনির পর কত প্ল্যান্টারকে অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট করা হ'য়েছে। তারই ভেতর থেকে জাঁদরেল গোছের কাউকে বেছে নিয়ে অনায়াসেই লেপ্টেন্যান্ট গবর্নর করা যেতো! অভিজ্ঞ সিবিলিয়ান না হ'লে লেপ্টেন্যান্ট গবর্নর হওয়া যায় না? কত কিছুই তো হয় না আবার কত কিছুই তো হচ্ছে! রায়তগুলো খুশি মনে নীলের চাষ করে না, ফর্‌লঙ তা ভালো ভাবেই জানেন। দস্তুর মতো চাপ না দিলে অতীতেও তারা নীলের চাষ করেনি, ভবিষ্যতেও ক'রবে না। এই যখন অবস্থা, তখন ওই অ্যাশলি ইডেনের পরোয়ানা নদীয়া-যশোরের বেয়াড়া রায়তগুলোকে আরো খানিকটা উস্‌কে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, নিজে শ্বেতাঙ্গ হ'য়ে লোকটা ইণ্ডিয়ান ফীল্ড সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্ল্যান্টারদের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার শুরু ক'রেছে! নিজের নামে লেখার সাহস নেই, লিখে যাচ্ছে ছদ্মনামে। কয়েক বছর আগে এই ইডেনই মিস্টার লারমুরকে রীতিমতো অপদস্থ ক'রেছিল! মিউটিনির পর মিস্টার লারমুরকে অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ক'রে দিয়েছে সরকার। কিন্তু সেইটুকুই কি যথেষ্ট? এই সময় গবর্নর জেনারেল যদি বিশেষ মনোনয়ন দিয়ে লারমুরকে বাঙলার লেপ্টেন্যান্ট গবর্নর পদে বসিয়ে দিতেন! জবরদস্ত শাসন কাকে বলে, সেটা একবার পরখ ক'রে দেখবার অবকাশ পেতো নেটিবগুলো।

একরারনামার জন্যে আবার হাজার হাজার স্ট্যাম্প-কাগজের বাণ্ডিল এসে গেছে কুঠিতে। আগের বার জাল টিপছাপ দিয়ে যে-সব খাতাই রায়তের নামে একরারনামা তৈরি করা হ'য়েছিল, তারা প্রায় সবাই জেলের ঘানি টানতে গেছে, নীল চাষ করেনি। সুতরাং জাল এক্‌রারনামা তৈরি ক'রলেও যে সমস্যার সমাধান হবে না, সেটা বেশ ভালোভাবেই বোঝা গেছে। বর্ষার চাষ মার খেয়েছে কিন্তু কাত্‌কি চাষ চাই-ই চাই!

কলকাতার হিন্দু পেট্রিয়ট নামে যে নেটিব সাপ্তাহিক পত্রিকা সেই লর্ড ডালহৌসির আমল থেকে শ্বেতাঙ্গদের জ্বালাতন ক'রে আসছিল, সেটা এবার প্ল্যান্টারদের বিরুদ্ধে উঠে-পড়ে লেগেছে।

নাম উল্লেখ না ক'রলেও বেঙ্গল ইণ্ডিগো কোম্পানি, বিশেষত এই মুলনাথ কুঠি যে তার আক্রমণের একটা প্রধান লক্ষ্য, তা বুঝতে এতটুকু কষ্ট হয় না। এদেশের প্ল্যান্টারদের কাজে বাধা সৃষ্টি করা মানেই যে বৃটিশ অর্থনীতির ওপর সরাসরি আঘাত হানা—লর্ড ক্যানিং কি তা জানেন না? অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন। মিউটিনির সময় প্রেস ল' জারি ক'রে ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার মতো শ্বেতাঙ্গ পত্রিকাকে বন্ধ ক'রে দিতে তাঁর বাধে নি। প্ল্যান্টারদের শত্রু এই উদ্ধত নেটিব কাগজখানাকে বন্ধ ক'রে দিতে তাঁর এত আপত্তি কেন?

কুঠির নিজ-আবাদ ব'লতে সামান্যই আছে। বেশির ভাগটাই খাতাই রায়তী আবাদ। নিজ-আবাদের ঝক্কি অনেক বেশি ব'লে গত কয়েকবছর থেকে তা কমাতে কমাতে প্রায় শূন্যের কোঠায় এনে ঠেকানো হ'য়েছে। অনেক আগে কুঠির নিজ-আবাদের জন্যে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম থেকে যে কুলি-কামিনগুলোকে আনা হ'য়েছিল, তারপর সে-সংখ্যা আর বাড়ানো হয়নি। ক্ষেতমজুর আর ফ্যাক্টরির কুলি-কামিন মিলিয়ে সেই সংখ্যা-ই ছ'শো। এদের দিয়ে তো কুঠির নিজ আবাদের সমস্ত জমির একটা কোণও চাষ করা যাবে না। খবর যা পাওয়া গেছে, তাতে মনে হচ্ছে, খাতাই রায়তেরা নিজের জমিতে নীল চাষ তো ক'রবেই না, তার ওপর এলেকা অর্থাৎ কুঠির নিজস্ব জমিতেও তারা লাঙল ছোঁয়াবে না। হাজার হাজার বিঘে জমি তাহ'লে সত্যিই কি অনাবাদী প'ড়ে থাকবে? ধু ধু ক'রবে প্রান্তরের পর প্রান্তর? কুঠির নীলখোলায় জমা প'ড়বে না গোছা গোছা নীল গাছ? কাজের অভাবে বসে থাকবে ওজনদার, কুলি-কামিন আর রঙ-মিস্তিরির দল?

অস্থির উত্তেজনায় ছট্‌ফট্‌ ক'রতে থাকে ফরলঙের মন।

কুঠির হাতায় জীবন যাত্রা এ পর্যন্ত যে রকম চ'লে এসেছে, এখনো সেইরকমই চ'লছে। দরকারে লাগতে পারে ব'লে আস্তাবলে আরো বারোটা নতুন ঘোড়া আনানো হ'য়েছে। চিড়িয়াখানায় এসেছে বেশ কয়েকরকম নতুন জাতের পাখি। দু'জোড়া আমহার্স্ট ফেজান্ট আর তিনজোড়া গোল্ডেন ওরিয়োল এসে চিড়িয়াখানার বাহার হঠাৎ বাড়িয়ে দিয়েছে। এসেছে একঝাঁক স্কারলেট মিনিভেট। তাদের রঙের বাহার আর মিষ্টিসুরের ডাক মাতিয়ে তুলেছে মুলনাথ কুঠির চিড়িয়াখানাকে। এদের আমদানী অবশ্য নীলচাষের কোনো প্রয়োজনে নয়, নিছকই সৌন্দর্যমণ্ডিত পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। সেই একই উদ্দেশ্যে কুঠির হাতার বাইরে বাওড়ের জলে ঘেরা উদ্যানে চিতল হরিণের সংখ্যা আরো বাড়ানো হ'য়েছে। তারা ঘাস খায়, পাতা খায়, আর নির্ভয়ে চ'রে বেড়ায়।

মিসেস লারমুরের বহুদিনের ইচ্ছে, কুঠির চিড়িয়াখানায় অন্তত একজোড়া লায়ারবার্ড থাকুক। বার্ড অব প্যারাডাইস ব'লতে যে-ক'রকম পাখি আছে, তার ভেতর রঙে-রূপে সেরা হ'ল লায়ারবার্ড! কিন্তু মিসেস লারমুরের সে-সাধ এখনো পূরণ হয়নি। ফর্‌লঙ ভেবেছিলেন, যত টাকাই লাগে লাগুক, কলকাতায় গিয়ে একজোড়া লায়ার পাখি সংগ্রহের ব্যবস্থা তিনি ক'রবেন; মনিবপত্নীকে উপহার দিয়ে মিস্টার লারমুরের কাছে নিজের গুরুত্ব সেই সুযোগে আরো কিছু বাড়িয়ে নেবেন। কিন্তু হঠাৎ রায়তদের এই বেয়াড়াপনায় তাঁর সে সংকল্প মনেই র'য়ে গেছে।

কুঠির নায়েব থেকে শুরু ক'রে নীলখোলার কুলি-মজুর পর্যন্ত প্রায় সমস্ত নেটিব কর্মচারীর মনেই একটু ভয়ের ভাব দেখা দিয়েছে, তা-ও বুঝতে পেরেছেন ফর্‌লঙ। কে একটা নেটিব ওজনদার নাকি ক'দিন আগে সন্ধ্যের পর কুঠিতে ফেরার পথে কিছু অচেনা লোকের হাতে মার খেয়ে ফিরেছে। আমিন-গোমস্তাদের তো কথাই নেই, অমন যে দাপুটে নায়েব পাঁচকড়ি ঘোষ, সে-ও সন্ধ্যের পর কুঠির সীমানার বাইরে যেতে সাহস পাচ্ছে না। কয়েকশো রায়তকে জেলে পাঠানোর পরেও নেটিবগুলোর তেজ এতটুকু কমেনি, এইটেই আশ্চর্য! তারা কি মনে করে প্ল্যান্টারের সঙ্গে বিবাদ ক'রে তারা রেহাই পাবে?

কুঠির প্রশস্ত বারান্দায় আস্তে আস্তে পায়চারি ক'রতে থাকেন ফর্‌লঙ। একটু দূরে আর্মচেয়ারে ব'সে গভীর মনোযোগে স্কটের 'কেনিলওয়ার্থ' উপন্যাসখানি প'ড়ছেন মিসেস ফর্‌লঙ। তাঁর পায়ের কাছে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে টমি নামে তুলোর বস্তার মতো লোমওয়ালা তিব্বতী

টেরিয়ার কুকুরটা। একটু আগেও সে বারান্দার এ-প্রান্ত জুড়ে খেলা ক'রছিল। কিন্তু হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি এসে পড়ায় বেচারার খেলা মাটি। জলের ছাটে বারান্দার অনেকখানি জায়গা ভিজে গেছে। তা ছাড়া বইয়ের দিকেই মনিবানীর নজরটা বেশি প'ড়ে যাওয়ার ফলে মনমরা হ'য়ে অগত্যা সে পায়ের কাছে এসে গুটিসুটি হ'য়ে শুয়ে প'ড়েছে।

বৃষ্টির পরে সূর্যের আলোও অদৃশ্য। মেঘলা আকাশটা থম্‌থমে হ'য়ে আছে। হয়তো আবার যখন তখন বৃষ্টি নামবে। একটু দূরে বাওড়ের ধারে হরিণগুলো এতক্ষণ কোথায় গিয়ে লুকিয়ে ছিল। বৃষ্টি থামতেই আবার তারা বেরিয়ে প'ড়েছে।

লারমুর কাল কৃষ্ণনগরে গেছেন। আজ তাঁর ফিরে আসার কথা। আপনমনেই একটু হাসলেন ফরলঙ্। লারমুর বাইরে যতই অবিচলিত ভাব দেখান না কেন, মনে মনে যে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছেন, তা বুঝতে তাঁর অন্তত বাকি নেই। কমিশনার মিস্টার গ্রোটের সংগে দেখা করবার জন্যেই লারমুর কৃষ্ণনগরে ছুটেছেন। সংগে কয়েক হাজার টাকা নিয়ে গেছেন তিনি। আসন্ন বিপদের স্বরূপটা এখনো ঠিক অনুমান করা যাচ্ছে না বলেই আগে থেকে আঁটঘাট বেঁধে রাখা দরকার। সারা বাঙলাদেশ সবচেয়ে বড়ো কারবার বেংগল ইন্ডিগো কোম্পানির। পাঁচ হাজার কি দশ হাজার টাকা এ কোম্পানির কাছে কিছুই নয়। সুতরাং অসময়ে কমিশনার যেন কোনোমতেই বেঁকে না বসেন, তার ব্যবস্থা আগে থেকে করে রাখা দরকার।

ঈশ্বরকে মনে মনে ধন্যবাদ দেন ফরলঙ্। মিস্টার গ্রোটকে এই মুলনাথ কুঠিতে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল সেদিন তিনি এখানে ছিলেন না। থাকলে হয়তো অতিথিকে শয্যায় সংগ দেওয়ার জন্যে মিসেস ফরলঙেরই ডাক পড়তো! মিসেস লারমুর বাঁচিয়েছেন তাকে।

সন্ধ্যে হয়ে আসছে। অন্ধকার নেমে আসছে চারদিকে। হাতের চুরুটের ছাই ঝেড়ে ফেলে কেমন একটা পরিতৃপ্ত মনে মিসেস ফরলঙের পাশের চেয়ারটায় এসে বসে পড়লেন ফরলঙ।

আবার ঝমঝম করে বৃষ্টি নামলো।

॥ বারো ॥

আটাশে জুলাই বৃহস্পতিবার ছিল ছুটির দিন।

নেটিব সেপাইদের বিদ্রোহের আগুন সম্পূর্ণভাবে নিবিয়ে দিতে পারাব সাফল্যে সরকারি উদ্যোগে সারা বৃটিশ-ভারতে বিজয়োৎসব উপলক্ষ্যে ছুটি। বিজয়োৎসবের আহ্বান স্বয়ং ভাইস্‌রয় লর্ড ক্যানিংয়ের।

আবার বাজির রোশনাই, আবার ফেনিল সুরার স্রোত। তার সংগে অতিরিক্ত আর একটি বৈশিষ্ট্য সেদিন যুক্ত হয়েছিল—গির্জায় গির্জায় বিশেষ প্রার্থনা অনুষ্ঠান। ভাইসরয় নিজে এক ঘোষণাপত্রে অনুরোধ করেছেন, বৃটিশ ভারতের সমস্ত ক্রীশ্চান অধিবাসী যেন এই ধার্য দিনটিকে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপনের দিন হিসেবে উদ্‌যাপন করেন। তাই গির্জায় গির্জায় বিশেষ প্রার্থনা অনুষ্ঠানের আয়োজন। ক্রীশ্চানেরা সে অনুষ্ঠান পালন করেছে নিষ্ঠার সংগে। নেটিব রাজা-জমিদার আর কলকাতার বাবু সমাজও পিছিয়ে থাকেননি। তাঁরা সাড়ম্বরে পুজো দিয়েছেন যে যাঁর ইষ্ট দেব-দেবীর মন্দিরে। এখন আর ভয়ের কিছু নেই। পলাতক তাঁতিয়া তোপি ধরা পড়েছে, বিচারের পর তার ফাঁসি হয়ে গেছে। ছোটো খাটো নেতারা তো আগেই খতম হয়েছে। ব্যারাকে ব্যারাকে নিরস্ত্র নেটিব সেপাইরা এখন ভয়ে বলির পাঁঠার মতো কাঁপছে। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বে শান্তি শৃংখলা আবার সম্পূর্ণ ফিরে এসেছে। সুতরাং বিজয়োৎসব স্বাভাবিক।

কয়েকদিন পরের কথা। পরের সপ্তাহের রবিবার।

বিকেলের দিকে চুঁচুড়া থেকে রেলগাড়িতে হাওড়ায় ফিরছিল হরিশ আর কালীচরণ। নেমন্তন্ন

ছিল গঙ্গাচরণের বাড়িতে। গঙ্গাচরণ নিজে নিতান্তই এক অখ্যাত মানুষ। আর পাঁচজন সাধারণ বাঙালী গেরস্তের দৈনন্দিন জীবন যেমন, তারও তেমনি। হরিশের মতো দেশবিখ্যাত মানুষের সঙ্গে তার যে একটা অন্তরঙ্গ সম্পর্ক থাকতে পারে, পাড়াপড়শিরা সে-কথা তেমন বিশ্বাসই করতে চায় না। যদিও আগে দু'একবার হরিশকে তারা গঙ্গাচরণের বাড়িতে আসতে দেখেছে, তবুও আড়ালে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে। এ নিয়ে বেশ একটা ক্ষোভ ছিল তার মনে। সে জানে, হরিশকে আমন্ত্রণ জানালে যত অসুবিধেই থাক তা মানিয়ে নিয়ে সে নিশ্চয়ই আসবে। কিন্তু হরিশ যে পেট্রিয়টের জন্যে দিনে-রাতে কতখানি ব্যস্ত, তাও ভালোভাবে জানা আছে বলেই গঙ্গাচরণ কখনো সে-রকম কোনো চেষ্টা করেনি।

হরিশ নিজেই একদিন একটা সুযোগ ঘটিয়ে দিলে। নিজে যেচেই নেমন্তন্নটা আদায় করে নিয়েছে হরিশ।

নতুন বাড়ি তুলেছে গঙ্গাচরণ। গৃহপ্রবেশও হয়ে গেছে। খবরটা শুনে হরিশই সেদিন কালীচরণকে বললে, কী ব্যাপার, বলো দিকি? নতুন বাড়ি তুললে লোকে বন্ধুবান্ধবকে ডেকে যাহোক একটা ভোজ দিয়ে থাকে, আমাদের চুঁচ্ড়োনিবাসী বন্ধুটির বেলায় তার বিপরীত দেখচি কেন?

কালীচরণের মুখে সে-কথা শুনেই দিন দুয়েক পরে একেবারে ভবানীপুরে পেট্রিয়ট আপিসে এসে হাজির গঙ্গাচরণ। হরিশ নিজের মুখে যখন বলেছে, তখন পরের সপ্তাহে তাকে চুঁচুড়ায় যেতেই হবে। যাবে শনিবার বিকেলে, সে-রাতে থাকতে হবে। পরের দিন রবিবারে বিকেলের আগে ছুটি নয়।

আপত্তি করেনি হরিশ। পরের সপ্তাহের লেখাগুলো তৈরিই আছে। তাছাড়া শম্ভুচাঁদের মতো সহকারী থাকতে চিন্তার কিছু নেই। একটা ছুটির দিনকে পুরোপুরি ছুটি হিসেবে কাটিয়ে এলে মন্দ কী?

আগের রাতে প্রায় তিনটে পর্যন্ত চলেছে গল্পগুজব। মুষলধারে বৃষ্টির ঝম্‌ঝম শব্দ আর গঙ্গার ওপর দিয়ে বয়ে-আসা বর্ষার জলো বাতাস বেশ একটা আমেজ তৈরি করে দিয়েছিল। রাতের প্রহরগুলো স্বচ্ছন্দে কেটে যাওয়া হরিশের কাছে বহু পুরনো। কিন্তু সুখী গেরস্ত কালীচরণ আর গঙ্গাচরণও গল্পে মশ্‌গুল হয়ে টের পায়নি, কত রাত হল।

আলোচনার প্রসঙ্গ অনেক। নীলকরদের কথা তো ছিলই; তাঁর সূত্র ধরে এলো অ্যাশলি ইডেনের প্রসঙ্গ। রীতিমতো অন্য ধাতের এই বৃটিশ সিভিলিয়ানটি এরই ভেতর যে নীলকর সাহেবদের একেবারে চক্ষুশূল হয়ে উঠেছে, সেই কথাই বলছিল হরিশ। তার প্রসঙ্গে এলো ইণ্ডিয়ান ফীল্ড সাপ্তাহিকের কথা। পত্রিকার সম্পাদক জেম্‌স্ হিউম দেশে চলে গেছেন। গত মে মাস থেকে ইণ্ডিয়ান ফীল্ডের সম্পাদক হয়েছে কিশোরীচাঁদ। একে নেটিব সম্পাদক, তার ওপর আবার সে-কাগজে নীলকরদের বিরুদ্ধে বেনামিতে লেখা একজন ব্রিটিশ সিভিলিয়ানের দু'একটা নিবন্ধ ছাপা হওয়ায় শ্বেতাঙ্গ মহলে রীতিমতো গুঞ্জন উঠেছে।

ওইদিকে মধুসূদনও কেল্লা মাৎ করেছে। যতীন ঠাকুরের সঙ্গে তর্কবিতর্কের পর সে পণ করেছিল, বাঙলায় ব্ল্যাঙ্কভার্স লিখে দেখিয়ে দেবে। তা সে দিয়েছে। তার ব্ল্যাঙ্কভার্সে লেখা তিলোত্তমা সম্ভব কাব্যের প্রথম সর্গ এ-মাসের বিবিধার্থ সংগ্রহ পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। দ্বিতীয় সর্গ পরের মাসে বেরোবে। ওদিকে পাইকপাড়ার রাজাদের উদ্যোগে তার শর্মিষ্ঠা নাটকের জোর মহলা চলছে। দু'এক মাসের ভেতরেই নাকি বেলগাছিয়া ভিলায় নাটকখানার অভিনয় হবে। মধুসূদনের সংস্কৃত অধ্যাপক রামকুমার বিদ্যারত্ন তাঁর ক্রীশ্চান ছাত্রটির সাফল্যে আনন্দে একেবারে দিশেহারা।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর বিশ্রাম সেরে ধীরে সুস্থে স্টেশনে এসেছে তিনজন। খুশিতে

গঙ্গাচরণ একেবারে ভরপুর। পাড়ার লোকে এবার ভালোভাবেই দেখেছে, হরিশ মুখুজ্যের মতো লোককে কেবল বাড়িতে আনাই নয়, ইচ্ছে করলে দুটো দিন সে রাখতেও পারে।

আজকাল রেলগাড়িতে আগের চেয়ে ভীড় হয়। রেলগাড়ি চালু হওয়ার পর এই ক'বছরে লোকের ভয় অনেক ভেঙে গেছে। যে ইঞ্জিনটা ভস্‌ভস্‌ করে ধোঁয়া ছেড়ে গাড়িগুলোকে টেনে নিয়ে যায়, সেটা যে নেহাৎই একটা যন্ত্র, কোনো অলৌকিক শক্তি নয়—সেটা বুঝতে পারার পর থেকে গাঁয়ের লোকজনও কিছু কিছু রেলগাড়ি চাপতে শুরু করেছে।

বিকেলের গাড়ি, ভীড় তেমন ছিল না। থার্ড ক্লাশে চাপলে কোনো অসুবিধেই হত না। কিন্তু গঙ্গাচরণ সেটা আর হতে দেয়নি। ভাইকে পাঠিয়ে আগেভাগেই দু'খানা ফার্স্ট ক্লাশের টিকিট কাটিয়ে রেখেছিল সে। স্টেশনে এসে একগাল হেসে কালীচরণের হাতে টিকিট দু'খানা দিয়ে বললে, টিকিট কেটেই রেখেচি, কাছে রেখে দাও।

হরিশ ভুরু কুঁচকে বললে, ফার্স্ট ক্লাশের টিকিট? খামোকা এ অপব্যয়ের দরকার ছিল না গঙ্গা!

—সদ্ব্যয় কি অপব্যয়, সেটা আমি বুঝবো। তোমরা আমার অতিথি। এখন পর্যন্ত আমার হেপাজতে আছো। চুঁচুড়োর মাটি ছেড়ে রওনা হওয়ার আগে পর্যন্ত আমি যে ব্যবস্থা করবো, তাই তোমাদের মেনে নিতে হবে।

—বেশ, মেনে নিলুম। তবে কাজটা বোধহয় ভালো করলে না হে গঙ্গাচরণ। রেলগাড়ির ফার্স্ট ক্লাশ কামরায় চলাফেরা করে সায়েবসুবোরা। তাদের কামরায় উঠে এই পথটুকু যেতে যেতে শেষকালে মেজাজটা না তাদের মতো হয়ে যায়।

একটু পরেই গাড়ি এসে গেল হুগলি থেকে। একটা ফার্স্ট ক্লাশ কামরায় একজন মাত্র গোরা সাহেব যাত্রী। সেই কামরাতেই দু'জনকে উঠিয়ে দিয়ে বিদায় নিলে গঙ্গাচরণ।

ভস্‌ভস্‌ করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে হেলে দুলে গাড়ি চলেছে হাওড়ার দিকে। একমাত্র গোরা সাহেব যাত্রীটি যেখানে বসে আছে, তার থেকে একটু দূরে মুখোমুখি বসলে তারা দু'জন। নেটিব সহযাত্রীদের দেখে বিরক্তিতে বেশ কিছুক্ষণ চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে ছিল গোরাসাহেব। হাওড়া পর্যন্ত দুটো নেটিবের পাশাপাশি বসে যেতে হবে দেখে অস্বস্তিতে তার মুখখানা কঠিন হয়ে উঠ্‌লো। আইনগতভাবে নেটিব দুটোকে কামরা থেকে নামিয়ে দেওয়ার উপায় নেই। অন্য কোনো কৌশলে লোক দুটোকে এ-কামরা থেকে নেটিবদের থার্ড ক্লাশ কামরায় চলে যেতে বাধ্য করা যায় কিনা, তাই নিয়ে সে মনে মনে ভাবতে লাগলো।

চন্দননগর পেরিয়ে গেছে। কালীচরণ আর হরিশ গল্পে মশগুল। প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর আর কালীপ্রসন্ন। মহাভারত অনুবাদের মতো এত বড়ো একটা দায়িত্বের কাজ বিদ্যাসাগর কেন কালীপ্রসন্নের মতো নিতান্ত এক অল্পবয়সী যুবকের ওপর ন্যস্ত করলেন তাই নিয়েই কালীচরণের প্রশ্ন।

হরিশ বললে, বিদ্যেসাগর নিজে কাজ করতে জানেন আর এটাও জানেন যে কাকে দিয়ে কোন্‌ কাজটা হবে। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো কালী, বিদ্যেসাগরের নির্বাচন যে ভুল হয়নি, ও-ছোকরা তা প্রমাণ করে ছাড়বে। কালীপ্রসন্নর মালতীমাধবের বাঙলা তর্জমা তুমি পড়েচো?

—না।

—পড়ে দেখো। বুঝতে পারবে ছোকরার এলেম আছে কি নেই! বিদ্যেসাগর যে ভুল করেননি, সে-সম্বন্ধে আমি অন্তত নিশ্চিন্ত।

কালীচরণ কিছুক্ষণ আগে থেকেই একটু উস্‌খুস্‌ করছিল কিন্তু আপনমনে কথা বলতে বলতে হরিশ তা খেয়াল করেনি। একটু পরে কালীচরণের অস্বস্তিভরা চাউনি অনুসরণ করে তার দিকে তাকিয়ে হরিশ দেখলে সহযাত্রী গোরাসাহেব তার জুতো-সমেত পা দু'খানা কালীচরণের পাশে তুলে দিয়ে গদীর ওপর পা নাচাচ্ছে। কালা আদমির গা আর ধলা আদমির পায়ের ভেতর

ব্যবধান খুবই সামান্য। কালীচরণ একটু সরে বসলে। কয়েক মুহূর্তের ভেতর সাহেবের পা দু'খানাও তার দিকে সরে এলো। সাহেব তখন জানালা দিয়ে বাইরে প্রকৃতির শোভা দেখছে। সামনে শ্রীরামপুর স্টেশন।

ব্যাপারটা বুঝে নিতে কয়েক সেকেন্ড সময় লাগলো হরিশের। তারপরেই নীরবে চোখে চোখে একটা ইশারা। কালীচরণকে নিজের জায়গায় বসিয়ে দিয়ে তার জায়গায় বসলে হরিশ। মুখে কোনো কথাবার্তা নেই।

নেটিব দুটোর বক্‌বকানি হঠাৎ থেমে গেল কেন তা দেখার জন্যে চোখ ফিরিয়েই সাহেব দেখলে, একটু ফর্‌সামতো নেটিবটা তার গায়ের পাশে পা তুলে দিয়ে নাচাচ্ছে। একটু আগে সে যেমনভাবে পা নাচাতে শুরু করেছিল ঠিক তেমনি। নেটিবটা তার গায়ে পা লাগায়নি বটে, কিন্তু দূরত্বও খুব বেশি নেই।

মুহূর্তের ভেতর রাগে, উত্তেজনায় সাহেবের লালমুখ আরো লাল হয়ে উঠ্‌লো। তার বুঝতে বাকি নেই যে এটা ঢিলের বদলে পাটকেল। উত্তেজিত চাপা গর্জনে সে বললে, সহবৎ জানো না? পা নামিয়ে নাও!

তুমি নামিয়ে নিলেই আমি নিতে পারি।

—ব্লাডি নিগার!— দাঁতে দাঁত চেপে আরো অস্ফুটস্বরে সাহেব বললে, হেল উইথ দোজ ব্লাডি এশিয়াটিক ক্রিচার্‌স্।

নিজের পা নামিয়ে নিলে সাহেব। গাড়ি তখন শ্রীরামপুর স্টেশনে ঢুক্‌ছে। মুচকি হেসে হরিশ বললে, এক্সকিউজ মী স্যার! আন্‌ফরচুনেটলি ইয়োর লর্ড যেশাস ওয়জ অ্যান এশিয়াটিক বাই বার্থ!

গাড়ি তখন প্রায় থেমে এসেছে। তড়াক্ করে নরম গদীর আসন থেকে উঠে দাঁড়ালে সাহেব। কট্‌মটে চোখে হরিশের দিকে তাকিয়ে কামরা থেকে নেমে গেল সে। হো হো করে হেসে উঠ্‌লে হরিশ।

গাড়ি ছাড়ার পর কালীচরণ বললে, তুমি একেবারে যেশাসকে নিয়ে খোঁচা দিয়ে দিলে?

—খোঁচাটা যেশাসকে দিইনি, দিয়েচি ওদের উন্নাসিকতাকে। আরে, গ্রীস আর রোম ছাড়া য়ুরোপের ওরা আর সবাই সভ্য হয়েচে ক'দিন? এশিয়া যে তার অনেক আগেই কয়েকটা সভ্যতার জন্ম দিয়েচে। সেটা বোধ হয় বেচারা জানে না। জানলে এশিয়াটিক ক্রিচারদের চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করতে যেত না। ওদের মতো হ নবড়া গোরাগুলোকে ঢিট্ করতে গেলে ডোজ একটু চড়াতেই হবে!

কালীচরণ বললে, হুঁ ডোজ যে ঠিকমতো পড়েচে সে তো বোঝা-ই গেল। সে যাই হোক, তুমি যখন গোরাটার পাশে পা তুলে দিয়ে নাচাতে লাগলে তখন কিন্তু আমার বুক একটু ঢিপ্ ঢিপ্ করচিলো হরিশ! প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছিল, এই বুঝি সাহেব আস্তিন গুটিয়ে তেড়ে ওঠে!

হরিশ হেসে বললে, সুবিধে করতে পারতো না। ছেলেবেলায় স্কুলে পড়বার সময় গোরা ঠেঙিয়ে হাত মক্‌শো তো করা-ই আছে হে! তোমার প্রায় গায়ের ওপর ওর ঠ্যাঙ-নাচানো দেখে মনে পড়ে গেল বিদ্যেসাগরের সেই কায়দার কথা। হিন্দু কলেজের প্রিন্সিপ্যাল কার সাহেবকে বিদ্যেসাগর কেমন জব্দ করেচিলেন, জানো তো? যেমন কুকুর তেমন মুগুর ছাড়া কাজ হয় না কালীচরণ! ক'দিন আগে কেষ্টনগর থেকে একখানা চিঠি পেয়েচি। তাতে জানতে পারলুম, বেতাই নামে একটা গ্রামে একজন দাপুটে-নীলকরকে ধরে রায়তেরা এমন আড়ংধোলাই দিয়েচে যে, খোঁড়া পা নিয়ে লোকটা সদরে এসে হাসপাতালে পড়ে আচে। যে উদ্ধত চোখে ওরা আমাদের দেশের মানুষকে মানুষ বলেই দেখে না, দুঃখের কথা, ওদের সেই উদ্ধত চোখে আরো ঔদ্ধত্যের সুর্মা পরিয়ে দেওয়ার জন্যে আমাদেরই দেশের একদল মানুষের চেষ্টার ত্রুটি নেই!

রাতের অন্ধকার নেমে এসেছে। গাড়ি এগিয়ে চলেছে হাওড়ার দিকে। ঘুরন্ত চাকার শব্দ এবার যেন কানে আরো বেশি করে লাগছে।

নীলকরদের প্রসংগ উঠতেই ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত হয়ে পড়েছে হরিশ। এরই ভেতর তার দপ্তরে এসে গেছে বেশ কিছু চিঠি, বেশ কিছু খবর। নদীয়া আর যশোর জেলার নীলচাষীরা মরীয়া হয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে। আরো অজস্র রক্তপাত অনিবার্য। পরিণাম যে ঠিক কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

বেশ কিছুক্ষণ নীরবে কেটেছিল। তারপর নীরবতা ভেঙে কালীচরণ বললে, তোমার কি মনে হয়, চাষীরা প্ল্যাণ্টারদের সংগে সমানে সমানে যুঝতে পারবে?

—সমানে সমানে?—ম্লান একটু হাসি ফুটে উঠলো হরিশের মুখে।—গোড়া থেকেই দুই পক্ষ যে অসমান! একপক্ষের আছে অজস্র টাকা, লেঠেল, বন্দুক আর সরকারি আইনের পিঠ চাপড়ানি, অন্যপক্ষের শুধু নিরুপায় অবস্থার মনের জোরটুকু। সেই জোরটুকু সম্বল করেই তারা নামতে যাচ্ছে বলতে গেলে রাজশক্তির বিরুদ্ধে। তাই নয় কি?

—সেইটেই তো ভয়ের কথা—বললে কালীচরণ।

—আমরা ভয়ের কথা ভাবলেও ওরা কিন্তু ভাবচে না। নীল চাষীদের বিদ্রোহের খবর আমার কাছে এ পর্যন্ত যতটুকু এয়েচে তাতে আমি স্পষ্ট বুঝতে পারচি, ওরা এবার দেওয়ালে পিঠ দিয়ে রুখে দাঁড়িয়েচে। আত্মরক্ষার জন্যে যেটুকু করা দরকার তা এবার ওরা করবেই!

চুঁচুড়া থেকে ফেরার কদিন পরের কথা।

বিকেলে পেট্রিয়ট আপিসে ফিরে ডাকের চিঠিগুলো দেখছিল হরিশ। একখানা চিঠি বেশ কিছুক্ষণের জন্যে তাকে হতবাক করে রেখে দিলে।

দ্বিতীয় চিঠির লেখক নদীয়া জেলার অন্তর্গত কুমারখালি গ্রামের হরিনাথ মজুমদার। নামটা হরিশের অপরিচিত নয়। সংবাদ প্রভাকর এবং এডুকেশন গেজেটে হরিনাথ মজুমদারের নাম গত দু'তিনবছরে তার নজরে এসেছে। কয়েকবছর আগে কুমারখালি গ্রামে ছেলেদের একটা স্কুল হয়েছে। এই হরিনাথই তার প্রধান উদ্যোক্তা। বছর তিনেক আগে গ্রামের মেয়েদের জন্যেও একটা পাঠশালা বসেছে। তারও উদ্যোক্তা এই হরিনাথ। রক্ষণশীল গ্রামবাসীদের প্রতিকূলতাকে অগ্রাহ্য করে নির্ভীকভাবে এগিয়ে যাওয়া এইরকম একজন মানুষের চিঠি পেয়ে বিশেষ মনোযোগে পড়তে আরম্ভ করলে হরিশ। পত্রলেখক অতি বিনীতভাবে গ্রাম্য পাঠশালার সামান্য একজন শিক্ষকরূপে নিজের পরিচয় দিয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করেছেন। জমিদার, নীলকর আর কারবারী মহাজনদের প্রজাশোষণের সংক্ষিপ্ত এক মর্মন্তুদ বিবরণ রয়েছে চিঠিতে। পত্রলেখক হরিনাথের একান্ত ইচ্ছে যে, জমিদার এবং বিশেষত, নীলকরদের নির্মম অত্যাচারের চিত্র যাতে হিন্দু পেট্রিয়টের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়, সেজন্যে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ বিভিন্ন কাহিনীর বিবরণ তিনি পত্রিকার দপ্তরে পাঠাবেন। এ বিষয়ে স্বনামধন্য বাবু হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সম্মতি পেলে তিনি কৃতার্থ হবেন। ইংরিজি ভাষায় উপযুক্ত দখল না থাকায় বিবরণগুলি তিনি তাঁর ইংরিজিনবীশ বন্ধু মথুরানাথ মৈত্রের সাহায্যে তর্জমা করিয়ে দেবেন। প্রেরিত সংবাদের দায়িত্ব গ্রহণে তিনি সম্মত। সম্পাদক মহোদয় যদি চান যে সংবাদের সংগে সংবাদদাতার নামও প্রকাশিত হবে, তাতেও তিনি নির্ভয়ে রাজি আছেন।

অভিভূত দৃষ্টি নিয়ে আর একবার চিঠিখানি পড়লে হরিশ। চিঠির প্রত্যেক ছত্রে এক দৃপ্ত তরুণ যুবকের চাউনি যেন উঁকি দিচ্ছে! শম্ভুচাঁদ একটু দূরে তার চেয়ারে বসে প্রুফ দেখছিল। তাকে চিঠিখানি পড়তে দিলে সে। চিঠি পড়ে শম্ভুচাঁদ বললে, সুন্দর যোগাযোগ দাদা। নদীয়া-যশোর থেকে দু'একজন স্থানীয় রিপোর্টার দরকার বলে যখন আপনি চিন্তা করচেন, তখনই এ'কে পেয়ে গেলেন! কিন্তু শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে যাবে না তো?

হরিশ বললে, যারা পিছিয়ে যায়, তাদের ধাতও আলাদা, বিষয়বুদ্ধিও প্রখর। মনে হচ্ছে, এ-ব্যক্তি সে-ধাতের নয়। এ'কে আমি আজই চিঠি লিখে দিই, কেমন?

—নিশ্চয়ই! কিন্তু দাদা, গাদা গাদা প্ল্যাণ্টারের এলাকার ভেতর বসে ইনি যে রিপোর্ট পাঠিয়ে যাবেন, তরপর যদি ইনি বিপন্ন হয়ে পড়েন, তখন তো এখান থেকে আমরা তাঁকে বাঁচাতে পারবো না?

—সে বিপদের ঝুঁকি নিজের ওপর নিয়েই ইনি এ-চিঠি লিখেচেন শম্ভু! তা নইলে দরকার হলে নিজের নাম প্রকাশেও এ'র ভয় নেই কেন? ঝুঁকি মাথায় নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বার মতো নির্বোধ লোক কিছু না কিছু এ-দুনিয়ায় সব সময়েই থাকে হে ছোকরা!

পরের দিনের ডাকে চিঠি চলে গেল কুমারখালির হরিনাথ মজুমদারের কাছে। নদীয়ার গ্রামাঞ্চলের প্রত্যক্ষদর্শী সংবাদদাতা হিসেবে হিন্দু পেট্রিয়টের প্রথম প্রতিনিধি হল হরিনাথ। চিঠিতে এ-ও জানিয়ে দেওয়া হল যে, পত্রিকার স্বার্থেই সংবাদদাতার নাম গোপন রাখা হবে, সুতরাং নাম প্রকাশের কোনো প্রয়োজন নেই। সংবাদপ্রেরক হিসেবে নীচে কেবল স্বাক্ষর করে দিলেই চলবে।

॥ তেরো ॥

কুমারখালি গ্রামে তখন সবে বিকেলের আলো পড়ে এসেছে।

বঙ্গ বিদ্যালয়ের ছেলেদের ছুটি বেশ কিছুক্ষণ আগে হয়ে গেছে। চালাঘরের একপাশে ছে'চা বেড়া দিয়ে ভাগ করা হেডমাস্টারের ঘরে বসে কাগজপত্র দেখছে হরিনাথ। ছাব্বিশ বছর বয়সের যুবক, একহারা গড়ন। চোখ দুটি স্থির, প্রশান্ত।

হরিশের চিঠিখানা দিয়ে গেল ডাকপিয়ন। চিঠি পড়ে বেশ কয়েকমুহূর্তের জন্যে বিহ্বলের মতো বসে রইলো হরিনাথ। হরিশ মুখুজ্জ্যের মতো কর্মব্যস্ত মানুষ যে ফেরৎ ডাকেই তার চিঠির উত্তর দেবেন, এ-কথা সে ভাবতেই পারেনি।

পাঠশালার পেছনে জিয়লগাছের ডালে বসে একটা ঘুঘু মাঝে মাঝে ডাকছে। এক ঝাঁক টিয়াপাখি সমস্বরে কর্কশ ট্যাঁ ট্যাঁ শব্দ করতে করতে উত্তরদিকে উড়ে গেল। গ্রামের উত্তরপ্রান্তে তিনটে বাজ-পড়া অকর্মণ্য নারকেল গাছের কোটরে কোটরে ওদের আস্তানা। দিনের আলো মিলিয়ে আসার আগেই ওরা আস্তানায় ফিরছে।

একটু অনামনস্ক হয়ে পড়েছিল হরিনাথ। হরিশ মুখুজ্জ্যেকে সে চোখে দেখেনি। কিন্তু তাঁর একটা কল্পিত মূর্তি চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। হয়তো কল্পনার এ-মূর্তির সঙ্গে বাস্তবের কোনোই মিল নেই, কিন্তু তাঁকে চোখে না দেখা পর্যন্ত এই মূর্তিটাই তার কাছে সত্যি। উদার, প্রশান্ত, নির্ভীক দৃষ্টি নিয়ে হরিশ মুখুজ্জ্যে যেন তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। আর, তাঁর সেই মূর্তির বিপরীতে চোখের সামনে ভেসে উঠছে বাস্তবে দেখা কয়েকটা মুখ—লোকনাথপুরের নীলকর ডেভিস, কাচিকাটা কুঠির আর্চিবল্ড হিল্‌স্‌, জোড়াদলন কুঠির ম্যাকনেয়ার, বিজলিয়া কুঠির ওমান আর সুজনপুর কুঠির দম্বাল!

দারিদ্র্যের সঙ্গে আশৈশব পরিচয় হরিনাথের। বয়েস একবছর পূর্ণ না হতেই মাকে হারিয়েছে সে। তারপর থেকে বাবা হলধর মজুমদারও সংসারে উদাসীন। সামান্য বিষয়সম্পত্তি যা ছিল তাও নষ্ট হয়ে গেল। তার ওপর শৈশবের প্রথম পর্বেই সেই সংসার-বিরাগী বাবাও চলে গেলেন এ-দুনিয়ার মায়া কাটিয়ে। জ্ঞান হতে না হতেই রূঢ় দারিদ্র্যের সঙ্গে অনাথ বালকের স্থায়ী সম্পর্ক। খুড়ো নীলকমলবাবু আর গাঁয়ের ইংরিজি স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা-প্রধান শিক্ষক কৃষ্ণধনবাবুর স্নেহটুকু না পেলে হয়তো বে'চে থাকাই হয়ে উঠতো না তার!

দারিদ্র্যের জ্বালা হরিনাথ জানে। দারিদ্র্যের নির্দয় নির্মম মূর্তি সে দেখেছে, সেই সঙ্গে

শৈশব থেকে দেখে এসেছে দরিদ্রের প্রতি শক্তিমানের প্রতিকারহীন অত্যাচার। শাদা চামড়ার কুটেলরা তো বিদেশি, সুযোগ পেলে দিশি জমিদার, গাঁতিদার, মহাজন কেউ গরীবকে শুষে নিতে ছাড়ে না। দারিদ্র্যের তাড়নায় দুটি অন্নসংস্থানের আশায় জমিদারের সেরেস্তা, নীলকরের ফ্যাক্টরি, মহাজনের গদী—সব জায়গাতেই কিছু না কিছুদিন কাজ করতে হয়েছে হরিনাথকে। এ তিনজাতের মানুষের ভেতরকার বীভৎস চেহারা সে দেখেছে। প্রাণ কেঁদেছে একটু প্রতিকারের আশায়। কিন্তু কোথায় প্রতিকার! তার নিজের যদি একখানা সংবাদপত্র থাকতো! কারো মুখ না তাকিয়ে গরীবের দুঃখের কথা অন্তত পাঁচজনের কাছে পৌঁছে দিতে পারতো।

বন্ধু মথুরানাথ মৈত্র হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকা রাখে। ক'দিন আগে সে-ই বলেছিল, নিজে একখানা কাগজ চালানোতো সোজা কথা নয় হরি। তার ওপর এই অজ পাড়াগাঁয়ে বসে কাগজ বের করলেও সে কাগজ পড়বে কে, বল? আমাদের এখন উদ্দেশ্য সিদ্ধি নিয়ে কথা। আমি বলি কি, চোখ কান বুজে তুই হিন্দু পেট্রিয়টের এডিটর হরিশবাবুর কাছে একখানা চিঠি লিখে দে। কুটেল সাহেবদের বিরুদ্ধে তিনি শক্ত হাতে কলম বাগিয়ে ধরেচেন। আমার মনে হয়, তোর ইচ্ছেটা তাঁর কাছে অবহেলা পাবে না।

মথুরার কথা ষোলো আনাই ঠিক। আন্তরিক আগ্রহ দেখিয়ে উৎসাহ দিয়ে যেভাবে ফেরৎ ডাকে চিঠি দিয়েছেন হরিশ মুখুজ্যে, হরিনাথের কাছে তা ছিল অপ্রত্যাশিত। তিনি জানিয়েছেন, খবরের ইংরিজি তর্জমার জন্যে চিন্তা করবার দরকার নেই। উল্লেখযোগ্য খবর বাঙলাতে লিখেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যেন পাঠিয়ে দেওয়া হয়; তর্জমা তিনি নিজেই করে নেবেন।

হরিশ মুখুজ্যের চিঠিখানা হাতে নিয়ে অন্যমনস্কভাবে কতক্ষণ কেটেছে তা নিজেই জানে না হরিনাথ। হঠাৎ দরজার কাছ থেকে কে যেন ভাঙা গলায় ডাকলে, বাবু!

দরজার দিকে ফিরে তাকালে হরিনাথ। চোখাচোখি হতেই ঝর্‌ঝর্‌ করে কেঁদে ফেললে পুবপাড়ার জলধর বিশ্বাসের বৌ অহল্যা। দরজার কপাটের ওপর কোনোমতে অশক্তদেহের ভার রেখে কাঁদতে কাঁদতে সে বললে, মোরে বাঁচান বাবু! তেনার কী হাল হয়েছে ধ'রে নে যাবে।—মোরে বাঁচান বাবু, বাঁচান—

ডুকরে কাঁদতে লাগলো অহল্যা।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালে হরিনাথ। এগিয়ে এলো অহল্যার কাছে। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করলে, কম্‌নে খবর পেলি?

—লয়নের মা'র মুকি। তেনারে কোন্‌ কুটিতি নে গিয়েচ তার পাত্তা নাই, বেঁচি আচে কিনা তাও জানিনে বাবু! তারপরেও মোরে ধ'রে নে গে ঝেদি কুটেলের থাবায় ছুঁড়ে দেয়, তালি—

আর বলতে পারলে না অহল্যা। কান্নার বেগ সামলাতে না পেরে থর্‌থর্‌ করে কাঁপতে কাঁপতে মাটির ওপর বসে পড়লে সে।

—তুই নিশ্চিন্দি থাক্‌ বুন! আমার দেহে যত্‌খন প্রাণ আচে তত্‌খন ভুবন মিত্তিরের সাধ্যি নেই তোরে টেনে নে যায়!

দু'চোখের চাউনি কঠিন হয়ে গেল হরিনাথের। টেবিলের কাগজপত্র গুছিয়ে রেখে কেবল হরিশ মুখুজ্যের চিঠিখানা সে কামিজের পকেটে ভরে নিলে।

ভুবন মিত্তির জেলেপোতা কুঠির নায়েব। বিঘে পাঁচেক জমির মালিক জলধরের ওপর তার আক্রোশ বহুদিনের। কুঠির নায়েবের চাকরি পাওয়ার অল্প কিছুদিন আগে ভুবন মিত্তিরের একটা আমবাগানের লাগোয়া জলধরের দু'বিঘে ধানী জমি নিয়ে বিরোধের সূত্রপাত। মিত্তির মশাই নাকি দাম দিয়েই জমিটা কিনে নিতে চেয়েছিলেন কিন্তু জলধর দেয়নি। কুঠির নায়েব হওয়ার পর এই ক'বছরে সে জমিতে এক দানা ধান ফলাতে দেয়নি ভুবন মিত্তির। বছরের পর বছর শুধু নীল। তা সত্ত্বেও তার তেজ কমেনি। ঘরের চালে খড় জোটে না, তারই ভেতর বছরখানেক আগে আসাননগর থেকে বিয়ে করে নিয়ে এলো। এমন একটা ডব্‌কা ছুঁড়িকে, যার দিকে তাকালে

আর চোখ ফেরানো যায় না। তখন থেকেই উপযুক্ত সুযোগের সন্ধানে ছিল ভুবন মিত্তির। কুঠির লেঠেল পাঠিয়ে ছুঁড়িটাকে ধরে এনে একবার সাহেবের ভোগে লাগিয়ে তরপর সেটাকে কব্জা করতে আর কতক্ষণ? নীল চাষ না করার দায়ে ক'দিন আগেই জনা পঁচিশেক বেশি তেজী রায়তকে কুঠির কয়েদখানায় এনে তোলা হয়েছে, তার ভেতর জলধরও আছে। তাকে অবশ্য দু'দিনের বেশি এ-কুঠিতে রাখা হয়নি। রাতের অন্ধকারে নৌকোয় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে হাজীনগর কুঠিতে। এইবার সোমত্ত বৌটাকে তার ঘর থেকে টুপ করে তুলে এনে কুঠিতে হাজির করবার পালা।

অহল্যা তখনো মাটিতে গড়িয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। নতুন করে কাউকে কিছু বলবার নেই, গাঁয়ের সব লোকই এ-সব কথা জানে। ভয়ে কেউ মুখ খোলে না।

পশ্চিম আকাশ লালে লাল। সূর্যাস্তের সে-আভাকে নিমেষে ঢেকে দিয়ে কোত্থেকে এগিয়ে এলো বর্ষার সজল মেঘ। ঝম্‌ঝম্ করে বৃষ্টি নামলো।

ঘরের কোণ্ থেকে জীর্ণ ছাতাটা হাতে তুলে নিলে হরিনাথ। অহল্যার উদ্দেশ্যে বললে, খালি চোকির জল ফেললে রক্ষা হবে না রে বুন, মন শক্ত কত্তে হবে। জল্‌দা যে ক'দিন না ফিরে আসে সে-ক'দিন দাদার বাড়িতেই থাকবি, চল্—

॥ চোদ্দ ॥

কলকাতায় এজুকেটেড নেটিব মহলে সাড়া প'ড়ে গেল।

পাইকপাড়ার রাজাভাইয়েরা তেসরা সেপ্টেম্বর শনিবারের বারবেলায় তাদের বেলগাছিয়া ভিলা বাগানবাড়িতে যে-ভেল্‌কি দেখিয়ে দিয়েছে তার তুলনা নেই! আগের বছর সেখানে হয়েছিল সংস্কৃত থেকে নাটুকে রামনারাণের অনুবাদ করা 'রত্নাবলী' নাটক। আর, এবার হ'ল কেরেস্তান মাইকেল মধুসূদন দত্তের লেখা 'শর্মিষ্ঠা' নাটক। মাইকেলের ইংরিজি লেখার এলেম আছে তা মোটামুটি সবাই জানে। কিন্তু বাঙলাও যে সে-লোকটা এমন ঝর্‌ঝরে ক'রে লিখতে পারে, কে তা জানতো? যেমন সুন্দ নাটক, তেমনি অ্যাকটিং, তেমনি অর্কেস্ট্রা! সব মিলিয়ে শর্মিষ্ঠা সেদিন আসর মাৎ ক'রে দিয়েছে!

রাজবাড়ির নাট্যশালা ব'লে কথা! দর্শকও এমন সব হোমরাচোমড়া লোক, সবাই যাদের এক ডাকে চেনে। ছোটোলাট পিটার গ্রান্ট সাহেব সস্ত্রীক এসেছিলেন। বড়ো বড়ো সব রাজকর্মচারিদের কথা বাদ দিলে গণ্যমান্য শ্বেতাঙ্গ আর যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের ভেতর ঠাকুরপুকুরের পাদরি লঙ সাহেব আর হেদোর ডফ সাহেবও ছিলেন। বাঙলা তাঁরা বেশ ভালোই জানেন। নাটকের ইংরিজি তর্জমার বই হাতে নিলেও নাটক বোঝার জন্যে সে-বই তাঁদের দরকার হয়নি। দুই পাদরিই নাটকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ক'রে গেছেন।

সেদিন নাটকের অভিনয় আরম্ভ হওয়ার বেশ কিছুক্ষণ আগেই বেলগাছিয়া ভিলায় গিয়ে হাজির হ'য়েছিল হরিশ। লঙ সাহেব তার একটু আগেই এসেছেন। হরিশকে দেখেই হাসিমুখে এগিয়ে এসে করমর্দন ক'রে তিনি ব'ললেন, কিশোরীচাঁদবাবুর মুখে শুনলাম, এখন কিছুদিন আপনি খুবই ব্যস্ত র'য়েছেন। আজ হয়তো না-ও আসতে পারেন।

—ঠিকই শুনেছেন ফাদার। কাজের চাপ খুবই বেশি। নদীয়া, যশোর, পাবনা, মালদা, ফরিদপুর থেকে প্ল্যান্টারদের অত্যাচার সম্বন্ধে বহু খবর এসে পেঁৗছেচে। সবগুলো এখনো দেখে উঠতে পারিনি। তবু আসতে হ'ল। মধু যেরকম অভিমানী তাতে নাটক দেখতে না এলে হয়তো বাক্যালাপই বন্ধ ক'রে দেবে!

লঙ সাহেব হেসে ব'ললেন, হ্যাঁ, মাইকেল দত্ত খুবই ভাবপ্রবণ যুবক। দেখুন, আমার মনে হয়, প্রতিভাবান কবির পক্ষে সেটা অস্বাভাবিক নয়। বিশেষত, এই তাঁর প্রথম নাটক। তাঁর 'তিলোত্তমা সম্ভব' কাব্যের প্রথম সর্গ হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি প'ড়ে ফেলেছি। হরিশবাবু, এই যে তিনি বাঙলাভাষায় কাব্য আর নাটক রচনায় হাতের ছোঁয়া লাগালেন, এটা বাঙলা সাহিত্যের পক্ষে সুলক্ষণ ব'লেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস! কারণ, তাঁর ভেতর যে যথার্থ প্রতিভা আছে তা আমি তিলোত্তমাসম্ভব প'ড়েই বুঝতে পেরেছি।

মধুসূদনের প্রসঙ্গে আর দু'চারটে কথার পর লঙ সাহেব চ'লে গেলেন নীলকরদের প্রসঙ্গে।—আচ্ছা হরিশবাবু, আপনার কি মনে হয়, রায়তেরা বিদ্রোহ ক'রবে?

—বিদ্রোহ তো আরম্ভ হ'য়েই গেচে ফাদার! তার চেহারা যে আরো কত বেশি ভয়ঙ্কর হ'য়ে উঠতে পারে, সেইটেই এখনো আন্দাজ ক'রে উঠতে পারচিনে।

—হুঁ।—একটু থেমে তারপর ফাদার লঙ ব'ললেন, আমাদের চার্চ মিশনারি সোসাইটির শান্তিপুর অঞ্চলের মিশনারি মিস্টার বমভেইটশ্ গতমাসে আমাকে দু'খানা চিঠি দিয়েছেন। সে-চিঠি দু'খানা প'ড়ে মনে হ'ল, সম্ভবত ব্যাপক বিদ্রোহ আসন্ন!

—আমার বিশ্বাস, আপনার অনুমান যথার্থ।—ব'ললে হরিশ।

—এ আমার অনুমান নয় হরিশবাবু, ইতিহাসের শিক্ষার ভিত্তিতেই আমার এ-সিদ্ধান্ত! ওরা এর আগে আমেরিকায় যা ক'রেছে, ওয়েস্ট ইণ্ডিজে যা ক'রেছে, আফ্রিকায় যা ক'রেছে, এখানেও ঠিক তাই-ই ক'রছে। উদ্ধত প্ল্যান্টারের দল ইতিহাস থেকে কোনো শিক্ষাই নেয়নি!

—কোম্পানি সরকারের তরফে ওদের সে-শিক্ষা দেওয়ার কোনো চেষ্টাও হয়নি, ফাদার!

—আপনার এ-কথা সর্বাংশে ঠিক, হরিশবাবু! বাণিজ্যের স্বার্থে যেখানে মানবতাবোধের টুঁটি চেপে রাখা হয়, সেখানে সে-রকম চেষ্টা থাকতেও পারে না। আমার গায়ে যে আইরিশ রক্ত বইছে সে তো আপনি জানেন! একজন আইরিশ হিসেবে ব্রিটিশের শোষণের চেহারা এবং চরিত্র আমি ভালো ক'রেই জানি। আয়ার্ল্যাণ্ডের সমস্ত জমির চারভাগের তিনভাগেই হয় পর্যাপ্ত গমের চাষ। কিন্তু হতভাগ্য আইরিশ চাষীদের কপালে রুটি জোটে না, প্রায় সারাবছরই তাদের আলু খেয়ে পেট ভরাতে হয়! আয়ার্ল্যাণ্ডের সব গম জাহাজ বোঝাই হ'য়ে চ'লে যায় ব্রিটেনে। শাসক বৃটিশদের রক্তচক্ষু আর হাতের অস্ত্রের দাপট চুপ করিয়ে রাখে আইরিশদের। তাদের চোখে শুধু জল আর বুকে শুধু দীর্ঘশ্বাস!

আয়ার্ল্যাণ্ডের কথা ব'লতে একটা বিহ্বল বেদনার অনুভূতিতে ম্লান হ'য়ে গেল ফাদার লঙের কণ্ঠস্বর। তারপর একটু থেমে নিজের আবেগ সামলে নিয়ে তিনি আবার ব'লতে লাগলেন, হরিশবাবু, প্রথম যৌবনের বেশ কয়েকবছর আমার কেটেছে রুশ দেশে। তখন সেখানে অসহায় ভূমিদাসদের করুণ অবস্থা আমি দেখেছি। তার পাশাপাশি দেখেছি, মরীয়ার মতো রুখে দাঁড়িয়ে জমিদারদের বিরুদ্ধে তাদের বেপরোয়া বিদ্রোহ! রুশদেশে কলেরা-দাঙ্গার সময়ও আমি সে-দেশেই ছিলুম। নিপীড়িত হ'তে হ'তে এই হতভাগ্য মানুষের দল যখন সব ভয়কে ঝেড়ে ফেলে রুখে দাঁড়ায় তখন তাদের শক্তি যে কতখানি, আমেরিকার বিপ্লব তা দেখিয়েছে, ফরাসি বিপ্লব-ও তা দেখিয়েছে। তা সত্ত্বেও কেন যে এদের চেতনা হয় না, সেইটেই আশ্চর্য!

অভিনয় আরম্ভের সঙ্কেত হিসেবে অর্কেস্ট্রা বেজে উঠলো।

সম্বিৎ ফিরে পেয়ে রেভারেণ্ড লঙ ব'ললেন, নাটক আরম্ভ হ'তে চ'লেছে। এখন এ-প্রসঙ্গ থাক, হরিশবাবু। কিন্তু এ-বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমি কিছু আলোচনা ক'রতে চাই। যদি আপনার অসুবিধে না হয়, আমি মাঝেমাঝে আপনার পেট্রিয়ট অফিসে যেতে পারি?

—সে তো আমার সৌভাগ্য, ফাদার! আমারও যে আপনার কাছে অনেক কিছু জানার বিষয় আছে। আপনি আমার দেশের নিপীড়িত মানুষকে অন্তর থেকে ভালোবাসেন! আপনি পায়ের ধুলো দিলে আমিও ধন্য হবো!

দ্বিতীয় দফার অর্কেস্ট্রা বেজে উঠলো। এরপরই ড্রপসিন উঠবে—নাটকের অভিনয় আরম্ভ হবে।

কাগজে কাগজে হৈহৈ। উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় সবাই মুখর। বেলগাছিয়ার সিংঘি রাজারা অনুষ্ঠান একটা ক'রেছে বটে! পরের সপ্তাহেই হিন্দু পেট্রিয়টে শর্মিষ্ঠা নাটকের সমালোচনা ছাপা হ'ল। নিজে নাটক দেখলেও গিরীশকেই সমালোচনা লিখতে ব'লেছিল হরিশ। উচ্ছ্বাস ব্যাপারটা গিরীশেরই আসে ভালো। নাটক, সাজসজ্জা, দৃশ্যপট—সব কিছুরই প্রশংসায় গিরীশ-পঞ্চমুখ। তারও ভেতর বিদূষক সম্বন্ধে তার উচ্ছ্বাস কিছু বেশি।

হরিশ হেসে জিজ্ঞেস করেছিল, সব কিছুকে ছাপিয়ে বিদূষককে নিয়ে এত কালি খরচ ক'রলে কেন, বলো দিকি? কোনো গভীর তাৎপর্য আছে নাকি?

গিরীশও হেসে উত্তর দিয়েছিল, থাকলেও থাকতে পারে! ওই বৃত্তিটাই বর্তমানে আমাদের জাতীয় চরিত্রে সবচেয়ে মানানসই কিনা! তবে আগেই ব'লে রাখ্‌চি বাপু, আর যা-ই থাক, রাজনৈতিক তাৎপর্য কিন্তু নেই!

দিন পনেরো পরের কথা।

টেবিলে স্তূপীকৃত কাগজপত্রের ভেতর প্রায় ডুবে গিয়ে পরের সপ্তাহের পেট্রিয়টের সম্পাদকীয় লিখছে হরিশ। ও-পাশে নিজের চেয়ারে ব'সে হারাণ মাঝেমাঝে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাচ্ছে আর উস্‌খুস্‌ ক'রছে। আকাশে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, যে কোনো সময়েই ঝমঝম ক'রে বৃষ্টি নামতে পারে অথচ হরিশের কোনো খেয়ালই নেই? শেষ পর্যন্ত আর না থাকতে পেরে হারাণ ব'ললে, ওরে, আকাশের অবস্থা ভালো নয়। মনে হচ্ছে, প্রবলবেগে জল নামবে। আজ একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরলে হ'ত না?

পকেট ঘড়িটা বের ক'রে দেখলো হরিশ। আটটা বেজে দশ মিনিট। ব'ললে, তুমি যাও দাদা, আমার এখনো কিছু সময় লাগবে।

হরিশের উত্তর যে এর চেয়ে ভিন্ন কিছু হবে, এমন আশা করেনি হারাণ। তবু রওনা হওয়ার আগে ব'লে গেল, অন্য দিন হ'লে বল্‌তুম না। নেহাৎ আকাশের অবস্থা বিশেষ ভালো বোধ হচ্ছে না ব'লেই বলচি ভাই কি! যাই হোক, একটু তাড়াতাড়ি ওঠার চেষ্টা করিস্‌—

কিছুক্ষণের ভেতরেই লেখাটা হ'য়ে গেল। আলমারি থেকে মদের বোতল আর সেই সঙ্গে দু'টো ফাইল বের ক'রলো হরিশ। একটার ওপর লেখা 'নদীয়া', অন্যটার ওপর 'যশোর'। দু'টো ফাইলেরই ওপরে লাল কালি দিয়ে লেখা 'একান্ত গোপনীয়'। এ-দুই ফাইলে কী আছে, একমাত্র শম্ভুচাঁদ ছাড়া আর কাউকে তা জনতে দেয়নি হরিশ। আলমারির চাবি তার নিজের কাছেই রাখে।

সারাদিনে পরিশ্রান্ত স্নায়ুগুলোকে চাঙ্গা ক'রে নেওয়ার পর ফাইল দু'টো নিয়ে ব'সতে হবে, এই ছিল তার অভিপ্রায়। মদের গেলাসে চুমুক দিতে দিতে সবে সে নদীয়ার ফাইল খুলে ব'সেছে ঠিক সেই সময় দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো দীনু বাগ্‌দির মেয়ে কাজলী।

—ছোট্‌ঠাউর!

চেনা ডাকটা কানে যেতেই চোখ তুলে তাকালো হরিশ। তাকিয়েই সে চম্‌কে গেল। কাজলীকে যেন চেনা যাচ্ছে না! কোথায় সেই ঢল্‌ঢলে চেহারা? চুল উস্‌কো খুস্‌কো, চোখ দু'টো ব'সে গেছে, চাউনিতে কেমন যেন ভয় মেশানো অস্থিরতা।

উদ্বিগ্ন স্বরে হরিশ বললে, কী হ'য়েচে রে? তোকে এমন দেখচি কেন?

—তবু তো দেখচো ছোট্‌ঠাউর। হিসেবের একটুন গোলমাল হ'য়ে গেলে হয়তো আমাকে আর কোনোদিন দেখতেই পেতেনি! আমি এখানে ছিনুনি। সেই যে করালীদাদা যেনাকে সেই বচ্ছর দেড়েক আগে আমাদিগের বাড়িতে ক'দিন রেখেছিলে, তেনার দেশে গিয়েছিনু। গেল

মাসে গুপী গয়লা মারা যাওয়ার পর গিরি আর তার ভাতার এয়েচিল। তাদের সঙ্গেই গিয়েচিনু পিঁপড়েগাছি। আজই ফিরচি। যে-পায়ে ফিরেচি, সেই পায়েই তোমার সঙ্গে দেখা কত্তে তোমার বাড়ি গেনু। মাঠারুণ ব'ললেন, তুমি তোমার কাগজের কারখানায় আচো। সেখান থেকে সিধে চ'লে এনু। বড়ো খারাপ একটা খপর এনেচি ছোট্‌ঠাউর! গিরিকে নীলকুটির লেঠেলেরা নুট ক'রে নিয়ে গেচে। আজ দশদিন মেয়েটার কোনো পাত্তা নেই!

কান্নায় গলা ধ'রে এসেছে কাজলীর। হরিশের স্তব্ধ নির্বাক মুখের দিকে তাকিয়ে কান্না-ভাঙা ধরা গলায় কাজলী বাকিটুকু ব'ললে, পাগলের মতো হ'য়ে গিয়েচে তার বুড়ো দা'শউর, লেঠেলদের লাঠির ঘায়ে আধমরা হ'য়ে তার ভাতার বিছানায় প'ড়ে আছে—কেউ জানে না, আবাগী এখন কোতায়!

অস্থির উত্তেজনায় চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালো হরিশ। নিস্ফল আক্রোশে তার সারা দেহ তখন থর্‌থর্‌ ক'রে কাঁপছে। হঠাৎ একটা প্রচণ্ড বিদ্যুৎ ঝলকানিতে ধাঁধিয়ে গেল চোখ। তার পরেই মেঘের গর্জন। তীব্র কান-ফাটানো শব্দ কড়—কড়—কড়াৎ—

বৃষ্টির ধারা আগেই হয়তো নেমেছিল। এবারে নামলো অঝোর ধারায়। সেই সঙ্গে শোঁশোঁ ক'রে হাওয়া। জানালার কপাট দু'টো দড়াম্‌ দড়াম্‌ ক'রে গরাদের ওপর আছাড় খেতে লাগলো, জানালা দিয়ে ছুটে-আসা জলের ছাঁটে টেবিলের কাগজপত্র ভিজে যেতে লাগলো।

দ্রুতপায়ে এগিয়ে গিয়ে জানালার কপাটে হুড়কো এ'টে দিয়ে হরিশ সবে ফিরে দাঁড়িয়েছে, ঠিক সেই সময় হাওয়ার মাতনে দড়াম ক'রে দরজার কপাট দু'টো বন্ধ হ'য়ে গেল আর ঠিক তার পরমুহূর্তেই দরজার কপাট ঠেলে ঘরে ঢুকলো হরিশদের পাড়ার দাশু মিত্তির। তার সারা দেহ ভিজে চুপ্‌সে গেছে।

কাজলীর দিকে আড়চোখে একবার তাকিয়ে নিয়েই হরিশের উদ্দেশে দাশু মিত্তির ব'ললে, পাওনাগণ্ডার কয়েকটা তাগাদা দিয়ে ডিহিবিরজি থেকে ফিরছি ভায়া। কে জানতো, এমনধারা অভন্দরের মতো জল নামবে? তোমার এখানে ঢুকে পড়লুম ব'লে কিছু মনে করোনি তো?

সে-কথার কোনো উত্তর না দিয়ে হরিশ ব'ললে, ভেতরে গামছা আছে, এনে দিচ্চি। মাথাটা অন্তত ভালো ক'রে মুছে নিন নইলে জল ব'সবে।

হরিশ ভেতরের ঘরে চ'লে গেল। দাশু মিত্তির হিহি ক'রে কাঁপছে তবু সেই অবস্থাতেই কাজলীর দিকে তাকিয়ে মুচ্‌কি হাসি হেসে ব'ললে, হে'হে' তুইও বুঝি হরিশের জার্নালের রিপোর্টার?

জার্নাল এবং রিপোর্টার—এ-দু'টো শব্দের অর্থই জানে না কাজলী। বিরক্তস্বরে সে ব'ললে, ছোট্‌ঠাউরকে একটা খপর দিতে এয়েচি।

—দিবি বৈকি, নিশ্চয়ই দিবি! হরিশ নাকি এখন ফেমাস পার্সন! তাকে খপর দিয়েও কত আনন্দ, কি বলিস্‌? আসিস্‌, মাঝেসাঝে সময়-সুযোগ বুঝে এসে-টেসে হরিশকে খপর-টপর দিয়ে যাস্‌, অ্যাঁ?

হরিশ গামছা নিয়ে এলো। ভালো ক'রে ঘষে ঘ'ষে মাথা মুছতে লাগলো দাশু মিত্তির। কাজলী যে তার দিকে কটমট ক'রে তাকিয়ে আছে তা সে লক্ষ্যই করেনি।

একটু পরে প্রবল বৃষ্টির বেগটা ধ'রে আসতেই কাজলী ব'ললে, আমি এখন যাই ছোট্‌ঠাউর, কালকে ভোরবেলায় তোমার বাড়ি যাবো—

—না, না, একটু দেরি কর্‌। পুরো ঘটনাটা আজই জেনে নিই।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুই থাক্‌। তুই যাবি কেন? —ব'ললে দাশু মিত্তির। —আমি চলি বুঝলে ভায়া? খামোকা এখানে ব'সে থেকে গায়ে জল বসানোর চেয়ে ছুটে বাড়ি চ'লে যাওয়াই ভালো, কি বলো?

দাশু মিত্তির বেরিয়ে যাওয়ার সময় আবার একটু মুচকি হেসে দরজার কপাট টেনে দিয়ে গেল। আর যেন তর্‌ সইছিল না কাজলীর। দাশু মিত্তির যাওয়ার পরমুহূর্তেই ঝাঁজের সঙ্গে ব'ললে,

ওই বজ্জাতের ধাড়ি অনামুখো মিন্‌সেটাকে অত সেবা-যতন দেখাতে গেলে ক্যানে ছোটঠাউর? ও মিন্‌সে জেবনে কোনোদিন কারুর উব্‌গারের তরে কুটোগাছটি নেড়েচে? তুমি জানো না, তোমার মতো দেবতুল্যি মুনিষ্যির নামেও কত কুচ্ছো ক'রে বেড়ায়?

জানি। —মৃদু হেসে হরিশ ব'ললে, তবে তুই যেগুলোকে কুচ্ছো ব'লে মনে করচিস্‌ তার কোনোটাই হয়তো কুচ্ছো নয় রে কাজলী! ধ'রে নে, সবই সত্যি।

ঠোঁট উল্‌টে কাজলী ব'ললে, ই-স্‌! তুমি ব'লচো ব'লেই তোমার এই কথায় আমি পেত্যয় গেনু আর কি! খবদ্দার, তুমি ওই মিন্‌সেটাকে আর আস্কারা দিয়োনি!

—আচ্ছা, দেবো না। তুই যা ব'লতে এসেছিস, সেইটেই বল্‌!

—ছোট্‌ঠাউর, আমি যে ভেবেই পাচ্চি নে, যখন চন্দরা গয়লানী গিরির কথা শুধোবে তখন কী জবাব দেবো আমি?—ব'লতে ব'লতেই আবার গলা ধ'রে এলো কাজলীর। —কী জবাব দেবো ছোট্‌ঠাউর? গিরিকে যারা নুট ক'রে লিয়ে গেচে, তাদের পালের গোদা কে তা জানো? আমারই ভাতার—যে আমাকে একদিন তাড়িয়ে দিয়েচে!

—তোর স্বামী! সে কোত্থেকে ওখানে গেল?

—ভগমান জানে! ওখেনে যাওয়ার পর তো জানলাম, সে এখন বেনাপোল নীলকুঠির সদ্দার নেঠেল। তুমি নালমোন সায়েবের নাম জানো ছোট্‌ঠাউর?

—জানি।

—সে নাকি একটা নরপিচেশ। তেনারই হুকুমে পিঁপড়েগাছি, পিপুলবেড়ে, নওদা, দুগ্গোপুর, হরিদাসপুর—আট-দশটা গাঁয়ে চড়াও হ'য়েচিল কুটির নেঠেলরা। তারা গোরু-বাছুর নুট ক'রেচে, ঘরে ঘরে আগুন দিয়েচে, আরো কত কি ক'রেচে! তারা চ'লে যাওয়ার পর সব গাঁয়েরই দু'চারটে ক'রে সোমত্ত বয়েসের বৌ-ঝির খপর নেই। গিরি তাদেরই একজন!

ঝম্‌ঝম্‌ ক'রে আবার বৃষ্টি নেমেছে। সেই সঙ্গে মাঝেমাঝে মেঘের গর্জন। কাজলী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

—সেদিন তুই কোথায় ছিলি?

—করালীদাদার ঘরে। ওখেনেই তো ছিনু। নিশুত রেতে হৈহল্লা শুনে ঘুম ভেঙে গেল। তারপরেই দেখি, চতুদ্দিকে আগুন আর আগুন! সেইসঙ্গে চিৎকার আর কান্নাকাটি। গাঁয়ের নোকেরা ঠেকানোর খুব চেষ্টা ক'রেচলো ছোট্‌ঠাউর কিন্তুক পারেনি। তুমি যেমন ক'রে হোক গিরিকে ফিরিয়ে আনার বন্দোবস্ত করো ছোট্‌ঠাউর! আমারই ভাতার যে মেয়েটাকে নুট ক'রে লিয়ে গেচে, এ-মনস্তাপ আমি যে আর পাচ্চিনি -

ঝরঝর ক'রে কাঁদতে লাগলো কাজলী।

গিরিবালার সঙ্গে পিঁপড়েগাছি যাওয়ার দিন পাঁচেক পরে করালীর সঙ্গে হাটে গিয়েছিল কাজলী। সেখানেই বদনের সঙ্গে তার দেখা। ফ্যাল ফ্যাল ক'রে কয়েক মুহূর্ত কাজলীর দিকে তাকিয়ে তারপরই অন্য সঙ্গী লেঠেলদের ভীড়ে মিশে গেল বদন। অবাক বিস্ময় ফুটে উঠেছিল কাজলীর চোখে। এ-লোকটা এখানে কেমন ক'রে এবং কেনই বা এলো, তা সে ভেবে পাচ্ছিল না।

করালী জিজ্ঞেস ক'রলে, ও শয়তানডারে তুই চিনিস্‌ নাকিনি দিদি?

কাজলীর বুক থেকে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। ব'ললে, এককালে চেনাজানা ছিল। তবে অনেককাল আর দ্যাখাসাক্ষেৎ নেই দাদা।

—ও শালা বেজন্মার সঙ্গে দ্যাখাসাক্ষেৎ না হওয়াই ভালো। ও-ই হচ্চে বেনাপোল কুটির সদ্দার নেটেলা বদন। শালা এ-এলেকার নোকই না। তোম্দের কলকেতার উদিকি কোন গেরামে ওর বাড়ি। কুটেলা সুমুন্দির কাচে কেমন ক'রে এসি জুটিচে কেডা জানে! তাই তো ভাবিরে দিদি, মোদের বাগ্‌দি ঘরের মোপুরুষ বিশ্বনাথ একদিন কুটেলগো সঙ্গে পাঞ্জা ন'ড়ে বাগ্‌দির

দাপট দেকায়ে গিয়েলো আর সেই বাগদির অক্ত গায়ে নে' ওই শালা বদন বাগ্দি কিনা কুটেলের পা চাটে! সিদিন রাত্তির দশ-কুড়িড়া গেরাম জ্বড়ে হ্যাংনামা বাধানোর চেষ্টা ক'রেলো কিন্তুক পারে নাই। শিগ্গিরই আবর হয়তো ঝেঁপিয়ে পড়বে।

করালীর কথাই সত্যি হ'ল। তার কয়েকদিন পরেই সেই হামলা। পিঁপড়েগাছিতে হামলা হ'য়ে যাওয়ার পর সবায়ের ম্বখেই কাজলী শ্বনেছিল, লেঠেলদের পালের গোদা ছিল বেনাপোল কুঠির সর্দার লেঠেল বদন বাগ্দি।

সে-ঘটনার পরের দিনই করালী ব'ললে, অবস্তা তো দেক্তিই পাচ্চিস দিদি? তুই মা-বাপের কোলের মাণিক, মা-বাপের ঘরেই ফিরে যা দিদি! গিরিদিদির মতন সোনার পিতিমে মেয়েডারে ওরা ছিঁড়ে খাবে রে দিদি! শগ্বনের মনেও হয়তো দয়া-মায়া থাকে কন্তুক কুটেলের মনে নাই।

গিরিবালার কথা মনে প'ড়তেই হাউহাউ ক'রে কাঁদতে লাগলো করালী। কিছ্বক্ষণ পরে চোখের জল ম্বছে নিয়ে ব'ললে, কেন্দে আর কীই বা করবো? তোরে কলকেতায় রওনা ক'রে দে' আমিও রওনা হবো বাঁশবেড়ে।

—কোন্ বাঁশবেড়ে, দাদা—তির্বেণী-বাঁশবেড়ে?

—নারে দিদি, এই ন'দে জেলার বাঁশবেড়ে। অন্তেরা পায়েচি, সে-গেরামের দ্বই বাগ্দির বেটা বদ্যিনাথ আর বিশ্বনাথ নতুন ক'রে দল গড়েলো। এরই মন্দি খালবোয়ালির কুটিতি হানা দে' কুটেল স্বম্বন্দিগ্বলোরে তারা জবর শিক্কে দেচে। তান্দের সঙ্গে একবার দ্যাকা কত্তি হবে। দরকার হলি হাঁতে আবার নাঠি ধরবো!

কাজলী ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে ব'ললে, আবার নাঠি? তোমার বয়েসটা মনে আচে?

—হ্, আচে। শরীলি ব্বড়ো হলি কী হবে? মনে আমি অ্যাকনো জোয়ান! আকাশে কালো ম্যাঘ নল্‌পাচ্চে! মোপ্বর্ষ বিশে সন্দারের সাগ্রেদ হ'য়ে অ্যাকন কি আমি হাত-পা গোটায়ে ব'সে থাকতি পারি? মরবো না রে দিদি, মরবো না! কুটেলগ্বলো কবরে যাওয়ার পর তোর সঙ্গে দ্যাখা ক'রে আমি চিতেয় ওঠার বস্তা করবো!

করালী কি বাঁশবেড়ের দিকে চ'লে গেচে?

প্রায় একদমেই বিবরণ দিয়ে যাচ্ছিল কাজলী। হরিশের প্রশ্ন শ্বনে সে একট্ব থামলো। তারপর ব'ললে, আমাকে রওনা ক'রে দিয়ে দাদাও রওনা হ'য়ে গেচে। দাদা আমাকে বারবার ক'রে ব'লে দিয়েচে, তাদের এলেকায় যা দেখে এন্ব তা যেন তোমার কাচে এসে সব জানাই। তোমাকে তো বন্ন্ব ছোট্‌ঠাউর, কিন্তুক চন্দরা গয়লানীকে কী ব'লবো আমি?

আবার ঝরঝর ক'রে কাঁদতে লাগলো কাজলী। বাইরে তখনো অঝোর ধারায় ব্বষ্টি প'ড়ে চ'লেছে।

কয়েকদিনের ভেতরেই পাড়ায় কানাকানিটা বেশ জ'মে উঠলো। দাশ্ব মিত্তির চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেনি। একেবারে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ! সবাই বেশ আগ্রহ সহকারেই কানে তুলে নিয়েছে। হরিশ ম্বকুজ্জ্যে তাহ'লে আরো একধাপ এগিয়েছে! এখন আর কলকাতা টাউনে গিয়ে রাঁড়ের বাড়িতে প'ড়ে থাকতে হয় না হে! হরিশ ম্বকুজ্জ্যে তুড়ি মারলে ডব্‌কা ছ্বঁড়িরাই তার কাগজের আপিসে হাজির হ'য়ে যায়। র্বচির-ও বলিহারি যাই! শকুন যত ওপরেই উঠ্বক, তার নজর সব সময় ভাগাড়ের দিকে। ছোটোজেতের মাগী ছাড়া তার রোচে না। তাও কিনা, ভাতার-খেদানো মাগী। একে ইংরিজিনবীশ তায় আবার বেহ্মোজ্ঞানী! হ্যাঁ, সব দিক দিয়েই করিৎকম্মা বটে হরিশ!

ওরে ভাই কাল্ব
কারো পাতে মাগ্বরমাছ কারো পাতে আল্ব।

হরিশের এখন একাদশে বেস্পতি! নাম-ডাক হ'য়েছে, যাহোক কিছ্ব পয়সা হ'য়েছে, আর কী পরোয়া? ওরে বাবা, মায়ের পেট থেকে পড়বার পর এই সেদিন পর্যন্ত খিদের জ্বালায় পেটে

গামছা বেঁধে কেটেছে তা কেউ জানে না? সেই মানুষের এখন কিনা দিনে চার-পাঁচ বোতল বিলিতি কারণবারি ছাড়া চলে না! আগে তবুও রাতের বেলায় লুকিয়ে-চুরিয়ে বাগ্‌দিপাড়ায় যেতো। এখন আর সে-বালাইও নেই। লাজলজ্জা জলাঞ্জলি দিয়ে নিজের কাগজের আপিসকেই ক'রে তুলেছে ভৈরবীলীলার সাধনক্ষেত্তর! ওদিকে আবার কাগজে কত গরম গরম কথা লিখে লাট-বেলাটের ছেরাদ্দ ক'রে বাহবা নেওয়া হয়! বুজরুকি জানে বটে হরিশ!

হরিশের স্কুলজীবনের বন্ধু কালাচাঁদ আলিপুর আদালতে ওকালতি করে। অবসর পেলে মাঝে মাঝে সে পেট্রিয়টের অফিসে আসে। এখানে এলে দেশের পাঁচজন গুণী লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়, এইটকুই তার লাভ। কে ভাবতে পেরেছিল, বিদ্যেসাগরের মতো ব্যক্তির সঙ্গে সামনাসামনি ব'সে দু'টো কথা বলবার সৌভাগ্য তার জীবনে কোনদিন আসবে? কিন্তু তাও তো হ'ল! হরিশের সঙ্গে কী একটা বিষয়ে আলোচনা করবার জন্যে বিদ্যাসাগর সেদিন হিন্দু পেট্রিয়ট অফিসে এসেছিলেন। সঙ্গে আবার রাজা রামমোহনের ছেলে রমাপ্রসাদ—সদর দেওয়ানি আদালতের নামজাদা উকিল! হরিশের একটা অভ্যেস, নামজাদা কেউ এলে কালাচাঁদকে সে এইভাবে পরিচয় করিয়ে দেয়, এ হ'ল শৈশব থেকে আমার অকৃত্রিম বন্ধু কালাচাঁদ রায়। এমন দিনও গেচে, অভাবের তাড়নায় স্কুল ছাড়ার পর এই কালাচাঁদ ঘুরে ঘুরে দরখাস্ত লেখার মক্কেল জুটিয়ে না আনলে আমাকে উপোসে থাকতে হ'ত!

কালাচাঁদ সত্যি সত্যিই লজ্জা পায়। সে তো কোন্ অতীতের কথা! আজ হরিশ মুখুজ্জ্যেকে সারা দেশের লোক চেনে। তার তুলনায় আলিপুর আদালতের একজন সাধারণ উকিল কালাচাঁদ সত্যিই তো নগণ্য! সে অনেকবার অনুরোধ ক'রেছে, ওভবে বোলিসনি হরিশ, আমার বড়ো লজ্জা লাগে।

হরিশ ব'লেছে, সে-কৃতজ্ঞতার ঋণ তো সারাজীবনেও শোধ হবে না রে ভাই! তবু মাঝে মাঝে সুযোগ পেলে সেই ছোটোবেলার কথাগুলো একবার স্মরণ ক'রে নিই, পাছে কৃতজ্ঞতার কথা ভুলে যাই!

বিদ্যাসাগরের সঙ্গে হরিশ যেদিন কালাচাঁদকে পরিচয় করিয়ে দিলে সেদিনও সেই একই বয়ান। কালাচাঁদ বিদ্যাসাগরকে প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়াতেই তিনি হেসে ব'ললেন, তুমি দেখচি, দুনিয়ার বা'র হে' ভায়া! কবে কোন্ শৈশবে কী একটু উপকার ক'রেচ, তাই নিয়ে হরিশ এখনো তোমার গুণগান ক'রচে! এ-রকম মন্দ ভাগ্যি তো সচরাচর কারো দেখিনে!

হোহো ক'রে হেসে উঠলো হরিশ।

কথায় কথায় প্রকাশ পেলো, কালাচাঁদের পৈতৃক নিবাস ছিল হুগলি জেলার বনমালীপুর নামে এক গ্রাম। বনমালীপুর নামটা শুনেই একটু ন'ড়ে-চ'ড়ে বসলেন বিদ্যাসাগর।

—কি আশ্চর্য যোগাযোগ! জাহানাবাদ মহকুমার বনমালীপুর তো? আরে, সে গাঁ যে আমারও পিতৃপুরুষের নিবাস ছিল হে!

কালাচাঁদ বিনীত স্বরে ব'ললে, আজ্ঞে, আমার পিতৃদেবের কাছে শুনেচি। তবে এখন বীরসিংহ গ্রামের নামই আপনার নামের সঙ্গে জুড়ে আছে ব'লে সে-কথা কাউকে আর বলিনে।

বিদ্যাসাগর হাসতে হাসতে ব'ললেন, পাছে লোকে বিশ্বাস না করে, কেমন?

কথাটা কিন্তু ঠিক। বনমালীপুরের বাড়ুজ্যে পরিবারের ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের পাঁচ ছেলে। সেজোছেলে রামজয় তর্কভূষণ সংস্কৃতে যেমন পণ্ডিত তেমনি বেপরোয়া ডাকাবুকো মানুষ। যেমন একরোখা তেমনি সাহসী। অথচ সেই মানুষ-ই ঘর-সংসার ক'রেও সংসারে উদাসীন। প্রথম যৌবন থেকে তাঁর জীবনের বেশির ভাগ সময়ই কাটতো হিমালয়ে কিম্বা অন্যান্য তীর্থে তীর্থে ঘুরে। সংসারবিরাগী রামজয়ের পত্নী দুর্গাদেবী নিরুপায় হ'য়ে শেষ পর্যন্ত বনমালীপুরে স্বামীর ভিটে ছেড়ে বালকপুত্র ঠাকুরদাসকে নিয়ে চ'লে গেলেন কয়েক ক্রোশ দূরে তাঁর বাপের বাড়ি

মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে। সেখানেই তিনি যাহোক একটা কুঁড়ে ঘর বেঁধে দিন কাটাচ্ছিলেন। ছেলে ঠাকুরদাস একটু বড়ো হওয়ার পর কলকাতায় এসে একটা আটটাকা মাইনের চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত দুঃখ-দুর্দশার ভেতরেই বছরের পর বছর কেটেছে দুর্গাদেবীর। তারপর আদিনিবাস সূত্রে হুগলি জেলার গোঘাট গ্রামের টুকটুকে সুন্দর ফুলের মতো মেয়ে ভগবতীর সঙ্গে ঠাকুরদাসের বিয়ে, বিদ্যাসাগরের জন্ম—সবই সেই বীরসিংহ গ্রামে। হুগলি জেলার বনমালী-পুরের বাড়ুজ্জ্যেদের একটা শাখা স্থায়ীভাবে হ'য়ে গেল মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামের অধিবাসী।

কালাচাঁদের কাছে সে-দিনটা বিশেষভাবে স্মরণীয় হ'য়ে আছে। মাঝেমাঝে ঠাট্টাচ্ছলে হরিশকে সে বলে, সেদিন শুনেচিস তো, বনমালীপুরের সুবাদে আমি বিদ্যেসাগরমশাইয়ের কাছের মানুষ? আমাকে একটু সমীহ ক'রে কথা বলবি, হ্যাঁ!

হরিশও হেসে জবাব দিয়েছে, ইয়েস ইয়োর এক্সেলেন্সি!

কাজলীকে নিয়ে হরিশের নামে রটানো কুৎসা কালাচাঁদের কানেও গেছে। সে একদিন ব'ললে, তুই শুনেচিস হরিশ?

হরিশ হেসে ব'ললে, হ্যাঁ, শুনেচি।

—তোর রাগ হয় না? দাশু মিত্তিরকে দু'ঘা চাবুক হাক্‌ড়ে দিতে পারিসনে?

হরিশ হাসতে হাসতেই উত্তর দিলে, তোর মেজাজ দেখচি একেবারে প্ল্যাণ্টারদের মতো হ'য়ে উঠ্‌ছে রে! শোন্‌, ও-সব নিয়ে চিন্তে করবার ইচ্ছেও আমার নেই, সময়ও নেই। কলম হাক্‌ড়েই সময় পাচ্চিনে তার ওপর আবার চাবুক?

—কিন্তু এই মিছে কলঙ্ক—

—এটা মিছে কলঙ্ক তা ঠিক। কিন্তু আমিও তো দেবচরিত্রের লোক নই, তা তুই জানিস!

—নিজেকে এমন ছোটো ক'রে ভেবে তুই কিসে এত আনন্দ পাস্‌, বল্‌ তো?

—ছোটোও নয়, বড়োও নয়। আমি আসলে যা—সেইটেই মনে রাখতে চাই।

॥ পনেরো ॥

কলকাতার সুপ্রীম কোর্টে প্রথম সারির ব্যারিস্টার হিসেবে সুপরিচিত মিস্টার উইলিয়ম থিয়োবোল্ড বেশ কয়েকদিন ধ'রেই একটা মানসিক অস্থিরতার ভেতর রয়েছেন। অস্থিরতা তাঁর পেশাগত ব্যাপারে নয়। সে-বিষয়ে তিনি নিশ্চিন্ত। সুপ্রীম কোর্টে আইন ব্যবসায়ে মিস্টার পিটার্সন, মিস্টার মন্ট্রিয়ো, মিস্টার কাউয়ি কিম্বা মিস্টার ক্লার্কের মতো সামান্য দু'চারজন ব্যারিস্টার ছাড়া তাঁর সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেউ নেই, তা তিনি জানেন। তাঁদের ভেতর আবার মিস্টার মন্ট্রিয়ো একটু নেটিব-ঘেঁষা। এত কাণ্ডের পরেও লোকটার শিক্ষা হয়নি। সে যাই হোক, তাতে থিয়োবোল্ডের কিছু যায়-আসে না। জাস্টিস বার্নেস পীককের মতো নেটিব-দরদী মানুষ পর্যন্ত মিউটিনির সময় বদমাশ নেটিবগুলোর কাণ্ডকারখানা দেখে তারপর থেকে পুরোপুরি নেটিব-বিদ্বেষী হ'য়ে গেছেন। মিউটিনির আগে যে-মানুষ কথায় কথায় শ্বেতাঙ্গ আর নেটিবদের ক্ষেত্রে ফৌজদারি আইনের বৈষম্য নিয়ে অনেক কড়াকড়া সমালোচনা ক'রেছেন, সেই মানুষই এখন ওই বৈষম্যের বাস্তব প্রয়োজনকে মনে-প্রাণে স্বীকার করেন। আরো আছেন জাস্টিস মর্ডান্ট ওয়েল্‌শ্‌। জাস্টিস পীককের মতো তাঁকে অবশ্য মোহভঙ্গের ধকল পোয়াতে হয়নি। ইণ্ডিয়ান নেটিব নিগারদের চরিত্র যে কী চীজ তা তিনি গোড়া থেকেই জানেন।

কৃতি ব্যারিস্টার উইলিয়ম থিয়োবোল্ডের এই সাম্প্রতিক অস্থিরতার কারণ তাঁরই আন্তরিক নিষ্ঠা এবং মমতায় গ'ড়ে-তোলা ইণ্ডিগো প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশন। লণ্ডন থেকে ক'দিন আগে

ইণ্ডিয়ান রিফর্ম সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক জন ডিকিন্সের একখানা চিঠি এসেছে। মাত্র উনচল্লিশজন র‍্যাডিক্যাল এম-পি'র যে সমিতিকে সেক্রেটারি অফ স্টেট ফর ইণ্ডিয়া স্যার উডের মতো জবরদস্ত সিবিলিয়ানও সমীহ ক'রে চলেন সেই ইণ্ডিয়ান রিফর্ম সোসাইটির পক্ষ থেকে ইণ্ডিগো প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক মিস্টার উইলিয়ম থিয়োবোল্ডকে মিস্টার ডিকিন্সন তাঁর চিঠিতে যে-প্রস্তাব পাঠিয়েছেন তাতে সম্মতি জানানো উচিত হবে কিনা সেই বিষয়েই মনস্থির ক'রতে পারছেন না তিনি। সেই কারণে অ্যাসোসিয়েশনের তিনজন দায়িত্বশীল বিশিষ্ট সদস্যকে আমন্ত্রণ জানিয়ে গোপনে তাঁদের সঙ্গে একবার খোলাখুলিভাবে আলোচনা করবার সিদ্ধান্ত নিলেন থিয়োবোল্ড। সেই তিনজন বিশিষ্ট সদস্য হ'লেন ব্যারিস্টার মিস্টার লঙভিল ক্লার্ক, ঢাকা নিউজ পত্রিকার স্বত্ত্বাধিকারী তথা নীলকর আলেকজাণ্ডার ফোর্বস এবং ইংলিশম্যান পত্রিকার সম্পাদক মিস্টার ওয়াল্টার ব্রেট। আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং গোপনীয়। কাশীপুরে গঙ্গার তীরে ফোর্ব্সের সুরম্য বাগানবাড়িতে হ'য়েছে আয়োজন।

প্রথমেই ডিকিন্সনের চিঠিখানা প'ড়ে সবাইকে শোনালেন থিয়োবোল্ড। ডিকিন্সন লিখেছেন, যদিও গত কয়েকবছর যাবৎ বিভিন্ন সময়েই পার্লিয়ামেন্টের প্রভাবশালী র‍্যাডিক্যাল সদস্য তথা ইণ্ডিয়ান রিফর্ম সোসাইটির সদস্যগণ বিভিন্ন কারণে ভারতবর্ষে বিশেষত দক্ষিণবঙ্গে নীলকর সম্প্রদায়ের আচার-আচরণ সম্বন্ধে পার্লিয়ামেন্টে যথেষ্ট সমালোচনা ক'রেছেন তবুও এখন উপলব্ধি করা যাচ্ছে যে, সামগ্রিকভাবে বৃটিশ পুঁজির স্বার্থে এখন থেকে একযোগে কাজ করবার সময় এসেছে। তাতে একদিকে যেমন লণ্ডনের সঙ্গে কলকাতার সমমনস্ক ব্যক্তিবর্গের যোগাযোগ স্বাভাবিক হবে, অন্যদিকে তেমনি বৃটিশ পুঁজির নিরাপত্তাও হবে সুনিশ্চিত। সব দিক চিন্তা ক'রে ইণ্ডিয়ান রিফর্ম সোসাইটির বিচক্ষণ সদস্যেরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, সাময়িকভাবে কিছু কিছু অসুবিধে হ'লেও বৃটিশ উপনিবেশের বৃহত্তর স্বার্থে ভারতবর্ষে প্রচলিত বিচারপদ্ধতির কিছু সংস্কার করা এখন নিতান্তভাবে প্রয়োজন। যাঁরা ব্রিটেনে রয়েছেন তাঁদের চেয়ে ভারতে বসবাসকারী ব্রিটিশেরা এই প্রয়োজনটিকে আরো বেশিভাবে উপলব্ধি ক'রবেন ব'লে রিফর্ম সোসাইটির সদস্যেরা বিশ্বাস করেন। সুতরাং এই পটভূমিতে কলকাতার ইণ্ডিগো প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশন যদি রিফর্ম সোসাইটির সঙ্গে একযোগে আন্দোলন ক'রতে সম্মত থাকেন তাহ'লে রিফর্ম সোসাইটিও পার্লিয়ামেন্টে নীলকরদের স্বার্থ সর্বতোভাবে দেখবেন। সুতরাং প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক যদি এই যুক্ত-আন্দোলনের জন্যে ইণ্ডিয়ান রিফর্ম সোসাইটিকে উপযুক্ত আর্থিক সাহায্য দিতে এবং একযোগে আন্দোলন আরম্ভ ক'রতে সম্মত থাকেন তাহ'লে নিঃসন্দেহে বৃটিশ স্বার্থ আরো অনেক বেশি সুরক্ষিত হবে। রিফর্ম সোসাইটির সদস্যগণ আশা করেন যে, এই প্রস্তাবের তাৎপর্য মিস্টার থিয়োবোল্ড এবং তাঁর তীক্ষ্ম বুদ্ধিশালী সহযোগীবৃন্দ নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে পারবেন।

থিয়োবোল্ড সবায়ের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে শান্ত, গম্ভীরস্বরে বললেন, মিস্টার ডিকিন্সনের এ-চিঠির গভীর তাৎপর্য আছে তা আমি স্বীকার করি। কিন্তু আমাদের সামনে এখন যে মূল প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে তা হ'ল, কোন্ স্বার্থে আমরা র‍্যাডিক্যাল এম-পিদের সঙ্গে বিচারব্যবস্থার সংস্কার-আন্দোলনে একযোগে কাজ ক'রবো? আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, আমরাও এদেশে এসে যথেষ্ট উদার মন নিয়েই জীবনযাপন আরম্ভ ক'রেছিলুম। কিন্তু এদেশের নেটিবদের স্বার্থপরতা, শঠতা আর নীচতা শেষ পর্যন্ত বৃটিশের জাতীয় স্বার্থরক্ষার জন্যে তৎপর হ'তে আমাদের সবাইকেই বাধ্য ক'রেছে!

—যথার্থ! আপনি আমারও মনের কথাটা ব'লেছেন মিস্টার থিয়োবোল্ড! —ঈষৎ উত্তেজিতভাবে ব'ললেন ফোর্ব্স্। —ষোলো বছর আগে প্রিন্স দ্বারকানাথের প্রাইভেট সেক্রেটারি হিসেবে যখন আসি তখন এদেশ সম্বন্ধে আমার একটা মোহ ছিল। কিন্তু অল্প কয়েকবছরের ভেতরেই আমার সে-মোহ সম্পূর্ণ কেটে গেল। দেখলুম, এরা শঠ, প্রবঞ্চক এবং মিথ্যেবাদী। সভ্যতার বিচারে এরা মধ্যযুগকেও পেরোয়নি। আমার'তো দৃঢ় বিশ্বাস, এই নেটিবদের জন্যে যে বিচারব্যবস্থা

আমরা ক'রেছি, তা প্রয়োজনের চেয়েও অনেক বেশি উদার। আমি তো বুঝতে পারছিনে, সে-ব্যবস্থার সংস্কারের কথা উঠছে কেন?

—হোমের রাজনীতিতে র‍্যাডিক্যাল এম-পিরা আরো নাম কিনতে চায় আর কি!—হেসে ব'ললেন ওয়াল্টার ব্রেট। —মানবতা, উদারনীতি এইসব বড়ো বড়ো ফাঁকা বুলি পার্লিয়ামেণ্টে আরো কিছু আসন দখলের মতলব! এদেশে এসে কিছুদিন বাস ক'রলে রিফর্ম সোসাইটির সদস্যেরা বুঝতে পারতেন এদেশের নেটিব কী চীজ!

থিয়োবোল্ড ব'ললেন, হ্যাঁ, ক্ষোভের কারণ আমাদের যথেষ্টই আছে মিস্টার ব্রেট! তবু ঠাণ্ডা মাথায় আমাদের সব কিছু বিবেচনা ক'রে দেখতে হবে। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, কলকাতার ইয়ং বেঙ্গলদের একসময় আমি বন্ধুভাবেই গ্রহণ ক'রেছিলুম? ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির প্রথম সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্য আমার হ'য়েছিল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! সে-পদ বেশিদিন আঁকড়ে থাকার দুর্মতি আমার হয়নি। আজ থেকে আটবছর আগে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি যখন ল্যাণ্ড হোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে মিশে গিয়ে নতুন নাম নিল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, তখনই আমার মনে হ'য়েছিল, কোথাও কিছু গোলমাল আছে! আমার অনুমান যে অভ্রান্ত, এই ক'বছরে তা প্রমাণিত হ'য়েছে। এই সমিতি বাইরে বৃটিশ শাসনের প্রতি আনুগত্য দেখায় কিন্তু ভেতরে ভেতরে আমাদের শত্রু!

লঙ্‌ভিল ক্লার্ক এতক্ষণ কোনো কথা বলেননি। এইবার তিনি ব'ললেন, আমার বিদগ্ধ বন্ধু মিস্টার থিয়োবোল্ডের সঙ্গে একমত হ'য়েও আমার একটা কথা আছে। আপনারা সবাই জানেন, সেখানে নেটিব জমিদারদেরই প্রাধান্য। আমাদের প্ল্যান্টারদের স্বার্থের সঙ্গে তাদের বেশিরভাগ সদস্যেরই স্বার্থ জড়িত। বেশ কয়েকজন জমিদারের নিজস্ব নীলচাষের ব্যবসা আছে। যাদের তা নেই তারা আমাদেরই প্ল্যান্টারদের কাছে জমি পত্তনি দিয়ে প্রতি বছর প্রচুর টাকা উপার্জন করে। আমাদের ব্যবসা বন্ধ হ'য়ে গেলে তাদের সেই উপার্জনের পথ-ও বন্ধ হ'য়ে যাবে, সেকথা তারা ভালোভাবেই জানে। তাই আমার মনে হয়, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের দিক থেকে আমাদের তেমন কোনো ভয়ের আশঙ্কা নেই।

—কিন্তু হরিশ মুকার্জি? সেই কুখ্যাত নেটিব এডিটরটা অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য। বদমাশটা কিভাবে আমাদের পেছনে লেগেছে তা নিশ্চয়ই আপনার অজানা নয় মিস্টার ক্লার্ক?—বললেন মিস্টার ফোর্ব্‌স্‌।

—জানি। সবই জানি মিস্টার ফোর্ব্‌স্‌। তাছাড়া, সব নেটিব জমিদারই যে আমাদের পক্ষে আছে, এমন কথাও আমি বলিনি। হরিশ মুকার্জি জমিদার নয়, তা তো আপনি জানেন? তার ওপরওলা কর্নেল চ্যাম্প্‌ নিজের পিঠচাপড়ানি না থাকলে সে-লোকটা এতখানি এগোতো কিনা, কে জানে! সে যাই হোক, জমিদার সদস্যদের ভেতর উত্তরপাড়ার জয়কিষ্টো মুকার্জিও যে আমাদের শত্রুপক্ষ তা-ও আমি জানি। তবু এটুকু আমার কাছে জেনে রাখুন, হরিশ মুকার্জি যা ক'রছে তা ব্যক্তিগতভাবেই ক'রছে। সমিতির কোনো নির্দেশ তার ওপর নেই। বরঞ্চ, তার বাড়াবাড়িতে ওই জয়কিষ্টো মুকার্জির মতো দু'একজন ছাড়া অন্যান্য জমিদার-সদস্যেরা রীতিমতো অসন্তুষ্ট।

—তা হ'তে পারে। কিন্তু তাতে আমাদের লাভ কী মিস্টার ক্লার্ক? এটা এখন খুবই স্পষ্ট যে, প্ল্যান্টারদের সঙ্গে একটা সংঘর্ষের জন্যে তৈরি হ'য়েই শয়তান হরিশ মুকার্জি মাঠে নেমেছে। তার সঙ্গে আবার জুটেছে, চার্চ মিশনারি সোসাইটির কয়েকটা বজ্জাত পাদরি। নীলচাষে আমার অভিজ্ঞতা যথেষ্ট মিস্টার ক্লার্ক! আমাকে অনেক খবরই রাখতে হয়। মিস্টার লঙ, মিস্টার বম্‌ভেইট্‌শ্‌ আর মিস্টার সুড় আমাদের বিরুদ্ধে খুবই বেয়াড়াপনা আরম্ভ ক'রেছেন! —উত্তেজিত-স্বরে বক্তব্য শেষ ক'রলেন ফোর্ব্‌স্‌।

ওয়াল্টার ব্রেট একটু রহস্যময় হাসি হেসে ব'ললেন, সেটা তো খুবই স্বাভাবিক মিস্টার ফোর্ব্‌স্‌! কারণ, এদের একজনও ব্রিটিশ নয়। একজন আইরিশ আর দু'জন জার্মান মিশনারি

এই সুযোগে মজা দেখছে! বম্‌ভেইট্‌শ্‌ তো শান্তিপুরের ওদিকে বল্লভপুর গ্রামে একটা অখাদ্য নেটিব মেয়েকে বিয়ে ক'রে নিজেও নেটিব হ'য়ে গেছে।

ক্লার্ক ব'ললেন, আমরা বোধ হয় আলোচনার মূল প্রসঙ্গ থেকে অনেকখানি দূরে স'রে এসেছি!

ফোর্ব্‌স্‌ ব'ললেন, খুব বেশি দূরে নয় মিস্টার ক্লার্ক। গত কয়েক বছর ধ'রে দক্ষিণ বাঙলায় প্ল্যান্টারদের একটা দুঃসহ অবস্থার ভেতর কাটাতে হচ্ছে। দু'একটা নেটিব নেড়িকুত্তা এডিটরকে নিয়ে মাথা ঘামাই না, কিন্তু সি-এম-এস্‌-এর ওই কয়েকটা মিশনারি যেভাবে আমাদের সঙ্গে শত্রুতা ক'রছে তা নিয়ে চিন্তার যথেষ্ট কারণ আছে। লণ্ডনে এম-পি আর্থার কিনেয়ার্ড নিজে চার্চ মিশনারি সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত, তা আপনি নিশ্চয়ই জানেন? পার্লিয়ামেন্টে মিস্টার কিনেয়ার্ড বহুবার সরাসরি আমাদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার ক'রেছেন। সেই একই ব্যক্তি আবার এই রিফর্ম সোসাইটির একজন কর্মকর্তা। সুতরাং আমরা হাত মেলাবো কাদের সঙ্গে?

—এ-প্রশ্ন আমারও।—গম্ভীরমুখে ব'ললেন থিয়োবোল্ড।—মিস্টার ডিকিন্সনের সদিচ্ছায় আমি সন্দেহ প্রকাশ ক'রতে চাই না। কিন্তু প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক হিসেবে আমাকে অবশ্যই ভাবতে হবে, এধরনের সহযোগিতার ফলাফল কী হ'তে পারে। আমাদের পক্ষে অনুকূল মতামত তৈরি করবার উদ্দেশ্যে দু'বছর আগে আমি যখন লণ্ডনে গিয়েছিলাম তখন এই সমস্ত তথাকথিত মানবতাবাদীদের সম্বন্ধে আমার বেশ কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতা হ'য়েছে বলা যেতে পারে। তাঁরা হোমে ব'সে শৌখিন রাজনীতি করেন ব'লে সব সময় গালভরা আদর্শের বুলি আউড়ে নিজেদের বাজার তাঁদের গরম রাখতেই হয়। হাজার হাজার মাইল দূরে এই অসভ্য, বর্বরদের দেশে বাস ক'রে এত কষ্টের ভেতর জীবন কাটিয়ে যাঁরা গ্রেট ব্রিটেনের সম্পদ বৃদ্ধি ক'রে চ'লেছেন, তাঁদের সম্বন্ধে ওই র‍্যাডিক্যালেব দল বড়ো বেশি উন্নাসিক! কিন্তু সৌভাগ্যের কথা, ও'রা ছাড়াও পার্লিয়ামেণ্টে আরো অনেক সদস্য আছেন যাঁদের বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করবার কাণ্ডজ্ঞান লুপ্ত হয়নি। সেই কারণেই যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমার হোমে যাওয়া, তা সফল হ'য়েছে ব'লে আমার বিশ্বাস। পার্লিয়ামেন্টে আমাদের পক্ষ সমর্থনের জন্যে এমন কিছু নির্ভরযোগ্য সদস্য পেয়েছি যাঁরা এই শৌখিন র‍্যাডিক্যালদের সঙ্গে সমানে লড়াই চালাতে সক্ষম। তা নইলে এরা যা অবস্থা তৈরি ক'রে আনতে চলেছিল তাতে আমাদের সমূহ অশান্তি দেখা দিতে পারতো!

ওয়াল্টার ব্রেট ব'ললেন, আচ্ছা, এ'দের মতলবটা কী? এ'রা কি চান না বৃটিশজাতের সম্পদ আরো বৃদ্ধি পাক?

মৃদু হেসে থিয়োবোল্ড উত্তর দিলেন, মনে হয়, তা অবশ্যই চান। কিন্তু সেটা যেন চিকেন স্যাণ্ডউইচ-ও খাবো অথচ বেচারা চিকেনের জান্‌ বাঁচিয়ে তৈরি ক'রে দিতে হবে—এই গোছের আবদার আর কি! মনে হ'চ্ছে, এই মানবতাবাদীর দল প্রত্যেকেই পার্লিয়ামেন্টে বক্তৃতার ভেতর দিয়ে দু'চারখানা ক'রে আঙ্কল টম্‌স্‌ কেবিন লিখে রেখে যাবেন ব'লে মনস্থ ক'রেছেন!

সবাই হো হো ক'রে হেসে উঠলেন।

হাসির রোল থামার পর থিয়োবোল্ড আবার ব'ললেন, র‍্যাডিক্যালদের ধারণা, আমরা এখানেও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মতো ক্রীতদাস খাটাচ্ছি। কিন্তু এখানকার নেটিব রায়তগুলো যে এদেশের বিষাক্ত সাপ কোব্‌রার চেয়েও মারাত্মক, সে-ধারণা ও'দের নেই। তবে মনে হয়, মিউটিনির পর হিউম্যানিটারিয়ানদের দর্শনতত্ত্বের ঝাঁজ একটু ক'মেছে। এইতো আমাদের কুলি-দরদী মিস্টার ক্লার্ক এখানে রয়েছেন। একসময় কুলি-নির্যাতনের বিরুদ্ধে চেঁচিয়ে উনি তো যথেষ্ট নাম ক'রেছিলেন। মিস্টার ক্লার্ক এখন কী বলেন?

একটু অপ্রতিভভাবে মুচ্‌কি হেসে লণ্ড্‌ভিল ক্লার্ক উত্তর দিলেন, দেখুন, নিবুদ্ধিতার জীবাণু যে কোনো সময়েই যে কোনো সুস্থ, স্বাভাবিক মানুষকেও আক্রমণ ক'রতে পারে। সে-সময় আমি আক্রান্ত হ'য়েছিলাম মনে হয়।

আবার সম্মিলিত হাসির রোল উঠলো।

হাসি থামার পর ফোর্ব্‌স্‌ ব'ললেন, মিস্টার ডিকিন্সনের চিঠিতে দু'টো শর্ত আছে। প্রথমত, তাঁদের আন্দোলনে সহযোগিতা ক'রতে হবে। দ্বিতীয়ত, তাঁদের সমিতিকে অর্থসাহায্য ক'রতে হবে। এ-দুটো শর্তে রাজী হ'লে তবেই তাঁরা আমাদের স্বার্থ দেখবেন, সোজা কথায় এইতো তার মানে দাঁড়ায়?

—আর, বাঁকা কথায় সম্ভবত এই মানে দাঁড়াবে যে, আমাদের টাকায় মাংস খেয়ে আরো তাগ্‌ড়াই হ'য়ে আমাদের দেখলেই তাঁরা ঘেউ ঘেউ ক'রবেন।—ব'ললেন ফোর্ব্‌স্‌।

—সেটা বিচিত্র নয়।—থিয়োবোল্ড ব'ললেন।—সম্ভবত ও'রা কোনো সূত্রে খবর পেয়েছেন যে, পার্লিয়ামেন্টে আমাদের পক্ষ সমর্থকদের জন্যে বেশ একটা মোটা অঙ্কের টাকা আমরা খরচ ক'রছি এখন। সেটা টাকাটা নিজেদের তহবিলে ভ'রে ফেলার জন্যেই চিঠিতে এত মোলায়েম সুর! ধরা যাক, ওদের প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে আমরা অর্থসাহায্য ক'রলাম। কিন্তু আইন আর বিচার-ব্যবস্থা সংস্কারের এই যে আর একটা কাঁটা? আমরা নেটিবদের যে উদ্ধত, দুর্বিনীত ব্যবহারের নমুনা দেখছি তার পরেও কি কোনো আইনসংস্কারের প্রস্তাবে সায় দেওয়া উচিত হবে?

সমস্বরে সবাই ব'ললেন, না!

থিয়োবোল্ড আবার ব'ললেন, তা সত্ত্বেও ধরা যাক, ইণ্ডিয়ান রিফর্ম সোসাইটির সমর্থনের আশায় আমরা আংশিকভাবে তাতে রাজী হ'লাম। তাতেও নতুন জটিলতার সৃষ্টি হবে। বিচার-ব্যবস্থার কোনোরকম সংস্কার মানেই জেলা আর মহকুমার সংখ্যাবৃদ্ধি। সঙ্গে সঙ্গেই আমদানি হবে নতুন কিছু সিবিলিয়ান। সেই দলে যদি পিটার গ্র্যান্ট, অ্যাশলি ইডেন, সীটনকার, হার্শেল কিম্বা বেইলির মতো আর কয়েকটা র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট এসে গেড়ে বসে তখন আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে। আমরা কি আইনসংস্কারের ফাঁস গলায় প'বে এইরকম বেয়াড়া আরো কিছু স্বজাত সিবিলিয়ানের আসার পথ খুলে দেবো?

আবার সমস্বরে উত্তর, না!

পরিতৃপ্ত দৃষ্টিতে সবায়ের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে থিয়োবোল্ড ব'ললেন, ধন্যবাদ! আমি এই সপ্তাহের জাহাজেই উত্তর দিয়ে দিচ্ছি—দুঃখিত। সম্মত হওয়া সম্ভব হ'ল না।

॥ ষোলো ॥

কপোতাক্ষ থেকে ভৈরব নদ যেখানে বেরিয়ে এসেছে তার মাইল দু'য়েক দক্ষিণে একটা জঙ্গলের ভেতর প্রতীক্ষা ক'রছে দিগম্বর বিশ্বাস। সঙ্গে ছকু ঢালি আর সোরাব আলী।

পৌষের শেষ। কন্‌কনে উত্তুরে হাওয়ার সঙ্গে দুরন্ত শীত। রাত দ্বিতীয় প্রহর পেরিয়ে গেছে। রাত যত গভীর হচ্ছে, কুয়াশার আস্তরণও তত জমাট বাঁধছে। কৃষ্ণা একাদশীর নিস্তেজ চাঁদের ভগ্নাংশ তখন সবে দেখা দেওয়ার উদ্যোগ ক'রছে।

ছকু একটু অসহিষ্ণুস্বরে ব'ললে, তেনারা অ্যাকনতক্‌ আসচে না তো বাবু? শ্যাষ তাবাদি আসবে তো?

—আসবে, নিচ্চয় আসবে!—ব'ললে দিগম্বর, নিশেনা চিন্‌তি হয়তো দেরি হচ্চে।

সোরাব ব'ললে, নিশেনা চিন্‌তি দেরি হবে ক্যান? ম্যাঘাই সদ্দার সঙ্গে আচে না? সে তো এ-জঙ্গল ভালো ক'রেই চেনে! ক্যান ঝে দেরি হচ্চে—

দিগম্বর মৃদু হেসে ব'ললে, তা তো চেনে। কিন্তু তোরা এত অধৈয্যি হলি লড়াই চালাবি কেমন ক'রে রে সোরাব?

—অধৈয্যি হবো ক্যান, বাবু? ফজরের আগেই তো শ্যাষ রাত্তিরির আন্ধারে এথেনেথে পলাতি হবে? আপনার কোনো বেপদ-খত্‌রা না হয় সেই কতাই ভাব্‌তিচি।

মুচকি হেসে দিগম্বর ব'ললে, ক্যান, তোরা দুইজন জোয়ান তো আছিস? বেপদ হলি মহড়া নিতি পারবিনে?

—জান্ কবুল, বাবু!—ব'ললে সোরাব।

—এ-সময় জান্‌ডা বড়ো দামী রে সোরাব! কতায় কতায় ওডা কবুল ক'রে বসিস্ নে!

ছকু ব'ললে, এত হাংনামার মদ্দিও বাবুর অং-তামাশা যায় না!

আবার একটু হাসলো দিগম্বর। ব'ললে, বেঁচি থাকতি হবে তো?

আজ প্রায় তিনমাস হ'ল দিগম্বর আত্মগোপন ক'রে আছে। বিষ্ণুচরণও তাই। তাদের দু'জনকে খতম করবার কোনো চেষ্টাই বাকি রাখেনি লারমুর সাহেব। কিন্তু লোকদু'টোর কোনো হদিস-ই নেই। চৌগাছার এই দুই বিশ্বাসের বিষদাঁত ভেঙে দেবার জন্যে চারদিকের সব নীলকরই লার্মুরের সঙ্গে সহযোগিতা ক'রতে প্রস্তুত। কাচিকাটা কুঠির আর্চিবল্ড হিল্স্, সুজনপুর কুঠির ডম্বাল, লোকনাথপুরের ডেভিস, সিন্দুরিয়ার ম্যাকনেয়ার—প্রত্যেকেই চায় ওই নেটিব গ্রাম্য নেতা দু'টোকে খতম ক'রে দেওয়া হোক। বিশেষ ক'রে বাঁশবেড়িয়া কুঠির যুবক নীলকর উইলিয়ম হোয়াইট তো একেবারে মরীয়া। কারণ, দিগম্বর আর বিষ্ণুচরণ উইলিয়মের বাবার আমল থেকে বেশ কয়েকবছর বাঁশবেড়িয়া কুঠিতে চাকরি করবার পর যেন উইলিয়মকে অপমান করবার জন্যেই চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে চ'লে গেছে। তারাই এখন নীলকরদের পয়লা সারির দুশ্মন!

মাসতিনেক আগে লারমুর সাহেবের চক্রান্তে এক গভীর রাতে চৌগাছা গ্রামের ওপর হাজার লেঠেলের যে নৃশংস হামলা হ'য়েছিল তার কয়েকদিন পর থেকেই দিগম্বর আর বিষ্ণুচরণ গ্রাম থেকে পলাতক। তারা বুঝতে পেরেছিল, গ্রামে থাকলে জীবন-সংশয়। ক্ষিপ্ত লারমুর আবার আঘাত হানবে। অথচ কুঠিয়ালগুলোকে শায়েস্তা করবার জন্যে এখন বেঁচে থাকা দরকার। বরিশাল জেলা থেকে পাকা লেঠেল আনানো, গ্রামে গ্রামে তাদের দিয়ে জোয়ান ছেলে-ছোকরাদের তালিম দেওয়া—সব কাজই এই পলাতক অবস্থায় ক'রতে হ'য়েছে। সঙ্গে এই ছকু আর সোরাব। থাকার জায়গার ঠিক নেই, খাওয়ার ঠিক নেই তবু কাজ থেমে থাকেনি।

আজ বদ্যিনাথ আর বিশ্বনাথ সর্দার দেখা ক'রতে আসবে ব'লে এই প্রতীক্ষা। ন'দিন আগে তারা দু'জন দলবল নিয়ে বাঁশবেড়িয়া কুঠির ওপর ঝাঁপিয়ে প'ড়েছিল। তছ্‌নছ্ ক'রে দিয়েছে হোয়াইট সাহেবের সাধের নীলকুঠি। সারা এলাকায় কুঠিয়াল সাহেবদের বুকে কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছে দুই বাগ্‌দি সর্দার। তারা খবর পাঠিয়ে দিয়েছে, খুবই জরুরি দরকার। বিশ্বাসবাবুদের সঙ্গে তারা দেখা ক'রতে চায়।

কুয়াশার আস্তরণ আরো জমাট বেঁধেছে। ঠাণ্ডায় হাত-পা বরফের মতো ঠাণ্ডা। আগুন জ্বালতে পারলে ভালো হ'ত। কিন্তু তার উপায় নেই। আকাশে বিবর্ণ পাণ্ডুর চাঁদ একটু আগে দেখা দিয়েছে। কিন্তু তার এক চিলতে আলোও সরাসরিভাবে জঙ্গলের ভেতর ঢুকতে পারেনি।

একটু পরেই শুকনো ঝরাপাতার ওপর যেন পায়ের শব্দ শোনা গেল। শব্দ কাছে এগিয়ে আসছে। আসাননগরের মেঘাই সর্দার এ-জঙ্গলের অন্ধি-সন্ধি চেনে। সে-ই ব'লেছিল, বনের উত্তর-পুব নদীর ধার-বরাবর পাশাপাশি দু'ডো সেগুনগাছ আচে। এট্টুস্ তফাতেই দ্যাকবেন একটা মুচ্‌কুন্দ চাঁপার গাছ। আপনি সেই জায়গায় থাকবেন বাবু। ওনাদের সঙ্গে নে' আমি ঠিক জায়গামতো এসি যাবো।

একটু পরেই অন্ধকারে দেখা গেল, কয়েকটা ছায়ামূর্তি এগিয়ে আসছে। মেঘাই সর্দারের গলার সাড়া পাওয়া গেল।—চক্‌মকি নে' আলাম, বাবু! সঙ্গে আর একঝনা আচেন—সাবেক আমলের চক্‌মকি!

চক্‌মকি মানে বদ্যিনাথ আর বিশ্বনাথ।

একটা মশাল জ্বাললো মেঘাই সর্দার। ব'ললে, শালা কুটেলগোর বাপের সাদ্যি নাই এই জঙ্গলে সে'দোয়। নেন বাবু, চক্‌মকি চিনে নেন!

এতক্ষণ ধ'রে নিকষকালো অন্ধকারে ঢাকা গাছতলাটা মশালের আলোয় হঠাৎ যেন বড়ো বেশি আলোকিত মনে হ'তে লাগলো। সেই আলোয় বদ্যিনাথ আর বিশ্বনাথকে দেখলো দিগম্বর। দু'জনেরই বয়স তিনের কোঠায়। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, রঙ নিকষকালো। চাদরে সারা শরীর ঢাকা থাকলেও হাতের কব্‌জি দেখেই বোঝা যায়, একেবারে পেটা গড়ন। হাতের লাঠি নুইয়ে মাথা নীচু ক'রে তারা দু'জনেই দিগম্বরকে প্রণাম্‌ জানালো।

তাদের পেছনে দাঁড়িয়ে বুড়ো করালী সর্দার। তাঁকে দেখিয়ে মেঘাই ব'ললে, বাবু, ইনিই হলেন সাবেককালের চক্‌মকি। আমান্দের জন্মেরও আগে সেই ঝে কুটেলের যম জব্বর নড়াই ক'রেলেন, ইনি তেনারই সাগরেদ ছেলেন। এনার নাম করালী সর্দার।

একগাল হেসে করালী ব'ললে, বাবু, নিজির বয়েসকালে তো কাজের কাজ কিছু কত্তি পাল্লাম না তাই তিনকাল বাদে লাতিপুতিগো আমলে কিছু হয় কিনা দেকতি এয়িচি।

—ক্যান দাদা, লাতিপুতির আমলে কিছু হচ্চে না?—বিশ্বনাথ হেসে ব'ললে, সেই ঝে সিদিন হুইট সায়েবডারে ন্যাজে-গোবরে ক'রে দে' আলাম, সেডা কও?

—হ, তা করিচো!—পরিতৃপ্তির হাসি হেসে করালী ব'ললে, আমার গুরুও ফিটি সায়েবডারে আচ্চা শিক্কে দিয়েলো রে ভাই কিন্তুক তেনার ছেলো দয়ার শরীল! ম্যামসায়েব বেধবা হবে ক'য়ে ফিটি সায়েব যেই কান্দন জুড়ে দেলে, মায়ের জেতের কতা ভেবি ওস্তাদেরও মন লরম হ'য়ে গ্যালো। আমান্দের ম্যাঘাদা ওস্তাদরে বারবার কয়েলো, ওস্তাদ, এই গুয়োডার মায়াকান্নায় ভুলো না! এ-শালা দোজকের শয়তান! এর কোনো কতার দাম নাই। কিন্তু দয়ার শরীল ওস্তাদ সেই বেইমানেরে ছেড়ি দে' নিজির সব্বোনাশ ডেকি আনলেন!

পঞ্চাশ-একান্ন বছর আগেকার সেই ঘটনার স্মৃতি মনে প'ড়তেই চোখ ছলছল ক'রে উঠলো করালীর। চাদরের খুঁটে চোখ মুছে আবার ব'ললে, বাবু, বড়ো আশা নে' অ্যাদ্দিন বেঁচে আচি! নীলবিষির ওই কালকেউটেগুলো আর কোন্দিন ফণা তুলতি পারবে না—তাই দেকে তয় চিতেয় উঠতি যাবো। এ-চালানে হবে তো বাবু?

হবে ভেবিই তো কাজে নেমিচি, কত্তা! অ্যাখন দেখা যাক, ভগমানের মনে কী আচে!—ব'ললে দিগম্বর।

—হবে বাবু, আলবাৎ হবে!—সতেজে ব'লে উঠলো বদ্যিনাথ, আর কদ্দিন প'ড়ে প'ড়ে মার খেয়ি যাবো? আপনাদের ছিচরণের আশীব্বাদে পেখম বৌনি করিচি খালবোয়ালির কুটিতি। এই সিদিন আবার বাঁশবেড়ের ছোকরা কুটেলডারে ভালোমতো শিক্কে দে' আলাম। এর পরেও ওই সুমুন্দিগার চটক ঝেদি না ভাঙে তো পরের দফায় কবরে পাঠাবো!—আপনারা তো ওই বাঁশবেড়ের কুটিতিই কাজ করতেন তাই না বাবু?

—হ রে ভাই!—একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে দিগম্বর ব'ললে, অনেক পাপ ক'রেলাম! তাও কই ভাই, ওর বাপ বুড়ো হোয়াইট সায়েব কিন্তু এত রক্তচোষা পিশেচ ছেলো না। সিনি ঝ্যাদ্দিন নীলির কারবার ক'রে গিয়েচেন ত্যাদ্দিন গরীব রেয়েদের চোখির জল এমন ঝোঝাতে লাগেনি। ছেলেডার হাতে কারবার তুলে দে' সিনিও বেলাতে পাড়ি দেলেন আর রেয়েদেরও কপাল ভাঙলো! ন'দে জেলার হাকিম তখন কাক্‌রোল সায়েব, তা মনে আচে তো? সেই নম্পট হাকিমডার সঙ্গে নিজির সোমত্ত বৌডারে শুতি দে' সেডারেও হাত ক'রে নেলে। তার পরেথেই আরাম্ব হ'য়ে গেল ছোটো সায়েবের রক্তচোষার দাপট। বিষ্টু আর আমি অনেক বাধা দিয়েলাম কিন্তুক সাহেব তখন বেপরোয়া। আমাদের দুইঝনারে গুমখুন করার-ও মতলব এ'টেলো। সে-খবরডা পেতিই চাকরিতি এস্তফা দে' দুইঝনাই দিনির আলোয় কুটি ছেড়ি চ'লে আলাম। পিতিজ্ঞে নেলাম, অ্যাদ্দিন নীলকুটিতি চাকরি ক'রে ঝে পাপ করিচি, তার পেরাচিত্তির না ক'রে আর কথা নাই!

দিগম্বর খুব সংক্ষেপেই ব'লেছে।

দু'বছর আগে বাঁশবেড়িয়া নীলকুঠির দেওয়ান বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস আর নায়েব দিগম্বর বিশ্বাস একই সঙ্গে যেদিন চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে বেরিয়ে আসে সেইদিনই রাত ঘনিয়ে এলে তাদের দু'জনকে অতর্কিতে খতম ক'রে কুঠির পেছনদিকে কলিঙ্গা নদীর জলে ফেলে দেবার সব ব্যবস্থা ক'রে রেখেছে ছোকরা হোয়াইট সাহেব। কিন্তু সময়মতো খবরটা পেয়ে যাওয়ায় হোয়াইটের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হ'ল।

জন হোয়াইট যৌবনেই বাঁশবেড়িয়ায় নীলকুঠির পত্তন ক'রেছিলেন। নীলকর হিসেবে তাঁকে ব্যতিক্রম-ই বলা চলে। বহু বছর ধ'রেই তিনি নীলের ব্যবসা ক'রেছেন তবে তাঁর লোভ ছিল সীমিত। সেই কারণে এই কুঠির এলাকার চাষীরা অন্যান্য এলাকার চেয়ে কিছু শান্তিতে ছিল। তাঁর আমলে কোনো বিরোধের ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু বুড়ো বাপের অত অল্প লাভে সন্তুষ্ট থাকার ব্যাপারটা যুবক ছেলে উইলিয়ম হোয়াইটের সহ্যের সীমা অতিক্রম ক'রে গেল। পাশাপাশি আর সব ছোটোখাটো কুঠিরও লাভের অঙ্ক যখন বছরে লাখ টাকা থেকে দু'লাখ টাকায় পেঁছে যাচ্ছে তখন বাঁশবেড়িয়া কুঠির লাভের অঙ্ক একলাখ টাকা পর্যন্তও পেঁছচ্ছে না। এই নিয়ে বাপ-ছেলেতে মন-কষাকষি ক্রমেই বেড়ে উঠছিল। শেষ পর্যন্ত সেপাই-বিদ্রোহের আগুন একটু স্তিমিত হ'তেই নীল কুঠি ছেলের হাতে দিয়ে দেশে চ'লে গেলেন জন হোয়াইট। উইলিয়ম হোয়াইটের হাতে দায়িত্ব আসতেই কুঠির হাল-চাল, কেতা-কায়দা সব পাল্টাতে আরম্ভ হ'ল। কাচিকাটা কুঠির আর্চিবল্ড হিল্স্ হ'য়ে দাঁড়ালো উইলিয়মের পরামর্শদাতা, মোল্লাহাটি কুঠির লারমুর আর ফর্লঙ হ'ল তার আদর্শ। সেই সময়েই তার বিরোধ শুরু হ'ল কুঠির দেওয়ান বিষ্ণুচরণ আর নায়েব দিগম্বরের সঙ্গে। জন হোয়াইটের আমলে নিরক্ষর চাষীরা কুঠিতে দশ আঁটি নীলগাছ জমা দিলে খাতায় দশ আঁটিই লেখা হ'ত। উইলিয়ম চায়, পাঁচ আঁটি লেখা হোক। বিষ্ণুচরণ আর দিগম্বর কেউ তাতে রাজী নয়। হিসেবের কারচুপি ক'রে প্রজার পাঁচ বিঘে জমিকে দুই বা তিন বিঘে ব'লে খাতায় তুলতে তারা অনিচ্ছুক। তামাদি এক্রারনামাকে হাল খতিয়ানে তুলে তাকে জীইয়ে রাখার তারা একান্ত বিরোধী। জন সাহেবের আমলে এ-সব কখনো করা হ'ত না। সুতরাং উইলিয়মের বাবার পেয়ারের দুই নেটিব চাকর উইলিয়মের পথের কাঁটা হ'য়ে দাঁড়ালো। এই অবাধ্য, বেয়াড়া নেটিব শয়তান দুটো যতদিন থাছে ততদিন লাভের অঙ্ক বাড়ানোর পথে প্রতি পদেই বাধা আসবে বুঝতে পেরে তাদের একেবারে সরিয়ে দেওয়ার ফন্দি আঁটতে বাধ্য হ'য়েছিল উইলিয়ম। ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার ককারেল তার হাতের মুঠোয়। কুঠির সর্দার লেঠেল ভোজপুরিয়া রামজনম যেমন নৃশংস তেমনি বিশ্বাসী। রাতের অন্ধকারে দুই বিশ্বাসকে খুন ক'রে কলিঙ্গা নদীর জলে দু'টো লাশ অনায়াসেই ফেলে দিতে পারবে সে। আপদ চুকে যাবে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত উইলিয়মের আপদ চুকলো না। দু'বছর আগে রামজনমের বৌ লখিয়ার হ'য়েছিল মায়ের দয়া। গুটি বসন্তে তার যে-অবস্থা হ'য়েছিল তাতে বাঁচার কথা নয়। কিন্তু তার নিজের কপালজোরেই হোক অথবা দিগম্বরের দেওয়া জরিবুটির গুণেই হোক, লখিয়া বেঁচে উঠলো। সেই থেকে সে দিগম্বরকে ধর্মবাপ ব'লে মান্তো। মাতাল স্বামীর মুখে পরের দিন রাতে সম্ভাব্য ঘটনার আভাস পেয়ে সেই রাতেই দিগম্বরকে জানিয়ে গিয়েছিল লখিয়া। পরের দিন সকালেই চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে বিষ্ণুচরণ আর দিগম্বর কুঠির হাতা থেকে বেরিয়ে এলো। সারা উত্তরভারত জুড়ে তখন বিদ্রোহের আগুন দাউদাউ ক'রে জ্বলছে।

সেইসব কথা ভাবতে ভাবতে একটুক্ষণের জন্যে অন্যমনস্ক হ'য়ে প'ড়েছিল দিগম্বর। সে ভাবটা কেটে যাওয়ার পর ব'ললে, ছোটো সায়েবেরে কি হাতের নাগালে পেয়িচিলে তোমরা?

—না বাবু।—জবাব দিলে বদ্যিনাথ।—সেইডেই তো আপসোস থেকি গ্যালো।—তয় কিনা কুটির গোলামগুলো কাউরি বাকী রাখি নাই। পরে শোনলাম, ম্যামসায়েব নাকি তরাসের চোটে কেলে হাঁড়ি মাথায় দে' কলিঙ্গার জলে গলা এস্তক ডুব্য়ে নুইকে রয়েলো।

সঙ্গে সঙ্গে করালী ব'ললে, আমরাও ঝ্যাকন ফিটি সায়েবের কুটীতি হাম্‌লে পড়েলাম, সিদিন তেনার ম্যামসায়েবও এই কারবারই ক'রেলো রে ভাই! তয় কিনা আমাদের সন্দারের কড়া হুকুম ছেলো, মায়ের জেতের গায় হাত দেবা না! আমরা ম্যামসায়েবেরে ক'লাম, তোমার কোনো ভয় নাই ম্যামসায়েব! আমরা ইস্তিরি জেতের গায় হাত দিই না!

একটু উত্তেজিতভাবে মেঘাই সর্দার ব'ললে, কত্তা, সে আজ কত সন আগের কথা! পঞ্চাশ বচ্ছরে জমানা অনেক পাল্‌টে গিয়েচ্‌! সারা ন'দে, যশোর, পাবনা, ফরিদপুর জেলায় অন্তেরা নে' দেকে এসো, ওই কুটেল সুমুন্দিরা আমাদ্দের ঘরের কত শ'য় শ'য় বৌঝির এজ্জৎ কেড়ি নিয়েচ্‌! ওদ্দের আবার দয়া কিসির?

দিগম্বর ব'ললে, কী কচ্ছিস ম্যাঘাই? ওরা ঝা করেলো, আমরাও কি তাই কত্তি পারি? না, না, মায়ের জেতের এজ্জতে হাত দেয়া পাপ!

সোরাবের চোখ দু'টো হঠাৎ আহত বাঘের মতো হিংস্র হ'য়ে উঠলো। তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে চৌগাছায় সেই ভয়ঙ্কর রাতের ছবি। পাঁচু শেখের মেয়ে আনোয়ারা......মণ্ডলপাড়ায় ডোবার ধারে একটা নিসিন্দেগাছের নীচে প'ড়ে-থাকা অজ্ঞান মেয়েটা......পরনের শাড়ি নিখোঁজ...... চাপ চাপ রক্ত জ'মে আছে তার উরু থেকে গোড়ালি পর্যন্ত......যার সঙ্গে সোরাবের শাদির কথা পাকা হ'য়ে গিয়েছিল!

দাঁতে দাঁত চেপে সোরাব ব'ললে, ক্ষেতি কী বাবু? ঝ্যামন কুকুর তার তেমনি মুগুর না হলি কুকুর সজুৎ হবে ক্যান?

সোরাবের পিঠে হাত রেখে দিগম্বর ব'ললে, কুকুর কুকুরির মতোই আচরণ করে সোরাব! মানুষির কি কুকুরির আচরণ মানায়? আমরা কুটেলদের নীলির চাষ বন্দ কত্তি চাই—অত্যেচারের পিতিবিধেন কত্তি চাই!

মেঘাই ব'ললে, খালি চাষ বন্দ করেই ক্ষান্তি নাই বাবু, নীল মেমদোগুলোরে দেশছাড়া এস্তক ক'রে ছাড়বো! এই ধরেন, কাচিকাটা কুটির ইলিস সায়েব বড্ড বাড় বেড়ি গিয়েচ্‌। ওডারেও জলদি জব্দ করা দরকার!

বিশ্বনাথ সঙ্গে সঙ্গে ব'ললে, সে-বস্তাও হচ্চে ম্যাঘাইদা! ব্যাতাই গেরামের ঈসুব বিশ্বেস আর বেন্দাবন দত্ত দল গড়াতি নেগিচে। ইলিস সায়েব শিগগিরই ছ্যাঁচা খাবে, কোনো [illegible] নাই। তোমার উদিকি জামকেষ্টরে ছ্যাঁচার কী বস্তা করেচো, তাই কও!

জামকেষ্ট অর্থে নীলকর জেম্‌স্‌ রক্‌হিল।

একটু মুচকি হেসে মেঘাই ব'ললে, বস্তা হচ্চে রে ভাই, হচ্চে! আমার আসানলগর গেরামে গেলিই মালুম পাবা। অ্যাকন খালি এইটুকু কতি পারি, আসানলগরের পাঁচ-সাত কোশ চৌহদ্দির মদ্দি কোনো নীল মেম্‌দোও নাক গলাতি পারবে না, কেরেস্তান পাদ্‌রিও পাত্তা কত্তি পারবে না!

ছকু সোৎসাহে ব'ললে, সেইডেই করো দিনি ম্যাঘাইদা! কথায় কয়, জমির শত্তুর নীল, জেতের শত্তুর পাদরি হীল—এডা একেবারে নাখ কথার এক কথা! খান্‌কি [illegible] নালম্‌কো কুটেলগুলো নীলির দাদন ঠেসি তো সর্বোনাশ ঝা করার ক'রেলো তারপর আবার কেরেস্তান পাদরি পেঠ্‌য়ে জেতের দফাও রফা কত্তি চায়? চাপ্‌ড়া, মেলেপোতার পেরায় সব নোমো-বাগদিরাই তো ওদের খপ্পরে ধরা দে' কেরেস্তান হ'য়েচ্‌, তারা কি কুটেলের হ্যাংনামাথে ছাড়ান পেয়েচ্‌? মুই তো শালা নোমোর ছাওয়াল। মুই জান দেবো তভু জাত দেবো না!

দিগম্বর হেসে ব'ললে, তোরে জান্‌ও দিতি হবে না, জাত-ও দিতি হবে না রে ছকু! যে-কাজে লেমিচিস, সেইডেই ক'রে যা। কুটেলরা যতই তড়্‌পাক, মনে মনে কিন্তু ভয়ে সিঁটিয়েচে! ত্যামন ঝাঁপান ঝেঁপ্‌য়ে পড়লি, ভয়ে ওরা তখন পলানোর পথ পাবে না!

তাই ঝ্যান্‌ হয়, বাবু!—আবেগে ধরা গলায় করালী ব'ললে, আমার এই লাতিরা ঝ্যান তাই পারে! বাবু, সেই সাবেক কালে আমার গুরু সেই মোপুরুষ একা ঝ্যা ক'রেলেন, তার তোলোনা

নাই! কিন্তুক অ্যাকন তোমরা জোট বেঁধি শত্তুরির শ্যাষ কত্তি লেগিচো! আমার গুরুর কোনো সহায় ছেলো না, এ-দফায় কিন্তু খুব বড়ো সহায় আচে!

—কী সহায় কত্তা?—বিস্মিত কৌতূহল জিজ্ঞেস ক'রলো দিগম্বর।

করালীর ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ফুটে উঠলো। গায়ের জীর্ণ চাদরখানা খুলে সে কোমরে বাঁধা একটা চওড়া গেঁজে বের ক'রলো। গেঁজের ভেতর থেকে ভাঁজ-করা একখানা ছাপা কাগজ বের ক'রে দিলে দিগম্বরের হাতে।

—হিন্দু পেট্রিয়ট!—প্রচণ্ড বিস্ময়ে হতবাক্ হ'য়ে গেল দিগম্বর। সে-অবস্থা কাটিয়ে কাঁপা উত্তেজিত স্বরে প্রশ্ন ক'রলে, এ-কাগজ তুমি কম্নে পেলে কত্তা?

—যেনার কাগজ সিনিই এ-বুড়োর হাতে দিয়েলেন, বাবু! সেই তাবাদি মুই এরে যতন ক'রে এইভাবেই সঙ্গে নে' ঘুরে বেড়াই।

করালী সর্দার কলকাতায় হরিশের সঙ্গে তার আকস্মিক সাক্ষাৎ এবং পরবর্তী ঘটনা সংক্ষেপে ব'লে তারপর নিজের মন্তব্য যোগ ক'রলো, বাবু, সিনি বেহ্ম। আমাদের ধম্মো মানেন না, তউ মুই বলি সিনি দেবতুল্যি নোক!

—তুমি ভাগ্যিমান, কত্তা!—দিগম্বর অভিভূত স্বরে ব'ললে, ভদ্দরলোকেদের মধ্যি গরীব রেয়েদের খাঁটি বন্ধু যদি কেউ থাকেন তো একমাত্তর এই হরিশ মুকুজ্যেই আচেন! শুনিচি, তিনি শক্ত হাতে কলম ধ'রে কুটেলদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেচেন! এই কাগজ গোয়াড়ি টাউনে কেউ কেউ রাখে শুনিচি। আমি নিজির চোখে আজই এই পেত্থম হিন্দু পেট্রিয়ট দেখলাম!

গোয়াড়ি মানে কৃষ্ণনগর। স্থানীয় লোকের মুখে নামটা দীর্ঘকাল ধ'রে চ'লে আসছে।

কাগজখানা সন্তর্পণে দিগম্বরের হাত থেকে নিয়ে সযত্নে গেঁজের ভেতর ভ'রে রেখে তারপর নিষ্ফল আক্রোশে থর্‌থর্ ক'রে কাঁপতে কাঁপতে পিঁপড়েগাছিতে ক'দিন আগে নীলকরের তাণ্ডবের কাহিনী ব'লে গেল করালী। শেষের দিকে তার গলা একেবারে ধ'রে এলো।—আমার গিরিদিদিরি আর কোনোদিন ফিরে পাবো না তা জানি। আর সহ্যি হয় না ভাই, আর সহ্যি হয় না—

সবাই কয়েকমুহূর্ত নীরব।

একটু প[illegible] দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে দিগম্বর বললে, লড়াইয়ে নেমিচি কত্তা—এবার এস্‌পার কি [illegible] ওস্পারই চন্‌মনাচ্ছে। তবু ধৈয্যি ধরতি হবে।

—[illegible] কুঠেলদের জেতেরে বেশি সময় দেওয়া কি ঠিক, বাবু? বেনাপোল কুটি তো চামচিকে! ও-কুটি দোরস্ত কত্তি কত্‌খন?—ব'ললে বিশ্বনাথ।

মেঘাই ব'ললে, সাচা কথা! বাবু, অ্যাকন তাবাদি খালি বাঁশবেড়ে, খালবোয়ালে আর কাটগড়া কুটি কিছুডা দোরস্ত হ'য়েচ্ কিন্তুক অনেক কুটি বাকী! নিচ্চিন্দিপুর, জোড়াদ', সিন্দুরে, লোকনাথপুর, [illegible]নদি', খাজুরে, কাচিকাটা, কুমোরখালি—সব শালা কুটেলগুলো তড়্‌পাচ্চে! আপনি খালি ক'য়ে দেন, কোন্‌[illegible]র পর কোন্‌ডায় ঝাঁপাবো!

দিগম্বর [illegible] ব'ললে, খালি কুটিতি কুটিতি হামলা কর্‌লিই তো হবে না মেঘাই? নীলির চাষ যাতে পুরো বন্ধ হয় সেদিকিও তো [illegible]র রেখি কাজ কত্তি হবে?

বদ্যিনাথ সঙ্গে সঙ্গে ব'ললে, বন্দ তো পেরায় হ'য়েই এয়েচ্ বাবু! কাটগড়া কুটির নীলখোলায় এ-চালানে এক আঁটি নীলগাছও জমা পড়ে নাই।

—জানি। ওই দশা যাতে সব কুটির-ই হয় সেইডেই তো আমাদের দেখতি হবে! যশোরে সিন্নিবাবু উঠে-প'ড়ে লেগিছেন। ছালকোপা, মীরগঞ্জ, মল্লিকপুর, রামনগর, শোলকোপা-সব কুটির খবর পাচ্চি। উদিকি দামুরহুদায় মহেশ চাটুজ্যেবাবু এমন তাল ঠুকেলেন যে, কুটেলেরা ভয় পেয়ি ছোটোলাট সায়েবের দরবারে গোরাপল্টন চেয়ে দরখাস্ত ক'রেচে।

—তাই নাকিনি? ঠিক আচে! আসুক গোরাপল্টন। দ্যাকা যাক্, কার কত হেক্‌মৎ!—ব'ললে মেঘাই।

দিগম্বর একইরকম শান্তস্বরে ব'ললে, ছোটোলাট গোরাপল্টন পাঠাবে কিনা তাতো এখনো ঠিক হয় নাই? তবে যদি পাঠায় তো তাদের হাতে থাকবে বন্দুক, সেডাও মনে রেখো। যন্দুর খবর পেয়িচি, কাটগড়া কুটি বন্ধ হ'য়ে যাওয়ার পর লালমোনের মতো নরপিচেশও থ' মেরি গেচে। আমাদের ভুলে গেলি চলবে না, গরমেণ্ট ওদের হাতে, কোর্ট-কাচারি ওদের হাতে আর আমাদের আমরা ছাড়া কেউ নাই! অবিশ্যি হরিশবাবুর কলমে আগুন ছোট্‌বে কিন্তুক লড়াই তো আমাদেরই কত্তি হবে? তাই যেটুক্ এগোবা, ভেবেচিন্তে এগোবা! লড়াই আমাদের জিত্‌তিই হবে মেঘাই! ভাবের ঘোরে কাজ করা চলবে না!

করালী ব'ললে, বাবু লেয্য কতাই ক'য়েচে!

দিগম্বর আবার ব'ললে, লাঠি, সুড়কি, অস্তরপাতি কিনতি টাকার দরকার। বিষ্টুদার হাতে আর কত টাকা আছে জানি না, আমার কাছে এখনো হাজার দশেক আছে। নীলকুটীতি চাকরি ক'রে জমানো টাকা। নীলকুটি ধ্বংস কত্তিই যাক্ সে-টাকা। তোমাদের কার কিরকম খর্‌চা লাগবে জানাও!

বিশ্বনাথ ব'ললে, টাকাকড়িতি আমাদের কী দরকার বাবু? কথায় কয়, ঝার শিল ঝার নোড়া তারই ভাঙি দাঁতের গোড়া। কুটি নুট ক'রে ঝা পাবো তাতেই খর্‌চাপাতি চ'লে যাবে। উৎপাতের ধন চিৎপাতেই যাক্! গরীবির চোকি ঝোজানি দে' জল ঝরায়ে ঝে টাকা সুমুন্দিরা সিন্দুকি তোলে সেই টাকা নুট ক'রে নাঠি-সুড়কি-তীর কিনলি কোনো পাপ হবে না, বাবু!

বদ্যিনাথ ব'ললে, আমারও সেই কতা বাবু! ওরা ঝাদের ঘরবাড়ি পুড়্য়ে দেচে, দাদন নিতি না-চাওয়ায় ঝারা কদ খাটতি গেচে, তাদের জন্যি এযাবৎ আপনারা অনেক টাকা-ই খর্‌চা করেচেন তা আমরা শুনিচি। টাকা আপনি তাদের জন্যিই রেখি দেন বাবু, আমরা নড়াইয়ের খর্‌চা ঠিক জোগাড় ক'রে নেবো না কী কও ম্যাঘাদা?

মেঘা ব'ললে, সাচা কতা!

একটু ভেবে দিগম্বর ব'ললে, হুঁ, আরো হাজার হাজার মানষিরি জেলখানায় পুরে দেয়ার ফন্দি ওদের মাথায় আচে তা জানি। ঠিক আছে, টাকা এখন থাক। সেই দুর্দিনি হয়তো কাজে লাগবে। কুটেলরা এবার মরণ-কামড় দেবেই! তবে এ-ও ক'য়ে রাখি, টাকার দরকার হলিই চেয়ি নেবা। ও পাপের টাকা আমাদের পেরাচিত্তিরেই খর্‌চা হোক! একটা পাই পয়সাও রেখি দেবো না—একটাও না—

করালীর দু'চোখে জল। সবায়ের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে আবেগে সে ব'লে উঠলো, এ-চালানে জিৎ হবেই! তোমরা পার্‌বা! তোমরা পার্‌বা!

॥ সতেরো ॥

উত্তরপাড়া থেকে কয়েকদিন আগে ভবানীপুরে এসেছিল রাজচন্দ্র। তার এক ছেলের উপনয়ন তাই নেমন্তন্ন ক'রতে এসেছে।

কথায় কথায় রাজচন্দ্র ব'ললে, হরিশ যেভাবে তেড়ে ফুঁড়ে নীলকর সায়েবদের পেছনে লেগেছে তাতে বড়ো ভয় হচ্চে ছোটোমা! ওরা ক'রতে পারে না, এমন কাজ নেই।

রুক্মিণী হতাশভাবে ব'ললেন, ওকে ঠেকাতে আমার কি অসাধ, বাবা? কিন্তু ও-ছেলেকে ঠেকাবে কে?

কাছেই ছিল মাধুরী।—কাকাবাবু তো কোনো খারাপ কাজ কচ্চেন না জ্যাঠামশাই? সবাই তেলা মাথায় তেল দেয়। কাকাবাবু গরীবের চোখের জল মোছাতে কলম ধ'রেচেন!

সস্নেহ হাসি হেসে রাজচন্দ্র ব'ললে, তা কি আর জানিনে রে মা? হরিশ আমাদের ভাই

ব'লে কত গর্বে বুক ফুলিয়ে চলি। কিন্তু অন্য দিকটাও তো আছে? নীলকর সায়েবদের একটা সমিতি আছে তা জানিস? হঠাৎ যদি কোনোদিন গুণ্ডো-বদমাশ লেলিয়ে দেয়?

এবারে চুপ ক'রে গেল মাধুরী। এ-ভয় তার মনেও আছে। কিন্তু সেই ভয়ে কাকাবাবু কলম গুটিয়ে ব'সে থাকবে না, সেটাও সে ভালোভাবেই জানে।

মাস তিনেক আগে বিদ্যাসাগর মশাইয়ের ছাপা পট বাজারে বেরিয়েছে। লালবাজারের এন, সি, ঘোষ অ্যাণ্ড কোম্পানি বের ক'রেছে পট। একটাকা ক'রে পটের দাম। মাধুরীর আবদারে একখানা ছাপা ছবি কিনে এনে দিয়েছে হরিশ। সবায়ের অলক্ষ্যে মাধুরী রোজ অন্তত একবার ছবিখানাকে প্রণাম করে। মনে মনে ভাবে, দেশের লোকে তার কাকাবাবুর ছবিও একদিন এমনিভাবে ঘরে ঘরে রাখবে, প্রণাম ক'রবে! কিন্তু ছবি কোথায়? আজ পর্যন্ত নিজের একখানা ছবি তোলেনি কাকাবাবু।

রাজচন্দ্র ব'ললে, হরিশ সত্যিই বড়ো মহৎ কাজে হাত দিয়েচে, ছোটোমা! সবই বুঝি কিন্তু মনে সব সময়েই একটা আতঙ্ক—ওর কোনো বিপদ-আপদ না হয়!

রুক্মিণী অনুনয়ের স্বরে ব'ললেন, তোকে আর আনন্দকে হরিশ তো খুবই মান্যি করে বাবা! তোরা একটু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বল্ না, যাতে একটু কম কম ক'রে নেকে আর গোরাসায়েবেরাও ওর ওপর বেশি খাপ্পা হ'য়ে না যায়!

মৃদু হেসে রাজচন্দ্র ব'ললে, কোনো লাভ হবে না, ছোটোমা! কম ক'রে লেখার পাত্তর সে নয়। আমরা যতই বোঝাই না কেন, ও যা করবার তা ক'রবেই!

—তা বটে!—দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে রুক্মিণী ব'ললেন, ওকে তো আমিই পেটে ধ'রেছি? ও যে কী গোঁয়ারগোবিন্দ ছেলে সে তো আমি হাড়ে হাড়েই জানি!

ক'দিন পরের কথা।

ইণ্ডিয়ান ফীল্ড পত্রিকার অফিসে ব'সে কিশোরীচাঁদের সঙ্গে কথা ব'লছে হরিশ। বন্ধুর কাছ থেকে জরুরি তলব পেয়ে অফিস-ফেরতা সে চ'লে এসেছে।

কিশোরীচাঁদ ব'ললে, কেষ্টনগর থেকে চার্চ মিশনারি সোসাইটির জর্মন পাদ্রি রেভারেণ্ড বম্‌ভেইট্‌শের্ একখানা চিঠি পেয়েচি। তুমি তো নিশ্চয়ই জানো, উনি শান্তিপুরের কাছে বল্লভপুর গাঁয়ে একটি এদেশি মেয়েকে বিয়ে ক'রে সেখানেই আছেন?

—হুঁ, শুনেচি। এ-ও শুনেচি, একটি এদেশি গেঁয়ো মেয়েকে বিয়ে ক'রেচেন ব'লে সি, এম, এস্-এর বৃটিশ পাদ্রিরাও ভদ্রলোকের প্রতি খুবই রেগে আছেন। কী লিখেচেন বম্‌ভেইট্‌শ্?

—নদীয়া জেলার অবস্থা খুবই ঘোরালো। এ-চিঠিখানা তিনি ফীল্ডে ছাপানোর জন্যেই পাঠিয়েছেন। আমি অবশ্যই ছাপবো। এই যে চিঠিখানা প'ড়ে দ্যাখো—

হরিশের হাতে চিঠিখানা দিলে কিশোরীচাঁদ।

রেভারেণ্ড বম্‌ভেইট্‌শ্ লিখেছেন, বল্লভপুরের রায়তেরা নীল চাষ ক'রতে সরাসরি নারাজ হওয়ায় নীলকরেরা হুমকি পাঠিয়েছিল, লেঠেল পাঠিয়ে গাঁ লুঠ ক'রবে, আগুন জ্বালিয়ে ছারখার ক'রে দেবে গ্রামকে গ্রাম। কিন্তু দেখা গেল, কুঠিয়ালদের লেঠেলবাহিনীকে রোখার জন্যে গ্রামবাসীরাও প্রস্তুত। তারা রীতিমতো সামরিক কায়দায় কয়েকটা বাহিনী তৈরি ক'রে ফেলেছে। ভিন্ন ভিন্ন অস্ত্র নিয়ে মোট ছ'টা বাহিনী। পয়লা নম্বর বাহিনী শুধু সড়কিওয়ালাদের নিয়ে। তার নাম দেওয়া হ'য়েছে যুধিষ্ঠির কোম্পানি। একটা বাহিনী শুধু তীরন্দাজদের। ফিঙে দিয়ে পোড়ামাটির শক্ত গুল ছোঁড়ার জন্যে একটা বাহিনী। ভাত খাওয়ার থালা-সান্‌কি ছুঁড়ে লেঠেলদের জখম করবার জন্যে আর একটা বাহিনী। পোড়া মাটির যাবতীয় ছুঁচলো টুকরো ছোঁড়ার দায়িত্ব মেয়েরাই নিয়েছে। তাদের বাহিনীর নাম হ'য়েছে রোলা কোম্পানি। এমন কি, গাছের শক্ত শক্ত কাঁচা বেল-ও তারা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার ক'রছে। সজোরে বেল ছুঁড়ে কুঠির লেঠেলদের মাথা ফাটাতে পারে এমন ছেলেদের নিয়ে তৈরি হ'য়েছে বেল কোম্পানি। সে-কোম্পানিতে বেশ কিছু

বৌ-ঝিও রয়েছে। বেল আর পোড়ামাটির রোলা এত ভালো কার্যকর হচ্ছে দেখে রায়তেরা এই নতুন সামরিক কৌশলকে যথাসম্ভব কাজে লাগাচ্ছে। দূর থেকে উড়ে-আসা এই সব বিচিত্র অস্ত্রে ঘায়েল হ'য়ে লেঠেলেরা আর এগোতে পারছে না। নীলচাষ প্রায় বন্ধই হ'য়ে গেছে বলা চলে।

চিঠিখানা প'ড়ে আনন্দে, উত্তেজনায় টেবিলের ওপর একটা চাপড় মেরে হরিশ চিৎকার ক'রে উঠলো, তুমি যে ব'ললে, অবস্থা খুব ঘোরালো?

—ঘোরালো নয়? এর পরেই তো অজস্র রক্তপাত অনিবার্য!—ব'ললে কিশোরীচাঁদ।

—হ্যাঁ, রক্তপাত অনিবার্য! কিন্তু কিশোরী, পঞ্চাশ বছরের ওপর ওরা মুখ বুজে যে নৃশংস অত্যাচার সহ্য ক'রেছে, যে-পরিমাণ রক্ত ঢেলেছে—তার চেয়ে এ-লড়াইয়ে রক্তপাত বোধ হয় বেশি হবে না!

—শুনচি, আর্মি যাবে, স্পেশিয়াল ফোর্স যাবে, গানবোট যাবে—

—যাক! যেতে দাও। তারা পারবে না! কিশোরী, রায়তদের এ-শক্তি বাইরের শক্তি নয়—ভেতরের। ঘা খেয়ে খেয়ে এতদিনে ওদের নিজেদের ভেতর থেকেই বিদ্রোহের শক্তি জেগে উঠেচে। রক্তপাত নিশ্চয়ই হবে। হয়তো হাহাকারে ন'দে-যশোরের আকাশ-বাতাস ভারী হ'য়ে উঠ্‌বে। কিন্তু তবুও আর্মি আর গানবোট দিয়ে এ-শক্তিকে দমিয়ে দিতে ওরা পারবে না!

—এত জোর দিয়ে ব'লচো?

—হ্যাঁ, বলচি। দিন যে কত পাল্‌টে গেচে, উদ্ধত প্ল্যাণ্টারের দল তা বুঝতে পারছে না! এইবার আশা করি বুঝবে!

কিশোরীচাঁদ ব'ললে, এই চিঠিখানা সামনের সপ্তাহে ফীল্ডে ছাপতে দেবো ভাবচি।

—নিশ্চয়ই দেবে! আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ুক।

—রেভারেণ্ড বম্‌ভেইট্‌শ্‌ এদেশের মানুষকে সত্যিই ভালোবেসেচেন, হরিশ!

—এদেশের মেয়েকে যখন অর্ধাঙ্গিনী ক'রেচেন তখন তাতে আর সন্দেহ কী? এদেশের মানুষকে রেভারেণ্ড লঙ-ও ভালোবাসেন। বঞ্চিত মানুষের জন্যে তাঁর বুকে যথার্থ দরদ আছে। তবু একটা কথা না ব'লে পারচিনে কিশোরী! রেভারেণ্ড লঙ, বম্‌ভেইট্‌শ, ফ্রেডরিক সুড় এমন কি ডফ সায়েবের মতো উদারচেতা মিশনারিরাও একটা জায়গায় কিন্তু দুর্বল। ও'দের ক্রিশ্চান ধর্ম প্রচারে বিঘ্ন ঘটানোর জন্যেই ও'রা প্ল্যাণ্টারদের ওপর অসন্তুষ্ট।

—তাঁরা মিশনারি। তাঁদের পক্ষে সেটা অস্বাভাবিক নয় হরিশ।

—তা মানি। রেভারেণ্ড লঙ তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা থেকে কিছু কাহিনী আমাকে ব'লেছেন। কিছুদিন আগে কয়েকজন নিরক্ষর গেঁয়ো চাষী তাঁকে ব'লেচিল, সায়েব, তোমাকে আমরা ভক্তিচ্ছেদ্দা করি। কিন্তু তোমাদের কেরেস্তান নীলকরেরা স্বভাব-চরিত্তিরের যে নমুনা রেকেচে তাতে আমরা বলি কি, আগে তাদের কাছে কেরেস্তান ধম্মের মহিমে বোঝাও, তারপর আমাদের মতো মুখ্যসুখ্যদের ধম্মোকথা শোনাতে এসো!

—রেভারেণ্ড লঙ কী ব'ললেন?

—অকপটে সেই বাস্তব সত্যিটাকে মেনে নিয়েচিলেন।

কিশোরীচাঁদ একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ব'ললে, মিশনারিদের একটা বড়ো অংশও যদি লঙ সায়েবের মতো হ'ত!

—সেটা আশা করা বৃথা, কিশোরী! এ'রা ব্যতিক্রম। ধরো, স্যান ডিয়াগো, গুয়াটেমালা, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—যেখানেই এরা তুলো আর নীলের চাষ ক'রে লাখোপতি-কোটিপতি হ'য়েচে সেখানেই এদের অত্যাচার সীমাহীন। আফ্রিকা থেকে ক্রীতদাস এনে বৃটিশ কারবারীর দল সেই ক্রীতদাসদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার ক'রেছে। মিশনারি তো সেখানেও অনেক ছিলেন। ক'জন প্রতিবাদ ক'রেচিলেন? একজন কি দু'জন। পরিণামে তাঁদের যেতে হ'য়েচে জেলখানায়।

রেভারেণ্ড লঙ কিম্বা বম্‌ভেইট্‌শের কপালে কী আছে জানিনে! এ'রা যদি এইভাবেই এগোতে থাকেন তাহ'লে সেই ধরনের পুরস্কার এ'দের কপালেও জুটতে পারে।

কিশোরীচাঁদ ব'ললে, সেটা আমাদেরও দুর্ভাগ্য! তবু একটা আশার কথা, হ্যালিডের জায়গায় এয়েচেন গ্র্যাণ্ট আর আমার বন্ধু, ইডেনের মতো কয়েকজন উদারচেতা সিবিলিয়ান এখন ম্যাজিস্ট্রেট। কেণ্টনগরের ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার হার্শেল দরদী মনের মানুষ। তাঁকে নিয়ে নদীয়ার প্ল্যাণ্টারের দল নাকি বেশ চিন্তায় প'ড়েচে।

হরিশ হেসে ব'ললে, সিভিল সার্ভিসে ক'টা ইডেন, ক'টা হার্শেল আছে কিশোরী? তার চেয়ে মলোনি আর স্কিনারদের সংখ্যা অনেক বেশি। যশোরের ম্যাজিস্ট্রেট মলোনিকে রায়তেরা নাম দিয়েচে 'বড়ো পাত্তর মারা সায়েব' আর জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট স্কিনারকে 'ছোটো পাত্তরমারা সায়েব।' নীলকুঠি থেকে নেমন্তন্ন পেলেই তারা ছুটে যায়।

—হ্যাঁ, ইডেনের কাছে ওই দুই চীজের কথা আমি শুনেচি।

হরিশ কয়েকমুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে তারপর ব'ললে, একটা কথা জিজ্ঞেস ক'রবো কিশোরী? আজ প্রায় দশ মাস হ'য়ে গেল, তুমিই ইণ্ডিয়ান ফীল্ড সম্পাদনা ক'রচো। সে পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় থাকতো খেলাধুলা আর শিকারের খবর, সেই পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় এখন কিন্তু ছাপা হচ্ছে রাজনৈতিক খবরাখবর। তার ভেতরেও প্ল্যাণ্টারদের অত্যাচারের খবরগুলোই আবার গুরুত্ব পাচ্চে বেশি। এ-পরিবর্তনটা কেন হ'ল?

কিশোরীচাঁদ ব'ললে, এত বড়ো একটা জ্বলন্ত সমস্যা সম্বন্ধে উদাসীন থাকা সম্ভব নয় ব'লেই হ'ল।

মুচকি হেসে হরিশ ব'ললে তাহলে কি বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র কি এই কুখ্যাত চরমপন্থী হরিশ মুখার্জির সঙ্গে এ-বিষয়ে একমত হবেন যে, বৃটিশ উপনিবেশের লাথি-ঝাঁটা খাওয়া নেটিব হিসেবে আপাতত সমাজ-সংস্কারের চেয়েও রাজনৈতিক চেতনা জাগিয়ে তোলার কাজটা অনেক বেশি জরুরি?

কিশোরীচাঁদ হেসে ফেললো। —তুমি কি আমাকে এইভাবে ভুলিয়ে শট্‌কে শিখিয়ে ছাড়বে নাকি হে? না হরিশ, এ-ব্যাপারে তোমার সঙ্গে আমার মতবিরোধ বহাল-ই থাকবে। আমাদের দেশের পক্ষে আরো বেশ কিছুকাল পর্যন্ত বৃটিশ-শাসন আমি অপরিহার্য ব'লেই মনে করি। তবে হ্যাঁ, সেটা সু-শাসন হোক, এইটেই আমার কাম্য।

—ওহে বাপু, বিনি অ্যালাওয়েন্সে কেউ গার্ডিয়ানগিরি করে না। গার্ডিয়ান হিসেবে বৃটিশকে যখন এতই পছন্দ তখন কী আর বলি? তবে কিনা বিনিময়ে দক্ষিণাটা বড়ো বেশি গুণে দিতে হচ্ছে, এই যা! আমেরিকা আর ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে ঝাঁঝ্‌রা ক'রে দিয়ে এবার আমাদের ঘাড়ে এসে চেপেচে। যখন চ'লে যাবে তখন আমাদের দেশের নেটিব নিগারদের শিরদাঁড়াটা সোজা ক'রে দাঁড়াতে বড়ো বেশি সময় লাগবে হে! তাছাড়া, এমন একটা মওকা যখন মিলচে তখন কোনোদিনই আর যেতে চাইবে কিনা, কে জানে! আমরা যতক্ষণ না সাবালক হচ্চি ততক্ষণ ওরা কেমন ক'রেই বা যায়? হাজার হোক, কর্তব্যবোধ ব'লে একটা কথা আছে তো?

—তুমি একচোখোর মতো একটা দিকই দ্যাখো কেন, বলোতো? বৃটিশ শাসন কি আমাদের দেশের জন্যে ভালো কিছুই করেনি?

—ক'রেচে বৈ কি! এ-ব্যাপারে সেই কত বছর আগে পার্লিয়ামেন্টারি কমিটির সামনে সাক্ষী দিতে গিয়ে একজন খোদ বৃটিশসন্তান ডেভিড হীল যা ব'লেছিলেন, সেই কথারই প্রতিধ্বনি ক'রে বলি, ওরা যা কিছু ক'রেছে নিজেদের সুবিধের জন্যেই ক'রেচে, নেটিবদের স্বার্থে নয়। যাকগে সে-কথা। তোমার সঙ্গে এ-বিষয়ে আমার তর্ক বাধলে যেখান থেকে শুরু হ'য়েচিল, আবার সেখানেই এসে ঘুরপাক খাবে। সুতরাং তর্ক স্থগিত থাক। তুমি রেভারেণ্ড বম্‌ভেইট্‌শের চিঠিখানা দেখানোর জন্যে আমাকে ডেকেচ, আমিও তোমাকে একখানা মূল্যবান বস্তু দেখাই।

পকেট থেকে একখানা মোটা লেফাফা বের ক'রে হরিশ মুচকি হেসে ব'ললে, ব'লতে পারো, এর ভেতর কী আছে?

কিশোরীচাঁদ ব'ললে, তোমার ভোজবাজির ঝোলায় কী আছে তা আমি কেমন ক'রে জানবো?

—প্ল্যান্টারদের কাছ থেকে পাওয়া শিরোপা!

—তার মানে?

—এতদিন ধ'রে তাদের সেবা ক'রে আসচি, তার একটা পুরস্কার দেবে না? হাজার হোক, চক্ষুলজ্জা ব'লে একটা জিনিস আচে তো? নদীয়া থেকে চিঠিখানা আমার আপিসের ঠিকানায় কাল এয়েচে। যে বা যারাই চিঠিখানা লিখে থাকুক, বিনয় তাদের ষোলো আনা! খুবই বিনীত ব'লে নাম-ঠিকানা দেয়নি। সম্বোধনটা খুবই মিষ্টি—ওয়েল নিগার!

লেফাফার ভেতর থেকে চিঠিখানা বের ক'রে ভাঁজ খুলতে খুলতে হেসে হরিশ ব'ললে, এমন মধুর চিঠিখানা শিগগিরই ছেপে দেবো। শিরোনামাও ঠিক ক'রে ফেলেচি—'আমেরিকানিজম্ ইন নদীয়া।' এখন মন দিয়ে শোনো—

'ওহে নিগার! দেখা যাচ্ছে সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকেদের নামে কুৎসা রটানোর কাজে তুই দিনকে দিন বড্ড বাড় বেড়ে যাচ্চিস। ওরে আহাম্মক, তুই কি ভুলে গেচিস যে তোরা আসলে বিজয়ী বৃটিশের ক্রীতদাস মাত্র? খেয়াল নেই যে পলাশীর যুদ্ধের দিন থেকে এইটেই তোদের বিধিলিপি? তোর জঘন্য পত্রিকার প্রচুর প্রচার সংখ্যার জন্যে মাথা ঘুরে গেচে কেমন? তোর দেশোয়ালি মিথ্যেবাদী ছোটোলোক নেটিবগুলোর কাছে এন্তার প্রশংসা পেয়ে এমন মাথায় উঠে গেচিস যে, আমাদের সদাশয় মহানহৃদয় নীলকরদের সম্বন্ধে যা খুশি জঘন্য মিথ্যে কথা লিখতে তোর আটকাচ্চে না? ওরে বদমাশ, জেনে রাখিস তোর এই মিথ্যের বেসাতি তোরই বিপদ ডেকে আনবে! ইতর গোলাম! আমাদের মহান প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতার কথা কি তোর জানা নেই? ওরে নিগার, তুই যা করচিস তার ফলাফলের জন্যে তৈরি থাকিস! তুই যদি এখনো তোর কলম বন্ধ না করিস তবে কপালে মারাত্মক দুর্ভোগ আচে তা জেনে রাখিস্! তোর চালচলন ক্রমেই অসহ্য হ'য়ে উঠ্‌চে। ওরে শয়তান নিগার, এখনো সাবধান হ'! আশা করি তোর প্রাপ্য দুর্ভোগ ডেকে আনার চেষ্টা ক'রবি না!'

এইটুকু প'ড়ে হাসতে হাসতে মুখ তুলে তাকালো হরিশ। কিশোরীচাঁদ বিড়বিড় ক'রে ব'ললে, এই কি কোনো ভদ্রলোকের ভাষা?

—যথেষ্ট ভদ্রতা ক'রেচে। যাতে আমার বিপদ না হয় তার জন্যে সাবধান পর্যন্ত ক'রে দিয়েচে। চিঠির একটা পুনশ্চ আছে হে! শোনো,—'ওরে নিগার, জেনে রাখিস, কলকাতায় হোক, মফস্বলে হোক, তোর সঙ্গে যদি একদিনও দেখা হয় তাহ'লে ঘোড়ার চাবুক দিয়ে তোর গতরে এমন কয়েকটা দাগ কেটে দেবো, যা জীবনেও ভুলতে পারবিনে।'

—জানোয়ার!—দাঁতে দাঁত চেপে ব'ললে কিশোরীচাঁদ।

—আহা, বেচারা জানোয়ার জাতকে আবার অপমান ক'রচো কেন? শুনেচি, তাদের জগতেও কিছু নীতিবোধ আচে। কিশোরী, এ-চিঠি পেয়ে আমার আনন্দ হচ্চে। কেন জানো? বুঝতে পারচি, ওষুধ ঠিক ধ'রেচে! চিঠিখানা পেট্রিয়টে ছাপিয়ে লেপ্টেন্যান্ট গবর্নরের নজরে একবার আনতে চাই। মফস্বলে কারা বৃটিশের প্রতিনিধিত্ব ক'রচে, সেটা তিনি আর একটু ভালো ক'রে বুঝুন!

॥ আঠারো ॥

কেশব একটু আগে শুয়ে প'ড়েছে তবে ঘুমোয়নি।

হেঁসেলের পাট চুকিয়ে হরমণি যখন ঘরে এলো তখন একটু অভিমানে কেশব ব'ললে, অ্যাত্‌খনে এই অবাগার পিতি দয়া হ'ল?

সলজ্জ মৃদু হেসে চাপাস্বরে হরমণি ব'ললে, আহা, মুই বুঝি ইচ্ছে ক'রে দেরি কল্লাম?

ফুটফুটে চাঁদের আলো ছড়িয়ে প'ড়েছে চারদিকে। শেষ মাঘের শীতে এবছর তেমন দাপট নেই। দক্ষিণ দিকের জানালার একটা কপাট খোলা রেখেছে কেশব। তারই ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে বাড়ির পেছনে আইরি-ক্ষেতের গাছগুলো। জ্যোৎস্নার ফিকে আলোয় এতদিনের এত চেনা সব জায়গাটুকুই রাতে মনে হচ্ছে অচেনার মতো।

দু'মাস পরে আজই বাপের বাড়ি থেকে ফিরেছে হরমণি। এতদিন পরে বৌকে দেখে বুকের ভেতর ঝিলিক দিয়ে উঠলেও সব মিলিয়ে মনে কিন্তু শান্তি নেই। সারা মুলুকে সব সময় একটা থম্‌থমে ভাব। নাকের ডগায় কাচিকাটা কুঠি আর ক্রোশ দু'য়েক দূরে গোঁসাই-দুর্গাপুরের কুঠি। সারা নদীয়া জেলার নীলচাষীরা রুখে দাঁড়ানোর ফলে নীলকর সাহেবগুলোও যেন হন্যে কুকুরের মতো হ'য়ে উঠেছে। কেশবের বাবা মথুর বিশ্বাস গাঁয়ের মোটামুটি সম্পন্ন গৃহস্ত। কুঠিয়ালদের সংগে বিরোধ এড়ানোর জন্যে এ-যাবৎ অনিচ্ছাসত্ত্বেও কিছু নীলচাষ ক'রেছে মথুর বিশ্বাস। কিন্তু তাতেও সাহেবের মন ওঠেনি। কাচিকাটা কুঠির আর্চিবল্ড হিল্‌স্‌ আগের চেয়ে আরো বেপরোয়া। মথুর বিশ্বাসের ওপর সে ফরমান জারি ক'রেছে, ছ'বিঘের খেজুরবাগিচার গাছগুলো কেটে সামনের মাসেই সে-জমি নীলচাষের জন্যে তৈরি ক'রে দিতে হবে। মথুর বিশ্বাস-ও জেদ ধ'রেছে, কিছুতেই সে তা ক'রবে না! গোপনে অভয় পাঠিয়েছেন মহেশ চাটুজ্জে। শুধু খেজুরবাগিচা কেন, অন্য জমির এক ছটাকেও হিল্‌স্‌ সাহেব যদি হাত দেয় তাহলে তার কুঠিও ধুলোয় মিশে যাবে। কেবল মথুর বিশ্বাস-ই নয়, ছোটো-বড়ো সব রায়তই মহেশ চাটুজ্জের সেই গোপন নির্দেশ পেয়েছে।

হরমণি ঘরে ঢোকার আগে এইসব কথা ভাবছিল কেশব। দুশ্চিন্তা আর দুর্ভাবনা তো নিত্যসংগী। তাই ব'লে দৈনন্দিন জীবনের ছোট্ট ছোট্ট সুন্দর মুহূর্তগুলো কি বিফলে যাবে?

হরমণি এসেছে দুপুরে। এই দু'মাসেই যেন সে আরো অনেক ডাগর-ডোগর হ'য়ে উঠেছে। এমনিতেই পাঁচ গাঁয়ের ভেতর সেরা সুন্দরী ব'লে কেশবের বৌয়ের নামডাক আছে। তা নিয়ে কেশবের গর্বের অন্ত নেই। তার ওপর এবার হরমণি সারা অংগে এমন জৌলুষ নিয়ে বাপের বাড়ি থেকে ফিরেছে যে তাকালেই চোখ ঝল্‌সে যায়। ভরা বর্ষায় মাথাভাঙা নদী যেমন টইটম্বুর হ'য়ে দুই পাড় ভাসিয়ে দেয়, বৌয়ের যৌবনও এবার ঠিক যেন তেমনি!

বিছানায় এসে উঠলো হরমণি। কাঁথা টেনে নিতে নিতে মৃদুস্বরে ব'ললে, আমার পর রেগি গিয়েচ?

দু'হাতে হরমণিকে বুকের ভেতর টেনে নিয়ে কেশব ব'ললে, রাগ হবে না? ঝেদি মুই ঘুমায়ে পড়তাম?

ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে হরমণি ব'ললে, আমি জাগায়ে তোলতাম?

কথাটা শুনে কেশব খুব খুশি। কিন্তু মুখে ব'ললে, জাগায়ে তুলতি না কচু! সেই কখনথে' পিতিক্ষে কচ্চি তো কচ্চি, তোর আসার নাম নাই!

—কী করবো? মেয়েনোকের শতেক জ্বালা!—কেশবকে আরো নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধ'রে হরমণি ব'ললে, হ্যাদে, তুমি এত রোগা হ'য়ে গিয়েচ ক্যান?

—তোর মা-বাপ তোরে নে' গ্যালো ক্যান? পেট ভ'রে খাই নাই।

—আহা, আমি ঝ্যান সারাজেবন তোমার কাছেই ছেলাম?

—ত্যাকনকার কথা ত্যাখন, অ্যাকনকার কতা অ্যাকন!

—এই তো আমি এসি গিয়েচি! অ্যাকন আমার কথা শোনবা তো? পেট ভ'রে খাবা?

—খাবো।

—জানো, শ্যাষের দিকি আমারও মন খুব ছটফট ক'রেলো। নজ্জায় কাউরি কওয়াও যায় না, খালি ভাবি কবে যাই—কবে যাই!

—চ'লে এলিই পাত্তি!

—আহা, মুই নিজির মুকি আসার কতা কতি পারি? তুমিই বা নে' এলে না ক্যান শুনি?

—বাবা না কলি আমি যেতি পারি?

দু'জনেই হেসে ফেললো। দু'মাস পরে এই মিলনের রাতটা এইটুকু সময়ের ভেতরেই যেন কানায় কানায় ভ'রে উঠেছে!

ফিস্‌ফিস্ ক'রে কেশব ব'ললে, অ্যাকটা কতা কই? তোর বুক দু'ডো এবার ঝ্যান দুগ্গো-পুজোর কলাবৌয়ির লাকান পুষ্টু হ'য়ে উটেচে!

কেশবের মুখ চেপে ধ'রলো হরমণি। তার বুকের ভেতর একটা পুলকের শিহরণ অথচ মনে একটা অস্ফুট আতঙ্ক! ভয়ে কাঁপাস্বরে ব'ললে, ছি ছি, তোমার বুকি এক্‌টুক্ ভয়ডরও কি নাই? ঠাউর-দ্যাব্‌তার নাম নে' এমন কতা কেউ কয়?

উপমাটা দিয়ে কেশব-ও একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল। থতোমতো খেয়ে ব'ললে, মুই তো আর ঠাউর-দ্যাব্‌তারে কই নাই? কলাবৌয়ির বুকি জোড়া ব্যাল বেঁধি দ্যায়, তারির কতা কইচি।

দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে বারবার মা দুর্গার উদ্দেশে প্রণাম জানাতে লাগলো হরমণি। তার স্বামীর মুখ ফস্‌কে যে আল্‌গা কথাটা বেরিয়ে গেছে, মা দুর্গা তার জন্যে যেন অপরাধ ক্ষমা করেন!

কিছুক্ষণ নীরবে কাটলো।

বাড়ির পূর্বদিকে আমগাছটার ওপর থেকে একটা পাপিয়ার ডাক ভেসে আসছে। দূরে কোথাও ডেকে উঠলো একটা লক্ষ্মীপ্যাঁচা।

হরমণি নীরবতা ভেঙে ব'ললে, জানো, পালবাড়ির ভগবতী আজ বিকেলে ছাবাল-কোলে আয়েলো। পশ্যুদিন শউরবাড়ি চ'লে যাবে। আহা, ছাবাল-কোলে কি সোন্দরই না নাগচিলো মেয়েডারে! ঝ্যান সাক্কেৎ গণেশজননী!

—মনে ধ'রেচে তোর?

—খু-উ-ব!—আরো উচ্ছ্বাসে ব'ললে হরমণি।

—তা তোরেও অমন সোন্দর দ্যাখা যেতি পারে। খনার বচনে কয়, ঝেদি বষ্‌যে মাঘের শ্যাষ, ধন্যি আজার পুণ্যি দ্যাশ। এই তো মাঘের শ্যাষ? জমিতি-ও জো আচে। পরের শীতি তুইও ছাবাল-কোলে গণেশজননী হ'য়ে যাবি!

আবেগে, শিহরণে হরমণির সর্বাঙ্গ কাঁপতে লাগলো। মুখে কোনো কথা নেই। কেবল আরো নিবিড় ক'রে কেশবকে জড়িয়ে ধ'রলো।

কেশব ফিস্‌ফিস্ ক'রে ব'ললে, মা ডাক শোনার ইচ্ছে জেগিছে এবার?

আরো আবেগে বিবশা হ'য়ে হরমণি ব'ললে, জানিনে, যাও—

কয়েকদিন পরের কথা।

দুপুরে বেতাইয়ের হাটে গিয়েছিল কেশব। ফিরতে ফিরতে প্রায় সন্ধে। অন্ধকার ঠিক ঘনিয়ে না এলেও অন্ধকারের ছায়া সবে নামতে শুরু ক'রেছে। নদীর পাড় ধ'রে জোর পায়ে হাঁটছিল কেশব। হঠাৎ একটু দূর থেকে হাঁক শুনতে পেলো, কেডা যায়? কেশব নাকি?

দাঁড়িয়ে পড়লো কেশব। গলার স্বর নিতান্ত পরিচিত। রাগে তার সর্বাঙ্গ রী রী ক'রে উঠলো। কর্কশস্বরে উত্তর দিলে, হ।

—একটু কষ্ট ক'রে দু'পা এগোয়ে আয় দিনি, বাপ! দেখা যখন হ'ল তখন একটা দরকারি কথা সেরে নিই।

নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও এগিয়ে গেল কেশব। তার গলার স্বরে বিন্দুমাত্র বিনয়ের চেষ্টাও নেই, ইচ্ছেও নেই। ব'ললে, কী কবেন, কন—

ভুরু কুঁচকে তাকালেন কাচিকাটা কুঠির মাঝবয়সী নায়েব কেদার মুখুজ্যে। চিবিয়ে চিবিয়ে ব'ললেন, বাপ কা বেটা, অ্যাঁ? দেশ-গাঁয়ের আদব-কায়দা, শিক্কে-সহবৎ সবই যে তোরা পাল্টে দিচ্চিস রে! পথে-ঘাটে বর্ণশ্রেষ্ঠ বামুনের সঙ্গে দেখা হ'লে ছোটোজেতের লোক এযাবৎ পেন্নাম জানায়ে এয়িচে। সে-সবের পাট তোরা তুলেই দিচ্চিস, কেমন?

কেশব কিছু বলবার আগেই কেদার মুখুজ্যের দুই পাহারাদারের অন্যতম রিসম সিং ব'ললে, শালালোগন জমানা একদম খারাব কর্ দিয়া, হুজুর।

কুঠির কাজ সেরে বাড়ি ফিরছেন কেদার মুখুজ্যে। মাথাভাঙা নদীর পাড়ে বেশ কয়েকবিঘে জমির ওপর বিশাল দোতলা বাড়ি হাঁকিয়েছেন তিনি। আগে একা-ই বাড়ি ফিরতেন। কিন্তু গত কয়েকমাস দেশ-গাঁয়ের যা অবস্থা তাতে একা যাতায়াত ক'রতে আর সাহস হয় না। কুঠির লেঠেলদের অন্তত দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে বেরোন তিনি। সকালে এসে লেঠেলরা নায়েববাবুকে কুঠিতে নিয়ে যায়।

প্রণামের প্রসঙ্গ ধামাচাপা দিয়ে কেদার মুখুজ্যে ব'ললেন, তোর বাপ তো শোনলাম, আমাদের সায়েবের সঙ্গে গলায় পা দিয়ে ঝগড়া বেঁধিয়ে দেওয়ার জন্যি পাঁয়তাড়া ভেঁজি চ'লেচ্। এডা কি ভালো হচ্চে রে কেশব?

কেশবের মুখে একটা খারাপ কথা এসে গিয়েছিল। কিন্তু অতি কষ্টে নিজেকে সে সাম্‌লে নিল। দুই লেঠেল দিয়ে এই সন্ধ্যের মুখে তাকে খতম ক'রে লাশটা মাথাভাঙার জলে ফেলে দিলে তার সাক্ষী কেউ থাকবে না।

—কি রে, চুপ মেরি আচিস ক্যান? দ্যাখ্, আমি কই কি, তোর বাপ যেমন ধানীপানি গিরস্ত আচে তেমনই থাক। উট্‌কো ঝামেলায় দরকার কী? সায়েবরা হ'ল রাজার জাত। তাদের সঙ্গে খটাখটি বেঁধিয়ে কেউ সুস্থির থাকতে পেরিচে, ক'? তোর বাপ তো তুচ্ছু, সায়েবদের সঙ্গে বিবাদ কত্তি গে' জয়রামপুরির তালুকদার রামরতন, রামমোহন আর গিরিশ মল্লিকির কী হাল হতি চলেচ্ তা জানিস্‌নে? শালা নেমকহারাম আর কারে কয়? তোরাই শালা জমি পত্তনি দিলি, কুটিতি দেওয়ান গিরি, নায়েবগিরি কল্লি আর তারপর কিনা অন্নদাতার গায়ে ছোবল? মায়ার্শ সায়েব আর ছেড়ি কতা কবে ভেবিচিস্? তাই কই কি, তোর বাপেরে যাহোক বুঝোয়ে-সুঝোয়ে রাজী কর্। হদ্দ গরীব রেয়েগুলোর কতা ছেড়ি দে। তারা যা কত্তি লেগেচ্, হাতে হাতে তার ফল পাবে! তোদের তো আর ঐ মুখ্যুগুলোর সঙ্গে ওঠ্-বস্ করা চলে না? তোদের ভালোর জন্যিই কচ্চি, তোর বাপেরে সায়েবের সঙ্গে একটা রফায় এস্‌তি ক', বুঝলি?

কেশব চুপ ক'রেই রইলো। তার মুখের দিকে আড়চোখে একটু তাকিয়ে নিয়ে কেদার মুখুজ্যে আবার ব'লতে লাগলেন, সত্যি কতাডা কী জানিস কেশব? বিপদে পড়লি ওই শালা মহেশ চাটুজ্যেই ক' আর বিষ্টুচরণ-দিগম্বরই ক'—কারো বাপের ক্ষ্যামতা নাই যে, হিল্‌স্ সায়েবের খপ্পরের থে' বাঁচায়। আমাদের সাহেবের মুরুব্বির জোর কত জানিস্?

ফস্ ক'রে কেশবের মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, জ্যালার যে লতুন হাকিম এয়িচেন তিনি নাকি কুটিতি কুটিতি ফুত্তি নুটে বেড়ায় না শুনিচি।

দপ্ ক'রে জ্ব'লে উঠলেন কেদার মুখুজ্যে।—হাকিমির ভয় দ্যাকাচ্চিস? নতুন মেজেস্টর হার্শেল সায়েব কয়ডা দিন সতীপনা ফলায়ে নিক তারপর দেখিস, কুটিতে ফুত্তি কত্তি ও না যায় ওর ঘাড়ে যাবে। জানিস্, হিল্‌স্ সায়েব দরকার হলি বিলেতে খোদ মহারাণীর কাছ ইস্তক দরবার কত্তি পারে?

কেশব গম্ভীরভাবে ব'ললে, জানতাম না বাবু। আপনার মুকি এই জানলাম।

—ও! মশ্‌করা হচ্চে? তোরা রাজার জেতেরে টেক্কা দিবি, কেমন? শালা হাতি ঘোড়া গেল তল, মশা বলে কত জল! শোন্, তোর বাপেরে আমার সঙ্গে দ্যাখা কত্তি কবি! চল রে আদিত্য—

দ্বিতীয় লেঠেল আদিত্য জ্বলন্ত চোখে একবার কেশবের দিকে তাকিয়ে নিয়ে ব'ললে, আপনি ভালোমানুষিতা কল্লি কী হবে বাবু, এই রেয়ে শালারা তার মরম বোঝে না।

দাঁতে দাঁত চেপে রইলো কেশব। চোখ তুলে লেঠেল আদিত্য বিশ্বাসের দিকে একবার শুধু তাকালো। লেঠেলদের নিয়ে কেদার মুখুজ্যে রওনা হ'য়ে গেলেন। কেশব বিড়বিড় ক'রে ব'ললে, শালা গব্ভোচ্ছাব!

কাচিকাটা কুঠির বাঙালি লেঠেলদের ভেতর আদিত্যকে সবচেয়ে নৃশংস ব'লে এ-অঞ্চলের সবাই চেনে। কেদার মুখুজ্যের মতো নায়েবও আদিত্য সম্বন্ধে কেন একটু দুর্বল তাও কারো অজানা নেই। আগে সে-কথা নিয়ে কানাকানি হ'ত। এখন তা পুরনো হ'য়ে গেছে। আদিত্যর বাল-বিধবা পিসি কাপাসীকে তার ভরা বয়সে কুঠির নীলখোলায় কামিনের কাজ জুটিয়ে দিয়েছিলেন কেদার মুখুজ্যে। খুবই হাল্‌কা কাজ। নীলগাছগুলো পচানোর এক নম্বর হৌজে পচানোর কাজ শেষ হ'য়ে গেলে ঈষৎ হল্‌দে জলটাকে যখন দু'নম্বর হৌজে চালান ক'রে দেওয়া হয় তখন সেই পচা গাছগুলোকে বলে সিটি। সেই সিটিগুলো তুলে নিয়ে রোদে শুকোতে দেওয়ার কাজটা কামিনেরাই করে। সেই কাজ কাপাসীর। শুকনো সিটিগুলোকে জমির সার হিসেবেও কাজে লাগানো হয় আবার নীল জ্বাল দেওয়ার জ্বালঘরে জ্বালানি হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। এযাবৎকাল ওই সিটি নিয়েই কাজ ক'রে আসছে কাপাসী। তার পাশাপাশি আর একটা কাজের দায়িত্ব-ও নিতে হ'য়েছিল তাকে। রস-নিঙড়ে-নেওয়া শুকনো নীলগাছগুলোকে সে ঠেলে দিত জ্বালঘরের উনুনের গন্‌গনে আগুনে আর যৌবনরসে টইটম্বুর নিজের গতর ঠেলে দিত নায়েববাবুর কামনার উনুনে। এখন কাপাসীর বয়স কম ক'রে তিরিশ বছর। নায়েববাবু এখনো তার একার বশেই রয়েছেন। পিসির ওপর নায়েববাবুর সেই দুর্বলতার পুরো সুযোগ নেয় লেঠেল আদিত্য বিশ্বাস।

নায়েববাবু দেখা ক'রতে ব'লেছে শুনেই তেলে-বেগুনে জ্ব'লে উঠলো মথুর বিশ্বাস। উত্তেজনায় তার হু'কোসমেত হাতখানা এমনভাবে ছিটকে এলো যে, সদ্য ধরানো ক'লকে থেকে দু'তিন টুকরো জ্বলন্ত কাঠকয়লা ছড়িয়ে প'ড়লো উঠোনে। চিৎকার ক'রে ব'ললে, সেই শালা চশমখোর, বেজন্মার কাচে কিনা আমারে যেতি হবে? থুঃ—থুঃ—। তুই হাটে কোনো খবরপত্তর পেইচিস কিনা, তাই ক!

কেশব ব'ললে, সবির মিঞার সঙ্গে দ্যাখা হ'য়েলো। ঝা শোনলাম তাতে তো মনে হচ্চে কুটির নিজ—আবাদে এ-চালানে একশো কুড়ো জমিতিও নীলচাষ হবে কিনা সন্দ!

—আর বে-এলেকা চাষ?—সোৎসাহে জিজ্ঞেস ক'রলে মথুর বিশ্বাস।—হচ্চে না তো?

কেশব ব'ললে, তুমি ঝা কচ্চ, একেবারে তাই। আমিন-গোমস্তা কুটির দাদন ধরাতি এলিই সোদা নাঠির বাড়ি। ইসুব মিঞা ফিস্‌ফিস্ ক'রে ক'য়ে দেলে, মজবুত থাকবি কেশা! নিচিন্দিপুরির কুটিতি মহেশবাবুর কারসাজিতি সেই হ্যাংনামা হ'য়ে যাওয়ার পরেত্থে কুটেলাদের বুকিও কাঁপ ধ'রেচে। সিন্দুরে, জোড়াদ', বামনদি, খাজুরে—সব কুটির আমিন-গোমস্তারা ভির্মি খেতি নেগেচে। দুইঝনা নেটেলা তো ধুরির কতা, দশ-বিশঝনা নেটেলা সঙ্গে নে'ও তারা কারো জমিতি দাগ মাত্তি যেতি সাহস পাচ্চে না। দাদনই ঝেদি না ধরাতি পারে তো নীলির গাছ পাবে কম্‌নে? খাজুরে কুটির আমিন, গোমস্তা, তাইদগীর—সব শালার মাতায় হাত। কুটির কারবার নাটে উট্‌লি তেনাদের তো চাকরিও খতম!

—আপদ যায়!—থুথু ছিটিয়ে ব'ললে মথুর, ওই বেজন্মাগুলোরে শ্যাল-কুকুরিও খায় না? ধলা চামড়ার কুটেলগুলোর চে'ও ওই দিশি কালাচামড়ার হারামজাদাগুলো ঝ্যান আরো বজ্জাত! জাতসাপেরেও ঝেদি বা বিশ্বেস করা যায়, ওগুলোরে যায় না। ও শালারা মরুক!

কথাটা ব'লে হু'কোয় দু'টো টান দিয়ে একটু চাপাস্বরে মথুর ব'ললে, মহেশবাবুর কোনো অন্তেরা কি সবির মিঞা দিয়েলো?

—না, বাবা। তেনার কোনো অন্তেরা কেউ জানে না। এই কয়দিন তাবাদিই তো শুনচি, সিনি নাকিনি নালমোন সায়েবের ডরে গা-ঢাকা দেচেন।

—নালমোন সায়েবের ডরে?—প্রচণ্ড প্রতিবাদ ক'রে উঠলো মথুর বিশ্বাস।—যে মহেশ চাটুজ্যে কুটেলগুলোরে জব্দ করার এত হেক্‌মত রাখে, সে কিনা ওই নালমোনের ডরে পলাবে? গা-ঢাকা যেদি দিয়েই থাকে তালি তেনার অন্য মতলব আচে!

কেশব ব'ললে, হুঁ, তা হতি পারে। সিনি বড়ো চালাক নোক।

মহেশ চাটুজ্যে যে অতি কৌশলী নেতা তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এক সময় নীলকুঠির দেওয়ান হিসেবে কয়েকবছর কাজ ক'রে ধূর্ত বিবেকহীন কুঠিয়াল সাহেবদের তিনি ভালো ভাবেই চিনে নিয়েছেন। তার পরের চাকরি নীলকরদের যম রতনবাবু অর্থাৎ নড়ালের জমিদার রামরতন রায়ের নায়েবের পদে। সারা অঞ্চলের নীলকরদের বুকে কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছেন তিনি। তাঁর নিজের এলাকা দামুরহুদার মানুষ মহেশ চাটুজ্যেকে খেতাব দিয়েছে 'নানাসাহেব'।

সম্প্রতি নিশ্চিন্তপুর কুঠির এলাকায় বেশ বড়োরকমের একটা সংঘর্ষে নীলকরদের প্রচণ্ড ক্ষতি হ'য়েছে। লারমুর এবং অন্যান্য নীলকর সাহেবদের দৃঢ় বিশ্বাস, এ-ঘটনার পেছনে মহেশ চাটুজ্যেরই হাত আছে। ক্ষিপ্ত লারমুরের নেতৃত্বে বেশ কয়েকজন নীলকর হন্যে হ'য়ে খুঁজেছে সেই লোকটাকে। কিন্তু কোথায় মহেশ চাটুজ্যে? হার মেনেছে লারমুর।

কেশব ঘরে চ'লে যাওয়ার পরেও অনেকক্ষণ দাওয়ায় ব'সে তামাক টানতে লাগলো মথুর। মাথার ভেতর নানারকম চিন্তা তো সব সময়েই জট পাকিয়ে আছে। নীলের চিন্তা সবচেয়ে বড়ো চিন্তা। নিতান্ত ছোটোখাটো রায়তেরা পর্যন্ত নীলচাষের নামে যেভাবে ক্ষেপে উঠেছে তাতে এবছর যে হাজার হাজার বিঘে জমি ধু ধু ক'রবে তা একরকম নিশ্চিত। গোয়াড়ির সদর জেলখানা নাকি উপচে প'ড়ছে। কয়েদ করো, ফাঁসে দাও, নীলচাষে আর হাত দেবো না—এই হ'ল শেষ কথা!

লোকনাথপুর কুঠির ডেভিস আর মায়ার্শ সাহেব দেড় হাজার লেঠেল নিয়ে গ্রাম আক্রমণ ক'রেছিল। কিন্তু হাজার লেঠেল নিয়ে আচম্‌কা চৌগাছা গ্রাম আক্রমণ ক'রে লারমুরের সহকারী দল যেমন কিস্তি মাৎ ক'রেছিল, দেড়হাজার লেঠেল নিয়ে ঝাঁপিয়ে প'ড়েও এই দুই নীলকর তা পারেনি। লাঠি আর তীরের ঘায়ে ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে দলবল নিয়ে তারা পালিয়েছে। তার পর থেকে গ্রামের মানুষের সাহস-ও বেড়ে গেছে চতুর্গুণ। সাহেবেরা জানুক বা না জানুক, দশ-বিশ ক্রোশের ভেতর প্রত্যেকটি গ্রামের মানুষ জানে, লোকনাথপুরের সেই রুখে দাঁড়ানোর পেছনেও শক্তি জুগিয়েছিল বিষ্টুচরণ আর দিগম্বর বিশ্বাস। রায়তেরা জয়ের স্বাদ পেয়েছে। আর তাদের পায় কে? এতদিন শুধু, চোখের জল ফেলেছে আর বুক চাপড়েছে। সেই একই বুক এবার তারা চাপ্‌ড়াতে শুরু ক'রেছে সম্পূর্ণ বিপরীত মেজাজে।—আয় সুমুন্দিরা, করা দিকিনি নীলচাষ! দেকি কত বড়ো হেকমৎ!

দু'চারদিন বাদে বাদেই এ ওকে জিজ্ঞেস করে, হিরুভিতির দাদন নিস্ নাই তো? উত্তরে হিন্দু চাষী বলে, শালা কুটির দাদন নিই তো গো-অক্ত খাই! মুসলমান চাষী বলে, দাদন নিইতো শোরের গোস্ত খাই!

না, কেদার মুখুজ্যের সঙ্গে দেখা ক'রবে না মথুর বিশ্বাস! ওই কুঠেলের পা-চাটা দিশি নেড়ি কুকুরটা তাতে যা ক'রতে পারে করুক!

দু'দিন পরে বিকেলবেলা।

শীতের রোদে তেজ এমনিতেই কম। তায় আবার বেলা প'ড়ে এসেছে। অন্যদিন এ-সময় আটআনির দীঘি থেকে জল নিয়ে ফিরে আসে হরমণি। আজ পরিপাটি ক'রে খোঁপা বাঁধতে বাঁধতে এত দেরি হ'য়ে গেছে। কেশবের এক বিচিত্র শখ। বৌয়ের মাথাভরা কালো চুল নয়ন-লোভন খোঁপাটিও

দেখা চাই আবার রাতের বেলায় বৌকে বুকে টেনে নিয়ে নিজের হাতে সে-খোঁপা এলোমেলো ক'রে দেওয়াও চাই! হরমণি আপত্তির ভান করে কিন্তু মনে মনে খুশিই হয়। আসলে, এবার বাপের বাড়ি থেকে ফেরার পর এই ক'দিন যেন একটা স্বপ্নের ঘোরের ভেতর দিয়ে কেটে যাচ্ছে। কপট রাগের ভান ক'রে কেশবকে সে শাসায় বটে কিন্তু মনে মনে চায়, আরো জোরজবরদস্তি ক'রে জোয়ান মানুষটা ভেঙে দিক তার খোঁপা—বিবশ, বিহ্বল ক'রে দিক তার মন-প্রাণ, দেহ—সব কিছু! কেশব তার পীরিতের টানে সব কিছু এমনিভাবে ভেঙে দিক, কেড়ে নিক ব'লেই নিখুঁৎ ক'রে খোঁপা বাঁধার গরজ অনেক বেড়ে গেছে হরমণির। যার জিনিস সে নেবে না তো নেবে কে?

জল আনতে যেতে কালও একটু দেরি হ'য়েছিল। আজ আবার আরো দেরি। ব্যস্ত হ'য়ে মাটির কলসিটা কাঁখে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো হরমণি। রাংচিতের বেড়ার বাইরে খোঁটায় বাঁধা রাঙী গাইটা ঘাস খাচ্ছিল। তাকে দেখেই গলা তুলে ডাকলো, হাম্বা—

অর্থাৎ, একটু আদর-সোহাগ করো, গল-কম্বল চুল্‌কে একটু আরাম দিয়ে যাও!

—মরণ!—মুখ টিপে হেসে আপনমনেই হরমণি ব'ললে, এই সিদিন ছিলি কম্‌লে বক্‌না, এরির মদ্দি গস্তানি বিটির লাকান গাবীন হ'য়েচিস, তোর নজ্জাও নাই? ওনারে অ্যাকন সোয়াগ কত্তি হবে আর আমার জল আনার বেলা ফুরোয়ে যাক্‌, কেমন?

কথাটা সে মুখে ব'ললে বটে কিন্তু এগিয়ে গিয়ে রাঙীর গল-কম্বল চুল্‌কে দিয়ে ব'ললে, হয়েচে? মা হওয়ার পরেও কি এমন নিলাজের লাকান আদর খাবি নাকি লো পোড়ারমুকি?

দ্রুতপায়ে দীঘির দিকে এগিয়ে চ'ললো হরমণি। দীঘির কিছুটা আগে রাস্তার দু'পাশে একটুখানি জঙ্গল। কবেকার পুরনো কয়েকটা সেগুন, তেঁতুল আর দু'টো অশ্বত্থগাছ সেখানে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। সূর্য একটু পশ্চিমে ঢ'লে গেলেই সে-জায়গাটুকু ছায়া-ঢাকা হ'য়ে যায়। আর, আজ তো রোদ একেবারেই ঢ'লে প'ড়েছে।

এদিক-ওদিক থেকে পাখির কিচির-মিচির ভেসে আসছে। হরমণির কোনো খেয়াল নেই। বিভোর হ'য়ে সে ভাবতে ভাবতে চ'লেছে, আজ রাতে তার স্বামী কেমন ক'রে খোঁপা ভেঙে দিয়ে তাকে বুকে টেনে নেবে!

হঠাৎ কী যে হ'য়ে গেল কিছুই সে বুঝতে পারলো না। দীঘির জল নজরে প'ড়েছে কিন্তু আর এক পা এগোতেই জঙ্গল ফুঁড়ে তার সামনে এসে দাঁড়ালো কুঠির চারজন লেঠেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা তেঁতুলগাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো কাচিকাটা কুঠির আর্চিবল্ড হিল্‌স্‌। সে একটা ঘোড়ার পিঠে ব'সে আছে।

আতঙ্কে বিহ্বল হরমণি ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠলো, বাঁচাও! বাঁচাও—

কেউ বাঁচাতে এলো না। কিছুটা দূরে অন্যদিক থেকে গাঁয়ের একজন লোক এদিকে এগিয়ে আসছিল। হিল্‌স্‌ আর লেঠেলদের দেখে সে জঙ্গলে লুকিয়ে প'ড়লো।

অট্টহাসি হেসে চিৎকার ক'রে উঠলো আর্চিবল্ড হিল্‌স্‌।—ওঃ, হ্যাণ্ডসাম! মুহ্‌মে কাপড় গুঁজিয়া ডেও, কোঠিমে লে চলো—

লেঠেল আদিত্য আর সুকুর মহম্মদ চেপে ধ'রলো হরমণির দু'হাত। মাটির কলসিটা ছিট্‌কে প'ড়ে ভেঙে গেল। তাগিদগীর কুতুব মিঞা আর লেঠেল মধু সিং হরমণির মুখে তার শাড়ির আঁচল গুঁজে দিল।

কয়েক মুহূর্তের ভেতরেই জায়গাটা ফাঁকা হ'য়ে গেল। নীরব সাক্ষী ভাঙা কল্‌সিটা কেবল সেখানে মুখ থুব্‌ড়ে প'ড়ে রইলো।

॥ উনিশ ॥

দেওয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে আটটা ঘন্টা বাজলো।

থানার যুবক দারোগাবাবুর টেবিলের সামনাসামনি স্তব্ধ পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে মথুর বিশ্বাস। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে প্রায় শ'খানেক গ্রামবাসী। থানাঘরের বারান্দায় হাঁটুতে মুখ গুঁজে আবছা অন্ধকারে হতবিহ্বলের মতো ব'সে আছে কেশব।

দারোগাবাবুর চোখে মুখে উৎকন্ঠা। বেশ কিছুক্ষণ কেটে যাওয়ার পর তিনিই প্রথমে কথা ব'ললেন, কী হ'ল কিছুই তো বুঝতে পারচি নে! সেই কখন পাঠিয়েছি অথচ এখনো তাদের দেখা নেই!

মথুর ব'ললে, আমার সোনার পিতিমে বৌমারে আপনি উদ্ধার ক'রে দিতি পারেন ভালো; নয়তো ওই কুটিতি আগুন দে' ছারখার ক'রে আমি ফাঁসে যাবো সে-ও আচ্ছা দারোগাবাবু!

দারোগাবাবু কলকাতার মানুষ। বছর তিনেক হ'ল এ-চাকরিতে ঢুকেছেন। সারা নদীয়া জেলায় হাতে গোণা যে ছ'জন দারোগা এখনো ঘুষের টাকা স্পর্শ করেনি, নীলকরদের টাকা খেয়ে বিবেক বিক্রি করেনি, এই যুবক দারোগা সেই ছ'জনের একজন। পুলিশের চাকরি ক'রে সৎ থাকতে গেলে যে নিজের প্রাণ হাতে নিয়ে প্রতি মুহূর্তে কত সতর্কভাবে চ'লতে হয়, নদীয়া জেলায় বদলি হ'য়ে আসার পর সে-অভিজ্ঞতা এই দারোগাবাবুর বেশ ভালোভাবেই হ'য়েছে। মথুরের কথা শুনে দারোগাসুলভ মেজাজ না দেখিয়ে সহানুভূতির স্বরেই তিনি ব'ললেন, এভাবে মাথা গরম ক'রে তো কোনো লাভ হবে না বিশ্বেসবাবু? আমাদের দরকার আপনার বৌমাকে এখন খুঁজে বের করা! আমার দিক থেকে যতখানি সাহায্য সম্ভব তা সবই আপনি পাবেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই অমানুষ প্ল্যান্টারগুলোকে নিয়ে যে কতরকম সমস্যা আছে—

দারোগাবাবুর কথা শেষ হওয়ার আগেই শশব্যস্তে ঘরে এসে ঢুকলো চৌকিদার ভোলা মণ্ডল। সেলাম জানিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে সে ব'ললে, হুজুর, পাঁচ্জন মাত্তর সেপাই নে' দফাদার হানিপ সায়েব কুটির হাতায় সেঁদোতি ভরসা পাচ্চে না। আমারে ক'য়ে দেলে, বন্দুক নে' আরো কয়ঝনা সেপাই ঝেদি পাঠাতি পারেন তো ভালো হয়!

—হুঁ। এবার আর পাঠাবো না। ফোর্স নিয়ে আমি নিজেই যাচ্ছি! তার আগে জানতে চাই, মেয়েটি এখনো কুঠির ভেতর আছে কিনা! কিছু জানো?

—আচে ব'লেই সন্দ হয় হুজুর। কুটির সদরের মুকি চার শয়তান নেটেলা রিসম সিং, জুরন সিং, আদিত্য বিশ্বেস আর সুকুর মামুদ পাহারা দেচ্চে।

থানা একেবারে খালি রেখে যাওয়া চলে না। কয়েকজনকে রেখে বাকি জনা পাঁচেক বন্দুকধারী কনস্টেবলকে নিয়ে কাচিকাটা কুঠির দিকে ঘোড়ায় চেপে রওনা হ'য়ে গেলেন দারোগাবাবু।

কুঠিতে যে পুলিশ আসছে, সে-খবর প্রথম দফাতেই সেখানে পেঁছে গিয়েছিল। তখন আদিত্যকে ডেকে নির্দেশ যা দেওয়ার তা দিয়ে রেখেছিলেন নায়েব কেদার মুখুজ্যে। কেউ যেন চৌহদ্দির ভেতর ঢুকতে না পারে তার সব ব্যবস্থা করা হ'য়ে গেছে। শুধু লেঠেল-ই নয়, বন্দুক হাতেও আনাচে কানাচে কয়েকজনকে মোতায়েন করা হ'য়েছে। পুলিশ যদি জোর ক'রে ঢুকতে চায় তখন অগত্যা বন্দুক না চালিয়ে উপায় নেই। পুলিশ পুলিশের মতো হ'লে চিন্তার কিছু ছিল না। লোক-দেখানো আসা আসতে হয় আসবে। টাকা নেবে চ'লে যাবে, ব্যস্। কিন্তু থানার নতুন ছোকরা দারোগাটা খুবই বেয়াড়া। সেই জন্যেই পুলিশের জোর ক'রে ঢুকে পড়ার আশঙ্কা র'য়ে গেছে।

কেদার মুখুজ্যের ওপর হিল্স্ সাহেবের হুকুম হ'য়ে গেছে, আজ রাতে কুঠিতেই থাকতে হবে—বাড়ি যাওয়া চ'লবে না। তার জন্যে এমনিতে কোনো অসুবিধেই ছিল না তাঁর। নানা

কাজে কত রাত-ই তো কুঠিতে কাটাতে হয়। কিন্তু আজ দু'দিন হ'ল, ছোটো মেয়ে আর জামাই এসেছে। জামাইয়ের খাতির যত্নটা ঠিকমতো হবে কিনা সেইটেই যা চিন্তার বিষয়।

কুঠির কাছারিঘরের ভেতর দেওয়াল তুলে আর একটা কাম্‌রা তৈরি করা আছে। মাঝে মাঝে রাত্রিবাস তো ক'রতেই হয়। তার জন্যে বিছানা-বালিশ, তাকিয়া, গড়গড়া সব কিছু মজুত আছে সেখানে। সাহেবের হুকুম পাওয়ার পর কাপাসীকেও খবর পাঠিয়ে দিয়েছেন কেদার মুখুজ্যে। আপনমনেই ব'লেছেন, শালা সায়েব, তুমি সারারাত্তির অমন সুন্দর একটা তাজা মাল নে' ফুর্তি লুটে যাবা আর আমি শালা মাজায় নেংটি এঁটি প'ড়ে থাকবো ভেবিচো?

কাপাসী খাওয়া-দাওয়া সেরে সময়মতোই চ'লে এসেছে। পানের রসে ঠোঁট লাল। নায়েববাবুর কিনে দেওয়া পমেটম-ও একটু মেখেছে। পরনের কাপড়ে কয়েক ফোঁটা সেন্ট-ও দিয়েছে। সুগন্ধে ভুর্‌ভুর ক'রছে। ঘরে ঢুকেই সে চোখ টিপে ফিক্‌ ক'রে একটু হেসে ব'ললে, শোনলাম, তোমার মেয়ে-জামাই নাকি এয়িচে?

—তাতে কী হ'য়েচে? মেয়ে-জামাই তাদের মতন থাকবে, আমি আমার মতন। আজ আমার ভারী ফুর্তির রাত রে কাপাসী! ওই শালা মথুর বিশ্বেসের পুতির বৌরি যে আজ সায়েবের কোলে শুয়ে কাপড় খুলতে হচ্চে, এই আমার মহা আনন্দ! শালা এবার বুঝুক, কুটেলের সংগে শত্তুরতা করার মজা কত!

—বলিদান হ'য়ে গিয়েচ্‌?—মুখ টিপে জিজ্ঞেস ক'রলে কাপাসী।

—তা আর হবে না? ঘন্টা চারেক তো হ'য়ে গ্যালো, এর পরেও কি বলি দিতি বাকি থাকে? শালা মথুর বিশ্বেস এবার আচ্ছা জব্দ!

—অ্যাকটা সতীনারীর সতীত্ব লষ্ট হলি তোমার ভারী ফুত্তি, তাই না বাবু?

—চুবো দিনি! দুনিয়ায় কয়ডা সতী আচে রে শালী? সব মাগীরি চিনি! মনে মনে পরপুরুষির কোলে ঢলার সাধ সব মাগীরই আচে! নেহাৎ সমাজের ভয়ে সে-সাধ আর পুরণ হয় না, বুঝলি?

কেদার মুখুজ্যের পাশে ব'সে তার কাঁধে হাতের ভর্‌ রেখে মুচকি হেসে কাপাসী ব'ললে, আহা, মেয়েনোকের সাধ পুরণের জন্যি তোমার কত দরদ গো! নিজির বে' করা পরিবারের সেই দুক্কু বুঝতে ব'লেই মাঝে মাঝে সায়েবেরে রাত্তির ব্যালায় নেম্‌তন্ন ক'রে নে' যেতে তাই না বাবু?

কেদার মুখুজ্যের চোখ-মুখ লাল হ'য়ে উঠলো।—ফের অমন অকথা-কুকথা কবি তো এক থাপ্পড়ে চাবালিডা ভেঙে দেবো!

কাপাসীর মুখে একইরকম মুচকি হাসি।—মোর ঝা ভাঙার তা তো আগেই ভেঙিচো, বাবু। এই বয়েসে আর চাবালি ভেঙে তোমার নাভ কী হবে, কও? তোমার চাকরির গরজে তোমার পরিবার সায়েবের কোলে কয়বার ঢলিচে, গেরামের নোক তা সবই জানে। তাদের মুক তো আর বন্দ কত্তি পারবা না?

কী যেন একটা কথা ব'লতে যাচ্ছিলেন কেদার মুখুজ্যে কিন্তু তার আগেই দরজার কপাটে দ্রুত ঠুকঠুক ক'রে টোকা মারার শব্দ। মুখ বিকৃত ক'রে একটা গালগাল দিয়ে উঠে গিয়ে তিনি দরজা খুলে দিলেন।

দরজায় টোকা দিয়েছে লেঠেল সুকুর মামুদ। ব'ললে, দারোগাবাবু নিজি এসি হাজির, বাবু! সিনি কুটির মদ্দি সেঁদোতি চাচ্চেন।

—লাঠির বাড়িতি সে খান্‌কির বাচ্চার চাঁদিডে দু'ফাঁক ক'রে দিতি পাল্লি না?

—হুকুম হলিই পারি।

—হুকুম দেয়ার মালিক তো সায়েব। তেনার ঘরে এখন যাবে কেডা? চল্‌ দিনি, কী কত্তি পারি! শালা মহারাণীর গরমেণ্ট দারোগার চাকরি দেয়ার আর লোক খুঁজে পায় না? সদরে আচে এক খান্‌কির বাচ্চা দারোগা গিরিশ বোস, আবার এই একটারে জোটায়ে এনিচে! চল্‌—

কুঠির ফটকে ঘোড়ার ওপর প্রতীক্ষা ক'রছেন দারোগাবাবু। তাঁর চারপাশ ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে আটদশজন লালপাগড়ি।

দেহটাকে যথাসম্ভব নুইয়ে হাত জোড় ক'রে নিতান্ত অনুগতের ভঙ্গিতে কেদার মুখুজ্যে ব'ললেন, কী ব্যাপার দারোগাবাবু? আপনি এত রাতে?

—আমি একবার আপনাদের কুঠি সার্চ ক'রতে চাই!

—সাচ্?—যেন আকাশ থেকে প'ড়লেন কেদার মুখুজ্যে।—কেন বলুন দিনি?

—আমি নালিশ পেয়েচি, একজন যুবতী গেরস্ত বৌকে অসৎ উদ্দেশ্যে এখানে আটক করা হ'য়েছে।

—সে কি! কী ব'লচেন দারোগাবাবু? তা কি সম্ভব?

—সম্ভব কি অসম্ভব তা আমি নিজের চোখেই যাচাই ক'রে দেখতে চাই নায়েবমশাই!

—সে আপনার এক্তেয়ার আচে, ইচ্ছেমতো সাচ্ আপনি কত্তি পারেন। তবে কিনা, আমিতো সামান্য নায়েব মাত্তর। কুটির মেনেজর সায়েব তো কুটিতি নাই দারোগাবাবু!

—নেই মানে? মিস্টার হিল্স্ কোথায়?

—আজ্ঞে, আজ দুপর ব্যালায় গোয়াড়ি গিয়েচেন। কালকে ফেরার কতা।

এই সময় দফাদার হানিফ মিঞা আর চৌকিদার ভোলার ভেতর চোখের ইশারায় কী যেন কথা হ'য়ে গেল। দারোগাবাবু তা খেয়াল করেননি।

কেদার মুখুজ্যের দিকে কটমট ক'রে তাকিয়ে দারোগাবাবু ব'ললেন, আমি কুঠি সার্চ ক'রলে আপনার আপত্তি আছে?

জিভ কেটে কেদার মুখুজ্যে ব'ললেন, ছি ছি, আপত্তি থাকবে কেন? আপনার হয়রানি হবে ভেবেই কচ্ছি দারোগাবাবু!

—হয়রানি হয় হোক, চলুন—

দারোগাবাবু ঘোড়ার লাগাম ধ'রে টান দেওয়ার উপক্রম ক'রতেই পেছনদিক থেকে চৌকিদার ভোলা সামনে এগিয়ে এসে ব'ললে, হুজুর, ফিরে চলেন!

—কেন? ফিরে যাবো কেন?

আম্তা আম্তা ক'রে ভোলা ব'ললে, নায়েববাবু ঠিকই ক'য়েচেন। আজ দুপরবেলায় মুই নিজির চোকি হিলিস সায়েবেরে গোয়াড়ির পথে যেতি দেকিচি হুজুর।

—তুই দেকিচিস?—উৎফুল্ল হ'য়ে উঠলো কেদার মুখুজ্যের মুখ।—শোনলেন তো দারোগাসায়েব? আপনার চৌকিদারই সাক্কি!

ঘোড়ার লাগাম একহাতে ধ'রে কাঁপা কাঁপা স্বরে ভোলা ব'ললে, ম্যালা রাত্তির হ'য়ে গিয়েচ্ হুজুর! অ্যাকন ফিরে চলেন! ইচ্চে হলি কালকে দিনির ব্যালায় সাচ্ করবেন।

দফাদার হানিফ মিঞাও ভোলার কথায় সায় দিলে। কেমন একটু খটকা লাগলো দারোগাবাবুর। ভোলা হঠাৎ নায়েবের কথায় সায় দিল কেন? হানিফ-ই বা ভোলাকে সমর্থন ক'রলো কেন? তবে কি এরই ভেতর নায়েববাবু টাকা খাইয়ে ওদের হাত ক'রে ফেলেছে? এই নীলকরের রাজ্যে কোনো ঘটনাই অসম্ভব নয়!

কয়েকমুহূর্ত কী যেন ভাবলেন দারোগাবাবু। তারপর ব'ললেন, ঠিক আছে, চলো। চললুম নায়েবমশাই—

দলবল সমেত দারোগাবাবু রওনা হ'য়ে যাওয়ার পর কেদার মুখুজ্যের মুখে ফুটে উঠলো কুৎসিত হাসি।—শালা, কুটি সাচ্ ক'র্বি? কুটি তোর মাগের ফল্না পেয়িচিস শালা?

কত সহজে ঝামেলা মিটে গেল। দারোগা জানে না, কোন্ পর্যন্ত হুকুম ছিল! বেশি জেদ ক'রে কুঠির হাতায় ঢুকলে ওকে আর ফিরে যেতে হ'ত না! লাশটাও দেখতে পেতো না কেউ কোনোদিন। ভোলা চৌকিদার আর দফাদার হানিফের ওপর দারুণ খুশি কেদার মুখুজ্যে।

হাতে একটা পয়সাও ছোঁয়ানো হয়নি অথচ যেচে তারা এতখানি উপকার ক'রলো কেন? নিশ্চয়ই কিছু পাওনার আশা আছে ওদের। সে দেওয়া যাবে। ওদের হাতে রাখতেই হবে!

কুঠি থেকে বেশ কিছুটা দূরে আসার পর ভোলা হঠাৎ কাঁপা গলায় ব'ললে, হুজুর, আমারে মাপ করেন হুজুর! নিরুপায় হ'য়ে আমি মিত্যে কতা ক'য়েচি।

—তার মানে?—ঘোড়া থামিয়ে প্রচণ্ড উত্তেজনায় চিৎকার ক'রে উঠলেন দারোগাবাবু।—মিথ্যে কথা ব'লেছিস! তোকেই আমি গুলি ক'রবো!

ভোলা হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠলো, মাপ করেন হুজুর—

—মাফ ক'রবো? একটা নিষ্পাপ ঘরের বৌকে জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে গিয়ে তার সর্বনাশ ক'রচে আর তুই কিনা মিছে কথা ব'লে আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে এলি?

প্রচণ্ড জোরে ভোলার গালে একটা চড় মারলেন দারোগাবাবু। ছিট্‌কে মাটিতে প'ড়ে গিয়ে হাউ হাউ ক'রে আবার কেঁদে উঠলো ভোলা।—হুজুর, কুটিতি একবার সেঁদোয়ে গেলি আপনি আর বেঁচে ফিত্তি পাত্তেন না! রেতের আন্ধারে আপনারে ওরা গুম করার মতলব এঁটেলো। নোক মোতায়েনই ছিল।

একটু থম্‌কে গেলেন দরোগাবাবু। কিন্তু প্রচণ্ড ক্রোধের উত্তেজনায় তখনো তাঁর সারা দেহ থর্‌থর্ ক'রে কাঁপছে। সেই ঝোঁকেই চিৎকার ক'রে উঠলেন, কে তোকে ব'লেচে?

এবারে জবাব দিলে হানিফ মিঞা।—ভোলা সাচা কতা-ই ক'য়েচে হুজুর! আমি ঝ্যাকন ওরে থানায় পেঠিয়ে দেলাম সেই ফাঁকে বন্দুক, তেরোনাল আর সড়কি হাতে কুটির কোণা-কান্‌চেয় নায়েববাবু নোক মোতায়েন ক'রেলো। আপনার পর ওদের খুব গোসা হুজুর! রেতের আন্ধারে এই মওকা ওরা ছাড়তো না। ভোলারে আমিই সেই অন্তেরা দিয়েলাম।

হানিফের কথার সংগে সংগেই ভোলা আবার কেঁদে উঠলো।—মুই আর থিব থাকতি পারি নাই হুজুর! মিত্যে কতাডা না কলি ঝে আপনি ফের্‌তেন না! হুজুর, কেশার বৌডা আমার মেয়ের বইসী। তার ধম্মোনাশ হ'য়ে গ্যালো ভেবি আমার ছাতি ফেটি যাচ্চে! কিন্তুক তারেও আমরা রক্কে কত্তি পাত্তাম না, আপনার জেবনডাও হয়তো চ'লে যেতো। তাই আমি আর চুপ থাকতি পাল্লাম না—

ভোলার কান্না আর থামতে চায় না। দারোগাবাবু কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হ'য়ে রইলেন। তারপর নির্জীব স্বরে ব'ললেন, মেয়েটাকে বাঁচাতে পারলুম না!

রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা বাজে।

আর্চিবল্ড হিল্‌সের খাস পেয়াদা এসে কেদার মুখুজ্যেকে জানালো, সাহেব তলব ক'রেছেন।

কেদার মুখুজ্যে একটু অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে কাপাসীর দিকে তাকালেন। অর্থাৎ, ফলার হ'য়ে গেছে। এবার এঁটো পাতা ফেলে আসতে হবে।

হিল্‌সের খাস কামরার বাইরে থেকেই উগ্র মদ আর কড়া চুরুটের গন্ধ নাকে এসে লাগলো। আজকের রাতে স্নায়ুগুলোকে চাঙ্গা রাখার জন্যে কেদার মুখুজ্যে নিজেও কিছুটা ধেনো মদ গিলেছেন। কিন্তু এর কাছে কোথায় লাগে তার গন্ধ! দরজার কপাট খোলা-ই ছিল।

—কাম ইন!

কামরার ভেতর থেকে আর্চিবল্ড হিল্‌সের নেশাজড়িত কণ্ঠের হুকুম শুনে আস্তে আস্তে পা ফেলে ঘরে ঢুকলেন কেদার মুখুজ্যে। মেয়েটা ঘরের মেঝের ওপর লুটিয়ে প'ড়ে আছে। পরনের কাপড়খানা এলোমেলো; মাথার একরাশ কালোচুলের খোঁপা বিধ্বস্ত।

মেহগনি কাঠের শৌখিন ডিভানে কাৎ হ'য়ে আয়েশে চুরুট টানছিল আর্চিবল্ড হিল্‌স্। ব'ললে, এ শালীকো বাহার নিকাল ডেও—

মেয়েটার জ্ঞান আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। মুখখানা মেঝেয় গোঁজা রয়েছে। কেদার মুখুজ্যে হাত ক'চলে মিহিস্বরে ব'ললে, নিজি হেঁটি যেতি পারবে তো হুজুর?

—উহার বাপ যাইটে পারিবে! ব্লাডি বীচ্! বহুট টক্‌লিফ ডিয়াছে। চেস্টিটি হাঃ হাঃ হাঃ! মাগীর পেট বাচাইয়া দিয়াছি!

—এইবার মথুর বিশ্বেস সমঝ পাবে হুজুর্। শালার ঘরে ধলা নাতি আসবে!

কৃতার্থের হাসি হেসে মনিবকে খুশি ক'রতে চাইলেন কেদার মুখুজ্যে। কিন্তু মনিবের হঠাৎ কী হ'ল কে জানে! টলতে টলতে ডিভানের ওপর উঠে ব'সে এক লাথি মারলো কেদার মুখুজ্যের কোমরে।—ব্লাডি নিগার, উহাটে টোমার কী? পহেলে এ মাগীকো নিকালো—

—এই ঝে নে' যাচ্চি হুজুর। কিন্তু এ-মাগীরে যে কুঠিতি রাখা যাবে না?

—হোয়াই? কেনো রাখা যাইবে না? বহুট খুবসুরত লড়্কি! হামার বহুট পসন্দ আছে!

—কিন্তু হুজুর, দলবল নে' দারোগাবাবু এয়েলো।

—ডারোগাবাবু? দ্যাট ব্লাডি বাস্টার্ড? হোয়াই?

কেদার মুখুজ্যে সংক্ষেপে পুলিশের ঘটনাটা ব'ললেন। পরের দিন যে আবার কুঠি তল্লাশি হওয়ার সম্ভাবনা আছে সেটাও জানালেন।

—ব্লাডি সোয়াইন! শালা ডারোগাকে হামি ডেখিয়া লইবে! ঠিক হ্যায়। আজ রাত্রির মধ্যে মাগীকে কোঠির বাহার পাচার করিয়া ডেও।

আদেশ পেয়ে হরমণির কাছে গিয়ে একটু ঝুঁকে কেদার মুখুজ্যে ব'ললেন, এই, ওঠ্—

হরমণি উঠলো না। কেদার মুখুজ্যে সাহেবের দিকে তাকিয়ে ব'ললেন, মাগী যে ওটে না হুজুর!

—হাট পকড়কে টানিয়া লইয়া যাও—

সাহস পেয়ে এবার হরমণির হাত ধ'রে টানলেন কেদার মুখুজ্যে। না, মেয়েটা জ্ঞান হারায়নি। দু'হাতে ঠেলে হরমণিকে উঠিয়ে বসালেন তিনি। মেয়েটার শুকনো চোখের জলে গালের ওপর লেপ্‌টে আছে কয়েকগাছা চুল। তার ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে তার চোখ দু'টি।

হরমণি তাকালো।

হঠাৎ বুকের ভেতরটা কে· · যেন কেঁপে উঠলো নায়েবমশাইয়ের। এ-ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট অভিজ্ঞ। এমন বেশ কিছু মেয়েকে এই ক'বছরে মনিবের ঘর থেকে বের ক'রে নিয়ে গেছেন তিনি। কিন্তু কোনো যুবতী মেয়ের চোখে এমন ভয়ঙ্কর শুকনো চাউনি তিনি আজ পর্যন্ত দেখেননি।

॥ কুড়ি ॥

"উৎপীড়নের জাল রীতিমতো নিপুণভাবেই বিস্তার করা হ'য়েছে। অসংখ্য রায়তকে অন্তরীণ করা হ'য়েছে কারাগারে। কিন্তু এই শাস্তির ব্যবস্থা একেবারেই বিফল হ'য়েছে, কারণ তার উদ্দেশ্য ছিল নীলচাষে রায়তদের বাধ্য করা। রায়তেরা জেলে গেছে কিন্তু নীলের বীজ বোনেনি। অগত্যা সরকার এখন কৌশল পরিবর্তিত ক'রেছেন। মফস্বলে ম্যাজিস্ট্রেটরা এখন বিঘেপ্রতি নীলজমির জন্যে নীলকরদের কুড়ি টাকা হারে ক্ষতিপূরণ দিতে শুরু ক'রেছেন। মিস্টার হার্শেল খাল-বোয়ালিয়া কুঠির জন্যে ক্ষতিপূরণ ধার্য ক'রেছেন বিঘেপ্রতি উনিশ টাকা। সরকারের এই অসঙ্গত শর্ত অনুসারেও এই ধরণের ক্ষতিপূরণের হার কোনোক্রমেই আট কিম্বা ন'টাকার বেশি হ'তে পারে না। আমরা যে হিসেব পেয়েছি, তাতে দেখা যাচ্ছে, গত বছর কাচিকাটা কুঠি উনিশ হাজার বিঘের চাষে একলক্ষ প'য়তাল্লিশ হাজার টাকা লাভ ক'রেছিল। এ-বছর ওই কুঠির ছ'হাজার বিঘে জমিতে নীলের চাষ হয়নি, সুতরাং সরকারের অভিনব বদান্যতায় তারা ওই অনাবাদী জমির জন্যে একলক্ষ কুড়ি হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ পাবে। যদি তাদের সম্পূর্ণ জমি উনিশ হাজার বিঘের

জন্যেই ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় তাহ'লে তারা পেতে পারে মোট তিন লক্ষ আশি হাজার টাকা। অর্থাৎ নীলচাষ ক'রে কাচিকাটা কুঠি যা লাভ করে, সরকারি ক্ষতিপূরণ তার তিনগুণ!"

কলম থামিয়ে মুখ তুলে তাকালে হরিশ। চোখ দু'টো টক্‌টকে লাল। মদের ঘোরে নয়, জ্বরের ঘোরে। মাথাটা যেন ছিঁড়ে প'ড়ে যাচ্ছে। হাতের কাছেই রয়েছে পানীয়ের গেলাস আর বোতল। গেলাসে বড়ো ক'রে একটা চুমুক দিয়ে আবার কলম তুলে নিলে হরিশ।

ও-পাশের টেবিলে ব'সে কাজ ক'রছিল শম্ভুচাঁদ। অনেকক্ষণ ধ'রেই সে কিছু ব'লবে ব'লে উস্‌খুস্‌ ক'রছিল। কিন্তু সাহস পায়নি। হরিশ মুখ তুলে তাকানোর ফাঁকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে নিয়ে সে মনস্থির ক'রে ফেলেছে।

হরিশ আবার কলম নিয়ে লেখায় মনোনিবেশ ক'রতেই মৃদুস্বরে শম্ভুচাঁদ ব'ললে, দাদা!—আজ আপনার শরীরটা বড়ো বেশি কাহিল দেখাচ্চে। আজকের রাতটা বিশ্রাম নিলে বোধহয় ভালো হ'ত!

—উপায় নেই শম্ভু!—মুখ না তুলেই ব'ললে হরিশ, বিশ্রাম নিতে চাইলেও মাথাটা তাতে সায় দেবে না। হয়তো ছট্‌ফট্‌ ক'রেই সারারাত কেটে যাবে! এ-লেখাটা প্রায় শেষ হ'য়ে এলো। তুমি ততক্ষণ হরমণি নামে মেয়েটাকে ধর্ষণ সম্বন্ধে যে রিপোর্টগুলো এয়েচে, সেগুলো মিলিয়ে দ্যাখো, কারো বিবরণের সঙ্গে অন্য কারো কোনো অমিল বা অসঙ্গতি আছে কিনা! সব ক'টা রিপোর্টই নদীয়ার ফাইলে আছে।

চাপকানের পকেট থেকে গোপনীয় নথীপত্রের জন্যে রাখা বিশেষ আলমারির চাবিটা বের ক'রে দিলে হরিশ।

চাবি হাতে নিয়ে শম্ভুচাঁদ ব'ললে, মোট রিপোর্টতো তিনটে?

—হ্যাঁ। একটা পাঠিয়েচে হরিনাথ, একটা গিরীশ বোস আর একটা মনোমোহন। সাবধান, কেউ যদি এসে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে লুকিয়ে ফেলবে। অন্তত রিপোর্টারদের নাম-ধাম যেন কেউ দেখতে না পায়!

আবার নিজের নিবন্ধ লেখায় মন দিলে হরিশ। শম্ভুচাঁদ আলমারি খুলে ফাইল বের ক'রে দেখতে ব'সলো। পেছনের ঘর থেকে ছাপামেশিনের শব্দ ভেসে আসতে লাগলো, টুং, টুং-ঘটাং, ঘটাং—

আজ কিছুদিন ধ'রেই মাঝে মাঝে জ্বর হচ্ছে হরিশের। বিকেলের দিকেই জ্বরটা আসে। কিন্তু হরিশের কোনো ভ্রূক্ষেপ-ই নেই। গিরীশ কয়েকদিন আগে ব'লেছিল, তুমি তো ঝড়-জল-বন্যাতেও কখনো ছুটি নাও না হরিশ: কর্নেল চ্যাম্প্‌নিজকে ব'লে কয়েকটা দিন ছুটি নিয়ে একটু বিশ্রাম ক'রলে ভালো হ'ত না?

—অসম্ভব! যতক্ষণ পর্যন্ত অশক্ত না হ'য়ে প'ড়চি ততক্ষণ ছুটি আমি নেবো না। কর্নেল চ্যাম্প্‌নিজ আমার শুভার্থী হ'তে পারেন কিন্তু আপিসে একা তিনিই তো শাদা চামড়া ন'ন? তারা বেশিরভাগই সুপ্রীম কোর্টের জজ মর্ডান্ট ওয়েল্‌শের মতো মনে করে, বাঙালী মাত্রেই মিথ্যেবাদী, প্রবঞ্চক আর কুঁড়ে। বাঙালী মানেই যে তা নয়, সেটা ওদের একটু দেখিয়ে দেওয়া দরকার। ব'লতে পারো এটা আমার জেদ।

—তাই ব'লে চোরের ওপর রাগ ক'রে মাটিতে ভাত খাবে? আমি ব'লচি, তুমি ছুটি নাও!

—বেশ, নিলুম। কিন্তু পেট্রিয়ট?

—পেট্রিয়ট থেকে ছুটি নিতে ব'লচি নে।

—আপিস থেকে ছুটি নেবো অথচ পুরোদমে পেট্রিয়টের কাজ ক'রবো, সেটা কেমন বিশ্রাম হে? তা হয় না। কাজ করবার শক্তি যতক্ষণ দেহে আছে ততক্ষণ সব কাজই ক'রবো। আমার কী মনে হচ্চে জানো গিরীশ? গত দু'বছর পেট্রিয়টের যে দায়িত্ব ছিল, বর্তমানে তার চেয়ে অনেক বেশি বেড়ে গেচে, হয়তো আরো বাড়বে। বিশ্রাম নেওয়ার কোনো উপায়ই এখন আমার নেই!

—তাই ব'লে নিজের শরীরের এত ক্ষতি ক'রে তুমি—

বাধা দিয়ে মৃদু হেসে হরিশ ব'ললে, আমি আর কতটুকুই বা ক'রতে পারচি, বলো? আমি দিব্যি দু'বেলা দু'টি খেতে পাচ্ছি, মাসান্তে মাইনে পাচ্ছি—কোনো দুশ্চিন্তা নেই। কিন্তু নীল-চাষীদের অবস্থাটা একটু ভেবে দ্যাখো দিকি? পেটে ভাত নেই, পরনে কাপড় নেই, একটা মুহূর্তের জন্যে নিরাপত্তা নেই—তবু তারা কিন্তু মরণপণ ক'রে যুঝে চ'লেচে! তাদের কোনো সংগঠন নেই অথচ দোর্দণ্ডপ্রতাপ প্ল্যান্টারদের সঙ্গে নিরুপায় হ'য়ে জীবন-মরণ লড়াইয়ে নেমেচে। সেপাইদের হাতে তবু কিছু কামান-বন্দুক ছিল, এদের হাতে তা-ও নেই! লাঠি-সড়কি আর মনের জোর নিয়েই এরা লড়াইয়ে নেমে প'ড়েছে! এ যে বাঙলাদেশের ইতিহাসে কি অসাধারণ একটা ঘটনা, তা আমি এখনো ভেবে উঠ্‌তে পারচি নে! এই বিরাট বিপ্লবের সময় তাদের হ'য়ে দু'কথা না লিখে যদি হাত গুটিয়ে ব'সে থাকি তাহ'লে সেটা বোধহয় হবে জীবনের সবচেয়ে বড়ো পাপ!

আবেগে উত্তেজিত হরিশের মুখের দিকে তাকিয়ে গিরীশ ব'ললে, লিখতে তোমাকে মানা ক'রচি নে, আমি শুধু তোমার নিজের স্বাস্থ্যের কথাটা ভাবতে ব'লচি!

হরিশ হেসে ব'ললে, স্বাস্থ্য আর চরিত্তির রক্ষে করবার কোনো নিয়মটাকেই তো এতগুলো বছর মেনে আসিনি, এখন আর মেনে কী হবে?

—এটা কোনো কাজের কথা নয়। যা খুশি করো কিন্তু একবার অন্তত ডাক্তার দেখাও!

কষ্ট ক'রে সেটা হয়তো একদিন ক'রতে পারি, কিন্তু সময় পাচ্ছিনে। রমাপ্রসাদও ব'লেচিল, ডক্টর গুডিভের কাছে নিয়ে গিয়ে আমাকে আগাপাশতলা পরীক্ষে করাবে।

—যাওনি কেন?

—পরশুদিন যাবো ব'লে ঠিক ক'রেচিলুম। কিন্তু বিকেলবেলায় পেট্রিয়ট আপিসে গিয়ে দেখি, যশোর থেকে কয়েকজন রায়ত আমার সঙ্গে দেখা ক'রতে এয়েচে। ওখানে কয়েকজন প্ল্যান্টার শ'য়ে শ'য়ে রায়তের নামে মিথ্যে ফৌজদারি মামলা রুজু ক'রেচে। কোনো মোক্তার রায়তদের হ'য়ে আদালতে দাঁড়াতে সাহস পাচ্চে না। ওরা পরামর্শ নেওয়ার জন্যে আমার কাছে এসে হাজির, যেমন ক'রে হোক তাদের একটা পথ বাৎলে দিতে হবে!

—কী ক'রলে তুমি?

—আপাতত আদালতে দাখিল করবার মতো কিছু দরখাস্তের মুসোবিদে ক'রে দিলুম। জানি, তাতেও বিপদ থেকে ওরা রেহাই পাবে না। এখন চেষ্টায় থাকতে হবে, এখান থেকে কয়েকজন মোক্তার যদি পাঠানো যায়!

—সেখানকার মোক্তারেরাই সাহস পাচ্ছে না, ক'লকাতার মোক্তার যেতে সাহস পাবে?

—জানিনে সাহস পাবে কিনা, তবে চেষ্টা তো আমাকে ক'রতেই হবে!—গভীর আবেগের সঙ্গে হরিশ ব'ললে, নিরুপায় গরীব মানুষগুলোর মুখ আমি দেখেচি গিরীশ! আমার বিশ্বাস, কমবয়সী কোনো কোনো মোক্তার হয়তো এগিয়ে আসবে। নীল-আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার পর থেকে আমার যে অভিজ্ঞতা হ'য়েচে, তা থেকে ব'লতে পারি, শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের ভেতর থেকে যে সামান্য কয়েকজন ব্যক্তি ওই অসহায় রায়তদের দুঃখমোচনে এগিয়ে এয়েচে, তারা সবাই নিতান্ত তরুণ যুবক। বয়েস আর একটু বেশি হ'য়ে গেলে হয়তো স্বার্থ-চিন্তা তাদের টেনে রেখে দিত! সে যাই হোক, ভবিষ্যতের ভয় নেই এরকম অন্তত দু'চারজন বোকা যুবক মোক্তার আশা করি আমি পেয়ে যাবো। যতদূর শুনচি, নতুন আইন জারি হ'তে চ'লেচে। নতুন আইন মানেই নতুন ফাঁস! সুতরাং মোক্তার দরকার হবেই!

গিরীশ ব'ললে, নতুন আইন মানেই নতুন ফাঁস হবে, আগেই তা ভাব্‌চো কেন? পিটার গ্র্যান্ট যে হ্যালিডে ন'ন, সেটা তো দেখা যাচ্ছে। হয়তো এমনও হ'তে পারে যে, নতুন আইন প্রজাদের পক্ষে সুবিধের হবে?

—হ'তে পারে না, তা ব'লচিনে, তবে আশা খুব ক্ষীণ। স্যার পিটার গ্র্যান্ট নিজে বিবেকসম্পন্ন মানুষ ব'লেই শুনেচি। কিন্তু যে আইন-ই তিনি করুন, তাকে প্রয়োগ ক'রবে তো লম্পট, ঘুষখোর ম্যাজিস্ট্রেটেরা? তারা পিটার গ্র্যান্ট কিম্বা সীটনকারের মতো ওপরওয়ালার পরোয়া করে না। প্যারীদাদার আলাল প'ড়েচো তো? নীলকর আর ম্যাজিস্ট্রেটের যে ছবি তিনি এঁকেচেন, এখনকার চিত্র তার চেয়েও অনেক বেশি ভয়ঙ্কর!

—তুমি নীল কমিশন বসানোর যে দাবি বারবার জানিয়ে আসচো, সে দাবি গ্র্যান্টের গবরমেন্ট হয়তো মানলেও মানতে পারে!

—কি জানি!—মৃদু হেসে হরিশ ব'ললে, কমিশনের চেহারাতো কিশোরীর ব্যাপারেও দেখেচি! কমিশন বসানোর দাবি জানাচ্চি ব'লে মনে ক'রো না, তার ওপর আমার পুরোপুরি আস্থা আছে। তবে এ প্রসংগে আমার একটা কথা আছে গিরীশ। নীলের ব্যাপারে কমিশন বসানোর দাবি আমার আগেও একজন ক'রেচিলেন, কিন্তু সেটা হ্যালিডের আমল ছিল ব'লে কমিশন তো বসেইনি, উল্‌টে বেচারা প্রস্তাবকের ভাগ্যে জুটেচিলো লেপ্টেন্যান্ট গবর্নরের শাসানি!

—কে, বলো তো?

—মিস্টার স্কোন্স। আজ থেকে বছর ছয়েক আগের কথা। তিনি তখন ছিলেন নদীয়ার জজ-ম্যাজিস্ট্রেট। ভদ্রলোকের মাথায় নিঃসন্দেহে দুর্বুদ্ধি ভর ক'রেচিলো! তাই নিজে ব্রিটিশ হ'য়েও নীলকরদের সম্বন্ধে একটা তদন্ত-কমিশন বসানোর জন্যে জোর সুপারিশ কল্লেন। তখন ডালহৌসির একাদশে বৃহস্পতি চ'লচে। হ্যালিডে আবার বাঙলার প্রথম লেপ্টেন্যান্ট গবর্নর। ডালহৌসি হ্যালিডেকে দিলেন পিঠ-চাপড়ানি। ব্যস, লেপ্টেন্যান্ট গবর্নরের কড়া চিঠি গেল স্কোন্সের কাছে। নীলচাষের ব্যাপারে দু'টো পক্ষ আছে—নীলকর আর রায়ত। স্কোন্স মাত্র একপক্ষ অর্থাৎ নেটিব রায়তদের কথাই শুনেচেন, সম্ভ্রান্ত নীলকরদের বক্তব্য তিনি শোনেননি। তা যদি শুনতেন তাহ'লে তিনি নিশ্চয়ই তাঁর মতামত আর সুপারিশ পরিবর্তন ক'রতেন। এটা কি চিন্তা করা যায় যে, ব্রিটিশ-শাসন যেখানে প্রতিষ্ঠিত, সেখানে আইন নেই, বিচার নেই? সুতরাং, একদেশদর্শী মতামতের ওপর নির্ভর ক'রে অকারণ নীলকরদের বিরুদ্ধে একটা তদন্ত কমিশন বসানোর কোনো প্রয়োজন গবরমেন্ট বোধ করেন না।

গিরীশ হেসে ব'ললে, তা বটে! দেখা যাক, পিটার গ্র্যান্ট কী করেন!

—দাদা!

শম্ভুচাঁদের ডাকে অন্যমনস্কতা কেটে গেল হরিশের।—কী ব'লচো?

—সব ক'টা রিপোর্টেই মিল আছে। মনে হচ্ছে, সবাই ভালোভাবে ঘটনাগুলো জেনেই রিপোর্ট পাঠিয়েচেন। তবে গিরীশবাবুর রিপোর্টে কিছু অতিরিক্ত তথ্য আছে।

—সেটা স্বাভাবিক। গিরীশবাবু নিজে কেষ্টনগর সদর কোতোয়ালির দারোগা, তাঁর পক্ষে ভেতরকার তথ্য অনেক বেশি জানা সম্ভব। দাঁড়াও, এ-লেখার কাপিটা গোবিন্দকে দিয়ে নিই—

ভেতর ঘরে ঢুকে নিবন্ধের পাণ্ডুলিপি দিয়ে এসে মদের গেলাসে আবার চুমুক দিয়ে হরিশ ব'ললে, আমি একবার চোখ বুলিয়েচিলুম মাত্র। রিপোর্ট তিনটে থেকে ঘটনার বিবরণ কী পেলে, বলোতো!

শম্ভুনাথ ব'ললে, ফেব্রুয়ারি মাসের বারো তারিখে মথুর বিশ্বাসের পুত্রবধূ হরমণি দাসী বিকেলবেলায় যখন জল আনতে যাচ্ছিল তখন আর্চিবল্ড হিল্‌সের লেঠেলরা জোর ক'রে তাকে ধ'রে কুঠিতে নিয়ে যায়। হিল্‌স্ নিজে ঘোড়ায় চ'ড়ে তার বাহিনীকে চালনা করচিল। গ্রামের একজন মুসলমান চাষী একটু দূরে জঙ্গলের ভেতর লুকিয়ে সে ঘটনা প্রত্যক্ষ করে। তার কাছে খবর পাওয়ার সংগে সংগে মথুর বিশ্বাস থানায় গিয়ে এজাহার দেয়। সৌভাগ্যক্রমে থানার দারোগা সৎপ্রকৃতির ব্যক্তি হওয়ায় তিনি তখনই কুঠিতে পুলিশ পাঠান। পরে নিজেও গিয়েছিলেন। কিন্তু

যেমন করেই হোক, তাঁর মনে বিশ্বাস উৎপাদন করানো হয় যে সেদিন দুপুরেই হিল্‌স্‌ নাকি কৃষ্ণনগরে গেছে। দারোগা ফিরে আসেন। পরে তিনি জানতে পারেন, হিল্‌স্‌ কুঠিতেই ছিল এবং বলপ্রয়োগে যুবতী মেয়েটিকে ধর্ষণ ক'রেছে। রাত সাড়ে এগারোটার পরে কুঠির নায়েব কেদার মুখুজ্যে এবং একদল লেঠেল মেয়েটিকে নিয়ে গ্রামের এক গরীব ব্রাহ্মণের বাড়িতে ফেলে রেখে আসার চেষ্টা করে কিন্তু সফল হতে পারেনি। তারপর পাশের গ্রামের এক নাপিতের বাড়িতে রেখে আসার চেষ্টাও তাদের ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত কয়েক মাইল দূরে গোঁসাই-দুর্গাপুর কুঠির আমিন স্বরূপ বিশ্বাসের বাড়িতে মেয়েটিকে রেখে তারা পালিয়ে আসে। ওই আমিন আবার মথুর বিশ্বাসের জ্ঞাতি-ভাই। মথুরের সঙ্গে তার শত্রুতা ছিল। তাই মথুরের পুত্রবধূর সতীত্বনাশের সংবাদে সে খুশিই হয় এবং সম্ভবত এই মনে ক'রেই ধর্ষিতা মেয়েটিকে সে রাতে আশ্রয় দেয় যে, সে সাক্ষী থাকার জন্যে ঘরের এই কেলেঙ্কারি মথুর আর গোপন ক'রতে পারবে না। তাছাড়া, মথুরের কাছে তার পুত্রবধূকে ফিরিয়ে দিয়ে একটু বাহবা-ও নেবে—

—মেয়েটিকে তার শ্বশুর ফিরিয়ে নিয়েচে?—উদ্‌গ্রীব উৎকণ্ঠায় প্রশ্ন ক'রলে হরিশ।

—হ্যাঁ, দাদা। চোদ্দ তারিখেই পুত্রবধূকে ঘরে নিয়ে আসে মথুর। শুধু তাতেই সে ক্ষান্ত হয়নি। মিস্টার উইলিয়ম জেম্‌স্‌ হার্শেল ফেব্রুয়ারি মাসের বিশ তারিখে নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট হ'য়ে কেষ্টনগরে এয়েচেন। শোনা যাচ্চে, ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে সরাসরি নালিশ করবার জন্যে সবদিক থেকে তৈরি হ'য়েচে মথুর বিশ্বাস।

শম্ভুচাঁদ থামলো। উচ্ছ্বাসে হরিশ চিৎকার ক'রে উঠ্‌লো, সাবাস! হ্যাট্‌স্‌ অফ টু মথুর বিশ্বাস!—ওরা জিতবে! ওরা জিতবে শম্ভু!

দ্রুত চেয়ার থেকে উঠে আর এক চুমুক মদ খেয়ে অধীর উত্তেজনায় পায়চারি ক'রতে লাগলো হরিশ।

ভয় পেয়ে গেল শম্ভুচাঁদ। এই প্রবল জ্বর গায়ে এত অস্থিরভাবে পায়চারি ক'রতে থাকলে যে কোনো সময় পা ট'লে মানুষটা প'ড়ে যেতে পারে! শম্ভুচাঁদ উদ্বিগ্নস্বরে ব'ললে, আপনি বসুন দাদা! এত জ্বর গায়ে—

—হেল উইথ ফিভার! শম্ভু, গণ্ডগ্রামের এই নিরক্ষর চাষীরা কত উদার, কত সাহসী—তা বুঝতে পারচো? হিন্দুর সন্তান হ'য়েও ধর্ষিতা পুত্রবধূকে যে-মানুষ সাদরে আবার ঘরে নিয়ে এয়েচে; কলঙ্ক ঢাকার কিছুমাত্র চেষ্টা না ক'রে যে-মানুষটা এতবড়ো পাপের প্রতিবিধানের জন্যে উঠে-প'ড়ে লেগেচে, তাকে যে এই মুহূর্তে প্রণাম ক'রে আসতে ইচ্ছে হ'চ্চে আমার! এরা জিতবেই শম্ভু! কোনো প্ল্যান্টার, কোনো গবরমেন্টের সাধ্যি নেই এবার এদের জয় ঠেকায়!—হ্যাঁ, গিরীশবাবুর রিপোর্টে অতিরিক্ত তথ্য কী আছে, বলো!

শম্ভুচাঁদ বললে, মার্চ মাসের ন'তারিখে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে মথুর বিশ্বাসের নালিশ দায়ের করবার কথা।

—আজই তো ন'তারিখ?

—হ্যাঁ। কিন্তু গিরীশবাবু যা লিখেচেন তাতে উদ্বেগের কারণ আছে দাদা। মিস্টার হার্শেল একজন কড়াধাতের ম্যাজিস্ট্রেট ব'লই তাঁকে লেপ্টেন্যান্ট গবর্নর হুগলি থেকে কৃষ্ণনগরে বদলি ক'রেচেন, এতে নদীয়ার নীলকরেরা ক্ষেপে আছে। এর ভেতর মিসেস হার্শেলের কাছে কয়েকখানা উড়ো চিঠিও গেচে। নীলকরদের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি ক'রলে ফলাফল যে মারাত্মক, সব চিঠিতেই আছে সেই একই ইঙ্গিত।

হুঁ। তাহ'লে মোল্লাহাটির লারমুর আর ফর্‌লঙ সম্ভবত এই হুমকির নাটের গুরু!

—সে-রকম সন্দেহের কথা-ও লিখেচেন গিরিশবাবু।

—দেখা যাক, মিস্টার হার্শেল কী করেন!—বললে হরিশ,—তুমি জানো কিনা ঠিক জানিনে শম্ভু, মিস্টার ইডেনের মতো মিস্টার হার্শেল-ও অভিজাত ভদ্রঘরের সন্তান। বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ

হিসেবে ও'র পিতামহ এবং পিতা দু'জনেরই নাম বৃটেনে বিশেষ পরিচিত। মিস্টার হার্শেল নিজে ড্যাক্‌টিলোগ্রাফি অর্থাৎ হস্তরেখাচিহ্নশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ। নীলকরেরা যাতে জাল এক্‌রারনামা পেশ ক'রে রায়তদের হয়রানি করতে না পারে তার জন্যে হুগলিতে উনি দলিলে কেবলমাত্র টিপসইয়ের বদলে পুরো হাতের ছাপ নেওয়ার হুকুম দিয়ে বেচারা নীলকরদের বড়ো বেকায়দায় ফেলেছেন। জানো তো, দু'টো আলাদা মানুষের হাতের ছাপ কখনোই একরকম হয় না?

—আজ্ঞে না, এটা আমার জানা ছিল না।

—এটা পরীক্ষিত বৈজ্ঞানিক সত্য, শম্ভু! আমার যতদূর মনে হয়, নদীয়াতেও মিস্টার হার্শেল যাতে এইরকমেরই একটা হুকুমনামা জারি করেন সেই উদ্দেশ্যেই মিস্টার গ্র্যান্ট ও'কে এখানে বদলি করলেন। তা যদি হয় তাহ'লে লারমুরের দল যতই গলাবাজি করুক, জাল এক্‌রারনামা তৈরি করবার গুড়ে বালি পড়বে; অসহায় রায়তদের একটা মস্তবড়ো উপকার হবে।

শম্ভুচাঁদ ব'ললে, কিন্তু বীর আলেকজাণ্ডার কি তা হ'তে দেবেন?

হরিশ হাস্‌লো। বীর আলেকজাণ্ডার মানে একদা নীলকর এবং বর্তমানে বেঙ্গল হরকরার সম্পাদক আলেকজাণ্ডার ফোর্ব্‌স্‌। তিনি আবার প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক-ও বটেন।

হাসতে হাসতেই হরিশ বললে, তা যা ব'লেচো! ওর ঝুলিতে যে কতরকমের বিচিত্র শেকড়-বাকড় আছে তা কেউ জানে না। শুনচি, পিটার গ্র্যান্টের নির্মম আচরণের বিরুদ্ধে ওরা নাকি বিলেতে আবার দরবার করবার তোড়জোড়ে নেমেচে। সত্যিই তো কি অন্যায়! লেপ্টেন্যান্ট গবর্নর পিটার গ্র্যান্ট, সেক্রেটারি সিটন কার, ম্যাজিস্ট্রেট অ্যাশলি ইডেনের মতো কয়েকজন হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর সিবিলিয়ানের জ্বালায় এদেশের সম্ভ্রান্ত, হৃদয়বান ইণ্ডিগোপ্ল্যান্টারদের নাকি ভদ্রভাবে দু'টো ক'রে খাওয়ার উপায় থাকচে না!

—কানাঘুষো শুনলুম, নদীয়া-যশোরে নাকি আরো আর্মি যাবে?

—এটা কানাঘুষো নয় শম্ভু, নিতান্তই সত্যি। গ্র্যান্টসায়েব বিহার সফরে গেচেন তাই ব্যাপারটা এখনো ঠেকে আছে। আরো আর্মি পাঠানোর জন্যে ফার্গুসন-ফোর্ব্‌স্‌ অ্যাণ্ড কোম্পানি তো ব'লতে গেলে প্রায় রোজই সেক্রেটারি সিটনকারের কাছে দরবার কচ্চে। কিন্তু সে-হুকুম দেওয়ার এক্তিয়ার একমাত্র লেপ্টেন্যাণ্ট গবর্নরেরই। তিনি ফিরে আসার পর হয়তো আর্মি যাবে।

অসহিষ্ণুস্বরে শম্ভুচাঁদ ব'ললে, এই অবস্থায় চাষীদের দমিয়ে দেবার জন্যে যদি গ্র্যাণ্টের মতো মানুষ-ও স্পেশাল আর্মি পাঠান, তাহ'লে তাঁর ন্যায়নিষ্ঠার পরিচয়টা কোথায় থাকবে দাদা?

হরিশ হেসে ব'ললে, শম্ভু, ভুলে যেয়ো না, রাজত্বটা বৃটিশের। যদি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস-ও করি যে, গ্র্যান্ট ব্যক্তিগতভাবে যথার্থই সৎ এবং নিরপেক্ষ তাহ'লেও মনে রাখতে হবে যে, তাঁর চাকরির মূল শর্ত কিন্তু বৃটিশ উপনিবেশে বৃটিশ মূলধনের স্বার্থরক্ষা! আমার মনে হচ্চে, এরই ভেতর তাঁকে বেশ কিছুটা আপোস ক'রে চ'লতে হচ্চে বা হবে। তবু ডালহৌসি বা হ্যালিডের বদলে ক্যানিং আর গ্র্যান্ট আমাদের কাছে মন্দের ভালো। দেখা যাক্‌!

কে যেন দরজার কাছে উঁকি দিলে। দ্রুতহাতে গোপন কাগজপত্রগুলো উল্‌টে চাপা দিয়ে শম্ভুচাঁদ জিজ্ঞেস করলে, কে?

অস্পষ্ট আলোয় এক প্রৌঢ় পুরুষের মুখ দেখা গেল। আগন্তুকের মুখে একমুখ কাঁচাপাকা দাড়ি, মাথায় মুসলমানী টুপি, পরণে ঢিলে-ঢালা ময়লা ইজের চাপকান। রোদে পোড়া তামাটে রঙ, লম্বা দোহারা গড়ন।

দু'জনের দিকে কয়েক লহমা তাকিয়ে নিয়ে তারপর হরিশের দিকে তাকিয়ে আগন্তুক বললেন, আপনিই কি হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ। কিন্তু আপনি—

আগন্তুক অনুমতি নিয়ে ঘরের ভেতর এসে দাঁড়ালেন। বিনীত মৃদু হাসি হেসে বললেন,

আজ্ঞে, আমি নিতান্তই একজন সাধারণ মানুষ। এমন একটা প্রয়োজনে এসেচি, যে-প্রয়োজনে কেবল আপনার কাছেই আসা যায়। তবে কিনা, বিষয়টা একটু গোপনীয়।

আগন্তুকের ইঙ্গিতটা বুঝে নিয়ে হরিশ ব'ললে, আপনি যে-ই হোন এবং যে-প্রয়োজনেই আসুন, এঁর উপস্থিতিতে অসংকোচেই ব'লতে পারেন। এঁর নাম শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—আমার হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার সহকারী সম্পাদক।

বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টিতে শম্ভুচাঁদের দিকে তাকিয়ে অগন্তুক ব'ললেন, 'কজেস অব মিউটিনি' বইয়ের লেখক! আমার আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন, শম্ভুবাবু! তাহ'লে আমার বক্তব্য বলতে আর কোনো অসুবিধে নেই, হরিশবাবু!

—কিন্তু আপনার পরিচয়?—প্রশ্ন করলে হরিশ।

—আজ্ঞে, আমার নাম মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। নিবাস দামুরহুদা।

এবার বিস্ময়ের পালা হরিশ এবং শম্ভুচাঁদের। অপলক দৃষ্টিতে তারা দু'জনেই বেশ কয়েক-মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো আগন্তুকের দিকে। এই সেই ব্যক্তি যিনি নদীয়া-যশোরে নীলকরদের বুকে এমন কি, মোল্লাহাটি কুঠির লারমুর, ফরলঙের মতো দুর্ধর্ষ নীলকরের বুকেও কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছেন। নদীয়া জেলার সরকারি সেরেস্তায় যাঁর নামের পাশে লাল কালিতে লেখা আছে, 'দ্য মোস্ট ডেঞ্জারাস এজিটেটর ইন নদীয়া!'

হরিশের ইঙ্গিতে দ্রুতপায়ে গিয়ে দরজার কপাট বন্ধ ক'রে দিয়ে এলো শম্ভুচাঁদ।

সসম্ভ্রমে হরিশ বললে, বসুন মহেশবাবু! আমি খপর পেয়েচিলুম, আপনাকে আত্মগোপন করতে হয়েচে।

সামনের চেয়ারে ব'সে মহেশ বললেন, যথার্থই শুনেচেন। কিন্তু আর বেশিদিন তা সম্ভব হবে না। কারণ, আমাদের ওদিকে বিপদ আরো ঘনিয়ে আসচে, সুতরাং আমাকে যেতেই হবে। আজ দিন পনেরো হ'ল বিহার থেকে কলকাতায় এসেচি। দু'একদিনের ভেতরেই দেশে রওনা হবো। তাই ভাবলুম, যাওয়ার আগে সেই দরদী মানুষটিকে একবার দেখে যাই যিনি হতভাগ্য গরীব চাষীদের এই ঘোর দুর্দিনে তাদের জন্যে এমনভাবে বুক দিয়ে ঝাঁপিয়ে প'ড়েচেন! শুধু দেখা করতেই আসিনি হরিশবাবু, সেই সঙ্গে কিছু অনুপ্রেরণাও নিয়ে যেতে এয়েচি!

হরিশ প্রগাঢ়স্বরে ব'ললে, আপনার অনুপ্রেরণা আপনি নিজেই মহেশবাবু! নইলে সরকার নিশ্চয়ই আপনাকে এই খেতাব দিত না—'দ্য মোস্ট ডেঞ্জারাস এজিটেটর ইন নদীয়া।' আপনারা যে-সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েচেন, তার পরিপূর্ণ সাফল্য কামনা করি! আমি তো সামান্য কলমচি মাত্র!

আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে মহেশ ব'ললেন, বাঙলার চাষী-রায়তের হৃদয়ে আপনার স্থান যে কোথায়, তা আপনি নিজে হয়তো জানেন না, হরিশবাবু! তারা ইংরিজি জানে না, হিন্দু পেট্রিয়ট পড়তে পারে না কিন্তু হরিশ মুখুজ্যে নামটা শুনলেই হিন্দু-মুসলমান-কেরেস্তান নির্বিশেষে সবাই হাত জোড় ক'রে কপালে ঠেকায়। হরিশবাবু, কুঠিয়াল সায়েবেরা এতদিনে বাধা পেতে শুরু ক'রেচে, আরো পাবে! এখন চাষীরা মরীয়া। জানি নে, কত রক্ত ঝ'রবে! কারণ, কুঠিয়ালেরা মরণ কামড় দেবেই!

উদ্দীপ্তস্বরে হরিশ ব'ললে, হ্যাঁ দেবে তা-ও অবধারিত। তবু রায়তেরা জয়ী হবে কারণ তারা সংঘবদ্ধ হ'তে শিখেচে! জয়ী তারা হবেই!

—আপনার দূরদৃষ্টি সার্থক হোক, হরিশবাবু! রায়তেরা তাদের এই লড়াইতে আপনার অকুণ্ঠ সাহায্য পেয়েচে, তাই তাদের প্রত্যাশাও বেড়ে গেচে। তারা এখন বিশ্বাস করে যে, কলকেতায় তাদের হ'য়ে আর কেউ কথা না বলুক, হরিশ মুখুজ্যের কলম তাদের কথা বলবে! আপনি শুধু কাগজে লেখা নয়, তাদের নানা আইনবিষয়ে পরামর্শ দিয়ে, মোক্তার দিয়ে সাহায্য করচেন তা তো আমি জানি! এ-ও জানি, আপনার বাড়িতে যে চাষীরা দূর দূর থেকে আসছে তাদের জন্যে অন্নছত্তর খুলেচেন, নগদ টাকা-পয়সা দিয়েও সাহায্য কচ্চেন। এর শেষ যে কোথায়!

হরিশ মৃদু হেসে ব'ললে, কেবল আমার টাকা কেন, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের ইণ্ডিগো ফাণ্ড থেকেও কিছু কিছু টাকা দিচ্চি, মহেশবাবু।

মহেশের মুখে একটু অর্থপূর্ণ বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠলো।

শম্ভুচাঁদ আর চুপ ক'রে থাকতে পারলে না। রীতিমতো উষ্মার সংগে ব'ললে, ও-কথা ব'লে কেন মহেশবাবুকে ভুল বোঝাচ্চেন দাদা? ইণ্ডিগো ফাণ্ড কি যথার্থই ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের?

হরিশ সে-কথার কোনো উত্তর দেবার আগেই শম্ভুচাঁদের দিকে তাকিয়ে মহেশ একটু স্মিত হাসি হেসে ব'ললেন, আপনার বিচলিত হওয়ার কোনো কারণ নেই শম্ভুচন্দ্রবাবু! আমি গাঁয়ের লোক হ'লেও ব্যাপারটা মোটামুটি জানতে পেরেচি। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে চাষীদের সাহায্য করবার প্রস্তাবকে নাকচ করবারই প্রাণপণ চেষ্টা করা হয়েচিলো সে-কথা আমি জানি। নেহাৎ উত্তরপাড়ার জমিদারবাবু জয়কেষ্ট মুখুজ্যেমশাই জেদ ধ'রে অ্যাসোসিয়েশনকে ওই ফাণ্ড খুলতে বাধ্য ক'রেচেন এবং তার দায়িত্ব হরিশবাবুর ওপর ন্যস্ত করতে বাধ্য করেচেন, সব খপরই আমার কানে পেঁছেচে। এবং সে-ফাণ্ডে জয়কেষ্টবাবু ছাড়া আর কোনো জমিদারবাবু কাণাকড়িও দেননি, যা দেবার বাইরের অন্য লোকেরাই দিয়েচেন, আমার শোনা এই খপর কি সঠিক?

—হ্যাঁ, সঠিক।—তৃপ্তস্বরে উত্তর দিলে শম্ভুচাঁদ।—জয়কেষ্টবাবু চেপে না ধরলে এই ফাণ্ড-ও হ'ত না! নেহাৎ চক্ষুলজ্জার খাতিরে দু'একজন সদস্য সামান্য দু'পাঁচ টাকা অবিশ্যি দিয়েচেন। যাই হোক, আপনি জেনে রাখুন মহেশবাবু, গত কয়েকমাস ধ'রে মাসের শেষে দাদার চাকরির মাইনে আর পেট্রিয়টের আয়ের একটা পাইপয়সাও ও'র হাতে থাকে না!

মহেশ বললেন, আমারও তাই বিশ্বাস। হরিশবাবু, আমি আর দেরি করবো না। যাওয়ার আগে এইটুকুই কেবল জানিয়ে যাই, হয়তো নিরুপায় অবস্থায় কোনো কোনো রায়তকে আইনগত পরামর্শের জন্যে আপনার কাছে পাঠাতে পারি। আমি জানি, তারা লাভবান হবে, বিপদে উদ্ধার পাবে!

হরিশ মৃদু হেসে ব'ললে, অবশ্যই পাঠাবেন। তবে আইনজ্ঞান তো আপনারও বিলক্ষণ আছে! নড়ালের জমিদার রতনবাবুর নায়েব হিসেবে আপনি কয়েকবছর কাজ ক'রেচেন আমি জানি।

মহেশ একটু সলজ্জ হেসে ব'ললেন, যৎসামান্য কিছু হয়তো আছে। ওই কুঠেলদের টিট্ করতে করতেই তো রামরতন রায়ের সারা জীবন কেটে গেল! তাঁর কাছে কিছু অভিজ্ঞতা হ'য়েচিল। তিনি আর ইহজগতে নেই! এখন দেখচি, পাহাড়ের সংগে আজীবন বিরোধই বোধ হয় আমার বিধিলিপি!

—পাহাড়ের সংগে!—সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলে হরিশ।—তার মানে?

—আজ্ঞে, হিল্স্। একুশবছর আগে এক হিলের সংগে আমার ঝগড়া আরম্ভ হয়। সেই জেম্স্ হিল্সের কুঠিতেই তখন আমি চাকরি করতাম। বিশবছর বাদে গতবছরে আর এক হিলের সংগে বিরোধ আরম্ভ হ'য়েচে। কাচিকাটা কুঠির আর্চিবল্ড হিল্সের নাম আপনি হয়তো শুনে থাকবেন?

হরিশ হেসে ব'ললে, কথায় বলে হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া। আমিও হাড়ে হাড়ে শুনেচি। উৎসাহিত স্বরে মহেশ ব'ললেন, গতমাসে যে কাজ সে ক'রেচে, তা শুনবেন?

—রিপোর্ট আমি পেয়ে গেচি।

—ছাপবেন তো?

—নিশ্চয়ই! লেঠেলদের নামও পেয়েচি, তাও বাদ দেবো না।

—এরকম অনাচার জীবনে সে অনেকই ক'রেচে হরিশবাবু। এই হিল্সের সংগে এবার ঝামেলার পরেই অনেক কিছু ভেবে-চিন্তে সাময়িকভাবে আমাকে গা-ঢাকা দিতে হ'য়েচে। কিন্তু ফিরতে

আমাকে হবেই! যদি সম্ভব হয় ক'লকাতা ছাড়বার আগে আর একবার আপনার সঙ্গে দেখা ক'রে যাবো, নয়তো এই শেষ!

—শেষ কেন হবে মহেশবাবু? আমি কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা ক'রবো, নীল-সংগ্রামের সাফল্যের পরে আপনার সঙ্গে আবার যেন দেখা হয়!

—জানি না হবে কিনা! আপনিই তো ব'ললেন, নদীয়ার সরকারি সেরেস্তায় মহেশ চাটুজ্যের নামের পাশে লেখা আছে, 'দি মোস্ট ডেঞ্জারাস এজিটেটর ইন নদীয়া'। আমাকে পেলে ওরা ছাড়বে না! চলি হরিশবাবু—

উঠেই দ্রুতপায়ে মহেশ বেরিয়ে গেলেন। বাইরের অন্ধকারে তাঁর দেহটা মিলিয়ে গেল।

॥ একুশ ॥

কামিনী তীব্র তির্যক দৃষ্টিতে তাকালো গোকুল মিত্তিরের দিকে। এতদিনে লোকটাকে বাগে পেয়ে সে যেন বাঘিনীর মতো হিংস্র হ'য়ে উঠেছে! গোকুল মিত্তিরের গলার নলীটা এখন তার থাবার তলায়! যে কোনো মুহূর্তে নলীটাকে ছিঁড়ে সে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটিয়ে দিতে পারে!

করুণ স্বরে গোকুল ব'ললে, মাইরি কচ্ছি, আমি মালুমই পাই নাই, ও-শালা কোনো মতলব নে' আয়েচে। তা যদি মালুম পাতাম তা'লি ওরে কি আমি ঘরের চৌকাট ডিঙোতি দেতাম?

কামিনী চিবিয়ে চিবিয়ে ব'ললে, নালমোন সায়েব কি সে-কতা বিশ্বেস করবে পেশকারবাবু?

—সেইজন্যিই তো রাত্তিরি আর ঘুমোতি পাচ্চি নাঁ রে কামিনী!—প্রায় কাঁদো কাঁদো স্বরে গোকুল ব'ললে, আমার 'অবস্তাডা অ্যাকবার ভেবি দ্যাক্? পরিবারের সুবাদে কুটুম এসি যদি দু'ডো দিন থাকতি চায় তো আমি কি মানা কত্তি পারি? ও-হারামির পেটে পেটে যে এত ফন্দি তা আমি কেমন ক'রে বোঝ্‌বো, ক'? সাদা মনে আমি থাকতি দেলাম আর—

—সাদা মনে থাকতি দিচিলে?—কামিনীর পানের রসে রাঙা ঠোঁটে মুচকি হাসির ঝিলিক।—তোমার মন বড়ো সাদা, তাই না বাবু? কোন্ বাবদে জোয়ান বয়েসের কুটুম ছাওয়ালডারে অ্যাতো যতন ক'রে এনি রেকেচিলে তা আর কেউ না জানুক, এই কামিনী মাগী জানে! ওরে দে' বুনডার পেট বাধায়ে আপদ বুনডারে পার কত্তি চেয়েলে না?

বিবর্ণমুখে কাঁপাস্বরে গোকুল ব'ললে, কী কচ্ছিস তুই?

—মুই অনেতেরা সবই জানি, বাবু! অমন সুন্দর দেকতি বুনডারে মাঝে মাঝে দুইচার রাত্তির ছোটো সায়েবের কোলে শুতি পাঠায়ে আমিন থে' কুটির পেশ্‌কার হ'য়েচো, মাইনে ঝা বাড়ানোর বাড়ায়ে নেচো। ছোটো সায়েব অ্যাকন আর অ্যাকটা মাগীরে নেচে, তোমার বুনির আর কদর নাই। অ্যাকন তাই মেয়েডারে বিদেয় করার জন্যি ফান্দ পাত্তি গেলে, বুনির ঘরের পাশের ঘরে সোমত্ত জোয়ান কুটুম মিন্‌সেরে শুতি দিলে, তার সেবা-যতনের ভার বুনির পর দিলে তাও সেই কুড়ো তোমার ফান্দে ধরা দেলে না হায় হায় রে!

মোল্লাহাটি কুঠির একদা আমিন বর্তমানে জবরদস্ত পেশকার গোকুল মিত্তির অসহায়ভাবে তাকিয়ে রইলো কুঠির সামান্য একজন কামিনের দিকে। কামিনী অবশ্য বাইরে সামান্য হ'লেও ভেতরে অসামান্য, সে-কথা তো বেশ ভালোভাবেই জানে গোকুল। লার্‌মুর্ সাহেবের মতো দুর্ধর্ষ মনিবকেও মেয়েটা জাদু ক'রে রেখেছে! কামিনী গোকুল মিত্তিরের ঘরের কথা যেটুকু জেনেছে তার একটা অংশ-ও যদি সাহেবের কানে তোলে তাহ'লে চাকরিতো যাবেই, প্রাণটাও থাকবে না। পিস্তলের একটা মাত্র গুলি! গোকুল মিত্তিরের নিষ্প্রাণ দেহটা ডুবে যাবে ইছামতীর জলে।

ক'দিন ধ'রেই গোকুল মিত্তিরের বুকের ভেতরটায় কে যেন হাতুড়ি পেটাচ্ছে।

ফন্দি-ফিকির ক'রে দূর সম্পর্কের এক শ্যালক অভয়পদকে গোপালনগর থেকে এখানে আনিয়েছিল গোকুল। বছর পঁচিশেক বয়স। একটা বিয়ে ক'রেছিল, বছরখানেক আগে সে বৌ

মারা গেছে। বোন বিন্দুবালার ওপর যেদিন ফর্লঙ সাহেবের নজর প'ড়লো সেইদিন থেকেই বিন্দুকে বড়ো তোয়াজে রেখেছিল গোকুল। সাহেবের নেকনজর-ও ফুরোলো, বিন্দুর খাতির-তোয়াজও ক'মে গেল। তবু কৃতজ্ঞতা ভোলে নি গোকুল। পেশকার গিরিতে উন্নতি তো ওই বোনেরই দৌলতে! সে-অবস্থা থাকলেও দিন চ'লে যেতো। কিন্তু বিপত্তি ঘটলো অন্যদিক থেকে। অন্যতম গোমস্তা পাঁচু মল্লিক যখন স্থির নিশ্চিত হ'ল যে ছোটো সাহেবের ফুর্তির কামরায় আর বিন্দুর ডাক প'ড়বে না তখন সে-ও গোকুলের কাছে তার পাওনা-গণ্ডা দাবি ক'রে ব'সলো। এক সময় অভাবের তাড়নায় পরিবারবর্গ নিয়ে না খেতে পেয়ে প্রায় ম'রতে ব'সেছিল গোকুল। সেই সময় পাঁচু মল্লিক-ই তাকে এই কুঠিতে চাকরির ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিল। সুতরাং, এইবার তার বিন্দুকে চাই! সে-দাবি পূরণ না ক'রে গোকুলের উপায় ছিল না। পাঁচু মল্লিকের কাছে বোনকে পাঠাতে হ'য়েছে। কিছুদিন পরেই অন্তঃসত্ত্বা হ'ল বিন্দু। এইতো মাস ছয়েক আগে এক গভীর রাতে সে খালাশ হ'য়েছে। মুহূর্তমাত্র দেরি না ক'রে জ্যান্ত সদ্যোজাতশিশুকে কাপড়ে জড়িয়ে ইছামতীর জলে ফেলে দিয়ে এসেছিল গোকুল। নিজের ছেলেটাকে কিছুতেই ছাড়বে না বিন্দু। জোর ক'রেই তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গোকুলের বৌ তুলে দিলে স্বামীর হাতে। তারপর থেকেই দাদা আর বৌঠানের ওপর হিংস্র হ'য়ে উঠলো বিন্দু। কখনো শাসায়, কখনো আপনমনে হাউ হাউ ক'রে কাঁদে। কখনো বা কাঁদতে কাঁদতে চিৎকার ক'রে জানায়, তাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে সাহেবের কাছে পাঠিয়ে অসতী ক'রে দিয়ে তার দাদা নিজের আখের গুছিয়ে নিয়েছে! সবাইকে সে সব কথা ব'লে দেবে—সব কথা!

বিন্দুর সে-হুমকিতে অবশ্য ঘাব্ড়ায়নি গোকুল। কুঠির চাকরি যারা করে তাদের প্রত্যেকেরই পিঠে একটা না একটা কুঁজ থাকে। কারো কুঁজ ছোটো, কারো কুঁজ বড়ো—এইযা তফাৎ। কিন্তু বিন্দু দিনকে দিন যেরকম বেয়াড়া হ'য়ে উঠছে তাতে তাকে ঘর থেকে দূর না করা পর্যন্ত গোকুলের শান্তি নেই। সেইজন্যেই অভয়পদকে আনিয়ে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা ক'রেছিল গোকুল। অভয়পদ উপোসী ছারপোকা। আর, বিন্দু যতই চেঁচামেচি করুক, যৌবনরসের স্বাদ তো পেয়েছে। একটা জোয়ান ছোকরা হাতের নাগালে পেলে ছেলের শোক-ও ভুলে যাবে। আগুন আর ঘি কাছাকাছি রাখলে ঘি গ'লতে কতক্ষণ? কয়েকটা দিন কাছাকাছি রাখলেই বৌ-মরা ছেলেটাও ফাঁদে পা দেবে আর গোকুলও তাকে চেপে ধ'রবে, এইবার বাছাধন, বে' ক'রে আমার বোনটাকে না নে' যেতি পারবা না!

কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, অভয়পদ ফাঁদে পা দিলে না। এতগুলো রাত হারামজাদা ছোঁড়াটা অন্ধকারে খোলা দরজা পেয়েও পাশের ঘরে গিয়ে আগুনে ঝাঁপ দিলে না। নিজের ঘরে নিজের বিছানায় শুয়েই অসাড়ের মতো ঘুমিয়ে রাত কাটালো।

—কী অত চিন্তে কত্তি নেগিচো পেশ্‌কারবাবু?

কামিনীর গলার সাড়ায় সম্বিৎ ফিরে পেলো গোকুল। কামিনীর চোখের দৃষ্টি এবার আরো শাণিত। সে চাপাস্বরে ব'ললে, সায়েব ঝেদি শোনে, তুমি দিগম্বর বিশ্বেসের অ্যাকটা গোইন্দারে অ্যাদ্দিন ধ'রে ঘরে পুষিচো তা'লি কীত্তিডা কী হবেনে বুঝ্তি পাচ্চ?

কামিনীর চোখের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠলো গোকুল। তার মরণ-বাঁচন এখন এই মেয়েটার ওপর নির্ভর ক'রছে!

হঠাৎ মাটিতে ব'সে প'ড়ে কামিনীর পা জড়িয়ে ধরলো গোকুল।—মা কালীর কিরে মাইরি! ও শালা যে আম্মাগো শত্তুরির গোইন্দা, তা আমি জানতাম না রে কামিনী!

—ছোটোনোকের মেয়ের পা জড়ায়ে ধ'ল্লে বাবু?—চাপা খিল খিল হাসির তরঙ্গে ভেঙে প'ড়লো কামিনী।—মিত্তির কায়েত ঘরের ছাওয়াল তুমি—কত দেমাক! আহা হা, কি আরাম নাগতিচে বাবু! এট্টু পা টিপে দেবা?

—দেবো। তুই যা ক'স, তাই করবো। খালি আমারে তুই বাঁচা—চাকরি গেলি খেতি না পেয়ে ম'রে যাবো!

দমকে দমকে হাসির লহর তুলে কামিনী ব'ললে, অমন কতা ক'য়ো না বাবু, নোকে শুনলি হেসি গড়াগড়ি খাবে। কুটির চাকরিতি এই কয় বচ্ছরেই ঝা টাকা ক'রে নেচো তা তোমার তিনপুরুষিও ফুরোবে না। শোনো, আমার অ্যাকটা কাজ ঝেদি ক'রে দিতি পারো তয় তোমারে বাঁচাতি পারি!

—তুই যা হুকুম করবি তাই ক'রে দেবো।

—পা ছাড়ো। শোনো, ভবি মাগী ঝাতে আর কোনোদিন এই কুটির হাতায় সে'দোতি না পারে তার বন্দোবস্তো ক'রে দিতি হবে। পারবা?

—পারবো। কাজডা শক্ত। তা হোক, আমারে কয়ডা মাস সময় দে।

—কয়ডা মাস! কী কচ্ছ তুমি? এরপর হয়তো কবা, আমারে কয়ডা বচ্ছর সময় দে কামিনী! না, না, বেশি দেরি করা যাবে না। চান্দিদিকির ভাব-গতিক টের পাচ্ছ না? রেয়েগুলোরে পিটোতি নেটেলার দল তো মাঝে-সাঝেই এদিক-ওদিক যায়, তাই না?

—হ, তা যায়।

—ভবি মাগী রাত-বিরেতে নায়েবমশায়ের কাচে আসে। কোনদিন আসতিচে তার অন্তেরা রেকি অ্যাক আন্ধার রাত্তিরে মাগীর মাতায় নাঠি মেরি ওর দফা নিকেশ ক'রে দিতি হবে।

—ওই ভবিই না তোরে এখেনে এনেলো?

—হ। অ্যাকন আবার আমার কপাল পোড়াতি আঁদা-জল খেয়ি নেগিচে। সে-সব বেত্তান্তে তোমার দরকার নাই। তোমারে ঝা কচ্ছি তাই ক'রে দিতি হবে। না পারো তো—

মুচকি হেসে তির্যক দৃষ্টিতে তাকালো কামিনী। কথাটা সে সম্পূর্ণ না ক'রলেও বাকিটুকু গোকুল মিত্তির ঠিকই বুঝে নিয়েছে। না পারলে পরিণাম ভয়ঙ্কর।

কুঠির প্রান্তসীমায় বাওড়ের ধারে একটা পিটুলি গাছের তলায় দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল। সন্ধ্যের পর কেউ এদিকে বড়ো একটা আসে না। সেইজন্যেই এ-জায়গাটা বেছে নিয়েছে কামিনী। এত বড়ো সুযোগটা যখন হাতে এসেছে তখন সেটাকে কাজে লাগাতেই হবে! এখন তার এক নম্বর শত্রু ভবি জেলেনী, দু'নম্বর তার নিজেরই ভাই কেনারাম। মোক্ষম বেকায়দায় প'ড়েছে গোকুল মিত্তির। তার মনে বড়ো সাহেবের ভয়টা জীইয়ে রেখে তাকে দিয়েই সে আগে একনম্বরকে খতম ক'রে তারপর হাত দেবে দু'নম্বরে।

কামিনীকে যথাসম্ভব খুশি করবার চেষ্টায় গোকুল মিত্তির ফ্যাসফে'সে গলায় ব'ললে, তোর কোনো চিন্তে নাই কামিনী! ভবি মাগীরে এই মাসের মদ্দিই আমি ভবপারে যাওয়ার পথ দ্যাখায়ে দেবো। তুই হলি বড়োসায়েবের পেয়ারের মেয়ে। তুই-ই তো অ্যাকন আমার দুই নম্বর মুনিবানী রে! তোর তুষ্টুতে সায়েব তুষ্টু! তোর হুকুম তামিল না ক'রে কি পারি? কিন্তু মা কালীর নামে কথা দে, অভয়পদর কথা কিছু ফাঁস ক'রবি নে?

—মুই কি তোমাদের ভদ্দরঘরের মাগ ঝে বেইমানি করবো? সোদা কতা, তুমি আমার কাজ হাসিল ক'রে দেবা, মুইও তোমার বেপদ কাটায়ে দেবো। কতার খেলাপি কল্লি কিন্তু তোমার সব্বোনাশ হ'য়ে যাবে তা ক'য়ে রাখলাম!

—না, কথার খেলাপি হবে না। ঘরে যাই?

—যাও। মনে থাকে ঝ্যান অ্যাক মাসের মদ্দিই কাজ সারতি হবে!

মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে ডাকসাইটে পেশকার গোকুল মিত্তির তাড়া-খাওয়া নেড়ি কুকুরের মতো প্রায় ছুটে রওনা হ'য়ে গেল। কামিনী চুপ ক'রে তাকিয়ে রইলো।

এক টুকরো হিংস্র কুটিল হাসি ফুটে উঠলো কামিনীর মুখে। ক'দিন আগে এসেছিল ভবি

জেলেনী। সব খবর-ই সে রাখে। কামিনীর ছোটোভাই পরাণকে ওজনদার থেকে একেবারে আমিন ক'রে দিয়েছে বড়োসাহেব। সুতরাং ভবির-ও দস্তুরি প্রাপ্য। সেই দস্তুরির টাকা নিতেই সেদিন এসেছিল ভবি। প্রথমেই কামিনীর পরনে জেল্লাদার শাড়িখানা দেখে তার চোখ টাটিয়ে গেল। তারপর পরাণের চাকরিতে উন্নতি বাবদ সে যখন একেবারে এককথায় দশটাকা দাবি ক'রে ব'সলো তখনই মেজাজ হারিয়ে ফেলেছিল কামিনী। কবে মাগী একটু উপকার ক'রেছিল, তার দায় এইভাবে সারাজীবন ধ'রে বইতে হবে? এর আগে ভবিকে কোনোদিন খালি হাতে ফেরায়নি কামিনী। সে যখনই এসে হাত পেতেছে তখনই দু'টাকা হোক, তিনটাকা হোক দিয়েছে সে। কখনো কখনো মাসে দু'তিনবার। তা-ও ভবির খাঁইয়ের শেষ নেই! এ কি নীলের দাদন যে একবার হাতে দু'টো টাকা গুঁজে দিয়ে সারাজীবন ধ'রে তার জের টেনে যেতে হবে? কামিনী তার নিজের বাবদ এ-যাবৎ কত টাকাই তো দিয়েছে কিন্তু ভাইয়ের জন্যে টাকা দেবে কেন? পরাণের জন্যে যা করবার সে নিজেই ক'রেছে। কোন্ সুবাদে ভবি দস্তুরি চায়?

ভবি কট্‌মট্‌ ক'রে তাকিয়ে বললে, আমার হকের পাওনা তুই দিবিনে?

—আমার ভেয়ের ব্যাপারে তোমার হকের পাওনার কতা আসে কিসি?

—আসে লো, আসে। তোর কপাল এমন চড়চড় ক'রে খুলে না গেলি তোর ভেয়ের কপাল কি ফের্‌তো? কার জন্যি তোর কপাল ফিরিচে?

—তার দস্তুরি তো অ্যাদ্দিন ধ'রে দিয়েই যাচ্চি।

—আর এর দস্তুরি তুই দিবি নে? ওলো, ভেবিচিস গাচে উটে মইডা অ্যাকন নাথি মেরি ফেলে দিলিই আপদ চোকে? কোন্ নরকের থে' তোরে এই স্বগ্গে নে' এয়েলাম, সে-কতা আর মনে নাই? সেসব বেত্তান্ত খোল্‌সা ক'রে দিলি লালমোন সায়েব তো অ্যাকনই তোর পাচায় নাতি মেরি ধর্‌ ক'রে দেবেনে। তউ কচ্চি, তা মুই করবো না। কিন্তুক তোর চেয়িও অনেক সরেস অ্যাকটা তাজা ছুঁড়ি এনি সায়েবের থাবায় ফেলে দে' তিনমাসের মদ্দি তোর কপাল ঝেদি না পোড়াই তো আমার নামে কুকুর পুষিস্, বুঝলি?

কেঁপে উঠেছিল কামিনীর বুক। ভবি সেই যে হন্ হন্ ক'রে চ'লে গেল, তাকে ডেকে আর খুশি করবার অবকাশ-ও পেলো না কামিনী। সেদিন থেকে তার চোখের ঘুম চ'লে গেছে। এমনিতে নীলের হাঙ্গামায় সাহেবের মেজাজ সব সময়ই টং হ'য়ে অছে। তার ভেতর একটু এদিক-ওদিক হ'য়ে গেলেই কপাল যে পুড়বে তাতে সন্দেহ নেই। কামিনী কেমন ক'রে ভবির সঙ্গে রফা ক'রবে ভেবে পাচ্ছিল না। সেই সময়েই কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার এমন সুযোগটা হাতে এসে গেল।

কুঠির কাজে নিশ্চিন্তিপুর গিয়েছিল পরাণ। সেখানে গোকুল মিত্তিরের দূর সম্পর্কের শালা ওই অভয়পদকে সে অন্য চেহারায় দেখে এসেছে। কিছুদিন আগে সেখানে কুঠির ওপর হামলা ক'রে যারা জোর হাঙ্গামা বাধিয়েছিল, লোকটা নাকি তাদেরই একজন। দিগম্বর বিশ্বাসের সঙ্গে গোপনে গোপনে লোকটার খুবই মাখামাখি। কুটুম হিসেবে বোনাইয়ের বাড়িতে এসে কিছুদিন থাকার নেমন্তন্ন সে লুফে নিয়েছিল। আসলে মোল্লাহাটি কুঠির ভেতরকার সব খবরাখবর নেওয়ার জন্যেই এসেছিল সে। সাধুহাটির জমিদার আচার্যিবাবুরা, চৌগাছার বিশ্বাসেরা আর মহেশ চাটুজ্যের দল মিলে হঠাৎ একদিন মোল্লাহাটি কুঠির ওপর হামলা ক'রতে পারে, এমন একটা কথা শোনা যাচ্ছে। তা যদি সত্যি হয় তাহ'লে গোকুল মিত্তিরের শালা যে গোয়েন্দাগিরি ক'রতেই এসেছিল তাতে আর কোনো সন্দেহ থাকে?

এতক্ষণ গুমোটের পর একঝলক ফুর্‌ফুরে হাওয়া ব'য়ে এলো। কুঠির চিড়িয়াখানার ওদিক থেকে ভেসে আসছে দু'চারটে পাখির ডাক।

গোকুল মিত্তিরের ওপর যতই তর্জন গর্জন করুক, কামিনীর বুকের ভেতরটা তবু শিউরে ওঠে। এই সুখ তার কপালে আর কতদিন সয় কে জানে! সাহেব আজকাল সব সময়ই এত ব্যস্ত যে

আগের মতো ঘন ঘন কামিনীর ডাক পড়ে না। তবু ভরসা, কী একটা নতুন আইন নাকি জারি হ'য়েছে। এই আইনে অনামুখো রায়ত মিন্সেগুলো যদি জব্দ হয়! কাঠগড়া কুঠিতো বন্ধ-ই হ'য়ে গেছে। ওদিকে, পিঁপড়েগাছি, বেনাপোল, হাজরাপুর, গাইঘাটা, লোহাজঙ্গ—সব কুঠির অবস্থা খারাপ। সাহেব এখন মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল। এই অবস্থার ভেতর ভবি মাগী যদি কামিনীর কপাল পোড়াতে আসে তো সহজেই সে তা পারবে।

দুনিয়ায় কত অবাক কাণ্ডই না ঘটে! গোকুল মিত্তিরের মতো বদমায়েশও কামিনীর পায়ে ধরে! আর, সহোদর ভাই কেনারাম? যে ভাইদু'টোকে খাইয়ে-পরিয়ে বাঁচানোর তাগিদে বাপের বয়সী রাজীব মুখুজ্যের কাছে সতীত্ব বিকিয়ে দিতে বাধ্য হ'য়েছিল কামিনী, সেই সোদর ভাই কেনারাম মুখের ওপরেই কতবার ব'লেছে, তুইতো বাজারের খান্‌কি মাগীর চে'ও অদম!

অনেক কথাই ব'লেছে কেনারাম। মাঝে মাঝে কামিনীও ফুঁসে ওঠে।—এই খান্‌কি দিদির জনাই দু'ডো ক'রে খেতি পাচ্চিস কেনা! তা না'লি শ্যাল-কুকুরিও তোর মড়ি ছুঁতি আসতো না!

কেনারামের ধারণা, ছোটোভাই পরাণের জন্যেই দিদির যা কিছু মায়া-মমতা। দুই ভাই-ই দিদির সুপারিশে কুঠির চাকরি পেয়েছে কিন্তু দেখতে দেখতে পরাণের কত উন্নতি হ'য়ে গেল আর কেনারাম যে কুলি ছিল তাই-ই র'য়ে গেল।

কেনারামকে আজকাল মনে মনে বড়ো ভয় পায় কামিনী। কুঠির গুদামঘরে আটক-করা রায়তদের ওপর অত্যাচার চালাতে সে পাকা হ'য়ে উঠেছে। সাহেবের হুকুম পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেভাবে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে, পরাণের মুখে তার বিবরণ শুনেই শিউরে উঠেছে কামিনী। মিন্সেগুলোর ওপর চালায় গাঁটওয়ালা লাঠি। বস্তায় পুরে তার মুখ বেঁধে লাথি মারতে মারতে গড়াগড়ি খাওয়ায় আর হা হা ক'রে হাসে। যে-সব বৌঝিদের ধ'রে এনে কয়েদ করা হয় তাদের হাত বেঁধে পরনের কাপড় খুলে লাথি মারে আর বিকটভাবে হাহা ক'রে হাসে। অবশ্য, একা সে নয়। আরো কয়েকজন এ-কাজে হাত পাকিয়েছে। মশাল জ্বালিয়ে নিয়ে তারা ছ্যাঁকা দেয় সেইসব বৌঝিদের বুকে, পিঠে, পেটে, তলপেটে। যন্ত্রণায় তারা আর্তনাদ ক'রতে থাকে। তাদের আর্তনাদকে ছাপিয়ে আরো জোরে বিকট চিৎকার ক'রে ওঠে কেনারাম, ক'শালীরা, তোদের ভাই-ভাতারগুলো নীল করবে কিনা! যৈবন রাকতি সাদ থাকে তো ভাই-ভাতারদের কবুল করা! করাবি?

অথচ, এই কেনারার ছোটোবেলায় কত নরম-ই না ছিল! একবার বাসা থেকে প'ড়ে-যাওয়া একটা গোশালিকের ছানাকে বাঁচানোর জন্যে কত চেষ্টা তার! ছানাটা ম'রে যাওয়ায় দু'দিন ধ'রে তার সে কি কান্না!

এখন সেই কেনারাম ক'রতে পারে না এমন নিষ্ঠুর কাজ নেই। মদের ঝোঁকে হয়তো কোনোদিন দিদির গলাও টিপে ধ'রতে পারে। হয়তো হিংসায় পরাণকেও মেরে ফেলতে পারে সে। নাঃ, বিহিত না ক'রে উপায় নেই!

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কুঠির দিকে এগোতে লাগলো কামিনী।

॥ দশ ॥

অ্যাক্ট ইলেভেন অফ এইটিন সিক্সটি—আঠারো শো ষাট সালের এগারো আইন!

বেলভেডিয়ার প্রাসাদে ব'সে লেপ্টেন্যান্ট গবর্নর পিটার গ্র্যান্ট যেদিন নতুন আইনের সংশোধিত বয়ানে সই ক'রলেন তার তিন সপ্তাহ আগে থেকে প্রকাশ্যে এবং নেপথ্যে অনেক ঘটনাই ঘ'টে গেছে।

আড়াই মাস বিহার সফরের পর তখন সবে কলকাতায় ফিরেছেন গ্র্যান্ট। টেবিলের ওপর কাগজের স্তূপ—নদীয়া—যশোর—পাবনা—ঢাকা—ফরিদপুর। নীলকর আর নীলচাষী—জবরদস্তি আর প্রতিরোধ। বিক্ষোভে উত্তাল সারা দক্ষিণ বাঙলা—আতঙ্কে বিহ্বল নীলকরের দল।

ক'দিনের ভেতরেই মিলিটারি পুলিশের তিনটে ব্যাটেলিয়ন পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল দক্ষিণ বাঙলায়। তার ক'দিন পরেই লেপ্টেন্যান্ট গবর্নরের সঙ্গে দেখা ক'রতে এলো নীলকরদের এক প্রতিনিধিদল।

একটা বিহিত চাই! সরকারের পক্ষ থেকে চাই একটা নিশ্চিত নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি! অ্যাশলি ইডেনের সেই রোবকারি পরোয়ানা জারির পর থেকে নেটিব রায়তদের মনে বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে যে সরকার নীলচাষের বিপক্ষে। হিজ এক্সেলেন্সি স্যার গ্র্যান্ট অবিলম্বে ঘোষণা করুন, সরকার কোনোমতেই নীলচাষের বিপক্ষে নয়। কেবল ঘোষণাই নয়; রায়তেরা একরারনামা দিয়ে চুক্তি পালনে যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ—সে-চুক্তি পালনের জন্যে তাদের বাধ্য করুক সরকার।

প্রতিনিধিদলের তিনজনের বক্তব্যই ধৈর্য ধ'রে শুনলেন গ্র্যান্ট। ঢাকা এবং ফরিদপুর অঞ্চলের সবচেয়ে বড়ো নীলকর মিস্টার ওয়াইজ, বেঙ্গল ইণ্ডিগো কোম্পানির সেক্রেটারি মিস্টার গুডেনো এবং বেঙ্গল হরকরার সম্পাদক মিস্টার ফোর্ব্স্—প্রত্যেকেই তাঁদের অভিযোগ প্রমাণের জন্যে বেশ কিছু কাগজপত্র সঙ্গে এনেছেন।

—ইয়োর এক্সেলেন্সি! খুবই দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, রাজকর্মচারীদের ভেতর এমন বেশ কয়েকজন রয়েছেন যাঁরা নিঃসন্দেহে পক্ষপাতদুষ্ট!—ক্ষোভের সঙ্গে ব'ললেন মিস্টার গুডেনো।—তাঁরা জানেন যে রায়তেরা চুক্তিভঙ্গ ক'রছে, তা সত্ত্বেও তাঁরা সেই রায়তদেরই প্রশ্রয় দিয়ে চ'লেছেন।

পিটার গ্র্যান্ট গম্ভীরস্বরে ব'ললেন, পক্ষপাতিত্ব ব্যাপারটা আমারও খুব অপছন্দ মিস্টার গুডেনো। কিন্তু যে-সব রাজকর্মচারী রায়তদের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র আপনাদের প্রতিই পক্ষপাতিত্ব ক'রছেন তাঁদের সম্বন্ধে আশা করি আপনাদের কোনো বক্তব্য নেই?

তিনজনই নিরুত্তর। কয়েকমুহূর্তের ভেতরেই বিব্রত অবস্থাটা সাম্‌লে নিয়ে ফোর্ব্স্ ব'ললেন, নিশ্চয়ই! যেকোনো রকম পক্ষপাতিত্বই আপত্তিজনক। তবে আমার বিশ্বাস, মিস্টার ইডেন, হার্শেল বেলি—এইরকম কয়েকজন একচোখা সিবিলিয়ানকে বাদ দিলে অন্যান্য বৃটিশ সিবিলিয়ানরা যথার্থই সৎ এবং নিরপেক্ষ।

পিটার গ্র্যান্টের গম্ভীরমুখে এক চিল্‌তে হাসির রেখা ফুটে উঠলো। সেটা যে অবিশ্বাস এবং কৌতুকবোধের হাসি তা বুঝতে তিনজনের কারো বাকি রইলো না। কিন্তু সে-হাসি যেন কিছুই নয় এমন ভাব দেখিয়ে ফোর্ব্স্ ব'ললেন, ইয়োর এক্সেলেন্সি! হাজার হাজার, লাখ লাখ নীলচাষী এখন চুক্তির খেলাপ ক'রছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, মালিকের সঙ্গে শ্রমিকের চুক্তিভঙ্গের এই অরাজক অবস্থা অবিলম্বে দূর না ক'রলে মালিকপক্ষের অর্থাৎ আমাদের আর্থিক ক্ষতি হবে মারাত্মক।

—কে মালিক আর কে শ্রমিক তা কোন্ ভিত্তিতে স্থির করা হ'লো মিস্টার ফোর্ব্স্? ফ্যাক্টরির নিজ-আবাদে যারা দিন মজুরিতে কিম্বা মাস মাইনেতে নীলচাষ করে তাদের সঙ্গে সম্পর্কটা তবু বোঝা যায়। কিন্তু ফ্যাক্টরির অধিকারের বাইরে যে-সব রায়তের নিজস্ব জমিতে নীলচাষ করা বা করানো হয়, সেই সব রায়ত-ও কি ফ্যাক্টরির শ্রমিক হিসেবে গণ্য হবে? আমার তো মনে হয়, সেই সব রায়ত-ও মালিক এবং পুঁজিপতি।

তারাও পুঁজিপতি! বিস্ময়ে তিনজনেরই চোখ বড়ো হ'য়ে গেল। নেংটি-পরা, ভূতের মতো কালো ওই নেটিব নিগারগুলো মালিক এবং পুঁজিপতি? হার ম্যাজেস্টি কুইন ভিক্টোরিয়া কি একজন উন্মাদকে লেপ্টেন্যান্ট গবর্নরের চেয়ারে বসিয়েছেন?

কোনোমতে মুখে একটু কাষ্ঠহাসি ফুটিয়ে মিস্টার ওয়াইজ ব'ললেন, মাফ ক'রবেন, আপনার কথাটার অর্থ ঠিক বুঝতে পারছি না।

কথাটা যে প্রতিনিধি দলকে হতবাক ক'রে দেবে তা হয়তো আগেই অনুমান ক'রে নিয়েছিলেন গ্র্যান্ট। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ গম্ভীর স্বরেই তিনি ব'ললেন, আমি মনে করি, যে রায়তের যত সামান্য জমিই থাক, মালিকানার ভিত্তিতে সেইটুকুই তার মূলধন বা পুঁজি। সুতরাং আপনারা যেটাকে মালিক-শ্রমিকের বিরোধ ব'লে মনে ক'রছেন, দুঃখের বিষয় আমি সেটাকে ঠিক সেইভাবে মনে

ক'রতে পারছি না। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, শাসনের ব্যাপারে আইনকেই আমি সবচেয়ে বড়ো মর্যাদা দেওয়ার পক্ষপাতী? সুতরাং আইনের ব্যাখ্যা অনুসারে আপনাদের দু'পক্ষের এই বিরোধকে আমি মালিকের সঙ্গে মালিকের বিরোধ ব'লে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য! তবে হ্যাঁ, এক্ষেত্রে এক মালিক-পক্ষ অনেক বেশি শক্তিশালী, অন্য মালিকপক্ষের সঙ্গতি নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর, এই যা পার্থক্য।

হতাশা আর চাপা ক্রোধে তিনজনেরই মুখ গম্ভীর হ'য়ে উঠলো। এই মারাত্মক শয়তান লোকটা বেলভেডিয়ার হাউসে এসে প্রবেশ করবার দিন থেকেই যেন ইচ্ছাকৃতভাবে প্ল্যান্টারদের সঙ্গে শত্রুতা ক'রে চ'লেছে। এর আগে যখন গবর্নর জেনারেলের কৌন্সিলে একজন সদস্য ছিল তখনও শ্বেতাঙ্গ সমাজের স্বার্থকে সবসময়েই নস্যাৎ ক'রেছে। জাস্টিস পীককের হৃদয়-ও একদিন নেটিব-দরদে উথ্‌লে উঠতো। মিউটিনির পরে নিজের ভুল তিনি বুঝতে পেরেছেন। নেটিবদের বিরুদ্ধে যেকোনো আন্দোলনেই আজ তাঁর মতো বিজ্ঞ, বিচক্ষণ ব্যক্তিকে সামনের সারিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই পিটার গ্র্যান্ট? কবরে না যাওয়া পর্যন্ত এই বদ্‌মাশটার স্বজাতি-বিরোধী মনের কোনো পরিবর্তন-ই হবে না!

বিগলিত হাসি হেসে ফোর্ব্‌স্‌ ব'ললেন, আইনগতভাবে আপনার যুক্তি হয়তো যথার্থ। কিন্তু অশিক্ষিত, বর্বর নেটিবগুলো যদি এই সুযোগে এইভাবেই আইন লঙ্ঘন ক'রে চলে তাহ'লে ঘোর বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে না কি?

—কোনো পক্ষকেই আমি আইন লঙ্ঘন ক'রতে দেবো না মিস্টার ফোর্ব্‌স্‌! মিলিটারি ব্যাটেলিয়ন পাঠিয়েছি। তাদের সাহায্য নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটরা কঠোর হাতে শান্তি রক্ষা ক'রবেন। যারা নীলচাষের জন্যে দাদন নিয়েছে তারা যেমন আইন অনুসারে চাষ ক'রতে বাধ্য, তেমনি যারা দাদন নেয়নি কিম্বা নিতে চায় না, তাদের ওপরেও যাতে জুলুম ক'রে দাদন চাপানো না হয়, সেটা দেখবার জন্যেও ম্যাজিস্ট্রেটদের আমি নির্দেশ দিয়েছি।

আর সময় ব্যয় করা পণ্ডশ্রম। শুষ্ক ধন্যবাদ জানিয়ে প্রতিনিধিদল বিদায় নিলেন। তাঁদের ব্রুহ্যাম গাড়িগুলো বেলভেডিয়ার প্রাঙ্গণের কেয়ারি-করা পাথরকুচির রাস্তার ওপর দিয়ে শব্দঝঙ্কার তুলে রওনা হ'য়ে গেল শহর কলকাতার দিকে। গাড়িতে চেপে দাঁতে দাঁত ঘ'ষে ফোর্ব্‌স্‌ একবার শুধু ব'ললেন, টেরিব্‌ল্‌ ক্রিচার! ইন্‌টলারেব্‌ল্‌ স্যাটান!

নীলকরদের তিন শক্তিমান প্রতিনিধি বিদায় নেওয়ার পর আপনমনেই একটু হাসলেন পিটার গ্র্যান্ট। সামান্য পুঁজি খাটিয়ে লাখ লাখ টাকা মুনাফা লোটার প্রায় নিরঙ্কুশ অধিকার পেয়েও এদের মন উঠছে না! আরো চাই! নীলচুক্তির ওপর একটা ফৌজদারি আইন প্রচলন করবার জন্যে কয়েকবছর ধ'রে নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশন। গত বছর লেফ্টেন্যান্ট গবর্নর এক মাসের ভেতরেই নীলচুক্তি রায়তদের পক্ষে বাধ্যতামূলক করবার উপায় হিসেবে একটা বিশেষ আইন চালু করবার জন্যে তাঁর ওপর প্রচণ্ড চাপ এসেছিল। নীলকরদের সে-উদ্যমকে সরাসরি নাকচ ক'রে দিয়েছিলেন তিনি।

দক্ষিণবঙ্গ এখন অগ্নিগর্ভ!

বিভিন্ন অঞ্চলে সংঘর্ষ শুরু হ'য়ে গেছে। কমিশনার, ম্যাজিস্ট্রেট—প্রত্যেকের রিপোর্টেই আসন্ন ঝড়ের ইঙ্গিত। যে লক্ষ লক্ষ চাষীরায়ত এতবছর ধ'রে নীলকরদের নিষ্ঠুর অত্যাচার সহ্য ক'রেছে অরা মরীয়া হ'য়ে উঠলে যে কী প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড শুরু হ'য়ে যাবে, উদ্ধত নীলকরের দল এখনো তা বুঝতে পারছে না। নির্বোধের দল বুঝতে পারছে না, এখানে ওখানে যে আগুন ধিকি ধিকি জ্ব'লতে আরম্ভ ক'রেছে, নিমেষে তা দাবানলে পরিণত হ'তে পারে। এই সেদিনকার মিউটিনি দেখেও এদের কোনো শিক্ষা হয়নি। রায়তদের বিদ্রোহের আগুন যদি ছড়িয়ে পড়ে তবে ওরা তো রেহাই পাবেই না, সারা বাঙলায় বৃটিশ সরকারের শাসনব্যবস্থাও বিপর্যস্ত হ'য়ে যাবে!

ভাইস্‌রয় এখন সিমলায়। সুতরাং এই বিপজ্জনক মুহূর্তে যাহোক একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে

গ্যান্টকেই কাজ আরম্ভ ক'রতে হবে! নিশ্চেষ্ট হ'য়ে ব'সে থাকা চ'লবে না। কিছু একটা ব্যবস্থা ক'রতেই হবে।

গবর্নর জেনারেলের কৌন্সিলের সদস্য মিস্টার স্কোন্সের ডাক পড়লো। নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে থাকার সময় এই স্কোন্সই নীলচাষের জন্যে তদন্ত বসানোর সুপারিশ ক'রে তখনকার লেপ্টেন্যান্ট গবর্নর মিস্টার হ্যালিডের কাছে প্রত্যাখ্যাত হ'য়েছিলেন।

ধীর, স্থিরভাবে সব কথা শুনলেন স্কোন্স। তারপর ব'ললেন, ছ'বছর আগে কমিশন বসানোর প্রস্তাব দিলেও আমার সে-প্রস্তাব নাকচ হ'য়ে গিয়েছিল, আশা করি তা আপনার মনে আছে?

—হ্যাঁ, আমার মনে আছে।

—সেই একই প্রস্তাব অর্থাৎ কমিশন বসানোর দাবিতে প্রচণ্ডভাবে মুখর হ'য়ে উঠেছে হিন্দু পেট্রিয়ট। মুখর হওয়ার কারণগুলো এই ছ'বছরে আরো জোরদার হ'য়েছে ব'লে আমি মনে করি। আমি নিয়মিত হিন্দু পেট্রিয়ট পড়ি। সেই জন্যেই বুঝতে পারছি, অবস্থা আগের চেয়ে এখন অনেক বেশি ঘোরালো। আমার তো বিশ্বাস, নীলচাষীদের বিদ্রোহ আরম্ভ হ'য়ে গেছে!

—আমার ধারণাও তাই-ই মিস্টার স্কোন্স! আমরা এখনো নিষ্ক্রিয় হ'য়ে ব'সে থাকলে এই বেঙ্গল প্রভিন্সেই মিউটিনির চেয়েও একটা ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘ'টে যেতে পারে।

—ঠিক তাই!—সমর্থন জানালেন স্কোন্স।—ওই অপরিণামদর্শী, উদ্ধত, চূড়ান্ত লোভী প্ল্যান্টারদের চেহারা আমি ব্যক্তিগতভাবে দেখেছি। ওরা বৃটিশ হ'লেও এ-কথা কখনোই ভাবে না, বৃটিশ সরকার এদেশে শাসন ক'রছে এবং সরকারের প্রতি ওদেরও একটা কর্তব্য আছে! ওদের চালচলনে মনে হয়, ওরা প্রত্যেকেই যেন এক-একজন শাসনকর্তা। ওদের ব্যাপারে অবিলম্বে একটা তদন্ত কমিশন বসানো সরকারের স্বার্থেই প্রয়োজন!

—আপনি একটা খস্‌ড়া তৈরি করুন! আইনের শাসনকে ঠিকমতো নিয়ন্ত্রণে আনা দরকার! প্ল্যান্টারদের সরকারি কোষাগার থেকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার ছিল না। অথচ অবস্থার চাপে সে-প্রস্তাব আমাকে মেনে নিতে হ'ল!

—এই সরকারি সিদ্ধান্ত নিয়ে হিন্দু পেট্রিয়টে তীব্র সমালোচনা হ'য়েছে।

—সে-লেখা আমি প'ড়েছি। সমালোচনা যথার্থ, মিস্টার স্কোন্স! নীলকর সত্যিই এক হৃদয়হীন অর্থলোলুপ দানব। প্রজাপীড়ন ক'রে তারা যা মুনাফা ক'রছে তা তো ক'রছেই, উপরন্তু এই সুযোগে কোনোরকম ব্যয় না ক'রেই প্রকৃত লাভের চেয়ে অনেক বেশি টাকা তারা পেয়ে যাবে। কথায় কথায় ওরা বৃটিশ পুঁজির কথা শোনায় কিন্তু বৃটিশ সরকারের ওপরেও কি ওদের বিন্দুমাত্র মমতা আছে? নিজের দেশ, জাতি কিম্বা সরকারের ওপরেই যাদের কোনো টান নেই, এদেশের নিঃস্ব, নেটিব রায়তেরা তাদের কাছে আর কোন্ ব্যবহার প্রত্যাশা ক'রতে পারে? রাজপ্রতিনিধি হিসেবে কোটি কোটি টাকা বৃটিশ পুঁজির স্বার্থ আমাকে দেখতেই হবে অথচ আমি চাই, নীলচাষের নামে এই ভয়াবহ নির্যাতন-ও বন্ধ হোক। আমার বিশেষ অনুরোধ, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনি একটা বিলের খস্‌ড়া ক'রে ফেলুন!

—কমিশনের প্রসঙ্গ?

—হ্যাঁ, কমিশনের প্রস্তাব সে-বিলে থাকতেই হবে!

ভাইস্‌রয়ের অনুপস্থিতিতে লেজিস্‌লেটিভ কৌন্সিলের বৈঠক ব'সলো। সভাপতিত্ব ক'রলেন সবচেয়ে প্রবীণ সদস্য স্যার বার্নেস পীকক। তিনিই কৌন্সিলের উপ-সভাপতি।

সেই বৈঠকে বিল পেশ ক'রলেন মিস্টার স্কোন্স।

"An Act To Enforce The Fulfilment of Indigo Contracts And To Provide The Appointment of A Commission of Enquiry Into The Practice of Indigo planting."

আলোচনা সভায় বাদ-বিতণ্ডার তুমুল ঝড় উঠলো। বিলের খসড়ায় নেটিব রায়তদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের সরাসরি অভিযোগ আনলেন স্যর পীকক। তাঁর বক্তব্য, দাদন হিসেবে টাকা নিয়ে চুক্তিভঙ্গ করলে রায়তের শাস্তি তো হবেই। এমন কি, টাকার বদলে বীজ নিয়েও সে যদি চুক্তিভঙ্গ করে তাহলেও একই রকম শাস্তি তার প্রাপ্য।

আপত্তি জানালেন নবাগত অর্থনীতিবিদ সদস্য জেম্‌স্‌ উইলসন। তাঁর মতে, টাকা নিয়ে চুক্তিভঙ্গ ক'রলে সেটা ফৌজদারি আইনের আওতায় প'ড়তে পারে কিন্তু বীজের ক্ষেত্রে সেটা প'ড়বে দেওয়ানি আইনের এক্তিয়ারে।

সুপ্রীম কোর্টের নামজাদা আইনজীবী চার্ল্‌স্‌ জ্যাকসন স্যার পীককের বক্তব্য সমর্থন ক'রলেন। জ্যাকসন এমন এক ব্যক্তি যাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, এদেশের নেটিব মানেই মিথ্যেবাদী, ঠক, প্রবঞ্চক। আইনের কোনোরকম সুবিধে তাদের দেওয়া উচিত নয়। অন্যতম সদস্য মিস্টার বার্টল্‌ ফ্রিয়ারের বক্তব্য নীলকরদের পক্ষে। স্কোন্সের সমর্থনে এগিয়ে এলেন একমাত্র অভিজ্ঞ, প্রবীণ সদস্য সিবিলিয়ান মিস্টার হেনরি হ্যারিংটন। তাঁর মতে, নীলচাষ এলাকায় সিবিলিয়ান হিসেবে কয়েকবছর কাজ করবার অভিজ্ঞতা থেকে মিস্টার স্কোন্স যেভাবে বিলের খস্‌ড়া ক'রেছেন, তার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে ব'লেই তিনি মনে করেন। ইণ্ডিগো প্ল্যান্টারেরা শ্বেতাঙ্গ ব'লেই যদি তাদের সাত খুন মাফ ক'রে আইন তৈরি হয় তাহ'লে অদূরভবিষ্যতে বৃটিশ শাসনব্যবস্থাই বিপর্যস্ত হ'য়ে প'ড়বে।

দুইপক্ষের বাদ-বিতণ্ডা চ'লতেই লাগলো কিন্তু তার সমাপ্তি হ'ল না। এক সপ্তাহের জন্যে সেদিনকার বৈঠক মুলতুবি হ'য়ে গেল।

গভীর দুশ্চিন্তায় প'ড়লেন পিটার গ্র্যান্ট। বাদ্‌-বিতণ্ডার যা প্রকৃতি তাতে কৌন্সিলের বৈঠকে পেশ করবার জন্যে লেপ্টেন্যান্ট গবর্নর হিসেবে তাঁর লিখিত বক্তব্যও বাতিল হ'তে চ'লেছে! উভয়দিক বজায় রাখার প্রচেষ্টা ছিল তাঁর সে বক্তব্যের ভেতর। তিনি চান না যে নীলচাষ বন্ধ হোক, আবার এ-ও চান না যে নীলকরের পীড়নে দাক্ষিণ বাঙলার আকাশ-বাতাস কান্নার রোলে ভ'রে উঠুক। তিনি লিখেছিলেন, যারা এই মরশুমে নীলচাষের জন্যে দাদন নিয়েছে, তাদের পক্ষে চুক্তি পালন করা বাধ্যতামূলক নিশ্চয়ই হবে কিন্তু আইনসঙ্গত এবং নিরপেক্ষ বিচারের পরেই নির্ধারিত হবে, চুক্তিভঙ্গের দায়ে কেউ অপরাধী এবং দণ্ডযোগ্য কিনা। যারা নীলকরের সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ ক'রতে চায় তারা মরশুম আরম্ভের আগেই দাদন প্রত্যাখ্যান ক'রতে পারে। প্রজা হিসেবে তাদের আইনগত এবং নৈতিক অধিকার প্রয়োগের এই সুযোগ থেকে যদি বঞ্চিত করা হয় তাহ'লে ভবিষ্যতের পক্ষে তা হবে বিপজ্জনক।

স্কোন্স এবং হ্যারিংটন ছাড়া গবর্নরের এই বক্তব্যের সপক্ষে কেউ বলেননি, বরঞ্চ বিরোধিতাই ক'রেছেন। নিরপেক্ষ জেনারেল আউটরাম ছাড়া আর সবাই প্রায় বিপক্ষে। জেম্‌স্‌ উইল্‌সন অল্প কয়েকমাস আগে ক'লকাতায় এসেছেন। এদেশের হালচাল তিনি এখনো ভালো জানেন না।

প্রমাদ গুণলেন গ্র্যান্ট। যে এক সপ্তাহের জন্যে বৈঠক মুলতুবি রইলো তারই ফাঁকে নদীয়া, যশোর, পাবনা, ফরিদপুর, রাজশাহী আর মালদায় ছ'জন বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ ক'রে পাঠালেন। তাঁদের বারবার ক'রে ব'লে দেওয়া হ'ল, এ আইনের মেয়াদ মাত্র ছ'মাস। কমিশনের কাজ সম্পূর্ণ হ'য়ে যাওয়ার পর অবস্থা অনুযায়ী নতুন স্থায়ী আইন তৈরি করা হবে। সুতরাং, যে আইনের অপব্যাখ্যায় অবিচারের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে, সে আইন যেন অত্যন্ত সতর্ক বিবেচনার সঙ্গে প্রয়োগ করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে চিঠিও গেল বিভাগীয় কমিশনারদের কাছে। লেপ্টেন্যান্ট গবর্নরের নির্দেশ—জেলা কিম্বা মহকুমা স্তরে এমন কোনো রাজকর্মচারী সম্বন্ধে যদি জানা যায় যে, এই আইনের প্রয়োগ ক'রতে গিয়ে তিনি নিরপেক্ষ থাকতে পারছেন না এবং বাদী-বিবাদী উভয়ের ক্ষেত্রেই আইনসঙ্গত সমদর্শিতা প্রদর্শনে অক্ষম তাহ'লে একটা দিনও দেরি না ক'রে এই আইনের প্রয়োগ-অধিকার থেকে তাঁকে বিরত ক'রবেন।

যে সপ্তাহের ভেতর গ্র্যান্ট তাঁর শাসন যন্ত্রকে নিরপেক্ষ ক'রে তোলার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে

প'ড়েছিলেন, সেই সপ্তাহের ভেতরেই স্যার বার্নেস পীকক নিজের দলে টেনে ফেললেন নবাগত অর্থনীতির পণ্ডিত জেম্‌স্‌ উইল্‌সনকে।

পরের সপ্তাহে মুলতুবি বৈঠক যখন নতুন ক'রে আরম্ভ হ'ল তখন উইলসনের সুর একেবারে বিপরীত। আগের বৈঠকে দাদনের প্রকৃতি নিয়ে যিনি ফৌজদারি আর দেওয়ানি আইনের চুলচেরা বিচার ক'রেছেন, পীককের প্রস্তাবের বিরোধিতা ক'রেছেন, তিনিই প্রস্তাব তুললেন, টাকা অথবা বীজের প্রশ্ন নয়—দাদন মানেই দাদন। রায়ত যেভাবেই নিক না কেন, শর্ত তাকে পূরণ ক'রতেই হবে! শুধু তাই নয়, জমির যে অংশের জন্যে রায়ত দাদন নিয়েছে শুধু সেই অংশেই নীল চাষ ক'রলে হবে না—তার সমস্ত জমিতেই নীল চাষ ক'রতে সে আইনগতভাবে বাধ্য। কারণ, প্রত্যেক রায়তেরই কুঠির কাছে আগেকার কিছু না কিছু দেনা থাকে। সে দেনা শোধ না করা পর্যন্ত সমস্ত জমিতে নীলচাষ তাকে ক'রতেই হবে!

কঠোর ভাষায় এই সংশোধনী প্রস্তাবের বিরোধিতা ক'রলেন স্কোস এবং হ্যারিংটন। কিন্তু নিষ্ফল হ'য়ে গেল তাঁদের প্রতিবাদ। সদস্যদের বেশিরভাগই তাঁদের বিপক্ষে। গৃহীত হ'য়ে গেল উইলসনের সংশোধনী প্রস্তাব।

আরো কয়েকটা ধারা যোগ ক'রলেন বার্নেস পীকক স্বয়ং। যে রায়ত শর্ত পূরণ ক'রবে না, ম্যাজিস্ট্রেট তার সমস্ত ফসল বাজেয়াপ্ত ক'রতে পারবেন। ম্যাজিস্ট্রেট অবাধ্য রায়তকে উপযুক্ত উপায়ে শর্তপূরণে বাধ্য ক'রতে পারবেন।

চৈত্রশেষের সন্ধ্যায় সেদিন ফুরফুরে দখিনা হাওয়ায় চামরের মতো দুলছিল বেলভেডিয়ার প্রাঙ্গণের গাছের ডালগুলো। নতুন গজানো হাল্‌কা সবুজ পাতাগুলো শির্‌শির্‌ ক'রে কাঁপছে। প্রাসাদের প্রশস্ত সিঁড়ির পাশ থেকে বহুদূর বিস্তৃত ডালিয়া-জিনিয়া-ক্রিসানথিমাম আর সুইটপী-র কেয়ারি করা বাগিচায় ফুলে ফুলে তখনো শেষ বসন্তের রেশ।

প্রাসাদে নিজের একান্ত গোপনীয় আলোচনা কক্ষে গম্ভীরমুখে ব'সে আছেন পিটার গ্রান্ট। প্রশস্ত মেহগনি টেবিলের ওপাশে আর একখানা চেয়ারে ব'সে আছেন পরাজিত বিধ্বস্ত স্কোন্স। ঘরের এককোণে দাঁড়িয়ে ঝুলন্ত ঝালরদেওয়া পাখা টানছে উর্দিপরা নেটিব পাংখাপুলার।

বেশ কিছুক্ষণ নীরবতার পর মুখ খুললেন গ্রান্ট। —স্যার পীককের মতো বিজ্ঞ ব্যক্তি যে এতখানি পাল্‌টে গেছেন তা আমি যেন এখনো বিশ্বাস ক'রতে পারছি না মিস্টার স্কোন্স! য়ুরোপীয়ান আর ইণ্ডিয়ান নেটিবদের ক্ষেত্রে আইনের বৈষম্য নিয়ে এই ব্যক্তিই মাত্র ক'বছর আগে কত ক্ষুরধার সমালোচনা ক'রেছেন!

স্কোন্স ব'ললেন, আমারও বড়ো আশ্চর্য লাগছে!

—যাঁরা বিলটাকে এইভাবে দুমড়ে মুচড়ে একটা কদাকার আইনে পরিণত ক'রে ছাড়লেন, তাঁরা বুঝতে পারবেন না, জাতিগতভাবে আক্রোশ চরিতার্থ করা আর শাসন করা এক জিনিস নয়! তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'য়েছে কিন্তু আমার অবস্থা হ'ল সঙ্গীন! শাসন তো আমাকেই চালাতে হবে! বারুদের স্তূপ একপাশ থেকে এরই ভেতর জ্ব'লতে শুরু ক'রেছে। সেই আগুনে হয়তো গোটা স্তূপেই বিস্ফোরণ ঘটবে! তা জেনেশুনেও এই আগুনের স্ফুলিঙ্গ কেমন ক'রে আমি সেদিকে ছুঁড়ে দেবো, সেই কথাই ভাবছি!

স্কোন্স ব'ললেন, আইন জারি ক'রতেই হবে। আর তো কোনো উপায় নেই!

—উপায় নেই ব'লেই তো নিজেকে বড়ো অসহায় মনে হচ্ছে। তবু আমার সৌভাগ্য, তদন্ত কমিশন বসানোর প্রস্তাবটা ও'রা সংখ্যার জোরে নাকচ ক'রে দেননি! ও'রা বুঝতে পারছেন না, কয়েকশো প্ল্যাণ্টারের জেদ বজায় রাখার জন্যে গোটা বৃটিশ শাসন-ব্যবস্থার সামনে কি বিপর্যয়ের সম্ভাবনা ও'রা ডেকে আনলেন!

স্কোন্স চুপ ক'রে রইলেন।

একটু ম্লান হেসে গ্রান্ট ব'ললেন, আমি আইনের শাসনেই বিশ্বাস করি। কোনো পক্ষেরই

বে-আইনি কাজ আমি সহ্য ক'রবো না। তবু ব'লতে বাধ্য হচ্ছি, কয়েকজন প্ল্যান্টারের কাছে বাঙলার লেপ্টেন্যান্ট গবর্নর কত অসহায়।

॥ তেইশ ॥

যশোর সদরে উকিল হরিনারায়ণ ঘোষের সেজো ছেলে মন্মথ ওরফে শিশির কঞ্চির মতো রোগা লিকলিকে হ'লেও যে এমন ডাকাবুকো হ'য়ে উঠবে, কে জানতো? এই সবে ষোলো-সতেরো বছর বয়সেই সেতার বাজায় খাসা। পাখোয়াজে হাত দিলে পাখোয়াজ যেন কথা বলে! সেই একই হাতে যখন সে লাঠি ধরে তখন কে ব'লবে সেই একই ছেলে সেতারে করুণ রাগ বাজিয়ে শ্রোতার চোখে জল এনে দিতে পারে। যশোর শহর থেকে অল্প কিছু দূরেই পলুয়া-মাগুরা গ্রামে বাড়ি। সেখানেই সে থাকে।

ঝিকরগাছা নীলকুঠির মালিক ম্যাকেঞ্জি সাহেবের সঙ্গে হরিনারায়ণের জমিজমা-সংক্রান্ত একটা মামলা চলছিল। সেই মামলার রায়ে হরিনারায়ণের জিৎ হ'ল, হেরে গেল ম্যাকেঞ্জি। মামলায় হেরে একেবারে ক্ষেপে গেল ম্যাকেঞ্জি। রাজত্ব বৃটিশের, জজ বৃটিশ এবং নিজে বৃটিশ হ'য়েও হার মানতে হ'ল একটা নেটিবের কাছে? এত বড়ো অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার একটাই উপায় আছে। হরিনারায়ণ সম্পন্ন, সম্ভ্রান্ত গৃহস্ত—গ্রামেও কোঠাবাড়ি। কিছু লেঠেল আর বন্দুকধারী পাঠিয়ে লোকটার গ্রামের বাড়ি লুঠ ক'রতে পারলে প্রতিহিংসাও চরিতার্থ হয়, বিস্তর লুঠের মালও পাওয়া যায়।

ঝিকরগাছা কুঠিতে প্রস্তুতি শুরু হ'য়ে গেল। সে-খবর সময় থাকতেই পেঁছে গেল হরিনারায়ণের কানে। তিনি ছুটলেন গ্রামেব বাড়ি। সম্পত্তির ক্ষতির চেয়েও বাড়ির মেয়েদের সম্ভ্রম হানির আশঙ্কা তাঁকে বেশি বিচলিত ক'রেছে। তিন ছেলে বসন্ত, হেমন্ত আর শিশিরকে ডেকে তিনি ব'ললেন, ম্যাকেঞ্জি সায়েব হামলা ক'রবে শুনছি। সহায় সম্পত্তি যায় যাক কিন্তু মেয়েদের কোনো অপমান হ'লে তা আমি সহ্য ক'রতে পারবো না। বাড়ির মেয়েদের নিয়ে তোরা যশোরের বাড়িতে চ'লে যা। তারপর কপালে যা থাকে তাই হবে।

বসন্ত আর হেমন্ত বাবার কথায় রাজী কিন্তু ফুঁসে দাঁড়ালো শিশির। উত্তেজনায় তার সারা দেহ কাঁপতে লাগলো।

—ওই কুঠেল সাহেবের ভয়ে বাড়ি ছেড়ে চ'লে যেতে হবে, বাবা? দেহে প্রাণ থাকতে বাড়ি ছেড়ে কিছুতেই যাবো না! আমরাই যদি পালাই তাহ'লে লোকে আমাদের কাপুরুষ ব'লবে না? আপনি বিচলিত হবেন না! যে-হাতে সেতার-পাখোয়াজ বাজাই সে-হাতে লাঠি চালানোও তো জানি? আসুক না সাহেবের লেঠেলরা—অক্ষতদেহে তাদের একজনও ফিরতে পারবে না! সাহেবকেই ভয় পেতে দিন বাবা, আমরা ভয় পাবো না। আমাদের নয় সদর শহরে আর একটা বাড়ি আছে কিন্তু গরীব রায়তদের কথা ভেবে দেখুন? তাদের তো পালানোর অন্য কোনো জায়গাও নেই! তারা রুখে দাঁড়িয়েছে আর আমরা পালিয়ে যাবো?

রোগা লিকলিকে সতেরো বছর বয়সের ছেলেটা সাহস জোগালো তার বাবার বুকে, সাহস জোগালো দুই দাদার মনে। দু'দিনের ভেতর লেঠেলের হামলার জবাব দেওয়ার ব্যবস্থাও ক'রে ফেললো। সে-খবর পেঁছে গেল ম্যাকেঞ্জি সাহেবের কানে। সে আর লেঠেল পাঠাতে সাহস করেনি। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার বাসনা তাকে ত্যাগ ক'রতে হ'ল।

ঝিকরগাছার নীলকর সাহেব সেই যে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল শিশিরের মাথায়, সে আগুন আর নেবেনি। গত বছরের গোড়ার দিক থেকেই নদীয়া পাবনায় যখন নীল বিক্ষোভের ধোঁয়া উঠতে আরম্ভ হ'য়েছে, শিশিরও নেমে পড়লো যশোরে তার নিজের এলাকায়। হাতে যত অস্ত্রই থাক্, যত ভাড়াটে লেঠেলই থাক, নীলকরের সংখ্যা কত? হাজার হাজার, লাখ লাখ চাষী কেবল

চোখের জল না ফেলে খালি হাতেও যদি একজোট হয়ে এগিয়ে আসে, তাদের পায়ের চাপে গুঁড়িয়ে যাবে কয়েকশো নীলকুঠি আর কয়েকশো নীলকর সাহেব। চোখের জল আর ফেলতে চাইছে না চাষীর দল, রুখে দাঁড়ানোর ইচ্ছেও তাদের আছে। কিন্তু এতবছরের মুখ বুজে সওয়ার অভ্যেসটা বারবার যেন তাদের দ্বিধাগ্রস্ত ক'রে দিচ্ছে। ওদের শক্তি যে কতখানি, সেইটেই কেবল ওদের একটু বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। যে মুহূর্তে সেটা তারা বুঝতে পারবে, সেই মুহূর্তেই থরথর ক'রে কাঁপতে আরম্ভ ক'রবে নীলকর নেকড়ের দল।

একজোট হ'ল যশোরের চাষী। ভয়ের কাঁপুনি কাঁপার বদলে এবার আরো হিংস্র হ'য়ে উঠলো নীলকর সায়েব। আগুন জ্বলতে লাগলো গ্রামে গ্রামে, আর্তনাদে ভ'রে উঠলো আকাশ-বাতাস। কিন্তু পাল্টা আগুনও জ্ব'লে উঠলো নীলচাষীর চোখের তারায়। সে আগুন আরো ভীষণ, আরো ভয়ঙ্কর!

রামনগর, বিজলিয়া, ছালকোপা, মীরগঞ্জ, হাজিপুর—কোনো কুঠির এলাকা বাদ রইলো না। ওকান, ম্যাক আর্থার, ওট্‌স্‌, কেনি, স্মিথের মতো অকুতোভয় নীলকরেরাও প্রমাদ গুণতে শুরু ক'রলো। নীল তাদের চাই-ই! কিন্তু কোথায় নীল? লেঠেল-পাইক, আমিন-গোমস্তা আর তাগিদগীরের দল চাষীদের প্রচণ্ড প্রহারে ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে ফিরে আসতে লাগলো কুঠিতে। আর্তনাদ করা নীলকরের কুষ্ঠিতে কোনোদিন ছিল না। কিন্তু আবেদনের ঘোমটা ঢাকা দিয়ে আর্তনাদেরই নামান্তর মাঝে মাঝে পেঁছিতে লাগলো লেপ্টেন্যান্ট গবর্নরের কাছে।

বৃটিশ পুঁজি বিপন্ন! রায়তেরা একজোট হ'য়ে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রেছে। তাদের দিয়ে নীলচাষ করানো আর সম্ভব হচ্ছে না। মফস্বলের আদালতে কোনো অবাধ্য রায়তের বিরুদ্ধে মামলা আনাও এখন প্রায় অসম্ভব হ'য়ে উঠেছে। তার সবচেয়ে বড়ো কারণ, আমাদের অভিযোগ প্রমাণ করবার জন্যে আমরা কোনো সাক্ষী জোগাড় ক'রতে পারছি না। এমন কি, আমাদের নেটিব কর্মচারিরা পর্যন্ত প্রাণের ভয়ে আদালতে গিয়ে সাক্ষী দিতে সাহস পাচ্ছে না। প্রকৃতপক্ষে রায়তেরা এখন ক্ষিপ্ত: যে কোনো রকম দুষ্কর্ম করবার জন্যে তারা প্রস্তুত। প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কার কারণ থাকছে, কোন্ সময় দুর্বৃত্তের দল কুঠিতে চড়াও হ'য়ে আমাদের ফ্যাক্টরির সরঞ্জাম আর বীজগোলায় আগুন ধরিয়ে দেবে। আমাদের অধিকাংশ নেটিব দাস-দাসী আমাদের প্রতি যথেষ্ট অনুগত থাকা সত্ত্বেও প্রাণের ভয়ে কুঠির সংশ্রব ত্যাগ ক'রে চ'লে যেতে শুরু ক'রেছে। রায়তেরা তাদের ভয় দেখিয়েছে, হয় তাদের খুন ক'রবে, নয়তো তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেবে। এখনো যা দু'চার জন নেটিব দাস-দাসী আছে তারাও হয়তো শিগগিরই কুঠি ছেড়ে চ'লে যাবে। কারণ তাদের এমনভাবে একঘ'রে করা হ'য়েছে যে বাজারে একজন দোকানদারও তাদের কাছে এককণা খাদ্যদ্রব্য বিক্রি ক'রছে না।

কালাপোল থানা এলাকায় মে মাসের মাঝামাঝি একটা ঘটনা ঘটেছিল। সেই ঘটনার বিবরণ হিন্দু পেট্রিয়টে পাঠানোর পর যশোরের ম্যাজিস্ট্রেট ম্যালোনি আর জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট স্কিনার এত ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠেছেন যে গ্রেপ্তার এড়ানোর জন্যে গা-ঢাকা দিতে হ'য়েছে শিশিরকে। গা-ঢাকা দিয়ে থাকার জন্যে তার জায়গার অভাব নেই। রায়তেরা তাদের সিন্নিবাবুকে কাছে পেলে কৃতার্থ। ওদিকে তার খোঁজে চতুর্দিক তোলপাড় ক'রে বেড়াচ্ছে প্রসন্ন দারোগা। আসলে যশোরের কোন্ লোকটা হিন্দু পেট্রিয়টের পৃষ্ঠায় ম্যাজিস্ট্রেট আর দারোগার অপকীর্তি ফাঁস ক'রে দিচ্ছে তারও স্পষ্ট প্রমাণ কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। প্রসন্ন রায় দারোগা মনেপ্রাণে রাজসেবক। শিশিরের ওপর সন্দেহটা বেশি থাকলেও ইংরিজি জানা কোনো লোকটাকেই সন্দেহ থেকে খালাশ দিতে পারছে না সে। আদালতের নাজির আনন্দবাবু, পোস্টমাস্টার বিষ্টুবাবু, শিক্ষক কেষ্টবাবু আর গিরীশ মল্লিকের ওপর সন্দেহটাই তার বেশি। এমনিতেই আসল অপরাধীকে ধ'রতে না পারার জন্যে প্রসন্ন দারোগার মেজাজ তিরিক্ষি হ'য়ে আছে, তার ওপর যশোর শহরে নচ্ছার হিন্দু পেট্রিয়ট কাগজের ক'জন গ্রাহক আছে, তারও ঠিকমতো হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। পোস্টমাস্টার, ডাকপিওন

সবাই বদমায়েশি ক'রে প্রসন্ন দারোগার আর একটা প্রমোশনের পথে কাঁটা দিচ্ছে যেন! আরে বাবা, তোরা তো আর চাষাভুষো নোস্ যে নীলের নামে তেলে-বেগুনে জ্ব'লে উঠবি? তোরা ভদ্দরনোকের ছেলে ইংরিজি শিখে ইংরেজেরই দয়ায় চাকরি ক'রে দু'টো খেতে-প'রতে পাচ্ছিস! একটা দু'টো খবর ফাঁস ক'রে দিলে যদি আর একটা ভদ্দরলোকের ছেলের চাকরিতে একটু উন্নতি হয়, তাতে তোদের এত আপত্তি কেন? সতীসাধ্বী হ'য়েছেন! শালা বুন্ধ বেশ্যা তপস্বিনী!

কালাপোল থানায় যে তুলকালাম কাণ্ডটা হ'য়েছিল তার জের এখনো চলছে।

নীলচাষ তো প্রায় বন্ধ হওয়ারই দাখিল, এমন সময় স্কিনার অর্থাৎ রায়তদের ভাষায় 'ছোটো পাত্তরমারা সাহেব' হঠাৎ একদিন ঘোড়া ছুটিয়ে এসে হাজির। দারোগা গাঁয়ে গাঁয়ে এত্তেলা পাঠিয়ে দিলে যে, রায়তদের দুঃখ-দুর্দশার প্রতিকার করবার জন্যেই জেলার হাকিম এসেছেন। স্কিনারের ওপর কোনো আস্থাই ছিল না চাষীদের। কিন্তু নতুন ছোটোলাট বাহাদুর অনেক কড়া লোক ব'লে তারা শুনেছে। নদীয়া জেলায় নতুন হাকিম আসার পর আগের চেয়ে তবু যাহোক মন্দের ভালো একটু পরিবর্তন হ'য়েছে। তাছাড়া নীলের হাঙ্গামা নিয়ে গবরমেন্ট নাকি কমিশন না কী একটা বসিয়েছে। হ'তে পারে, ছোটোলাটের তাড়া খেয়ে পাত্তরমারা সাহেব নিজের দোষ ঢাকার জন্যে ছুটে এসেছে।

দেখতে দেখতে প্রায় হাজার দশেক রায়ত জমায়েত হ'ল। কিন্তু কোথায় দুঃখ-দুর্দশার প্রতিকার? হাকিম সাহেব ব'ললেন, টোমরা ভুল করিয়াছ! নীল চাষ করিলেই টোমাডিগের ডুক্খ ডুর হইবে! টোমরা ডাডন লও!

দশহাজার রায়তের বিক্ষোভের গুঞ্জনে গম্ভীর শব্দ-তরঙ্গ জাগলো। দু'হাতে চারপাশের লোককে সরিয়ে দিয়ে সামনে এগিয়ে এলো গোপাল মণ্ডল আর কবীর শেখ। পাশেই দাঁড়িয়ে প্রসন্ন দারোগা। তাতে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। চিৎকার ক'রে উঠ্‌লো কবীর শেখ, এই কতা কওয়ার জন্যি অ্যাদ্দুর আ'লে নাকি সায়েব? তোমার কুটেল দোস্তদেরে পুছ্ ক'রে দ্যাকোগে', বাদশা হোসেন শার আমলে যে দাদন আমরা নিয়েলাম তাই নাকি অ্যাকন আবদি শোদ হয় নাই! আবার দাদন?

গোপাল মণ্ডল আরো সু' গড়িয়ে ব'ললে, কুটেলের বিবির মাজা ধ'রে নেচ্তেচো, তাই নাচোগে হাকিম সায়েব! মোদের দুক্কু মোরাই দূর কত্তি পারবো।

উত্তেজনায় অধীর দশহাজার রায়ত চিৎকার ক'রে উঠ্‌লো, দাদন আমরা নেবো না!

প্রসন্ন রায়ের মতো দুঁদে দারোগাও একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। দাদন নেওয়ার কথায় রাজী তো এরা হবেই না, বরঞ্চ হাকিম সাহেব অক্ষত দেহে সদরে ফিরতে পারবেন কিনা, এই চিন্তায় সে বিচলিত হ'য়ে পড়লো। সবাই মারমুখী। তারা মনে মনে একটা আশা নিয়ে এসেছিল যে, নতুন আইনে তারা হয়তো দাদন নেওয়ার জ্বালা থেকে রেহাই পাবে! দাদন একবার যাদের নেওয়া হ'য়ে গেছে, নতুন আইনে তাদের রেহাই নেই, সে-কথা তারা জানে। কিন্তু নদীয়া জেলার হাকিম তার পাশাপাশি ইস্তাহার দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন, দাদন নেওয়া বা না-নেওয়া রায়তের ইচ্ছাধীন। এ হাকিম তো সে-কথা কিছু ব'লছে না! হাওয়ায় খবর এসে গেছে, গোয়াড়ি কোতোয়ালির বড়ো দারোগা গিরীশবাবু নিজে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে রায়তদের বুঝিয়ে দিয়েছেন, যার জমি সে তার ইচ্ছেমতো চাষ ক'রবে। যার ইচ্ছে ধান ক'রবে, সে ধান—যার ইচ্ছে নীল বুনবে, সে নীল। তবে চুক্তি যদি একবার ক'রে ফেলে তাহ'লে তা ক'রতেই হবে। গোয়াড়ির বড়ো দারোগা নাকি লোক ভালো। রায়তদের কাছে গোপনে গোপনে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, এ আইনের মেয়াদ নাকি আশ্বিন মাস পর্যন্ত। সিন্নিবাবু আল্লার পাঠানো পীর—ভগবানের দূত। তাঁর মুখেই রায়তেরা শুনেছে, গিরীশ দারোগা তার ক্ষমতার ভেতর রায়তদের জন্যে যতটুকু ভালো করা যায় তা ক'রছে। তার পাশে এই প্রসন্ন দারোগা? বেজন্মা না হ'লে কেউ এত নীচে নামতে পারে?

গোপাল মণ্ডল আর কবীর শেখের সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার ক'রে উঠলো দশ হাজার মানুষ। স্কিনারের তখন মুখ শুকিয়ে গেছে। গোপাল মণ্ডল বেপরোয়াভাবে স্কিনারের ঘোড়ার লাগাম দু'হাতে মুঠো ক'রে ধ'রে ব'ললে, শোনো পাত্তরমারা সায়েব, তোমার মন ঝ্যাতো চায় কুটেলার বিবিদের নে শোওগে', কিন্তুক এই বিশ গাঁয়ের মুনিষ্যির সুমুকে কতা দে' যাও, নীলির দাদন আর চাপাবা না, মিত্যে ফোজদুরি করবা না!

—জবান না দিলি তোমারে আজ ছাড়া হবে না!—ব'ললে কবীর শেখ।

অসহায় দৃষ্টিতে দারোগার দিকে তাকালে স্কিনার। বন্ধু কেনি, ম্যাকআর্থার, ওকান, স্মিথ এবং বিশেষ ক'রে ফর্লঙের অনুরোধে তাকে এখানে আসতে হ'য়েছে। অবস্থা যে এত ভয়ঙ্কর হ'য়ে দাঁড়াবে তা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি স্কিনার।

চিৎকার ক'রে উঠলো আর একজন রায়ত, কুটেলের খানায় ভারি মজা? তোমার দোস্ত কুটেল সুমুন্দিরা আমদেরই বাঁশঝাড় কেটে নে' সেই বাঁশে তার নেটেলার নাটি বানায়, শালা মুরগির আণ্ডাগুলো তাবাদি কুটেলের খানার জন্যি কেড়ে নে যায়, ত্যাকন তো আমাদের দুক্কু দ্যাকার জন্যি আসো না সায়েব? ঝ্যাতো দুক্কু অ্যাকন উৎলে ওঠলো, কেমন?

উত্তেজিত জনতা তখন ঘিরে ধ'রেছে স্কিনারকে। হয় তাকে জবান দিয়ে যেতে হবে, নীলের কথা আর কোনোদিন মুখে উচ্চারণ করবে না, নয়তো মোল্লাহাটি কুঠির ক্যাম্পবেল সাহেবের মতো দশা হবে!

অল্প কয়েকদিন আগের কথা।

জনা তিরিশেক লেঠেল আর আমিন গোমস্তাদের নিয়ে সামটা গ্রামে জোর ক'রে দাদন ধরাতে গিয়েছিল মোল্লাহাটি কুঠির সহকারী ম্যানেজার ক্যাম্পবেল। নতুন আইন জারি হ'য়েছে, মিলিটারি পুলিশ ঘুরে ঘুরে টহল দিচ্ছে, তাই আগেকার সন্ত্রস্তভাব মন থেকে ঝেড়ে ফেলে বীরবিক্রমে অভিযানে গিয়েছিল ক্যাম্পবেল। কিন্তু রায়তগুলো যে দিনদুপুরে দলবলসমেত তাকে এমন জাঁতাকলে ফেলে দেবে, তা কে জান্তো? গ্রামে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই চারপাশ থেকে ঘিরে ধরলে শ'দুয়েক মানুষ। বরিশালের সড়কিওয়ালা ওস্তাদেরা যাদের হাতে-কলমে সড়কির তালিম দিয়ে গেছে, তাদেরই দশজন বারোজন নিয়ে এক একটা এলাকায় তৈরি হ'য়েছে যুধিষ্ঠির কোম্পানি। বেতের ঢাল আর একগোছা সড়কি নিয়ে যুধিষ্ঠির কোম্পানির এক-একজন সড়কিওয়ালাই কম ক'রে পঞ্চাশজন লেঠেলের মহড়া নিতে পারে। আর ক্যাম্পবেলের সঙ্গে ছিল মোটে তিরিশজন লেঠেল। তীরবেগে সড়কি ছুটে আসে মাটি ঘেঁষে, তীক্ষ্ণফলা এসে বিঁধে যায় গোড়ালি কিম্বা পায়ের গোছায়। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত-ছোটা পা নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে পালিয়ে গেল কুঠির লেঠেলের দল। ক্যাম্পবেল তখন একা অসহায়। কোঁচড়ে একরাশ রোলা নিয়ে কাছেই একটা ঝাঁকড়ালো হিজল গাছের ওপর উঠে গিয়েছিল ছিনাথ মণ্ডলের ষোলো বছরের মেয়ে কুসুম। গত চৈতমাসে ছিনাথকে সড়কি দিয়ে এফোঁড়-ওফোঁড় ক'রে মেরেছিল ক্যাম্পবেলের লোক। সেই ছিনাথ মণ্ডলের মেয়ের ছোড়া পোড়ামাটির একটা রোলা ছুটে এসে প্রথম আঘাত ক'রলো ক্যাম্পবেলকে। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটলো সাহেবের কপাল থেকে। গল্‌গল ক'রে রক্তের ধারা প'ড়ে ঢেকে দিলে চোখ-মুখ। তাজা রক্তে ভিজে গেল গায়ের জামা-কোট। তার সঙ্গে সঙ্গেই উপর্যুপরি লাঠি। জ্ঞান হারিয়ে ঘোড়া থেকে মাটিতে প'ড়ে গেল ক্যাম্পবেল। ঘোড়াটা যে সওয়ারকে নিয়ে ছুটে পালাবে সে উপায়-ও রাখেনি যুধিষ্ঠির কোম্পানি। সড়কির ঘায়ে ঘোড়ার পা-ও জখম। ক্যাম্পবেল প'ড়ে গেল বলবার চেয়ে ঘোড়াটাই তাকে পিঠ থেকে ঝেড়েফেলে কোনোমতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ছুটে পালালো বলাই ভালো।

হিজলগাছ থেকে নিমেষের ভেতর নেমে এলো কুসুম। পাগলের মতো ছুটে গিয়ে হতচেতন

রক্তাক্ত সাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার ক'রে উঠলো, আমার বাপেরে সড়কি দে' মেরে চিলি না শত্তুর? ছ্যাঁচন খেলি ক্যামন নাগে তা বুজতি পাচ্চিস? বোজ—আরো বোজ শালা—

ক্যাম্পবেলের রক্তাক্ত মুখের ওপর এলোপাথাড়ি লাথি মারতে লাগলো মেয়েটা। কে যেন ব'ললে, অক্তে তোর ঠ্যাং যে মাকামাকি হ'য়ে গ্যালোরে কুস্‌মি—

—যাবেই তো! মুই ঝে আল্‌তা পচ্চি, মুই সাদের আলতা পচ্চি—

—সাচা কতা ক'য়েচে কুস্‌মি!—চিৎকার ক'রে ব'ললে, বুড়ি মটরমণি, ঝে ঝে মাগীর ভাই-ভাতার পুতিরি ওরা জ্যান্ত রাকে নাই, তারা আল্‌তা প'রে নে! এমন আলতা আর পাবি না লো!

গোপাল ম'ডল সেদিন সেখানে হাজির ছিল। তারই একটা ভুলের জন্যে বেঁচে গেল লালমোন সাহেবের ডান হাত ওই সাহেবটা। কেউ কেউ ব'লেছিল, ও সুমুন্দিগার কাছিমির জান্, মরে নাই। কিন্তু গোপালের ধারণা হ'য়েছিল, সাহেব ম'রে গেছে। সে-ই ব'ললে, মরেই ঝ্যাকন গে'চে, ত্যাকন আর পিট্‌য়ে নাভ কী? যা, মড়িডা খালের ধারে ফেলে দে' আয়!

গ্রামের পশ্চিমপ্রান্তে খালের ধারে মাঠের ওপরে সাহেবের দেহটা ফেলে দিয়ে এসেছিল তারা। কিন্তু নীলকরের জান্ সত্যিই কচ্ছপের জান্। সাহেব মরেনি। সন্ধ্যের অন্ধকার নেমে আসার পর কুঠির কয়েকজন লেঠেল আর বন্দুকধারী পাইক নিয়ে হাইড সাহেব এসে সহকর্মীর আধমরা দেহটা তুলে নিয়ে যায়। মোল্লাহাটি কুঠির হাসপাতালে লোকটা নাকি দিব্যি সেরে উঠ্‌ছে!

সেদিনকার সে-ঘটনার কথা শুনেছে প্রসন্ন দারোগা। এখন যেমন ক'রেই হোক, এই উত্তেজিত জনতার হাত থেকে জেলার দু'নম্বর হাকিমকে বাঁচাতে না পারলে তার চাকরি তো যাবেই, উপরন্তু কপালে আরো কত দুর্ভোগ আছে, কে জানে!

হঠাৎ প্রসন্ন দারোগার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। সে চাষীদের উদ্দেশে চেঁচিয়ে ব'ললে, তোরা সবাই মিলে একসঙ্গে চেঁচামিচি ক'রলে মীমাংসাটা কেমন ক'রে হবে, বল্? কথায় বলে, গাঁয়ের মোড়ল দেশের নেতা, তার কাছে কও মনের কথা, অ্যাঁ? তোদের এত গাঁয়ের মোড়লেরাও যখন আছে, তখন তারাই তো হাকিম সাহেবের সঙ্গে কথা ব'লে মীমাংসা ক'রে ফেলতে পারে। হাকিম সাহেব সুস্থমতো তোদের সঙ্গে কথাবার্তা কওয়ার জন্যেই এয়েচেন। আমি বলি কি, যে-ক'টা গাঁয়ের লোক তোরা এয়েচিস সেই ক'টা গাঁয়ের মোড়লেরা থাক্, তারাই সাহেবের সঙ্গে কথা বলুক। বাকি যারা বাড়ি ফিরে যা।

কবীর শেখ এক গাঁয়ের মোড়ল। অন্য এক মোড়ল গোপালকে সে ফিস্‌ফিস্ ক'রে ব'ললে, কী কও গোপালদা, নাজি হবা?

গোপালও ফিস্‌ফিস্ ক'রে ব'ললে, শালার প্যাটে প্যাটে কী মতলব আচে, কেডা জানে! তয় কিনা, মোটে চার-পাঁচজন তো না? অনেক গেরামের নোকই আচে। নাজি হ'য়ে দেকি, কী মীমেংসা করে!

হিসেব ক'রে দেখা গেল ঊনপঞ্চাশটা গ্রামের লোক আছে। ঊনপঞ্চাশজন মোড়লকে একদিকে গিয়ে দাঁড়াতে ব'ললে প্রসন্ন দারোগা। আবারও সে অভয় দিলে, কেউ নিজের ইচ্ছেয় নীল ক'রতে না চাইলে সাহেব কাউকে জোর ক'রবেন না, সে-কথা আমি দিয়ে রাখছি। তবু একবার ঠাণ্ডা মাথায় কথা ব'লে দেখা আর কি! তোরা নিশ্চিন্ত থাক্!

ঊনপঞ্চাশজন মোড়লকে প্রতিনিধি রেখে হাজার হাজার রায়ত শান্তভাবে থানার প্রাঙ্গণ ছেড়ে চ'লে গেল। বেশ কিছুক্ষণ পরে কেষ্টদাস নামে এক মোড়ল অসহিষ্ণু হ'য়ে ব'ললে, সাহেব কই? আর কখন কতা কবে?

—এই এখুনি কথা হবে বাপ্!—ব'লেই চোখের একটা ইঙ্গিত ক'রলে প্রসন্ন দারোগা। মুহূর্তের ভেতর দেখা গেল, মোড়লদের চারপাশ ঘিরে বন্দুক উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে পনেরো-ষোলোজন সেপাই। চিৎকার ক'রে উঠলো প্রসন্ন দারোগা, শালা বেইমানের দল! যে-রাজা খেতে-প'রতে

দিচ্ছে, তাকেই কিনা চোখরাঙানি? নীল তোরা ক'রবি না? তোদের বাপে ক'রবে শালারা! হাবিলদার, সবক'টা বদমাশকে লক-আপে ঠেসে দাও! দেখি শালারা নীল না ক'রে যায় কোথায়!

পরম স্বস্তির হাসি ফুটে উঠলো স্কিনার সাহেবের মুখে। এতক্ষণ ভেতরে ব'সে তিনি কাঁপছিলেন। বেরিয়ে এসে অধীর আনন্দের উত্তেজনায় প্রসন্ন দারোগার পিঠে চাপড় মেরে ব'ললে, ওহ্, হোয়াট আ ক্লেভার পার্সন! ইউ ডিজার্ভ অ্যান এক্সেলেন্ট প্রমোশন!

॥ চব্বিশ ॥

কিশোরীচাঁদ ব'ললে, এত উত্তেজিত হওয়ার কী আছে হরিশ? এই এগারো আইনের মেয়াদ তো ছ'মাস।

—উত্তেজিত হওয়ার কারণ আছে কিশোরী! নীলচাষীদের বিক্ষোভ চেপে দেওয়ার জন্যে পিটার গ্র্যান্টের মতো লেফ্টেন্যান্ট গবর্নরকেও এক সন্ত্রাসের আইন জারি ক'রে আসরে নেমে প'ড়তে হ'য়েচে! তাই ভাব্‌চি, প্ল্যান্টারদের ক্ষমতার হাত কত দূর পর্যন্ত বিস্তৃত!

—ছ'মাসের ভেতর ওরা কতটা এগোতে পারে দ্যাখো!

—সারা দক্ষিণ বাঙলায় লাখ লাখ গরীব রায়তের ভিটেয় ঘুঘু চরিয়ে ছাড়তে ওদের কাছে ছ'মাস যথেষ্ট সময়!

—গ্র্যান্ট সাহেব তা ক'রতে দেবেন না ব'লেই মনে হয়। কমিশন বসানোর কথাও মনে হয় সেই কারণেই এই আইনে ঘোষণা করা হ'য়েচে!

—হ্যাঁ, সবই হ'য়েচে তবু আস্থা রাখা কঠিন!

—আমি কিন্তু কিছুটা আস্থা রাখার পক্ষপাতী। তোমারই মুখে শুনেচি, এই এগারো আইনের সাঁড়াশিটা আসলে কারা তৈরি ক'রেচে। আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও গ্র্যান্ট এবং স্কোন্স তাঁদের মূল বয়ানকে পাশ করাতে পারেননি। গ্র্যান্ট সাহেবকে বাধ্য হ'য়ে এই আইনের বয়ানে সই ক'রতে হ'য়েচে। তবু কমিশন বসানোর প্রস্তাবটা যে পীককের সমর্থকদল নাকচ ক'রে দেননি, এইটেই যা আশার কথা! হয়তো কমিশন ব'সলে অনেক রূঢ় সত্য প্রকাশ হ'য়ে প'ড়বে। তাতে যদি ছ'মাস পরে রায়তদের কিছু উপকার হয়!

হরিশ মৃদু হেসে ব'ললে, বিবি যতদিনে ডাগর হবে, মিঞার ততদিনে যে কবরে যাওয়ার সময় হবে হে!

—তোমার কি ধারণা কমিশন ব'সলেও কোনো প্রতিকার হবে না?

—কী হবে তা জানিনে! কমিশন কাদের নিয়ে হ'চ্ছে? সভাপতি মিস্টার সীটনকার—এইটুকু যা আশার কথা। এই ভদ্রলোক যে প্ল্যান্টারদের ওপর আন্তরিকভাবেই বিরক্ত, তা আমি জানি। কিন্তু অন্য সব সদস্য? সরকারি প্রতিনিধি হিসেবে থাকচেন মিস্টার টেম্পল্। তিনি বৃটিশ পুঁজির কথা মাথায় রেখে কতটা নিরপেক্ষ থাকতে পারবেন জানি না। প্ল্যান্টারদের প্রতিনিধি হিসেবে থাকচেন মিস্টার ফার্গুসনের মতো একটা পৈশাচিক চরিত্রের লোক। সেটা কিছু আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। আশ্চর্যের বিষয়, আমাদের দিশি জমিদারবাবুদের শখের মজলিশ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি মনোনীত হ'য়েচেন বাবু চন্দ্রমোহন চাটুজ্যে!

চন্দ্রমোহনের নাম উল্লেখ ক'রতেও ঘৃণায় বিকৃত হ'য়ে গেল হরিশের মুখ। কথার রেশ টেনেই সে ব'লতে লাগলো, এই ব্ল্যাক নিগারের দেশে জন্ম হ'য়েচে ব'লে যে জমিদারবাবু লজ্জায়, ঘেন্নায় প্রতি মুহূর্তে মরমে ম'রে যাচ্চেন, তিনি ক'রবেন এদেশবাসীর প্রতিনিধিত্ব! তাঁর মতো একজন স্বদেশবিদ্বেষীর কাছে আমরা কী প্রত্যাশা ক'রতে পারি কিশোরী? সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, যে রায়তদের ওপর অত্যাচার-অবিচারের তদন্ত করবার জন্যেই নাকি কমিশন দরকার হ'য়ে পড়লো, তাদেরই কোনো প্রতিনিধি নেই?

কিশোরীচাঁদ ব'ললে, শুনেচি, রেভারেণ্ড সেলকে প্রজাদের প্রতিনিধি হিসেবে মনোনীত করা হ'য়েচে।

হ্যাঁ, ঠিকই শুনেচো। তিনি নীলচাষ এলাকায় থাকেন, অনেক কিছুরই প্রত্যক্ষদর্শী। তবু তিনি তো সি-এম-এস মিশনারিদের প্রতিনিধি! তাঁর সততায় আমি সন্দেহ ক'রচিনে কিশোরী কিন্তু তবু মনে হয়, তাঁর জায়গায় রেভারেণ্ড লঙ কমিশনে থাকলে ভালো হত! তিনি আয়ার্ল্যাণ্ডের কৃষকদের চোখের জল দেখেচেন, রাশিয়ায় ভূমিদাসদের বিদ্রোহ দেখেছেন, এদেশেও সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। যাই হোক, দেখা যাক এই কমিশন কী করে!

—কমিশনের শুনানি তো আঠারোই মে থেকে শুরু হবে শুনচি! তুমি কিছু জানো?

—হ্যাঁ, তাই-ই। আমি একজন সাক্ষী হিসেবে হাজুরে দেওয়ার নোটিশ পেয়েচি।

—তোমাকে তো ডাকবেই!

—তার দ্বারা কতটুকু কাজ হবে জানিনে! যাক্‌গে, এখন যে যার কাজে মন দেওয়া যাক্‌!

হিন্দু পেট্রিয়ট অফিসে ব'সেই কথাবার্তা হ'চ্ছে। কিছুদিন আগে থেকে কিশোরীচাঁদের ইণ্ডিয়ান ফীল্ড পত্রিকা হিন্দু পেট্রিয়টের ছাপাখানাতেই ছাপা হচ্ছে। পত্রিকা মোটামুটি ভালো চললেও তার ছাপাখানা ক্যালকাটা প্রিণ্টিং অ্যাণ্ড পাবলিশিং কোম্পানি রীতিমতো লোকসানে চলছিল। সেই অবস্থায় ছাপাখানার পাঁচজন মালিক আমেরিকান মিস্টার আপ্‌কার, বাঙালী জমিদার রমানাথ ঠাকুর, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ এবং ব্রিটিশ ব্যবসায়ী জর্জ শ্যালো আর চার্ল্‌স্‌ পিফার্ড ছাপাখানা বিক্রি ক'রে দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন। হরিশের পরামর্শে ইণ্ডিয়ান ফীল্ড পত্রিকার স্বত্ব কিনে নিলে কিশোরীচাঁদ। তখন থেকেই এই ব্যবস্থা চ'লছে। দুটো পত্রিকার প্রকাশের দিন বদল ক'রতে হ'য়েছে।

প্রুফ দেখতে দেখতে হঠাৎ চোখ তুলে কিশোরীচাঁদ ব'ললে, ভালো কথা হরিশ, ক'দিন আগে কালীপ্রসন্ন এসেছিল। তার মহাভারতের প্রথম খণ্ডটা ছেপে বেরিয়েছে তাই দিয়ে গেল। শুনলুম তোমাকেও তো দিয়ে গেচে। প'ড়েচ?

—এ'ক'দিন বড়ো ব্যস্ত ছিলুম, পড়া হয়নি।

—জলদি প'ড়ে ফেলো হে! নইলে ও-বেচারা মনে বড়ো কষ্ট পাবে! বড়ো গুণী ছেলে! তোমাকে খুবই ভক্তি করে।

—সে তো বুঝলুম কিন্তু জমিদারনন্দন হিসেবে একেবারেই অপদার্থ! কোথায় তেজারতি কারবার ক'রবে, অসহায়ের সম্পত্তি হাতাবে, দিনে শিক্ষে-সংস্কৃতি-ধর্মের ওপর কড়া লেক্‌চর্‌ মেরে রাতে বাগানে গিয়ে বাইনাচের মাইফেলে গড়াগড়ি দেবে—তা না ক'রে শিক্ষে নিয়েই উঠে-প'ড়ে লেগেচে! আরে বাবা, বরানগরের মত চমৎকার বাগানবাড়িটায় গোটাকতক মেয়েছেলে না রেখে কেন ওটার নাম দিতে গেলি সরস্বতাশ্রম? দেশে কি ইহুদি, আর্মানি রূপসী মেয়েলোকের এতই আকাল যে, তোর রক্ষিতা হ'য়ে থাকার মতো একটাও জুটলো না? বুঝলে কিশোরী, ও অপদার্থের দ্বারা কিচ্ছু হবে না!

ইঙ্গিতটা স্পষ্টভাবেই বুঝতে পারলো কিশোরীচাঁদ। কিন্তু ইচ্ছে ক'রেই প্রসঙ্গান্তরে চ'লে যাওয়ার জন্যে ব'ললে, নীলচাষ-এলেকা থেকে রোজই তো তোমার কাছে কিছু না কিছু চাষী-রায়ত আসচে। তাদের জন্যে মোক্তারের ব্যবস্থা কিছু ক'রতে পেরেচ?

—ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন মারফৎ?

—হ্যাঁ। আমি তো আমার পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে দিয়েচিলুম। বড়দাদা, রামগোপালদাদা—সবাই এ-ব্যাপারে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েচেন।

মুচ্‌কি হেসে হরিশ ব'ললে, জানি। কিন্তু পূর্ণ অসমর্থন জানিয়ে আড়াল থেকে যে

জমিদারবৃন্দ কলকাঠি নাড়ছেন, তাঁদের সংখ্যা এবং প্রতাপ তোমাদের মতো অ-জমিদারদের চেয়ে অনেক বেশি, কিশোরী! অ্যাসোসিয়েশন কিছুতেই তা হ'তে দেবে না। আমারও জেদ, মোক্তার আমি নিজের চেষ্টায় জোগাড় ক'রবোই!

॥ পঁচিশ ॥

হুরমুত্ বাহার! —মানহানি!

আলিপুর আদালতের সাবজজ অর্থাৎ সদর আমিন বাবু তারকনাথ সেনের এজলাশ থেকে হরিশের কাছে একখানা সমন এলো।

নদীয়া জেলার অন্তর্গত কাচিকাটা কুঠির নীলকর মিস্টার আর্চিবল্ড হিল্স্ মামলার বাদীপক্ষ। বিবাদী সাপ্তাহিক হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদক বাবু হরিশচন্দ্র মুখার্জি। আর্চিবল্ড হিল্সের মতো একজন সম্ভ্রান্ত, সচ্চরিত্র ভদ্রলোকের নামে নারীহরণ এবং ধর্ষণের একটা মনগড়া কাহিনী ছেপে বাবু হরিশচন্দ্র মুখার্জি আবেদনকারীর সামাজিক ও ব্যক্তিগত সম্ভ্রমের চূড়ান্ত হানি ঘটিয়েছেন। এ-অভিযোগ প্রথমে সুপ্রীম কোর্টে দায়ের করা হ'য়েছিল। কিন্তু বিবাদী হরিশচন্দ্র মুখার্জির বাসস্থান এবং হিন্দু পেট্রিয়ট অফিস জেলা চব্বিশ পরগনার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এক্তিয়ারের আইনগত বৈধতায় মামলাটি চব্বিশ পরগনার জেলা সদর আলিপুরের আদালতে স্থানান্তরিত হয়েছে। বাদী মিস্টার আর্চিবল্ড হিল্স্ তাঁর মানহানির জন্যে দশহাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি ক'রেছেন।

শম্ভুচাঁদ আপনমনে কাজ ক'রছে। হরিশ হাসতে হাসতে ব'ললে, ওহে শম্ভু, এইবার যে শিয়রে শমন! ব্যারিস্টার মিস্টার মন্ট্রিও অবিশ্যি আগেই আমাকে ব'লেছিলেন, মামলা আলিপুর কোর্টেই আসবে। তোমাকে বোধহয় ব'লেছি, তিনিই আমার কৌন্সিল হিসেবে দাঁড়াবেন?

—হ্যাঁ, দাদা।

—আচ্ছা শম্ভু, সম্ভ্রান্ত, চরিত্রবান ভদ্রলোক আর্চিবল্ড হিল্সের নামে আমার মনগড়া আষাঢ়ে গপ্পোটা তেসরা মার্চ তারিখের পেট্রিয়টে ছাপা হ'য়েছিল না?

শম্ভুচাঁদ ফাইল দেখে ব'ললে, হ্যাঁ।

—সত্যিই কোম্পানির আইন একেবারে সলোমনের আইনের মতোই নিরপেক্ষ, পবিত্র! হতভাগিনী মেয়েটিকে জবরদস্তি ক'রে কুঠিতে নিয়ে গিয়ে সেই নিষ্পাপ ফুলটিকে দ'লে-মুচড়ে-থেঁৎলে এই সম্ভ্রান্ত, সচ্চরিত্র ভদ্রলোক তার নারীত্বের গৌরব নষ্ট ক'রেচেন ফেব্রুয়ারি মাসের বারো তারিখে। মেয়েটিকে নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার হার্শেলের এজলাশে নিয়ে যাওয়া হয় মার্চ মাসের দশ তারিখে। তিনি এপ্রিল মাসের পাঁচ তারিখে মামলা ডিস্মিস্ করেন। সেই তারিখ পর্যন্ত কেস ছিল সাবজুডিস। অথচ কোম্পানির পবিত্র আইনে তার আগেই হরিশ মুকুজ্যের নামে মানহানির মামলা ঠুকে দিতে হিল্সের কোনো অসুবিধে হ'ল না!

হরিশ হাসতে লাগলো।

হারাণও একপাশে তার টেবিলে ব'সে হিসেব মেলাচ্ছিল। আদালতের সমন শুনেই হারাণের বুক ঢিপ্ ঢিপ্ ক'রছে। তার ওপর হরিশের নির্বিকার হাসি দেখে উষ্মার সঙ্গে সে ব'ললে, তুই হাস্চিস? দশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া কি সোজা কথা? ভিটেমাটি বিকিয়ে যাবে!

হরিশ হাসতে হাসতেই ব'ললে, মিছেমিছি ভাব্চ কেন দাদা? ক্ষতি হ'লে তো ক্ষতিপূরণ? সাক্ষী-প্রমাণ দরকারের চেয়ে বেশিই আচে! তাছাড়া মিস্টার মন্ট্রিও জেরায় জেরায় ওকে এমন জেরবার ক'রে দেবেন যে নিজেই হয়তো সবকিছু কবুল ক'রে ব'সবে! জানো শম্ভু, আমার এই ভেবেই আনন্দ হ'চ্চে যে, তীরটা গিয়ে চাঁদমারির ঠিক মাঝখানেই গেঁথেচে! প্ল্যান্টার মহাপুরুষেরা এতদিনে নেটিব নিগারদের একটা গ্রাহ্যের মধ্যে আনতে বাধ্য হ'য়েচে!

এর দ্বারা নেটিবদের যে কিভাবে গ্রাহ্যের ভেতর আনা হ'ল, হারাণের মাথায় তা ঢুকলো না। আরো বিরক্ত হ'য়ে সে মেশিনঘরে চ'লে গেল।

—কী রকম মনে হচ্ছে হে শম্ভু? নীলকর নাটক এবারে তাহ'লে বেশ দই-জমা জ'মে উঠতে চ'লেচে, কি বলো?—উচ্ছ্বসিত কৌতুকের সুরে ব'ললে হরিশ।

শম্ভুচাঁদ কিন্তু একটু গম্ভীরমুখেই ব'ললে, তা হয়তো জ'মচে দাদা, কিন্তু মামলায় আমাদের হার যে অবধারিত, তা তো আপনিও বুঝতে পারচেন! চীফ জাস্টিস পীকক সায়েব পর্যন্ত যেভাবে নির্লজ্জের মতো নীলকরদের পক্ষ নিয়েচেন তাতে কোর্টের কোন্ জজ নীলকরের বিপক্ষে রায় দেবার সাহস পাবে বলুন?

—দেখা যাক না, কোথাকার জল কোথায় গে দাঁড়ায়! সমন দেরাজে ভ'রে রেখেচি, ওখানেই থাক্। আদালতে যেদিন যাওয়ার এত্তেলা হ'য়েচে সেদিন যাবো। তুমি এক কাজ করো দিকি! আজকের কাগজ থেকে সেদিনকার সেই লেখাটা একবার প'ড়ে যাও তো, চোখ বুজে শুনি। অনেকদিন পর সেদিন অমন চমৎকার কনিয়াকের বোতল সামনে পেতেই মাত্রাটা একটু বেশি হ'য়ে গিয়েচিল। কনিয়াকের ঝোঁকে লিখেচি, তারপর একবার প'ড়ে দেখাও হয়নি! তুমি তো প্রুফ দেখার সময় প'ড়েচো। কোনো বেচাল কথা লিখে ফেলিনি তো?

—বেচাল!—অপরিসীম শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে হরিশের দিকে তাকিয়ে শম্ভুচাঁদ ব'ললে, আপনার কলমের ডগায় কোনো বেচাল কথা কেমন ক'রে আসবে দাদা? প্রুফ দেখতে দেখতে আমি কেবল ভাবচিলুম এই লেখার একটা বাঙলা তর্জমা ক'রে যদি নীল-এলাকায় ছড়িয়ে দেওয়া যায় তাহ'লে রায়তেরা অসাধারণ প্রেরণা পাবে!

—বটে! কী ব'লচো হে? এত জোরদার লিখে ফেলেচি? থ্যাঙ্কস্ টু ফ্রেণ্ড কনিয়াক! নাও, পড়ো দিকি, শুনি!

শম্ভুচাঁদের টেবিলে হাতের কাছেই সদ্যপ্রকাশিত পেট্রিয়ট ছিল। সে কাগজ খুলে পড়তে শুরু ক'রলে,—"বাঙলাদেশ তার কৃষকদের জন্যে অবশ্যই গৌরব অনুভব ক'রতে পারে। নীল আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার পর থেকে এই বাঙলাদেশের রায়তেরা যে অসামান্য নৈতিক শক্তির স্পষ্ট পরিচয় দিয়েছে, এখন পর্যন্ত তা পৃথিবীর আর কোনো দেশের কৃষকদের ক্ষেত্রে দেখা যায়নি। এইসব দরিদ্র কৃষকদের রাজনৈতিক জ্ঞান এবং ক্ষমতা নেই। তা সত্ত্বেও প্রায় নেতৃত্বশূন্য অবস্থায় এই নিঃস্ব কৃষকসমাজ এমন একটা বিপ্লব ঘটাতে সমর্থ হ'য়েছে, যা গুরুত্বে এবং মহত্ত্বে পৃথিবীর যে কোনো দেশের উল্লেখযোগ্য সামাজিক বিপ্লবের তুলনায় কোনোক্রমেই নিকৃষ্ট নয়। এমন একটা শক্তির বিরুদ্ধে তাদের লড়তে হ'য়েছে, যার হাতে রয়েছে দুর্ধর্ষ ক্ষমতার সমস্ত উপকরণ। সরকার তাদের বিপক্ষে, সংবাদপত্রগুলি তাদের বিপক্ষে, আইন-আদালত সমস্তই তাদের বিপক্ষে। এতগুলি প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে যে সাফল্য তারা অর্জন ক'রেছে, তার সুফল দেশের সমস্ত শ্রেণীর মানুষ এবং দেশের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা উপভোগ ক'রতে পারবে। এরই ভেতর শক্তিমদমত্ত উৎপীড়নকারীর দল বুঝতে পেরেছে যে তাদের যথেচ্ছাচারের অবসান হ'তে চ'লেছে। এই নীল বিপ্লবের জন্যে রায়তগণকে অবর্ণনীয় দুঃখের বোঝা মাথায় নিতে হয়েছে। নির্মম দৈহিক নির্যাতন, অপমান, গৃহচ্যুতি, সম্পত্তিনাশ—সব কিছুই তাদের সহ্য ক'রতে হ'য়েছে। গ্রামের পর গ্রাম আগুনে পুড়ে পরিণত হ'য়েছে ভস্মস্তূপে, পুরুষদের ধ'রে নিয়ে গিয়ে কয়েদ করা হ'য়েছে, কৃষক নারীদের ওপর নির্বিচারে করা হ'য়েছে পাশবিক অত্যাচার। কৃষকদের সামান্য সঞ্চয়ের ধানের গোলাগুলোও নীলকরের আক্রোশের আগুন থেকে রেহাই পায়নি। সমস্ত রকম নৃশংস আচরণই রায়তদের ওপর করা হ'য়েছে তবু কিন্তু তারা নীলকরের কাছে মাথা নত করেনি। যদি এই বীর কৃষকেরা আরো কিছুদিন এইভাবে নির্যাতন সহ্য ক'রেও সঙ্কল্পে দৃঢ় থাকতে পারে, তাহ'লে তাদের সামাজিক অবস্থায় এমন এক তাৎপর্যপূর্ণ বিপ্লব সফল হবে, যার প্রভাব দেশের সর্বস্তরে অনিবার্য প্রভাব বিস্তার ক'রবে।"

পড়া শেষ ক'রে মুখ তুলে তাকালে শম্ভু। হরিশ তখনো চোখ বুজে ব'সে আছে। গড়গড়ার সট্‌কা হাতে ধরা রয়েছে বটে, কিন্তু টানছে না।

কিছুক্ষণ পরে চোখ খুলে তাকালে হরিশ। কেমন একটা আত্মবিভোর স্বরে ব'ললে, আমার গভীর বিশ্বাস থেকেই এ-কথা আমি লিখেচি শম্ভু! তোমার কী মনে হয়, আমার ধারণা ভুল হ'য়ে যাবে?

শম্ভুচাঁদ ব'ললে, যে গভীর দৃষ্টি দিয়ে নীলচাষীদের বিপ্লবকে আপনি দেখেছেন দাদা, সে-দৃষ্টি বা অনুভূতির অধিকারী আমি হইনি। আমার সামান্য বুদ্ধি দিয়ে কেবল এইটুকুই বুঝতে পেরেচি যে, তাদের এতবড়ো একটা সংঘবদ্ধ সংগ্রাম যদি বিফল হয় তাহ'লে ধ'রে নিতে হবে যে ইতিহাসের দেবতা আমাদের দেশের ওপর বড়ো বেশি বিরূপ!

স্মিত হেসে শম্ভুচাঁদের দিকে তাকালে হরিশ। ব'ললে, রায়তেরা তাঁকে বিরূপ থাকতে দেবে না! ওরা তো আমাদের মতো শহুরে বাবু নয়? ভাগ্যকে মানতে মানতে হয়রাণ হ'য়ে এবার ওরা দুর্ভাগ্যের শেষ সীমানাটা একবার চোখে দেখার জন্যে পথে নেমে প'ড়েচে। এ জেদ যে কত বড়ো জেদ, এ যে কতখানি বেপরোয়া—লারমুর, ফরলঙ্, হিল্‌স্, মায়ার্শ বা কেনির দল এখনো তা ঠিক ঠাহর ক'রতে পারেনি! কিন্তু মালুম ওদের ক'রতেই হবে!

কয়েকমুহূর্ত নীরবে কাট্‌লো। সট্‌কায় কয়েকটা টান দিয়ে হরিশ ব'ললে, এত ভালো বিষ্টুপুরী তামাক, তা-ও যেন মুখে কেমন বিস্বাদ লাগচে। এই হতচ্ছাড়া জ্বরকে নিয়ে কী ঝঞ্ঝাটেই যে প'ড়েচি! প্রায় রোজই একটু জ্বর হচ্চে তো হচ্চেই!

—আপনাকে কতবার বললুম, একবার ডাক্তার দেখান!

—সময় কোথায়? দেখতেই তো পাচ্চ, কী অবস্থা চ'লচে। কালকে সন্ধ্যেবেলায় কেষ্টনগরের ওদিক থেকে যারা এয়েচে তাদের সবায়ের সঙ্গে কথা এখনো শেষ হয়নি। বাড়িতে ফিরে গে' তাদের সঙ্গে বসতে হবে।

পনেরো জনের একটা দল আগের দিন এসেছে। আসাননগরের মেঘাই সর্দার আর বেতাইয়ের ইসুব বিশ্বাস তাদের পাঠিয়েছে। আজ কয়েকমাস ধ'রেই নীচের বৈঠকখানা ঘরটা পরিণত হ'য়েছে অতিথিশালায়। রায়তেরা এসে সেই ঘরেই থাকে। একপ্রস্থ বেশ বড়ো বড়ো হাঁড়ি, কড়া, গামলা, ডেকচি কিনতে হয়েছে।

রুক্মিণী ব'লেচিলেন, বাড়িতে তুই কি পাকাপোক্ত অন্নছত্তর বসিয়ে দিলি বাবা?

মায়ের কথার উত্তরে হরিশ ব'লেছিল, ওরা কত বড়ো বিপদে প'ড়ে একটু সুরাহার আশা নিয়ে এতদূরে আমার কাছে ছুটে আসচে মা! ওদের জন্যে সামান্য দু'টো ডাল-ভাতের বন্দোবস্ত না ক'রলে তোমার ঘরের অকল্যাণ হবে না, বলো?

গেরস্তের অকল্যাণ!

হ্যাঁ, যাকে অতিথি ব'লে বাড়িতে জায়গা দেওয়া হ'য়েছে, সে অভুক্ত থাকলে গৃহস্থের অকল্যাণ হয় বৈকি! এমন মোক্ষম জায়গায় হরিশ ঘা দিয়েছে যে, আর আপত্তি করবার উপায় থাকেনি রুক্মিণীর। তা সত্ত্বেও তাঁর মনে আর একটা আপত্তির কারণ ছিল।

—হ্যাঁ রে, যারা আসে তারা সবাই কি হিঁদু?

—না মা। হিঁদুই বেশি তবে মোচলমান, ক্রীশ্চানও থাকে।

—ওমা, পাগলের মতো কী ব'লচিস তুই? গাঁয়ের চাষা-ভুষো আবার কেরেস্তান হ'তে যাবে কেন?

—হ'য়েচে মা! কেউ পেটের দায়ে, কেউ হিঁদু সমাজের ঘেন্না সইতে না পেরে ক্রীশ্চান হ'য়েচে।

—কী কাণ্ড! তাদের পরেও ওই নীলকর গোরা মিন্‌সেগুলো অত্যেচার করে?

—না ক'রলে তারা বিপদে প'ড়বে কেন? সে যাই হোক, হে'সেলে রান্নার অনুমতিটা তুমি দাও,

ওদের পরিবেশন ক'রে খাওয়ানোর কাজটা আমিই ক'রবো। তোমার বেহ্ম ছেলেকে যখন মানিয়ে নিয়েচো তখন ওই অভাগা মানুষগুলোকেও তোমার সন্তান ভেবে মানিয়ে নিও মা!

রুক্মিণী মানিয়ে নিয়েচেন। তার চেয়েও বেশি আশ্চর্যের কথা, হরিশ কিছু বলবার আগেই এগিয়ে এসেছে ছোটোবৌ। হরিশকে সে নিজেই ব'লেছিল, তোমার যদি আপত্তি না থাকে তবে আমাকে বলো কী ক'ত্তে হবে, আমি তাই ক'রবো।

প্রগাঢ় আবেগে হরিশ ব'লেছিল, ওরা এ-বাড়ির অতিথি। ওরা যে যখন দু'একবেলা থাকবে তখন তৃপ্তিতে দু'টো পেট ভ'রে যাতে খেতে পারে সেইটুকু দেখলেই তোমার সবই করা হবে ছোটোবৌ!

দিনে রান্নার চাপ বেশি থাকলে রুক্মিণী হাত লাগান, হাত লাগায় মাধুরী। রাতে চাপ বেশি না থাকলে বড়োবৌ আর ছোটোবৌ সাম্‌লে নেয়। চাপ বেশি থাকলে মাধুরীও এগিয়ে আসে। রান্না হ'য়ে যাওয়ার পর স্নান ক'রে নেয়।

একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিল হরিশ। মেশিনঘরে কী একটা জিনিস প'ড়ে যাওয়ার শব্দ হ'তেই তার চমক ভাঙলো। শম্ভুচাঁদের দিকে তাকিয়ে ব'ললে, মহাপুরুষ কেনির কথায় একটা কথা মনে প'ড়ে গেল হে! যশোর থেকে শিশির মানে এম. এল. জি'র আর কোনো চিঠিপত্তর এয়েচে?

—হ্যাঁ।—অপরাধীর মতো মুখ নীচু ক'রে শম্ভুচাঁদ ব'ললে, নীলকর কেনি, জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট স্কিনার আর এক দারোগার কীর্তি নিয়ে বেশ বড়োসড়ো আর একখানা চিঠি এয়েচে দাদা। কিন্তু এর আগের সংখ্যা পেট্রিয়টে আমারই প্রুফ দেখার ভুলে যে বিশ্রী ব্যাপারটা ঘ'টে গেচে, সেটা কীভাবে শুধ্‌রে নেবো তা বুঝতে পারচি নে!

—কোন্ ভুল বলোতো?

—উনি সংক্ষেপে সই দিয়েচিলেন এম. এল. জি—

—হ্যাঁ, মন্মথলাল ঘোষ।

—কিন্তু আমার ভুলে ছাপা হ'য়ে গেচে এম. এল. এল।

—তাই নাকি? আমি তো খেয়াল করিনি! ভুল যখন হ'য়ে গেচে তখন ওইটেই চালিয়ে যাও। শিশিরের আর একটা নাম মন্মথলাল, সেটা প্রথম চিঠিতেই সে জানিয়েচিল। মনে হচ্চে, তোমার ভুলটা শাপে বর হ'তে পারে। ও ছেলেটা যেভাবে নীলকরদের বিরুদ্ধে উঠে-প'ড়ে লেগেচে, তায় আবার হরিশ মুখুজ্যের খাতায় নাম লিখিয়ে ব'সে আচে, তাতে বিপদ ওর আসন্ন! সুতরাং ওই এম. এল. এল-এর আড়ালে ওকে যতদিন গোপন রাখতে পারা যায়, ততদিনই ভালো। ও তো আর নামের জন্যে লিখচে না! সুতরাং নাম-বিভ্রাট নিয়ে আশা করি কিছু মনে ক'রবে না।

আশ্বস্ত হ'ল শম্ভুচাঁদ। হেসে ব'ললে, সমস্যার সমাধান ক'রে আমাকে বাঁচালেন দাদা!

হরিশও হাসতে হাসতে ব'ললে, সমস্যা তো সবে শুরু হ'ল হে! নাটকের এখনো অনেক বাকি!

উঠে পড়লো হরিশ। নদীয়া থেকে আসা রায়তদের সঙ্গে কথাবার্তা এখনো বাকি। ওদের সমস্যার জটগুলো আজ রাতের ভেতরেই খুলে ফেলতে হবে। কাল হয়তো আসবে নতুন দল।

॥ ছাব্বিশ ॥

কলমিদামে ছাওয়া মজা পুকুরটায় মনের আনন্দে পোকা খুঁটে খেয়ে বেড়াচ্ছে কয়েকটা ডাহুক পাখি। কি নিশ্চিন্ত জীবন ওদের! দাদন নেওয়ার বালাই নেই, নীল বোনার দায় নেই, ইজ্জতহানির ভয় নেই—ইচ্ছে খুশি মতো চ'রে বেড়ায়।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কলমিশাক তুলতে লাগলো অহল্যা।

আজ মাসছয়েক হ'ল কুমারখালির হরিনাথ মাস্টারের আশ্রয় থেকে আসাননগরের মেয়ে সে আসাননগরেই ফিরে এসেছে। দলবল নিয়ে কুমারখালি গিয়ে হরিনাথের সম্মতি নিয়ে গাঁয়ের মেয়েটাকে গাঁয়ে ফিরিয়ে এনেছিল এ-অঞ্চলের দুর্ধর্ষ বিদ্রোহী চাষী মেঘাই সর্দার। ব'লতেই বাপের বাড়ি কিন্তু বাড়ি কোথায়? অহল্যাকে নিজের বাড়িতেই আশ্রয় দিয়েছিল মেঘাই। তার স্ত্রী যুগলমণি ব'ললে, চোকির জল আর ফেলা চলবে না রে বুন! মন শক্ত কর্, কাঠ হ'য়ে যা!

অনেকবার চেষ্টা ক'রেও কুঠিয়ালরা আসাননগরে হামলা ক'রতে পারেনি। গোরাপল্টন এসে যাওয়ায় তাদের সাহস অনেকটা বেড়েছিল। বিশ্বনাথ নামে এক বেপরোয়া বিদ্রোহী চাষীকে এনে কিছুদিন আগে তারা আসাননগরের এক চৌমাথায় গাছে ঝুলিয়ে ফাঁসি দিয়েছিল। কিন্তু মেঘাই সর্দারকে বাগে আনতে পারেনি। মাসখানেক আগে সে-সুযোগ তাদের হাতে এলো। মেঘাইকে গ্রামপ্রান্তে একা পেয়েছিল গোরাপল্টন। তাদের সঙ্গে নীলকর জেম্‌স্ সাহেব। এতবড়ো সুযোগ সে নষ্ট করেনি। লেঠেলদের অতর্কিত লাঠির ঘায়ে মাটিতে লুটিয়ে প'ড়লো মেঘাই। তার অচেতন দেহটাকে সেই চৌমাথার ওপরই গাছে ঝুলিয়ে ফাঁসি দিলে গোরাপল্টন।

মেঘাই সর্দারকে হারিয়ে আসাননগরের মানুষ দিশেহারা হ'য়ে গেছে। নেতা কোথায়? এই কঠিন সময়ে কে দেবে নেতৃত্ব?

খুব বেশি দিনের কথা তো নয়? সেই সময়ের কথা ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্কভাবে কলমিশাক তুলছে অহল্যা। কাছেই কোথায় যেন একটা কাঠ্‌ঠোকরা মহোৎসাহে একটা গাছে কোটর তৈরি করবার জন্যে ঠোক্কর দিয়ে চ'লেছে। শরতের পড়ন্ত বেলায় ভেসে আসছে তার শব্দ ঠক্ ঠক্—ঠক্ ঠক্—

গোরাপল্টনের হাতে মেঘাইয়ের ফাঁসির খবর পেয়ে সেদিন হঠাৎ ডুক্‌রে কেঁদে উঠেছিল যুগলমণি। কিন্তু সে-কান্নার মেয়াদ ছিল মাত্র কয়েক মিনিট। তারপরই আটাশ বছর বয়সের সদ্য বিধবা যুবতী স্তব্ধ গম্ভীর চোখে আকাশের দিকে একবার তাকিয়ে চোখের জল মুছে নিয়ে সামনের দিকে তাকালো। উঠোনে মেয়ে-পুরুষ বেশ কিছু লোক জড়ো হ'য়েছে তখন। তাদের সবায়ের দিকে তাকিয়ে ব'ললে, কত মেয়ের ভাই-ভাতার গিয়েচে, আমার ভাতারও এবার চ'লে গেলেন! কিন্তুক যে কাজের দায় সিনি নিয়েছেন, সে-কাজ অ্যাকন তাবাদি ফুরোয় নাই! এবার কাজের দায়িক্ কেডা নেবা, কও!

প্রৌঢ় জলধর ব'ললে, আর বোধ হয় ভাবনা কত্তি হবে না রে মা! গরমেন্ট নীলির দরুণ যে কোমেট বসায়েচে, সেনারা গোয়াড়ি এয়েলো। জ্যালখানায় গে' এস্তক রেয়েদের সাক্কিসাবুদ নেচে। এবার মনে হয় নীলির—

জলধরকে কথা শেষ ক'রতে না দিয়েই চিৎকার ক'রে উঠলো যুগলমণি, রাকো তোমার কোমেট! নালমুকো গোরাদের কোমেট আমাদের কোন্ উব্‌গার করবে শুনি? ফিরোয়ে দীতি পারবে আমাদের বাপ-ভাই-ভাতার-ছাবালদেরে? পারবে না! অ্যাদ্দিন ধ'রে যত অন্ত ঝ'রেচে তা দুনো ক'রে আদায় কত্তি হবে! তোমরা না পারো, মুই এগোয়ে যাবো! ম্যাঘাই সন্দারের পরিবার মুই! পরাণের ডর মোর নাই—

—তুই মেয়েছেলে, তুই কী ক'রবি?

—মুই কী ক'রবো? দেক্‌তি চাও, মুই কী কত্তি পারি?

অহল্যাও উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছিল। চিৎকার ক'রে উঠলো, মেয়েছেলেরা কিচু করে নাই? নেটেলা যকন আসে তকন রোলা ছোঁড়ে কারা? কাঁচা ব্যাল ছুঁড়ে নেটেলাগুলোর মাথা ফাটায় কারা? মা দুগ্গা কোন্ জাত—মন্দা না মেয়ে? অসুর নিদন করে নাই সিনি?

জলধর এবং অন্যান্যেরা আর কথা বাড়ায়নি। মেঘাই সর্দারের অসমাপ্ত কাজের দায়িত্ব ব'লতে গেলে সেদিন থেকেই নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে যুগলমণি। তার সর্বক্ষণের সঙ্গিনী অহল্যা।

হাঁটুজলে নেমে কল্‌মির ডগাগুলো তুলে কোঁচড়ে রাখছিল অহল্যা। হঠাৎ পাঁকের ভেতর পায়ে যেন কী বিঁধলো। পা তুলে দেখলো, বুড়ো আঙুলের তলায় লেগে-থাকা পাঁকের আস্তরণের ভেতর থেকে রক্ত গড়াচ্ছে। পচা শামুক? উপুড় হ'য়ে ঝুঁকে প'ড়ে জায়গাটা হাতড়াতে লাগলো অহল্যা। কী যেন একটা শক্ত মতো জিনিস তার হাতে ঠেকলো। সন্তর্পণে জিনিসটাকে আস্তে আস্তে জলের ওপর তুলতেই বিস্ময়ে তার চোখ দু'টো বড়ো বড়ো হ'য়ে গেল।

একখানা তরোয়াল!

—তেরোনাল!—আপনমনেই বিড়বিড় ক'রে ব'ললে অহল্যা। একটা অপরিসীম উত্তেজনায় কাঁপতে লাগলো তার সারা দেহ। সে গ্রামে ফিরে আসার কিছুদিন আগে কুঠিয়াল জেম্‌স্‌ সাহেবের লেঠেলদের সঙ্গে মেঘাই সর্দারের একটা সংঘর্ষ হ'য়েছিল। পাঁচজন লেঠেল খুন হ'য়েছিল, তা শুনেছে অহল্যা। এ নিশ্চয়ই তাদেরই কারো হাতের তরোয়াল!

আর কলমিশাক তোলা হ'ল না। কাদা-মাখা তরোয়ালখানা নিয়ে সে পুকুর থেকে উঠে বাড়ির দিকে ছুটলো। সারাদিন ঘুরে আসার পর যুগলমণি তখন একটা ঘটি থেকে গলায় ঢেলে ঢক্‌ঢক্‌ ক'রে জল খাচ্ছিল। জল খেয়ে কাদামাখা তরোয়ালখানা হাতে তুলে নিতেই কী এক অদ্ভুত উন্মাদনায় তার চোখদু'টো চক্‌চক্‌ ক'রতে লাগলো। বেশ কিছুক্ষণ তরোয়ালখানাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে দিশেহারা উত্তেজনায় সে ব'ললে, বড়ো ভালো জিনিস পেইচিস রে বুন! এডা তোলা থাক্‌। কুটেল শালার এই তেরোনালে যেদিন ওরই ছাতি ফুটো করবো সেই দিন আমার শান্তি! ওই শালা তোর দাদারে ধরায়ে দিয়েলো, ফাঁসি দিয়েলো! ওর কল্‌জের অক্তে যিদিন চান্‌ করবো সিদিন আমার মানসিক পুণ্ণ হবে!

মেঘাই সর্দারের ফাঁসির আগে থেকে এ-পর্যন্ত অনেক ঘটনা-ই ঘ'টেছে। সরকারের নীল কমিশনের সদস্যেরা কৃষ্ণনগরে এসেছিলেন। সব মিলিয়ে প্রায় দেড়শো মানুষের সাক্ষী নথীভুক্ত হ'য়েছে। তার ভেতর রায়ত ছিল সাতাত্তর জন। নীলকরদের দায়ের করা মিথ্যে ফৌজদারি মামলায় কয়েদ খেটে ম'রছে তবু কমিশনের সাহেবদের সামনে বিন্দুমাত্র ভয় পায়নি। পাঞ্জু মোল্লার সাফ জবাব, মোরে গুলি ক'র্যে মারো সেও বি আচ্ছা, কিন্তু নীল আমি বোনবো না! দীনু ম'ডলেরও একই রকম উত্তর, গলা কেটি চিতেয় তুল্যে দ্যাও তেউ নীল আর করবো না! জামির ম'ণ্ডল স্পষ্ট ব'লেছে, ছাড়া ঝেদি পাই তো মুই অ্যামন দ্যাশে চ'লে যাবো, ঝে দ্যাশে নীল ককনো কেউ চোকি দ্যাকে নাই।

রায়তেরা যে এমন কথাই ব'লবে তাতে আর আশ্চর্য কী? কিন্তু শাদা চামড়া সাহেবদেরও কেউ কেউ নীলকরদের সম্বন্ধে এমন কথা ব'লেছেন যা চাষীদেরও হতবাক্‌ ক'রে দিয়েছে। আটজন পাদরির সাক্ষী দিয়েছেন। তাঁদের সব ক'জনেরই বক্তব্য নীলকরদের বিরুদ্ধে গেছে। যে ইডেন সাহেব রোব্‌কারি পরোয়ানা জারি ক'রে একদিন চাষীদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি গাদা গাদা নথীপত্র হাজির ক'রে প্রমাণ দেখিয়ে দিয়েছেন—ধান, তামাক কিম্বা অন্য ফসলের চাষ থেকে বঞ্চিত ক'রে সারাবছর নীলকরেরা কিভাবে চাষীদের ঠকায় আর নিজেরা লাখ লাখ টাকা মুনাফা করে। তাদের মুনাফার সব টাকাই চাষীর ঘাম আর চোখের জল ঝরানো টাকা। সমস্ত রকম হিসেব দেখিয়ে ইডেন সাহেব নাকি কড়া ভাষায় ব'লছেন, নীলচাষে গুরুতর লোকসান দিতে হবে জেনেও চাষীরা স্বেচ্ছায় নীলচাষ করে—এ-কথা কোনো ক্রমেই বিশ্বাসযোগ্য নয়! প্রকৃতপক্ষে নীলচাষের ব্যাপারে গরীব চাষীদের ওপর যে ভয়ঙ্কর ধরনের জবরদস্তি হয় যার তুলনা নেই।

ফরিদপুরের হাকিম ছিলেন দেলাতুর সাহেব। তিনি স্পষ্ট ব'লেছেন, এদেশ থেকে এমন এক বাক্স নীলও ইংল্যাণ্ডে পৌঁছয় না, যা কিনা গরীব চাষীর রক্তে রঞ্জিত নয়।

নীল কমিশনের রায় বেরিয়ে গেছে।

কিন্তু এত কাণ্ডের পরেও অত্যাচারের প্রতিকার কোথায়? নদীয়া জেলার বড়ো হাকিম হার্শেল সাহেবের কাজে সাহায্য করবার জন্যে মহকুমা ভাগ ক'রে আরো চার-পাঁচজন ছোটো হাকিমকে

কাছারিতে বসানো হ'য়েছে। কিন্তু তাতে লাভ কী হ'ল? একমাত্র হার্শেল সাহেব ছাড়া আর সবাইকেই তো নীলকরেরা কিনে নিয়েছে। তারা যখন এজলাশে ব'সে মামলার বিচার করে তখন তাদের পাশের চেয়ারে ব'সে থাকে নীলকর সাহেব। হাসি-তামাশার ফাঁকে ফাঁকে বিচারের নামে অবিচারের রায় বেরোয়। দামুরহুদা মহকুমার হাকিম বেট্‌স্‌ সাহেব সেখানকার মোক্তার তিতুরাম চক্রবর্তীকে ছ'মাসের কারাদণ্ড আর দু'শো টাকা জরিমানা ক'রে বুঝিয়ে দিয়েছে, রায়তের পক্ষে মোক্তার হ'য়ে দাঁড়ানো কতখানি অন্যায়! যশোরের 'ছোটো পাত্তরমারা' স্কিনার সাহেবও গিরিশ মল্লিকের মোক্তার গোপী চাটুজ্যেকে জেলের ঘানি টানিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে নীলকরের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গেলে সবচেয়ে কম সাজা কী হ'তে পারে!

নীল কমিশন বসানোর জন্যে নীলকরের গ্র্যান্ট সাহেবের ওপর ক্ষেপে লাল হ'য়ে গিয়েছিল। গ্র্যান্টের নামে তারা ভাইসরয় ক্যানিং সাহেবের কাছে বহু অভিযোগের ফিরিস্তি পাঠিয়েছে। কিন্তু ক্যানিং তাতে কান না দেওয়ায় নীলকরেরা নিজেরাই একটা কিছু হিল্লে করবার জন্যে উঠে-প'ড়ে লেগেছে। গ্র্যান্টের মতো বদমাশ লেপ্টেন্যান্ট গবর্নর আর সীটন কারের মতো সেক্রেটারি যতদিন বেঙ্গল গবর্নমেন্টের মাথায় ব'সে থাকবে ততদিন প্রতি পদে তাদের যে অশান্তি ব'য়ে চলতে হবে, নীলকরেরা তা ভালোভাবেই বুঝে নিয়েছে। তার ভেতর তবু এইটুকুই আশার কথা যে, বেট্‌স্‌, ম্যাকলিন, টেলর, মলোনি, স্কিনার এবং লিংহ্যামের মতো কয়েকজন সহৃদয় বিবেচক ম্যাজিস্ট্রেট আছেন যাঁরা অন্তত প্ল্যান্টারদের দুঃখ-কষ্ট বোঝেন!

বড়ো পুজো অর্থাৎ দুর্গাপুজোর সময় এগিয়ে আসছে। কিন্তু কে ক'রবে পুজো? জমিদার, তালুকদার, গাঁতিদার সবাই থরহরি কম্প। মা দুর্গাকে কে স্মরণ ক'রবে?

শরতের নীল আকাশে পুঞ্জ পুঞ্জ শাদা মেঘের আলপনা। কাশফুলে ছেয়ে গেছে মাঠ-ঘাট। পুকুর, ডোবা আর বাওড়ে শালুক ফুলের মেলা ব'সে গেছে। ধনেশ আর শামখোল পাখিরা নিরুপায়ভাবে শস্যহীন জমিতে চ'রে আধার খুঁজছে। আকাশ-বাতাসের ওপর নীলকরের এক্তিয়ার নেই। তাই আকাশে-বাতাসে, মাঠে-ঘাটে বিল-বাওড়ে শরৎ তার পশরা সাজিয়ে ব'সেছে।

যুগলমণিকে নেত্রী মেনে নিয়েছে তল্লাটের সব চাষী-রায়ত। আর পাঁচটা গ্রামের মেয়েরাও এগিয়ে এসেছে। শুধু রোলা ছোঁড়া-ই নয়, লাঠি-সড়কির তালিমও তারা নিচ্ছে। নতুন উদ্দীপনায় তারা নির্ভয়।

যুগলমণির মুখের একটা কথার দাম এখন অনেক। তার হুকুম মানতে একজন পুরুষও আপত্তি করেনি। সত্যিই তো, অসুর নিধন ক'রতে সেই মায়ের জাত-ই তো হাতে অস্ত্র নিয়েছিল। কুঠেল নিধন ক'রতে মায়ের জাত যদি পথ দেখায় তো আপত্তি কী?

করিম শেখ মেঘাইয়ের দলে ছিল সেরা সড়কিওয়ালা। বয়সে হয়তো মেঘাইয়ের চেয়ে একটু বড়ো। সে বলে, এতকাল বোনাইরি ন্যাতা মেনেলাম, অ্যাকন বুনিরিই ন্যাতা মানি। নীলির নড়াইয়ে হে'দুও নই, মোচলমানও নাই। অ্যাকন এই জমানায় তোন্দের দুগ্গো ঠাকুরুণির মেনি তো নিই, পরে পীরির দরগায় শিন্নি দে' ফের মোচলমান হবো!

নীলকরের অন্ধি-সন্ধি জানে করিম। যা জানে সব ব'লে বুঝিয়ে রেখেছে যুগলমণিকে। এদিকে অহল্যা তার কাছে সড়কির তালিম যা নিয়েছে তাতে করিম নিজেই অবাক্। স্বামীহারা দুই যুবতীকে মাঝে মাঝেই কথাচ্ছলে সে সান্ত্বনা দেয়, তাদের মনটাকে প্রফুল্ল রাখার চেষ্টা করে। সামনে হয়তো আরো কঠিন লড়াই!

—ওরে বুন, ওই ঝে কতায় কয় না, ম্যাঘ বিনে হয় না ঝ'ড়ো হাওয়া আর ত্যাগ বিনে হয় না বড়ো পাওয়া? দুক্কু কষ্ট তো কত্তিই হবে! তোন্দের একটা কতা আচে, কষ্ট না কল্লি কেষ্ট মেলে না। তা এই ঝে অ্যাতো কষ্ট কচ্চিস, এরপরেও কি জামকেষ্ট না মিলে পারে?

জামকেন্ট মানে নীলকর জেম্‌স্‌ সাহেব। তাকে খতম না করা পর্যন্ত যুগলমণির মানসিক পূর্ণ হবে না, সে-কথা জানে করিম শেখ।

মেঘাই সর্দারের বিধবা যুবতী বৌটা রায়তদের নেত্রী হ'য়েছে, সে-খবর যথাসময়েই জেম্‌স্‌ সাহেবের কাছে পেঁৗছে গিয়েছিল। মাঝে মাঝেই খবর আসে যুবতী বৌটা গ্রামে গ্রামে ঘুরে রায়তগুলোকে নাকি আরো এককাট্টা করবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। জমি সব প'ড়েই ছিল। কেউ আউশ ধানের চাষ-ও করেনি। কুঠির লোকেরা এসে ফসল নষ্ট ক'রে দিতে পারে জেনেও জমিতে জমিতে চাষীরা ছড়িয়ে দিয়েছে আইরি, খেসাড়ি আর মুগ-মসুরের বীজ। তাতে অবশ্য এই মুহূর্তেই কোনো অসুবিধে হচ্ছে না জেম্‌সের। নীলচাষের সময় আসতে এখনো কিছু দেরি আছে।

যুগলমণির মুখোমুখি হওয়ার জন্যে বিশেষ একটা কারণে জেম্‌সের মন ছটফট ক'রছে। সেই বিধবা বৌটার সব সময়ের সঙ্গিনী কমবয়সী আর একটা যুবতী। যৌবনের জোয়ারে তার দেহটা টইটম্বুর। অহল্যা নামে সেই মেয়েটাকে একবার কুঠির চৌহদ্দির ভেতর এনে ফেলতে পারলে জেম্‌স্‌কে আর পায় কে? ভবিষ্যতের ঝামেলা? কোনো দুশ্চিন্তা নেই। মিস্টার হিল্‌সের অমন জ্বলজ্যান্ত সত্যি মামলাটাও যখন ধোপে টেঁকেনি তখন আর চিন্তা কী? ব্লাডি সোয়াইন হার্শেলের বিবির কাছে বিধবা হওয়ার ভয় দেখিয়ে কয়েকখানা উড়ো চিঠি পাঠিয়ে দিলেই চ'লবে। প্রাণটা বাঁচাতে হার্শেলও মামলা ডিস্‌মিস্‌ ক'রে দেবে। তাছাড়া, এ-মেয়েটার হ'য়ে মামলা-ই বা ক'রতে যাবে কে? আর, কলকাতার ব্লাডি নিগার হ্যারিস মুকার্জি যদি তার পত্রিকায় লিখে হৈচৈ করে তখন মিস্টার হিল্‌সের মতো দশহাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি ক'রে একটা মানহানির মামলা ঠুকে দিলেই হবে! তাতে দু'তরফা লাভ।

দিনকাল অবশ্য অনেক পাল্‌টে গেছে। একবছর আগেও পছন্দসই কোনো নেটিব যুবতীর কাছে প্রস্তাব নিয়ে যাওয়ার জন্যে ইনাম দিয়ে লোক পাওয়া যেত। এখন কুড়ি-পঁচিশ টাকা বকশিশের লোভ দেখিয়েও কোনো নেটিব কর্মচারীকে-রাজী করানো যায় না। নীল-হাঙ্গামা শুরু হওয়ার পর থেকে প্রাণের ভয়ে তারা সব সময়েই তটস্থ হ'য়ে আছে।

জেম্‌স্‌ সাহেব অহল্যাকে কুঠিতে নিয়ে যাওয়ার জন্যে ক্ষেপে উঠেছে। কুঠির আমিনের মুখ থেকে কেমন ক'রে যেন কথাটা বেরিয়ে প'ড়েছিল। সেই কথা এলো করিম সর্দারের কানে। করিমতো সেইদিনই হামলা ক'রে কুঠিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার জন্যে তৈরি! তাকে বাধা দিলে যুগলমণি।

—মাতা ঠাণ্ডা করো দাদা! অ্যাদ্দিনি সোযোগের মতন সোযোগ মিলেলো! আগে আমার যুক্তি শোনো, তার পর যা কত্তি চাও, ক'রো।

যুগলমণির পরামর্শ শুনে রীতিমতো চিন্তিতভাবে করিম ব'ললে, ঝক্কিডা এট্‌টু জেয়াদা হ'য়ে যাবে না বুন?

—ঝক্কি তো নিতিই হবে! ও-শালা বেজম্মা ফান্দে অ্যাকবার পা দিক তারপর পোলোর মদ্দি ওই শোলমাছেরে এট্‌কে কোঁচ দে' খোঁচায়ে খোঁচায়ে ওর জান্‌ নিকেশ করবো তয় মুই ম্যাঘাই সদ্দারের ইস্তিরি!

অহল্যার সম্মতি নিয়ে গোপন দূত গেল কুঠির আমিনের কাছে। অহল্যা রাজী। অমাবস্যার রাতে নিকষ কালো অন্ধকারে মিশে গ্রামের দক্ষিণ সীমানায় মজা পালদীঘির পাড়ে বাঁশঝাড়ের কাছে হাজির হবে সে। কুঠির সাহেবের পেয়ার-পীরিত পাবে—সে তো বিধবা যুবতী মেয়ের ভাগ্যি! তবে লোকলজ্জার ভয় আছে তো? তাই রাতের অন্ধকারে সাহেব ঘোড়ায় চেপে নিজে এসে তাকে নিয়ে যায়। এক দঙ্গল পাইক-পেয়াদা-লেঠেল নিয়ে হৈ হৈ ক'রে এলে গ্রামের লোক জেনে ফেলবে! অহল্যা আর গ্রামে ফিরবে না। কুঠির সাহেবের সঙ্গে আমোদ-ফুর্তি ক'রে জীবন কাটানো তার বহুদিনের সাধ!

জেম্‌স্‌ খুশিতে দিশেহারা! অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনার শক্তিও হারিয়ে ফেলেছে। মেয়েটা যে কুঠির আমোদ-ফুর্তিতেই নিজেকে সঁপে দেওয়ার জন্যে এত অধীর তা আগে জানায়নি কেন? আমিনকে আগাম দশ টাকা বক্‌শিশ দিয়ে দিলে জেম্‌স্‌।

এলো অমাবস্যার রাত।

দেশের যা হালচাল তাতে যত কমই হোক, অন্তত জনা পঁচিশেক লেঠেল-পাইক না নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। মেয়েটা যা খবর পাঠিয়েছে তাতে তাকে তুলে আনার কাজটা চুপিসাড়েই হয়তো হ'য়ে যাবে। তবু সাবধানের মার নেই। লেঠেল-পাইকের দল না হয় আড়ালে একটু দূরেই থাকবে। দু'টো পিস্তলে গুলি ভ'রে রওনা হ'ল জেম্‌স্‌।

না, মেয়েটা ভাঁওতা দেয়নি। অন্ধকারের ভেতরেও একটু দূরে বাঁশঝাড়ের তলায় শাদা কাপড়-পরা অস্পষ্ট ছায়ামূর্তির মতো তাকে দেখা গেল। জেম্‌সের ঘোড়া এগিয়ে গেল।

—কাম অন ডিয়ার!

এই একটা কথাই মাত্র ব'লতে পেরেছিল জেম্‌স্‌। পরমুহূর্তেই একখানা তরোয়াল বিঁধে গেল তার বুকে। এফোঁড়-ওফোঁড় হ'য়ে বিঁধে-যাওয়া তরোয়ালের হাতল যুগলমণির হাতে। আর সেই মুহূর্তেই সড়কি হাতে ওপর থেকে লাফিয়ে প'ড়লো করিম সর্দার। বাঁশঝাড়ের ঝুঁকে-পড়া একটা মোটা ভেল্‌কো বাঁশের ওপর ব'সে শিকারের জন্যে এতক্ষণ প্রতীক্ষা করছিল করিম। সাহেব যাতে তার বোনের গায়ে হাত লাগাতে না পারে সেই কারণেই করিমের সেই অভিনব স্থান-নির্বাচন।

জেম্‌স্‌ মুখ থুবড়ে মাটিতে প'ড়ে যেতেই যুগলমণি গলাফাটা স্বরে চেঁচিয়ে উঠলো, শোলমাছ গেঁথিচি—

আশ-পাশের ভাট-আশশ্যাওড়ার ঝোপ থেকে বেরিয়ে এলো শ'খানেক লোক। হাতে লাঠি আর সড়কি। যুগলমণি পাগলের মতো চেঁচিয়েই চ'লেছে, দ্যাক্‌, দ্যাক্‌ অক্ত ক্যামন ঝোজাচ্চে—

উন্মাদ কলরোল উঠলো বাঁশবন কাঁপিয়ে। মুহুর্মুহু সড়কি ছুটতে লাগলো জেম্‌সের লেঠেলদের দিকে। অন্ধকারে তারাও ঠাহর ক'রতে পারছে না দুশ্‌মনের সংখ্যা কত। তাছাড়া যে মনিবের হুকুমে তারা লড়বে, সেই মনিবেরই আর্তনাদ তাদের কানে পৌঁছেছে। দিশেহারা হ'য়ে তারা পেছন ফিরে ছুটতে শুরু ক'রলো।

মশাল জ্ব'লে উঠ্‌লো আট-দশটা। সেই আলোয় দেখা গেল, পাগলের মতো যুগলমণি তরোয়ালখানা তুলছে আর সাহেবের গায়ে বিঁধিয়ে দিচ্ছে। বুকে, পেটে, গলায়, পায়ে, মাথায়—যেবার যেখানে গাঁথে। রক্তে ভিজে গেছে ঝ'রে পড়া একরাশ শুকনো বাঁশপাতা, রক্তে ভিজে যাচ্ছে যুগলমণির পরণের কাপড়।

কিছুক্ষণ আগেও একটু ক্ষীণ গোঙানির শব্দ ছিল সাহেবের গলায়। সেটুকুও থেমে গেল। ছটফট্‌ ক'রতে ক'রতে নিথর হ'য়ে গেল তার দেহ। ঝাঁপিয়ে প'ড়ে তার গায়ের রক্ত দু'হাতে মাখতে লাগলো যুগলমণি।

করিম চেঁচিয়ে ব'ললে, কী কচ্চিস রে বুন, ওই পাপ-গতরের লোউ গায়ে মাক্‌চিস ক্যান?

কোনো উত্তর না দিয়ে জেম্‌সের নিথর দেহটার ওপর উঠে দাঁড়ালো যুগলমণি। লাথির পর লাথি আর থুথু ছেটাতে লাগলো মৃত সাহেবের মুখে। পাগলের মতো বিড়বিড় ক'রতে লাগলো, অ্যাদ্দিনি মোর শান্তি, অ্যাদ্দিনি মোর শান্তি—

॥ সাতাশ ॥

আজ ক'দিন হ'ল জ্বরের সঙ্গে কাশির দমক্‌টাও বেড়েছে হরিশের।

শীতের আমেজ আসতেই হাঁপানি যে মাথা চাড়া দেবে, এ তো রুক্মিণীর সেই কতকাল আগে

থেকেই জানা কথা। জ্বর নিয়েই তিনি চিন্তিত বেশি। দু'দিন কব্‌রেজকে ডেকেছিলেন। কিন্তু কব্‌রেজ এসে ফিরে গেছেন, রোগীর পাত্তা নেই। রুক্মিণীর বিশেষ অনুরোধে কব্‌রেজ মশাই একদিন সন্ধ্যের পর পেট্রিয়ট আপিসে গিয়েও হাজির হ'য়েছিলেন। কিন্তু রোগীর সেই একই কথা, এখন সময় নেই। তখন ঘরভর্তি সব হোম্‌রাচোম্‌রা লোকেরা ব'সে আছেন। কব্‌রেজ মশাই অগত্যা তাঁর লাল শালুতে বাঁধা ওষুধ-ভরা বাঁশের চোঙাগুলি যেমন নিয়ে গিয়েছিলেন তেমনিই নিয়ে পথে পা বাড়ালেন।

কিশোরীচাঁদের কাগজ সেই জুলাই মাস থেকে পেট্রিয়ট প্রেসেই ছাপা হ'চ্ছে। প্রেস ছোটো অথচ দু'খানা সাপ্তাহিকের জন্যে চাপ অনেক বেশি। বাধ্য হ'য়ে পত্রিকা প্রকাশের দিনও একটু ওলোটপালোট ক'রে নিতে হ'য়েছে। একখানা বেরোচ্ছে বুধবার, একখানা শনিবার।

কিশোরীচাঁদকে এখন প্রত্যেকদিনই ভবানীপুরে আসতে হয়। গিরীশ-ও আগের চেয়ে বেশি আসছে। শম্ভুনাথ, রমাপ্রসাদও মাঝে মাঝে হাজিরা দেয়। আগে শম্ভুনাথের বাড়িতে সপ্তাহে অন্তত একটা দিন আড্ডা ব'সতো। নীল-হাঙ্গামা আরম্ভ হওয়ার পর থেকে সেখানে যাওয়ার সময়-ও পায় না হরিশ। সকাল দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত চাকরি, সন্ধ্যে ছ'টা থেকে অনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পেট্রিয়ট আর রায়তদের কাজ। জ্বরও হ'য়ে চ'লেছে, কাশিও বাড়ছে, পেট্রিয়টও বেরোচ্ছে, রায়তেরাও পরামর্শ পাচ্ছে।

কলকাতার দুর্গোৎসবে এবছর জৌলুষ যেন আরো বেশি ছিল।

দক্ষিণ বাঙলার গ্রাম-গ্রামান্তর জুড়ে জীবন-মরণের যে সংগ্রাম চ'লছে তার কোনো প্রভাবই কালো ছায়া ফেলতে পারেনি কলকাতার বুকে। দুর্গোৎসবে সেই বাইনাচ, সেই ফেনিল সুরার স্রোত, সেই ঢালাও খানা-পিনা আর সাহেব হুজুরদের ভেট দেওয়ার হুড়োহুড়ি সমানেই চ'লেছে। কিছু কিছু শৌখিনবাবু নাকি মাঝে মাঝে বজরা চেপে কপোতাক্ষ, ইছামতী, চিত্রা আর ভৈরব নদীতে ঘুরে ঘুরে মজা দেখে এসেছেন। নিরাপদ দূরত্বে বজরার ওপর ব'সে নীলকরের লেঠেলদল আর চাষীদের লড়াই দেখতে তাঁদের বেশ ভালোই লেগেছে।

এবছর দুর্গোৎসবের আগে রুক্মিনীর কাছে হরিশ আবেদন জানিয়েছিল, এবার পুজোয় যেন কোনো আড়ম্বর ক'রো না মা, বড়ো বিসদৃশ লাগবে।

একটু ক্ষুণ্নস্বরেই রুক্মিনী ব'ললেন, আমি তো নমো নমো ক'রেই মায়ের পুজো সারি, বাবা! জাঁক-জমক কবে হ'য়েচে বল্‌?

মিষ্টি হেসে হরিশ ব'ললে, তুমি রেগে গেচ, তা বেশ বোঝা যাচ্চে, মা! তুমি যে জাঁকজমক ক'রবে, তোমার ছেলের সে সামর্থ্য কোথায়? আজ এই প্রায় বছরখানেক ধ'রে নিজের চোখেই তো দেখতে পাচ্চ, কি করুণ অবস্থায় গাঁয়ের চাষীরা তোমার বাড়িতে এসে আছড়ে পড়ে? তাদের জন্যে ফি-মাসেই কিছু টাকার সংস্থান আমাকে রাখতে হয়। তাই বলচিলুম—

—আর ব'লতে হবে না, বাবা! আমি বুঝেচি।

এরপর আর অপ্রসন্ন থাকেননি রুক্মিনী। নিজের পেটের ছেলের এই মায়া-মমতা, এই দরাজ মনের ব্যথাকে তিনিই যদি না বুঝবেন তো বুঝবে কে?

নীলকমিশনের রায় আর সুপারিশ পড়বার পর হরিশের বুক থেকে একটা বড়ো দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এসেছিল। সব দিক বাঁচিয়ে অতি মিহি সুরে একটা অস্পষ্ট, ধোঁয়াটে সুপারিশ মাত্র! কমিশনের তদন্তের ফলে নীলকরদের অত্যাচারের কিছু কিছু কাহিনী প্রকাশিত হ'য়েছে বটে কিন্তু তার ভয়ঙ্করতার তুলনায় সেসব তথ্য নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। উপরন্তু, গ্রাম-গ্রামান্তরে নীলকরদের অবস্থানের প্রয়োজনকে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রয়োজন ব'লেই কমিশন স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। কারণ, রাজনৈতিক দুর্দিন কিম্বা সঙ্কটকালে অরাজকতা দমনের জন্যে একমাত্র নীলকরেরাই বাঙলা

সরকারকে সাহায্য ক'রতে সক্ষম। কমিশনের মতে, নীলের ব্যাপারে সরকারি হস্তক্ষেপ হ'লে সমস্যা আরো জটিল হ'য়ে দাঁড়াবে।

কমিশনের রিপোর্টে লেপ্টেন্যান্ট গবর্নর পিটার গ্র্যান্টও খুশি হ'তে পারেননি। তিনি রীতিমতো কটাক্ষসহ মন্তব্য ক'রেছেন, এর নরম সুর যদিও প্রশংসনীয় কিন্তু বিক্ষুব্ধ কৃষকদের মনোভাবের তীব্রতা সম্বন্ধে এ-রিপোর্ট ক্ষীণ একটা আভাস দিয়েছে মাত্র।

কিছুদিন আগে স্টিমারে সিরাজগঞ্জ থেকে কলকাতায় ফেরবার পথে হাজার হাজার কৃষকের তীব্র বিক্ষোভের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা পিটার গ্র্যান্টের হ'য়েছিল। সীটন কারের কাছে তিনি ব'লেছেন, ক্ষমতা আর অর্থের দর্পে নীলকরের দল ভুলেই গেছে যে, এদেশের চাষীরা ক্যারোলিনার নিগ্রো ক্রীতদাস নয়! তারা এদেশেরই মূল অধিবাসী এবং এদেশের জমির আইনসঙ্গত মালিক। সিরাজগঞ্জ থেকে ফেরার সময় কৃষকদের যে সংযমী বিক্ষোভ আমি দেখেছিলাম তার তাৎপর্য অনেক গভীর ব'লেই আমার মনে হ'য়েছে। কেউ যদি মনে করে, এটা নিছকই নীল-সংক্রান্ত একটা সাধারণ ব্যবসায়িক গোলযোগ মাত্র তাহ'লে আমি ব'লতে বাধ্য যে, কালের অদৃশ্য ভয়ঙ্কর ইঙ্গিত সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ!

কমিশনের সামনে হরিশ নিজে সাক্ষী দিয়েছিল তিরিশে জুলাই। অনেক সম্ভাব্য প্রশ্নের যথাযথ অপ্রিয় উত্তর তৈরি ছিল তার ঠোঁটের ডগায়। কিন্তু তাকে প্রশ্ন করা হ'ল খুবই সংক্ষিপ্তভাবে এবং সংখ্যায়ও যথেষ্ট কম। কমিশনের সদস্যদের ভেতর সভাপতি মিস্টার সীটনকার এবং পাদরি রেভারেন্ড সেল ছাড়া বাকী তিনজন হরিশের উপস্থিতির সারা সময়টুকু রীতিমতো অস্বস্তি অনুভব ক'রছিলেন, তা সে লক্ষ্য ক'রেছে। নীলকরদের প্রতিনিধি মিস্টার ফার্গুসন যে হরিশ মুখার্জিকে দেখেই মনে মনে তেলে-বেগুনে জ্ব'লে উঠবেন সেইটেই স্বাভাবিক। কিন্তু ভারতীয় জমিদারবর্গের তথা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি বাবু চন্দ্রমোহন চ্যাটার্জি যথেষ্ট ধূর্তবুদ্ধির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও বিরক্তিটা যে এত প্রকটভাবে প্রকাশ ক'রে ফেলবেন, সেটা হরিশ ঠিক বুঝতে পারেনি।

নীল কমিশনের রিপোর্ট সম্পূর্ণভাবে হতাশ ক'রলেও নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার হার্শেল এবং আরো কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ রাজকর্মচারী, এমনকি নীলকরদেরও কয়েকজনের উত্তর পরিতৃপ্ত ক'রেছে হরিশকে। সম্ভবত, একটা বিশেষ উদেশ্যেই ফার্গুসন সাহেবের আগ্রহে সবাইকে একটি বিশেষ প্রশ্ন করা হ'য়েছিল। প্রশ্নটির উদ্দেশ্য ছিল, সাক্ষীদের দিয়ে কবুল করিয়ে নেওয়া যে, নীলচাষ-এলাকার বাইরে থেকে নীলকর বিদ্বেষী কয়েকজন ধূর্ত ব্যক্তি প্রত্যক্ষে অথবা পরোক্ষে নীলচাষীদের প্ররোচনা দেওয়ার ফলেই হাঙ্গামা হ'য়েছে নতুবা নীলচাষীরা এ-কাজ ক'রতো না।

কিন্তু নীলকরদের সে-অভিসন্ধিকে চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ ক'রে দিয়েছেন হার্শেল। তিনি খুব জোরের সঙ্গেই ব'লেছেন, বাইরের কেউ প্ররোচনা দেওয়ার জন্যে চাষীরা বিদ্রোহী হ'য়েছে, এ-ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। নীলচাষীদের বিদ্রোহ তাদের দীর্ঘকালের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভেরই প্রকাশ। বিদ্রোহের জন্যে চাষীদের যারা সংঘবদ্ধ ক'রেছে তারা প্রত্যেকেই স্থানীয় ব্যক্তি। এই বিদ্রোহের ব্যাপারে বাইরের কোনো ব্যক্তির কোনো ভূমিকা নেই। হার্শেলের এই উত্তরে ফার্গুসনের মুখ করুণ হ'য়ে গেলেও হার্শেলের বক্তব্য কিন্তু পালটায়নি। শেষ চেষ্টা হিসেবে যখন হার্শেলকে প্রশ্ন করা হ'ল, নিজের জ্ঞানবুদ্ধি আর সংগঠন ক্ষমতায় রায়তদের সংঘবদ্ধ ক'রতে পারে এমন কোনো নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে আপনি কি জানেন? হার্শেল হেসে উত্তর দিলেন, একজন কেন, কমিশনের সদস্যেরা যদি চান, আমার জেলাতেই সে-রকম একশো গ্রাম্য নেতার নাম আমি ব'লতে পারি। মহেশ চ্যাটার্জি, দিগম্বর বিশ্বাস বা বিষ্টুচরণ বিশ্বাস—এ'রা কেউ বাইরের লোক ন'ন।

এমনকি, আর্চিবল্ড হিলসের মতো নীলকরও কমিশনের সামনে ব'লেছে, নীলকরদের বিরুদ্ধে রায়তগুলোর এই উদ্ধত, দুর্বিনীত আচরণের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে তাদেরই। বাইরের কেউ এর জন্যে দায়ী নয়। রায়তগুলো নিজেরাই জোট বেঁধে হাঙ্গামা বাধিয়েছে।

কমিশনের রায়ে হতাশ হ'লেও কমিশনের কার্যবিবরণীতে এই বিশেষ প্রসঙ্গটি সত্যিকারের তৃপ্তিতে ভরিয়ে দিয়েছে হরিশের বুক। গত বছর বিদ্রোহের আগুন জ্ব'লে ওঠার পর নীলকর আর রাজশক্তির নির্মম নিপীড়নে যখন গ্রামের পর গ্রামে দাউ দাউ ক'রে আগুন জ্বলছে, হাজার হাজার চাষী নীলকরের কয়েদঘরে ধুঁকছে, শ'য়ে শ'য়ে কৃষকরমণী হচ্ছে স্বামী-পুত্রহারা, হচ্ছে ধর্ষিতা—তখন মর্মান্তিক বেদনায় বিহ্বল হরিশের মনে এই প্রশ্নটাই বারবার দেখা দিত, এর পরে এরা সংঘবদ্ধ হ'য়ে রুখে দাঁড়াতে পারছে না কেন? সংহত শক্তি নিয়ে রুখে দাঁড়ালে এত নির্যাতন কি সহ্য ক'রতে হ'ত? ওই নীলকর-নেকড়েরাও কি এত বেপরোয়া অত্যাচার চালাতে সাহস পেতো? মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহের পেট্রিয়টে বড়ো ক্ষোভের সঙ্গে হরিশ লিখেছিল, বাঙলার রায়তদের স্বার্থ দেখার জন্যে কোনো সংঘবদ্ধ সংগঠন নেই, এ যে কত বড়ো দুর্ভাগ্য!

অবশ্য এই ক্ষোভ দূর করবার জন্যে হরিশকে নীল কমিশনের রায় পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রতে হয়নি। যশোর থেকে শিশিরের পাঠানো খবর, কুমারখালি থেকে হরিনাথ আর মথুরানাথের, কৃষ্ণনগর সদর থেকে মনোমোহন, গিরীশ দারোগা, রাধিকাপ্রসন্ন এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন সময়ে দীনবন্ধুর পাঠানো খবরগুলো থেকে এটা খুব স্পষ্টভাবেই বোঝা গেছে যে, নীলচাষীরা সংঘবদ্ধ হ'য়েছে। তারা এখন আর শুধু প'ড়ে প'ড়ে মার খাচ্ছে না, পাল্‌টা মারতেও শিখেছে।

কমিশনের রায়ে সরকারিভাবে স্বীকৃত হ'ল যে, চাষীরা নিজেরাই সংঘবদ্ধ হ'য়েছে এবং শহর থেকে ইংরেজের কোনো গুপ্ত শত্রু গিয়ে তাদের দিয়ে বিদ্রোহ করায়নি। রিপোর্টের শেষের দিকে কমিশন ব'লেছেন, আমরা এই সুচিন্তিত সিদ্ধান্তে উপনীত হ'য়েছি যে, সম্প্রতি নদীয়া, যশোর এবং অন্যান্য জেলায় কৃষকেরা যে নীলচাষ ক'রতে অস্বীকার ক'রেছে তা অন্য যেকোনো সময় যেকোনো অবকাশেই ঘ'টতে পারতো কারণ, জনমতের এই প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ার সমস্ত উপকরণই পুঞ্জীভূত ছিল। জমিদার কিম্বা কলকাতার কোনো গুপ্ত প্রতিনিধির প্ররোচনায় এই বিক্ষোভ-বিস্তার লাভ ক'রেছে তার কোনো প্রমাণ আমরা পাইনি। কৃষকদের বিক্ষোভ স্বতঃস্ফূর্ত।

পরিতৃপ্ত হ'য়েছে হরিশ, প্রশমিত হ'য়েছে তার ক্ষোভ।

রুশদেশে আবহমানকালের ভূমিদাসের দল সংঘবদ্ধভাবে তীব্র সংগ্রামে অনেক রক্ত ঢেলে দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভ ক'রেছে। রেভারেণ্ড লঙ হরিশকে তার বিস্তৃত বিবরণ শুনিয়েছেন। রুশচাষীরা এতদিনে যা পেরেছে, বাঙলার চাষীরাই বা তা পারবে না কেন? সে-চেতনা তাদের এসেছে! তারা সংঘবদ্ধভাবে পা বাড়িয়েছে। এগিয়ে চ'লেছে দুর্জয় গতিবেগে। আজ না হোক কাল—কাল না হোক পরশু—জয় তাদের হবেই!

দুর্গোৎসব আর ক'দিন পরেই আরম্ভ হবে।

সেদিন জ্বরের মাত্রাও কিছু বেশি, মাথা ধরাও অসহ্য। তা সত্ত্বেও কাজ ক'রে চলছিল হরিশ। কিশোরীচাঁদ নিজে বাড়িতে রওনা হওয়ার আগে একরকম জোর ক'রেই হরিশকেও বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছে। হারাণ মনে মনে মনে খুব খুশি। ইণ্ডিয়ান ফীল্ড পত্রিকা তাদের ছাপাখানায় উড়ে এসে জুড়ে বসায় তার মন মোটেই প্রসন্ন ছিল না। সেদিন সে মনে মনে ব'ললে, ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন! বড়োভাই হ'লেও তার সাধ্যি ছিল না হরিশের ওপর ওইভাবে হম্বি-তম্বি ক'রে বাড়িতে পাঠাতে পারে। বাড়িতে ফিরে মাকে জানানোর ছলে হারাণ বেশ চেঁচিয়েই ছোটো-বৌমাকে জানিয়ে দিলে, আজ রাতে কোনোক্রমেই যেন হরিশকে কাগজ-কলম নিয়ে বসতে না দেওয়া হয়! ছোটোবৌকে সাহায্য ক'রতে এগিয়ে এলো মাধুরী। আসলে যা কিছু করবার মাধুরীই ক'রে গেল, ছোটোবৌ নীরব দ্রষ্টা মাত্র। আগেকার সেই নিষ্করুণ দূরত্ব এখন আর নেই বটে, কিন্তু ছোটোবৌ একেবারে সহজ, স্বাভাবিক হ'তে পারেনি। এই একবছরে সে সহধর্মিণী হওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে চলেছে তবু কোথায় যেন একটা দূরত্ব র'য়ে গেছে।

কাকাবাবুকে শুইয়ে গায়ে চাদর ঢেকে দিয়ে চ'লে গেল মাধুরী। ছোটোবৌ কিছুক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর একসময় মৃদুস্বরে ব'ললে, হ্যাঁ গা, মাতা টিপে দেবো?

—অসুবিধে না হ'লে দিতে পারো।

একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে হরিশের কাছে এগিয়ে গেল ছোটোবৌ। শিয়রের কাছে ব'সে সবে সে মাথা টিপতে শুরু ক'রেছে এমন সময় দরজার বাইরে থেকে চাকর খবর দিয়ে গেল, এক বাবু দেখা ক'রতে এয়েচেন। নাম বললেন, দীনবন্ধু মিত্তির।

দিশেহারা উত্তেজনায় সঙ্গে সঙ্গে উঠে ব'সলো হরিশ। কোনোমতে চাদরখানা গায়ে জড়িয়ে দোতলা থেকে নেমে এলো একতলার বৈঠকখানায়। দীনবন্ধু ব'সে আছে। হাতে একটা পোর্টম্যান্টো ব্যাগ।

হরিশকে প্রণাম ক'রে দীনবন্ধু ব'ললে, ঢাকা থেকে কাল বিকেলে এসে পেঁাছেচি। নিজের হাতে সবচেয়ে আগে আপনার কাছে পেঁাছে দেবার জন্যে একটা সামান্য উপহার এনেছি। আপনি গ্রহণ ক'রলে কৃতার্থ হবো। কিন্তু এসে শুনলুম, আপনি নাকি অসুস্থ?

—ও কিছু নয়। কই, কী উপহার এনেচো, দাও—

পোর্টম্যান্টো ব্যাগের ভেতর থেকে একখানা সদ্যমুদ্রিত বই বের ক'রলো দীনবন্ধু। সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে হরিশের হাতে নব্বুই পৃষ্ঠার ক্ষীণ কলেবর একখানি বই তুলে দিলে—নীল দর্পণং নাটকং।

দু'হাতে দীনবন্ধুকে জড়িয়ে ধ'রলো হরিশ। মাথার যন্ত্রণার কথা তখন আর তার মনে নেই। ব'ললে, আজ রাতেই আমি প'ড়ে ফেলবো ভাই! কবে বেরিয়েচে?

পরশুদিন। আমি সেদিনই ঢাকা থেকে রওনা হ'য়েচি।

দীনবন্ধু! দীনবন্ধু! সার্থক তোমার নাম!—অভিভূত আবেগে ব'ললে হরিশ, তুমি যে তলে তলে এতবড়ো একটা কাজে হাত দিয়েচ তা তো ঘুণাক্ষরেও আগে জানাওনি ভাই?

আপনার গা যে জ্বরে পুড়ে যাচ্চে দাদা!

যাক্। আমি এখুনি এ-নাটক প'ড়তে বসবো। পড়াও শেষ হবে, আমার জ্বর-ও ছেড়ে যাবে। আমি বুঝতে পেরেচি, এ অমূল্য রত্ন!

আমাকে এভাবে লজ্জা দেবেন না, দাদা! যা ব'লতে চেয়েচি তার কতটুকুই বা পেরেচি তা নিজেই জানিনে!

পেরেচো, নিশ্চয়ই পেরেচো! তোমার যে হৃদয় আচে! নাটক আমার আজ রাতেই পড়া হ'য়ে যাবে।

—আপনার শরীর যে রকম অসুস্থ তাতে ক'দিন পরেই নয় পড়বেন?

—না, না, আমাকে আজ রাতেই প'ড়তে হবে! কাল এই সময়ে অবশ্যই একবার এসো কিন্তু!

রাত বেশ হ'য়েছে। দীনবন্ধু একটু পরে চ'লে গেল। নাটকখানা নিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে হরিশ ব'ললে, আর মাথা টিপতে হবে না ছোটোবৌ, মাথা ধরার ওষুধ আমি পেয়ে গেচি!

টেবিলের বাতিটা উস্কে দিয়ে বই খুলে ব'সে গেল হরিশ।

নীলদর্পণং নাটকং—নীলকর-বিষধর-দংশন কাতর-প্রজানিকর ক্ষেমঙ্করেণ কেনচিৎ পথিকেনাভি প্রণীতং। ২ আশ্বিন, ১৭৮২ শকাব্দা, ইং ১৮৬০। ঢাকা শ্রীরামচন্দ্র ভৌমিক কর্তৃক বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত।

পরের দিন এসেছিল দীনবন্ধু। তাকে নিবিড় আবেগে জড়িয়ে ধ'রে হরিশ ব'ললে, আবেগ দেখা দিলেই আমাদের মধু মানে মাইকেল যেমন জড়িয়ে ধ'রে চুমো খায়, আমারও ঠিক তেমনি ইচ্ছে কচ্চে ভাই! আমি এতদিন কলম চালিয়ে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখে-যা ক'রতে পারিনি, তুমি এই নাটক লিখে তার চেয়ে অনেক বেশি ক'রেচো! বৃটিশের কোপদৃষ্টি এবার যে তোমার ওপর পড়বেই তা অবধারিত! প্রকৃত নাম গোপন রেখে 'পথিক' সেজে ভালোই ক'রেচো। কংগ্র্যাচুলেশন্‌স্ দীনবন্ধু, কংগ্র্যাচুলেশন্‌স্!

সঙ্কোচে আড়ষ্ট হ'য়ে গেল দীনবন্ধু। যিনি একথা ব'লছেন তিনি নিজেই জানেন না, দুর্গত

লক্ষ লক্ষ নীলচাষীর হৃদয়ে আজ হরিশ মুখুজ্যের স্থান কোথায়! তারা ইংরিজি জানে না, হিন্দু পেট্রিয়ট পড়তে পারে না। কিন্তু এটুকু জানে যে, কলকাতার বাবুরা যখন তাদের দুঃখ-দুর্দশায় নির্বিকার তখন ওই একটিমাত্র মানুষ তাদের হ'য়ে এগিয়ে এসেছে—নীলকরদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে! ক'জনই বা হরিশ মুখুজ্যে মানুষটিকে চোখে দেখেছে? ছোটো ছোটো দলে নদীয়া, যশোর থেকে যারা পরামর্শ নিতে এসেছে শুধু তারাই দেখেছে। বাকী লক্ষ লক্ষ চাষী? তারা চোখে দেখেনি কিন্তু হৃদয়ে হরিশের জন্যে আসন বসিয়েছে। তাদের দুর্দিনে সবচেয়ে বড়ো বন্ধু ব'লে হরিশ মুখুজ্যে নামটাই তারা জানে। হরিশ তাদের বন্ধু, তাদের সংগ্রামের প্রেরণা, তাদের সবচেয়ে বড়ো দরদী সহায়!

দীনবন্ধুর গলা ধ'রে এলো। ব'ললে, দাদা, আপনি আমার রচনাকে স্বীকৃতি দিয়েচেন, এই আমার সবচেয়ে বড়ো পুরস্কার! কিন্তু মহৎ প্রচেষ্টার সঙ্গে আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে তুলনা ক'রে আমাকে এভাবে বিব্রত ক'রবেন না! আমি আপনাকে অনুরোধ ক'রচি, একবার অন্তত কয়েকদিনের জন্যে ন'দে-যশোর-পাবনা ফরিদপুরের গাঁয়ে ঘুরে আসুন; দেখবেন, হরিশ মুখুজ্যে সেখানে প্রবাদ-পুরুষ! আপনি গেচেন জানতে পারলে হাজারে হাজারে, লাখে লাখে চাষী এসে আপনার পায়ে লুটিয়ে পড়বে!

—আমি কারো পায়ে লুটোতে চাইনে, কেউ আমার পায়ে লুটিয়ে পড়ুক তাও আমি চাইনে দীনবন্ধু। সত্যিই যদি আমি তাদের উপকারে লেগে থাকি, তাদের দুর্দিনের অবসানে তাদের মুখের হাসিটুকুই হবে আমার পুরস্কার! আমি যাবো, অন্তত একবার আমি যাবোই! তাদের মুখের হাসিটুকু দেখতে একবার অন্তত যাওয়ার বড়ো সাধ আমার! কিন্তু দুর্ভাগ্য, এখনো সে সময় আসেনি!

—আসেনি কিন্তু আসচে!—গভীর বিশ্বাসের সুরে দীনবন্ধু ব'ললে; ছোটোখাটো নীলকরদের কথা ছেড়েই দিন, বেঙ্গল ইণ্ডিগো কোম্পানির নরদানব লারমুর আর ফরলঙ পর্যন্ত আজ চিন্তিত। মোল্লাহাটি কুঠির অবস্থা সঙ্গীন। আমিন, গোমস্তা, পেশকার,—এমন কি, যাদের বুকে দয়া-মায়া ব'লে কোনো অনুভূতিই এতদিন ছিল না, সেইসব লেঠেলদেরও অনেকেই প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে কুঠি ছেড়ে চ'লে গেচে! নতুন ছড়া বেঁধেচে গেঁয়ো কবি,—

মোল্লাহাটির লম্বা লাঠি, রইল সব হুদোর আঁটি
কলকাতার বাবুভেয়ে, এল সব বজরা চেপে লড়াই দেখবে ব'লে।

—হুদোর আঁটি মানে?—প্রশ্ন ক'রলে হরিশ।

—অব্যবহৃত লাঠির গোছা। যে লাঠির দাপটে ওরা এতদিন কাউকে পরোয়া ক'রতো না, সেই সেই লাঠির বোঝাগুলো এখন প'ড়ে রয়েচে, ধরবার লোক তেমন নেই ব'ললেই চলে। গেঁয়ো কবির ছড়ায় ক'লকাতার বাবুরাও কিঞ্চিৎ স্থান পেয়েচেন!

শেষের কথাটা বলবার সময় একটু হাসলো দীনবন্ধু।

হরিশ ব'ললে, হ্যাঁ, শুনেচি। এককালে ক্রীতদাস গ্ল্যাডিয়েটরদের লড়াই দেখতে রোমের কলোসিয়মে কত হাজার হাজার প্যাট্রিসিয়ান বাবুরা জড়ো হ'তেন। সেক্ষেত্রে হাল ক'লকাতার প্যাট্রিসিয়ান বাবুরা একটু ফুর্তি করবার জন্যে যদি বজরা চেপে গেঁয়ো প্লিবিয়ানদের রক্তপাত দেখতেই যান তাতে দোষের কী আছে, বলো? গেঁয়ো কবিরা বড়ো স্বভাব নিন্দুক দেখচি! সে যাই হোক, তোমাকে দেখচি বড়ো বেশি আশাবাদী! নেহাৎ একটা ইণ্ডিগো কমিশন ব'সেচে ব'লেই চাষীদের সুদিন আসচে ব'লে যদি মনে ক'রে থাকো তাহ'লে ভুল ক'রেচ! কেউটে সাপের শিরদাঁড়া ভেঙে দিলেও দাঁতের বিষ কিন্তু তার দাঁতে ঠিকই থাকে। ওদের শিরদাঁড়াও ভাঙেনি। একটু মৃদু আঘাত প'ড়েচে মাত্র। কমিশনের রায়ে ওদের মহৎ কীর্তির কতটুকুই বা প্রকাশ পেয়েচে? এক শতাংশও নয়। তাতেই ওরা ক্ষিপ্ত হ'য়ে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে ল্যাজ আছড়াচ্ছে! উড আর রোগ সায়েবকে সৃষ্টি করবার পরেও তুমি বুঝতে পারচো না দীনবন্ধু, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, আফ্রিকা, ক্যারোলিনায়

তিনপুরুষে ওদের রক্তে নির্মম অর্থলোলুপতার যে কালোপোকা থিক্ থিক্ ক'রচে, তা কি এত সহজে যায়?

দীনবন্ধুর সঙ্গে সেদিন কথাবার্তার পর মাস দু'য়েক কেটে গেছে। এর ভেতর জলও গড়িয়েছে অনেকদূর। কোন্ ব্লাডি নেটিব নীলদর্পণ লিখেচে তার খোঁজ তো চ'লছেই, বিষোদ্গারের বহরও ক্রমেই বাড়ছে। এবারে আরো স্থূল, আরো উলঙ্গ। ইংলিশম্যান আর হরকরা যেখানে পারছে সেখানেই ছোবল দিচ্ছে। নেটিবদের বিরোধিতার একটা অর্থ তবু বোঝা যায় কিন্তু শাদা চামড়ার অধিকারী হ'য়ে গ্র্যান্ট, সিটনকার এবং ইডেনের মতো স্নেকগুলো যে নীলকরদের বিরুদ্ধে এমন উঠে-প'ড়ে লেগেছে, সেইটে কিছুতেই বরদাস্ত করা যাচ্ছে না। সবচেয়ে বেশি আক্রোশ পিটার গ্র্যান্টের ওপর। তাঁর সম্বন্ধে হরকরা ছড়া কেটেছে,—

Governor Grant is a terrible man,
As he reigns in Alipore Hall;
A compound of Chenges and Kublai Khan
Tamerlain, Nadir and all.

পিটার গ্র্যান্ট যে চেঙ্গিস খাঁ, কুবলাই খাঁ, তৈমুরলঙ্গ্ আর নাদির শাহের সংমিশ্রণে গড়া এক নৃশংস দানব তা নিয়ে কোনো দ্বিধাই রইলো না নীলকর মহলে। সব খবরই তাদের রাখতে হয়। গ্র্যান্ট তাঁর এক বিবরণীতে যা লিখেছেন, সেক্রেটারি ফর ইণ্ডিয়া স্যার চার্লস্ উড যদি সেগুলো মেনে নেন তাহ'লে সমূহ বিপদ!

গ্র্যান্ট নাকি লিখেছেন, যে কোনো বাণিজ্যেই সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির মধ্যে যে সব চুক্তি হয়, স্বাভাবিকভাবেই সেগুলির ভিত্তিতে থাকে পারস্পরিক স্বার্থের সমতা। কিন্তু একমাত্র বাঙলাদেশেই এই একমাত্র ব্যবসা অর্থাৎ নীল-ব্যবসা আশ্চর্যজনকভাবে সেই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। এর জন্যে ব্যক্তিগতভাবে কোনো একজন বা দু'জন নীলকরকে দায়ী ক'রে লাভ নেই। বাঙলা প্রদেশে নীল ব্যবসার সমস্ত পদ্ধতিটাই কলুষিত। সাক্ষ্যপ্রমাণে স্পষ্টই বোঝা গেছে যে, দরিদ্র চাষীরা আর্থিক ক্ষতির জন্যে যতটা ক্ষুব্ধ তার চেয়ে শতগুণে ক্ষুব্ধ নীলকরদের নির্দয় ব্যবহারে। নীলকরের নির্মম পীড়নের ইতিহাসও দীর্ঘকালের। এবং নীলকরদের প্রতি পক্ষপাতী শাসকগণ এই নিপীড়নকে আরো ভয়াবহ হ'য়ে ওঠার অবকাশ দিয়েছে। যে দেশে এই জাতীয় নিপীড়ন একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার এবং চূড়ান্ত নিপীড়ন চালিয়েও শাস্তির হাত থেকে অব্যাহতি পেতে কোনো বাধা নেই, সে দেশে আইন কেমন ক'রে অসহায় দুর্বলকে রক্ষা ক'রবে? এই বাস্তব সত্য আমাদের শাসন ব্যবস্থার পক্ষে কতখানি শোচনীয় কলঙ্ক!

এবার অনেক দেরিতে উত্তুরে হাওয়া সবে দেখা দিয়েছে।

শীতটা পড়তে পড়তেই যদি পালিয়ে যায় এই ভয়ে উত্তুরে হাওয়ার ছোঁয়া পেতেই শাল-দোশালা, জামেয়ার সব বেরিয়ে প'ড়েছে ধনী বাবুদের ঘরে ঘরে। অন্তত কয়েকটা দিন গায়ে দিয়ে নেওয়া যাক।

ক'দিন আগেই কুমারখালি থেকে হরিনাথ আর কেষ্টনগর থেকে স্কুল ইন্‌স্‌পেক্টর রাধিকাপ্রসন্নের কাছ থেকে একই প্রসঙ্গে খবর এসেছে। বেতাই গ্রামের ইসুব বিশ্বাস আরা বৃন্দাবন দত্তের নেতৃত্বে আশিজন রায়ত অতর্কিতে আর্চিবল্ড হিল্‌সের কাচিকাটা কুঠি আক্রমণ ক'রেছিল। কুঠি তছনছ হঁয়ে গেছে, লেঠেলরা ছত্রভঙ্গ হ'য়ে পালিয়েছে, আমিন, গোমস্তা তাগিদ্‌গিরের দল জখম হ'য়ে কুঠি ছেড়েছে। নায়েব কেদার মুখুজ্যে অল্পের জন্যে প্রাণে বেঁচে গেছে।

ক'দিন পরেই হরিনাথের আর একখানা চিঠি। দারোগা গিরীশ বসুর ওপর হার্শেল ছাড়া আর সমস্ত ম্যাজিস্ট্রেটেরই বিষদৃষ্টি প'ড়েছে। বেচারার চাকরিটা থাকবে কিনা সন্দেহ!

এতদিন যে গিরীশের চাকরি আছে এইটেই তো যথেষ্ট! কিছুদিন থেকেই গিরীশ বোস নামটাকে বিকৃত ক'রে 'গ্রীজ বুজ' নাম দিয়ে ইংলিশম্যান পত্রিকা তাকে যেভাবে আক্রমণ ক'রে চ'লেছে তাতে অনেক আগেই তার চাকরি যেতে পারতো।

একই চিঠিতে আর একটি কাহিনী পাঠিয়েছে হরিনাথ। আসাননগরের মেঘাই সর্দারের বিধবা স্ত্রী যুগলমণি কিভাবে নেতৃত্ব দিয়ে চাষীদের উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলেছে তার ইতিহাস। সেই সঙ্গে নীলকর জেম্‌স্‌কে ফাঁদে ফেলে কেমন ক'রে সে হত্যা ক'রেছে তার বিবরণ। তা প'ড়ে শিউরে উঠেছিল কিশোরীচাঁদ। কোনো নারীর পক্ষে এতখানি পৈশাচিক নৃশংসতা কেমন ক'রে সম্ভব তা সে বুঝে উঠতে পারেনি।

কিশোরীচাঁদ কিছুক্ষণ হতবাক্ হ'য়ে ছিল। তারপর আস্তে আস্তে ব'ললে, সত্যি বল্‌চি হরিশ, আমি যেন এখনো বিশ্বাস ক'রতে পারচি নে, একজন নারীর পক্ষে একজন পুরুষকে ওই নৃশংসভাবে তরোয়াল দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মেরে ফেলা কেমন ক'রে সম্ভব! হাজার হ'লেও নারী তো মায়ের জাত? এ যেন অসম্ভব মনে হচ্চে!

—একটুও অসম্ভব নয় কিশোরী!—খুব স্বাভাবিক স্বরেই হরিশ ব'ললে, When the passions are violently agitated it is in the softer sex that may appear wilh the most violence!

—কী ব'লচো!

—আমার তৈরি করা কথা নয় কিশোরী, ইতিহাসের অভিজ্ঞতা। ভার্জিলের লেখা এই কথাটাও ইতিহাসের সেই বাস্তব সত্যেরই প্রতিফলন—'Guarus furen squid femina possit'.—নারীজাতি যখন প্রতিহিংসার আক্রোশে জ্ব'লে ওঠে তখন সে নৃশংসতম আচরণেও অকুণ্ঠিত।

—এটা কি চিরন্তন সত্য?

—সম্ভবত তাই। নইলে প্রাচীনকাল থেকেই কবি-দার্শনিকেরা একথা ব'লে এয়েচেন কেন? মনে ক'রে দ্যাখো, রেস্টোরেশনে লা মার্টিন ব'লেচেন, 'Women of the highest rank were implacable in their thirst for blood.' কিশোরী, নারী মায়ের জাত, কোমলতা তার চরিত্রের স্বাভাবিক ধর্ম, এটা ঠিক কথা। কিন্তু প্রতিহিংসার উন্মাদনায় একবার যদি সে ক্ষিপ্ত হ'য়ে ওঠে তাহ'লে নৃশংসতার যে চূড়ান্ত পর্যায়ে সে চ'লে যেতে পারে, পুরুষও অনেক সময় তা পারে না। ফরাসি বিপ্লবের প্রথম পর্যায়ে কী হ'য়েচিল? বাস্তিল দুর্গ দখলের পর রক্তের তৃষ্ণায় মেয়েরাই হ'য়ে উঠেচিল ভয়ঙ্করী। রাজা লুই আর তার পরিবারের প্রত্যেকটি মানুষের মুণ্ডচ্ছেদের দাবি তুলেছিল ফরাসি মেয়েরাই। তখন তারা নির্মম, ক্ষমাহীন! দূরে দেশের কথা ছেড়ে দাও, নিজের দেশের দিকেই তাকিয়ে দ্যাখো! তিনবছর আগে আগ্রা, দিল্লী, লখ্‌নৌয়ে কী ঘ'টেচিল? ফ্রান্সে যা ঘ'টেচে তারই রকমফের মাত্র! মহাবিদ্রোহের সময় আগ্রা আর এলাহাবাদে পলাতক শ্বেতাঙ্গদের ওপর পুরুষের চেয়েও অনেক বেশি নির্দয় ছিল নারীসম্প্রদায়। দিল্লী থেকে পলাতক বৃটিশেরা গ্রামাঞ্চলের চাষীদের কাছে কিন্তু যাহোক একটু সাময়িক আশ্রয় পেয়েচিল। কিন্তু তাদের দলের একজনও মহিলা কিন্তু বাড়ির ভেতরে মেয়েদের কাছে আশ্রয় কিম্বা বিন্দুমাত্র সহানুভূতি পায়নি। বিদ্রোহী সেপাইদের লখ্‌নৌ দখলের সময় হয়তো অনেক রক্তপাত এড়ানো যেতো কিন্তু জেনানাদের ক্ষমাহীন মনোভাবের জন্যেই তা সম্ভব হয়নি। এ তো গেল একদিক। অন্যদিকে দ্যাখো, ইণ্ডিয়ান নেটিবদের হাতে শ্বেতাঙ্গ-নিধনের অভিযোগে ইংল্যাণ্ড থেকে শুরু ক'রে এদেশের শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় পর্যন্ত সবাই যে এত হৈচৈ বাধিয়ে দিয়েচিল, তার ভেতর শ্বেতাঙ্গিনীদেরই ভূমিকা ছিল বেশি। বিদ্রোহের শেষের দিকে কোম্পানির ফৌজের হাতে যে হাজার হাজার মানুষের রক্তে মাটি ভিজেচে, সে-রক্তপাতের পেছনেও কিন্তু শ্বেতাঙ্গিনীদের প্ররোচনাই বেশি কাজ ক'রেচে। সুতরাং স্বামীর হত্যাকারীকে যুগলমণি ওই ভাবে মারলেও অবাক্

হওয়ার কিছু নেই। এর সংগে শিক্ষা-দীক্ষা, সামাজিক পরিচয়ের কোনো সম্বন্ধ নেই। ফরাসি বিপ্লবের সময়কার একজন নারীও যা, আসাননগরের যুগলমণিও তাই!

কিশোরীচাঁদ চুপ ক'রে রইলো। তার বিরস মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে হরিশ ব'ললে, আমি কিন্তু যুগলমণির পক্ষে ওকালতি করবার জন্যেই এতগুলো কথা বললুম না কিশোরী। তিন বছর আগে জানুয়ারি মাসে পেট্রিয়টে 'INDISCRIMINATE RETRIBUTION AND THE ANTAGONISM OF RACE নামে যে আর্টিকেলটা লিখেছিলুম, তাতেই কথাগুলো আছে। কোন্ সংখ্যা ঠিক মনে প'ড়চে না। ফাইল বের ক'রবো?

—না, না, দরকার নেই। বাড়িতে আছে, প'ড়ে দেখবো। মনে হচ্চে প'ড়েছিলুম।

হরিশ হেসে ব'ললে, তাহ'লে তোমার ওই গোলপানা মুখখানা আরো গোল ক'রচিলে কেন? হ্যাঁ, আর একবার প'ড়ে দেখো। আচ্ছা কিশোরী, বৃটিশের বশম্বদ আমাদের নেটিব জেন্টুবাবুদের সংখ্যা কত? একেবারেই নগণ্য। তারা নির্যাতন কাকে বলে জানে না। গুপ্তকবির ভাষায় তাদের মনের কথা হ'ল, 'আমরা ভুষি পেলেই খুশি হবো, ঘুষি খেলে বাঁচবো না।' কিন্তু ওই যুগলমণিরা জানে, নির্দয়, নির্মম অত্যাচার কাকে বলে! আমি তো মনে ক'রছি, ওই যুগলমণির ভেতরেই আজ ভারতবর্ষের নিপীড়িত মানুষের যথার্থ প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেচে! বিদ্রোহী চাষীদের সম্পত্তি ব'লতে সামান্য একটু জমি। তাও বাজেয়াপ্ত করা হ'য়েচে। ওদিকে ইংল্যাণ্ডের পার্লিয়ামেন্টে শৌখিন তর্ক-বিতর্ক চ'লচে, কেমন ক'রে ভারতীয়দের মনে একটু শান্তির প্রলেপ দেওয়া যায়? এটা কি সম্ভব? ভারতের কোটি কোটি মানুষের মতামতের অপেক্ষা না রেখে বৃটেনের পার্লিয়ামেন্ট বৈপ্লবিক প্রস্তাব নেবে আর এখানকার বৃটিশ সরকার সেই প্রস্তাব কার্যকর ক'রে এদেশে একেবারে বৈপ্লবিক শাসনের পরাকাষ্ঠা দেখাবে? অন্তত আমি একথা বিশ্বাস করিনে। পেট্রিয়টে 'THE FUTURE OF INDIAN GOVERNMENT' নামে আর্টিকেলটা-ও আর একবার প'ড়ে দেখো, কিশোরী। আমার দৃঢ় বিশ্বাসকেই আমি প্রকাশ ক'রেচি—'I firmly believe, the time is nearly come when all Indian questions must be solved by Indians.'—হ্যাঁ, ভারতবর্ষের যা কিছু সমস্যা তার সমাধান ভারতীয়েরাই ক'রবে!

বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে কিশোরীচাঁদ ব'ললে, তুমি যে সরাসরি আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতার কথা ব'লচো!

—হয়তো তাই! কিশোরী, প্রত্যেক দেশ, প্রত্যেক জাতেরই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আছে। আমাদেরও সেটা আছে বুঝতে পেরে আপাতত একটা কিছু সান্ত্বনার মলম লাগিয়ে ক্ষতচিহ্নের ব্যথা কমিয়ে উপনিবেশটাকে হাতে রাখা একান্ত দরকার ব'লেই বৃটিশের টনক নড়েচে! সেপাইদের বিদ্রোহ আরা নীলচাষীদের এই বিদ্রোহ ওদের রীতিমতো দুশ্চিন্তায় ফেলেচে। বড়ো ধুরন্ধর জাত তো? প্রলেপের একটা মলম বের ক'রেচিল—'কুইন্‌স্ প্রোক্লেমেশন।' দরকারে আরো মলম বের ক'রবে। তবু আমি কিন্তু ওই একই কথা বলতে চাই—'অল ইণ্ডিয়ান কোশ্চেন্‌স্ মাস্ট বী সল্‌ভ্‌ড্ বাই ইণ্ডিয়ানস্ অ্যাণ্ড নট বাই অ্যাংলো স্যাক্সনস্'!

॥ আটাশ ॥

—আমি নাটকখানা প'ড়ে ফেলেচি মিস্টার লঙ! যেটুকু বাঙলা জানি তাতে সব কথাগুলোর অর্থ হয়তো বুঝতে পারিনি, তবে এ-বিষয়ে আপনার সংগে আমি সম্পূর্ণ একমত যে, এই নাটকে নীলকরদের অত্যাচারে জর্জরিত দক্ষিণ বাঙলার বিক্ষুব্ধ জনমানসের যথাযথ প্রতিফলন ঘ'টেছে।

বক্তা বাঙলা সরকারের সেক্রেটারি ডব্লিউ. এস. সিটনকার, যিনি ছিলেন নীল কমিশনের সভাপতি। কয়েকদিন আগে তাঁকে একখানা নীলদর্পণ নাটক দিয়ে গিয়েছিলেন পাদ্রি লঙ।

স্বমতের সমর্থন পেয়ে প্রসন্ন হাঁসি ফুটে উঠ্‌লো ছেচল্লিশ বছর বয়স্ক পাদরির মুখে। ব'ললেন,

আপনি যে আমার অভিমত সমর্থন ক'রেচেন এতে আমি আন্তরিক আনন্দিত। অবশ্য আপনার হাতে সদ্য প্রকাশিত এই নীলদর্পণ তুলে দেবার সময়েই আমার বিশ্বাস ছিল, এই উত্তর-ই আপনার মুখ থেকে পাবো। অক্টোবরের মাঝামাঝিই এ নাটক আমার হাতে আসে। পড়বার পর আমি আরো কয়েক কপি কিনেচি। নিজের হাতে মাত্র দু'জনকেই আমি নীলদর্পণ প'ড়তে দিয়েচি, তার একজন ডক্টর ডফ্, অপরজন আপনি।

—ডক্টর ডফের অভিমত কী?

—অভিমত একইরকম মিস্টার সিটনকার। আপনি তো জানেন, ডক্টর ডফ্ এবং আমি খুব দৃঢ়ভাবেই বিশ্বাস করি, এই অবিবেচক উদ্ধত নীলকরদের জন্যে দীর্ঘকাল ধ'রে সুসমাচারের বাণী প্রচার প্রচণ্ডভাবে ব্যাহত হ'য়ে আসচে। এরা ব্রিটিশ জাতের সম্ভ্রম এবং খ্রীষ্টধর্মের ঘোরতর শত্রু। বরঞ্চ আরো সংক্ষেপে বলা ভালো, মানবিক মূল্যবোধের নিকৃষ্টতম শত্রু এরা।

সিটনকার হেসে ব'ললেন, আর নীলকরেরা ভাবে আপনারা মিশনারিরা তাদের ব্যবসায়ের পক্ষে মারাত্মক শত্রু! অবশ্য, গত কয়েকমাসের ভেতর তাদের আক্রোশের লক্ষ্য একটু পাল্‌টেচে। আপনি নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন, স্যার গ্র্যান্ট এখন তাদের পয়লা নম্বর দুশ্‌মন, দু'নম্বরে জায়গা হ'য়েচে মিস্টার ইডেন এবং আমার।

—কিছু কিছু আমি শুনেচি। স্যার গ্র্যান্টের বিরুদ্ধে উঠে প'ড়ে লাগবার জন্যে নীলকরদের একটা প্রভাবশালী দল ইংল্যাণ্ডে চ'লে গেচে। আমার মনে হয় তাদের একতর্‌ফা মিথ্যে প্রচারের বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ডে স্থিরমস্তিষ্ক বুদ্ধিজীবীদেরও সজাগ ক'রে দেওয়া দরকার!

—সমস্ত পরিস্থিতি জানিয়ে গবর্নর জেনারেল এবং লেপ্টেন্যান্ট গবর্নর দু'জনেই স্যার উডকে বিস্তৃত বিবরণ পাঠিয়েচেন।

—সেটা তো সরকারি ব্যাপার। ধরুন, মিস্টার ডিকিন্সনের মতো উদারপন্থী র‍্যাডিক্যালিস্ট নেতাদের সাহায্যে পার্লামেন্ট সদস্যদের কাছে প্রকৃত তথ্য পেঁাছে দেবার চেষ্টা করলে আশা করি মিস্টার থিয়োবোল্ডের মতো ঝানু ব্যারিস্টারও এবার ততখানি সুবিধে ক'রতে পারবেন না, কারণ, কমিশনের খবর সেখানে পেঁাছে গেছে।

—তা ঠিক। আচ্ছা মিস্টার লঙ, একজন এদেশি নাট্যকারের লেখা এই নীলদর্পণ নাটকেরই একটা তর্জমা করিয়ে যদি পাঠানো যায়?

উৎসাহে উদ্দীপনায় ঝলমল ক'রে উঠ্‌লো লঙ সাহেবের চোখ। ব'ললেন, আশ্চর্য চিন্তার সাদৃশ্য মিস্টার সিটনকার! ঠিক এই প্রস্তাবটিই আপনার কাছে উত্থাপন করবার জন্যে মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছিলুম আমি! তর্জমার দায়িত্ব গ্রহণে আমি এই মুহূর্তেই সম্মতি জানাচ্চি।

উৎসাহিত লঙ সাহেবের দিকে তাকিয়ে সিটনকার ব'ললেন, আপনি যে তর্জমার দায়িত্ব নিতে সম্মত তা জেনে আমি নিশ্চিন্ত হলুম। ইংল্যাণ্ডে পাঠানোর প্রসঙ্গ পরের কথা। আপাতত, এখানেই কিছু আগ্রহী শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোকের জন্যে এই নাটকের একখানা অনুবাদ প্রয়োজন। স্যার গ্র্যান্টকে আমি নাটকখানার কথা ব'লেছিলুম। তিনি এর অনুবাদ প'ড়ে দেখার জন্যে খুবই আগ্রহী। তিনি চান, এই নাটকের অনুবাদ ক'রে অল্প কিছু সংখ্যাক ছাপিয়ে আগ্রহী ভদ্রলোকদের মধ্যে বিতরণ করা হোক!

—খুবই সাধু প্রস্তাব। কিন্তু যাঁরা এদেশেই বাস ক'রছেন, তাঁরা তো নীলকরদের অত্যাচার এবং নীলচাষীদের বিদ্রোহ সম্বন্ধে তবু কিছু জানেন। অনুবাদ ক'রে ছাপাতেই যদি হয় তাহ'লে তাঁদের জন্যে অল্প কয়েকখানা ছাপিয়ে লাভ কী? আমার তো মনে হয়, একই সঙ্গে কিছু বেশি কপি ছাপিয়ে ইংল্যাণ্ডে একটা অংশ পাঠালে সবদিক থেকেই ভালো হয়।

একটু চিন্তা ক'রলেন সিটনকার। তারপর ব'ললেন, স্যার গ্র্যান্ট সবে গতকাল কলকাতার বাইরে সফরে রওনা হ'য়েছেন। তাঁর ফিরতে কয়েকদিন দেরি হবে। যাই হোক, তিনি যদিও

শ'খানেক কপির কথা ব'লেছিলেন তাহলেও আপনার প্রস্তাবে তিনি অসম্মত হবেন না ব'লেই মনে হয়। তর্জমা করিয়ে কত কপি ছাপলে ভালো হয় ব'লে আপনি মনে করেন?

—অন্তত পাঁচশো কপি।

—তাই-ই করুন। দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। কিন্তু তর্জমা ক'রবেন কে—আপনি?

—না, আমি নিজে ক'রতে চাইনে। ইংরিজি সাহিত্যের ওপর যথেষ্ট অধিকার আছে অথচ এদেশেরই মানুষ—এমন কাউকে দিয়ে অনুবাদ না করালে সেটা হয়তো ভাষান্তর মাত্রই হবে, নাটকের ভেতরকার আবেগ-অনুভূতি ঠিকমতো ফুটে উঠবে না।

—হুঁ, ঠিকই ব'লেছেন। পাঁচশো কপিই করুন! এদেশের মানুষ সম্বন্ধে আপনার প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং এদেশীয় সাহিত্য সম্বন্ধে আপনার পাণ্ডিত্য শ্রদ্ধার বিষয়। আপনি যা সমীচীন ব'লে বিবেচনা ক'রেছেন তার বিপক্ষে কিছু ব'লতে যাওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। যদি কিছু মনে না করেন তাহ'লে একটা কথা কি জিজ্ঞেস ক'রতে পারি মিস্টার লঙ? এই নাটকের লেখককে আপনি কি চেনেন?

স্মিত হেসে লঙ ব'ললেন, মাফ করবেন, এ-প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি অক্ষম। হয়তো নাট্যকারের নাম-ধাম-পরিচয় সবই আমি জানি। কিন্তু নিজে যখন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ব'লে 'পথিক' ছদ্মনামের অন্তরালে রয়েছেন তখন সেটা প্রকাশ করা কি আমার পক্ষে উচিত হবে?

লজ্জিতভাবে সিটনকার ব'ললেন, আমাকে মাফ ক'রবেন মিস্টার লঙ! আমি বাঙলা সরকারের সেক্রেটারি হিসেবে জিজ্ঞেস করিনি, এ আমার নিতান্ত ব্যক্তিগত কৌতূহল। জেলা জজ হিসেবে একসময় আমি যশোরে ছিলুম। নাটকের রায়তদের ভাষা আমার খুব চেনা চেনা মনে হ'ল। তাই অনুমান ক'রেচি নাট্যকার সেই অঞ্চলেরই কাছাকাছি কোনো জায়গার অধিবাসী। রায়তদের সংলাপে যশোর-নদীয়া অঞ্চলের কথ্যরীতিই লক্ষ্য ক'রেছি। সে যাই হোক, অনুবাদের দায়িত্ব স্বয়ং লেপ্টেন্যান্ট গভর্নরই যখন আমার ওপর ন্যস্ত ক'রেছেন তখন এ-কাজের জন্যে যা ব্যয় হবে তা সরকারি তহবিল থেকেই বহন করবার প্রতিশ্রুতি আপনাকে আমি দিচ্ছি। আপনি উপযুক্ত ব্যক্তি দিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অনুবাদের ব্যবস্থা করুন!

—আমি আশা করি, জানুয়ারি মাসের ভেতরেই ইংরিজি নীলদর্পণ আপনার হাতে তুলে দিতে পারবো।—দৃপ্ত আত্মবিশ্বাসে ব'ললেন রেভারেণ্ড লঙ।

॥ ঊনত্রিশ ॥

কাঞ্চন মোল্লার বাড়ির কাছাকাছি হ'তেই থমকে থেমে দাঁড়ালো ছকু ঢালী।

পায়ে-চলা পথের পাশেই সেই শিষ্‌আপাঙের ঝোপ। শীতে এখন নিস্তেজ, বিবর্ণ। ওইখানেই তার দুর্গামণিকে ভরা-পোয়াতি অবস্থায় পেটে লাথি মেরে শেষ ক'রে দিয়েছিল লালমোন সাহেবের লেঠেলের দল। বৌয়ের নিষ্প্রাণ দেহটাকে চিতেয় পুড়িয়ে সেইদিনই ওস্তাদ লেঠেলদের আনতে সোরাবের সঙ্গে বরিশালের পথে রওনা হ'য়েছিল ছকু।

কতদিন পরে গ্রামে ফেরা! দিন কেন, বছর! এক বছরের ওপর দিন কেটেছে ভিন গ্রামের পথে, জঙ্গলে আর নদীর বুকে নৌকোর ছইয়ের তলায়। কতদিন আধপেটা খেয়ে থাকতে হ'য়েছে, কতদিন খাওয়াই জোটেনি। কতদিন খেতে ব'সেও খাওয়া ছেড়ে পালাতে হ'য়েছে। বাতাসের আগে মুখে মুখে খবর এসে গেছে, দিগম্বরবাবুকে ধরবার জন্যে রাঙাপাগড়ির দল নিয়ে দারোগা আসছে।

আজ তিনদিন হ'ল সারাক্ষণের সঙ্গী ছকু আর সোরাবকে নিয়ে নিজের গ্রাম চৌগাছায় ফিরেছে দিগম্বর বিশ্বাস। নিঃস্ব, রিক্ত, সর্বস্বান্ত কিন্তু মুখে বিজয়ের হাসি। অনিয়ম, অনাহার, অনিদ্রায়

গত এক বছরে দেহ অর্ধেক হ'য়ে গেছে, দ্'চোখ কোটরে ব'সে গেছে কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই। লারমুর সাহেব যে হার মানতে বাধ্য হ'য়েছে, সেই আনন্দই সব দুঃখ কষ্ট ভুলিয়ে দিয়েছে।

বিষ্ণুচরণ অসুস্থ অবস্থায় খাজুরা গ্রামে এক আত্মীয়ের বাড়িতে রয়েছে। তারও অবস্থা একই—সর্বস্বান্ত। দু'জনের সঞ্চয় মিলিয়ে ছিল মোট সতেরো হাজার টাকা। মাস ছয়েক আগে তার শেষ পাই পয়সাটাও নিঃশেষ হ'য়ে গেছে কিন্তু কাজ থেমে থাকেনি। চৌগাছায় যে-আগুন জ্ব'লেছিল, সেই আগুনের ফুল্‌কি থেকে যে কর্তাদিকে বিদ্রোহের আগুন জ্ব'লে উঠবে, কুঠেলরা কি তা ভাবতে পেরেছিল? কুঁড়ে জ্ব'লতো, গ্রাম জ্ব'লতো—দূরে দাঁড়িয়ে তারা হো হো ক'রে হাসতো। তারপর যখন নীলকুঠি জ্ব'লতে শুরু ক'রেছে তখন তারা বুঝতে পেরেছে, তাদের সে-আগুনের চেয়ে বিদ্রোহের আগুনের আঁচ অনেক বেশি!

দিগম্বরের বাড়ির উদ্দেশ্যেই যাচ্ছিল ছকু। কাঞ্চন মোল্লার বাড়ি পেরিয়ে আর একটু এগোতেই দেখা হ'ল আনোয়ারার সঙ্গে। মেয়েটার কাঁকালে এক ঝুড়ি ভর্তি কুলগাছের ডগার পাতা, হাতে কাস্তে-বাঁধা একটা আঁকশি।

হঠাৎ ছকুর সঙ্গে চোখাচোখি হ'তেই আনোয়ারার মুখখানা কালো হ'য়ে গেল। ছকু তা লক্ষ্যও করেনি। একগাল হেসে ব'ললে, ক্যামন আচিস রে আনু, ভালো তো?

করুণ চোখে পলকের জন্যে মাত্র তাকিয়ে সে মুখ নীচু ক'রলো। মুখে কোনো কথা নেই, শুধু মাথা নাড়লো।

—ছাগলরে খাওয়ানোর জন্যি বরই পাতা নে' যাচ্চিস? তা তোদের বাড়ির হাতুনের পাশে অত বড়ো বরইগাছ থাকতি হে'সো-বান্দা কোটা হাতে কন্দুরি গিইলি?

আনোয়ারা নিরুত্তর।

হঠাৎ মনে পড়ায় ছকু নিজেই ব'ললে, তাই ক'! সে গাছতো শালা নালমোনের বাচ্চারা পোড়ায়ে দে' গেচে। তা জানলি আনু, নালমোন শালা এবার আচ্ছা জব্দ! খালি নালমোন ক্যান, সব শালা কুটেলাই অ্যাদ্দিনি শায়েস্তার লাকান শায়েস্তা!

আনোয়ারা তখন চ'লে যেতে পারলেই বাঁচে। মুখ নীচু ক'রে ব'ললে, মুই যাই—

হন্ হন্ ক'রে হেঁটে চ'লে গেল আনোয়ারা। কয়েকমুহূর্ত ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইলো ছকু। মেয়েটার হ'ল কী? এতদিন পরে দেখা অথচ অমন হাসিখুশি মেয়েটার মুখে কথা নেই! একটু ভেবে আপনমনেই রহস্যের সমাধান ক'রে নিলে ছকু। মুসলমানের মেয়ে তো? বয়স হ'য়েছে তাই আব্রুর জ্ঞানটা হয়তো বেড়ে গেছে।

দিগম্বরের বাড়ির দিকে আবার রওনা হ'ল ছকু।

দিগম্বর হুঁকোর ধোঁয়া ছেড়ে ব'ললে, টাকা গেচে যাক্ রে ছকু, কোনো দুক্কু নাই। বে'চে থ্যাকন আচি, পরিবার-পরিজন নে' গালে তো দু'ডো দিতি হবে? সামান্য ওই বিঘে আষ্টেক জমি আচে, সোরাব আর তুই ভাগে চায কর্। তাইতি যা হয় হবে। আর ইদিক আমবাগান দুডো ইজেরা দে' লগদে যা পাই তাই দে এ-বচ্চরডা ঝাক্ ক'রে চালায়ে নিতি হবে।

সোরাব-ও হাজির আছে। সে ব'ললে, খোদাতালাব মর্জি থাকলি আবার সব-ই হবে বাবু! সিনি ঝ্যাকন অ্যাত্‌খানি সেম্‌লে দেচেন ত্যাকন বাকিটুকুও সেম্‌লে দেবেন!

একটা বছর। একটা দুঃস্বপ্ন! একটা সফল স্বপ্ন!

এই একবছরের ভেতর লাঙলের নিজেনে হাত পড়েনি, জমি ঘাসে ছেয়ে গেছে। সারা জেলা জুড়ে শীতের মরশুমে এত যে খেজুর গাছ কাটা হ'ত, নলেন গুড়, পাটালি আর চিনি তৈরি হ'ত—কোথায় তার চিহ্ন? সেই সময় অষ্টপ্রহর ধ'রে গুড়ের গাড়ি যেতো কোটচাঁদপুর আর কেশবপুরের চিনির কলে। এই চৌগাছাতেই ছিল চার-পাঁচটা চিনির কল। সারা বছর ধ'রে কলগুলো ধু'কছে। খেজুরগাছে জিরেনকাট, দোকাট, তেকাট তো পরের কথা, গাছে হাত-ই পড়েনি। কোন্ গাছ-তোলা সিউলি গাছ তুলবে, চাঁছ দেবে? দাদন দিক বা না দিক, সবায়েরই

নাম কুঠির খাতায়। বছরের পর বছর গাছ-কাটা সিউলিরা তাদের রোজগারের এই সম্বলটুকুকে আঁকড়ে ধ'রে চোখের জল মুছেছে। কুঠির নীলখোলায় নীলগাছ জমা না দিলে তো যেতে হবে কুঠির কয়েদখানায়। তারপর খেজুরগাছ। কিন্তু সবাই কি আর গাছ থেকে রস বের করবার কায়দা জানে? যারা জানে তারাও গত বছরের গোড়া থেকে গাছ তোলার হেঁসো হাতে নেওয়ার ফুরসৎ পায়নি। হাতে তুলে নিতে হ'য়েছে লাঠি নয়তো সড়কি। তাই খেজুর গাছের মাথাগুলো একবছর ধ'রেই অক্ষত। সব গাছ যেন ঝাঁকড়া চুলে-ভরা মাথা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সোরাবের বাবা তাহের আলি মণ্ডল ছিল এ-অঞ্চলের সেরা সিউলিদের একজন। তার হাতের ছোঁয়া পেলে খেজুরগাছগুলো যেন কপিলা গাইয়ের দুধ দেওয়ার মতো ঠিলে বোঝাই ক'রে রস দিত। বাপের কাছেই তালিম পেয়েছে সোরাব। একেবারে গাছ-তোলা থেকে নলি বসানোর বিশেষ কায়দা তার নখদর্পণে।

এ-বছর মরশুম চ'লে গেছে তাই আর উপায় নেই। সামনের মরশুম থেকে বিশ্বাসবাবুর যে খেজুরগাছগুলো আছে সেগুলোর ভার-ও যদি সোরাব পায় তাহ'লে তার আর চিন্তা থাকে না। বিনীতভাবে সে-প্রসঙ্গ তুলতেই সোরাবের একখানা হাত টেনে নিয়ে জড়িয়ে ধ'রলো দিগম্বর। কিছুটা যেন অপরাধীর মতো ব'ললে, আমার মনেই ছিল না রে সোরাব! তোরে দেবো না তো কারে দেবো? অ্যাখন আমার আর ক্ষ্যাম্‌তা নাই। তা না হলি তোদের দুইজনের ভিটেয় দু'ডো চালাঘরও আমি তুলে দেতাম!

দিগম্বরের চোখ ছলছল ক'রে উঠলো। তার চোখের দিকে তাকিয়ে ছকু আর সোরাবের চোখও শুকনো রইলো না। তারই ভেতর দু'জনের চোখ চাওয়া-চাওয়ি হ'য়ে গেল। সোরাব ব'ললে, মুই ঝ্যামন ক'রে হোক, চালাঘর অ্যাখান তুলে নিতি পারবো বাবু। তা নে আপনি ভেবি মন খারাপ করবেন না।

ছকুও ব'ললে, ঘর আমিও অ্যাকখান তুলে নিতি পারবো বাবু। আপনি এই দফায় সোরাব শালার শাদির বন্দোবস্ত ক'রে দেন, ঘর শালা আপনিই চচ্চড় ক'রে উটে যাবে!

মাসখানেক পরের কথা।

দিগম্বর একদিন ডেকে পাঠালো আনোয়ারার বাবা পাঁচু শেখকে। দু'চারটে এ-কথা সে-কথার পর ব'ললে, আর তো অ্যাখন নীলির হুজ্জুৎ নাই? মেয়েডারে এবার শাদি বসাও পাঁচু!

কিছুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইলো পাঁচু শেখ। তারপর ভাঙা গলায় জিজ্ঞেস ক'রলে, কোন্ মেয়ের কতা কচ্চেন বাবু?

—কোন্ মেয়ে আবার, আনু—তোমার আনোয়ারা?

হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠলো পাঁচু।—ও মেয়েরে আমি কম্‌নে শাদি বসাবো বাবু—ও আবাগিরে কেডা শাদি করবে?

—ঝার সঙ্গে শাদির কতা ছিল সে-ই করবে! তোমার কিচ্ছু ভাবতি হবে না পাঁচু—সোরাবের ঘর তুলতি বাঁশ-খ্যাড়-সুতলি ঝা লাগে তার বন্দোবস্ত আমি করিচি। জমিতি জো এসি গেলি ওর নাঙ্গল ধরার বন্দোবস্তও আমি ক'রে দেবো। তোমার মেয়েরে না খেয়ি থাকতি হবে না। সোরাবের হাতে দিলি মেয়ে তোমার সুখী হবে, ভয় নাই।

অপ্রত্যাশিত আনন্দ আর কৃতজ্ঞতায় পাঁচু শেখের বুকের ভেতর থেকে কান্নার বেগ যেন আরো জোরে ঠেলে বেরিয়ে আসতে লাগলো। কাঁধের গামছায় বারবার ক'রে চোখ মুছতে মুছতে ভাঙা গলায় সে ব'লতে লাগলো, নসীব, বাবু! সবই নসীব! নসীবির ফের না থাকলি আমার আনুর এই দশা হয়?

সেই বীভৎস রাত!

সারা চৌগাছা গ্রামে দাউ দাউ ক'রে আগুন জ্ব'লছে। কুঠির লেঠেলদের পৈশাচিক উল্লাসধ্বনি

আর শ'য়ে শ'য়ে আহত নারীপুরুষের আর্তনাদে চিরে খান্ খান্ হ'য়ে যাচ্ছে অন্ধকার রাত। পরের দিন সকালে মণ্ডলপাড়ার এক ডোবার ধারে অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া গেল ধর্ষিতা পনেরো বছর বয়সের মেয়ে অনোয়ারাকে। নিসিন্দেগাছের তলায় প'ড়ে আছে দলিত, পিষ্ট একটা ফুলের কুঁড়ি।

আনোয়ারাকে তবু পাওয়া গিয়েছিল। আর কয়েকটা মেয়েকে তো পাওয়াই গেল না। তারা বেঁচে আছে না ম'রে গেছে, কেউ জানেও না। চৌগাছা গ্রামের জীবন থেকে তারা মুছে গেছে।

কী ব'লে দিগম্বরবাবুকে কৃতজ্ঞতা জানাবে তা ভেবে পাচ্ছে না পাঁচু। প্রস্তাবটাও তার যেন বিশ্বাস হ'তে চাইছে না। সোরাব তার আনোয়ারকে ঘরে নেবে? একে মুসলমানের মেয়ে, তার ওপর রক্তখেকো লালমোন সাহেবের পাঠানো দোজখের শয়তানগুলো নষ্ট ক'রে দিয়ে গেছে মেয়েটার জেনানাধরম। সেই মেয়ের কাছে শাদির ইজাব নিয়ে সোরাবের তরফ থেকে লোক এসে দাঁড়াবে? চাইবে বিবির সম্মতি? এমন দিল্, এমন ক'ল্জে কি সোরাবের আছে?

ব্যাকুলস্বরে পাঁচু ব'ললে, বাবু, সোরাব ঝে আপনারে বাপের লাগান মন্যি করে, তা মুই জানি। কিন্তুক সে নাজি আচে কিনা তা পুছ্ ক'রে দ্যাকেচেন?

—তা না দেকে তোমায় কচ্চি? সোরাব নিজি আমারে জবান দেচে। তোমার বিবির সঙ্গে কতা ক'য়ে তুমি দিন-ক্ষণ ঠিক করো, আমি ইদিকটা দেকি।

সোরাব-ই প্রস্তাবক। কয়েকদিন আগে দিগম্বরের কাছে সে নিজেই কথা পেড়েছিল। আনোয়ারাকে সে ভালোবাসে। যে-কলঙ্কের দায়ে মেয়েটাকে সবাই আড়চোখে দেখে, তার জন্যে মেয়েটা নিজে কি দায়ী? কিসের কলঙ্ক? সোরাবের দিল্ যদি সাচ্চা হয়, পেয়ার-মুহব্বৎ যদি সাচ্চা হয় তাহ'লে জবান খেলাপি সে ক'রবে না! জবান পাঁচু শেখকে না দিক, নিজের মনকে দিয়েছে, আনোয়ারাকেও দিয়েছে। ওই মেয়েকেই সে ঘরে আনবে, তার মুখে হাসি ফোটাবে, তার সব দুঃখ ভুলিয়ে দেবে!

সেদিন সোরাবকে দেখে আনোয়ারা ছুটে পালিয়েছিল। একটা কথা বলা তো দূরের ব্যাপার, দ্বিতীয়বার মুখ তুলেও চায়নি। অথচ, নীল-হাঙ্গামার আগে শাদির কথাবার্তা যখন মোটামুটি পাকা, তখন মন-জুড়ানো হাসি আর দুষ্টু দুষ্টু মিষ্টি কথায় কতবার আনোয়ারা সোরাবের মন ভরিয়ে দিয়েছে! সোরাবও উপযুক্ত জবাব দিত।

উঁ! শাদি করার তো খুব শখ! তা দেনমোহর কী দেবা?

—ক্যান, ক'লজে কেটি মোহর গড়ায়ে দেবো তোর দেনমোহর?

—হায় আল্লা, ক'লজে কি তোমার আচে? মুইতো ভাবি, বাপজান অ্যামন খসমের হাতে আমারে দেচ্চে ঝার ক'লজে ব'লে পদাত্থ নাই!

—কবুলনামায় অ্যাকবার নাজি হ' তারপর দেকিস্, খসমের ক'লজের বাহার কত!

—উঁ! অকম্মা নাপিতির ধামাভরা ক্ষুর!—ফিক্ ক'রে হেসে ব'লেছিল আনোয়ারা, তোমার ক'লজে ঝুনো নেরকোলের লাকান শুকনো ঠন্‌ঠন্, বুজলে?

—ঝুনো নেরকোলই মিষ্টি হয় রে আনু! কাঁটাভরা খাজুর গাচের বুকির মদ্যিই জমা থাকে মিষ্টি অসের ফোয়ারা, তা মানিস্ তো?

ফিক্ ক'রে আবার হেসে আনোয়ারা ব'লেছিল, দ্যাকা যাবে খাজুর না শ্যালকাঁটা!

কত মিষ্টি স্মৃতি! কত সুখের স্বপ্ন! কিন্তু নীল-বিষের ভয়ঙ্কর কালো ধোঁয়ায় সব স্বপ্ন মিলিয়ে গেল! সব কিছুই এখন নতুন ক'রে গ'ড়ে নিতে হবে!

ক'দিন আগে আনোয়ারার সঙ্গে একবার দেখা হ'য়েছিল সোরাবের। তখন বিকেলের আলো একটু প'ড়ে এসেছে। কপোতাক্ষ পেরিয়ে গুয়াতেলি গ্রামে গিয়েছিল সোরাব। এ-সময় নদীতে তেমন জল থাকে না। হাঁটুজল হেঁটেই পার হওয়া যায়। নদীর ওপার থেকেই সোরাব দেখতে

পেয়েছে, মেটে কলসিতে জল ভ'রে বাড়ি ফেরার জন্যে আনোয়ারা পা বাড়িয়েছে। নদীর পাড়ে ধারে-কাছে আর কেউ নেই। একটু চাপা গলায় সোরাব ডাকলো, দাঁড়া আনু, কতা আচে!

বিবর্ণ হ'য়ে গেল আনোয়ারার মুখ। তার পা-দুটো যেন অসাড় হ'য়ে গেছে। নদীর কিনারে সে যেখানে দাঁড়িয়ে সোরাবের গলা শুনতে পেয়েছে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলো। পুরন্ত বোলের গন্ধে ভরা যৌবনবতী আমগাছের শাখায় শাখায় মৌমাছির গুঞ্জন। একটানা একটা মিষ্টি সুরের তান কানে বাজছে। গুলঞ্চলতায় ছেয়ে গেছে একটা পাকুড়গাছ। কয়েকটা দোয়েল আর ফিঙে ব'সে দোল খাচ্ছে লতায় লতায়।

দ্রুতপায়ে নদী পেরিয়ে এসে বেশ একটু অভিমানের স্বরে সোরাব ব'ললে, আমারে দেকে সিদিন মুক ঘুরোয়ে চ'লে গেলি ক্যান, আনু?

আনোয়ারার বুক ফেটে কান্না বেরিয়ে আসতে চাইছে। দাঁতে দাঁতে চেপে নিজেকে সে সামলানোর চেষ্টা ক'রতে লাগলো।

—কতা কচ্চিস না ঝে?

তীব্র যন্ত্রণায় কুঁকড়ে উঠতে লাগলো আনোয়ার মন। মুখ নীচু ক'রে চোখের জল আড়াল ক'রে নিষ্প্রাণ স্বরে সে ব'ললে, কী কবো?

—তোর বাপজানেরে এবার শাদির কতা কই?

শিউরে উঠলো আনোয়ারা। —না! না—

—না ক্যান? কতা ছিল, তুই আমার ঘরে রোশনাই হবি—এবার হ'!

—তুমি জানো না, মুই নাপাক হ'য়ে গিইচি? —টপ্ টপ্ ক'রে আনোয়ারার চোখ থেকে জল প'ড়তে লাগলো।

সোরাব তেজী গলায় ব'ললে, মুই মানি নে। জবরদস্তি ক'রে কেউ কাউরি নাপাক কত্তি পারে? ঝার নিজির মনে গুনাহ্ নাই তারে নাপাক করে কোন্ শালা? তোরে আমি জবান দিচ্চি আনু, কোনো অযতন তোর হবে না! সোরাবের বিবিরি কেডা নাপাক কয়, তা আমি দেকে নেবো! তুই কবুল হ', অমি শাদির কতা পাড়ি?

মুখ তুলে মর্মান্তিক করুণ দৃষ্টিতে একবার শুধু সোরাবের মুখের দিকে তাকিয়ে দ্রুত পায়ে চ'লে গেল আনোয়ারা। সোরাবের বুকের ভেতরটা ঝিলিক দিয়ে উঠলো। মেয়েরা নাকি মনের কথা বলে মুখের ভাষায়। আনোয়ারা এবার কবুল হ'য়েছে!

এর দিন তিনেক পরেই পাঁচু শেখকে ডেকে পাঠিয়েছে দিগম্বর। টাকার জোর যখন নেই তখন নেওতাদাওয়াতের উপায়ও নেই। পরে যদি সুদিন আসে তখন সাগাই-কুটুমদের দাওয়াত দিয়ে খাসি জবাই ক'রে খাইয়ে দেওয়া যাবে।

সোরাবের ঘর তোলা শুরু হ'য়ে গেছে। পাঁচু শেখও মেয়ের জন্যে নতুন নাকছাবি আর মাকড়ি গড়াতে দিয়েছে। সেইটুকুতেই খুশি নয় ফতেমা। যে-মেয়ের শাদির কোনো আশাই ছিল না, খোদা যখন তার দিকে ফিরে তাকিয়েছে তখন মেয়েকে আরো কিছু দিয়ে সাজিয়ে দিতে হবে বৈকি! গোট, বাউটি সব দিতে হবে! নিজের পাঁচভরি রুপোর গোট পাঁচুর হাতে তুলে দিয়ে ফতেমা ব'ললে, লতুন ক'রে গড়ায়ে আনো। বাউ গড়াতি ঝেটুক্ চাঁদি নাগে তা কিনতি হবে। এক কুড়ো জমি লয় বেচেই দ্যাও—

ক'দিন পরেই খাজুরা গ্রামের একজনকে দিয়ে অসুস্থ বিষ্ণুচরণ খবর পাঠালো, অবস্থার চাপে কুঠেলরা সাময়িকভাবে চুপচাপ ক'রে থাকলেও তাদের বিষদাঁত কিন্তু ভাঙেনি। সামনের মরশুমে ডেভিস আর মায়ার্শ সাহেব নতুন জাঁতাকল চালু করবার ফন্দি আঁটছে। তাদের পেছনে লারমুর আর ফরলঙের উস্কানি আছে।

খবরটা পেয়ে সেদিন গভীর রাতেই সোরাব আর ছকুকেও খবর পাঠিয়ে দিয়েছে দিগম্বর। কাল সকালেই তারা যেন আসে। আগে থেকেই শলা-পরামর্শ ক'রে রাখতে হবে।

ভোরবেলাতেই সোরাব আর ছকু এসে হাজির। তাদের কাছে বিষ্ণুচরণের খবর বিশদভাবে ব'লে তারপর সোরাবের দিকে তাকিয়ে সস্নেহ হাসি হেসে দিগম্বর ব'ললে, আর দু'চারদিন বাদেই আমাদের সোরাব মিঞা শাদি কত্তি চলিচে। কাজে কাজেই ওরে কিন্তু অ্যাখন কয়ডা দিন টানাটানি করা উচিত হবে না। কী ক'স সোরাব, বিবির গোসা হবে না?

সলজ্জ ভঙ্গিতে সোরাব ব'ললে, কী যে কন, বাবু!

ছকু কী যেন একটা ফোড়ন কাটতে যাচ্ছিল তার আগেই কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে ছুটে এসে দিগম্বরের সামনে পাঁচু শেখ হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠলো। —আমার সব শ্যাষ হ'য়ে গ্যালো বাবু, সব শ্যাষ! আনু আর নাই—

—তার মানে? —উদ্‌ভ্রান্তের মতো জিজ্ঞেস ক'রলো দিগম্বর।

—ক'লকে ফুলির বীচি বেটি সেই বিষ খেয়ি সে নিজির শ্যাষ ক'রে দেচে বাবু। কালকে রাত্তিরি কোন্ সময় আমার আবাগিনী মা জহরবিষ খেয়িচে আমরা বুজতি পারি নাই। ফজরের ব্যালায় তার শরীল নীলবন্ন। সে নাই বাবু, সে চ'লে গ্যালো! আর কারে আপনি শাদি বসাবেন? হায় আল্লা! এ তুমি আমার কী কল্লে? আল্লা—

॥ ত্রিশ ॥

—আপোস? অসম্ভব! অসম্ভব!

চিৎকার ক'রে উঠে ব'সলো হরিশ। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল একটা কাশির দমক।

ঘুম ভেঙে গেছে ছোটোবৌয়ের। ধড়মড় ক'রে সে উঠে প'ড়লো। কিন্তু অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না হরিশকে। আচমকা ঘুম ভেঙে যাওয়ায় তারও বুকের ভেতর ধড়্‌ফড়্ ক'রছে। সেই অবস্থাতেই সে জিজ্ঞেস ক'রলে, হ্যাঁ গা, কী হ'য়েচে? কী হ'ল?

কাশির বেগ সাম্‌লে তখনো কথা ব'লতে পারছে না হরিশ। ছোটোবৌ তাড়াতাড়ি খাট থেকে নেমে গিয়ে বাতি জ্বাললো। দেওয়াল ঘড়িতে ঢংঢং ক'রে তিনটে ঘন্টা প'ড়লো। রাত তিনটে বাজে।

খাট থেকে নেমে নিচে থেকে পিকদানিটা নিজেই তুলে নিলে হরিশ। আলোর তেজ যত কমই হোক, তাতেই ছোটোবৌ স্পষ্ট দেখতে পেলে, শ্লেষ্মার সঙ্গে কয়েক ঝলক রক্ত প'ড়লো পিকদানিতে।

কাশির দমক ক'মলো। হাতের পিকদানি মেঝেয় নামিয়ে রেখে মুখ মুছে নিয়ে হরিশ ব'ললে, কিছু হয়নি ছোটোবৌ, একটা স্বপ্ন দেখ্‌ছিলুম।

ছোটোবৌয়ের বিহ্বল দৃষ্টি তখনো পিকদানির দিকে। তার কানায় টকটক ক'রচে কয়েক ফোঁটা কাল্‌চে লাল রক্ত!

—হ্যাঁ গা, রক্ত প'ড়লো কেন?

ছোটোবৌয়ের ভয়ার্ত বিহ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে নির্বিকার স্বরে হরিশ ব'ললে, না, না, রক্ত হ'তে যাবে কেন? কয়েকটা বেশি পান খেয়েছিলুম তো? আলো নিবিয়ে দাও।

মাথা একটু ঝিম্‌ঝিম্ ক'রছে। ঘামে সারা গায়ে চট্‌চটে ভাব। জ্বর এখন আর নেই। কিন্তু বিকেলের দিকে প্রত্যেকদিনই জ্বর আসে। জ্বর গায়ে চলে লেখাপড়ার কাজ। শরীরে বেশি অস্বস্তি বোধ ক'রলেই মদের মাত্রা বাড়ে। শেষ রাতের দিকে একটু একটু ঘাম দেখা দিতেই রোজ প্রায় ঘুম ভেঙে যায় হরিশের। বুঝতে পারে, জ্বরটা এবার ছেড়ে যাচ্ছে। তার একটু পরে চোখে আবার নেমে আসে তন্দ্রা।

একটা স্বপ্ন দেখেই ঘুম ভেঙেছে হরিশের।

আলিপুর সদর আমিনের আদালত ঘরে সে যেন দাঁড়িয়ে আছে। হাকিমের পাশে একটা

চেয়ারে ব'সে আছে আর্চিবল্ড হিল্‌স্‌। এজলাশ ঘরের এককোণে দাঁড়িয়ে অঝোর ধারায় কাঁদছে একটি চাষীবৌ। তার দিকে তাকিয়ে। আর্চিবল্ড হিল্‌স্‌ মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসছে আর হাকিমের কানে ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে কী যেন ব'লছে। হরিশের, ব্যারিস্টার মিস্টার মন্টিও সওয়াল করতে উঠবেন এমন সময় রমাপ্রসাদ আর শম্ভুনাথ যেন দু'পাশ থেকে হরিশের কানের কাছে মুখ এনে ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে ব'ললে, বুঝতেই তো পারচো হেরে যাবে? তাই ব'লচি, আপোস ক'রে নাও!

সঙ্গে সঙ্গে চাষীবৌটি যেন ডুক্‌রে কেঁদে উঠে মেঝেয় লুটিয়ে প'ড়লো আর হরিশও চিৎকার ক'রে উঠ্‌লো, আপোস? অসম্ভব!

সেই চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গেই তার ঘুম ভেঙেছে আর কাশির বেগ এসেছে বুক ঠেলে।

মাঝে মাঝে কাশতে গিয়ে রক্ত পড়ে, হরিশ তা নিজেই কয়েকদিন আগে থেকে লক্ষ্য ক'রে আসছে। কিন্তু একসঙ্গে এতখানি রক্ত এই প্রথম।

আলো নিবিয়ে দিয়েছে ছোটোবৌ। ঘর আবার অন্ধকার। ছোটোবৌয়ের একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ ভেসে এলো হরিশের কানে।

—ছোটোবৌ। আমি কি খুব জোরে চেঁচিয়ে উঠেছিলুম?

—হ্যাঁ। —মৃদুস্বরে উত্তর দিলে ছোটোবৌ।

—আমার নামে নীলকর সায়েবেরা যে মামলা রুজু ক'রেচে সেই মামলা নিয়েই স্বপ্ন দেখছিলুম। মামলায় হেরে গেলে দশহাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে! কি জানি কোত্থেকে দেবো! হয়তো বাড়িটাই বিক্রি ক'রে দিতে হবে! তারপর তোমরা কোথায় দাঁড়াবে, তাই ভাবচি!

ছোটোবৌ নীরব। হরিশও কিছুক্ষণ নীরব রইলো। তারপর আপনমনেই যেন ব'ললে, আপোস জিনিসটা কত সোজা অথচ কত কঠিন!

—তুমি ঘুমোও!

—আর ঘুম আসবে না। আচ্ছা ছোটোবৌ, সারাজীবনে আমি তোমার ওপর কত অবিচার ক'রেচি, তার একটা হিসেব আমাকে দিতে পারো? কয়েকটা ফিরিস্তি নিজেই অবিশ্যি আমি দিতে পারি! অদৃষ্টের কি পরিহাস, বিপত্নীক হওয়ার পরে আর বে' ক'রবো না ব'লে প্রতিজ্ঞা ক'রেও প্রবৃত্তির তাড়নার কাছে হার মানলুম! অথচ, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর তোমার আমার ভেতর মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো কঠিন ব্যবধানের একটা পাঁচিল আর সেই প্রবৃত্তিই চাবুক মেরে মেরে আমাকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াতে লাগলো কুলটাদের ঘরে ঘরে! তুমি কেন জোর ক'রে আমাকে বেঁধে রাখতে পারলে না ছোটোবৌ?

আবার একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ। তারপর শোনা গেল ছোটোবৌয়ের ম্লান কন্ঠস্বর, এ-সব কতায় এখন আর লাভ কী? তুমি ঘুমিয়ে পড়বার চেষ্টা করো!

—হ্যাঁ, ঘুমিয়ে প'ড়তে তো হবেই একদিন, তার আগে যে-ক'টা দিন হুঁশ থাকে সেই ক'টা দিন একটু না হয় পেছন ফিরে তাকালুম! একটা ব্যাপার আমার বড়ো আশ্চর্য লাগে ছোটোবৌ! জিজ্ঞেস ক'রলে জবাব দেবে?

—কিসের জবাব, কেমন ক'রে দিতে হবে, তা তো আমি জানিনে!

—তুমি ছাড়া আর কে জানবে? এই যে দেড়বছরের ওপর গাঁ থেকে আসা চাষীদের জন্যে রোজ দু'বেলা ঘন্টার পর ঘন্টা হাঁড়ি ঠেললে, এ তো তুমি না-ও ক'রতে পারতে ছোটোবৌ? তারা আসতো আমার কাছে, আর এ-বাড়িতে আমি সবচেয়ে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি। তাই জিজ্ঞেস ক'রচি, এ-দায়িত্ব তুমি কাঁধে ব'য়ে নিলে কেন?

ছোটোবৌয়ের দিক থেকে কোনো উত্তর নেই। একটু অপেক্ষা ক'রে হরিশ আবার ব'ললে, কিছু ব'লচো না যে?

—কী ব'লবো? আমি একা তো হাঁড়ি ঠেলিনি, বাড়ির সবাই ঠেলেচে।

হরিশ আবার কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে তারপর ব'ললে, মধু-মাকে তুমি নিজের মেয়ের

মতো ভালোবাসো, তা-ও আমি বুঝতে পারি। এ-বাড়িতে সে অভাগিনীর একমাত্র আশ্রয়স্থল তার কাকাবাবু। সেই কারণেই তো তার ওপর তোমার সবচেয়ে বেশি আক্রোশ থাকার কথা ছিল। অথচ কেন যে একমাত্র ওই মেয়েটাকেই তুমি এমনভাবে বুকে টেনে নিলে, তার রহস্য আজো আমার কাছে দুর্বোধ্য! তোমাকে এতদিন কি আমি কেবল ভুলই বুঝে এলুম?

দু'একটা কাক ডাকতে আরম্ভ করেছে।

—ভোর হ'য়ে গেল নাকি? জানালার কপাট একটু খুলে দেবে ছোটোবৌ?

খাট থেকে নেমে গিয়ে দক্ষিণের জানালার আধ-ভেজানো কপাট আর একটু খুলে দিলে ছোটোবৌ। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রিশেষের ম্লান, পাণ্ডুর চাঁদের আলোয় রাতের অন্ধকারে একটা ঘোলাটে অস্বচ্ছ ছোঁয়া লেগেছে মাত্র। খোলা জানালার পটভূমিতে একটা ছায়ামূর্তির মতো দেখাচ্ছে ছোটোবৌকে। নির্নিমেষ দৃষ্টিতে বেশ কয়েকমুহূর্ত সেই ছায়ামূর্তির দিকে তাকিয়ে রইলো হরিশ। তাকে অতিক্রম ক'রে দৃষ্টি চ'লে গেল বাইরের দিকে। মোক্ষদার স্মৃতি সেই কদমগাছটা তার বিস্তৃত শাখা-প্রশাখার সীমানা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে গর্বোদ্ধত ভঙ্গিমায়। ফিকে আলো-আঁধারির ভেতর সে-ও একটা নিশ্চল ছায়া-মূর্তির মতো। ও-গাছটার একটা পাতা ছুঁলেও যেন ওফেলিয়ার হাতের ছোঁয়া পাওয়া যায়!

—ছোটোবৌ! ওই কদম গাছটার বয়েস কত হ'ল, জানো?

—জানি। মাধুর কাছে শুনেচি।

আবার একটা কাশির দমক। কাশতে কাশতে উঠে ব'সলো হরিশ। এবার সে নিজে খাট থেকে নামার আগেই পিকদানিটা তুলে তার মুখের কাছে ধ'রলো ছোটোবৌ।

মাধুরীর মুখে খবরটা শুনে মুখ কালো হ'য়ে গেল রুক্মিণীর। মাধুরী শুনেছে খুড়িমার কাছে।

রক্ত পড়ার খবরটা শুনেই ঝর্‌ঝর্‌ ক'রে কেঁদে ফেলেছিল মাধুরী। আর তার মুখে খবরটা শুনে প্রথম কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলেন রুক্মিণী। তারপর হঠাৎ ডুক্‌রে কেঁদে উঠে কপালে করাঘাত ক'রে ব'ললেন, এ-কপালে সুক তো ভগমান নেকেনি রে মাধু, এই তো হবে! এই তো হবে!

কাঁদতে কাঁদতে ঠাকুরঘরে গিয়ে লুটিয়ে পড়লেন রুক্মিণী। —মা কালী, এ তুমি আমার কী সব্বোনাশ কল্লে মা!

এতদিনের শোনা কথাটা তাহ'লে ভুল? যার হাঁপানি থাকে তার নাকি রাজরোগ হয় না? তাহ'লে হ'ল কেন? চোখের জলে বুক ভাসিয়ে কালীর পটের সামনে কাঁদতে লাগলেন রুক্মিণী। —তোমার মানতের পুজো তো আমি দিয়েচিলুম মা! তবু কেন আমাকে এতবড়ো শাস্তি তুমি দিচ্চ মা? আমার হরিশকে তুমি ভালো ক'রে দাও মা, আমি সোনার নত্‌ গড়িয়ে তোমার পুজো দেবো! ভালো ক'রে দাও—

ক্লান্তি যে আগের চেয়ে অনেক বেশি লাগে, তা নিজেই বুঝতে পারে হরিশ। আপিস থেকে পেট্রিয়ট প্রেসে ফেরার পথে কেরাঞ্চিগাড়ির ভেতরে মাথাটা একটু হেলিয়ে রেখে চুপচাপ ব'সে থাকে। এসে পেঁছনোর পরেই তো আবার কাজ আর কাজ।

প্রতিদিন বিকেলে চাকরকে দিয়ে দুধ আর ফল ফলারি পাঠিয়ে দেন রুক্মিণী। প্রথম দু'একদিন খেতেই চায়নি হরিশ। কিন্তু রুক্মিণীর ব্যাকুল কান্নার সঙ্গে গলা মিলিয়ে মাধুরী একদিন বললে, তুমি যদি না খাও কাকাবাবু তবে ঠিক জেনে রেকো, আমার মরা-মুক দেখবে!

তারপর থেকে খাবার আর ফিরিয়ে দেয় না হরিশ। হয়তো আধঘন্টার বিরতি। তারপরই আলমারি থেকে বেরোয় সুরাপাত্র।

হারাণকে দিয়ে এক রবিবারের সকালে কালীঘাটের সেরা কবিরাজ দামোদর ভিষক্‌রত্ন মশাইকে

ডাকিয়ে এনেছিলেন রুক্মিণী। তিনি বহুক্ষণ ধ'রে হরিশকে পরীক্ষা ক'রলেন। পরীক্ষা ক'রতে ক'রতে তাঁর মুখ-ও কালো হ'য়ে গেল। বিধান দেওয়ার আগে তিনি ব'ললেন, ব্যাধি কঠিন, নিরাময় হ'তে সময় লাগবে। কিন্তু তার আগে আমার প্রথম বক্তব্য, আপনাকে সুরাপানের অভ্যাস সম্পূর্ণ পরিত্যাগ ক'রতে হবে!

—এখন আর তা আমার পক্ষে সম্ভব নয়!

—কেন সম্ভব নয়? দেহের আরোগ্যের প্রয়োজনে মানুষকে কত প্রকারের অভ্যাসকে বর্জন ক'রতে হয় আর আপনি এইটুকু পারবেন না?

মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠ্‌লো হরিশের মুখে। ব'ললে, আপনি প্রবীণ শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। আপনি চিকিৎসক হিসেবে যে নির্দেশ দিচ্ছেন, তা পালন করা আমার কর্তব্য। কিন্তু যা আমি পারবো না, তার সম্বন্ধে মিছে প্রতিশ্রুতি দিয়ে লাভ কী বলুন? মিছে কথা আমি বলিনে। আমি তো জানি, প্রতিশ্রুতি দিলেও তা আমি রক্ষে করতে পারবো না।

করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দামোদর কবিরাজ ব'ললেন, তাহ'লে ব্যাধির উপশম কেমন ক'রে হবে?

হরিশ হাসতে হাসতেই ব'ললে, দেহ যখন আছে, ব্যাধিও তখন অনিবার্য। আপনার যদি এমন কোনো ওষুধ থাকে, যা সুরাপানের প্রতিক্রিয়াকে কাটিয়ে দিয়ে নিজে কিছু ক্রিয়া করতে পারবে, সেইরকম কোনো ওষুধ দিন!

—তবু আপনি এই সংযমটুকু পালন ক'রতে পারবেন না?— রীতিমতো অসহিষ্ণু বিক্ষুব্ধ কণ্ঠে দামোদর ব'ললেন, হরিশবাবু, অন্য কোনো রোগী, এমন কি রাজা-মহারাজা হ'লেও আমি এই দণ্ডেই চিকিৎসা বিষয় প্রত্যাখ্যান ক'রে চ'লে যেতুম! কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে তা পারচিনে, কারণ, চৌদ্দগণ্ডা রাজা-মহারাজার চেয়ে আপনার জীবন অনেক বেশি মূল্যবান। দেশের, সমাজের—সর্বোপরি অসহায় আতুরদের প্রয়োজনের জন্যেও আপনার দীর্ঘায়ু প্রয়োজন। আপনি আমার অনুরোধটুকু রক্ষে করুন, আমিও নিশ্চিন্ত মনে আমার সাধ্য অনুসারে সুচিকিৎসার চেষ্টা ক'রে যাই।

—আমি চেষ্টা ক'রে দেখতে পারি কবরেজমশাই কিন্তু নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দিতে পারিনে যে, সুরাপান আমি ত্যাগ ক'রবোই! আন্তরিক চেষ্টা ক'রবো, কেবল প্রতিশ্রুতিই দিতে পারি।

অগত্যা এতেই রাজী হ'য়ে বিধান দিয়ে গেছেন দামোদর কবিরাজ। ওষুধপত্র খাওয়ানোর দায়িত্ব নিয়েছে মাধুরী।

জানুয়ারি মাসের গোড়া থেকেই ইণ্ডিয়ান ফীল্ড চ'লে গেছে বৌবাজারের নতুন প্রেসে। ওদিকে শম্ভুচাঁদ 'মুখার্জিস্‌ ম্যাগাজিন' নামে নিজে একটা পত্রিকা বের ক'রতে যাচ্ছে। টাকার জোগান দিচ্ছে কালীপ্রসন্ন। হরিশের কাছে অনুমতি চেয়েছিল শম্ভুচাঁদ। সানন্দে সম্মতি দিয়েছে হরিশ। হেসে ব'লেছিল, আমার সম্মতির কোনো প্রয়োজনই ছিল না শম্ভু! তুমি স্বাধীনভাবে দাঁড়াও, এতেই আমার আনন্দ। কিন্তু আমার সম্মতি চাইছো দেখে বুঝতে পারচি, বিবেক আর কৃতজ্ঞতাবোধ নামক বৃত্তিটার পোকা তোমার মাথায় বাসা বেঁধে আছে! ওহে ছোকরা; কলকাত্তাই ধাঁচে জীবনে উন্নতি ক'রতে গেলে ও দু'টোকে যেন বেশি প্রশ্রয় দিও না।

ক'দিন আগে মধুসূদনের মেঘনাদ বধ কাব্যের প্রথম খণ্ড বেরিয়েছে। পাঁচটা সর্গ নিয়ে প্রথম খণ্ড। বাকি কয়েকটা সর্গ নিয়ে দ্বিতীয় খণ্ড নাকি খুব দ্রুত লেখা চ'লছে। মধু তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় 'টু মাই বিলাভেড নটোরিয়স পেট্রিয়ট' লিখে মেঘনাদ বধের একখানা কপি পাঠিয়ে দিয়েছে হরিশকে। কালীপ্রসন্ন ছেলেটা 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' নামে যে বইখানা ছাপছে তাতে নাকি ক'লকাতার বাবু সমাজকে নিয়ে ব্যঙ্গ-শ্লেষের ফুলঝুরি ছোটানো হ'য়েছে। শম্ভুচাঁদের মুখেই খবরটা পেয়েছে হরিশ। কালীপ্রসন্নর নক্‌শা সম্ভবত আর পনেরো-বিশ দিনের ভেতরেই বাজারে বেরিয়ে যাবে। মিউটিনির সময় বাঙালীবাবুদের আচরণ নিয়ে খুব নাকি কটাক্ষ ক'রেছে

হুতোম অর্থাৎ কালীপ্রসন্ন। সেটা স্বাভাবিক। সেপাই আর উত্তরভারতের চাষীরা যখন বৃটিশ বাহিনীর হাতে অজস্র রক্ত দিচ্ছে তখন কলকাতার জমিদার এবং প'ড়ে-পাওয়া চৌদ্দআনার ধনীবাবুরা যেচে যেভাবে রাজভক্তির ঘটা দেখিয়েছিল, তা নিয়ে কালীপ্রসন্ন রসিয়ে রসিয়ে বেশ মজার কথা ব'লতো।

"যখন বিভিন্ন দেশে রাজারা তাঁদের স্বৈরাচারী শাসনের জন্যে সিংহাসনচ্যুত হচ্ছেন, তখন আমরা এখানে অতি সামান্য দু'চারজন পুলিশ অফিসারের স্বৈরাচারী কার্যকলাপ সত্ত্বেও চুপ ক'রে থাকতে বাধ্য হচ্ছি! একটা জাতির ওপর আর একটা জাতির অত্যাচার করবার কোনো অধিকার-ই নেই...।"

শিশিরের চিঠিখানা প'ড়ে এই অংশটুকুর ওপরেই বেশ কিছুক্ষণ আকৃষ্ট হ'য়ে রইলো হরিশ। সদ্য উনিশ কি কুড়ি বছরের যুবক, কিন্তু কি স্পষ্ট আর পরিচ্ছন্ন চিন্তার অধিকারী! সম্পূর্ণ চিঠিখানা অবশ্য ডিসেম্বর মাসেই ছাপা হ'য়ে গেছে। যশোরের ফাইল খুলে সদ্য আসা আর কয়েকখানা চিঠিপত্র রাখতে গিয়ে নজর পড়ে গেছে শিশিরের এই চিঠিখানার ওপর।

বিদ্রোহ হয়েছে, রক্ত ঝ'রেছে, দাঁতে দাঁত চেপে সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার ক'রেছে চাষীরা; তবু নীলকরের স্বরূপ বিন্দুমাত্র পালটায়নি। সাময়িকভাবে তারা ফণা গুটিয়ে নিয়েছে মাত্র, সুযোগ পেলেই আবার চতুর্গুণ আক্রোশে ছোবল মারবে। অন্তত নীল-অঞ্চল থেকে এখনো যে-সব চিঠিপত্র আসছে, তা থেকে এটা স্পষ্টই বোঝা যায়।

কালীপ্রসন্ন হঠাৎ একদিন এসে হাজির।

জ্বরটা তখন যতখানি আসার এসে গেছে। মুখের ভেতর বিস্বাদ লাগছে, মাথাও বেশ ধ'রেছে। কিছুক্ষণ আগে কয়েক চুমুক মদ খেয়ে নিয়েছে হরিশ। তা নইলে এই অসহ্য মাথাধরার ভেতরে এক কলমও সে লিখতে পারবে না। দামোদর কবিরাজের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতির কথা মনে রেখে আজকাল যথাসম্ভব কম মদ্যপান করবারই চেষ্টা করে সে। কিন্তু সব সময় তা হ'য়ে ওঠে না।

প্রণাম ক'রে কালীপ্রসন্ন ব'ললে, দাদা, আগামী বারোই ফেব্রুয়ারি দয়া ক'রে এ দীনের কুটিরে একবার পায়ের ধুলো দিতেই হবে!

—যথার্থ দীনের কুটির-ই বটে! তা বারো তারিখে কেন? তোমার নক্শার অভিনয় হবে নাকি?

—আজ্ঞে না। বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ থেকে ওই দিনে কবিবর মাইকেল মধুসূদনকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের আয়োজন করা হ'য়েচে।

—অতীব আনন্দ-সংবাদ! এই সিদ্ধান্তের জন্যে তোমার বিদ্যোৎসাহিনী সভাকেই আমি আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্চি ভাই! আমার দেহ সুস্থ থাকলে আমি অবশ্যই তোমাদের সম্বর্ধনা সভায় যাবো।

মুহূর্তের ভেতর কালীপ্রসন্নের মুখখানা লজ্জায় লাল হ'য়ে গেল। হাত জোড় ক'রে ব'ললে, ছোটোভাইয়ের অপরাধ মার্জনা ক'রবেন দাদা! শম্ভুর মুখে শুনেচিলুম, আপনার শরীর নাকি এদানিক ভালো যাচ্চে না। আমার প্রথমেই উচিত ছিল আপনার কুশল প্রশ্ন করা। আমি যে তা করিনি তার জন্যে ক্ষমাপ্রার্থী! শরীর অসুস্থ কেন? কী হ'য়েচে?

—তেমন কিছু নয়। একটু জ্বরজ্বালা, এই আর কি! অত্যেচার অনিয়ম যা চলে তাতে শরীর বেচারার আর দোষ কী বলো? যে-ক'টা দিন বেঁচে আছি, এইভাবেই চ'লে যাবে। তা তোমরা মধুকে ওর মেঘনাদ বধের জন্যেই সম্বর্ধনা দিচ্ছ তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বঙ্গভাষাজননীকে উনি যে নতুন অলঙ্কারে সজ্জিত করলেন, এর তুলনা নেই! আপনি মেঘনাদবধ প'ড়েচেন তো?

—মধুর এতবড়ো সৃষ্টি! না প'ড়ে কি থাকতে পারি? শরীরটা সুস্থ ছিল না ব'লে

একবার শুধু চোখ বুলিয়ে গেছি। দ্বিতীয় খণ্ড বেরোলে তখন সম্পূর্ণ কাব্য আবার আগাগোড়া নতুন ক'রে প'ড়বো।

কালীপ্রসন্ন যেদিন সম্বর্ধনা সভার আমন্ত্রণ জানিয়ে গেল, তার দু'দিন পরেই একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ খবর এলো হরিশের কাছে।

ইংরিজি অনুবাদ হ'য়ে গেছে নীলদর্পণের! ইণ্ডিগো প্ল্যাণ্টিং মিরর। অনুবাদ করিয়েছেন লঙ সাহেব।

শুধু খবর নয়, ঠাকুরপুকুর গির্জা থেকে এক বাঙালী ভদ্রলোক এসে লঙ সাহেবের পাঠানো একখানা বই-ও উপহার দিয়ে গেলেন হরিশকে। নীল দর্পণ অর্ ইণ্ডিগো প্ল্যাণ্টিং মিরর—বাই এ নেটিভ। প্রিন্টেড বাই সি. এইচ, ম্যানুয়েল।

বইখানা বুকে চেপে ধ'রলো হরিশ। আবেগে, উত্তেজনায় তার হাত দু'খানা তখন কাঁপছে।

॥ একত্রিশ ॥

এদিকে নীলদর্পণের অনুবাদ, ওদিকে লণ্ডনে প্রকাশিত হ'য়েছে নীলকরদের পক্ষ থেকে পুস্তিকা 'BRAHMINS AND PARIAHS'—ব্রাহ্মণ এবং পারিয়া। লেপ্টেন্যান্ট গবর্নর পিটার গ্র্যান্টের নেতৃত্বে পরিচালিত বাঙলা সরকারকে তীব্র বিদ্বিষ্ট আক্রমণে পুস্তিকার প্রত্যেকটি পৃষ্ঠা উত্তপ্ত। আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য গ্র্যান্ট স্বয়ং।

পুস্তিকার ভাষায় গ্র্যান্ট 'সিবিল সার্ভিস জগন্নাথের প্রধান পাণ্ডা-পুরোহিত' আর সিটনকার, ইডেনের মতো সিবিলিয়ানরা 'সিবিল লাঠিয়ালদল।' তারা চক্রান্ত ক'রে বৃটিশ স্বার্থের আসন্ন সর্বনাশ ডেকে আনছে।

বৃটিশ সরকারকে সতর্ক ক'রেছে 'ব্রাহ্মণ ও পারিয়া'। সেই সঙ্গে ক্ষুব্ধ আবেদন, এমন একজন নির্বোধ শয়তান স্বৈরাচারী শাসক যার ওপর কিনা পৃথিবীর প্রকৃষ্টতম ভূভাগের শাসনভার ন্যস্ত করা হ'য়েছে, তার অনাচারী দমননীতির হাত থেকে আমরা পরিত্রাণ চাই! আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এই অপদার্থ শয়তান স্বৈরাচারীর হাতে আরো কিছুদিন যদি বাঙলাপ্রদেশের শাসনভার থাকে তাহ'লে সমস্ত ব্যাপারটাকে এমন অবস্থায় নিয়ে যাবে যে বৃটিশকে হয় সে দেশ ত্যাগ ক'রতে হবে অথবা অধিকার রক্ষা ক'রতে গেলে নির্ভর ক'রতে হবে একমাত্র বেয়নেটের ওপর।

এই তীব্র আক্রোশের বাস্তব কারণ ছিল নীলকরদের। নীল কমিশনের অধিবেশন যখন চ'লছে এবং একের পর এক সাক্ষীতে তাদের কীর্তিকাহিনী সরকারিভাবে নথীভুক্ত হয়ে যাচ্ছে তখনই তারা মরীয়া হ'য়ে গ্র্যান্টের বিরুদ্ধে এক দীর্ঘ অভিযোগ পাঠিয়েছিল গবর্নর জেনারেল ক্যানিঙের দরবারে। স্বেচ্ছাচারী লেপ্টেন্যান্ট গবর্নর যে পন্থা অবলম্বন ক'রেছেন তা মারাত্মক বিপজ্জনক! তিনি পবিত্র আদালত এবং বিচারবিভাগের ওপর অনুচিত হস্তক্ষেপ ক'রে প্রতিপদে তার পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ ক'রছেন এবং মালিক-শ্রমিক বিরোধের ভেতর অবৈধভাবে নাক গলিয়ে এদেশে ইংরেজ অধিবাসীদের মূলধন এবং ব্যবসা দুই-ই নষ্ট ক'রছেন। শুধু তাই নয়, তাঁরই প্ররোচনায় ঘ'টেছে শ্রমিক নীলচাষীদের উদ্ধত বিদ্রোহ। পিটার গ্র্যান্টের আচরণে নীলব্যবসা বিপন্ন!

বড়োলাট ক্যানিং সে আবেদন গ্রাহ্য করেননি।

একদিকে নেটিব চাষীদের অপ্রত্যাশিত ঔদাসীন্য। নিষ্ফল আক্রোশে তখন থেকেই ফুঁসছিল তারা। আবার নবেম্বর মাসেই নীলকমিশনের রিপোর্ট পেঁছে গেল ইংল্যাণ্ডে। জন ব্রাইট, রিচার্ড কবডেন, গ্ল্যাডস্টোনের মতো পার্লামেণ্ট সদস্যারা সে বিবরণ প'ড়ে হতবাক্! সেক্রেটারি ফর ইণ্ডিয়া স্যার চার্লস্ উড-ও চাইছিলেন, বৃটিশ পুঁজির প্রকৃত নিরাপত্তার আসল শত্রু জলদস্যু জাতীয় এই নির্বিবেক, নির্বিকার লোভার্ত নীলকরের দলকে একটু কড়া হাতে দমন ক'রতে। তাঁর সমর্থনে র‍্যাডিক্যালিস্ট সঙ্গীদের নিয়ে এগিয়ে এলেন জন ব্রাইট, এগিয়ে এলেন ইণ্ডিয়া

রিফর্ম সোসাইটির সভাপতি সেই জন ডিকিন্সন—যিনি একদিন কয়েকটি শর্তসাপেক্ষে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছিলেন নীলকর সমিতির দিকে। নীলকরদের মুখপাত্র উইলিয়ম থিয়োবোল্ড এবং নীলকর সমিতির প্রত্যাখ্যান অপমানে তাঁকে ক্ষিপ্ত ক'রে তুলেছিল। তারপর থেকেই স্বদেশে নীলকরদের পয়লা নম্বরের শত্রু হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন ডিকিন্সন।

সব দিক থেকে আঘাত পেয়ে শেষে হোমে একটা জোরালো আন্দোলন শুরু করা ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না নীলকরদের। প্রকাশিত হ'ল ব্রাহ্মিণ্‌স অ্যাণ্ড প্যারিয়াস। সঙ্গে সঙ্গে কলম নিয়ে বসলেন ডিকিন্সন। লেখা আরম্ভ হ'য়ে গেল—'A REPLY TO THE INDIGO PLANTERS' PAMPHLET 'BRAHMINS AND PARIAHS'.

ডিকিন্সনের উত্তর ছেপে বেরোনোর আগেই ইংরিজি নীলদর্পণ এসে পেঁৗছে গেল জন ব্রাইট, কব্‌ডেন আর গ্ল্যাডস্টোনদের হাতে। কাকে কাকে পাঠাতে হবে তার তালিকা দিয়েছিলেন লঙ সাহেব। সেই তালিকা অনুসারে সিটনকারের আপিস থেকে খোদ সরকারি ভাবেই নীলদর্পণ চ'লে গেল লণ্ডনে। হাউস অব কমন্‌স্‌ হ'য়ে উঠ্‌লো সরগরম; মুখর হ'য়ে উঠলো পত্র-পত্রিকা। কেউ পক্ষে, কেউ বিপক্ষে। তলিয়ে গেল ব্রাহ্মণ আর পারিয়া—আলোচ্য হ'য়ে উঠ্‌লো নীলদর্পণ।

এদেশে তার কিছু আগে থেকেই নীল-নাটকের আর একটা জটিল রুদ্ধশ্বাস অঙ্কের সূচনা হ'য়ে গেছে।

নীলকরদের কানে ভাসাভাসা ভাবে একটা খবর এসেছে যে নীলদর্পণ নামে একখানা নেটিব নাটক নাকি লেখা হয়েছে এবং তার ইংরিজি অনুবাদও হ'য়েছে। কিন্তু তা নিয়ে অকারণ বিচলিত হওয়ার কোনো প্রয়োজন তারা বোধ করেনি। একটা নেটিব কী লিখেছে না লিখেছে, তা নিয়ে তাদের কী এসে যায়?

কিন্তু এসে যাওয়ার যে অনেক কিছুই আছে, সেটা তারা তখনো বুঝে উঠ্‌তে পারেনি। পরপর এতগুলো ব্যাপার ঘ'টে যাওয়ার পর নিতান্ত নিরুপায়ভাবেই তাদের কিছু কৌশল অবলম্বন ক'রতে হ'য়েছে। প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের নাম পাল্‌টে হ'ল ল্যাণ্ড হোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন।

কিছুদিন আগে বাঙলা সরকারের উদ্যোগে ছাপা হয়েছে, "SELECTIONS FROM THE RECORDS OF THE GOVERNMENT OF BENGAL RELATING TO THE CULTIVATION OF INDIGO." বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের লেখা রিপোর্ট আর চিঠিপত্র থেকে নির্বাচিত এবটি বিবরণসমষ্টি। নীল কমিশনের সামনে উত্থাপিত হয়নি, এমন অনেক ঘটনার বিবরণই রয়েছে তাতে।

এই বিবরণ ছেপেও অগ্নিতে নতুন ক'রে ঘৃতাহুতি দিলেন গ্র্যান্ট।

যশোর জেলার লক্ষ্মীপাশা কুঠির মালিক ম্যাকআর্থার সাহেব ছুটে এলেন কলকাতায়। জরুরি পরামর্শ ক'রতে হবে সমিতির কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে। একটা মস্তবড়ো সুযোগ হাতে এসেছে। বাঙলা সরকারের আইন কানুনের ভেতর খুব চমৎকার একটা ফাঁক রয়েছে! সরকারি শাসকদের কাজের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা রুজু করা যাবে না, এমন কোনো কথা আইনে বলা হয়নি। যত বড়ো সরকারি কর্মচারীই হোক, তার নামে মামলা করবার সুযোগ আছে। আর, সেই সুযোগটা যদি গ্র্যান্টের বিরুদ্ধে ঠিকমতো কাজে লাগানো যায়, তার চেয়ে আনন্দের বিষয় কী আর হ'তে পারে?

নদীয়া ডিভিশনের কমিশনার মিস্টার লাসিংটনের লেখা একখানা চিঠি প্রকাশিত হ'য়েছে ওই সরকারি বিবরণে। সে চিঠিতে বর্ণিত কাহিনীর নায়ক ম্যাকআর্থার।

লাসিংটন লিখেছেন, আঠারোশো ষাট সালের আঠারোই জুন তারিখে লক্ষ্মীপাশা কুঠির মালিক মিস্টার ম্যাকআর্থার এবং তাঁর কুঠির ম্যানেজার মিস্টার ড্রাইভারের প্ররোচনায় নীলচাষে অনিচ্ছুক জমিদার হরনাথ রায় এবং তাঁর অনুগত রায়তদের সঙ্গে কুঠির লাঠিয়ালদের এক ভয়ঙ্কর দাঙ্গা হয়। এই দাঙ্গায় প্রচুর রায়তই আহত হ'য়েছে এবং নিহত-ও হ'য়েছে একজন। যদিও দাঙ্গার

সময় ম্যাকআর্থার কিম্বা ড্রাইভার ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকেননি কিন্তু নির্ভরযোগ্য সূত্রেই জানা গেছে, তাঁদের সক্রিয় প্ররোচনাতেই এই দাঙ্গা ঘটেছে।

আলোচনায় ব'সলেন ল্যান্ডহোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের কর্তাব্যক্তিরা। ঘটনাটা সত্যি কিনা, সেটা বড়ো কথা নয়। কিন্তু সরকারি নথী হিসেবে এই চিঠিখানা প্রকাশ করবার অধিকার কে দিয়েছে পিটার গ্র্যান্টকে? লাসিংটনের মতো একটা চুনোপুঁটি কমিশনার যা খুশি লিখতে পারে, সে তো হার্শেল-ও লিখেছে। কিন্তু এই ধরণের সতীপনার কাঙাল কমিশনার কিম্বা ম্যাজিস্ট্রেট-গুলো আসলে আস্কারা পেয়েছে ওই হাড়বজ্জাত গ্র্যান্টের কাছে। একটা কমিশনার কিম্বা ম্যাজিস্ট্রেটের নামে মামলা ক'রে কীই বা লাভ? তাদের চিঠিপত্রগুলো এইভাবে ছেপে বের করবার অনুমতি দিয়েছে ওই গ্র্যান্ট-ই। এটা তার জেনে-শুনে বদমায়েশি। সুতরাং, মানহানির মামলা রুজু করা হোক ওই পয়লা নম্বর স্বজাত-দুশমনের নামে। লোকটাকে যত রকমে অপদস্থ করা যায়, ততই আনন্দ। প্রতিশোধ নিতে না পারা পর্যন্ত মাথা যেন কিছুতেই ঠাণ্ডা হচ্ছে না!

অনেক আলোচনার পর ঠিক হ'ল, সুযোগটা নেওয়া অবশ্যই উচিত কিন্তু এরই ভেতর এখানে এবং হোমে জল যখন অনেক ঘোলা হ'য়েছে তখন আর কিছুদিন যাক। অভিসন্ধি গোপন রেখে খুবই সন্তর্পণে এখন এগোতে হবে। সুযোগটা তো হাতের পাঁচ রইলোই!

উত্তেজনাকে আপাতত চাপা দিতেই হ'ল ম্যাকআর্থারকে। যাঁরা এ-সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাঁরা গ্র্যান্টের সম্বন্ধে আরো অনেক বেশি উত্তেজিত। সুযোগ পেলে গ্র্যান্টকে ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে কাঁচা মাংস খেতেও তাঁরা রাজী। খুব অসুবিধে না বুঝলে পরের দিনই হয়তো মানহানির মামলা রুজু করবার পক্ষে সায় দিতেন তাঁরা। কিন্তু হোমে যেরকম হৈচৈ শুরু হ'য়ে গেছে, তাতে পরবর্তী অবস্থা না বুঝে এই মুহূর্তেই একটা কিছু ক'রে ফেলা ঠিক হবে না। ডিকিন্সন, ব্রাইট, কব্‌ডেনের দল চেঁচামিচি ক'রে একটু হাঁপিয়ে পড়ুক, তারপর আবার আসরে নামা যাবে।

অগত্যা এই সিদ্ধান্তই মানতে হ'ল। কিন্তু লক্ষ্মীপাশা থেকে ছুটে এসে কিছুই না ক'রে গেলেও যে বিশ্রী লাগে। স্বজাতের ভেতর শয়তান এই গ্র্যান্ট আর নেটিবদের ভেতর শয়তান হিন্দু পেট্রিয়টের হরিশ!

আলোচনা সভা ভেঙে যাওয়ার পর ম্যাকআর্থার ব'ললে, হাতটা বড়ো নিস্‌পিস্‌ ক'রছে মিস্টার ব্রেট! সেই বেজন্মা নেটিব এডিটর হরিশের ডেরা আপনি চেনেন? ফিরে যাওয়ার আগে সেই সোয়ানইনটার মুখে দু'টো জুতোর ঠোক্কর মেরে যেতে পারলেও একটু শান্তি হ'ত!

ইংলিশম্যানের সম্পাদক ওয়াল্টার ব্রেট ব'ললে, একটা পিগ্‌মি নেটিবকে এত গুরুত্ব দিচ্ছেন কেন? তার মুখে মারতে গেলে আপনার জুতোজোড়াই অশুচি হ'য়ে যাবে।

—হুঁ, তা অবশ্য ঠিক।

ব্রেট ব'ললেন, সেই নেটিব শুয়োরটাকে ভালোভাবেই মামলায় ফাঁসানো হ'য়েচে। মিস্টার গ্র্যান্টকে আমি আপাতত একটা ইঙ্গিত দিয়ে রাখচি! ইংলিশম্যানে দেখবেন।

কয়েকদিন পরেই ইংলিশম্যানে একটা ছড়া বেরোলো :—

John Peter! John Peter! beware of the day,
When the friends of the planters shall have their say.

* * * * *

Down, down must thou stoop from thy pearch upon high;
Ah! hence must thou speed, for the spoiler is nigh!

॥ বত্রিশ ॥

কিশোরীচাঁদ একরকম জোর ক'রেই রাজী করালো হরিশকে।

কলকাতার সেরা ডাক্তার গুডিভ সাহেবকে দিয়ে হরিশকে একবার পরীক্ষা করানো দরকার। রমাপ্রসাদের সঙ্গে ডক্টর এডোয়ার্ড গুডিভের বিশেষ অন্তরঙ্গতা। তাই রমাপ্রসাদই প্রথমে সে-প্রস্তাব দিয়েছিল হরিশকে। কিন্তু সে-কথা কানেই তোলেনি হরিশ।

শেষ পর্যন্ত যেদিন জ্বরের ঘোরে প্রায় অচেতন হ'য়ে প'ড়লো তার পরের দিনই কিশোরীচাঁদ নিজে এলো।

—কেন পাগলামি কচ্ছ হরিশ? রমা যেচে তোমাকে তার বাড়িতে নিয়ে যেতে চায়, ডক্টর গুডিভকে দিয়ে তোমাকে পরীক্ষা করাতে চায় অথচ তুমি গোঁ ধ'রে ব'সে আছো?

—আমি গিয়ে রমার বাড়িতে শুয়ে থাকলে আমার পেট্রিয়টের কী হবে?

—কী আবার হবে? পেট্রিয়ট যেমন চ'লচে তেমনি চলবে। গিরীশ আছে, শম্ভু আছে, দরকার মতো আমিও এসে ক'টা দিন সাহায্য ক'রবো—তাতেও তোমার কাগজ চ'লবে না?

হরিশ হেসে ব'ললে, শম্ভুকে নিয়ে চিন্তে নেই, চড়া পর্দায় বাঁধা যন্তর সে বাজাতে জানে। গিরীশ-ও আগে জান্‌তো, এখন দেখি যন্তর খাদে বেঁধে বাজানোটা তার বেশি পছন্দ।

—আর আমি তো দাগী মডারেট সোশ্যাল রিফর্মর—এই তো? তোমার মোক্ষম চেলা শম্ভুতো থাকচে। আমরা তোমার পেট্রিয়টের সেতার খাদে বেঁধে দিলেও সে ছোকরা সুর ঠিকই চড়িয়ে নেবে হে! দুটো হপ্তা না হয় পরখ ক'রেই দ্যাখো!

একটু লজ্জিতভাবে হরিশ ব'ললে, না হে, তোমাকে এখন আর অতটা ভয় করিনে। নীলের হাঙ্গামা তোমার মোহ বেশ কিছুটা ভেঙে দিয়েচে, তা তো দেখেচি! আসলে আমার দুশ্চিন্তা কী, জানো কিশোরী? আজ এই এতবছর পর্যন্ত পেট্রিয়টের প্রকাশ একটা সপ্তাহের তরেও অনিয়মিত হয়নি। যেদিন বেরোনোর কথা ঠিক সেইদিনই বেরিয়েচে।

—তাই বেরোবে! তুমি আর আপত্তি ক'রো না হরিশ! ধরো, পেট্রিয়ট যদি কোনো হপ্তায় একটা দিন দেরি ক'রেও বেরোয় তাতে বড়ো ক্ষতি হবে না। কিন্তু তোমার শরীরটা চিকিচ্ছের বাইরে চ'লে গেলে সে-ক্ষতি তার চেয়ে অনেক বেশি!

—তোমার কি ধারণা, শরীরটা আমার এখনো মেরামত করবার মতো অবস্থায় আছে?

—নিশ্চয়ই। ডক্টর গুডিভ আগে একবার তোমাকে দেখুন, তার পর তো অন্য কথা। দরকার হ'লে কিছুদিন চেঞ্জে যাবে, তাতে বিশ্রাম-ও হবে।

মৃদু হেসে হরিশ ব'ললে, চিরবিশ্রাম!

একেবারে শেষ পর্যন্ত আর আপত্তি করেনি হরিশ। শুধু মনের জোরের ওপর আর কতদিন এ-শরীরটাকে টেনে নিয়ে বেড়ানো যাবে, তা নিয়ে তার নিজের মনেই সন্দেহ দেখা দিয়েছে। তবু আজ পর্যন্ত মিলিটারি অডিটর জেনারেল আপিসে নেটিব অ্যাসিস্ট্যান্ট অডিটর জেনারেল হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের আপিসের হাজিরায় একদিনের জন্যও এক মিনিট দেরি হয়নি।

চেহারা খুব অল্পদিনের ভেতরেই ভেঙে গেছে। চোখের কোণে কালি প'ড়েছে, মুখখানা ফ্যাকাশে। ফাইল দেখতে দেখতে মাথা ঝিম্‌ঝিম্‌ করে। তবুও আজ পর্যন্ত একটা ফাইলও তার টেবিলে প'ড়ে থাকেনি।

কর্নেল চ্যাম্প্‌নিজ ব'লেছিলেন, এই বারো বছরে তুমি একটা দিনও ছুটি নিয়েচো ব'লে তো আমার মনে পড়ে না হরিশ! শরীর যখন এত অসুস্থ তখন কয়েক মাসের জন্যে ছুটি নাও না!

উত্তরে হরিশ ব'লেছিল, এখান থেকে নয় ছুটি নিলুম কিন্তু আমার পেট্রিয়ট? সেখান থেকে

তো আমার ছুটি নেবার কোনো উপায়ই নেই! বিশ্রামের নামে আপিস থেকে ছুটি নেবো অথচ নিজের কাগজের কাজ ক'রে যাবো, সেটা হয় না। শরীর যতক্ষণ বইবে ততক্ষণ একটা ক'রলে দু'টোই আমাকে ক'রতে হবে!

—তোমার শরীর তো বইচে না।

—আমি এখনো তো শয্যাশায়ী হ'য়ে পড়িনি?

কর্নেল চ্যাম্প্‌নিজ তার পর আর কথা বাড়াননি।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন শয্যাশায়ী হ'তেই হ'ল তখন ছুটি না নিয়ে আর উপায় রইলো না। শয্যাশায়ী অবস্থার ভেতরেই সেদিন দেখা ক'রতে এলো গিরীশ। হরিশ তখন ভবানীপুর থেকে রমাপ্রসাদের উত্তর কলকাতায় চাল্‌তাবাগানের বাড়িতে চ'লে এসেছে। কিশোরীচাঁদ আর রমাপ্রসাদ একরকম জোর ক'রেই নিয়ে এসেছে তাকে।

গিরীশকে দেখেই হরিশের প্রথম প্রশ্ন, পেট্রিয়ট নির্দিষ্ট দিনেই বেরোবে তো?

গিরীশ হেসে ব'ললে, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, নির্দিষ্ট দিনেই বেরোবে। বলো তো, একদিন আগেও বের ক'রে দিতে পারি।

—না, না, তার দরকার নেই। নির্দিষ্ট দিনে বেরোলেই আমি নিশ্চিন্ত। মনে রেখো, এ-যাবৎ একটা সপ্তাহেও পেট্রিয়ট প্রকাশে নিয়মভঙ্গ হয়নি! আচ্ছা গিরীশ, আমার বাড়িতে এখনো কি রায়তেরা আসচে? নিশ্চয়ই আসচে! অথচ আমি প'ড়ে রইলুম এখানে!

গিরীশ ব'ললে, অসুস্থ অবস্থায় এসব নিয়ে চিন্তা ক'রে কোনো লাভ আচে? হ্যাঁ, রায়তেরা আসচে তবে তাদের কোনো অসুবিধে হয়নি। তোমার মাতৃদেবী, বৌঠান, মধুমা তাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা যথারীতি ক'রেচেন। কেউ অভুক্ত ফিরে যায়নি।

অসহিষ্ণুভাবে হরিশ ব'ললে, সেইটেই বড়ো কথা নয়, গিরীশ! তাদের অনেকেরই হয়তো পরামর্শের দরকার ছিল, কারো বা কিছু টাকা-পয়সার দরকার। কিন্তু আমার সঙ্গে তো দেখা হ'চ্চে না! নিজের টাকা অবিশ্যি এ-মাসে নিঃশেষ! কেবল সেই ইন্ডিগো ফাণ্ডের সামান্য কিছু টাকা আচে। তা থেকেই যাহোক কিছু কিছু ক'রেও তো দেওয়া যেতো?

গিরীশ একটু ইতস্তত ক'রে ব'ললে, সে-ফাণ্ডের টাকা থেকে আপাতত আর ব্যয় ক'রো না হরিশ!

—কেন, তাতে কী হ'য়েচে? দুঃস্থ রায়তদের জন্যেই তো ফাণ্ড।

—সে কি আমি জানি নে? ওটা পাবলিক মানি তো? তুমি এখন অসুস্থ—

—অসুস্থ ব'লে ফাণ্ড বন্ধ থাকবে? তোমার কোনো চিন্তা নেই গিরীশ, কাকে কবে কত টাকা দেওয়া হ'য়েচে তার পাই পয়সার হিসেব রয়েচে। যতদূর মনে হচ্চে, তবিলে এখন তিনশো তিপ্পান্ন টাকা বারো আনা প'ড়ে আচে।

—থাক্‌। তুমি সুস্থ হ'য়ে উঠে ও-টাকার হিসেব অ্যাসোসিয়েশনকেই বুঝিয়ে দিও। ওতোরপাড়া থেকে জয়কেষ্ট মুখুজ্যে সংবাদ পাঠিয়েছেন, তিনি সম্ভবত কাল-ই তোমাকে দেখতে আসচেন। তাঁরই উদ্যোগে—ব'লতে গেলে, তাঁরই জেদাজিদির ফলে অ্যাসোসিয়েশনের নামে ওই ফাণ্ড গ'ড়ে উঠেছিল। তুমি তো ভালো ক'রেই জানো, অ্যাসোসিয়েশনের রথী মহারথী জমিদারবর্গ এ-ব্যাপারে বেলাইনের ওই জমিদারটির ওপর হাড়ে হাড়ে চ'টে আছেন! আমি বলি কি, ইন্ডিগো ফাণ্ডের দায়দায়িত্ব তুমি তাঁকেই বুঝিয়ে দাও।

হরিশ ব'ললে, তা ক'রতে পারলে তো আমি বেঁচে যাই হে! ফাণ্ড গড়ার উদ্যোগ-ও জয়কেষ্ট-বাবুর, আমার ওপর দায়িত্ব দেওয়ার ব্যবস্থাও তাঁর। তিনি নিজে কয়েক হাজার টাকা দিয়েছেন আর জমিদার খেতাবধারী ছোকরা কালীপ্রসন্ন প্রথম দফায় এক হাজার টাকা দিয়ে ব'লেচিল, দাদা, টাকায় টান প'ড়লেই খবর পাঠাবেন। এরা দু'জন ছাড়া আর কোনো জমিদারবাহাদুর তো ও-ফাণ্ডে একটি কড়িও ঠেকিয়েচেন ব'লে স্মরণ হ'চ্চে না! বাকী টাকা সাধারণ মানুষেরাই দু'পাঁচ টাকা

যা পারে তাই দিয়েচে। তোমার কথায় মনে হ'চ্চে, অ্যাসোসিয়েশনের দেশহিতৈষী জমিদারবাবুদের ভেতর ইণ্ডিগো ফাণ্ড নিয়ে খুব দুশ্চিন্তা দেখা দিয়েচে?

—হ্যাঁ। তোমার শরীর অসুস্থ। এখন আমি বিশদ কিছু ব'লতে চাইনে।

—হুঁ। নাটের গুরু কি রাজা বাহাদুর দিগম্বর মিত্তির?

—সেইরকমই শুনেচি।—ব'ললে গিরীশ।—কেন, তোমার কানে কিছু এয়েচে নাকি?

মৃদু ক্ষীণ হাসির রেশ ফুটে উঠলো হরিশের মুখে। ব'ললে, কানে না এলেও আঁচ করতে পারি হে গিরীশ! কথায় বলে, সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে। একটানা এই ক'বছর ও'দের সঙ্গে ঘর করলুম আর এইটুকু মালুম করতে পাববো না? এইটেই স্বাভাবিক! এই দিগম্বর মিত্তির একসময় নিতান্তই সাধারণ অবস্থার মানুষ ছিলেন। কাশিমবাজার রাজবাড়িতে গৃহশিক্ষক হ'য়ে যান। তার কয়েকবছর পরে দেখা গেল, মুর্শিদাবাদ জেলায় তিনি একটা একটা ক'রে অনেকগুলো রেশমকুঠি আর নীলকুঠির মালিক হলেন! গিরীশ, তাঁর মালিকানার কুঠিগুলোতেও কিন্তু প্রজা-পীড়নের দৃষ্টান্ত বড়ো কম নেই! তার ওপর, উড়িষ্যায় জমিদারি কিনে পুরোপুরি জাতে উঠেচেন। তিনি যদি বিরোধিতা না করেন তবে তো জগৎ-সংসারের নিয়মই পাল্‌টে যায় হে! যাই হোক, তুমি জানিয়ে ভালোই করলে। জয়কেষ্টবাবু এলেই কাল আমি ওই ইণ্ডিগো ফাণ্ডের সামান্য টাকাকড়ি যা আছে আর সেই সঙ্গে রসিদপত্তরগুলোর দায়িত্ব তাঁকে বুঝে নিতে বলবো। তোমাকেও জানিয়ে রাখি, আমার লেখার টেবিলের ডানদিকের সবচেয়ে নিচের দেরাজে ওই ফাণ্ডবাবদ টাকা-কড়ি আর কাগজপত্তর সম্পূর্ণ আলাদাভাবে রাখা আচে। চাবি রয়েচে আমার মধুমায়ের কাছে।

—আমাকে জানানোর কী আচে? তুমি বাড়িতে যাও তারপর নিজের হাতেই জয়কেষ্টবাবুকে বুঝিয়ে দিও।

—আর যদি ফিরে না যাই?

—পাগলের মতো কী আবোল-তাবোল বলচো? আমি বলচি, তুমি সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হ'য়ে উঠবে! ভালো কথা, আমার নামে একখানা লেটার অব অথরিটি দাও। কর্নেল চ্যাম্প্‌নিজ ব'লেচেন, তোমার আপিসের বেতন তুলে আমি যেন তোমাকে পৌঁছে দিই।

—এখানে আমাকে দেবার দরকার নেই গিরীশ। তুমি বরঞ্চ আমার মায়ের হাতেই দিয়ে এসো। সংসারতো তাঁকেই চালাতে হয়'

—বেশ, তাই করবো। তুমি চিঠিটা লিখে দাও।

শীর্ণ, দুর্বল হাতে প্রয়োজনীয় চিঠিখানা লিখে গিরীশের হাতে দিয়ে হরিশ ম্লান হেসে বললে, এতদিন নিজের শরীরটাকে বড়ো বেশি অবহেলা ক'রেচি, শরীর এখন তার প্রতিশোধ পুরোপুরি নিচ্চে! এখন মনে হচ্চে, আমার অনেক কাজ বাকি! আরো ক'বছর বেঁচে থাকতে পারলে বড়ো ভালো হ'ত! কিন্তু তা বোধহয় আর হ'ল না! নীলচাষীদের এই এতবড়ো বিদ্রোহের পর জয় অবশ্যই তাদের করায়ত্ব হবে! কিন্তু তাদের বিজয়ের সেই আনন্দ আর মুখের হাসি দেখে যাওয়া আমার আর হবে না!

গিরীশ অন্যদিকে তাকিয়ে দ্রুতহাতে চোখ মুছে তারপর হরিশের দিকে তাকিয়ে ব'ললে, এলেই যদি তুমি এই ধরণের আবোল-তাবোল বক্‌তে থাকো তাহ'লে আর আসবো না! আমি বলছি, নীলচাষীদের মুখের হাসি তুমি দেখবে—নিশ্চয়ই দেখবে!

॥ তেত্রিশ ॥

কালীপ্রসন্নের উদ্যোগে বিদ্যোৎসাহিনী সভা যেদিন মধুসূদনকে সম্বর্ধনাজ্ঞাপন করে, তার আগের দিন থেকেই হরিশের শরীর রীতিমতো অসুস্থ। তা সত্ত্বেও গেল জোড়াসাঁকোয়।

কালীপ্রসন্নের বাড়িতে সেদিন যেন একটা বিরাট উৎসব! পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র,

ঈশ্বরচন্দ্র, যতীন্দ্রমোহন, দিগম্বর, কিশোরীচাঁদ, গৌরদাস, রমানাথ, রাজেন্দ্রলাল—সবাই উপস্থিত। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন-ও সানন্দে আমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রে সম্বর্ধনা সভায় এসেছেন। গৌরদাস অবশ্য মধুসূদনের সঙ্গেই এসেছিল।

সন্ধ্যের ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই আলো ঝলমল উৎসব প্রাঙ্গণের সামনে এসে দাঁড়ালো গাড়ি। বন্ধু গৌরদাস আর সংস্কৃত শিক্ষাদাতা পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্নকে নিয়ে গাড়ি থেকে নামলো মধুসূদন।

স্বাগত গীতি দিয়ে সম্বর্ধনা সভার অনুষ্ঠান আরম্ভ হ'ল। অভিনন্দন পত্র পাঠ ক'রে কবির গলায় মালা পরিয়ে দিলে কালীপ্রসন্ন। তারপর তার হাতে তুলে দেওয়া হ'ল হ্যামিল্টন কোম্পানির তৈরি অতি সুন্দর একটি রুপোর পানপাত্র। বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ থেকে কবিকে সশ্রদ্ধ উপহার।

জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে, যন্ত্রণায় মাথার শিরা যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে, তবুও অতি কষ্টে স্বাভাবিকভাবে ব'সে থাকার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করছিল হরিশ। অত প্রচণ্ড শারীরিক কষ্টের ভেতরেও বিস্ময়ে হরিশের কান খাড়া হ'য়ে উঠ্‌লো। সম্বর্ধনার উত্তরে মধু প্রত্যভিভাষণ দিতে আরম্ভ ক'রেছে বাঙলাভাষায়! সবাই অবাক্‌! একথা ঠিক যে বাঙলাভাষায় কাব্যরচনা ক'রেই মধুসূদন আজ যশস্বী। কিন্তু কথাবার্তা সব সময়েই সে ইংরিজিতে বলে। সে তার অভিভাষণ বাঙলাভাষায় লিখে এনেছে এটা অবাক্‌ হওয়ার বিষয় বৈ কি!

মধুসূদন ব'লতে লাগলো, 'বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়, আপনি আমার প্রতি যেরূপ সমাদর ও অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, ইহাতে আমি আপনার নিকট যে কি পর্যন্ত বাধিত হইলাম তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য। স্বদেশের উপকার করা মানব জাতির প্রধান ধর্ম। কিন্তু আমার মতো ক্ষুদ্র মনুষ্য দ্বারা যে এদেশের তাদৃশ কোনো অভীষ্ট সিদ্ধ হইবেক, ইহা একান্ত অসম্ভবনীয়। তবে গুণানুরাগী আপনারা আমাকে যে এতদূর সম্মান প্রদান করেন, সে কেবল আমার সৌভাগ্য এবং আপনার সৌজন্য ও সহৃদয়তা। বিদ্যাবিষয়ে উৎসাহ প্রদান করা ক্ষেত্রে জলসেচনের ন্যায়। ভগবতী বসুমতী সেই জলপ্রাপ্তে যাদৃশ উর্বরতরা হন, উৎসাহ প্রদানে বিদ্যাও তাদৃশী প্রকৃতি ধারণ করেন। আপনার এই বিদ্যোৎসাহিনী সভার দ্বারা এদেশের যে কত উপকার হইতেছে, তাহা আমার বলা বাহুল্য। আমি বক্তৃতাবিষয়ে নিপুণতাবিহীন। সুতরাং আপনার এ-প্রকার সমাদর ও অনুগ্রহের যথাবিধি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে অক্ষম। কিন্তু জগদীশ্বরের নিকট আমার এই প্রার্থনা যেন আমি যাবজ্জীবন আপনার এবং এই সামাজিক মহোদয়গণের এইরূপ অনুগ্রহভাজন থাকি।'

দেহ যতই অসুস্থ থাক, একটা নির্মল আনন্দের অনুভূতি নিয়ে সে-রাতে জোড়াসাঁকো থেকে ফিরেছিল হরিশ। কিন্তু তারপর থেকেই একেবারে শয্যাশায়ী।

দু'দিন এসেছিলেন ডাক্তার এডোয়ার্ড গুডিভ এবং ডাক্তার নীলমাধব মুখোপাধ্যায়। বেশ অনেকক্ষণ ধ'রে হরিশকে পরীক্ষা ক'রেছেন তাঁরা। দুজনেরই মুখে ফুটে উঠেছিল হতাশার স্পষ্ট চিহ্ন। সেটা হরিশেরও নজর এড়ায়নি। অবশ্য হরিশকে তাঁরা ব'লেছেন, সামান্য ব্যাপার, সেরে যাবে।

অন্য ঘরে গিয়ে কথা ব'লেছেন তাঁরা রমাপ্রসাদের সঙ্গে। দ্বিতীয় দিন ডাক্তার গুডিভ ব'ললেন, দু'টো ফুস্‌ফুস্‌ই ঝাঁঝ্‌রা হ'য়ে গেছে মিস্টার রায়। এ অবস্থায় কোনো ওষুধ-ই ধরবে না।

নীলমাধবও সেই কথাতেই সায় দিলেন। ব'ললেন, কিছুদিন আগেও যদি ধরা পড়তো, তাহ'লেও একবার চেষ্টা ক'রে দেখা যেতো। কিন্তু সে সময় অনেক আগেই পেরিয়ে গেচে।

ডাক্তার গুডিভ ব'ললেন, ফুস্‌ফুসের যা অবস্থা তাতে উনি যে এখনো বেঁচে আছেন, এইটেই তো আশ্চর্য ব্যাপার! আমি যেটা অনুমান ক'রেছিলুম, তা হ'ল অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে ও'র লিভারটাই হয়তো নষ্ট হ'য়েচে। কিন্তু পরীক্ষা ক'রে মনে হ'ল, লিভারও ক্ষতিগ্রস্ত, কিন্তু তার

চেয়েও অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ও'র ফুস্‌ফুস্‌। গ্যালপিং টিউবারকুলোসিস—আমাদের ভাণ্ডারে এর কোনো ওষুধ-ই নেই। শুনেচি, এদেশীয় আয়ুর্বেদে কিছু ওষুধ নাকি আছে। কিন্তু তা-ও এই অবস্থায় কতখানি ফলপ্রদ হবে, কে জানে!

রমাপ্রসাদ ব'লল, ব্যামোটা ধরা পড়বার পর কালীঘাটের এক প্রবীণ কবিরাজ-ই ওর চিকিৎসে কর্‌চিলেন। তাতেও উপশম তো কিছু হয়নি!

—হওয়া দুঃসাধ্য।—ব'ললেন, নীলমাধব, সত্যি কথা ব'লতে কি রমাপ্রসাদ, ও'কে সম্পূর্ণ সুস্থ ক'রে তোলার কোনো উপায়ই এখন নেই! এখন ঈশ্বরই ভরসা! এতবড়ো একজন শক্তিমান পুরুষ এইভাবে অকালে চ'লে যাবেন ভাবতেও বড়ো কষ্ট হচ্চে। কিন্তু আমরা তো অসহায়!

ডাক্তার গুডিফের গলার স্বরও ভারী হ'য়ে উঠেছে। ব'ললেন, আমি হিন্দু পেট্রিয়টের একজন নিয়মিত পাঠক। আমার কেবলই মনে হচ্ছে, যে অসাধারণ লেখনীর জোরে হিন্দু পেট্রিয়ট চলে, সেই লেখনী এত তাড়াতাড়ি স্তব্ধ হ'য়ে যাবে! আপনারা যদি আরো কয়েকমাস আগে এই উদ্যোগ গ্রহণ ক'রতেন তাহ'লেও সর্বশক্তি দিয়ে একবার চেষ্টা করা যেতো! কিন্তু বড়ো বেশি দেরি হ'য়ে গেচে!

দিন দু'য়েক পরে হরিশই একদিন ব'ললে, আর কেন রমা, দুই সেরা ডাক্তারই তো জবাব দিয়ে গেচেন। এবার চালপটির মালকে এই চালতেবাগান থেকে আবার সেই চালপট্টিতেই রেখে এসো!

—কে তোমাকে ব'ললে, ডাক্তার জবাব দিয়ে গেচেন?

—ব'লতে হবে কেন? আমি দেওয়ানি আদালতের উকিল নই ব'লে কি আমার কিঞ্চিৎ বুদ্ধিও নেই ভেবেচো? তুমি দুধ ছানা, ফলমূল মাংস খাইয়ে কী ক'রবে? ডিক্রি তো জারি হ'য়েই গেচে বাবা! এখন ঘরের ছেলেকে ঘরে ফিরিয়ে দিয়ে এসো। তোমার বাড়িতে অনেক লোকজন। এ ব্যামোর বীজ বাতাসে ছড়ায়। তুমি আমার বন্ধু ব'লে ব্যামো তো আর তোমাকে কিম্বা তোমার পরিবারবর্গকে খাতির ক'রবে না!

—তুমি বড়ো বেশি বাজে চিন্তে করো।

—কাজের চিন্তে করবার সময় কখন পেলুম বলো?—বিশীর্ণ মুখেই কৌতুকের হাসি হেসে হরিশ ব'ললে, তবে ব্যাপারটা ভাবতে কিন্তু মন্দ লাগচে না হে! আমার গোটা জীবনটাই দেখচি রাজকীয়তায় ভরা। রাজনীতি—রাজরোষ—আর সবশেষে এই রাজযক্ষ্মা! এরকম রাজকীয় মহিমা পাওয়া কি কম কথা?

ক'দিন পরেই হরিশকে ভবানীপুরে রেখে এলো রমাপ্রসাদ। রুক্মিণীকে আশ্বাস দিয়ে এলো, অতবড়ো সাহেব ডাক্তার ব'লেছেন আয়ুর্বেদ চিকিৎসাই এখন রোগীর পক্ষে ভালো। তাতে তাড়াতাড়ি উপকার পাওয়া যাবে।

চোখের জল মুছতে মুছতে আকুল স্বরে রুক্মিণী ব'ললেন, বাছা আমার ভালো হ'য়ে উঠবে তো বাবা?

—নিশ্চয়ই।—ক্ষীণকণ্ঠে ব'ললে রমাপ্রসাদ।

দামোদর কবিরাজের চিকিৎসা আবার আরম্ভ হ'ল। ঘড়ি ধ'রে অনুপান আর ওষুধ খাওয়ায় মাধুরী। ছোটোবৌও সাহায্য করে মাধুরীকে। বড়োবৌ ঠাকুরপোর ঘরে ঢুকতে ভয় পায়। তবুও মাঝে মাঝে না গেলে একেবারেই দৃষ্টিকটু দেখায় ব'লে কখনো-সখনো আসে। দু'চারটে কথা ব'লেই সংসারের কোনো কাজের অজুহাতে বেরিয়ে যায়।

কয়েকটা দিন একেবারে বিছানায় শুয়েই কেটেছে। সেই সময় প্রায় রোজই আসতে হ'ত গিরীশ আর শম্ভুচাঁদকে। গিরীশই সে-কদিন সামাল দিয়েছে পেট্রিয়টকে। যে লেখাই যাক, তা একবার দেখিয়ে নিয়ে যেতে হবে হরিশকে। আর, মেশিনে চড়ানোর আগে চূড়ান্ত প্রুফটা তার একবার দেখা চাই-ই। পেট্রিয়ট যেন নির্দিষ্ট দিনেই বেরোয় এবং কোথাও যেন একটাও ছাপার ভুল না

থাকে—হরিশের এই শর্ত মানতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যায় গিরীশ! কিন্তু শর্তটা সে ঠিকই পালন ক'রছে। শম্ভুচাঁদ এখন নিজের 'মুখার্জিস্ ম্যাগাজিন' নিয়ে ব্যস্ত। তা সত্ত্বেও সপ্তাহে অন্তত দু'টো দিন এসে যথাসাধ্য সাহায্য করে গিরীশকে; দেখা ক'রে যায় হরিশের সঙ্গে। কালীপ্রসন্নও দু'তিন দিন এসে দেখে গেছে হরিশকে। কিশোরীচাঁদের অবকাশ কম। তা-ও তারই ভেতর সময় ক'রে নিয়ে দু'দিন এসে দেখা ক'রে গেছে।

যে-ই আসুক, তাকে দূরে ব'সতে বলে হরিশ। স্পষ্টই বলে, দ্যাখো বাবা, প্রীতি যতই হোক, যেচে এই রাজরোগ ব'য়ে নিয়ে যাওয়াটা তো কোনো কাজের কথা নয়? দেখতে এয়েচ ভালো কথা, কিন্তু দূরে ব'সো।

কয়েকদিন আগে লঙ সাহেব একদিন এসেছিলেন। হরিশকে তিনি বেশি কথা ব'লতে দেননি। নিজেই কথা ব'ললেন বেশি। যাওয়ার সময় করুণ দৃষ্টিতে হরিশের দিকে তাকিয়ে ব'ললেন, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, আপনি আবার সম্পূর্ণ সুস্থ হ'য়ে উঠে আপনার দেশসেবার ব্রত পালন করুন!

হরিশের বিশীর্ণ মুখে ফুটে উঠলো একটু ম্লান হাসি।

॥ চৌত্রিশ ॥

বোশেখের রোদে আগুন ঝ'রতে শুরু ক'রেছে। পুরন্ত শিমুল ফলের শক্ত খোলাগুলো ফাটছে। হাওয়ায় ভেসে বেড়াতে শুরু ক'রেছে টুকরো টুকরো তুলোর আঁশ। ফাল্গুনে গজানো বট-অশ্বত্থের কচি কচি লাল্চে পাতাগুলো এখন সতেজ সবুজ। বটগাছের লাল টুকটুকে পাকা ফলে রোজ পাখিদের ফলার চ'লছে। দিনদুয়েক বৃষ্টি হ'য়ে গেছে। শুকনো বিবর্ণ ঘাসে ঘাসে ধ'রেছে একটু সবুজের ছোপ। শুকনোপ্রায় ডোবা-পুকুরে শুশুনি, কলমি আর হিঞ্চের নিস্তেজ ডগাগুলো যেন একটু হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে।

কিছুদিন থেকে একটা কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে, কোনো কোনো কুঠি নাকি আবার নীলের দাদন ধরানোর জন্যে নতুন কৌশলে ফন্দি-ফিকির আঁটতে শুরু ক'রেছে। জোর ক'রে দাদন না ধরিয়ে বাপু-বাছা ব'লে কাজ বাগানোর মতলব। সিন্দুরিয়া কুঠির বেপরোয়া ম্যাকনেয়ার সাহেব নাকি লোক পাঠিয়ে জনে জনে অনুরোধ ক'রেছে, নীলচাষ ক'রে দিলে ন্যায্য দাম দেওয়া হবে। কিন্তু সে-কথায় চিঁড়ে ভেজেনি। সুজনপুরের ডম্বাল সাহেব ধরাকে সরা জ্ঞান ক'রতো। গত শীতকালে মার খেয়ে দু'মাস বিছানায় শুয়ে থাকার পর সেই মানুষ এখন চুপ্সে কাদা!

কোনো কোনো কুঠির মালিক নাকি নীলের কারবার গুটিয়ে ফেলার কথা ভাবছে। কিন্তু তাদের সংখ্যা খুবই কম। নীলকর সাহেবেরা তাদের দেশ বিলেতে খুব হৈচৈ লাগিয়ে দিয়েছে। কাচিকাটা কুঠির হিল্স্ আর লোকনাথপুরের মায়ার্শ সাহেবের তেজ এখনো কমেনি। ঘরের বৌয়ের ইজ্জৎ নিয়ে উল্টে হরিশ মুখুজ্যের নামে মামলা ঠুকে দিয়ে ব'সে আছে! মোল্লাহাটির লালমোন সাহেব যে কী ক'রবে সেইটেই এখনো ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

জবর একটা খবর এনেছে হোসেন আলির ভায়রাভাই কালু শেখ। খুলনা শহরের কাছাকাছি ফুলতলা গ্রামে তার বাড়ি। খুলনা মহকুমার বাঙালি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিম চাটুজ্যের দাপটে সে-এলাকার কুঠেলেরা নাকি চোখে সর্ষেফুল দেখতে আরম্ভ ক'রেছে। বয়স আর কত? বড়োজোর এককুড়ি দুই কিম্বা তিন বছর। একেবারে তরতাজা জোয়ান হাকিম। কিন্তু কাউকে তার পরোয়া নেই। এইবার দ্বিতীয় দফায় মহকুমার হাকিম হ'য়ে এসেছেন বাবু। যশোর জেলার খুলনা মহকুমার হাড়হদ্দ তাঁর জানা আছে।

গ্রামের বারোয়ারিতলায় জমায়েত হ'য়েছে অনেক চাষী। শুধু চৌগাছা নয়, আশপাশের অনেক গ্রাম থেকেও লোক এসেছে।

কাল্ম শেখ ব'লতে লাগলো, বাবুর গুণির কতা কী কবো, ক'য়ে শ্যাষ করা যায় না। তিন সন এগোনে এই বঙ্কিমবাবু পেত্থম যেবার হাকিম হ'য়ে আ'লেন ত্যাকন তো বয়েস আরো কম? কিন্তুক হেম্মৎ? একেবারে বাদাবনের বড়োমেঞার লাকান! এক কুটেল সায়েব হাতির শুঁড়ে মশাল বা'ন্ধে অ্যাকখান গেরাম জ্বালায়ে দেলো। দারোগা-পুলুশির দল লাস্তালাবুদ। সায়েবডারে যে ধত্তি যাবে ত্যামন ছাতির জোর নাই। সায়েবের দুই হাতে সব সময় গুলিভরা দুই পেস্তল! ধত্তি গেলিই তো দুম্! কেডা আগোবে? কিন্তু আগোলো! ওই ছোকরা হাকিমির কতা কী কবো রে ভাই, জানের ডর নাই? আমাগো ওদিক তো তোমরা জানো না ভাই? খালি লদী, খাল, আর বাওড়। যত দক্কিনি যাবা, তত পানি—তত পানি! তারই মদ্যি আজ লদী, কাল খাল, পশ্শু বিল—বজরায় ক'রে সায়েবরে তাড়া কত্তিছে তো কত্তিছে! সায়েবের হাতে পেস্তল, বঙ্কিম হাকিমির হাতে বন্দুক। শ্যাষকালে সায়েবডারে গেরেফ্তার ক'রে তয় ছাড়লেন! এরেই কয় ছাতি! এরেই কয় হেম্মত! সোজা কতা, অ্যাঁ! খালি গেরেফ্তার করা-ই না, পেস্তল সমেত সায়েবরে কলকেতার হাইকোটে চালান দিয়ে সোপদ্দ ক'রে তয় সে-শালারে জব্দ কল্লেন।

একটু দম নিয়ে কাল্ম শেখ আবার উৎসাহিত ভঙ্গিতে ব'লতে আরম্ভ ক'রলো, এ-দফায় তেনার লজর বাদাবনে। কেউ তোমরা মরেলগঞ্জের নাম শুনিচো, মরেলগঞ্জ?

দিগম্বর ব'ললে, জানি। ক্ষ্যামতা আলা কুটেল-জমিদার মরেল সায়েব। সেই তো অ্যাকটা শহর-গঞ্জ পত্তন ক'রে তার নামে রেকেচে মরেলগঞ্জ?

—সেই মরেল সাহেব। দুরিথি তো কিচু বোজ্যা যায় না বাবু, মনে হয় কত ভালো। সদরেখে এট্টু দক্কিণি স'রে বাদার গা ঘে'ষে সেখেনে বসাইচে তার নিজির শহর। কতায় কয়, বাদা হল আঠারো ভাটির পথ। তা মরেলগঞ্জ অন্তক পাঁচ ভাটির পথ হবে! শয়তান ব'লে শয়তান? চালাকির বীচি বা'টে খাইচে সায়েব। সদরেখে দুরে ব'সে যা খুশি তাই কল্লি তারে ঠ্যাকাচ্চে কেডা? অ্যাতোকাল তো সেই চালাকি ক'রেই চালায়ে যাচ্চিল। তোমাগো এখেনে তউ এই হ্যাংনামার আগে দুই চারডে কুটেলের গতরে নাটির বাড়ি পড়িছে, ঘাপান খা'য়ে তানারা বুজিছে ঘাপান দিতি যাওয়ারও খত্রা কত! আর মরেল সায়েব? তানার মুলুকি কোন্ পোর্জার ঘেটিতি কয়ডা মাতা ছেলো যে তানার ছামায় মুক তুলে কতা কয়? এই আমার সার কতা শুনে রাখো মিঞা ভাইরা, হি'দু ভাই...া, জানের ডরে তারা খালি সায়েবের দাপট সহ্যি ক'রে আইচে অ্যাতোদিন। তোমরা এদিকি যকন কুটেলের সঙ্গে কাজিয়া নাগালে, তকন তাগো লোউ অমনি চন্মনায় ওট্লো। সেই তকনেখে মরেলগ..। কাজিয়া-দাঙ্গা হ'য়ে আসতিচে, বুজলে? মরেল সায়েবের হাতে সাতশোর উপর না'টেল মজুত; তাগো চালায় আর এক লোউ-চোষা সায়েব, তার নাম হিলি সায়েব। এই হিলি আর মরেল সায়েবরে কব্জা করার জন্যি এ-দফায় উটে-প'ড়ে নাগিচেন আমাগো হাকিম বঙ্কিমবাবু। আমার তো মনে হয়, সিনিও য্যামন স্যায়না হাকিম, অ্যাকটা এস্পার-ওস্পার না ক'রে ছাড়বেন না!

দিগম্বর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ব'ললে, তাই যেন হয়!

—না হ'য়ে যাবে কোতায়? খোদার কুদ্রতে কী না হয় বাবু? খোদার কুদ্রতি যদি না থাকবে তালি এই তিন সনের মাতায় বঙ্কিম হাকিম ফের খুল্নেয় বদলি হ'য়ে আলেন ক্যান? খোদাতালা এই হাকিমরি দিয়েই ওই মরেল সায়েবরে জব্দ করায়ে তয় ছাড়বে, এ আমি ক'য়ে দেলাম!

দিন পনেরো পরেই করালী ফিরে এলো চৌগাছায়। তার মুখে বিশদভাবে জানা গেল, লারমুরের মোল্লাহাটি কুঠির সে জৌলুষ আর নেই। লার্মুরের মতো লোকও আগেকার সে দাপট আর দেখাতে পারছে না। কাঠগড়া কুঠির কারবারতো সেই কবেই বন্ধ হ'য়ে গেছে, অন্য কুঠিগুলোও ধুঁকছে। নিজ-আবাদ এখন ভরসা। তাতে খরচ অনেক বেশি তাই লাভ কম। কারবার বাঁচাতে সেই নিজ-আবাদের ওপরে নির্ভর ক'রে থাকতে হচ্ছে মোল্লাহাটি কুঠিকে। যে কুঠিতে আগে সারা বছর ধ'রে দিন রাত কাজ হ'ত, সেই কুঠিতে কাজের অভাবে এখন কুলি-মজুর হ'য়ে গেছে

বাড়তি। বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া থেকে আনিয়ে যে-সব কুলি-কামিনকে দিয়ে এতদিন কাজ করানো হ'ত, তাদের কেউ কেউ দেশে ফিরে গেছে। বাকি যারা আছে তাদের বেশির ভাগই কুঠির এলাকার বাইরে ক্ষেতমজুরির কাজ ক'রে দিন চালাচ্ছে।

দিগম্বরের সংসারের অবস্থা খুবই খারাপ। হে'সেলে হাঁড়ি না-চড়ার মতো। আমবাগান ইজারা দিয়ে যা পেয়েছিল সব নিঃশেষ। বিষ্ণুচরণের বাড়ির অবস্থাও প্রায় একই রকম। কিন্তু সাফল্যের তৃপ্তি তাদের সব দুঃখ কষ্টকেই ভুলিয়ে দিয়েছে। মনের জোর এতটুকু কমেনি। তারা জানে, আউশধান না ওঠা পর্যন্ত এইভাবেই চালিয়ে যেতে হবে।

করালী একদিন ব'ললে, অ্যাকটা কতা কবো বাবুমশায়রা? ঝে হরিশবাবু আমাদের জন্যি এত কল্লেন, তেনারে অ্যাকবার নে' এলি ক্যামন হয়?

দিগম্বর আর বিষ্টুচরণের চোখে-মুখে ফুটে উঠলো শ্রদ্ধার ভাবাবেগ। কিন্তু সেই সঙ্গে নেমে এলো বিষণ্ণতা। দিগম্বর ব'ললে, সবই তো জানো, কত্তা! তেনার মতন মান্যিগণ্যি মনিষ্যিরে এনি সেবা-যতন করার মতো অবস্তা তো আর নাই!

করালী তাতে দমলো না। ব'ললে, তা কি আর জানি নে বাবু? তেনারে এই অজ পাড়াগাঁয়ে এনি কি কষ্ট দেয় যায়? আমি কচ্চিলাম, সিনি ঝেদি অ্যাকবার গোয়াড়ি টাউনি আসেন তো জ্যালার রেয়েরা দলে দলে গে' তেনারে অ্যাকবার তো দশ্শন ক'রে আসতি পারে? ঝাদের জন্যি সিনি অ্যাতো কল্লেন তারা তেনারে অ্যাকবার চোকির দ্যাকাও দেকতি পাবে না, এডা কি হয়?

বিষ্টুচরণ ব'ললে, করালী ভালো কতাই ক'য়েচে দিগম্বর! হরিশবাবু ঝেদি গোয়াড়ি এস্তকও আসেন, সে তো আমাদের পরম ভাগ্যি!

করালী আরো উৎসাহিত হ'য়ে ব'ললে, আসবেন, সিনি আসবেন তা মুই হলপ ক'রে কতি পারি। সেবার ব্যাত্যাই এলেকার রেয়েদের সঙ্গে ঝ্যাকন কলকেতায় তেনার কাচে গিয়েলাম সেবার সিনি কী ব'লেলেন জানেন? ব'লেলেন, কুটেলরা ঝাড়ে-বংশে জব্দ হোক, রেয়েদের মুকি হাসি ফুটুক তারপর মুই সেই হাসি মুকগুলো দেকতি যাবো!.

দিগম্বর ব'ললে, তাই ঝেদি ক'য়ে থাকেন তো তুমি কলকেতায় গে' তেনারে নে' আস্‌বা কত্তা। আমি কয়দিন পরেই গোয়াড়ি গে' তেনার থাকার জায়গা ঠিক ক'রে আসি।

ক'দিন পরে দিগম্বর কৃষ্ণনগর গেল। পরের দিনই ফিরে এলো। মুখখানা বিষাদে পাণ্ডুর। হরিশের কালব্যাধির সংবাদ কৃষ্ণনগরে এসে গেছে।

॥ পঁয়ত্রিশ ॥

কদমগাছটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে শুয়ে আছে হরিশ।

একটু লক্ষ্য ক'রলেই বোঝা যায়, আসন্ন বর্ষার জন্যে গাছের শাখায় শাখায় সাজ সাজ রব প'ড়ে গেছে। ছোট্ট ছোট্ট সবুজ রঙের ফুলের গুটি দেখা দিতে শুরু ক'রেছে। ওই গুটিগুলোই আর কিছুদিন পরে প্রস্ফুট যৌবনের উচ্ছলতায় গাছটাকে ভরিয়ে তুলবে। সজল কালো মেঘের পুঞ্জ এসে প্রবল বর্ষণে স্নিগ্ধ ক'রে দেবে প্রখর দাবদাহে' দগ্ধ আকাশ, বাতাস আর মাটিকে। স্নিগ্ধ জলধারায় তৃপ্ত হবে মাটি, পুষ্ট হবে তৃণলতাগুল্ম। বাসন্তী আর শাদা রঙের কেশরে সেজে ডালে ডালে ফুটতে থাকবে ওফেলিয়ার নিজের হাতে রোপণ ক'রে-যাওয়া কদম গাছের ফুল। সে নেই তবু ফুল ফুটবে!

—তোমার ওষুদ এনেচি।

ছোটোবৌয়ের গলার সাড়া পেয়ে আস্তে আস্তে মুখ ফিরিয়ে তার দিকে তাকালো হরিশ। বিষাদের মূর্ত প্রতিমা! কে ব'লবে, এক সময় কি প্রচণ্ড হিংস্র হ'য়ে উঠতে পারতো এই নারী!

আস্তে আস্তে উঠে ব'সলো হরিশ। ছোটোবৌয়ের পরনে একখানা ময়ূরকণ্ঠী নীল আর

শাদা রঙে মেশানো ডুরে শাড়ি। কপালে জ্বলজ্বল ক'রছে সিঁদুরের টিপ। সিঁথিতে সিঁদুরের রেখা বেশ চওড়া। কিন্তু তারই ভেতর থেকে হরিশের চোখের সামনে ভেসে উঠলো আসন্ন বৈধব্যের বেশে আর এক ছোটোবৌ!

কিছুদিন আগে পর্যন্ত-ও এত যত্ন ক'রে সিঁদুর প'রতো না ছোটোবৌ। এয়োতির চিহ্ন হিসেবে সিঁথিতে লাল রেখাটা থাকতো বটে কিন্তু তার পেছনে কোনো সযত্ন প্রয়াস ছিল না। হয়তো থাকতেও পারে কিন্তু হরিশ কখনো লক্ষ্য করেনি। তার লক্ষ্য করবার সময় তখন কোথায়? সকালে আপিসে বেরিয়ে যাওয়ার পর ছোটোবৌয়ের সঙ্গে দেখা হ'তে তো সেই গভীর রাত। তা-ও এই গত একবছর। তার আগে বছরের পর বছর কেটে গেছে অথচ একই বাড়িতে বাস ক'রেও দু'টি মানুষের ভেতর দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। যেন কেউ কাউকে চেনে না!

ছোটোবৌ হরিশের হাতে খল-নুড়ি এগিয়ে দিলে। ওষুধ খাওয়া হ'য়ে যাওয়ার পর সেপায়ার ওপর থেকে জলের গেলাস আর গামছা এগিয়ে দিয়ে মৃদুস্বরে ব'ললে, বদ্যিমশাই ব'লচিলেন, এই ওষুদটা নাকি একেবারে ধন্বন্তরি।

ম্লান হেসে হরিশ ব'ললে, তোমাদের বিশ্বেস থাকলেই ভালো।

—তোমার বিশ্বেস নেই? ওষুদটা যদি ভালোই না হবে তো জ্বরের তাড়স ক'মচে কেন? এই ক'টা দিন আগের চেয়ে ভালো বোধ ক'চ্চ কিনা, বলো?

—হ্যাঁ, কচ্চি। তবুও বলি, তোমরা কিন্তু বেশি কিছু আশা ক'রো না ছোটোবৌ!

—কেন আশা ক'রবো না? তোমার ব্যামো সেরে যাবে—ঠিকই সেরে যাবে, দেখো।—ব'লতে ব'লতে ছোটোবৌয়ের গলা ধ'রে এলো।

—যে বাস্তবকে মানতেই হবে, তাকে জোর ক'রে ভুলে থাকার চেষ্টা ক'রে লাভ নেই! আমিতো বুঝতেই পাচ্চি, আমার দিন ঘনিয়ে আসচে। কিন্তু বাড়িশুদ্ধু এতগুলো লোকের কী হবে সেইটে ভাবতে গিয়েই মনটাকে আর সামলাতে পাচ্চিনে!

ছোটোবৌয়ের দু'চোখ দিয়ে টপ্‌টপ্ ক'রে জল পড়তে লাগলো। ভাঙা গলায় ব'ললে, আমিই দায়ী। আমার ওপর রাগ ক'রেই তুমি এইভাবে নিজেকে শেষ ক'রে দিলে!

করুণ একটু হাসি ফুটে উঠলো হরিশের মুখে।—এ-সব কথা নিয়ে নতুন ক'রে কিছু বলবার দিন অনেক আগেই চ'লে গেছে ছোটোবৌ! বিশ্বেস করো, ভালোবাসতে আমি জানি। তবু আমার দায়িত্বও তো কিছু কম নয়? তুমি যদি সেই অভাগিনীর সম্বন্ধে আর একটু সহিষ্ণুতা দেখাতে পারতে তাহ'লে হয়তো একদিন তার জায়গায় তোমাকেই বসাতে পারতুম! তুমি কিছুতেই বুঝতে চাইলে না, সে ছিল আমার জীবনে প্রথম নারী। সে যে তার ভালোবাসার জোরে আমার সব কিছুই জয় ক'রে ব'সে ছিল! তাকে ভুলতে চাইলেই কি ভোলা যায়? সে চ'লে যাওয়ার পর মনে মনে প্রতিজ্ঞা ক'রেচিলুম, আর নয়। কিন্তু সে-প্রতিজ্ঞা রাখতে পারলুম কই? লোকে বলে, আমার কলমে নাকি খুব জোর। কিন্তু আমার ভেতরকার কামনা-তাড়নার জোরও যে তার চেয়ে কিছু কম নয়, এ-কথা কি লোক ডেকে বলা যায়? লোকে জানে, আমি মায়ের চাপে বাধ্য হ'য়ে তোমাকে বে' ক'রেচি। সেটা আংশিক সত্যি। মোক্ষদার স্মৃতিকে বুকে রেখেও রিপুর প্রচণ্ড তাড়নাকে বশ ক'রতে পারলুম না ব'লেই তো আবার বে' ক'রতে রাজী হলুম। তারপর সব কিছু যেন আরো জট পাকিয়ে গেল! মোক্ষদা বেঁচে নেই তবু তুমি তার স্মৃতিটুকুও সহ্য ক'রতে পারলে না! আক্রোশে তুমি আমাকে ক'রলে প্রত্যাখ্যান। আমার মাথায় কেমন যেন আগুন চেপে গেল। হয়তো তোমার ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যেই সেদিন থেকে আমি গণিকা-সঙ্গ বেছে নিলুম! কী লাভ হ'ল? তুমি আমার বিবাহিতা স্ত্রী অথচ তোমার প্রতি দেহে-মনে কোনো কর্তব্যই পালন করা আমার হ'ল না! এত মদ্যপানও হয়তো আমি করতুম না ছোটোবৌ! কিন্তু ওই প্রতিশোধ নেওয়ার জেদেই আমি সুরার দাস-ও হ'য়ে গেলুম। আমাদের দু'জনের ভেতর এত বছর ধ'রে এই ব্যবধানের দায়িত্ব একা তোমার হ'তে যাবে কেন? দায়িত্ব আমারও যে রয়েচে!

চোখের জল আর সামলাতে পারছে না ছোটোবৌ। আর্ত কান্না বুক ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। নিজেকে সামলাতে সে খাটের বাজু চেপে ধ'রলো।

কদমগাছটার ওপর ডাল-পাতার আড়ালে কোথায় যেন বসে একটা ঘুঘু ডাকছে। জ্যৈষ্ঠের তাপক্লিষ্ট অপরাহ্ণে বড়ো উদাস-করা বিষণ্ণ সে-ডাক।

চোখে আঁচলচাপা দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল ছোটোবৌ। হরিশ ব'ললে, চ'লে যেয়ো না, আর একটা কথা আচে।

নিশ্চল হ'য়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে প'ড়লো ছোটোবৌ। ম্লান করুণ স্বরে হরিশ ব'ললে, হুইস্কির বোতলটা বের ক'রে আমাকে শুধু এক চুমুকের মতো একটু দেবে?

থর্‌থর্ ক'রে কাঁপতে লাগলো ছোটোবৌয়ের অধরোষ্ঠ। কান্নাভাঙা গলায় ব'ললে, বদ্যিমশাইয়ের মানা তুমি কিছুতেই শুনবে না?

—শোনার মতো অবস্থা থাকলে নিশ্চয়ই শুনতুম ছোটোবৌ! কিন্তু সে অবস্থা যে নেই তা তিনিও জানেন, তোমরাও জানো, আমিও জানি। যে-ক'টা দিন আছি, সে-ক'টা দিন আমাকে আরো কষ্ট দিয়ে লাভ কী? তুমি বিশ্বেস করো, দু'টো ঝাঁজরা ফুস্‌ফুসে শ্বাস টেনে নিতে প্রতি মুহূর্তে আমার যে-কষ্ট হয়, তার চেয়েও বেশি কষ্ট হচ্চে আমার! আমি পুরো এক বোতল চাইনে, এমন কি আধবোতলও নয়। শুধু গলা ভেজানোর মতো একটুখানি আমাকে দাও—

ছোটোবৌ নীরবে কয়েকমুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর যন্ত্রচালিতের মতো আলমারির কাছে এগিয়ে গেল।

বোতল থেকে সামান্যই একটু মদ গেলাসে ঢেলে নিলে হরিশ। তার মুখে ফুটে উঠ্‌লো আবার সেই করুণ হাসি। আপনমনেই ব'ললে, Oh thou invisible spirit of wine, if thou hast no name to be known by, let us call—devil!

প্রত্যেকদিনই কেউ না কেউ দেখা ক'রতে আসে।

উত্তরপাড়া থেকে আনন্দ, রাজচন্দ্র আর রাজকিশোর পালা ক'রে প্রতি সপ্তাহেই আসছে। প্রত্যেকেই অভয় দেয়, ব্যামো তার সেরে যাবে। ভয় বা অভয় কোনোটাই দেননি বিদ্যাসাগর। দিন তিনেক তিনি এসে দেখে গেছেন। আগের সপ্তাহে যেদিন এসেছিলেন, সেদিন কথায় কথায় জিজ্ঞেস ক'রলেন, তোমার বয়েস ক'ত হ'ল?

হরিশ দিব্যি হাসতে হাসতেই উত্তর দিলে, এইতো এই বোশেখে সাঁইতিরিশ হ'ল। এইটেই ভারী অস্বস্তি লাগচে দাদা, বয়েসটাকে অন্তত দু'কুড়ি পর্যন্ত আর টেনে নিয়ে যেতে পারলুম না!

রামগোপাল, প্যারীচাঁদ, রাজেন্দ্রলাল—তিনজনেই একদিন এসে অনেকক্ষণ ছিলেন। সোমপ্রকাশের বিদ্যাভূষণ প্রতি সপ্তাহে একবার অন্তত ঘুরে যান।

কয়েকদিন আগে এসেছিল ছাপাখানার গোবিন্দ, হরিগোপাল আর নন্দরাম। ঘরে ঢোকার আগে থেকেই তাদের চোখ ছলছল ক'রছে। হরিশ রীতিমতো হাসতে হাসতে ব'ললে, ব্যাপার কী? তোমরা কি ধ'রেই নিয়েচো, আমি চ'লে যাচ্চি? ওরে বাবা, আমার হ'ল কচ্ছপের জান্! কয়েকটা দিন জিরিয়ে নিই তারপরই আবার গে' তোমাদের নাস্তানাবুদ ক'রবো।

উৎফুল্ল আনন্দে খুশি হ'য়ে উঠলো তিনজনেরই মুখ। একটি মাত্র মানুষের এই কয়েকদিনের অনুপস্থিতি তাদের এতদিনের অভ্যস্ত কাজের তান লয় ছন্দ সবই যেন কেটে দিয়েছে।

গোবিন্দের উদ্দেশে হরিশ ব'ললে, খুব সাবধান গোবিন্দ, কম্পোজের সময় একটুও অন্যমনস্ক হবে না! গিরীশ অবিশ্যি প্রুফগুলো নির্ভুলভাবেই দেখে তাহলেও তো কোনো গলতি থেকে যেতে পারে? মেশিনে চড়ানোর আগে কাটা প্রুফটা তুমিও কিন্তু ভালো ক'রে দেখে নিও! তুমি তো জানো, পেট্রিয়টে এ-পর্যন্ত কোনোদিন একটাও ছাপার ভুল থাকেনি। ভবিষ্যতেও যেন না থাকে!

নন্দরাম ব'ললে, আপনি নিশ্চিন্দি থাকুন স্যার! মিশিন প্রুফ আমি দেকিয়ে তবে মিশিন চালাবো।

গোবিন্দ ব'ললে, ক'টা মাত্তর দিনের তো ওয়াস্তা স্যার। তারপর আপনি গে' ব'সলেই আমাদেরও আর চিন্তের কিছু থাকবে না?

হরিশের বিশীর্ণ মুখে ফুটে উঠলো একটু ম্লান হাসি। ব'ললে, ঠিকই তো!

কৃষ্ণনগরে এসে খবর পেয়েই কলকাতায় ছুটে এসেছে দীনবন্ধু। তাকে দেখে উল্লসিত হ'য়ে উঠলো হরিশের মুখ।—এসো হে দীনের বন্ধু! তোমার দর্পণ যে এরই ভেতর মিরর হ'য়ে ছাপা পর্যন্ত হ'য়ে গেল!

—জানি, দাদা। কিন্তু আপনার এ কী হ'ল?

দীনবন্ধুর ছলছল চোখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে হরিশ ব'ললে, রাজকীয় ব্যাপার হে! ছেলেবেলায় না খেয়ে কতদিন কেটেচে। গরীবের ছেলে ছিলুম ভালো ছিলুম। কিন্তু গত কয়েকবছরে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে রাজারাজড়াদের সঙ্গে ওঠাবসা ক'রেছি ব'লেই হয়তো রাজরোগে ধ'রেচে! চ'লে যাওয়ার আ'গে একটু রাজকীয় আড়ম্বর ক'রে যাচ্চি আর কি!

—এখন নাকি আয়ুর্বেদ চিকিচ্ছে চ'লচে?

—একটা কিছু চালাতে হবে ব'লেই চ'লচে আর কি! ডক্টর গুডিভ আর নীলমাধব মুকুজ্যেতো জবাব-ই দিয়েচেন। সুতরাং অ্যালোপ্যাথিবেদ ঘায়েল। তবু দামোদর কব্‌রেজ মশায়ের চিকিচ্ছের এই যে তোমাদের পাঁচজনের সঙ্গে দু'টো কথা ব'লতে পাচ্চি, এই যথেষ্ট! এখন কী মনে হচ্চে জানো দীনু? আরো ক'মাস আগে ব্যামোটা ধরা প্'ড়লে কব্‌রেজমশাই হয়তো আমাকে খাড়া ক'রে তুলতে পারতেন!

—এখনো পারবেন।

—তুমিও কি ছেলে ভোলাতে এলে নাকি হে? ওরে বাবা, হরিশ মুখুজ্যে জ্ঞানপাপী। শরীরের ভেতর কিছু কলকব্‌জা যে বিগড়োতে শুরু ক'রেচে তা অনেকদিন আগেই টের পেয়েচিলুম।

—টের যদি পেয়েই থাকেন তবে ডাক্তার দেখাননি কেন?

—সময় পেলুম কোথায়? নীলদানোর দল যেসব কাণ্ডকারবার শুরু ক'রে দিলে তারপরও কি ব'সে থাকা যায়? তখন ও'দিক সামলাবো না নিজের চিকিচ্ছে করাবো? ব্যামোর কথা ছেড়ে দাও দিকি! ওদিককার খবর বলো। লারমুর-ফর্‌লঙ কোম্পানি কিছুটা টিট্ হ'য়েচে?

—কিছুটা কী ব'লচেন দাদা, চুপ্‌সে গেচে! কেষ্টনগর থেকে আসতে রেললাইনের দু'ধারেই দেখতে পেলুম কেবল আউশধানের বাহার—নীলগাছের নাম-গন্ধ নেই।

—ঠিক ব'লচো?—উত্তেজনায় উঠে ব'সলো হরিশ।—আঃ! আমার অর্ধেক ব্যামো বোধহয় সেরে গেল ভাই!

—আমি আরো একটা খবর এনেচি দাদা! নদীয়া, যশোর, পাবনা, রাজশাহী, ফরিদপুরের লাখ লাখ চাষী আগ্রহে অধীর হ'য়ে উঠেচে, কবে তারা আপনাকে একবার চোখের দেখা দেখবে!

—আমাকে! তা আর বোধ হয় হবে না দীনু! তারা দেখবে কেন, আমিই তো তাদের দেখবার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা ক'রচিলুম! সব তাদের নিজেদেরই কৃতিত্ব দীনু। সংঘবদ্ধ শক্তি যে কি অসাধ্যসাধান কত্তে পারে, নীলচাষীরা তা দেখিয়ে দিয়েচে! আমাদের দেশের কত বড়ো দুর্ভাগ্য, চুনোগলি সংস্কারের জন্যেও আমরা হয়তো একদিনের নোটিশে একটা 'চুনোগলি উন্নতি বিধায়িনী সমিতি' স্থাপন কত্তে পারি কিন্তু যে চাষীরাই দেশের আসল শক্তি, তাদের জন্যে কোনো সংঘ নেই, কোনা সমিতি নেই! এবারে সংঘ-শক্তির জোরটা তারা নিজেরাই বুঝতে পেরেছে, তারা আরো সজাগ হবে!

—সজাগ হ'য়েচে। এখন কোনো কুঠির একটা আমিনের সাধ্যি নেই, রায়তের অমতে জমিতে মার্কা করে। একশো লেঠেলেরও সাহস নেই, একটা রায়তের ঘরের মেয়ের গায়ে হাত দেয়! এযাবৎকাল

মিথ্যে মামলায় শুধু আসামীর কাঠগড়াতেই দাঁড়িয়ে এয়েচে, এখন দাঁড়াচ্চে ফরেদির কাঠগড়ায়। রায়তেরাই উল্‌টে নালিশ ঠুকতে শুরু ক'রেচে নীলকরের নামে।

—আই ওয়জ করেক্ট! আই ওয়জ করেক্ট!—প্রচণ্ড উত্তেজনায় খাট থেকে নেমে টেবিলের পাশে রাখা পত্রিকার র‍্যাকের কাছে চ'লে গেল হরিশ। দ্রুত হাতে পেট্রিয়টের বছর দু'য়েক আগেকার একটা ফাইল বের ক'রে পৃষ্ঠা ওল্‌টাতে লাগলো। উদ্দিষ্ট অংশটা পেয়েই চেঁচিয়ে উঠলো, The time is nearly come when all Indian questions must be solved by Indians!

প্রচণ্ড উত্তেজনা আর চিৎকারের জন্যে কাশির দমক এলো। কাশতে কাশতে ফাইলটা জায়গামতো রেখে দিয়ে ব'ললে, এটা অবশ্য আমি নীলবিদ্রোহের কথা ভেবে লিখিনি।" লিখেছিলুম সাতান্ন সালের মহাবিদ্রোহের পর। কিন্তু এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস দীনু, নিজের সমস্যার সমাধান নিজেকেই ক'রতে হয়, অপরকে দিয়ে সমাধান হয় না! বিশেষত, যারা এদেশকে তাদের শোষণের উপনিবেশ ক'রেচে, তাদের দিয়ে তো নয়ই। একটা গ্র্যান্ট, একটা ইডেন কি একটা হার্শেল কী ক'রতে পারে? নীলচাষীরা সেটা বুঝতে পেরেচিলো ব'লেই নিজেরা যখন বুক ঠুকে নেমে পড়লে, তখন সমাধান হ'ল সমস্যার! ওরাই পারবে দীনু, ওরাই পারবে। ব্রিটিশকে কোনোদিন যদি এদেশ থেকে বিদেয় নিতে হয়, সেটা ওদের জন্যেই হবে। শিক্ষিত ভদ্দরলোক নেটিবরা ওদের বিদেয় ক'রতে চাইবে না—

হাঁপাতে হাঁপাতে খাটে এসে শুয়ে পড়লো হরিশ। ব্যাকুল উৎকণ্ঠিত স্বরে দীনবন্ধু ব'ললে, দোহাই আপনার দাদা, আপনি উত্তেজিত হবেন না। আপনার কষ্ট হচ্চে!

—আরে রেখে দাও শরীর। এ ঝাঁজরা খাঁচাটা তো আর ক'দিন বাদেই আগুনে পুড়বে। তার আগে এই যা জেনে গেলুম এতে যে আমার কতবড়ো আনন্দ তা আর কেউ না বুঝুক, নীলদর্পণের লেখক নিশ্চয়ই বুঝবে!

দীনবন্ধু এগিয়ে এসে হরিশের বুকে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। হাড়গুলো গোণা যাচ্ছে, হাঁপরের মতো ওঠা-পড়া ক'রছে বুকের ভেতরটা।

কাশির বেগ একটু সাম্‌লে নিয়ে ভয়ার্তভাবে দীনবন্ধুর হাত সরিয়ে দিয়ে হরিশ ব'ললে, ক'চ্চো কী? পাগল হ'য়েচো? আমার এত কাছে এলে কেন? স'রে যাও, ওই দূরের চেয়ারে ব'সো গে'। জানো না, এ-রোগ কি নির্দয়ভাবে ছড়ায়?

ধরা গলায় দীনবন্ধু ব'ললে, জানি।

—তাহ'লে আমার এত কাছাকাছি আসচো কেন?

নীলদর্পণের লেখক বত্রিশ বছরের যুবক ঝর্‌ঝর্‌ ক'রে কেঁদে ফেললো।—দাদা, এভাবে এতবড়ো একটা সব্বোনাশকে আপনি কেন ডেকে আনলেন?

জলে ঝাপ্‌সা হ'য়ে এসেছে হরিশের চোখ-ও। কিন্তু চেষ্টাকৃত একটু হাসি ফুটিয়ে সে ব'ললে, দ্যাখো দিকি জ্বালা! তুমি যে আমার বিন্দুমাধবের মতো কাঁদতে শুরু কল্লে! বী তোরাপ ব্রাদার, বী তোরাপ!

দীনবন্ধু ধরা গলাতেই ব'ললে, এই মুহূর্তে আমি তা পাচ্চি নে!

—দীনু, এ হয়তো ভালোই হ'ল! হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন ব্রিটিশ সোসাইটির সম্মানিত সদস্যেরা। তাঁদের তোষণ-নীতিতে বাধা দেবার জন্যে হরিশের মতো আপদটা আর থাকবে না! তাঁদের অনেক মিষ্টি মিষ্টি রেজোলুশনেই এ-যাবৎ অনেক সময় বাগড়া দিয়েচে এই ভ্রান্ত স্বদেশহিতৈষী অপদার্থটা!

—ভ্রান্ত স্বদেশহিতৈষী! আপনি?

—কেন, তুমি জানো না? হরিশ মুখুজ্যের নাকি স্বদেশহিতৈষণার ইচ্ছে আছে, কিন্তু লোকটা ভ্রান্তপথে চ'লছে ব'লেই কাজের কাজ কিছুই ক'ত্তে পাচ্চে না।

—কে বলে এ-কথা?

—কেন, তুমি তাদের ধ'রে শ্যামচাঁদের প্রহার ক'রবে নাকি? রাজা-জমিদারদের ভেতর একমাত্তর ওই সাতু সিংঘির ছেলেটা ছাড়া আর সবাই তাই মনে করেন দীনু! বেশিদূর যেতে হবে না, আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু কিশোরীচাঁদেরও সেই একই ধারণা! কি জানি, ওদের ধারণাই হয়তো সত্যি!

—কোন্‌টা সত্যি, কোনটা মিথ্যে, নীলবিদ্রোহে তা যাচাই হ'য়ে গেচে, দাদা!

—তুমি নীলদর্পণ লিখেচো, তুমি তো সে-কথা বলবেই! কিন্তু তাঁরা বলেন, আমি আগুন নিয়ে খেলেচি। নীলচাষীদের উস্‌কে দেওয়ার ভয়ঙ্কর রাজনীতি ক'রে আমি নাকি ভব্য রাজনীতির চূড়ান্ত ক্ষতি ক'রে দিয়েচি।

চুপ ক'রে রইলো দীনবন্ধু। জমিদারদের আবেদন-নিবেদনই কি ভব্য রাজনীতি?

একটু দম নিয়ে হরিশ আবার ব'ললে, আমার বিবেক আর বিশ্বাস নিয়েই যা করবার আমি ক'রেচি। হয়তো এ রাজরোগ একদিক থেকে আমার পরম উপকারই ক'রলে দীনু! এক্সট্রিমিস্ট হরিশ মুখার্জি মডারেট হ'ল না। এক্সট্রিমিস্ট পরিচয় নিয়েই সে দুনিয়া থেকে চ'লে যাবে!

—এ-কথা ব'লবেন না দাদা, এ-কথা ব'লবেন না!

দীনবন্ধুর গলা দিয়ে স্বর যেন বেরোতে পারছে না। দু'চোখ কেবলই ঝাপ্‌সা হ'য়ে আসছে।

হরিশ ম্লান হাসি হেসে ব'ললে, তুমি দেখচি বড়ো সেন্টিমেন্টাল! আমি না ব'ললেও যা ঘটবার তা তো ঘ'টবেই ভাই! দু'দিন আগে কিম্বা পরে—এই যা। ও-কথা কেন ব'ললুম জানো? অ্যাসোসিয়েশনের জমিদারবাবুরা যে আমাকে এক্সট্রিমিস্ট খেতাব দিয়ে একঘ'রে ক'রেচেন এটা আমার খুবই আনন্দের বিষয়। হ্যাঁ, আমি তাই-ই। রাজনীতির নামে ভণ্ডামি আমার অসহ্য! ও'রা নিজেদের ভণ্ডামিকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের আখের অনেক গুছিয়েচেন, আরো গোছাবেন। সেটা ঠেকানোর সাধ্যি তো আমার নেই? ভবিষ্যতেও যদি ও'দের এই রাজনীতি সচল থাকে তাহ'লে দেশের কপালে অনেক দুর্ভোগ আছে। আমাকে কালব্যাধিতে ধ'রেচে শুনে কলীপ্রসন্ন আর ওতোরপাড়ার জয়কেষ্ট ছাড়া আর সব জমিদারই কিন্তু খুশিতে ডগমগ। হয়তো কেউ হিন্দুমতে, কেউ বেহ্মমতে আমার শেষ নিঃশ্বেসটা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে মানত-ও ক'রে থাকতে পারেন। যেতে যখন হবেই তখন তাড়াতাড়ি যাওয়াই ভালো।

—আপনাকে যে চ'লে যেতেই হ'বে, এ-কথা কেন বারবার ভাবচেন? আমি তো শুনে এয়েচি, কবুরেজি চিকিচ্ছেয় আপনার শরীর আগের চেয়ে অনেক সুস্থ হ'য়েচে। চোখে দেখেও তা বুঝতে পাচ্চি।

আবার সেই কৌতুকের ছোঁয়া-লাগানো হাসি ফুটে উঠলো হরিশের মুখে।—দেখচি, তুমি কেবল কবি-নাট্যকারই নও, কবিরাজও বটে! ওহে ইন্‌স্‌পেক্টিং পোস্টমাস্টার, মনুষ্যদেহটা পোস্ট-আপিস নয় যে দেখেই তুমি তার হালচাল বুঝে ফেলবে! কু-অভ্যেস আর কুসঙ্গেরও তো একটা মাত্রা আচে? আমার জীবন-বর্ণমালায় মাত্রা নামক চিহ্নটা কোনোদিনই পাত্তা পায়নি। তা সত্ত্বেও এই খাঁচাটা যে তার প্রাণপাখি সমেত এতদিন টি'কে গেল, এইটেই তো আশ্চর্য! কবরেজমশাই যথাসাধ্য চেষ্টা কচ্চেন তাই হয়তো আগের চেয়ে একটু ভালো মনে হচ্চে। মনটা কিন্তু আমার বোঁচকা-বুঁচকি বেঁধে খেয়াঘাটে গে' ব'সে আচে! ভেবে দ্যাকো দিকি, কত নীলকুঠিতে শ্যাম্পেন পার্টি হবে? লারমুর সাহেবের মোল্লাহাটি কুঠিতে তো মোচ্ছব লেগে যাবে! আমাদের দিশি জমিদারবাবুরা প্রকাশ্যে উৎসব ক'রলে নেহাৎ ভালো দেখায় না ব'লে হয়তো বাগানবাড়িতে আয়োজন ক'রবেন। দুঃখু এই যে, সেসব আমার আর দেখা হবে না!

দীনবন্ধু নিজেকে আর সামলাতে পারছে না। হরিশের মুখে কিন্তু সেই মর্মান্তিক কৌতুকের হাসি।

॥ ছত্রিশ ॥

এই কলকাতার বুকের ওপরেই তালতলার একটা ছাপাখানায় ছাপা হ'য়েছে অথচ এখানে থেকেও বহু চেষ্টায় মিস্টার ব্রেট যার এক কপিও সংগ্রহ ক'রতে পারেননি, সে জিনিস তাঁকে পেতে হ'ল ডাকযোগে সুদূর লাহোর থেকে। লাহোর ক্রনিকল্ সম্পাদক ইণ্ডিগো প্ল্যাণ্টিং মিরর বইয়ের একখানা কপি পাঠিয়ে দিয়েছেন ইংলিশম্যান সম্পাদক ব্রেটকে।

বই তো নয়, একখানা জ্বলন্ত অঙ্গার!

আগের রাতেই বইখানা প'ড়ে ফেলেছেন ব্রেট। অসহ্য রাগে, উত্তেজনায় তখন থেকেই মাথা গরম হ'য়ে উঠেছে। রাতে ঘুম হয়নি। একে মে মাসের গরম, তার ওপর ইণ্ডিগো মিররের প্রতিক্রিয়া। নিষ্ফল আক্রোশে পত্রিকা অফিসের অধস্তন অফিসার-কর্মীদের সঙ্গে সারাদিন দুর্ব্যবহার ক'রেছেন। নেটিভ পাংখাপুলারকে লাথি মেরেছেন।

ইন্ফার্নাল সোয়াইন্স্!—দাঁতে দাঁত চেপে আপনমনেই অজ্ঞাত লেখক আর অনুবাদকের উদ্দেশে অভিব্যক্তি প্রকাশ ক'রলেন ব্রেট। নাম প্রকাশ করবার সাহস নেই? কেন শুধু 'বাই এ নেটিব?' কেন নামটা ছাপানোর হিম্মতে কুললো না? শুধু মুদ্রাকরের নাম ছাপা আছে সি, এইচ ম্যানুয়েল। সে-ও তো শ্বেতাঙ্গ। নেটিব কুকুরগুলো কোন্ কৌশলে একজনের পর একজন শ্বেতাঙ্গকে বশ ক'রে ফেলছে? গ্র্যাণ্টের জন্যে অস্ত্র মজুত করা আছে, সময়মতোই সে অস্ত্র নিক্ষেপ করা হবে! কিন্তু এই ইণ্ডিগো প্ল্যাণ্টিং মিররের পেছনে কে আছে? সে-ও কি গ্র্যাণ্ট? ভাসা-ভাসা ভাবে যে খবরটুকু কানে এসেছে তাতে বেঙ্গল গবর্নমেন্টের সেক্রেটারি বদমায়েস সিটনকার আছে এর পেছনে। কিন্তু গ্র্যাণ্টের সম্মতি না থাকলে এতখানি এগোনোর সাহস কি হবে সে লোকটার?

মিস্টার ফার্গুসনের সঙ্গে দেখা হওয়ার পরই রহস্য অনেক স্পষ্ট হ'য়ে গেল। বাঙলা বইখানার ইংরিজি তর্জমা নিয়ে চার্চ মিশনারি সোসাইটির সেই আইরিশ পাদ্রিটাই মাতামাতি ক'রেছে সবচেয়ে বেশি। সেই লোকটাই দলে টেনেছে সিটনকারকে। এই দুই শয়তানের ফন্দিতেই এ তর্জমা চ'লে গেছে হোম পর্যন্ত। সুযোগ পেয়ে কব্ডেন, ব্রাইটের মতো ভণ্ড লিবারেলগুলো খুব শোরগোল তুলেছে হাউস অব কমন্স্-এ। ক'লকাতায় বাস ক'রেও ইংলিশম্যানের সম্পাদক একখানা কপি জোগাড় ক'রতে পরেননি অথচ তার আগেই কপি পেয়ে গেল হোমে শত্রুপক্ষ?

অসহ্য কুৎসা! রুচিহীন আক্রমণ!

নীলকরদের চরিত্রে কটাক্ষপাত করা হ'য়েছে নিষ্করুণভাবে। তার চেয়েও মারাত্মক আক্রমণ করা হ'য়েছে ব্রেটকে আর ফোর্বস্কে। ইংলিশম্যান আর হরকরার সম্পাদক দু'জনকে নাটকের ভূমিকায় যে ভাবে আক্রমণ করা হ'য়েছে তা কেবল রুচিহীন নেটিবদের পক্ষেই সম্ভব। কারো নামই উল্লেখ করা হয়নি অথচ স্পষ্ট বুঝিয়ে দেওয়া হ'য়েছে, কোন্ দু'জন সম্পাদক সেই আক্রমণের লক্ষ্য!

"দৈনিক সংবাদপত্র সম্পাদকদ্বয় তোমাদের প্রশংসায় তাহাদের পত্র পরিপূর্ণ করিতেছে, তাহাতে অপর লোক যেমত বিবেচনা করুক তোমাদের মনে কখনই ত আনন্দ জন্মিতে পারে না, যেহেতু তোমরা তাহাদের এরূপ করণের কারণ বিলক্ষণ অবগত আছ। রজতের কি আশ্চর্য আকর্ষণশক্তি! ত্রিংশৎ মুদ্রালোভে অবজ্ঞাস্পদ জুডাস, খৃষ্ট-ধর্ম প্রচারক মহাত্মা যীজস্কে করাল পাইলেট করে অর্পণ করিয়াছিল; সম্পাদকযুগল সহস্র মুদ্রালাভ পরবশ হইয়া উপায়হীন দীন প্রজাগণকে তোমাদের করাল কবলে নিক্ষেপ করিবে আশ্চর্য কি?"

What surprising power of attraction silver has!

প্রত্যেকটা শব্দ যেন বেয়নেটের মতো খোঁচায় খোঁচায় রক্তাক্ত ক'রে দিচ্ছে বুকটাকে! হাজার টাকা! হাজার টাকা! জুডাস! ওঃ—

কিন্তু এত গোপন বিষয়টা একজন নেটিব নাট্যকারের কাছে কে পেঁাছে দিয়েছিল? এ খবর তো বাইরের কোনো লোকেরই জানার কথা নয়!

ফার্গুসন ব'ললেন, গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতায় দেখতে পাচ্চি আমাদের স্বজাতের ভেতরেই বিশ্বাসঘাতকের সংখ্যা দিন দিন বাড়চে। উদ্যমী নীলকরদের মুখে চুণকালি লাগানোর জন্যে একদিকে যেমন কয়েকটা নচ্ছার সিবিলয়ন রয়েচে, অন্যদিকে তেমনি কয়েকটা মিশনারি কোমর বেঁধে লেগেচে। ভণ্ড ধার্মিক লঙ আইরিশ, বমভেইট্‌শ্‌ জর্মন—ওদের আক্রোশের কারণটা যাহোক আন্দাজ ক'রতে পারি। কিন্তু ফ্রি চার্চের ডফ্‌ নিজে স্কচ্‌ হ'য়েও আমাদের পেছন থেকে ছুরি মারচে, এটা ভাবতেও অবাক্‌ লাগে। যাই হোক, ইণ্ডিগো মিরর নামে এই শয়তানির পেছনে লঙ আর সিটনকার আছে, সে খবর আমি জোগাড় ক'রে ফেলেচি। মনে রাখতে হবে, নেটিবদের ভেতর আমাদের স্বার্থের সবচেয়ে ঘৃণিত শত্রু হরিশ আর স্বজাতের ভেতর গ্র্যান্ট-সিটনকার-ইডেন কোম্পানি! নেটিবটা শুনেচি গ্যালপিং টি-বিতে কবরের দিকে পা বাড়িয়েচে। সেটা গেলে বাঁচি! কিন্তু স্বজাত দুশ্‌মনগুলোতো এত সহজে যাবে না! আপনি কিছু ভাববেন না মিস্টার ব্রেট, এই মিরর দিয়েই সিটনকারকে প্রথমে খতম ক'রবো, তারাপর ধরবো ভণ্ড আইরিশটাকে। আবার হাইকোর্ট!

—কেমন ক'রে তা সম্ভব? এ বইয়ের কোথাও তো তাদের নাম গন্ধ নেই!

—প্রিন্টার মিস্টার ম্যানুয়েলের নামেই প্রথমে লাইবেলের মামলা আনতে হবে। তারপর জেরায় জেরায় ওই দুই শয়তানের নাম একবার বের ক'রে নিতে পারলে তখন ঝাঁপিয়ে প'ড়বো! নাম বেরোবেই!

ফোর্ব্‌স্‌ ব'ললেন, তাছাড়া আর তো কোনো পথ-ও নেই!

ফার্গুসন ব'ললেন, মামলা একট নয়—দু'টো। আপনারা দু'জন নাটকের ভূমিকার এই অংশটুকুর ওপরে আনবেন মানহনির মামলা আর আমাদের সমিতির পক্ষ থেকে আর একটা মামলা রুজু করবার ব্যবস্থা ক'রতে হবে, কারণ নাটকের ভেতর শ্বেতাঙ্গ নীলকর ভদ্রলোকদের চরিত্রের ওপরেই কেবল কটাক্ষ করা হয়নি, তাঁদের বিবাহিতা পত্নীদের চরিত্র সম্বন্ধেও কুৎসিত ইঙ্গিত করা হ'য়েচে! এ অসহ্য!

ব্রেট একটু আম্‌তা আম্‌তা ক'রে ব'ললেন, আত্মসম্মানের জন্যে মানহানির মামলা আমাদের ক'রতেই হবে। কিন্তু প্রতিপক্ষ যখন বেঙ্গল গবর্নমেন্টের সেক্রেটারি তখন ভালো ব্যারিস্টার তো দিতেই হবে?

—টাকার কথা ভাবচেন? কোনো চিন্তা ক'রবেন না মিস্টার ব্রেট। আমি সমিতির সম্পাদক হিসেবে আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি, টাকার অভাব হবে না। নীলকর ভদ্রলোকেরা অকৃতজ্ঞ নয়! আপনারা তাঁদের জন্যে যা ক'রেচেন তার জন্যে কৃতজ্ঞতা ব'লে তো একটা কথা আছে? মামলা চালানোর দায়িত্ব আমিই নিচ্ছি। তার আগে আমার একটা অনুরোধ, আপনারা দু'জন একবার মিস্টার লার্‌মুরের সঙ্গে আলোচনা ক'রে নিন।

—তিনি কি ক'লকাতায় আসচেন?

—না, তেমন কিছু শুনিনি। আপনারাই দু'একদিনের জন্যে মুলনাথে যান।

—আপনি যখন বলচেন তখন যেতেই হবে।

—অনেক কিছু ভেবেই আমি এ-অনুরোধ করচি। অভিজ্ঞতায় মিস্টার লার্‌মুর্‌কে সবচেয়ে প্রবীণ বলা যেতে পারে। তাছাড়া এই নাটকে মিস্টার রোগ এবং মিস্টার উড চরিত্র দু'টি সৃষ্টি ক'রে যে তাঁকে এবং মিস্টার ফর্‌লঙ্‌কে কুৎসিতভাবে আঘাত হানার চেষ্টা করা হ'য়েচে তা দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার। সুতরাং ব্যাপারটা তাঁদেরও জানানো দরকার নয় কি?

একবাক্যে সমর্থন জানালেন ব্রেট আর ফোর্ব্‌স্‌।

তাঁরা দু'জন যেদিন মোল্লাহাটি কুঠিতে গেলেন ঠিক তার আগের দিনই সেখানে একটা ঘটনা ঘ'টে গেছে। কুঠির দৈনন্দিন জীবনে ঘটনা হিসেবে সেটা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু তার বিরক্তিকর রেশ তখনো মিস্টার লার্‌মুরের মন থেকে মুছে যায়নি।

কে কল্পনা করতে পেরেছিল যে কামিনী তার দেহের মাদকতায় আচ্ছন্ন ক'রে রেখে গুপ্তচর হ'য়ে আছে?

কথাটা শুনেই সম্পূর্ণ অবিশ্বাসে হাঃ হাঃ ক'রে হেসে উঠেছিলেন লার্‌মুর।—নন্‌সেন্স! কে ব'লেছে এ-কথা?

কিন্তু ক্যাম্পবেল যখন মাস তিনেক আগেকার দু'খানা হিন্দু পেট্রিয়ট কাগজ দেখিয়ে বললে, কামিনীর ঘরে সেগুলো পাওয়া গেছে তখন হতবাক্‌ হ'য়ে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন লার্‌মুর।

—কামিনীর ঘরে! তুমি কী বলচো ক্যাম্পবেল?

—অবিশ্বাস্য মনে হ'লেও ঘটনাটা সত্যি, স্যার! কামিনী ইংরিজি জানে না। কিন্তু তার ঘরে দামুরহুদার সেই শয়তান মহেশ চ্যাটার্জির গোয়েন্দার যাতায়াত আছে, এটা বোঝা যাচ্ছে। সেই লোকটাই সম্ভবত ভুলে এদু'টো ওর ঘরে ফেলে গেছে।

কর্কশ, কঠিন মুখ আরো কঠিন হ'য়ে উঠলো লার্‌মুরের। এই মারাত্মক সাপিনীকে এতদিন তিনি সরল মনে বিশ্বাস ক'রে এসেছেন!

—তুমি কোন্‌ সূত্রে সংবাদ পেলে যে ওর ঘরে মহেশের গুপ্তচর আসে?

লারমুরের রূঢ়, কঠিন কণ্ঠস্বরে সহকারী ম্যানেজার ক্যাম্পবেলের বুক পর্যন্ত কেঁপে উঠ্‌লো। সে-ভাবটা সামলে নিয়ে সে বললে, স্যার, সূত্র আমাদের কুঠিরই বিশ্বস্ত কর্মচারি পেশকার গোকুল মিটার।

—বিশ্বস্ত! কোনো নেটিবকে আমি বিশ্বাস করি না, ক্যাম্পবেল। ব্লাডি বাস্টার্ডস্‌! প্রত্যেকটা নেটিব বেজন্মা! ওহ্‌, ডেভিল হিন্দু পেট্রিয়ট! ইন্‌ফারন্যাল সোয়াইন হ্যারিস মোকার্জি! দ্য ইন্‌ফারন্যাল সোয়াইন এভার বর্ন্‌!

উৎসাহিত ক্যাম্পবেল ব'ললে, ওটুকু ব'ললেও তার যোগ্য বিশেষণ হয় না স্যার!

—কামিনীকে গুদাম ঘরে তলব করো, আমি যাচ্ছি।

—আমি এখুনি লোক পাঠাচ্ছি স্যার। মেয়ে জাতটা পুরুষের চেয়েও সাংঘাতিক! বিষাক্ত সাপ যে-ক'টা আছে সবই মাদী।

—আমি জানি। তুমি তাকে ডাকতে লোক পাঠাও। সে যদি আসাতে না চায়, তার চুলের মুঠি ধ'রে যেন টেনে আনা হয়! আর, হাসপাতাল থেকে একটু তার্‌পিন তেল পাঠিয়ে দিতে বলো। না, না, তার্‌পিন তেলের দরকার নেই। মিছেমিছি দু'পয়সার তেল নষ্ট হবে।

খুশির উচ্ছ্বাসে ক্যাম্পবেল অধীর। কয়েকমাস আগে রায়তদের হাতে মার খেয়ে সে যখন মাটিতে প'ড়ে গিয়েছিল তখন একটা যুবতী মেয়ে এসে বীভৎস হাসি হাসতে হাসতে তার বুকে উঠে নেচেছিল, মুখে বারবার লাথি মেরে রক্তাক্ত পা দেখিয়ে বলছিল, আলতা পচ্চি। তখনো সম্পূর্ণ জ্ঞান হারায়নি ক্যাম্পবেল। পরম করুণাময়ের দয়া ছিল ব'লেই সে-যাত্রা সে বেঁচে উঠেছে। তারপর থেকেই নেটিব মেয়েগুলোর ওপর তার অসহ্য রাগ।

আত্মরক্ষার অস্থির তাড়নায় মরীয়ার মতো একটা ঝুঁকি নিতে হ'য়েছিল গোকুল মিত্তিরকে। সে ঝুঁকি নেওয়া তার সার্থক হ'য়েছে।

কায়েতের ছেলে হ'য়ে একটা ছোটোজাতের মাগী কামিনীর পা-ও তাকে জড়িয়ে ধরতে হ'য়েছিল একদিন। তারপর কয়েকরাত সে ঘুমোতে পারেনি। ভবি জেলেনীকে না হয় সরিয়ে দেওয়ার

ব্যবস্থা করা গেল, কিন্তু তারপর? এই শয়তান কামিনী মাগী তো তখনো বহাল তবিয়তেই বে'চে থাকবে আর বড়োসায়েবের কোলে শোবে। নিজের পথের কাঁটা দূর হওয়ার পর সে যদি কোনোদিন সাহেবের কাছে অভয়পদ-র কথা ব'লে দেয়? এত কায়দা ক'রে কামাই-করা হাজার হাজার টাকা, বেনামিতে তোলা বাড়ি—সব কিছু মিথ্যে হ'য়ে যাবে! বড়োসাহেব কি বাঁচিয়ে রাখবে তাকে? খতম ক'রবেই! ভোগই যদি না করা গেল তাহ'লে এতদিন কুঠির চাকরি ক'রে কী লাভ হ'ল?

আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কা বিচলিত ক'রে ফেলেছিল গোকুলকে। তার ক'দিন পরেই কুঠির কাজের অজুহাতে সে ছুটলো কাচিকাটায় কেদার মুখুজ্যের কাছে। ব্রাহ্মণের পায়ের কাছে হাজার টাকার একটা তোড়া প্রণামী রেখে পায়ের ধুলো জিভে আর মাথায় ঠেকিয়ে ব'ললে, বড়ো বিপদে পড়িচি নায়েবমশাই, উদ্দার কত্তিই হবে!

টাকার তোড়াটা দেখে বড়ো খুশি কেদার মুখুজ্যে। মোলায়েম হাসি হেসে ব'ললে, আহা হা, তার জন্যি আবার পেন্নামি ক্যান গোকুল? কত দিলে?

—এক হাজার। হাজার হোক আপনি বন্নছেষ্ট বেরাহ্মণ। পেন্নামি না দিলি পাপ হবে না?

আরো মোলায়েম হাসি হেসে কেদার ব'ললে, কাগের মাংস কাগে খায় না। তণ্ড বেরাহ্মণের সম্মানে দিলে ব'লেই নিতি হচ্চে। কী বিপদে পড়িচো, কও শুনি।

একটা সাজানো কাহিনী আগেই মনে মনে মক্শো ক'রে গিয়েছিল গোকুল। আসল কথা তো বলা যাবে না? তাহ'লে বিপদের ক্ষেত্র আর একটা বাড়বে।

গড়গড় ক'রে সাজানো গল্পটা ব'লে গেল গোকুল। যে কৈবর্তের জল চলে না, সেই কৈবর্তের ঘরের মেয়ে হ'য়ে ধরাকে সরাজ্ঞান ক'রছে বড়ো সাহেবের পেয়ারের মাগী কামিনী। বামুন-কায়েত যে উঁচু জাত তা তো সে মানেই না; উল্টে শাসাচ্ছে, গোকুলের চাকরি খেয়ে নেবে। গোকুলের অপরাধ, সে নাকি রাগের মাথায় একদিন কামিনীর একটা ভাইকে বেজন্মা ছোটোলোক ব'লেছিল। কুঠিতে কাজ ক'রতে গেলে ওই সামান্য কথাটাকে কেউ ধর্তব্যের মধ্যে নেয়? কিন্তু তারপর থেকেই মাগীটা শাসিয়ে চ'লেছে, বড়ো জাত কায়েতের পেশ্কারগিরি কেমন ক'রে থাকে তা-ও সে দেখে নেবে। এমনিতেই শুয়োরের বাচ্চা রায়তগুলোর বেয়াদপিতে কুঠিতে শান্তি নেই, বড়ো সায়েবের মেজাজ সব সময়ই আগুন হ'য়ে আছে। তার ভেতর ওই বেশ্যা মাগী যদি উদোম গায়ে সাহেবের কোলে ব'সে মাতাল অবস্থায় সাহেবের গলা জড়িয়ে ধ'রে আবদার করে, গোকুল মিত্তিরকে ছাড়িয়ে দাও, তাহ'লে তার পরের দিনই হয়তো চাকরি ডিস্মিস্ হ'য়ে যাবে। এ অবস্থায় নিজে কোনো পথ ঠিক ক'রতে না পেরে ছুটে এসেছে গোকুল। সে জানে, কেদার মুখুজ্যের মতো মানুষ ঠিকই একটা সুরাহা ক'রে দিতে পারবেন।

—মাগীডারে সরাতি চাও?—প্রশ্ন ক'রলে কেদার।

—তালি তো সবচে ভালো হয়।—উৎসাহে উত্তেজনায় মুখ চক্চক্ ক'রে উঠেই আবার নিষ্প্রভ হ'য়ে গেল গোকুলের মুখ।—কিন্তু সেডা তো অসাদ্যি কাজ!

কেদার মুখুজ্যের মুখে ফুটে উঠলো এক বিশেষ ধরণের আত্মতৃপ্তির হাসি। গড়গড়ার নলে বেশ মৌজ ক'রে দুটো টান দিয়ে ব'ললে, ভগবানের দুনিয়ায় অসাধ্যি ব'লে কোনো কাজ আচে? সে যাই হোক, আমার কাচে যখন ছুটে আয়েচো তখন উপায় একটা ক'রে দিতিই হবে! কাজ উশ্ধার হলি আরো হাজারখানেক দিতি পারবা তো গোকুল?

—আরো এক হাজার!—গোকুলের মুখে করুণ অভিব্যক্তি ফুটে উঠলো।

—আচ্ছা, আচ্ছা, শ'পাঁচেকই দিও। হাজার হোক, একই ধম্মে দুজনই যকন আচি, তকন তোমার দিকটাও আমার বিবেচনা কত্তি হবে বৈ কি! মোক্ষম অস্তর তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি। ঠিক মতো কাজে লাগাতি পারলি তোমার চাকরিও ডিস্মিস্ হবে না, এমন কি তোমার সুন্দরী বুনডার কপালও আবার ফিরে যেতি পারে।

বিগলিত হাসি হেসে গোকুল ব'ললে, আজ্ঞে বিশ্বেস করেন, চাকরিডে রক্ষে হ'লিই আমার শান্তি। তারপর ভালো যুগ্যি পাত্তরের সন্ধান মিল্‌লিই বুনডারে বিয়ে দিয়ে দেবো।

—আহা, এত ব্যস্ত হওয়ার কী আচে? তোমার বুনডা তো অ্যাকনো রসে টইটুম্বুর, অ্যাঁ? ওই ছেনালি মাগী কামিনী আসার পরেই যে তারও কপাল পুড়িচে, তোমারও কপাল পুড়িচে, তা কি আর আমি জানিনে গোকুল? দেক্‌তিই তো পাচ্চ, দিনকালের গতিক খারাপ। কবে কুটি বন্ধ হ'য়ে যাবে তার ঠিক নাই। সময় থাক্‌তি যা পারো গুছোয়ে ন্যাও! তোমার বুনডার কপাল যদি ফেরে তো তোমারও পোয়াবারো! দাঁড়াও, পাশুপত অস্তর এবার তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি।

কথাটা ব'লেই ভেতরঘরে চ'লে গেল কেদার মুখুজ্যে। একটু পরেই ময়লা ন্যাকড়ার মোড়কে ঢাকা হিন্দু পেট্রিয়টের দুখানা কপি নিয়ে বেরিয়ে এলো। মুখে একগাল হাসি।

—এই ন্যাও।—গোকুলের হাতে মোড়কটা দিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে ব'ললে, এরে মিত্যুবাণ-ও কতি পারো। শালা হরিশ মুকুজ্যের কাগজ। এই মাল কামিনী মাগীর ঘরে পাচার ক'রে দিয়ে সায়েবদের কানে খালি একবার কথাডা জানান দিয়ে দেয়া! পার্‌বা না?

গোকুল ব'ললে, তা বোধয় পারবো। কামিনীর ভাই কেনারামডা আমার হাতে আচে। কিন্তু—

—এতে কোন্ কাজডা হবে, এই তো? একবার ওষুদটা প্রেয়োগ ক'রেই দ্যাকো না, কী হয়!

দিন তিনেক পরের কথা।

কিছুক্ষণ আগে সন্ধ্যে ঘুরে গেছে। হাঁড়িতে ভাত চাপিয়ে উনুনের সামনে হাঁটুতে মুখ গুঁজে ব'সে আকাশ-পাতাল কত কথা ভাবছিল কামিনী। দুপুর গড়িয়ে যাওয়ার পর কেনই বা ক্যামেল সাহেব হঠাৎ তার ঘরে এসে ঢুকলো, হাঁড়ি-কলসীর পেছন থেকে ময়লা ন্যাকড়ায় জড়ানো কি সব ছাপা কাগজ বের ক'রে প'ড়লো, তার কোনো মানেই খুঁজে পাচ্ছে না সে। ওগুলো কী আর কেমন ক'রেই বা তার ঘরে এসেছে, তাও সে ভেবে পাচ্ছে না। কাগজ পড়তে পড়তে ক্যামেল সায়েবের চোখদু'টো জ্বলজ্বল ক'রে উঠছিল, তা সে দেখেছে।

ক্যাম্পবেল কট্‌মট্ ক'রে কামিনীর দিকে কয়েকবার তাকিয়ে সেই পুঁটলিটা নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। বড়ো খট্‌কা লাগছে কামিনীর। যে-মেয়ে লালমোন সাহেবের পেয়ারে রয়েছে তার দিকে কট্‌মট্ ক'রে তাকানোর সাহস ক্যামেলসাহেব কোথায় পেলো? ওই কাগজে কী এমন ছিল?

—কামনী!—উঠোন থেকে সর্দার লেঠেল রামবিলাসের গলার স্বর শোনা গেল।

কামিনী ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াতেই রামবিলাস ব'ললে, বড়া সাব্ তলব কিয়েছেন!

আচ্চা। ভাত চেপিয়েচি। ফুটে উট্‌লিই উবুড় দে' যাচ্চি—

—নেহি, আভি যানেকো হুকুম।

আরো বেশি ধাঁধা লাগলো কামিনীর। রামবিলাসের পেছনে আব্‌ছা অন্ধকারে মিশে দাঁড়িয়ে আছে লাঠি-হাতে আরো চারজন লেঠেল। সাহেব তো হুকুম পাঠালে একজনকে দিয়েই পাঠায়। আজ পাঁচজন কেন? হঠাৎ বুক কেঁপে উঠলো কামিনীর। ক্যাম্পবেল সাহেবের সেই কট্‌মটে চাউনি ভেসে উঠলো তার চোখের সামনে।

ভয়ে ভয়ে কামিনী ব'ললে, তোমরা যেতি নাগো, মুই কুটিতি যাচ্চি।

—নেহি, কোঠিমে নেহি। হামরা সাথ আভি যানে হোগা। চলো—

কামিনীর মুখ বিবর্ণ হ'য়ে গেছে। উনুনে ভাত তখন সবে ফুটতে আরম্ভ ক'রেছে। ভাত উপুড় দেওয়া আর হ'ল না। উঠোনে নেমে এসে কোনোমতে ব'ললে, চলো—

অন্ধকার নীলখোলা পেরিয়ে পাঁচজন লেঠেলের সঙ্গে এগিয়ে চ'ললো কামিনী। সামনেই কুঠির সেই ভয়ঙ্কর গুদামঘর। কামিনীর গলা শুকিয়ে গেছে। ওদিকে কেন? ওখানেই তো

এতকাল ধ'রে কয়েদ ক'রে রাখা হ'য়েছে রায়তদের। ইজ্জৎ কেড়ে নেওয়া হ'য়েছে রায়ত ঘরের বৌঝিদের!

ক্ষীণ কাঁপা স্বরে কামিনী ব'ললে, ওদিকি নে' যাচ্চ ক্যান?

—হুকুম।—এককথায় সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলে সর্দার লেঠেল।

কামিনীকে ঘিরে নিয়ে পাঁচ লেঠেল এসে ঢুকলো গুদামঘরে। দু'পাশে দু'টো মশাল জ্বলছে। সেই আলোর কাঁপা কাঁপা শিখায় অন্ধকারের চিল্‌তেগুলো যেন নাচ্‌ছে!

লারমুর সাহেবের মূর্তি দেখে শিউরে উঠলো কামিনী। ছট্‌ফট্‌ ক'রতে ক'রতে পায়চারি ক'রছেন লারমুর। তাঁর ডানহাতে সেই বীভৎস চাবুক শ্যামচাঁদ আর বাঁহাতে ক্যাম্পবেল সাহেবের নিয়ে-আসা সেই ছাপা কাগজ। একটু দূরে একটা মশালের কাছে দাঁড়িয়ে ছোটোসাহেব ফর্‌লঙ। হাতে একটা পিস্তল।

কামিনীর গলা দিয়ে স্বর বেরোচ্ছে না। তবু ফ্যাঁসফেঁসে কাঁপা গলায় ব'ললে, আমারে এখেনে ডাকলে ক্যান সায়েব? মুই—

লারমুরের প্রচণ্ড গর্জনে চাপা প'ড়ে গেল কামিনীর আর্তস্বর।—স্টপ ইট য়ু ইনফার্নাল বীচ! লালমোন সাহাবকে ভুলাইয়া রাখিয়াছিলে, আঁ? লাঠিয়াল্‌স্‌! এ শালী আওরৎকো তুই হাট একট্রে বান্ধিয়া ইস্‌কো নাঙ্গা কর্‌ দেও! মেক হার নেকেড! কুইক—

—সায়েব!—ভাঙা গলায় করুণ আর্তনাদ ক'রে উঠলো কামিনী।—দোই তোমার সায়েব! এতগুলো নোকের সুমুকি আমারে ন্যাংটা ক'রো না!

ডেরি কাঁহে?—লেঠেলদের উদ্দেশে আবার চেঁচিয়ে উঠলেন লার্‌মুর, জলদি কাপড়া খোল্‌কে খাম্বা সাথ বান্ধো শালীকো!

কয়েকমুহূর্তের ভেতর কামিনীকে বিবস্ত্রা ক'রে পাশের একটা শালখুঁটিতে কামিনীকে বেঁধে দিলে লেঠেলরা। যদিও এ-হুকুমে তারা একটু হক্‌চকিয়ে গিয়েছিল কিন্তু হুকুম যখন হ'য়েছে তখন তামিল না ক'রে রেহাই নেই।

মশালের আলো কাঁপছে কামিনীর উলঙ্গ দেহের উপর। ক্রূর, বীভৎস দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে এক-পা এক-পা ক'রে কাছে এগিয়ে আসতে লাগলেন লারমুর।

—য়ু ভেনমাস সার্সি অব মুলনাট কোঠি! শালী ডাহিন! হামার হাতের এই কাগজ চিনিটে পারিটেছিস? কি রূপে এইগুলি টোর ঘরে আসিল?

—মুই জানিনে সাহেব! ও-কাগজ মুই চিনিনে!

—হুঁ, চিনিস্‌ না! শাম্‌চাণ্ড্‌সে দোস্ত হইলেই চিনিটে পারিবি! লাঠিয়ালস্‌! তোমলোগ আভি বাহার যাও। হাম বোলানেসে তব্‌ আয়েগা!

অনুচরদের নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বাইরে চ'লে গেল রামবিলাস। বড়ো সাহেবের পেয়ারের আওরৎকে সে নিজর হাতে উলঙ্গ ক'রেছে, এতবড়া একটা কাজের গৌরবে সে তখন দিশেহারা।

—কাম্‌নী!—দাঁতে দাঁত চেপে ব'ললেন লারমুর, বড্‌মাশ মহেশ চটর্জির স্পাই শালী! টোমার এই গটরে লালমোন সাহেবের বহুট আডর খাইয়াছ, আঁ? আজ থোড়া শাম্‌চাণ্ড্‌কা আডর খাও!

সপাং—

প্রথম চাবুক পড়লো কামিনীর বুকে। ক'কিয়ে-ওঠা একটা আর্তচিৎকার বেরিয়ে এলো কামিনীর গলা থেকে। তার অনাবৃত স্তন দু'টি থেকে দর্‌দর্‌ ক'রে রক্ত ঝ'রছে।

সপাং—সপাং—সপাং—

উন্মত্ত লারমুরের নির্দয় শ্যামচাঁদ মুহুর্মুহু পড়তে লাগলো কামিনীর বুকে, পেটে, পায়ে। বীভৎস পৈশাচিক অট্টহাসিতে গুদামঘর কাঁপিয়ে লারমুর ব'লতে লাগলো, টোমার ডেহ বহুত মিঠা আছে! লালমোন সাহেবকে বরাবর ভুলাইয়া রাখিবে ভাবিয়াছিলে, ইজ্‌ন্‌ট্‌ ইট?

আর একটা চাবুক প'ড়লো কামিনীর উরুর উপর। দরদর্ ক'রে রক্তের ধারা বেয়ে নামছে। কিন্তু সে-আঘাত অনুভব করবার কোনো চেতনাই তখন নেই কামিনীর। লারমুরের কথাগুলোও তার কানে যায়নি। তিনবার চাবুক খাওয়ার পরই সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। দেহটা খুঁটির সংগে বাঁধা রয়েছে ব'লে মাটিতে প'ড়ে যায়নি। রক্তাক্ত দেহটা বেঁকে কুঁকড়ে সামনের দিকে ঝুঁকে প'ড়েছে।

ফরলঙ বললেন, আই থিঙ্ক, শী নীড্স্ নো মোর! লেট মী গিভ দ্য ফাইনাল টাচ্!

এগিয়ে গিয়ে কামিনীর বুকের কাছে পিস্তল ধ'রে একটা মাত্র গুলি ছুঁড়লেন ফরলঙ। কামিনীর মাথাটা বুকে ঝুঁকে প'ড়লো।

কামিনী নামে সেই কুহকিনী নেটিব মেয়েটার নিষ্প্রাণ দেহটা ইছামতীর জলে শেষ আশ্রয় পেয়েছে জেনে কুঠিতে সবচেয়ে খুশি মিসেস লারমুর। ওই মেয়েটা এতদিন ধ'রে তাঁর অনেক স্বপ্নের রাতকে ক'রে তুলেছিল দুঃস্বপ্নের রাত! অন্যদিকে খুশিতে ডগমগ গোকুল মিত্তির। কেদার মুখুজ্যের দেওয়া বাণ সত্যিই তাহ'লে মৃত্যুবাণ!

পরের দিন ইংলিশম্যানের সম্পাদক মিস্টার ব্রেট এবং বেঙ্গল হরকরার সম্পাদক মিস্টার ফোর্ব্স্ অসাধারণ উষ্ণ অভ্যর্থনা পেলেন মোল্লাহাটি কুঠিতে। চরম দুর্দিনে তাঁরা প্ল্যাণ্টারদের সবচেয়ে উপকারী বন্ধুর কাজ ক'রেছেন এবং এখনো ক'রে চ'লছেন। প্রতি মাসে দু'জনের জন্যে দু'হাজার টাকা পাঠাতে হয় বটে কিন্তু তার বিনিময়ে তাঁরা যা করেন তার দাম অনেক বেশি!

উৎসবের সাড়া প'ড়ে গেছে কুঠিতে। রকমারি দামী মদের বোতল বেরিয়ে এলো ভাঁড়ার থেকে। কুঠির শেষ সীমানায় বাওড়ের ওপার থেকে মেরে আনা হ'ল একটা কচি হরিণছানা। পার্টির মূল দায়িত্ব যদিও মিসেস লারমুরের তাহ'লেও বিশিষ্ট অতিথি দু'জন দু'তিনদিন থাকবেন ব'লে তাঁদের নৈশ-বিলাস মধুর ক'রে তোলার দায়িত্ব দেওয়া হ'য়েছে প্যাট্রিসিয়া আর অ্যানিকে। কাকে কিভাবে পরিতুষ্ট ক'রতে হয় তা জানা আছে তাদের দু'জনেরই। আগেও এ-দায়িত্ব তারা সাফল্যের সংগে পালন ক'রেছে। কেবল আকর্ষণীয় পোশাক-পরিচ্ছদই নয়, পোশাকের অন্তরালে সুপুষ্ট, সুডোল বক্ষোসৌন্দর্যের মদির আকর্ষণকেও অবকাশ দিতে তারা কার্পণ্য করেনি। ক্যাম্পবেল আর হাইড-ও জানে, অতিথিরা যে-ক'দিন থাকবেন সে-ক'দিন তাদের ডার্লিংরাই থাকবে অতিথিদের রাতের শয্যাসঙ্গিনী। কিন্তু তা নিয়ে মুখ ভার নেই। কুঠির স্বার্থের সংগে তাদের সকলের স্বার্থই যে জড়িত।

অঢেল পান-ভোজনের ফাঁকে ফাঁকেই চ'লতে লাগলো আলোচনা। ইণ্ডিগো প্ল্যাণ্টিং মিরর সবটুকু পড়বার কোনো মানে হয় না। বাজে নষ্ট করবার মতো সময়ই বা কোথায়? যে যে অংশ প'ড়ে শোনাতে হবে সেগুলো চিহ্নিত ক'রে এনেছেন ব্রেট।

কত নোংরা এই নেটিব লেখকের রুচি! গোটা নীলকর সমাজকে হেয় ক'রেই ছাড়েনি, তাদের প্রিয়তমা পত্নীদের চরিত্রে পর্যন্ত কলঙ্কের কালি লেপন ক'রেছে! আমাদের শ্বেতাঙ্গিনী ভদ্রমহিলারা তাঁদের স্বামীদের সুখ-দুঃখের অংশভাগিনী হ'য়ে কত কষ্ট ক'রে এই অস্বাস্থ্যকর নরকের দেশে প'ড়ে আছেন অথচ তাঁদের সম্বন্ধেই এই কুৎসিত কটাক্ষ? তাঁরা ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রভাবিত করবার জন্যে নিজেদের যৌবনের আকর্ষণকে কাজে লাগান? শুধু উড সাহেবের বিবিকেই নয়, তার মাধ্যমে সমস্ত নীলকরপত্নী শ্বেতাঙ্গিনীদের প্রতি কুৎসিত ইঙ্গিত করা হ'য়েছে!

—অব্নক্শাস্!—সুরেলা গলায় তীব্র প্রতিবাদ জানালো অ্যানি।

—অব্সিন!—সায় দিলে প্যাট্রিসিয়া।—আর পড়বেন না মিস্টার ব্রেট! ওহ্! হরিব্ল্!

মাথা নীচু ক'রে ভদ্রমহিলাদের উদ্দেশ্যে সম্ভ্রম জ্ঞাপন ক'রে মিস্টার ব্রেট ব'ললেন, আপনাদের সামনে এই কদর্য সংলাপগুলো প'ড়তে হ'ল ব'লে আমি লজ্জিত। কিন্তু পরিস্থিতি আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন? এই স্কাউণ্ড্রেল নেটিব নাট্যকার জাতিবিদ্বেষের বশে সম্ভ্রান্ত

ভদ্রমহিলাদের পর্যন্ত রেহাই দেয়নি! কিন্তু তার চেয়েও ক্ষোভের বিষয় কী জানেন? একজন শ্বেতাঙ্গ মিশনারি উদ্যোগ নিয়ে এই কদর্য নাটকখানার ইংরিজি তর্জমা করিয়েছেন এবং বাঙলা সরকারের সেক্রেটারির মতো অতবড়ো দায়িত্বশীল পদে ব'সে মিস্টার সিটনকারের মতো অতবড়ো একটা হাম্‌বাগ্‌ সিবিলিয়ান এই বই হোমে পর্যন্ত পাঠিয়েছে!

ক্ষিপ্ত চিতাবাঘের মতো পায়চারি কর্‌ছিলেন লারমুর। হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে ব'ললেন, টাকার অভাব হবে না মিস্টার ব্রেট! সব ক'টা শয়তানের নামে মামলা রুজু করুন! ডেভিল্‌স্‌ মাস্ট বী স্ম্যাশ্‌ড্‌! ওই শয়তান আইরিশ মিশনারি জেম্‌স্‌ লঙ আর ব্রিটিশ হ'য়েও ব্রিটিশবিদ্বেষী ওই সীটনকারকে আমি আসামীর কাঠগড়ায় দেখতে চাই!

আমরাও তাই চাই মিস্টার লারমুর! কিন্তু বইয়ের কোথাও যে তাদের নাম ছাপা নেই!

—কারও নাম নেই?

—শুধু প্রিন্টার মিস্টার ম্যানুয়েল।

—তারই নামে মামলা করুন! মিস্টার ম্যাকআর্থারকেও আমি চিঠি দিচ্ছি, রাস্‌কেল লেপ্টেন্যান্ট গবর্নর পিটার গ্র্যান্টের বিরুদ্ধে মামলা ল'ড়তে তিনিও তৈরি হ'তে থাকুন। লঙ, সিটনকার আর গ্র্যান্টকে এমন শিক্ষা দিতে হবে যেন ভবিষ্যতে আর কোনোদিন ওরা আমাদের বিরুদ্ধে লাগতে আসার সাহস না পায়!

স্বামীর চেয়েও যেন বেশি উত্তেজিত দেখাচ্ছে মিসেস লারমুরকে। তীক্ষ্ণস্বরে তিনি ব'ললেন, মিস্টার ব্রেট! শ্বেতাঙ্গিনীদের নামে যারা এইভাবে মিথ্যে অপবাদ রটিয়ে সম্ভ্রমহানি ক'রতে চায়, তারা যেন কোনোমতেই রেহাই না পায়!

ঝাড়বাতির আলোয় মিসেস লারমুরের আঙুলে হ্যামিল্টন কোম্পানির হীরের আংটিটা তীব্র ছটায় ঝলমল ক'রতে লাগলো।

॥ সাইত্রিশ ॥

একখানা ছক্কর গাড়ি রওনা হ'ল ঠাকুরপুকুর গির্জা থেকে। আরোহী লঙ সাহেব। গাড়িখানা যাবে ভবানীপুরে। একটা বেশ বড়ো টুকরি বোঝাই ফল আগেই তুলে দেওয়া হ'য়েছে গাড়িতে।

জুন মাসের ভ্যাপ্‌সা গরম। এখন পর্যন্ত বৃষ্টির দেখা নেই। গাড়িতে ব'সে আপনমনে কত কিছু ভাবছিলেন লঙ। ক্রোধে ক্ষিপ্ত মিস্টার ব্রেট মানহানির মামালা দায়ের ক'রেছেন ইংরিজি নীলদর্পণের মুদ্রাকর সি, এইচ্‌, ম্যানুয়েলের নামে। অথচ লঙের অনুরোধে বইখানা ছাপিয়ে দেওয়া ছাড়া সে-বেচারার সত্যিই তো এ-ব্যাপারে আর কোনো দয়িত্ব নেই! তিনি ছাপাখানার মালিক, ওইটেই তাঁর ব্যবসা। তিনশো টাকায় তিনি বইখানা ছাপিয়ে দিয়েছেন। মামলায় প'ড়ে বেচারা ম্যানুয়েল কাঁদো কাঁদো ভাবে ছুটে এসেছিলেন ঠাকুরপুকুরে। শান্ত গলায় লঙ ব'লেছেন, আদালতে আপনি আমার নাম ব'লবেন। প্রমাণের অভাব হবে না, প্রিন্ট অর্ডারে আমার স্বাক্ষর আছে।

কয়েকমুহূর্ত ধ'রে লঙের স্থির অচঞ্চল মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন ম্যানুয়েল। তারপর ব'ললেন, আপনার ওপর ও'দের যে অসম্ভব রাগ আছে ফাদার!

—আমি জানি। আমি যা ক'রেচি তা সজ্ঞানে এবং সুচিন্তিতভাবেই ক'রেচি মিস্টার ম্যানুয়েল। আপনার সঙ্কোচের কোনো কারণ নেই। আমি নিজেই তো ব'লচি, আদালতে আপনি আমার নাম উল্লেখ ক'রবেন। দায়িত্ব যখন আমার, তখন ফলাফল যা-ই হোক তা আমাকে প্রশান্ত হৃদয়েই মেনে নিতে হবে! ও'রা আমার বিরুদ্ধে মামলা ক'রতে চাইলে ক'রবেন। আমিও আদালতে আমার বক্তব্য ব'লবো। আমি মনে করি, আমার পরিশ্রম সার্থক হ'য়েছে। নীলদর্পণ ইংল্যান্ডে

যাওয়ার ফলে সেখানেও এই মর্মান্তিক নীলচাষের বিরুদ্ধে তবু যাহোক একটা জনমত গ'ড়ে উঠ্‌ছে!

পড়ন্ত বিকেলের রোদ ততটা আর ঝাঁ ঝাঁ ক'রছে না বটে কিন্তু গুমোট গরমে গাড়ির ভেতর ব'সে গল্‌গল্‌ ক'রে ঘামছেন লঙ। এতটুকু বাতাস নেই, একটা গাছের পাতা নড়ছে না। কোচোয়ানের যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও ঘোড়া একটু মন্থরগতিতেই চ'লছে।

আরোগ্যকামনা ক'রে কর্নেল চ্যাম্পনিজ কয়েকদিন আগে আন্তরিকতায় ভরা একখানি চিঠি এবং কিছুদিনের জন্যে ছুটি মঞ্জুরের সংবাদ পাঠিয়েছিলেন। তারপর থেকে একদিন অন্তর তাঁর আর্দালি একগোছা ক'রে ফুল নিয়ে আসে, খবর নিয়ে যায়।

আজ চ্যাম্পনিজ সাহেবের আর্দালি চ'লে যাওয়ার একটু পরেই এলো শম্ভুচাঁদ। সে হরিশের নিষেধ মানে না। চেয়ার কাছে টেনে নিয়ে ব'সে কথা বলে যাতে হরিশকে জোরে জোরে কথা ব'লতে না হয়।

পেট্রিয়টের পরবর্তী সংখ্যা সম্বন্ধে যা যা জানা এবং জানানোর সেগুলো খুব সংক্ষেপেই সেরে নিলে শম্ভুচাঁদ। আপিসের পর গিরীশ এসে প্রুফগুলো দেখবে এবং যেগুলো হরিশকে একবার না দেখালেই নয়, সেইগুলো নিয়ে সে হয়তো সন্ধ্যের কিছু পরে আসবে।

কথায় কথায় শম্ভুচাঁদ ব'ললে, নীলদর্পণের প্রিণ্টার মিস্টার ম্যানুয়েলের নামে কাল আদালতে মামলা উঠেছিল, তিনি লঙ সায়েবের নাম ব'লে দিয়েচেন।

—তিনি না ব'ললেও ওরা ঠিকই বের ক'রে নিতো। এবার ওরা আটঘাট বেঁধে নামবে লঙ সায়েবের বিরুদ্ধে। ভালোই হ'ল। আমার নামে একটা ঝুলচে, এবার তাঁর নামে নতুন একটা ঝুলবে। ওদের মানের বহর এত বেশি যে মানহানি ঘটলে বিচলিত হ'য়ে পড়াতো খুবই স্বাভাবিক!

শম্ভুচাঁদ ব'ললে, শুনচি সিটনকারকেও একহাত নেওয়ার জন্যে ওরা পাঁয়তাড়া ক'ষচে।

—তাতে আর আশ্চর্য কী?

—কালকে কেষ্টনগর থেকে রিপোর্টার রাধিকাপ্রসন্নবাবুর একখানা চিঠি এয়েচে। দারোগা গিরীশ বোসের চাকরি গেছে।

—এ তো আমি আগেই জানতুম। এতদিন যে কেন ওর চাকরি যায়নি, সেইটেই আশ্চর্য! দারোগাগিরির চাকরি করা ওর কম্মো নয় শম্ভু! যে লোক ঘুষ খায় না, প্রজার সুবিধে ক'রে দেওয়ার জন্যে নিজের ঘাড়ে বিপদ ডেকে নেয়, নীলকরের অত্যাচার সম্বন্ধে পেট্রিয়টে রিপোর্ট পাঠায়, পুলিশের চাকরি কি তাকে পোষায়?

কয়েক মুহূর্ত নীরবে কেটে গেল।

দেওয়ালে টাঙানো সেই ফ্রেমটার দিকে আন্‌মনা হ'য়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো হরিশ। কবে সেই বছর তিনেক আগে গোন্দলপাড়া থেকে সংগ্রহ ক'রে আনা নীল গাছের চারা দু'টো শুকিয়ে একেবারে কালো হ'য়ে গেছে। ছোটোবৌ আর নিজের ঘরের ভেতরকার যে দরজাটা এক রাতে নিজের হাতে খুলে দিয়েছিল হরিশ, তার দিকেও তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। কতদিন আগে খুলে দিয়েছিল সে? একবছর?—দু'বছর?—মনে পড়ছে না।

দরজার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে হরিশ ব'ললে, আমার চাকরিও তো কবেই চ'লে যেতো শম্ভু! যায়নি ও'দের দু'জনের জন্যে—কর্নেল গোল্ডী আর কর্নেল চ্যাম্পনিজ।

চাকর খবর নিয়ে এলো, লঙ সাহেব এসেছেন।

ঘরে ঢুকে হরিশের শীর্ণ হাত টেনে নিয়ে করমর্দন ক'রলেন লঙ সাহেব। ফলের চুপ্‌ড়িটা চাকর এনে রেখে দিলে ঘরের কোণে।

—কেমন আছেন?

—এখন ক'দিন একটু ভালো।

—আরো ভালো—আরো ভালো এবং সম্পূর্ণ সুস্থ হ'য়ে উঠ্‌তে হবে! এখনো আপনার অনেক কাজ বাকি হরিশবাবু!

হরিশের বিশীর্ণ মুখে ফুটে উঠলো সেই ম্লান হাসি। ব'ললে, আপনি তো আমাদের পুরাণ প'ড়েচেন মিস্টার লঙ? ওই যে হিরণ্যকশিপুর ছেলে প্রহ্লাদ—আমার ধারণা ছিল, তার মতো প্রাণ নিয়েই আমি জন্মেচি। পাহাড় থেকে ফ্যালো, হাতির পায়ের তলায় দাও, জলে ডুবিয়ে রাখো—এ-প্রাণ যাবে না। কিন্তু এখন দেখচি, হিসেবটা ভুল ক'রেচিলুম।

—হিসেব আপনি ভুল করেননি হরিশবাবু, আপনি বেঁচে থাকবেন!—কেমন যেন একটু দ্ব্যর্থবোধক ভঙ্গিতে ব'ললেন লঙ।

হরিশ তা বুঝতে পারলো না। ব'ললে, ক'বুরেজ মশাই প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে চ'লেচেন। তাঁর হাব-ভাব দেখে মনে হচ্চে আমাকে নিয়ে তিনি মহাসমস্যায় প'ড়ে গেচেন। আয়ুর্বেদশাস্ত্রের ক্ষমতা যে কতখানি, এটা না দেখিয়ে তিনি ছাড়বেন না!

—তিনি সফল হোন, ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনাই করি! আমার অনুরোধ হরিশবাবু, আপনি ক'বরেজ মশাইয়ের কোনো নির্দেশ লঙ্ঘন ক'রবেন না! আয়ুর্বেদশাস্ত্র যে চিকিৎসা বিজ্ঞানে এক রত্ন-সমুদ্র, এ-বিশ্বাস আমার-ও হচ্চে। আমার সংস্কৃত পণ্ডিতকে আমি ব'লেচি, এর পর আমি আয়ুর্বেদ কিছু পড়তে চাই। তিনি একজন প্রবীণ আয়ুর্বেদশাস্ত্রীর সঙ্গে আমার পরিচয় ক'রে দেবেন ব'লেচেন।

—কিন্তু তার আগে তো নীলকরের ঝামেলা মেটাতে হবে?

স্নিগ্ধ হাসি হেসে লঙ ব'ললেন, ঝামেলা তো আমার সারাজীবন জুড়েই রয়েচে হরিশবাবু! ইতিহাসের ইঙ্গিত নীলকরেরা বুঝতে চায় না অথবা বোঝার ক্ষমতা তাদের নেই। নইলে তারা গরীব চাষীদের চির-ভূমিদাস ভেবে এত স্পর্ধিত হ'য়ে ওঠার সাহস দেখাতো না! আমি রুশ দেশে ভূমিদাসদের সংঘবদ্ধ সংগ্রামের শক্তি দেখেচি। সেই একই শক্তির প্রকাশ দেখলুম এদেশের নীলচাষীদের সংগ্রামে! মিউটিনি শেষ হ'য়ে গেছে, নীলবিদ্রোহ-ও মোটামুটি সফল হ'ল। ভবিষ্যতে কী হবে, কে জানে! ইতিহাসের যে-ইঙ্গিত ভবিষ্যতের ভয়ঙ্কর রক্তক্ষয়ী দিনগুলির দিকে নির্দেশ ক'রছে, তার দিকে তাকিয়ে আমি চুপ ক'রে থাকতে পারি না। সে দিনগুলি অদূর ভবিষ্যতেরও হ'তে পারে, দূর ভবিষ্যতেরও হ'তে পারে! কিন্তু আমি জানি, রুশদেশের ভূমিদাস-সংগ্রামের প্রভাব ভারতের দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। কাবুলে বিশ বছর আগে তার প্রভাব দেখা দিয়েচিল, মিউটিনির সময়ে ভারতেও তার ছায়াপাত ঘ'টেচে। আর এই সদ্যসমাপ্ত নীলবিদ্রোহ তো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে, নিজেদের ভেতরকার শক্তিটাকে আবিষ্কার করবার পর ভূমিদাস আর ভূমিদাস হ'য়ে থাকতে চায় না! সব জেনেশুনেও কি এ অবস্থায় নির্বিকার থাকা সম্ভব?

মুগ্ধ দৃষ্টিতে এই বিদেশী মিশনারির দিকে তাকিয়ে রইলো হরিশ। একটু থেমে লঙ আবার ব'ললেন, কালকে আদালতে আমার নাম উঠেচে। আমিই নাম প্রকাশ ক'রতে ম্যানুয়েলকে বলেছি। শিগ্‌গিরই হয়তো ডাক প'ড়বে। সে যাই হোক, প্রতি সপ্তাহে আমি একবার অন্তত আপনার সঙ্গে দেখা ক'রে যাবো। আপনি কোনো অবস্থাতেই অন্যায়ের সঙ্গে আপোস করেননি। আপনার সঙ্গলাভে আমি অনেক মনের জোর পাই!

একটু পরে লঙ সাহেব চ'লে গেলেন। তাঁকে হেদুয়ায় ডফ সাহেবের সঙ্গে একবার দেখা ক'রে ঠাকুরপুকুরে ফিরতে হবে।

তিনি চ'লে যাওয়ার পর শম্ভুচাঁদ ব'ললে, চার্চ মিশনারি সোসাইটি ও'র ওপর আগেই ক্ষুণ্ণ হ'য়েচিলেন। শুনচি, এই নীলদর্পণের ব্যাপারে তাঁদের ক্ষোভ উঠেচে চরমে।

—সেটা স্বাভাবিক। এবং ও'র মতো মানুষের পক্ষেও স্বাভাবিক তাতে বিচলিত না হওয়া! কত শান্ত অথচ কত দৃঢ় এই মানুষটি, তা বুঝতে পারো না?

কতদিন তামাক খায়নি হরিশ! অথচ তামাক একেবারে নিষেধ ক'রে দিয়েছেন দামোদর কবিরাজ। তাছাড়া অনেক আগে থেকেই সট্‌কায় মুখ লাগিয়ে ধোঁয়া টানতেও বড়ো কষ্ট হ'ত। মদও একেবারে নিষেধ। বিছানায় শুয়ে শুয়ে হরিশের মনে হয়, হরিশ মুখুজ্যের একটা প্রেতাত্মাকেই এরা বাঁচিয়ে রেখেছে, আসল হরিশ মুখুজ্যে বেঁচে নেই।

সন্ধ্যের বেশ কিছুক্ষণ পরে সামান্য কিছু প্রুফ নিয়ে গোবিন্দ এলো। ছোট্ট একটা চিঠি লিখে তার হাতে পাঠিয়ে দিয়েছে গিরীশ। কৈলাসকামিনীর শরীরটা খুব অসুস্থ ব'লে সে একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যাচ্ছে, পরের দিন আসবে।

গোবিন্দ ব'ললে, ক'দিন আগে আপনাকে যা দেকিচিলুম স্যার, তার চে' আজ অনেক ভালো লাগচে!

মনে মনে খুব খুশি হ'ল হরিশ। সত্যিই আজ ক'দিন হ'ল শরীরটা আগের চেয়ে কিছুটা ভালো লাগছে। ব'ললে, তাহ'লে সেরে উঠ্‌বো, কি বলো?

—আলবাৎ সেরে উঠবেন স্যার! আপনি কবে গিয়ে আবার আপনার চেয়ারে ব'সবেন আমরা তো সেই পিতিক্ষেয় দিন গুণ্‌চি।

—আমারও তো মন ছট্‌ফট্‌ ক'রচে। কিন্তু কী ক'রবো বলো? ক'বরেজ মশায়ের হুকুম ছাড়া এখন নিজের ইচ্ছেয় কিছুই আমার করবার উপায় নেই।

—আর কতদিন লাগবে স্যার?

—কি জানি! কে জানতো আমাকে এইভাবে বিছানায় শুয়ে দিন কাটাতে হবে? মিউটিনি থেমে যাওয়ার পর ভেবেচিলুম, তোমাদের সব ক'জনেরই যাহোক দু'চার টাকা ক'রে মাইনে বাড়িয়ে দেবো। কিন্তু তারপরই এই নীলের হাঙ্গামা লেগে যাওয়ায় এমন আট্‌কে গেলুম যে সেটা আর করা-ই হ'ল না।

—আমাদের মাইনে বাড়ানোর দরকার নেই স্যার, আপনি সেরে উঠে আবার হাল ধরুন, তাতেই আমরা খুশি।

—তা ব'ললেই তো হয় না গোবিন্দ! তোমাদের পুষ্যি-পরিজন বাড়চে, খরচও বাড়চে। কিছু না বাড়ালে তোমাদেরই বা কেমন ক'রে চ'লবে?

—চ'লবে স্যার, চ'লবে। আপনি যে কী বাবদ এই দু'বছর জলের মতো টাকা খর্‌চা কল্লেন, তা তো আমরা জানি! নিজের মাইনে, কাগজের বাড়তি টাকা—কিছুই তো আপনি রাখেননি!

ম্লান স্নিগ্ধ এক টুক্‌রো হাসি ফুটে উঠলো হরিশের মুখে। ব'ললে, তোমরা আমাকে এত ভালোবাসো ব'লেই বোধহয় আমার পেট্রিয়ট এতদিন বন্ধ হ'য়ে যায়নি!

—কোনোদিন যাবে না স্যার। আপনি খালি সেরে উঠুন, ভগমানের কাছে এই পেরাথ্থনা করি।

জামবাটিতে দুধ নিয়ে ঘরে ঢুকলে মাধুরী।

গোবিন্দ চ'লে যাওয়ার পর সে ব'ললে, আচ্ছা কাকাবাবু, ও'য়ারা সবাই রয়েচেন, তবু কিছুদিন তোমার এই পুরুফ্‌ না দেক্‌লেই কি নয়?

মায়ের কাছে অপরাধী বালকের মতো নিষ্ফল কৈফিয়তের হাসি হেসে হরিশ ব'ললে, তুই বিশ্বেস কর্‌ মা, প্রুফ দেখতে আমার কোনো কষ্ট হয় না। তাছাড়া, দিন-রাত শুয়ে-ব'সে এভাবে কাটাতে কি ভালো লাগে, বল্‌?

—ব্যামো হ'লে ভালো লাগুক আর না-ই লাগুক এইভাবেই কাটাতে হবে!

হরিশের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জ'মেছে। আঁচল দিয়ে কপালটা মুছে দিয়ে মাধুরী আবার ব'ললে, ভগমানের দয়ায় দিব্যি তাড়াতাড়ি সেরে উট্‌চো। তোমার পায়ে পড়ি কাকাবাবু, এখন এতটুকু অনিয়ম ক'রো না!

—কচ্চি না তো! কিন্তু তুইও সব সময় এত বাড়াবাড়ি করিসনি মা! এই যে আঁচল দিয়ে আমার ঘাম মুছে দিলি, এটা কি ভালো হ'ল? আমার আলাদা গাম্‌চা তো র'য়েচে!

—আমি বিধবা মুনির্নিষ্যি, আমার কিছু হবে না।

সেই একই কথা! বারো-চৌদ্দ বছর বয়সেও যে-কথা ব'লতো, আজও তোতাপাখির মতো সেই কথা আউড়ে গেল।

অপলক বিষণ্ণ দৃষ্টিতে মেয়েটার দিকে কয়েকমুহূর্ত তাকিয়ে রইলো হরিশ। বুকের ভেতরটা যেন মুচড়ে উঠ্‌তে লাগলো। এই নিরপরাধ মেয়েটাই আবার সুখী হ'তে পারতো! চোখের সামনে ভেসে উঠ্‌লো পাঁচবছর আগেকার সেই দিনটি। সুকিয়াস স্ট্রীটে রাজকৃষ্ণ বাড়ুজ্জ্যের বাড়িতে সাড়ম্বরে সেই প্রথম বিধবা-বিবাহ। শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন আর সেই বাল-বিধবা কালীমতী কত সুখে সংসার ক'রছে এখন! কই, বৈধব্যের অভিশাপ দ্বিতীয়বার তো স্পর্শ করেনি মেয়েটিকে?

—কী ভাবচো কাকাবাবু?

একটু যেন চ'মকে উঠলো হরিশ। করুণ বেদনার্ত দৃষ্টিতে মাধুরীর দিকে তাকিয়ে ব'ললে, আচ্ছা মধু-মা, তুই তো এখন সাবালিকা হ'য়েচিস! কোন্‌টা স্বাভাবিক, কোন্‌টা নিছকই অন্ধ-কুসংস্কার, তা বোঝার বয়স-বুদ্ধি তোর হ'য়েচে। এই যে ক'বছর আগে বিদ্যেসাগর মশাইয়ের উদ্যোগে কালীমতী নামে অকালবিধবা মেয়েটির বিয়ে হ'ল, সে কিন্তু সুখে ঘরকন্না ক'রচে। ধরু, হৃদয়বান, সচ্চরিত্র একটি পাত্রের সন্ধান যদি পাওয়া যায় তবে তুইও তো তার মতো—

হরিশকে কথাটা শেষ ক'রতে দিলে না মাধুরী। গভীর বেদনা-বিষণ্ণ অস্ফুট স্বরে ব'ললে, আমাকে ও-কথা আর ব'লো না কাকাবাবু—ব'লো না—

চোখে আঁচল দিয়ে দ্রুতপায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মাধুরী। একটু পরেই ঘরে ঢুকলো ছোটোবৌ। মৃদুস্বরে ব'ললে, তোমার ওষুদ খাওয়ার সময় হ'য়েচে দেখে মাধু ঘরে এয়েচিল। কিন্তু মেয়েটা চোকে আঁচল চাপা দিয়ে বেরিয়ে গেল কেন গা? তুমি কি ওকে ব'কেচো?

হরিশের চোখের কোণ্‌ চিক্‌ চিক্‌ ক'রছে। —ওকে কি আমি ব'কতে পারি ছোটোবৌ? ওর মুখখানা দেখি আর আমার বুক ফেটে যায়! মেয়েটা যদি আবার বে' বসতে রাজী হয়, সেই কথাই ওকে বলচিলুম। উঃ, নতুন ক'নের সাজে ওর হাসিমুখখানা যদি দেখে যেতে পারতুম!

ছোটোবৌ আঁচলে চোখ মুছে ব'ললে, তুমি সেরে ওঠো, ওকে আমি রাজী করাবো।

—তুমি পারবে? —হরিশের কোটরগত চোখ দু'টি উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠলো।

—ভগমান আমার কোলে তো একটাও দেননি! মাধু-ই আমার মেয়ে। আমাদের দু'জনারই মেয়ে হ'য়ে ও এয়েচে। ওকে আমরা বে' দেবো! নাও, ওষুদটা খেয়ে নাও—

ওষুধ খেয়ে হরিশ ব'ললে, আমার মাধু-মায়ের জন্যেই আমাকে সুস্থ হ'য়ে উঠতে হবে ছোটোবৌ! জানো, আজ ক'টা দিন যেরকম বোধ কচ্চি তাতে মনে হয়, যমরাজের সঙ্গে দামোদর কব্‌রেজের এই কুস্তিতে কব্‌রেজমশাই হয়তো জিতে যেতেও পারেন।

ছোটোবৌয়ের চোখে একই সঙ্গে জল আর আশার আলো! দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে সে ইষ্টদেবতার উদ্দেশে প্রণাম জানালো। সাবিত্রী খবর নিয়ে এলো, গিরীশকাকাবাবু এসেছেন। ছোটোবৌ তাড়াতাড়ি গামছায় হরিশের মুখ মুছে দিয়ে ঘোমটা টেনে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। একটু পরেই ঘরে ঢুকলেন রুক্মিণী এবং তার পেছনে এলো গিরীশ।

রুক্মিণী এখন প্রায় নির্বাক উন্মাদিনীর মতো হ'য়ে গেছেন। হরিশের অতি ঘনিষ্ঠ গিরীশ কিম্বা শম্ভুচাঁদ এলেই তিনি সঙ্গে আসেন। উন্মুখ আগ্রহে ছেলেদের মুখ থেকে আশ্বাসবাণী শোনার জন্যে প্রতীক্ষা করেন।

দু'দিন পরে এ-সপ্তাহের পেট্রিয়ট বেরোবে। কী কী লেখা যাচ্ছে তা হরিশকে দেখিয়ে নিয়ে যেতে হয়। তালিকা সঙ্গেই এনেছে গিরীশ। সে-সম্বন্ধে দু'জনের কথাবার্তা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রুক্মিণী ব'ললেন, আচ্ছা বাবা গিরীশ, আজ ওর মুখে দু'দিন আগেকার দুব্‌লা ভাবটা আর আচে? অনেক ভালো দ্যাকাচ্চে না?

গিরীশ সংগে সংগে ব'ললে, আমিও তো সেই কথাই ব'লতে যাচ্ছিলুম মা! কব্‌রেজমশাইয়ের ওষুধ ঠিকই ধ'রেচে! এখন ওর দরকার শুধু বিশ্রাম। ওকে সেরে উঠতেই হবে!

—তোমার মুকে ফুলচন্নন পড়ুক, বাবা! আমি তো পই পই ক'রে বলি, ওই কাগজ নিয়ে তোর অত চিন্তে-ভাবনার কী আচে? গিরীশ, শম্ভু—এরা তো তোর সোদব ভেয়ের মতো সব দায়-দায়িক নিজেরাই কাঁধে তুলে নিয়েচে। তুই একটু জিরিয়ে নিলে কী এমন ক্ষেতি?

হরিশের মাথা আবার ধ'রেছে। জ্বরও আবার বাড়তে আরম্ভ ক'রেছে, তা সে নিজেই বুঝতে পারছে। সাবিত্রী আবার খবর নিয়ে এলো, একজন অচেনা বাবু কাকাবাবুর সংগে দেখা ক'রতে এসেছেন।

হরিশ জিজ্ঞেস ক'রলে, নাম ব'লেচেন?

সাবিত্রী ব'ললে, হ্যাঁ, ব'লেচেন। কী যেন কেষ্টদাস—

—বোঝা গেচে।—গম্ভীরমুখে গিরীশ ব'ললে, কৃষ্ণদাস পাল!

—কৃষ্ণদাস!—তীব্র মাথার যন্ত্রণার ভেতরেও হরিশের মুখে বিশীর্ণ হাসি ফুটে উঠলো।—ও আবার এলো কেন?

গিরীশ ব'ললে, মনে হয়, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের জমিদারবাবুরা হয়তো চক্ষুলজ্জার খাতিরে হরিশ মুখুজ্যের খবর নেবার জন্যে তাঁদের বশম্বদ ছোকরাকে পাঠিয়ে থাকবেন।

হুঁ, তাই হয়তো হবে। যা সাবি, ওকে এ-ঘরে নিয়ে আয়—

সাবিত্রী মাথা নেড়ে বেরিয়ে গেল। রুক্মিণীও ঘর থেকে বেরোলেন বটে তবে দরজা থেকে বেশি দূরে গেলেন না। যে-ই আসুক, হরিশকে যেন বেশি বক্‌বক্‌ না করায় সে-ব্যাপারে নজর রাখতে হবে।

একটু পরে ঘরে ঢুকলো যুবক কৃষ্ণদাস পাল। নমস্কার জানিয়ে হরিশের উদ্দেশে ব'ললে, পরম করুণাময় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, আপনি অচিরে আরোগ্যলাভ করুন! আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের সকল সদস্যই আপনার দ্রুত আরোগ্যলাভ কামনা ক'রে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

—এত শুভেচ্ছার জন্যে তাঁদের সকলকেই আমার ধন্যবাদ জানিও কৃষ্ণদাস!

—তাঁরা আসতে পারলেন না ব'লে—

—না, না, কুণ্ঠার কোনো কারণ নেই। তাঁরা প্রত্যেকেই কর্মব্যস্ত ব্যক্তি। তুমি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি। তুমি ব্যক্তিগতভাবে শুভেচ্ছা জানাতে এয়েচ, এই তো যথেষ্ট! আশা করি, তোমাদের কাজকর্ম ভালোই চ'লচে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তা চ'লচে। তবে হ্যাঁ, একটা বিষয়ে আপনাকে অবহিত কবা প্রয়োজন। অ্যাসোসিয়েশনের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনার উদ্দেশ্যে একটি মিটিঙের দিন ধার্য হ'য়েচে। অন্যান্য সব বিষয়ের হিসেব দপ্তরে আছে। কেবল 'ইণ্ডিগো ফাণ্ড' সংক্রান্ত হিসেবটা আপনার কাছে রয়েচে। তাই সেক্রেটারি ব'ললেন—

কৃষ্ণদাসের কথা শেষ হওয়ার আগেই গিরীশ ব'ললে, সেই হিসেবটার জন্যেই তোমাদের সেক্রেটারি তোমাকে পাঠিয়েচেন কৃষ্ণদাস?

কৃষ্ণদাস আম্‌তা আম্‌তা ক'রে ব'ললে, আজ্ঞে, ঠিক তা নয়। তবে মিটিঙে সে-হিসেবটাও তো পেশ হওয়া আবশ্যক? তাই হরিশবাবু যদি অনুগ্রহ ক'রে ইণ্ডিগো ফাণ্ড বাবদ হিসেব এবং গচ্ছিত টাকাকড়ি আমার কাছে দিয়ে দেন তো ভালো হয়!

গিরীশ গর্জন ক'রে উঠলো, ওই সামান্য টাকার হিসেবটা না পেয়েই বোধহয় অ্যাসোসিয়েশনের রাজা-মহারাজাদের রাতের ঘুম হচ্চে না? আশ্চর্য তোমাদের রাজাসাহেবদের আচরণ! ইণ্ডিগো ফাণ্ড তৈরি করবার ব্যাপারে তাঁদের কোনো আগ্রহ ছিল? ওতোরপাড়ার জয়কেষ্ট মুখুজ্যের চাপে প'ড়ে ওই ফাণ্ড গড়ার ব্যাপারটাকে তাঁরা বাধ্য হ'য়ে মেনে নিয়েচিলেন। বাধা দিয়ে বানচাল করবার কোনো চেষ্টাই তাঁরা বাদ রাখেননি! তাঁরই চাপে ফাণ্ডের দায়িত্ব সেই মানুষটির ওপরে

দেওয়া হ'য়েচিল, যে-মানুষটি কিনা নীলচাষীদের জন্যে নিজের সর্বস্ব দিয়ে নিঃস্ব হ'য়েচে, এমন কি, প্রাণটাও দিতে ব'সেচে!

হরিশ উত্তেজনায় চিৎকার ক'রে উঠলো, তুমি থামো গিরীশ, এখন ও-সব কথার কোনো অর্থ নেই! ফাণ্ড যখন অ্যাসোসিয়েশনের নামেই আচে, তখন ওদের কাছে হিসেব বুঝিয়ে দিয়ে আমি দায়মুক্ত হই। আমার মাকে একবার ডেকে আনো গিরীশ!

গিরীশ ডেকে আনার আগেই হরিশের চিৎকারে ঘরে ঢুকে প'ড়েছেন রুক্মিণী। তাঁকে দেখেই হরিশ ব'ললে, মা, আমার টেবিলে ডানদিকে সবচেয়ে নীচের দেরাজে একটা টাকার থলি আর তারই পাশে কিছু কাগজপত্র বাঁধা রয়েচে। সব নিয়ে এসো—

রুক্মিণী বেরিয়ে গিয়ে আবার একটু পরেই সেগুলো নিয়ে ফিরে এলেন। হিসেবের খাতায় একটু চোখ বুলিয়ে কৃষ্ণদাস ব'ললে, সেক্রেটারি ব'লচিলেন, হাজারখানেক টাকা হয়তো আচে। এ যে দেখচি মাত্র সাড়ে তিনশো মতো টাকা—

উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে হরিশ পাগলের মতো চিৎকার ক'রে উঠলো, কী ব'লতে চাও কৃষ্ণদাস, হরিশ মুখুজ্যে চোর? ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের কাছে শেষ পর্যন্ত এই পুরস্কারও আমার পাওনা ছিল?

হরিশ হাঁপাতে হাঁপাতে শুয়ে প'ড়লো। গিরীশ আরো জোরে চিৎকার ক'রে উঠলো, তুমি সব রেখে যাও কৃষ্ণদাস! জয়কেষ্ট মুখুজ্যেকে খবর পাঠাচ্চি। তিনি এসে হিসেব বুঝে নিয়ে তোমাদের হাতে দেবেন।

—না গিরীশ, অত দেরি আমার সইবে না! নিয়ে যাক, ও নিয়ে যাক। মা, ওরা যা চায় তাই দিয়ে দাও! ওপরের দেরাজে পেট্রিয়টের কিছু টাকা আচে। তাতেও না কুলোয়, মধু-মাকে বলো, আমার মাইনের টাকা থেকে দিয়ে দিক। হাজার—বারোশা—দেড়হাজার ওরা যা চায় দিয়ে দাও—দিয়ে দাও—

॥ আটত্রিশ ॥

কালীপ্রসন্ন স্তব্ধ, বিমূঢ়ভাবে শম্ভুচাঁদের মুখে খবরটা শুনলো।

—ডিলিরিয়ম? প্রলাপ ব'কছেন?—কালীপ্রসন্নের গলার স্বর কাঁপছে।

ধরা গলায় শম্ভুচাঁদ ব'ললে, হ্যাঁ। এ-কথা আমরা সবাই বুঝতে পারছি, এ-অবস্থা থেকে সুস্থ হ'য়ে ওঠা মিরাকল্ ছাড়া সম্ভব নয়। তবু দুঃখু কী জানো? আসন্ন মৃত্যুর ঠিক আগে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে তাঁর সঙ্গে যে-ব্যবহারটা করা হ'ল সেটা মানুষের যোগ্য নয়!

—তুমি কি মনে করো অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যেরা সবাই মানুষ? শম্ভু, আমার যতদূর মনে হয়, কেষ্টদাসবাবুকে পাঠানোর পেছনে তারই মুরুব্বি বাগাড়ম্বর মিত্তিরের কারসাজি রয়েচে!

—তুমি কি দিগম্বর মিত্তিরের কথা ব'লচো?

—বুঝতেই তো পাচ্চ ভাই। যে-মানুষটা দেশের কাজে সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে এখন মৃত্যুপথযাত্রী, তাঁর শেষ ক'টা দিন শান্তিতে কাটুক, তা কেমন ক'রে হয়? পিশাচ! এরা পিশাচ!

—সেদিন কেষ্টদাস চ'লে আসার পর থেকে দাদার অবস্থার অবনতি হ'তে থাকে। এত বেশি উত্তেজিত হ'য়ে গিয়েচিলেন যে—

—উত্তেজিত ক'রতেই তো অনুচরকে পাঠানো! এই জমিদারবাবুদের জীবনে উন্নতি ঠেকায় কে? ওদের কথা থাক শম্ভু! ভাবতেও গা ঘিন ঘিন করে। তুমি তো আজ রাতটা ভবানীপুরেই থাকবে ব'ললে। তাই থাকো। আমি কাল্ সকালেই যাবো।

শম্ভুচাঁদ ব'ললে, যেয়ো। তোমাকে বড়ো স্নেহ করেন। দেখলে খুশি হবেন।

কালীপ্রসন্ন একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ব'ললে, আমি ভাগ্যবান, শম্ভু! এরা কেউ বুঝতে পারচে না, হরিশ মুখুজ্যের চ'লে যাওয়ার অর্থ ইন্দ্রপতন! তিরিশ সালে নাকি এক ভয়ংকর জলপ্লাবনে হাজার হাজার লোক গৃহহীন হ'য়েছিল। সদ্য বিগত বিদ্রোহেও দেশের অনেক ক্ষতি হ'য়েচে। কিন্তু হরিশ চ'লে গেলে গোটা ভারতবর্ষের যে-ক্ষতি হবে, সে-ক্ষতির কোনো তুলনা তো আমি খুঁজে পাচ্চিনে! লক্ষ লক্ষ গরীব নীলচাষী যে পিতৃহীন হ'য়ে যাবে শম্ভু! রাজা রামমোহন, দয়ার সাগর বিদ্যেসাগর আমাদের নমস্য! তবু বলচি, সতীদাহ নিবারণ আন্দোলনে রামমোহন দেশের যেটুকু উপকারসাধনে সমর্থ হ'য়েচেন, বিধবাবিবাহ প্রবর্তনে বিদ্যেসাগর দেশের যেটুকু উপকার ক'রেচেন, তার চেয়ে বহুগুণে বেশি উপকার ক'রেচেন হরিশ। হিংস্র ব্রিটিশ ফৌজের হাত থেকে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীকে তিনি রক্ষা ক'রেচেন, নরপশু নীলকরদের হাতে নির্যাতিত লক্ষ লক্ষ গরীব চাষীর পক্ষ নিয়ে লড়াই ক'রে তাদের তিনি মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়ানোর প্রেরণা একা জুগিয়ে গেচেন! দেশপ্রেমিক কাকে বলে? তাঁর চেয়ে মহৎ দেশপ্রেমিক আর কেউ আচে এখন? শম্ভু, মন যদিও কিছুটা প্রস্তুত হ'য়ে রয়েচে তবু যেন বিশ্বেস করতে পাচ্চিনে, হরিশ সত্যি সত্যিই চ'লে যাবেন!

জোড়াসাঁকো থেকে রওনা হ'য়ে শম্ভুচাঁদ সন্ধ্যের আগেই হরিশের বাড়িতে পেঁছিলো।

মাধুরী তখন খল-নুড়িতে ওষুধ মেড়ে হরিশের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।—কাকাবাবু, ওষুদটা খেয়ে নাও!

—কে?—আচ্ছন্ন ক্ষীণস্বরে ব'ললে হরিশ। চোখের পাতা খুলে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে মাধুরীর দিকে তাকালো।—তুমি কে?

উদ্গত কান্না চাপতে চাপতে মাধুরী ব'ললে, আমি কাকাবাবু! আমি মাধুরী—তোমার মধু-মা!

—মধু-মা!—বিড়বিড় ক'রে কথাটা উচ্চারণ ক'রলো। তারপর ব'ললে, তুমি থান-ধুতি প'রেচো কেন মধুমা? ও কাপড় তো বিধবা মেয়েরা পরে। যাও, রঙীন শাড়ি প'রে এসো—

—পরবো।—ওষুদটুকু খেয়ে নাও কাকাবাবু!

—দাও।—ওষুধ খেয়ে মাধুরীর কান্না-ভাঙা মুখের দিকে তাকিয়ে হরিশ ব'লতে লাগলো, The time is nearly come when all the Indian questions must be solved by Indians you know? সেপাইরা জেগে উঠেছিল কিন্তু শেষরক্ষে কত্তে পারলে না, ওঃ! নীলচাষীরা জেগেছে, শেষরক্ষেও ক'রেচে! ওই মানুষগুলোই তো দেশের আসল মানুষ আর আমরা?

মাধুরী কান্না চেপে চোখের জল মুছতে মুছতে ব'ললে, সবাই তা বুঝতে পেরেচে কাকাবাবু! দোহাই তোমার, থামো! তোমার শরীল দুবলা—

—ছোটোবৌ, আমি থাকবো না! তুমি তো ব'লেচো, মধু-মা তোমার মেয়ে? সব কুসংস্কারে লাথি মেরে আমার মধু-মাকে আবার তুমি বিয়ে দিও ছোটোবৌ! মধু-মা আমার বড়ো দুঃখিনী! ওর মুখের দিকে আমি তাকাতে পারিনে! বুক ফেটে যায়—

ঘরে ঢুকলো ছোটোবৌ। দরজার বাইরে থেকে হরিশের কথা কিছুটা তার কানে গেছে। সে মাধুরীকে নিঃশব্দ ইশারায় ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে ব'লে হরিশের কাছে এগিয়ে এলো।

—কে, গিরীশ? মিস্টার মন্ট্রিওকে ব'লো, কোনো চিন্তা নেই! মথুর বিশ্বাস নিজে তাঁর পুত্রবধূকে সঙ্গে নিয়ে আসবেন, সাক্ষী দেবেন! আমাকে চিঠি দিয়েছেন। কোর্টেই প্রমাণ হ'য়ে যাবে কে কার মানহানি ক'রেচে! হরিশ মুখুজ্যে আর্চিবল্ড হিলসের না নরপশু আর্চিবল্ড হিলস্ সেই নিষ্পাপ গৃহবধূর? মিস্টার মন্ট্রিও তাঁর পেশায় সৎ! তিনি চেষ্টার কসুর করবেন না, সে-বিশ্বাস আমার আচে, গিরীশ! হরমণিকে আমি চোখে দেখিনি কিন্তু আমার সেই অভাগিনী মায়ের মুখখানা যে আমার চোখের সামনে ভাসচে! কেঁদো না মা, তোমার

লাঞ্ছনার প্রতিকার নিশ্চয়ই হবে! হাজার হাজার মা আবার নির্ভয় হবে! গিরীশ, আপোস আমি ক'রবো না—

শূন্যে একখানা হাত ছুঁড়ে আবার হাতখানা নামিয়ে নিলে হরিশ। চোখ বুজে হাঁপাতে লাগলো। ছোটোবৌ হাতপাখা দিয়ে হরিশকে হাওয়া ক'রতে লাগলো। মাধুরী দ্রুতপায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে হারাণের কাছে ছুটে গেল।—কব্‌রেজমশাইকে এখুনি ডেকে আনো, বাবা!

দামোদর কবিরাজ হারাণের মুখে বিবরণ শুনে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে তারপর ব'ললেন, এখুনি যাওয়ার দরকার নেই মুখুজ্যেমশাই। দু'রকমের ওষুধ দিচ্ছি। প্রথমটা এখুনি গিয়েই খাইয়ে দেবেন। দ্বিতীয়টা খাওয়াবেন আগামীকাল ভোরে সূর্যোদয়ের পূর্বে। সকালে সংবাদ পাঠাবেন তারপর যাবো।

হারাণ ফিরে আসার পর হরিশকে ওষুধ খাইয়ে মাধুরী সবে ঘর থেকে বেরিয়েছে এমন সময় চাকর এসে খবর দিলে, সেই করালী বুড়ো ন'দে-যশোরের ক'জন চাষী-সঙ্গী নিয়ে বাবুকে দেখতে এসেছে। তারা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

মাধুরী সদরের দিকে এগিয়ে গেল। তাকে দেখেই জোড়হাতে প্রণাম জানিয়ে করালী ব্যাকুল-স্বরে ব'ললে, বাবু ক্যামন আচেন দিদি? আমরা অ্যাকবার দ্যাকা কত্তি পারবো?

মাধুরী ধরা গলায় ব'ললে, আজ রাতে তো দ্যাকা করা যাবে না!

—সে আজ রাত্তিরি না হোক, কালকে বিহেনব্যালায় তেনারে দশ্যন করবো না কী ক'স ইসুব?

ইসুব বিশবাস সায় দিয়ে ব'ললে, সেই ভালো।

করালী ব'ললে, রাত্তিরব্যালায় বাবুরি বেরক্ত করাও ঠিক না।

মাধুরী ব'ললে, তোমাদের দেকলে কাকাবাবুও কত খুশি হবেন! তোমরা মোট ক'জন এয়েচো করালীদাদা?

—আটজন, দিদি। এই ঝে দ্যাকো, ঝে হিলিস সায়েবডা বাবুর নামে মিত্যে ফোজদুরি ঠুকিচে সেই সায়েবের কুটি ভেঙি চুরমার ক'রে ছেড়িচে এই ইসুব আর এই বেন্দাবন। আর এই হল সবির মেঞা—কুটেল সায়েবগোর সঙ্গে জব্বর লড়াইয়ে ওস্তাদ। আর এই দুই জোয়ান হচ্চে ছকু ঢালী আর সোরাব মণ্ডল। নালমোন সায়েবের নাম শুনিচো তো দিদি? সেই শয়তানডার গোলামগুলোরে আচ্ছা দোরস্ত করিচে এরা। এনার নাম গোপাল আর এই ঝে দেখতিচো পটখড়ির লাকান পেল্লাদ আর জামির শ্যাখ—এরা দুইঝনাই কদ-খাটা চাষা। কদ খেটিচে কিন্তু নীল করে নাই। হাজার হাজার নোক বাবুরি দেকতি চায় দিদি, তা অত ঝনারে কি আনা যায়, কও?

মাধুরীর চোখ জলে ঝাঁপ্‌সা হ'য়ে এলো। চোখ মুছে নিয়ে সে ব'ললে, কাকাবাবু যে কি খুশি হবেন! করালীদাদা, আজকের রাতটা তোমরা একটু কষ্ট ক'রে ওই কদম গাছটার তলায় কাটিয়ে দিতে পারবে না? জায়গাটা পরিষ্কারই আচে।

—খুব পারবো দিদি! পোষ্কার না থাকলিও ক'রে নেতাম। ও নে' তোমার ভাবতি হবে না। বাবুর সঙ্গে সাক্ষেৎ হলিই জেবন ধন্য!

—আটজনের মতো রান্না হ'লেই হবে তো? না কি আর ক'জনের বেশি ক'রবো?

—আন্নাবান্না কত্তি হবে না দিদি! এরা বাবুরি দেকতি আয়েচে, খেতি তো আসে নাই?

—তা কি হয়? তোমরা এ-বাড়িতে এসে না খেয়ে থাকলে আমার কাকাবাবুর অকল্যেণ হবে না? কাকাবাবু-ই বা শুনলে কত দুঃখু পাবেন বলো তো?

করালী বিব্রতভাবে ব'ললে, আচ্ছা দিদি, আর ও-কতা কবো না।

মাধুরী ভেতরে চ'লে যাওয়ার পর সবাইকে নিয়ে কদমগাছটার তলায় ব'সলো করালী। ইসুব চাপাগলায় ব'ললে, অ করালীদা, আমরা কয়ঝনা তো মোচলমান। আমাদের খানাও আন্না হবে?

—ধুশ্‌শালা মেঞার বাচ্চা, কনে আয়েচিস তা খেয়াল আচে? শুনিস নাই, হরিশির কাচে

জেতের বেচার নাই? গ্যালো দুই সন কত মোচলমান এই বাড়ির ভাত খেয়ি গ্যালো আর তুই আজ ভারী মোচলমানি ফলাচ্চিস, ক্যামন? কাফেরের বাড়ি ভাত খেতি তোর মানা আচে?

—কী ঝে কও!—লজ্জা পেয়ে ইসুব ব'ললে, আগে আসি নাই তো?

বৈঠকখানায় ব'সে আছে শম্ভুচাঁদ।

দেওয়াল ঘড়িতে পেণ্ডুলামের টিক্‌টিক্ শব্দ ছাড়া ঘরে আর কোনো শব্দ নেই। সাবিত্রী একবার এসে খাওয়ার কথা ব'লেছিল। শম্ভুচাঁদ জানিয়ে দিয়েছে, আজ রাতে তার খাওয়ার ইচ্ছে নেই। দামোদর কবিরাজ আজ রাতে আসতে চাননি শুনে সে বুঝে নিয়েছে, আজকের এই রাত সঙ্কটের রাত।

হরিশের শিয়রে ব'সে আছে ছোটোবৌ। আজও তার সিঁথির সিঁদুররেখা চওড়া, কপালে সিঁদুরের টিপ আগের দিনের চেয়ে বড়ো। মাধুরী করালীদের খাইয়ে এসে কাকাবাবুর পায়ের কাছে ব'সে আস্তে আস্তে পা টিপে দিচ্ছে। রুক্মিণী দরজার বাইরে দেওয়ালে ঠেস্ দিয়ে নিথরভাবে ব'সে আছেন। ভাদ্রবধূ ঘরে রয়েছেন ব'লে হারাণ ঘরে না ঢুকে বাইরের দালানে পায়চারি ক'রছে। পা ধ'রে গেলে কখনো বা টুলে একটু ব'সে নিয়ে আবার পায়চারি ক'রছে।

কবিরাজের ওষুধের ক্রিয়ায় হরিশের আচ্ছন্নভাব কেটেছে। সন্ধ্যে থেকে মাঝে মাঝে প্রলাপ বকছিল। এখন আর সে-ভাবটা নেই। একবার নির্জীবস্বরে একটু জল চাইলো। ছোটোবৌ সন্তর্পণে তাকে জল খাইয়ে আবার পাখার হাওয়া ক'রতে লাগলো।

জল খাওয়ার একটু পরে হরিশ ক্ষীণস্বরে ব'ললে, ছোটোবৌ, দস্যি দামাল ছেলের মতো জীবনটা বড়ো বেপরোয়াভাবে কাটিয়ে দিলুম! তোমাদের কাউকে সুখী ক'রতে পারলুম না!

ছোটোবৌ নীরবে চোখের জল মুছতে লাগলো। মাধুরী ব'ললে, আর কথা ব'লো না কাকাবাবু! একটু ঘুমোও!

দূর থেকে সদর দেওয়ানি আদালতের পেটা-ঘড়ির শব্দ একঘণ্টা অন্তর ভেসে আসছে ঢং-ঢং-ঢং—

কদমগাছতলায় ওদের আটজনের চোখেও ঘুম নেই।

করালী বলছিল, জাননি সবির, আমাদের কী কী কত্তি হবে তা মুই ভেবি রেকিচি। অ্যাকন বাবুর শরীল ঝা দুব্‌লা তাতে তেনারে অ্যাকন তো আর যাওয়ার কতা কওয়া যাবে না? শরীলডে সেরি উটুক তারপর ওনারে আমরা গোয়াড়ি নে' যাবো। র‍্যালগাড়িতি গোয়াড়ি যাবেন তারপরই পাল্‌কি। অ্যাকখান জব্বর দেকে বাহারি পাল্‌কির বস্তা রাকতি হবে রে ভাই! পালকিতি ক'রে গেরাম-গঞ্জে ঘুরে বেড়ালি তো আর ধকলের ভয় নাই? পাল্‌কি ভাড়ায় ঝ্যাতো টাকা নাগে নাগুক। রেয়েরা চান্দা ক'রে দেবে না কী কও জামির ভাই?

—কবো আবার কী? এ তো হক কতা! তুমি কিচ্চু ভেবোনি দাদা, সব্বাই দেবে।

করালী ব'ললে, সে কি আর আমি জানিনে? নয়তো পাল্‌কির কতা ভাবলাম ক্যান? সে-পালকিতি ঝে ঘাড় নাগাবে তারই পুণ্যি!

পেল্লাদ ব'ললে, পালকি কান্ধে নেয়ার জন্যি ঝে হুড়োহুড়ি প'ড়ে যাবে!

—সে তো যেতিই হবে।—সোচ্ছ্বাসে ব'ললে করালী, শালা রেয়েরা ঝ্যাকন জানতি পারবে, তান্দের হরিশ আয়েচে ত্যাকন কেডা নিজিরি সামলাতি পারবে?

সবির ব'ললে, অত নোকের হ্যাঁচকানিতি পাল্‌কি না উলো হয়ে যায়!

রীতিমতো ধমকের সুরে করালী ব'ললে, ক্যান, উলো হবে ক্যান? তোরা শালারা নালমুকো লীলমেম্‌দোগলোর কুটিকে-কুটি ভেঙি তছ্‌নছ্ কল্লি, সেই সুমুন্দিগুলোরে পিটোয়ে তক্তা কল্লি আর হরিশির পাল্‌কিখান সামাল দিতি পারবি নে?

বৃন্দাবন ব'ললে, আরে, ওর কতা ছাড়ান্ দ্যাও। পাল্‌কি অমনি উলো হলিই হল?

—হ! অ্যাই হল সাচা কতা! উলো হক নালমোন সুমুন্দির কারবার, উলো হক নীলির কারবার! হরিশির পাল্‌কি থাকুক থিয়ে সোজা!

উদগ্রীব ব্যাকুল দৃষ্টিতে প্রায় সারাক্ষণই হরিশের মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে ছোটোবৌ। রাত সাড়ে তিনটের পর সে যেন অবস্থার একটু পরিবর্তন দেখতে পেলো। মাধুরীর তখন একটু ঝিমুনি এসেছে। তার গায়ে মৃদু চাপ দিয়ে চাপাস্বরে ছোটোবৌ ব'ললে, সাড় বোধহয় ফিরেচে!

তাড়াতাড়ি চোখ কচ্‌লে নিয়ে মাধুরী এগিয়ে গেল। হ্যাঁ, কাকাবাবুর সাড় ফিরেছে! মুখে কথা নেই। শুধু একটা যন্ত্রণাকাতর অভিব্যক্তি।

ভোরবেলায় পুরোপুরি জ্ঞান ফিরলো। চোখের চাউনি স্বাভাবিক কিন্তু বড়ো দুর্বল। স্বাভাবিক ভাবেই মাধুরীর কাছে জল খেতে চাইলো হরিশ। মাধুরী তাড়াতাড়ি ভোরবেলার জন্যে নির্দিষ্ট ওষুধ খাইয়ে দিয়ে একটু একটু ক'রে জল দিতে লাগলো। হারাণ কবিরাজবাড়ি রওনা হ'য়ে গেল।

জানালা দিয়ে সদ্য সকালের আলো এসে প'ড়েছে। মোক্ষদার লাগানো কদমগাছটা ফিকে অন্ধকারের আবরণ থেকে মুক্ত হ'য়ে হরিশের চোখের সামনে স্পষ্ট হ'য়ে উঠছে। গাছটা আরো কত বেড়ে উঠেছে অথচ যার হাতের গাছ সে নেই!

—হ্যাঁরে মধু-মা, সকাল হ'ল তাই না?

—হ্যাঁ কাকাবাবু। তোমার শরীল এখন ভালো লাগচে?—ব্যাকুল স্বরে প্রশ্ন ক'রলো মাধুরী।

—হ্যাঁ রে মা। অনেক ঝরঝরে লাগচে! বৌঠান কোথায় রে? একবার ডাকবি?

—এখুনি ডেকে আনছি।—মাধুরী দ্রুতপায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কদমগাছটার দিকে দুর্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো হরিশ। তার চোখের কোণ্ বেয়ে জল গড়িয়ে প'ড়তে লাগলো।

একটু পরে দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো বড়োবৌ।—আমাকে ডেকেচো ঠাকুরপো?

—আচ্ছা বৌঠান, তোমাদের সেই আগেকার ছোটোবৌকে আমরা সবাই ভুলে গেচি, তাই না? সে-ও কিন্তু একদিন এ-বাড়ির-ই একজন ছিল! আচ্ছা, সে কবে আমাদের ছেড়ে চ'লে গেচে, ব'লতে পারো? আমি কত চেষ্টা কচ্চি কিন্তু কিছুতেই স্মরণ ক'রতে পাচ্চি নে!

উদ্গত কান্নার বেগ চেপে বড়োবৌ ব'ললে, অ্যাকন আর তার কতা ভেবে লাভ কী ঠাকুরপো? সে তো আর ফিরবে না!

ম্লান বিশীর্ণ হাসি ফুটে উঠলো হরিশের মুখে।—বৌঠান, আমরা যারা বেঁচে থাকি তারা কত অকৃতজ্ঞ! একটা মানুষ চ'লে গেলে আর আমরা তাকে মনে রাখি নে! আমি নিজেই তাকে মনে ক'রতে পাচ্চিনে, তোমাদের আর কী দোষ বৌঠান? ছোটোবৌ, তুমি দুঃখ পেয়ো না! তার হাতের ওই কদমগাছটা দেখে কেবলই তার কথা মনে প'ড়চে! হ্যাঁ রে মধু-মা, আজ কত তারিখ রে?

—পয়লা আষাঢ়। —ধরা গলায় ব'ললে মাধুরী।

—পয়লা আষাঢ়! আষাঢ়স্য প্রথম দিবস! জানো ছোটোবৌ, কালী সিংঘি ছেলেটা কি অপূর্ব সুন্দর কালিদাস আবৃত্তি করে! সবাইকে একেবারে মুগ্ধ ক'রে দেয়! —ব'লেই ক্ষীণস্বরে হরিশ নিজেই আবৃত্তি ক'রতে লাগলো,—

আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে মেঘমাশ্লিষ্টসানুং বপ্রক্রীড়াপরিণত গজপ্রেক্ষণীয়ং দদর্শ॥
তস্য স্থিত্বা কথমপি পুরঃ কৌতুকাধানহেতোরন্তর্বাষ্পশ্চিরমনুচরো রাজরাজস্য দধ্যৌ।
মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনিজনে কিম্ পুনর্দূরসংস্থে॥

—এই তো দিব্যি মেঘদূত পাঠ ক'চ্চেন হরিশবাবু! তাহলে অবশ্যই অনেকখানি সুস্থ বোধ ক'চ্চেন, কী বলেন?—ব'লতে ব'লতে ঘরে ঢুকলেন দামোদর কবিরাজ। তাঁর পেছনে হারাণ আর শম্ভুচাঁদ। ছোটোবৌ মাথার ঘোমটা আরো একটুখানি টেনে দিলে।

দামোদর কবিরাজের দিকে তাকিয়ে ক্ষীণ, পাণ্ডুর একটুখানি হাসির সঙ্গে হরিশ ব'ললে, আজ পয়লা আষাঢ় শুনে মহাকবিকে মনে প'ড়ে গেল কব্‌রেজমশাই! একসময় ভেবেছিলুম, সংস্কৃত ভাষাটা একটু ভালো ক'রে শিখে নিয়ে সংস্কৃত সাহিত্যের বিশাল রত্নভাণ্ডার থেকে কিছু রস আহরণের চেষ্টা ক'রবো। কিন্তু সেই ডালহৌসি সাহেব থেকে এই নীলকর সাহেবের দল পর্যন্ত সবাই যেন চক্রান্ত ক'রে আমাকে আর পড়াশোনাই করতে দিলে না! ও কে, শম্ভু নাকি?

—হ্যাঁ, দাদা।—শম্ভুচাঁদ উত্তর দিলে।

হারাণ ব'ললে, শম্ভু কাল সন্ধ্যেবেলা থেকেই রয়েচে। রাতে বাড়ি ফেরেনি।

—ভালো করোনি ভাই! আজ সকালে এলেই হ'ত! পেট্রিয়ট ঠিক দিনেই বেরুচ্চে তো?

—কোনো চিন্তা নেই দাদা, ঠিকই বেরুবে। আজ চোদ্দুই জুন—

দামোদর কবিরাজ মৃদু ধমকের সুরে ব'ললেন, সে-চিন্তে এখন আপনার নয়—ও'দের। কই, হাত এগিয়ে দিন!

খাটের পাশে টুলে ব'সে গভীর অভিনিবেশে হরিশের নাড়ী পরীক্ষা ক'রতে আরম্ভ ক'রলেন দামোদর। চোখে-মুখে ঈষৎ আশার চিহ্ন।

হরিশ ব'ললে, আচ্ছা কব্‌রেজমশাই, কালিদাসের কালের সঙ্গে আমাদের একালের এত পার্থক্য হ'য়ে গেল কেন, বলুন তো? ইংরিজি ক্যালেণ্ডারে হোক চোদ্দুই জুন কিন্তু আমাদের তো আষাঢ়স্য প্রথম দিবস? মহাকবি ব'লেচেন, আষাঢ় মাসের প্রথম দিবসে পর্বতের সানুদেশে প্রমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় নবমেঘের ক্রীড়া দর্শন ক'রে বিরহী যক্ষ বাহ্যজ্ঞানহীন হ'য়ে প'ড়েচে। আজও পয়লা আষাঢ় কিন্তু আকাশে মেঘ কোথায়?

—আসবে হরিশবাবু, মেঘ আসবে! বর্ষাসমাগম সূচিত হ'লে আকাশে প্রমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ঘন কৃষ্ণ মেঘ দেখা না দিয়ে কি পারে?

একটু অবকাশ পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মাধুরী ব'ললে, কাকাবাবু, তোমার ব্যামোর খবর পেয়ে কয়েকজন লোক সঙ্গে নিয়ে সেই করালীবুড়ো কাল সন্ধ্যেবেলায় এয়েচে।

—করালী সর্দার এয়েচে! —আনন্দে, উত্তেজনায় মুহূর্তের ভেতর উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠলো হরিশের দু'চোখ। —ডাক্ ওদের! ডেকে আন্ মা—

মাধুরী প্রস্থানোদ্যত হ'তেই দামোদর নিষেধ ক'রলেন। —উঁহুঁ, এখনো ডাকা চ'লবে না হরিশবাবু!

—ওরা যে সেই কত দূরে দূরে থেকে এয়েচে কব্‌রেজ মশাই!

—জানি। ওরা যে আপনার প্রতি অন্তরের টানেই এয়েচে তাও বুঝতে পারি। কিন্তু ওরা আপনার সামনে এসে দাঁড়ালে আপনি যে উচ্ছ্বাস সামলাতে পারবেন না হরিশবাবু! আর কিছুটা সময় যাক। তারপর ওদের ডেকে আনার সময় হ'লে আমি ব'লবো।

কিন্তু তাদের ডাকার অবসর আর হ'ল না। মিনিট পনেরো পরেই হরিশ আবার আচ্ছন্ন। নাড়ী ধরা-ই ছিল দামোদরের। তাঁর মুখ ক্রমেই গম্ভীর হ'তে লাগলো। চোখ বুজে নাড়ী টিপে ব'সে রইলেন তিনি।

আবার শুরু হ'ল প্রলাপ।

—গিরীশ, তোমাকে এত ক'রে ব'ললুম, তবু প্রুফটা আমাকে দিচ্ছ না কেন? মেশিন প্রুফটা আমাকে দেখতে দাও—ছাপায় যেন একটাও ভুল না থাকে—

আচ্ছন্ন, জড়িতস্বরে প্রলাপ ব'কছে হরিশ। অশক্ত, দুর্বল হাত তুলে প্রুফের কাগজগুলো সে খুঁজতে লাগলো।

টাউন কলকাতা থেকে গিরীশ আর কিশোরীচাঁদকে নিয়ে একখানা ফিটন গাড়ি ছুটে চ'লেছে ভবানীপুরের দিকে। জোড়াসাঁকো থেকে আর একখানা ল্যাণ্ডো ছুটেছে—সওয়ারি কালীপ্রসন্ন।

—গিরীশ, গিভ দ্য প্রুফ! গিভ দ্য মেশিন প্রুফ প্লীজ—

হাতখানা উঠতে উঠতে প'ড়ে গেল। দেহ নিথর, নিস্পন্দ। দামোদর কবিরাজ হরিশের ডানহাতখানা তার বুকের ওপর রেখে ছলছল চোখে ব'ললেন, উনি চ'লে গেলেন! রাখতে পারলুম না—

হরিশের বুকের ওপর আছড়ে প'ড়লো মাধুরী। পায়ের ওপর ছোটোবৌ।

হঠাৎ নারীকণ্ঠের মর্মভেদী কান্নার ঢেউ আছড়ে পড়লো ভবানীপুর চালপট্টির বাতাসে।

কদমগাছটার তলায় সঙ্গীদের নিয়ে ব'সে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিল করালী সর্দার, কখন দেখা করবার ডাক আসে! মাধুরীর কান্নার শব্দ কানে যেতেই এক বুকফাটা আর্তনাদ ক'রে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। মাটিতে লুটিয়ে প'ড়ে হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠলো সবির, ইসুব, বৃন্দাবন, ছকু, সোরাব সবাই। যারা লাঠি-সড়কি হাতে দোর্দণ্ডপ্রতাপ নীলকরদের সঙ্গে লড়াই ক'রেছে, তাদের নীলকুঠি ভেঙে তছ্‌নছ্‌ ক'রেছে, তারা শিশুর মতো মাটিতে লুটিয়ে কেঁদে বুক ভাসাচ্ছে।

সেই অমার্জিত, অপরিশীলিত গ্রাম্য মানুষগুলির বুকফাটা কান্নার ঢেউ বৃথাই হয়তো টাউন কলকাতার বাতাসে প্রতিধ্বনিত হ'য়ে ফিরতে লাগলো।